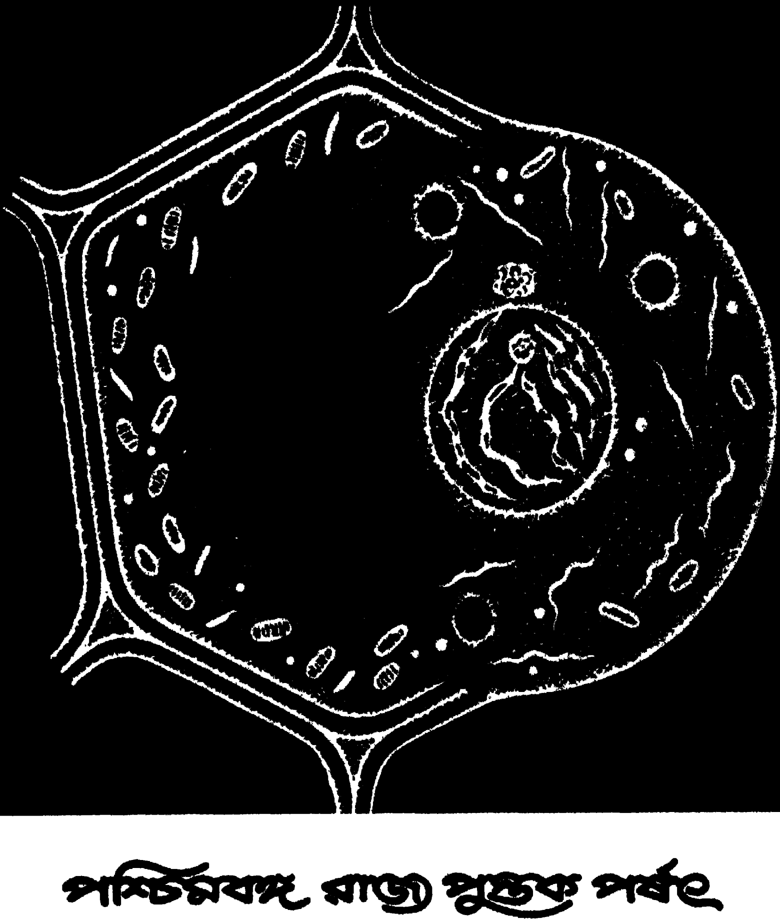
সাইটোলজি

সুহিতা গুহ



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

সাইটোলজি

সুহিতা গুহ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

..............Public Library
11th FIN Com No....................
11th FIN. Com M R N 78832

CYTOLOGY
Suhita Guha

West Bengal State Book Board
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৬০/বি

571.6
G=9112

প্রকাশক ঃ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলকাতা ৭০০ ০১৩

বিপণন কেন্দ্র ঃ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ বিপণন কেন্দ্র
১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ISBN-81-247-0524-0

ডিটিপি টাইপ সেটার ঃ
শুভম গ্রাফিক্স
৮এ, আরিফ রোড
কলকাতা ৭০০ ০৬৭

অফসেট প্রিন্টার ঃ
অজন্তা প্রিন্টার্স
৭বি সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (শিক্ষা বিভাগ), নতুন দিল্লি কর্তৃক আঞ্চলিক ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের গ্রন্থ রচনা প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ-এর মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক শ্রী গুণেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত

মা'কে

তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক স্তরে পঠন-পাঠনের উপযোগী করে রচিত কোষবিজ্ঞানের এই বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। আধুনিকীকরণের স্বার্থে পূর্ব-প্রকাশিত সংস্করণের তুলনায় এই সংস্করণে উল্লেখযোগ্য পরিমার্জনা ও সংযোজন করা হয়েছে।

বঙ্গভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের ব্যবহার্যতার নিরিখে বিজ্ঞান বিষয়ে প্রকাশিত পর্ষদের অন্যান্য কয়েকটি প্রকাশনার মত এই বইটিও পাঠকবৃন্দের সমাদর লাভ করে এসেছে।

আশা করা যায়, এই পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণটির সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাদের সম্পর্ক নিকটতর হবে।

কলকাতা

গুণেন্দ্রনাথ মজুমদার
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সাইটোলজির নানা জটিল বিষয় এই বইয়ে যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি। এই সংস্করণ আমূল সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করা হয়েছে। সাইটোলজির গবেষণার দ্রুত অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সংস্করণে অনেক নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া ক্যারিওটাইপের বিবর্তন, কোষের বৃদ্ধি, বিকাশ ও বার্ধক্য এবং ক্যানসার ইত্যাদি তিনটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। অনেক চিত্র এইসব আলোচনাকে সুবোধ্য করেছে।

এই সংস্করণটি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর হীরেন্দ্র চন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় অত্যন্ত যত্ন করে দেখে দিয়েছেন ও অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই বই প্রকাশনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। পরিশেষে বোধি প্রেসকে, যাঁরা এই বই যত্ন করে ছেপেছেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আশা করি প্রথম সংস্করণের মতো এই সংস্করণটিও ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপকমণ্ডলীর সমাদর লাভ করবে। এই বইয়ের উৎকর্ষ বাড়াতে সুধী অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সুচিন্তিত মতামত আহ্বান করছি।

সুহিতা গুহ

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বাংলা ভাষায় সাম্মানিক-স্তরে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের সবে শুরু। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক পাঠ্যসূচি অনুসারে লিখিত বাংলা বইয়ের খুবই অভাব। বিশেষ করে কোষতত্ত্ব বা সাইটোলজি সম্বন্ধে লিখিত বাংলা বইয়ের সংখ্যা নগণ্য। সেজন্য এই বিষয়কে যথা সম্ভব সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে এই বইয়ে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক (অনার্স) পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বইটি লেখা হয়েছে।

বাংলা প্রতিশব্দের বেশিরভাগই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' অনুযায়ী করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রচলিত মূল বৈজ্ঞানিক শব্দগুলিও রাখা হয়েছে, কারণ ছাত্র-ছাত্রীদের এইসব শব্দের সাথে পরিচয় থাকলে তাঁরা আন্তর্জাতিক বই ও গবেষণা নিবন্ধগুলি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

এই বইয়ে মূলত কোষতত্ত্ব বা সাইটোলজি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তবে যেহেতু কোষতত্ত্ব ও জিনতত্ত্ব নিবিড়ভাবে জড়িত, সেজন্য বিভিন্ন প্রসঙ্গে জিনতত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। দশম অধ্যায়ে জিন মিউটেশন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে পলিপ্লয়েডি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে সাইটোলজীয় ও জেনেটিক উভয় পদ্ধতিতে গঠিত ক্রোমোসোমের মানচিত্রের বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া কোষতত্ত্বের নানা বিষয় সহজে বোঝার জন্য সপ্তম অধ্যায়ে জনন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

এই বই লেখার সময় বিভিন্ন বইয়ের সাহায্য নিয়েছি। আমি সেই সব বইয়ের লেখকদের কাছে ঋণী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর হীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় বইটির পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে দেখে দিয়েছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে বইটির উৎকর্ষ বাড়াতে সাহায্য করেছেন, তাঁর কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। শ্রী অঞ্জন চক্রবর্তী এই বইয়ের প্রথম দিকের কিছু ছবি যত্ন সহকারে এঁকে দিয়েছেন। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই। শ্রীপার্থ সুবীর গুহ বইটি লেখা ও ছাপার সময় নানাভাবে সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, যাঁরা এই বই প্রকাশনার গুরু দায়িত্ব বহন করেছেন, তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। পরিশেষে, জেনারেল প্রিন্টার্সকে, যাঁরা এই বই যত্ন সহকারে ছেপেছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ।

সাম্মানিক স্তরে কোষতত্ত্ব বা সাইটোলজির বাংলা বইয়ের অভাব আশা করি এই বই অন্তত কিছুটা দূর করতে পারবে। বইটি যদি ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপকমণ্ডলীর প্রয়োজন মেটায়, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

সুহিতা গুহ

সূচিপত্র

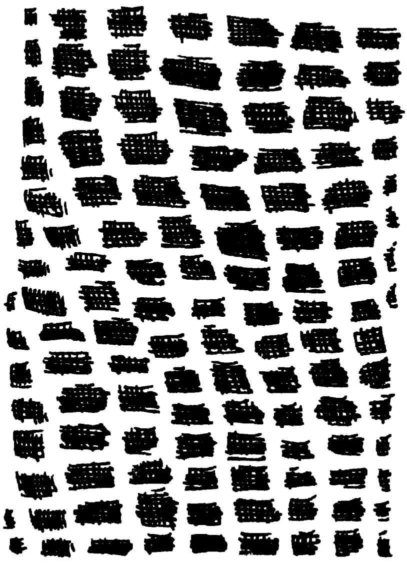
সাইটোলজি

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

যে ছোট ছোট অংশ দিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহ তৈরি, সেই কোষ (সেল) সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানই হল সাইটোলজি (গ্রিক শব্দ cytos = ফাঁকা স্থান) বা কোষতত্ত্ব। জীবতত্ত্বের এই বিশেষ শাখাটি উদ্ভিদ বা প্রাণী দেহের সূক্ষ্ম গঠন ভালভাবে দেখবার আগ্রহ থেকেই জন্মলাভ করেছে।

1665 খ্রিস্টাব্দে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইংরেজ বিজ্ঞানী Robert Hooke-এর বোতলের ছিপির (কর্ক) কোষ বা cell আবিষ্কারই সাইটোলজি (cytology) বা



চিত্র—1

ছিপির সেকশন থেকে অঙ্কিত কোষের চিত্র

কোষতত্ত্বের সূচনা করে। তিনি ছিপির সেকশনে (বা ছেদে) মৌচাকের মত অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর দেখতে পান (চিত্র 1)। প্রতিটি ঘর হল প্রাচীর বেষ্টিত একটি ফাঁকা স্থান। তিনি এইসব ঘরকে সেল (ল্যাটিন cellula = ছোট ঘর) নাম দেন। সেলকে (cell) বাংলায় 'কোষ' বলা হয়ে থাকে। Hooke ছিপিতে যে 'সেল' দেখেছিলেন তা মৃত ছিল। সুতরাং, তিনি কেবল কোষ প্রাচীরই দেখতে পেরেছিলেন।

ওই শতাব্দীতেই ইতালীয় বিজ্ঞানী Malpighi এবং ইংরেজ বিজ্ঞানী Grew স্বাধীনভাবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের টিস্যু (tissue বা কলা) পরীক্ষা করে Hooke-এর গবেষণাকে সমর্থন করেন। তাঁরা দেখেন যে, সব উদ্ভিদের দেহই কোষ দিয়ে তৈরি। কিন্তু এইসব বিজ্ঞানীরা কেবল কোষ প্রাচীরের বর্ণনা করেন, কোষের সজীব প্রোটোপ্লাজম সম্বন্ধে তাঁদের কোনও ধারণা ছিল না। 1772 খ্রিস্টাব্দে Corti এবং 1781 খ্রিস্টাব্দে Fontana কোষের ভিতরে সজীব রসের মত বস্তু লক্ষ্য করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বহু গবেষণার ফলে কোষতত্ত্বের নতুন নতুন তথ্য জানা গিয়েছে এবং এই শতাব্দীকে কোষতত্ত্বের বর্ণনামূলক যুগ বলা হয়। 1802 খ্রিস্টাব্দে de Mirble বলেন যে, উদ্ভিদ দেহ সূক্ষ্ম কোষ সমষ্টি দিয়ে গঠিত। 1809 খ্রিস্টাব্দে Lamarck বললেন যে, সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ কোষ দিয়ে তৈরি। ফরাসী বিজ্ঞানী H. J. Dutrochet (1824) এবং পরে Turpin (1826), Meyers (1830) ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ ও প্রাণীতে কোষের উপস্থিতির প্রমাণ পান এবং কোষের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। প্রায় ওই সময়েই Robert Brown (1831) অর্কিডের পাতার কোষের মাঝখানে গোলাকার বস্তু দেখতে পান ও তিনি এই বস্তুকে নিউক্লিয়াস (nucleus) নাম দেন। এর এক বছর পর Dumortier শৈবালে কোষ বিভাজন দেখতে পেয়েছিলেন। Dujardin 1835 খ্রিস্টাব্দে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর কোষের ভিতরের সজীব জেলির মত পদার্থকে 'সারকোড' (sarcode) নাম দেন।

নিউক্লিয়াসের আবিষ্কারের পরে জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী M. T. Schleiden (1838) ও প্রাণী বিজ্ঞানী T. Schwann (1839) **কোষ মতবাদ** (cell theory) গঠন করেন। এই মতবাদ অনুসারে, কোষই হল জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব বস্তুর আধার এবং সব সজীব বস্তুই কোষ দিয়ে তৈরি। কোষ মতবাদের সূচনা জীববিজ্ঞানে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। von Mohl-এর গবেষণাও এই মতবাদকে সমর্থন করে। তবে এই মতের ব্যতিক্রম দেখা যায় ভাইরাসের ক্ষেত্রে। ভাইরাসের দেহ অকোষীয় (acellular)। এখানে সুগঠিত নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম থাকে না। ভাইরাস অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং কেবল পরজীবী হিসাবে থাকে। Schleiden ও Schwann-এর মতে, কোষ হল দেহ গঠনের একক। ইট দিয়ে যেমন অট্টালিকা তৈরি হয়, ঠিক তেমনি অসংখ্য কোষ দিয়ে জীবদেহ গঠিত। বিভিন্ন রকমের কোষের ভিন্ন ভিন্ন কাজের ফলে বহুকোষী জীবদেহের নানা কাজ সাধিত হয়। অনেক ছোট ছোট জীবই এককোষী এবং এই সব জীবদেহের সাথে বহুকোষী জীবের কোষের যথেষ্ট সাদৃশ্য থেকে Schleiden ও Schwann সিদ্ধান্ত করলেন যে, বিবর্তনের কোনও পর্যায়ে এককোষী জীব দলবদ্ধভাবে বাস করেছিল, অর্থাৎ তারা আলগা কলোনি তৈরি করেছিল। এইভাবে সংযুক্ত থাকতে থাকতে প্রতিটি কোষ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে; এর ফলে বহুকোষী উচ্চতর জীবের সৃষ্টি হয়েছে। Schwann কোষের অঙ্গসংস্থানিক ও

শারীরতত্ত্বীয় গুরুত্ব প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন বলে তাকে সাইটোলজির জনক বলা হয়। কোষ মতবাদ দিয়ে সিনোসাইটিক (coenocytic) দেহের ব্যাখ্যা করা কঠিন। এই রকমের দেহ বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত মধ্যপর্দাবিহীন প্রোটোপ্লাজম দিয়ে তৈরি। কোষ মতবাদের কিছু সমর্থকরা বলেন যে, সিনোসাইটিক দেহের প্রতিটি নিউক্লিয়াস ও তার চারিদিকের সাইটোপ্লাজম একটি কোষের সমকক্ষ, আবার অন্যান্যদের মতে সম্পূর্ণ সিনোসাইটিক দেহটাই একটি কোষ। কিন্তু এই দুই মতের কোনোটাই সম্পূর্ণ ঠিক নয়। 1839 খ্রিস্টাব্দে Schleiden বললেন যে, নতুন কোষ পুরনো কোষের ভিতরের সাইটোব্লাষ্ট (cytoblast) অর্থাৎ নিউক্লিয়াস থেকে তৈরি হয়। প্রথমে তাঁর এই মত সমর্থন লাভ করেছিল, কিন্তু 1840-1860 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে von Mohl, Nageli এবং Virchow প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন যে, প্রত্যেক কোষ পুরনো কোষের বিভাজনের ফলেই গঠিত হয়।

R. Virchow- এর (1858) মত অনুসারে (a) প্রত্যেক জীব দেহই কোষ দিয়ে তৈরি এবং (b) প্রত্যেক কোষ পুরনো কোষ থেকে উৎপন্ন হয়। পরে ফ্রান্সে Louis Pasteur Virchow-র মতের সপক্ষে প্রমাণ দেন। সুতরাং, সজীব দেহ জননশীল কোষ দিয়ে গঠিত।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষে প্রোটোপ্লাজমের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। 1837 খ্রিস্টাব্দে J. E. Purkinje কোষের ভিতরের চটচটে পদার্থকে প্রোটোপ্লাজম (protoplasm; গ্রিক শব্দ proto = প্রথম; plasm = গঠিত) নাম দেন। 1846 খ্রিস্টাব্দে Hugo von Mohl কোষে প্রোটোপ্লাজমের গুরুত্বের বিবরণ দেন। 1861 খ্রিস্টাব্দে Schultz প্রাণী কোষের 'সারকোড' ও উদ্ভিদ কোষের 'প্রোটোপ্লাজমে'র মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেন। Schultz-এর **প্রোটোপ্লাজম মতবাদ** (protoplasm doctrine) অনুসারে সব জীবের প্রোটোপ্লাজম একই রকমের। জীব দেহে প্রোটোপ্লাজমের ভূমিকাই মুখ্য এবং কোষ প্রাচীরের ভূমিকা গৌণ। Schultz প্রোটোপ্লাজমের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও, Huxley-ই (1868) প্রথম বলেন যে, প্রোটোপ্লাজমই হল জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। Huxley-র গবেষণা প্রোটোপ্লাজম মতবাদকে সমর্থন করে। 1880 খ্রিস্টাব্দে Hanstein একটি কোষের নিউক্লিয়াসযুক্ত প্রোটোপ্লাজমকে প্রোটোপ্লাষ্ট (protoplast) নামে অভিহিত করেন।

de Bary, Sachs ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে কোষ মতবাদের বিপক্ষে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করলেন ও তাঁরা একটি নতুন মতবাদ (organismal theory) গঠন করলেন। এই মতবাদ অনুসারে, বহুকোষী জীব দেহ অবিচ্ছিন্ন প্রোটোপ্লাজম দিয়ে তৈরি এবং প্রোটোপ্লাজম অসম্পূর্ণভাবে ছোট ছোট অংশ বা কোষে বিভক্ত। কোষই হল বিভিন্ন কাজের কেন্দ্রস্থল। **অরগ্যানিসম্যাল** (organismal) **মতবাদ** অনুসারে কোষকে জীব দেহের একক (unit) বলা হয় না, সম্পূর্ণ জীবটি একটি একক হিসাবে কাজ করে। এই মত অনুসারে সিনোসাইটিক দেহ হল একটি কোষ।

1835-1839 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে von Mohl কোষ বিভাজন লক্ষ্য করেন। পরে 1855 খ্রিস্টাব্দে Virchow বলেন যে, প্রত্যেক কোষই মাতৃকোষের বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে, আবার সেই মাতৃকোষ তার আগের মাতৃকোষের বিভাজনের ফলে উৎপন্ন হয়েছে। 1882 খ্রিস্টাব্দে Flemming বিস্তারিতভাবে দেহ কোষের বিভাজন বর্ণনা করেন ও এই বিভাজনকে মাইটোসিস (mitosis) নাম দেন। Waldeyer ক্রোমোসোমের প্রথম বর্ণনা দেন এবং পরে (1888) এর ক্রোমোসোম নামকরণ করেন। 1866 খ্রিস্টাব্দে Haeckel প্লাস্টিড দেখতে পান। 1871 খ্রিস্টাব্দে Miescher নিউক্লিন (এখনকার নিউক্লিও প্রোটিন) আবিষ্কার করলেন। পরে Flemming (1879) নিউক্লিয়াসের বর্ণগ্রহণকারী অংশকে ক্রোমাটিন নাম দেন। তিনি ক্রোমোসোমের লম্বালম্বি বিভাজনও লক্ষ্য করেছিলেন। Hertwig (1876), Strasburger (1884), Weismann (1885) প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ স্বাধীনভাবে কাজ করে বললেন যে, ক্রোমাটিনই হল বংশধারার বাহক। Wilson, von Beneden, Boveri প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণও এই গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে Weismann বংশধারার 'জার্মপ্লাজম মতবাদ' (germplasm theory) প্রকাশ করেন। 1884 খ্রিস্টাব্দে von Beneden ও Heusen দেখেন যে, ক্রোমোসোমগুলির লম্বালম্বি অর্ধাংশ কোষ বিভাজনের সময় অপত্য কোষে যায়। আশির দশকে Heitzmann, Klein, Flemming, Butschli, Mayer, de Vries, Benda প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণের গবেষণার ফলে ভ্যাকুওল, প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বস্তু ইত্যাদির আচরণ সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা গিয়েছে। 1882 খ্রিস্টাব্দে Flemming সেন্ট্রোসোমের উৎপত্তি ও ফার্টিলাইজেশনে এদের ভূমিকার উল্লেখ করেন। 1855 খ্রিস্টাব্দে Pringsheim শৈবালের স্ত্রী কোষে শুক্রাণুর প্রবেশ লক্ষ্য করেন। এর কিছুদিন আগে Kölleker (1845) দেখেন যে, শুক্রাণু ও ডিম্বাণু হচ্ছে এককোষী। Butschli (1875) ডিম্বাণুর পরিণতি ও ফার্টিলাইজেশন (নিষেক) নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণা করেন। Oscar Hertwig সী আর্চিনের (sea urchin) ফার্টিলাইজেশনের সময় ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসের মিলন লক্ষ্য করেন ও বংশধারায় নিউক্লিয়াসের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। Strasbürger দেখেন যে, উদ্ভিদেও ফার্টিলাইজেশনের সময় দুইটি নিউক্লিয়াসের মিলন হয়, যার একটি মাতা থেকে অন্যটি পিতা থেকে আসে। Weismann বলেন যে, দুইটি প্রজন্মের মধ্যে জনন কোষ সেতু রচনা করে। সুতরাং, জনন কোষের মধ্যেই ঐ জীবের সকল চরিত্রের বাহক কোনও বস্তু থাকে। von Beneden (1887) দেখেন যে, ফার্টিলাইজেশনের সময় ডিম্বাণু ও শুক্রাণু থেকে সমান সংখ্যক ক্রোমোসোম আসে ও এইসব জনন কোষে পিতা বা মাতার দেহ কোষের অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। 1894 খ্রিস্টাব্দে Strasbürger দেখেন যে, সপুষ্পক উদ্ভিদে গ্যামেট গঠনের সময় ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাস পায়। 1903 খ্রিস্টাব্দে Flemming, von Beneden, Bovari, Montgomery

ও Sutton মায়োসিসের (meiosis) প্রধান পর্যায়গুলির বর্ণনা করেন। পরীক্ষামূলক কোষতত্ত্বের সূচনা হয় 1887 খ্রিস্টাব্দে। ঐ সময় O. Hertwig এবং R. Hertwig ফার্টিলাইজেশন সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। পরীক্ষামূলক কোষতত্ত্বের প্রথমদিকে, অর্থাৎ 1887-1890 পর্যন্ত কোষতত্ত্ব পরীক্ষামূলক ভ্রূণতত্ত্বের (embryology) সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল। বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে কোষতত্ত্ব এই সময়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়, কোষতত্ত্বীয় গবেষণার বিভিন্ন কলাকৌশলেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। 1870-এ মাইক্রোটোমের (microtome) আবিষ্কার একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই যন্ত্রের সাহায্যে কোনও টিসুর পর্যায়ক্রমিক সেকশন কাটা যায়। আরো পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও মাইক্রোটোমের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে ও রঞ্জিতকরণ (staining), ফিক্সেশন (fixation) প্রভৃতি প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে।

1865 খ্রিস্টাব্দে Mendel দীর্ঘ গবেষণার উপর ভিত্তি করে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। কিন্তু তখনকার বিজ্ঞানীরা এর তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। 1900 খ্রিস্টাব্দে de Vries, Tschermak এবং Correns প্রত্যেকে আলাদাভাবে Mendel-এর সূত্র আবিষ্কার করেন। এর ফলে জেনেটিক্স (genetics) বা জিনতত্ত্বের সূচনা হয়। জিনতত্ত্বের সাথে কোষতত্ত্ব নিবিড়ভাবে জড়িত, কারণ কোষের ক্রোমোসোমের মধ্যেই বংশধারার নিয়ন্ত্রক জিনগুলি থাকে। সুতরাং, জিনতত্ত্বের আইন-কানুন বুঝতে হলে কোষতত্ত্বের জ্ঞান অপরিহার্য। প্রথমদিকে এই দুই বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক এত ভাল করে বোঝা যায়নি, কিন্তু যতই গবেষণা হচ্ছে ও কোষতত্ত্ব ও জিনতত্ত্বের নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, ততই দেখা যাচ্ছে যে, জিনতত্ত্ব ও কোষতত্ত্ব হল একই বিজ্ঞানের দুইটি দিক। ক্রোমোসোমের আচরণ ও জিনতত্ত্বীয় গবেষণালব্ধ ফলের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গিয়েছে এবং অধিকাংশ গবেষণায় উভয় পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এই দুই পদ্ধতির একসাথে ব্যবহারের ফলে সংকর বিজ্ঞান সাইটোজেনেটিক্স (cytogenetics) বা কোষজিনতত্ত্বের সূচনা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে ক্রমবিকাশেব নানা মতবাদ গড়ে উঠেছে। এই সময় জীববিজ্ঞানী Weismann তাঁর বংশধারার ও বিবর্তনের মতবাদ প্রকাশ করেন। 1896 খ্রিস্টাব্দে Wilson বংশধারায় ক্রোমোসোমের ভূমিকার বর্ণনা করেন। পরে Morgan ও তাঁর অনুগামীরা (1910-1926) Wilson-এর মতের সমর্থনে বিভিন্ন তথ্য পেশ করেন।

বিংশ শতাব্দীতে নতুন যন্ত্রপাতি ও উন্নত কলাকৌশলের ব্যবহারের ফলে কোষতত্ত্বের অনেক উন্নতি হয়েছে। যেমন, ফেজ কনট্রাস্ট অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সজীব কোষ পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা দৃশ্যমান আলোক ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তুলনায় অনেক বেশি। মাইক্রো-ম্যানিপুলেটার দিয়ে সজীব কোষের ব্যবচ্ছেদ করা সম্ভব হয়েছে। চলচ্চিত্রের ক্যামেরা

দিয়ে সজীব কোষের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার যেমন— কোষ বিভাজন ইত্যাদির আলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

এই শতাব্দীতে জিনের প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা গিয়েছে ও ক্রোমোসোমে এদের সরলরেখায় অবস্থান প্রমাণিত হয়েছে। জিনের স্বজনন, মিউটেশনের ক্ষমতা ও চরিত্র নির্ধারণে জিনের গুরুত্ব নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। জেনেটিক পদার্থ হিসাবে ডি. এন. এ-র (ডিঅক্সি-রাইবোজ-নিউক্লিক অ্যাসিড) দাবী প্রমাণিত হয়েছে।

1881 খ্রিস্টাব্দে Balbiani-র ড্রসোফিলার অতিকায় স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমের আবিষ্কার কোষতত্ত্বের (সাইটোলজির) গবেষণার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এই ক্রোমোসোমের গুরুত্ব অনেক পরে, ত্রিশের দশকে বোঝা গিয়েছিল। প্রায় এই সময় Müller (1927) ও Stadler (1928) স্বাধীনভাবে রঞ্জন রশ্মির (X-ray) প্রয়োগ করে কৃত্রিম মিউটেশন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অস্বাভাবিক ক্রোমোসোমের উপর গবেষণা করে বংশধারায় ক্রোমোসোমের ভূমিকা সম্বন্ধে জানা গিয়েছে ও কোষতত্ত্বের নানা জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করা সম্ভব হয়েছে। এই সময়ে পলিপ্লয়েডিও আবিষ্কৃত হয়েছে ও জীবের বিবর্তনে পলিপ্লয়েডির গুরুত্ব বোঝা গিয়েছে।

1953 খ্রিস্টাব্দে Watson, Crick এবং Wilkins ডি. এন. এ-র গঠন সঠিকভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হন। ডি. এন. এ. অণুর গঠনের সাহায্যে জিনের স্বজনন, মিউটেশন ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা যায়। পরে প্রোটিন উৎপাদনে ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এ-র গুরুত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কোষতত্ত্বের (cytological) গবেষণার জন্য আজকাল সংখ্যাতত্ত্বের বহুল ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতির ব্যবহার করে নানা জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়েছে; জিনের কাজ ও ক্রোমোসোমের আচরণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গিয়েছে। এই জন্য কোষতত্ত্বের গবেষণায় রাসায়নবিদ্ ও সংখ্যাতত্ত্ববিদ্দের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

জীবের বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়া যেমন— বিপাক, বৃদ্ধি, বিকাশ, বংশগতি ও বিবর্তন ইত্যাদি সম্বন্ধে যথাযথ ধারণার জন্য সাইটোলজির জ্ঞান প্রয়োজন। এখন জানা গেছে যে, বিভিন্ন বিজ্ঞানের সাথে সাইটোলজির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

i) সাইটোট্যাক্সোনোমি বা Cytotaxonomy (Cytology ও Taxonomy)— কোষতত্ত্বের সাথে শ্রেণীতত্ত্বের (taxonomy) নিবিড় যোগাযোগ লক্ষ্য করা হয়েছে। ক্রোমোসোমের সংখ্যা ও আকৃতি থেকে বিভিন্ন জীবের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা যায় কারণ, প্রত্যেক প্রজাতিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক এবং নির্দিষ্ট আকার ও আয়তনের ক্রোমোসোম থাকে। এছাড়া কোষতত্ত্বের সাহায্যে কোনও শ্রেণীবিন্যাসগত এককের (taxonomic unit) উৎপত্তি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। নিকট প্রজাতি (species) বা গণের (genus) ক্রোমোসোমের আচরণ পরীক্ষা করে তাদের সম্পর্ক বোঝা যায়। উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় জটিল প্রশ্ন আংশিক বা

সম্পূর্ণভাবে ক্রোমোসোমীয় গবেষণার সাহায্যে মীমাংসা করা সম্ভব হয়েছে। কোষতত্ত্বের সাহায্যে ট্যাক্সোনোমির নানা জটিল সমস্যার মীমাংসা করাকে সাইটোট্যাক্সোনোমি বলে।

ii) **সাইটোজেনেটিক্স** বা Cytogenetics (Cytology ও Genetics)— এই বিজ্ঞান থেকে বংশগতি, প্রকারণ, পরিব্যক্তি, বিবর্তন ইত্যাদির কোষতত্ত্বীয় ভিত্তি সম্বন্ধে জানা যায়। জিন বা ক্রোমোসোমের পরিবর্তনের ফলে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি দেখা দেয়। নতুন প্রজাতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এইসব পরিব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং, সাইটোলজির সাথে বিবর্তনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মেন্ডেলের সূত্র বা জার্মপ্লাজমের মতবাদের সঠিক ব্যাখ্যা কোষতত্ত্ব বা সাইটোলজি থেকেই পাওয়া যায়।

iii) **সাইটোকেমিস্ট্রি** বা Cytochemistry (Cytology ও Chemistry)— সজীব কোষের বিভিন্ন বস্তুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ কিম্বা, সজীব কোষের উপর রাসায়নিক বস্তুর প্রভাব সম্বন্ধে সাইটোকেমিস্ট্রি বা কোষ-রসায়ন (কোষতত্ত্ব ও জৈব রসায়ন) থেকে জানা যায়। কোষে শ্বেতসার, স্নেহপদার্থ (লিপিড), প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড ও অন্যান্য জৈব ও অজৈব পদার্থের উপস্থিতি সম্বন্ধে রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই জানা যায়। সেজন্য, এখন এই বিজ্ঞানকে অনেক সময় জৈবরাসায়নিক কোষতত্ত্ব (bio-chemical cytology) বলে।

iv) **আলট্রাস্ট্রাকচার ও মলিকিউলার বায়োলজি** (Ultrastructure ও Molecular Biology) বা অতি সূক্ষ্ম গঠন ও আনবিক জীববিজ্ঞান— কোষের অতি সূক্ষ্ম গঠন সম্বন্ধে আনবিক জীববিজ্ঞান থেকে জানতে পারা যায়। বিজ্ঞানের এই অত্যাধুনিক শাখাটি জৈবরসায়ন, ভৌতরসায়ন, বিশেষত ম্যাক্রোঅণু (macromolecule) এবং কোলয়ডীয় রসায়নের সাথে জড়িত। কোষেব প্রায় সব কার্যকর ও ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তন আনবিক স্তরে ও আনবিক (molecular) গঠনে হয়। সেজন্য কোষের সূক্ষ্ম গঠন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। আনবিক জীববিজ্ঞানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল, Watson ও Crick-এর (1953) DNA-র গঠন, প্রোটিন সংশ্লেষের আনবিক ব্যাখ্যা, জেনেটিক কোষের ধারণা ইত্যাদি। আধুনিক জীববিজ্ঞানে এইসব আবিষ্কারের গুরুত্ব অপরিসীম।

v) **কোষ-শারীরতত্ত্ব** বা Cell Physiology (Cytology ও Physiology)— কোষতত্ত্বের সাথে শারীরতত্ত্বের যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায। এই বিজ্ঞানে জীবনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া যেমন, বৃদ্ধি, বিপাক, জনন, কোষ বিভাজন, কোষের বিকাশ, পুষ্টি, উদ্দীপনা ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা যায়। কোষ রসায়নের মাধ্যমে কোষ স্তরে বিভিন্ন জটিল শারীরতত্ত্বীয় বিক্রিয়া সম্বন্ধে জানা যায়।

vi) **সাইটোপ্যাথোলজি** বা Cytopathology (Cytology ও Pathology)— কোষ ও টিস্যুর অস্বাভাবিক আচরণের ফলেই কোনও কোনও রোগের উৎপত্তি হয়। সেজন্য কোষতত্ত্বের সাথে রোগবিদ্যাও জড়িত। মানুষের অনেক রোগের কারণ

আনবিক স্তরে আনবিক জীববিজ্ঞানের মাধ্যমে জানা গেছে। DNA অণুর জেনেটিক কোডে অস্বাভাবিকতার জন্য নানা রকম রোগ দেখা দেয়। কারণ, এরকম অস্বাভাবিকতার ফলে এনজাইম উৎপাদনে পরিবর্তন হতে পারে, যা কোষের বিপাকীয় প্রক্রিয়াকে বাধা দেয়। কোষবিদ্যার সাথে রোগবিদ্যার নিবিড় সম্পর্ক, ক্যানসার কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি কিম্বা ভাইরাসের আক্রমণের ফলে কোষের কাজের বা গঠনের পরিবর্তন থেকে ভালভাবে বোঝা যায়।

vii) সাইটোইকোলজি বা Cytoecology (Cytology ও Ecology)— কখনও কখনও ক্রোমোসোমের আকৃতি ও সংখ্যার পার্থক্য একই উদ্ভিদের বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানের বা বাস্তুসংস্থানগত পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং, এখানে কোষতত্ত্বের সাথে বাস্তুসংস্থানের যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়।

viii) কোষতত্ত্ব ও বিবর্তন (Cytology and Evolution)— বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এবং নানারকম বিকিরণের (যেমন X-রশ্মি) প্রভাবে জিনে বা ক্রোমোসোমে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। এসব পরিবর্তনের ফলে জীবের গঠনে বা কাজের পরিবর্তন হতে পারে। যেসব পরিবর্তন জনন কোষে হয়, সেগুলি বংশগত। এসব পরিবর্তন পরের প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় ও এরকম পরিবর্তন পরপর প্রজন্মে সঞ্চিত হতে থাকে। এভাবে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং, কোষতত্ত্বের সাথে জৈব বিবর্তনের যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

জীবতত্ত্বের বিভিন্ন শাখা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যতই দিন যাচ্ছে ততই কোষ-জিনতত্ত্ব (cytogenetics) অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে জড়িয়ে পড়ছে এবং কোষতত্ত্বের গবেষণার জন্য এখন ঐসব বিজ্ঞানের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। আধুনিককালে কোষ জীববিজ্ঞান (cell biology) বা সাইটোলজি, জীববিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা বলে গণ্য হচ্ছে।

কোষতত্ত্বের গবেষণায় বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল।

বিজ্ঞানীদের নাম	বৎসর	অবদান
Z. Jannsen ও H. Jannsen	1590	প্রথম যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেন।
Robert Hooke (1635-1703)	1665	কর্ক কোষের বর্ণনা করেন এবং 'সেল' (cell বা কোষ) শব্দটি ব্যবহার করেন।

বিজ্ঞানীদের নাম	বৎসর	অবদান
Anton von Leewenhock (1632-1723)	1674	অণুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সের উন্নতি সাধন করেন। শুক্রাণু, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া ও রক্তের কোষ দেখেন।
J. B. Lamarck (1744-1829)	1809	সজীব জীবে কোষের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।
R. J. H. Dutrochet (1776-1847)	1824	সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ কোষ দিয়ে তৈরি। তিনি উদ্ভিদ *Mimosa* নিয়ে কাজ করেছিলেন।
T. V. Raspail (1794-1878)	1825	স্টার্চের উপস্থিতি জানবার জন্য আয়োডিন ব্যবহার করেন। তিনি frozen section (হিমশীতল অবস্থায় ছেদ) পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। সাইটোকেমিস্ট্রির সূচনা হয়।
Turpin	1826	কোষ বিভাজন লক্ষ্য করেন।
R. Brown (1773-1858)	1828	Brownian চলন লক্ষ্য করেন।
J. B. Amici (1784-1860)	1830	গর্ভাশয়ে পরাগ নালিকার প্রবেশ লক্ষ্য করেন।
Robert Brown	1831	উদ্ভিদ কোষে (*Tradescantia*-এ) নিউক্লিয়াসের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন।
H. von Mohl (1805-1872)	1835	কোষ বিভাজন বর্ণনা করেন এবং প্রোটোপ্লাজমের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।
Felix Dujardin	1835	'সারকোড' নামে প্রোটোপ্লাজমকে অভিহিত করেন।

বিজ্ঞানীদের নাম	বৎসর	অবদান
J. E. Purkinje (1787-1896)	1837	প্রোটোপ্লাজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।
M. J. Schleiden (1804-1881)	1883	নিউক্লিওলাসের বর্ণনা দেন। 1781 খ্রিস্টাব্দে F. Fontana প্রথম নিউক্লিওলাস দেখেছিলেন। 'কোষ মতবাদ' গঠন করেন।
T. Schwann (1810-1882)	1839	প্রাণীতে কোষ মতবাদের প্রয়োগ করেন।
A. Donne (1801-1878)	1845	শুক্রাণু পরীক্ষা করেন এবং প্রথম photomicroscopy-র ব্যবহার করেন।
Hugo von Mohl	1846	কোষে প্রোটোপ্লাজমের গুরুত্বের বিবরণ দেন।
K. Nageli (1817-1891)	1846	উদ্ভিদে নতুন কোষ পুরনো কোষের বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হয়।
W. Hofmeister (1824-1877)	1849	*Tradescantia*-র পুংকেশরে নিউক্লিয়াসের বিভাজন লক্ষ্য করেন। নিষেক বর্ণনা করেন।
R. Virchow (1821-1902)	1855	নতুন কোষ যে কেবল পুরনো কোষের বিভাজনের ফলে উৎপন্ন হয় সে ধারণা সমর্থন করেন।
Schultz	1861	'প্রোটোপ্লাজম মতবাদ' গঠন করেন। তিনি বলেন যে, কোষ সজীব, নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং কোষ পর্দা (membrane) দিয়ে আবৃত।

বিজ্ঞানীদের নাম	বৎসর	অবদান
W. E. Waldeyer	1863	কোষ রঞ্জিত করার জন্য হেমাটো-অক্সিলিনের ব্যবহার করেন।
G. J. Mendel (1822-1884)	1865	বংশধারার মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করেন।
E. Haekel	1866	প্লাস্টিড নাম ব্যবহার করেন।
W. His (1831-1904)	1870	সেকশন (ছেদ) কাটার জন্য মাইক্রোটোম উদ্ভাবন করেন।
F. Miescher (1844-1895)	1871	নিউক্লিওপ্রোটিন আলাদা করেন।
H. Fol (1845-1892)	1873	স্পিণ্ডিল ও অ্যাস্টারীয় রশ্মির (astral ray) বর্ণনা করেন।
O. Hertwig (1849-1922)	1876	সী আর্চিনের জনন লক্ষ্য করেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে নিষেক হয়।
E. Abbe (1840-1908)	1877	অয়েল ইমারশন (oil immersion) লেন্স উদ্ভাবন করেন।
H. Fol	1879	নিষেকের সময় কেবল একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে।
E. G. Balbiani (1825-1899)	1881	*Chironemus*-র স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের অতিকায় (giant) ক্রোমোসোমের বর্ণনা দেন।

বিজ্ঞানীদের নাম	বৎসর	অবদান
W. Flemming (1843-1915)	1879	নিউক্লিয়াসের বিভাজনের সময় যে ক্রোমোসোম লম্বালম্বিভাবে বিভাজিত হয় তা লক্ষ্য করেন।
,,	1882	'মাইটোসিস' নাম চয়ন করেন। কোষ বিভাজনে অপত্য নিউক্লিয়াসের উৎপত্তি লক্ষ্য করেন।
,,	,,	ক্রোমাটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে সম্পর্ক লক্ষ্য করেন।
W. Pfitzer	1882	ক্রোমোসোমে ক্রোমোমিয়ারের উপস্থিতি বর্ণনা করেন।
E. van Beneden (1845-1910)	1883	*Ascaris* নিয়ে পরীক্ষা করে বলেন যে, গ্যামেটে দেহ কোষের অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।
W. Roux	1883	ক্রোমোসোমে বংশধারার নিয়ন্ত্রক পদার্থ রয়েছে।
Schimper	1883	উদ্ভিদের সবুজ কণিকাকে ক্লোরোপ্লাস্ট নাম দেন।
E. Strasburger	1884	গুপ্তবীজী উদ্ভিদে জনন লক্ষ্য করেন। সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিও-প্লাজম শব্দ দুইটি ব্যবহার করেন।
R. Altmann	1886	সাইটোপ্লাজমের দানাদার বস্তুর (মাইটোকন্ড্রিয়াসহ) শ্বাসকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করেন।

বিজ্ঞানীদের নাম	বৎসর	অবদান
E. van Beneden	1887	সেন্ট্রিওল আবিষ্কার করেন।
W. Waldeyer (1836-1921)	1888	'ক্রোমোসোম' শব্দটি ব্যবহার করেন।
T. Boveri (1862-1915)	1888	সেন্টিওলের বর্ণনা দেন।
A. Weismann (1834-1914)	1892	'জার্মপ্লাজম মতবাদ' গঠন করেন। বলেন যে, নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ক্রোমোসোম।
T. Boveri	1892	*Ascaris*-র মায়োসিসের বিবরণ দেন।
C. Golgi (1844-1926)	1898	স্নায়ুকোষে গলগি বস্তুর বর্ণনা করেন।
C. Benda	1898	মাইটোকন্ড্রিয়া নামকরণ করেন। শুক্রাণু ও অন্যান্য কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া পরীক্ষা করেন।
R. Altmann	1899	নিউক্লিক অ্যাসিড শব্দটি ব্যবহার করেন।
C. Garnier	1900	ergastoplasm শব্দটি ব্যবহার করেন।
J. Loeb	1900	যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে ডিম্বাণুর কৃত্রিম অপুংজনি আবিষ্কার করেন।

বিজ্ঞানীদের নাম	বৎসর	অবদান
H. de Vries (1848-1935)	1901	পরিব্যক্তি আবিষ্কার করেন।
F. Strasburger	1901	প্লাসমোডেসমাটা শব্দটি ব্যবহার করেন।
T. H. Montgomery	1901	সমসংস্থ ক্রোমোসোম মায়োসিস বিভাজনের সময় যুগ্ম অবস্থান (synapsis) করে।
C. E. McClung (1870-1946)	1902	*Hemiptera*-এ (grasshopper) সেক্স ক্রোমোসোম আবিষ্কার করেন।
W. S. Sutton (1876-1916)	1902	বংশধারার ক্রোমোসোমীয় মতবাদ গঠন করেন। ডিপ্লয়েড কোষে ক্রোমোসোমগুলি যে জোড়ায় (pairs) অবস্থান করে তা লক্ষ্য করেন।
E. Buchner	1903	এনজাইম (উৎসেচক) আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পান।
F. Meves	1904	উদ্ভিদ কোষে মাইটোকন্ড্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করেন।
J. B. Farmer ও J. E. Moore	1905	মায়োসিস শব্দটি ব্যবহার করেন।
R. G. Harrison	1907	টিস্যু কালচার (tissue culture) পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

বিজ্ঞানীদের নাম	বৎসর	অবদান
F. A. Jassens	1909	ক্রোমাটিডের অংশ বিনিময়ের chiasma-type মতবাদ গঠন করেন।
A. Kossel	1910	নিউক্লিয়াসের রাসায়নিক গঠন গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পান।
T. H. Morgan	1910	ড্রসোফিলার সেক্স লিঙ্কেজ আবিষ্কার করেন।
,,	1911	ক্রোমোসোমে জিনগুলি সরল রেখায় (linear-order) অবস্থান করে।
	1915	মেন্ডেলীয় উত্তরাধিকার ব্যাখ্যা করেন। *Drosophila*-এ সাইটোলজিয় গবেষণার সাথে জেনেটিক পরীক্ষালব্ধ ফলের সম্পর্ক বুঝতে পেরেছিলেন।
R. M. Wilstatter ও Stoll	1913	ক্লোরোফিল পৃথক করেন ও এর গঠনের বিবরণ দেন। এজন্য 1915 খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।
A. F. Blakeslee	1920	*Datura*-এ ট্রাইসোমিক আবিষ্কার করেন।
C. B. Bridges	1921	*Drosophila*-এ ট্রিপ্লয়েড ইন্টারসেক্স লক্ষ্য করেন।

বিজ্ঞানীদের নাম	বৎসর	অবদান
C. B. Bridges	1923	ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন যেমন, ডেফিসিয়েন্সি, ডুপ্লিকেশন, ট্র্যান্সলোকেশন লক্ষ্য করেন।
O. Warburg	1923	জৈব পদার্থের বিশ্লেষণ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পান।
R. Feulgen ও H. Rossenbeck	1924	DNA-এর উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য Feulgen পরীক্ষা উদ্ভাবন করেন।
J. Svedberg	1926	আলট্রাসেন্ট্রিফিউজ আবিষ্কার করেন।
A. H. Sturtevant	1926	ইনভারশন আবিষ্কার করেন।
H. J. Muller	1927	এক্স রশ্মি প্রয়োগ করে প্রাণীতে কৃত্রিম মিউটেশন (পরিব্যক্তি) সৃষ্টি করেন।
F. Griffith	1928	ব্যাকটিরিয়ায় ট্র্যান্সডাকশন আবিষ্কার করেন।
L. J. Stadler	1928	উদ্ভিদে এক্স রশ্মি প্রয়োগ করে পরিব্যক্তি সৃষ্টি করেন।
K. Lehmann	1929	শক্তির উৎস ATP আবিষ্কার করেন।
W. H. Lewis	1931	পিনোসাইটোসিস আবিষ্কার করেন।
C. Stern	1931	ড্রসোফিলায় ক্রসিং ওভারের সাইটোলজিয় প্রমাণ দেন।

বিজ্ঞানীদের নাম	বৎসর	অবদান
H. B. Creighton ও B. McClintock	1931	উদ্ভিদে (ভুট্টায়) ক্রসিং ওভারের সাইটোলজিয় প্রমাণ দেন।
M. Knoll ও R. Ruska	1932	ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রথম আবিষ্কার করেন।
T. H. Morgan	1933	বংশগত চরিত্র পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারণে ক্রোমোসোমের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন ও এজন্য নোবেল পুরস্কার পান।
R. R. Bensley ও N. L. Hoerr	1934	কোষ থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া পৃথক করেন।
W. M. Stanley	1935	তামাকের মোজাইক ভাইরাস কেলাস অবস্থায় আলাদা করেন।
F. Zernicke	1935	ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কৌশল আবিষ্কার করেন।
A. F. Blakeslee	1937	কলচিসিন প্রয়োগ করে পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি করেন।
T. Caspersson	1938	নিউক্লিক অ্যাসিডের পরীক্ষা করার জন্য আলট্রা-ভায়োলেট ফটো-মাইক্রোগ্রাফির উদ্ভাবন করেন।
G. W. Beadle ও E. L. Tatum	1941	এক্স রশ্মি প্রয়োগ করে *Neurospora*-এ জৈব রাসায়নিক মিউটেশন সৃষ্টি করেন। 'একটি জিন একটি এনজাইম' মতবাদ গঠন করেন।

বিজ্ঞানীদের নাম	বৎসর	অবদান
A. Claude	1941	আলট্রাসেন্টিফিউজ করে কোষ থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া পৃথক করেন।
,,	1943	সেন্ট্রিফিউজ করে কোষ থেকে রাইবোসোম, নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া ইত্যাদি পৃথক করেন।
O. T. Avery, C. M. McLeod ও M. McCarty	1944	ব্যাকটিরিয়ায় ট্রান্সফর্মেশন পরীক্ষার মাধ্যমে বংশধারায় DNA-র গুরুত্ব প্রমাণ করেন।
F. Lipmann	1945	কো-এনজাইম A আবিষ্কার করেন, নোবেল পুরস্কার পান।
K. R. Porter	1945	এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা আবিষ্কার করেন।
H. J. Muller	1946	এক্স রশ্মি প্রয়োগ করে কৃত্রিম মিউটেশন সৃষ্টির জন্য নোবেল পুরস্কার পান।
A. Bovin, R. Vandrely ও C. Vandrely	1948	একই জীবের বিভিন্ন কোষে যে DNA-র পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে তা দেখান।
L. Pauling	1949	সিকেল সেল অ্যানিমিয়া (sickle cell anemia) রোগ নিয়ে গবেষণা করে বলেন যে, প্রোটিনের গঠন জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।

বিজ্ঞানীদের নাম	বৎসর	অবদান
E. Chargaff	1950	বলেন যে, DNA তে সমপরিমাণ পিউরিন (purine) ও পিরিমিডিন (pyrimidine) থাকে।
T. O. Caspersson ও J. Brachet	1950	প্রোটিন উৎপাদনে RNA-র ভূমিকা উপলব্ধি করেন।
C. de Duve	1952	লাইসোসোম দেখতে পান।
M. Chase ও A. D. Harshey	1952	বংশধারায় DNA-র গুরুত্ব বুঝতে পারেন।
G. E. Palade	1952	মাইটোকন্ড্রিয়ায় ক্রিস্টির উপস্থিতি দেখতে পান।
F. Zernicke	1953	ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পান।
R. Briggs ও T. J. King	1953	নিউক্লিয়াসের ট্রান্সপ্ল্যান্ট বা সঞ্চারণ করেন এবং কোষের বিকাশে (differentiation) নিউক্লিয়াসের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।
J. D. Watson ও F. H. C. Crick	1953	DNA অণুর গঠন বর্ণনা করেন। এজন্য 1962 খ্রিস্টাব্দে এরা নোবেল পুরস্কার পান।
F. Sanger	1954	প্রোটিন অণু ইনসুলিনের গঠন বর্ণনা করেন।

বিজ্ঞানীদের নাম	বৎসর	অবদান
H. Fraenkel Conrat ও R. C. Williams	1955	TMV ভাইরাসের রাসায়নিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন।
J. H. Tjio ও A. Levan	1956	মানুষের সঠিক ক্রোমোসোম-সংখ্যা নির্ণয় করেন।
S. Ochoa	1956	পলিরাইবোনিউক্লিওটাইড উৎপাদন করেন এবং এজন্য 1959 খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।
A. Kornberg	1956	পলিডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড উৎপাদন করেন ও এজন্য 1959-এ নোবেল পুরস্কার পান।
S. Benzer	1957	জিনের কার্যকর একক সিস্ট্রোনের বর্ণনা করেন।
M. R. Hoagland, P. C. Zamecnik ও Stephenson	1957	ট্রান্সফার আর. এন. এ (transfer RNA বা t-RNA) পৃথক করেন ও এর কাজ বুঝতে পারেন।
A. R. Todd	1957	নিউক্লিওটাইড ও নিউক্লিওটাইডীয় কো-এনজাইম আবিষ্কার করেন।
M. Meselson ও F. W. Stahl	1958	DNA-র সেমিকনজারভেটিভ পদ্ধতিতে দ্বিগুণ হওয়া সমর্থন করেন।
G. W. Beadle, E. L. Tatum ও J. Lederberg	1958	একটি জিন একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, এই ধারণার সূচনা করেন ও এজন্য নোবেল পুরস্কার পান।

NDRA STATE CENT
11th Financ

বিজ্ঞানীদের নাম	বৎসর	অবদান
F. H. C. Crick	1958	প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রম DNA নিয়ন্ত্রণ করে।
V. Ingram	1958	স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের সাথে সিকেল সেল হিমোগ্লোবিনের পার্থক্য প্রোটিন চেনের কেবল একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিবর্তনের জন্য হয়।
F. Sangar	1958	ইনসুলিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রম নির্ণয়ের জন্য নোবেল পুরস্কার পান।
S. Ochoa	1959	'in vitro' কালচারে পলিরাইবো-নিউক্লিওটাইড উৎপাদন করেন ও এজন্য নোবেল পুরস্কার পান।
C. E. Ford, P. A. Jacob ও J. H. Tjio	1959	কোনও কোনও অস্বাভাবিকতার জেনেটিক কারণ উপলব্ধি করেন।
A. Kornberg	1959	কালচারে (in vitro) পলিডিঅক্সি-রাইবোনিউক্লিওটাইড উৎপাদন করে নোবেল পুরস্কার পান।
J. Hartwig, A. Steven ও S. Weiss	1960	DNA-র ছাঁচ (template) থেকে RNA-র উৎপাদনে এনজাইম RNA পলিমারেজের ভূমিকা লক্ষ্য করেন।
R. B. Park ও N. G. Pon	1960	ক্লোরোপ্লাস্টে কোয়ান্টোজোম আবিষ্কার করেন।

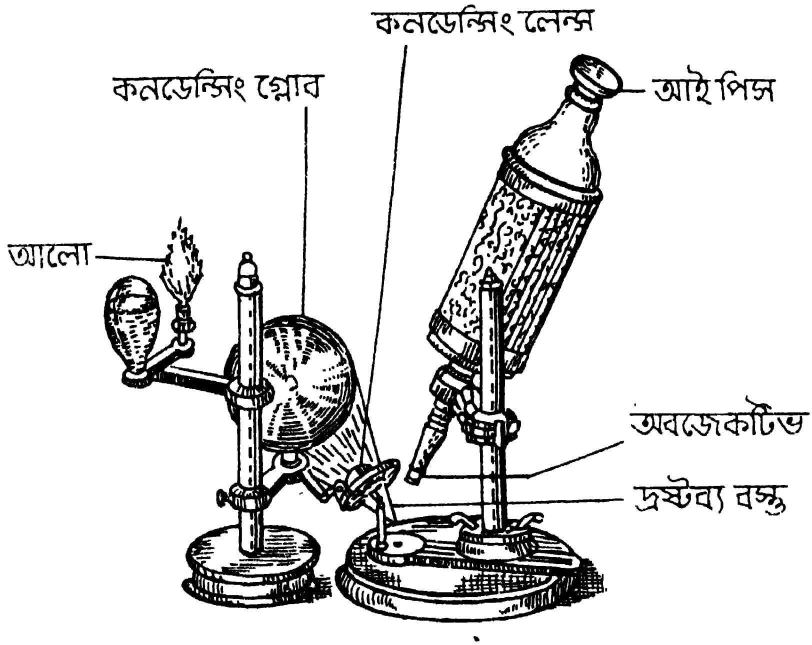
বিজ্ঞানীদের নাম	বৎসর	অবদান
F. Jacob ও J. Monod	1961	ওপেরন (operon) মতবাদ গঠন করেন এবং মেসেঞ্জার বা বার্তাবহ RNA-র কাজ উপলব্ধি করেন।
M. Nirenberg ও J. H. Mathaei	1961	বলেন যে, ফিনাইল-অ্যালানিনের কোড হল পলিইউরিডিলিক অ্যাসিড (UUU)।
F. H. C. Crick ও সহকর্মীরা	1961	জেনেটিক কোড ট্রিপ্লেট, এই ধারণার সপক্ষে প্রমাণ দেন।
H. M. Temin	1963	কোনও কোনও টিউমার ভাইরাসে RNA নিয়ন্ত্রিত RNA উৎপাদন লক্ষ্য করেন।
R. W. Holley	1964	ইস্টের অ্যালানিন t-RNA-র নিউক্লিওটাইডের ক্রম নির্ণয় করেন।
A. Loweff, J. Monod ও F. Jacob	1965	নিয়ন্ত্রক (regulatory) জিনের কাজ বুঝতে পারেন। তাঁরা প্রোফাজের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। ইনডিউসড এনজাইমের উৎপাদন লক্ষ্য করেন। এপিসোম দেখতে পান।
P. Rous ও C. Huggins		ক্যানসার গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পান।
R. H. Holley		একটি t-RNA-র বেসের ক্রম নির্ধারণ করেন ও নোবেল পুরস্কার পান।

বিজ্ঞানীদের নাম	বৎসর	অবদান
M. W. Nirenberg ও H. G. Khorana		জেনেটিক কোড সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পান।
M. Delbrück, A. D. Harshey ও S. E. Luria		ভাইরাসের জনন দেখেন। এজন্য নোবেল পুরস্কার পান।
B. Ephrusii		কোষ সংকরণ করেন।
D. Ephrusii ও H. Harris		DNA-RNA-র এবং RNA-RNA-র সংকরণ করেন।
Knippers R. Kornberg ও Gefter ; M. J. Moses ও Richardson		এনজাইম DNA পলিমারেজ II পৃথক করেন।
H. Khorana		কৃত্রিম জিন উৎপাদন করেন।
E. W. Sutherland		সাইক্লিক AMP-র গুরুত্ব বুঝতে পারেন।
W. H. Stein, S. Moore ও C. B. Anfinsen		এনজাইম রাইবোনিউক্লিয়েজের গঠন বুঝতে পারেন। এজন্য রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান।
A. Claude, G. E. Palade ও C. de Duve		কোষের সূক্ষ্ম গঠন (ultra-structure) বুঝতে পারেন। এজন্য তাঁরা নোবেল পুরস্কার পান।
C. de Duve		লাইসোসোমের গঠন ও কাজ লক্ষ্য করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope)

আমরা খালি চোখে খুব ছোট্ট জিনিস দেখতে পাই না। এইসব ছোট ছোট জিনিস দেখবার জন্য প্রথম বিভিন্ন রকমের আতস কাচ (magnifying glass) উদ্ভাবিত হয়েছিল, আরও পরে সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র, যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (চিত্র 2A, 2B



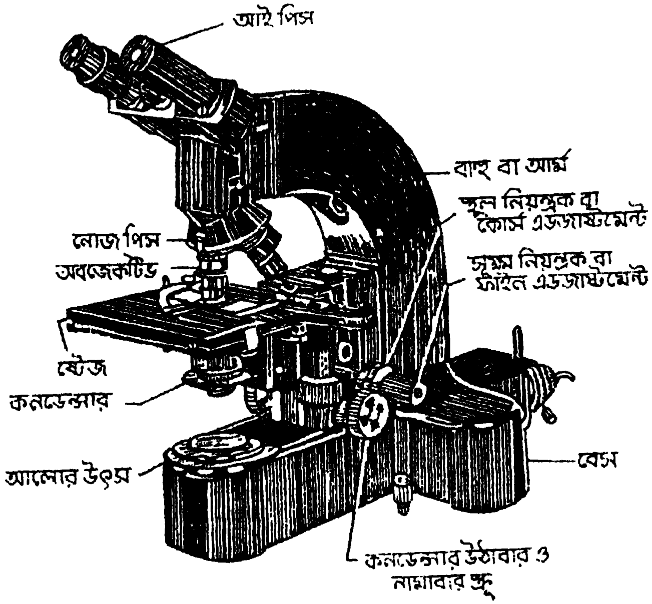
চিত্র—2A

সপ্তদশ শতাব্দীতে Robert Hooke-এর ব্যবহৃত যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র

এবং আধুনিক কালে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। সাইটোলজির সব পরীক্ষার জন্য যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র অপরিহার্য।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা microscope (Gr. mikros— ছোট, skopien— দেখা) হল একটি বা কয়েকটি লেন্স (lens) দিয়ে তৈরি যন্ত্র, যার সাহায্যে আমরা ছোট জিনিসকে বড় করে দেখতে পারি। যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা compound microscope (চিত্র

2B) দিয়ে কোনও বস্তুকে অনেক বড় দেখায়। যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দুই সেট লেন্স থাকে— অবজেকটিভ (objective) ও আই পিস (eye piece)। যে লেন্সটি দ্রষ্টব্য বস্তুর কাছে থাকে, তাকে অবজেকটিভ বলে। এই লেন্স দ্রষ্টব্য বস্তুর কিছুটা বড় প্রতিবিম্ব (image) গঠন করে। অবজেকটিভের ফোকাল দৈর্ঘ্য (focal length) কম



চিত্র—2B

আধুনিক যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র

থাকে ও অ্যাপারচার (aperture) ছোট হয়। একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সাধারণত ×10, ×40, ×100 ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন অবজেকটিভ থাকে। এর মধ্যে অয়েল ইমারশন লেন্স (oil immersion lens) সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। যে লেন্স দিয়ে আমরা দেখি, তাকে আই পিস বলে। আই পিস অবজেকটিভ দিয়ে তৈরি কোনও বস্তুর প্রতিবিম্বকে আরো বড় করে। আই পিসের ফোকাল দৈর্ঘ্য বেশি হয় ও অ্যাপারচার বড় হয়। অবজেকটিভের মত আই পিসও বিভিন্ন শক্তির হয়, যথা ×5, ×6, ×10, ×20 ইত্যাদি। অবজেকটিভ বডি টিউবের (body tube) নিচের দিকে এবং আই পিস ড্র টিউবের (draw tube) উপরের দিকে থাকে। ড্র টিউব বডি টিউবের ভিতরে থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সম্পূর্ণ টিউবটা ওঠানো বা নামানো যায়। মোটামুটি ফোকাস (focus) করবার জন্য স্থূল ব্যবস্থা (coarse adjustment) এবং সূক্ষ্ম ফোকাস

করবার জন্য সূক্ষ্ম ব্যবস্থা (fine adjustment) থাকে। অবজেকটিভের নিচে স্টেজ (stage) বা প্ল্যাটফর্ম (platform) থাকে, যার উপর দ্রষ্টব্য বস্তুকে রাখা হয়। স্টেজের নিচের আয়নার সাহায্যে দ্রষ্টব্য বস্তুকে যথাযথভাবে আলোকিত করা হয়। আয়না ও স্টেজের মাঝে কনডেন্সার (condenser) থাকে। এখানে একটি iris diaphragmও থাকে, যার সাহায্যে আলোর রশ্মিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন আই পিস ও অবজেকটিভ ব্যবহার করে বিভিন্ন মাত্রার ম্যাগনিফিকেশন (magnification) বা বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়।

একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ম্যাগনিফিকেশন হল আই পিস ও অবজেকটিভের ম্যাগনিফিকেশনের গুণফল। কোনও অবজেকটিভের ম্যাগনিফিকেশন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের টিউবের দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ অবজেকটিভ থেকে আই পিসের দূরত্বের উপর নির্ভর করে। ব্রিটেন ও আমেরিকায় তৈরি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই দূরত্ব 160mm এবং জাপান, রাশিয়া ও ইউরোপীয় দেশগুলিতে তৈরি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে 170mm হয়ে থাকে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা (resolving power)

কোনও বস্তুর সূক্ষ্ম গঠন পরিষ্কারভাবে দেখাবার ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ ক্ষমতা বলে। কোনও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা ওই যন্ত্রে যে আলো ব্যবহার করা হচ্ছে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (wave length) ওপর নির্ভর করে। আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়লে বিশ্লেষণ ক্ষমতা কমবে এবং এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম হবে, কোনও বস্তুকে তত বেশি স্পষ্ট দেখাবে। কোনও অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট কোনও বস্তুকে ওই অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায় না।

আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিভিন্ন রকমের হয়। আমরা যে আলো দেখি তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 3850 থেকে 7600 অ্যাংস্ট্রম। (1 অ্যাংস্ট্রম (Å) = $\frac{1}{10000000}$ সেন্টিমিটার = $\frac{1}{250000000}$ ইঞ্চি)। অতিবেগুনী (ultra-violet) আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 1000 থেকে 3850Å। যেসব আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 7600Å-এর বেশি হয়, তাকে অবলোহিত (infra red) আলো বলে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা অবজেকটিভের ওপরও নির্ভর করে। কোনও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা (R) নিচের সংকেত (formula) থেকে পাওয়া যায়।

$$R = \frac{\lambda}{NA}$$

λ = আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (λ— ল্যামডা)
NA = অবজেকটিভের নিউমেরিক্যাল অ্যাপারচার

যদি কনডেন্সার ব্যবহার করা হয় তাহলে বিশ্লেষণ ক্ষমতা হবে—

$$R = \frac{0.61\lambda}{NA + na}$$

na = কনডেন্সারের নিউমেরিক্যাল অ্যাপারচার।

খালি চোখের বিশ্লেষণ ক্ষমতা হল 0.025mm থেকে 0.1mm। অর্থাৎ, এর চেয়ে কম ব্যবধানে অবস্থিত দুইটি লাইনকে আমরা আলাদা করে বুঝতে পারি না। একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা সাধারণত 0.275μ বা 275nm (1 nm বা ন্যানোমিটার 10^{-6} mm = 10Å)। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা হল 1.0 nm।

নিউমেরিক্যাল অ্যাপারচার (numerical aperture) বা N.A.

একটি অবজেকটিভের বিশ্লেষণ ক্ষমতা ওই অবজেকটিভের নিউমেরিক্যাল অ্যাপারচার দিয়ে মাপা হয়। নিউমেরিক্যাল অ্যাপারচার যত বেশি হবে, লেন্সটা ততই শক্তিশালী হয়, অর্থাৎ এর বিশ্লেষণ ক্ষমতা বেশি হয়। নিচের সংকেত থেকে নিউমেরিক্যাল অ্যাপারচার (N.A.) পাওয়া যায় (চিত্র 3)।

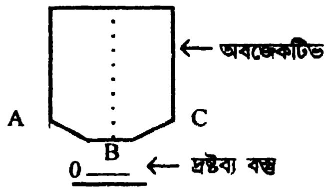
$$N.A. = n\frac{AB}{AO} = n \sin\alpha$$

n = অবজেকটিভ ও দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যবর্তী স্থানের (বাতাস বা তরল) রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স (প্রতিসরাঙ্ক)

AB = অবজেকটিভ লেন্সের ব্যাসার্ধ

A0 = অবজেকটিভের পরিধি থেকে বস্তুর দূরত্ব

sinα = দ্রষ্টব্য বস্তুকে আলোকিত করার জন্য যে আলো ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই আলোর sin কোণ (angle)।



চিত্র — 3

বাতাসের প্রতিসরাঙ্ক λ = 1। দ্রষ্টব্য বস্তু ও অয়েল ইমারশন অবজেকটিভ (অভিলক্ষ্য) লেন্সের মাঝে যে তেল ব্যবহার করা হয় তার প্রতিসরাঙ্ক হল 1.5।

সাইটোলজি পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় কয়েকটি এককের তালিকা (Avers 1976) –

i) দৈর্ঘ্যের পরিমাপ—

মিটার	মিলিমিটার	মাইক্রন বা মাইক্রোমিটার	মিলিমাইক্রন বা ন্যানোমিটার	অ্যাংস্ট্রম
m	mm	μ বা μm	mμ বা nm	Å
1	1000 বা 1×10^3	1,000,000 বা 1×10^6	1,000,000,000 বা 1×10^9	1×10^{10}
0.001	1	1000	1,000,000	1×10^7
0.000001	0.001	1	1,000	1×10^4
1×10^{-9}	1×10^{-6}	0.001	1	10
1×10^{-10}	1×10^{-7}	1×10^{-4}	0.1	1

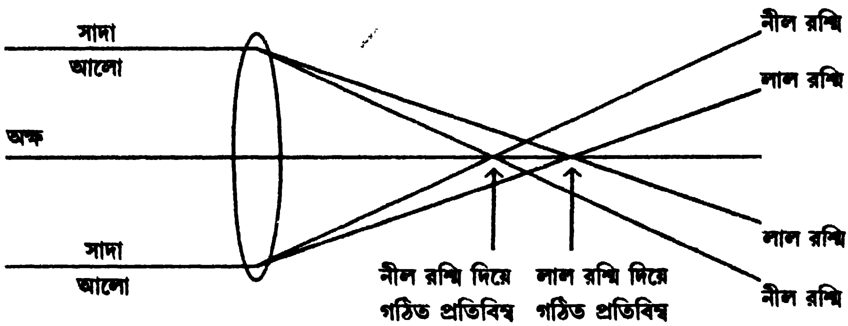
ii) ওজনের পরিমাপ—

গ্রাম	মিলিগ্রাম	মাইক্রোগ্রাম	ন্যানোগ্রাম	পিকোগ্রাম
gm	mg	μg	ng	pg
1	1000 বা 1×10^3	1,000,000 বা 1×10^6	1,000,000,000 বা 1×10^9	1×10^{12}
0.001	1	1000	1×10^6	1×10^9
1×10^{-6}	0.001	1	1×10^3	1×10^6
1×10^{-9}	1×10^{-6}	0.001	1	1×10^3
1×10^{-12}	1×10^{-9}	1×10^{-6}	0.001	1

অ্যাবারেশন (aberration) বা ত্রুটি

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখবার সময় লেন্স ভাল না হলে কখনও কখনও সোজা বস্তুকে বাঁকা দেখায়, কখনও বা রঙিন বলয় দেখা যায়। এইসব ত্রুটিকে অ্যাবারেশন (aberration) বলে। অ্যাবারেশনকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(1) ক্রোমাটিক অ্যাবারেশন (chromatic aberration) — সাধারণ আলো একটি প্রিজিমের (prism) মধ্যে দিয়ে যাবার সময় সাতটি বিভিন্ন বর্ণের অংশে বিভক্ত



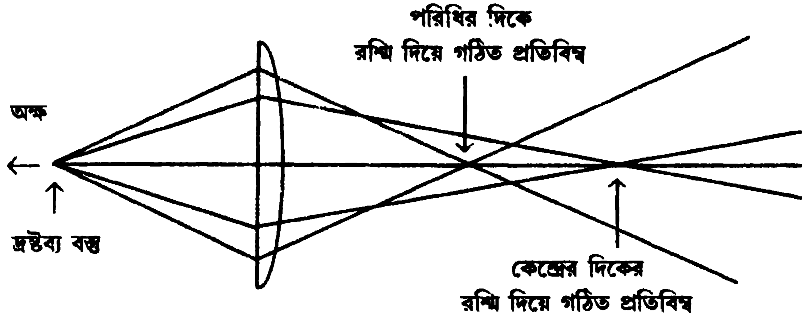
চিত্র—4

ক্রোমোটিক অ্যাবারেশন— একটি কাঁচ দিয়ে তৈরি লেন্সের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় বিভিন্ন বর্ণের আলো ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বেঁকে যায় ও বিভিন্ন স্থানে প্রতিবিম্ব গঠন করে।

হয়। এই অংশগুলির প্রত্যেকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (wave length) আলাদা। কেবল একটি কাঁচ দিয়ে তৈরি লেন্সের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় বিভিন্ন বর্ণের আলো ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বেঁকে যায়। বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের লাল আলো সবচেয়ে কম বেঁকে যায় এবং কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নীল আলো বেশি বেঁকে যায় (চিত্র - 4)। সেজন্য নীলাভ বেগুনী রশ্মি লেন্সের অক্ষ (axis) সবচেয়ে আগে ও লোহিত রশ্মি সবচেয়ে শেষে পার হয়।

এর ফলে কোনও বস্তুকে ভাল করে দেখা যায় না এবং ওই বস্তুর প্রতিবিম্বকে ঘিরে একটি রঙিন বলয়ের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের ত্রুটিকে ক্রোমাটিক অ্যাবারেশন বা বর্ণগত ত্রুটি বলে। একাধিক কাঁচ দিয়ে তৈরি লেন্স ব্যবহার করে এই ত্রুটি দূর করা সম্ভব হয়েছে। 1810 খ্রিস্টাব্দে Amici এই ত্রুটি সংশোধন করতে পেরেছিলেন।

(2) **স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন (spherical aberration)** — একটি কাঁচ দিয়ে তৈরি লেন্সের মধ্যে দিয়ে আলোর রশ্মি যাবার সময় লেন্সের পরিধির দিকের রশ্মি কেন্দ্রের দিকের রশ্মির তুলনায় বেশি বেঁকে যায় (চিত্র 5)। এর ফলে কেন্দ্রের কাছের রশ্মিগুলি পরিধির দিকের রশ্মির তুলনায় কোনও বস্তুর প্রতিবিম্ব দূরে গঠন করে।



চিত্র—5

স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন— একটি কাঁচ দিয়ে তৈরি লেন্সের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আলোর রশ্মি বিভিন্ন পরিমাণে বেঁকে যায় ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিবিম্ব গঠন করে।

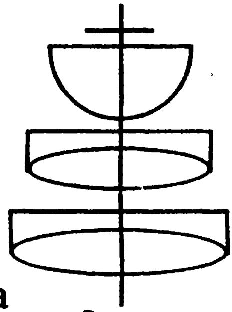
লেন্সের কোন অংশ দিয়ে আলোর রশ্মি যাচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে লেন্সের অক্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবিম্ব (image) গঠিত হয়। কোনও একটি স্থানের প্রতিবিম্বকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ঐ প্রতিবিম্বের চারদিকে একটি আলোকিত বলয় রয়েছে। এই রকম ত্রুটিকে স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন বলে। স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশনের ফলে দ্রষ্টব্য বস্তুর কনট্রাস্ট (contrast) বা বৈষম্য কমে যায় ও বস্তুটিকে অস্পষ্ট দেখায়। বিভিন্ন ধরনের কাঁচ দিয়ে তৈরি লেন্স ব্যবহার করলে এই ত্রুটি দেখা যায় না।

(3) **বিকৃতি** (distortion)— যখন কোনও সোজা বস্তুকে বাঁকা দেখায়, তখন এই ত্রুটিকে ডিসটরশন বা বিকৃতি বলে। এই ত্রুটি লেন্সের কেন্দ্রে ও পরিধিতে আলাদা আলাদা বিবর্ধন ক্ষমতার (magnification) জন্য হয়।

অবজেকটিভ (objective)

অবজেকটিভ দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে যে সব আলোর রশ্মি আসে তা সংগ্রহ করে ও ঐ বস্তুর একটি বড় প্রতিবিম্ব গঠন করে। সাধারণত তিন রকমের অবজেকটিভ লেন্স দেখতে পাওয়া যায়।

(1) অ্যাক্রোমাটিক লেন্স (achromatic lens) (চিত্র *6a*)— *এটি সবচেয়ে সস্তা* ও সাধারণ লেন্স। কম ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যাক্রোমাটিক অবজেকটিভে ক্রোমাটিক ও স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশনের জন্য সংশোধন থাকে। কিন্তু উচ্চ ক্ষমতাযুক্ত (high-power) অ্যাক্রোমাটিক অবজেকটিভে ঐ ত্রুটি দুইটি দেখা যায়।



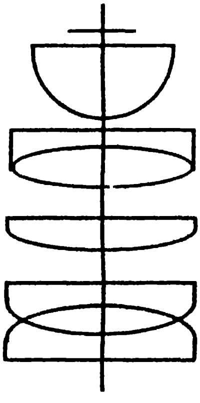
a

চিত্র—6a

অ্যাক্রোমাটিক লেন্স

(2) **সেমি-অ্যাপোক্রোমাটিক (semi-apochromatic)** বা **ফ্লুরাইট লেন্স (fluorite lens)**— এই ধরনের লেন্স অ্যাক্রোমাটিক লেন্সের চেয়ে ভাল। সেমি-অ্যাপোক্রোমাটিক লেন্স ফ্লুরাইট দিয়ে তৈরি করা হলে একে ফ্লুরাইট লেন্স বলা হয়। কিন্তু আর্দ্র আবহাওয়ায় ফ্লুরাইট দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

(3) **অ্যাপোক্রোমাটিক লেন্স (apochromatic lens)** (চিত্র 6b)— এই লেন্স ব্যবহার করলে কোনও রকম অ্যাবারেশন বা ত্রুটি দেখা যায় না। উৎকৃষ্ট চশমার কাঁচ (optical glass) ও ফ্লুরাইট দিয়ে অ্যাপোক্রোমাটিক লেন্স তৈরি করা হয়।



b

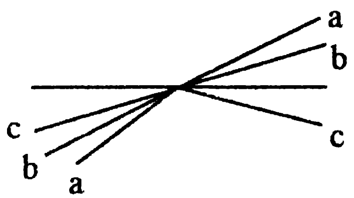
চিত্র—6b

অ্যাপোক্রোমাটিক লেন্স

অয়েল ইমারশন অবজেকটিভ (oil immersion objective)

অয়েল ইমারশন অবজেকটিভ সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। দুইটি বস্তুর মধ্যে ব্যবধান মাত্র 0.25 μ হলেও তাদের অয়েল ইমারশন অবজেকটিভ দিয়ে আলাদাভাবে দেখা যায়।

সাধারণ অবজেকটিভ ব্যবহার করার সময় দ্রষ্টব্য বস্তুর এবং অবজেকটিভের মাঝখানে বাতাস থাকে। একটি ঘন মাধ্যম (dense medium, যেমন— কাঁচ) থেকে হালকা মাধ্যমে (light medium, যেমন—বাতাস) যাওয়ার সময় যেসব আলোর রশ্মি ঐ দুই মাধ্যমের সংযোগস্থলে কোনাকুনিভাবে আসে তারা বেঁকে যায় (aa, bb) (চিত্র 7)। যেসব রশ্মি খুব বাঁকাভাবে আসে (critical angle), তারা অন্য মাধ্যমে প্রবেশ না করে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত (reflected) হয় (cc) (চিত্র 7)। সেজন্য কভার স্লিপ ও বাতাসের সংযোগস্থলে যেসব আলোর রশ্মি critical angle-এর চেয়ে বড় কোণ তৈরি করে, তারা অবজেকটিভে প্রবেশ করতে পারে না। বাতাসের পরিবর্তে কাঁচের সমান রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স (refractive index) বা প্রতিসরাঙ্কযুক্ত সেডার তেল (ceder wood oil) কভার স্লিপ ও অবজেকটিভের মাঝখানে দিলে আলোর রশ্মি বেঁকে না গিয়ে সোজা যায় ও অবজেকটিভে প্রবেশ করে। এইজন্য অয়েল ইমারশন অবজেকটিভ দিয়ে খুব ছোট বস্তুকেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়।



চিত্র—7

এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করার সময় বিভিন্ন আলোর রশ্মি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বেঁকে যায়

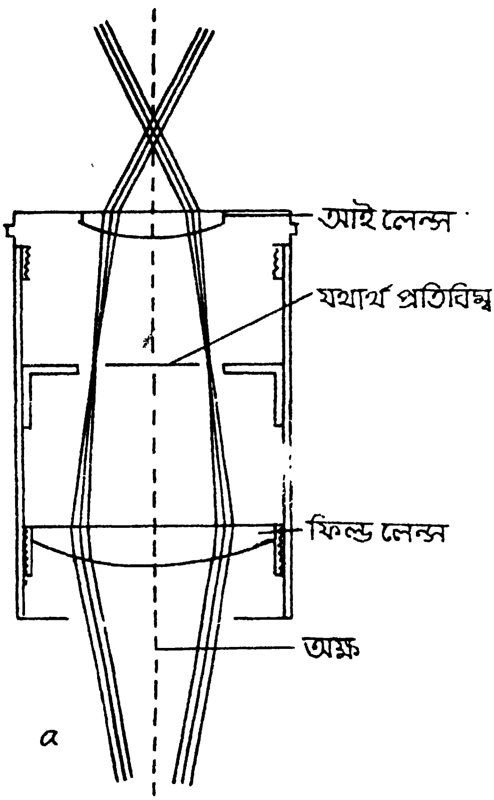
আই পিস (eye piece)

আই পিস বিভিন্ন রকমের হয়। নিচে কয়েক ধরনের আই পিসের বর্ণনা দেওয়া হল।

(1) **Huygenian** আই পিস (চিত্র 8a)— এই আই পিস সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এবং দুইটি প্লেনো-কনভেক্স (plano-convex) লেন্স দিয়ে তৈরি। লেন্স দুইটির উত্তল (convex) দিক নিচের দিকে থাকে। নিচের লেন্সটি দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রাথমিক বা

যথার্থ প্রতিবিম্ব (real image) যেখানে তৈরি হয়, তার নিচে থাকে ও অবজেকটিভ থেকে যে আলোর রশ্মি আসে, যেসব রশ্মিকে অক্ষের (axis) দিকে বেঁকিয়ে দেয়। উপরের লেন্সটি নিচের লেন্স থেকে কিছুটা ব্যবধানে থাকে। এই লেন্সটি আলোর রশ্মিকে সমান্তরাল বা সামান্য বর্হির্মুখী রশ্মিতে পরিবর্তিত করে। এই আই পিস নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন (low power) অ্যাক্রোমাটিক অবজেকটিভের সাথে ভালভাবে ব্যবহার করা যায়।

(2) **নির্দেশক বা পয়েন্টার (pointer) আই পিস**— কোনও কোনও Huygenian আই পিসে একটি নির্দেশক কাঁটা থাকে, যার সাহায্যে স্লাইডের কোনও বিশেষ বস্তুকে দেখান যায়। এই রকম আই পিসকে নির্দেশক বা পয়েন্টার আই পিস বলা হয়।

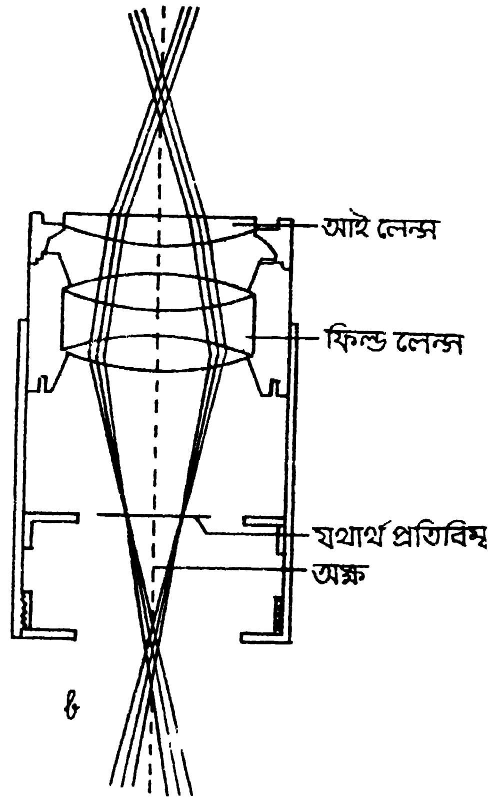


চিত্র—8a

Huygenian আই পিস

(3) **কমপেনসেটিং বা পরিপূরক আই পিস (compensating eye piece)** (চিত্র 8b)— এই আই পিস সব রকমের অবজেকটিভের সাথে ব্যবহার করা যায়।

অবজেকটিভের জন্য বর্ণগত ত্রুটি (বা ক্রোমাটিক অ্যাবারেশন) হলে কমপেনসেটিং আই পিস তা সংশোধন করতে পারে।



চিত্র—8b

কমপেনসেটিং বা পরিপূরক আই পিস

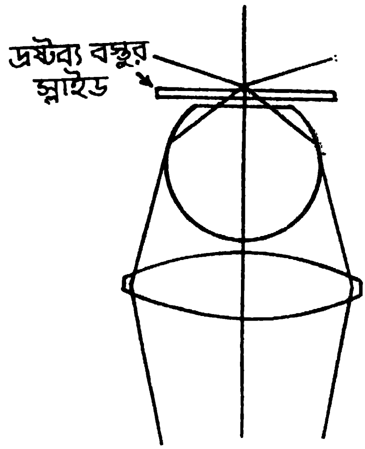
কনডেন্সার (condenser) বা আলোক কেন্দ্রীভূতকারী লেন্স

কনডেন্সার দিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুকে সমভাবে আলোকিত করা হয়। কনডেন্সার আয়না ও দ্রষ্টব্য বস্তুর মাঝে থাকে এবং এখানে একটি আইরিস ডায়াফ্র্যাম (iris diaphragm) থাকে। আইরিস ডায়াফ্র্যামের রন্ধ্র বা অ্যাপারচার (aperture) যত কমান যায়, ততই প্রতিবিম্বের বৈষম্য (contrast) বাড়ে।

কনডেন্সার বিভিন্ন রকমের হয়। এখানে কয়েকটি বেশি ব্যবহৃত কনডেন্সারের বর্ণনা দেওয়া হল।

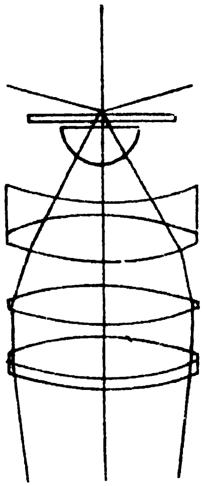
(1) অ্যাবে কনডেন্সার (abbe condenser) (চিত্র 9a)— অ্যাবে কনডেন্সার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এবং চলনসই ধরনের। এই কনডেন্সার ক্রোমাটিক

অ্যাবারেশন (chromatic aberration বা বর্ণগত ত্রুটি) এবং স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন (spherical aberration) সংশোধন করতে পারে না। অ্যাবে কনডেন্সার দুইটি প্লেনো-কনভেক্স (plano-convex) লেন্স দিয়ে তৈরি।



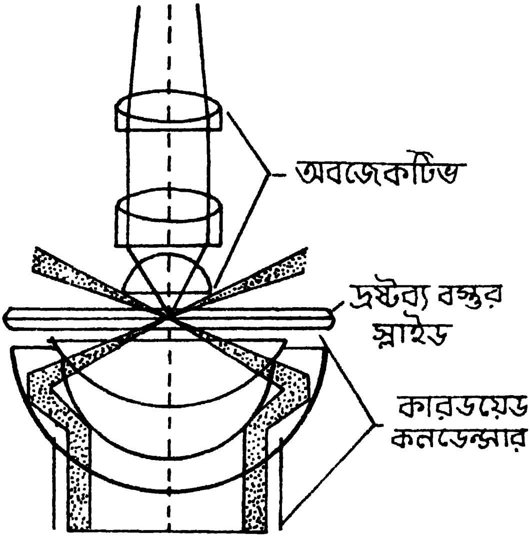
চিত্র—9a
অ্যাবে কনডেন্সার

(2) **অ্যাক্রোমাটিক কনডেন্সার (achromatic condenser)** (চিত্র 9b)—কয়েকটি লেন্স দিয়ে এই কনডেন্সার তৈরি করা হয়। অ্যাক্রোমাটিক কনডেন্সার ক্রোমাটিক ও স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন সংশোধন করতে পারে। গবেষণার কাজের জন্য ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই কনডেন্সার থাকে।



চিত্র—9b
অ্যাক্রোমাটিক কনডেন্সার

(3) কারডয়েড কনডেন্সার (cardoid condenser) (চিত্র 10)— অন্ধকার ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই কনডেন্সার ব্যবহৃত হয়। কারডয়েড কনডেন্সার ব্যবহার করলে কোলয়ডীয় দ্রবণ ভাল করে দেখা যায়।



চিত্র—10

কারডয়েড কনডেন্সারের মধ্যে দিয়ে আলোর গতিপথের নক্সা

আইরিস ডায়াফ্র্যাম (iris diaphragm)

কনডেন্সারে আইরিস ডায়াফ্র্যাম থাকে। আইরিস ডায়াফ্র্যামের রন্ধ্র কমিয়ে বাড়িয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুকে প্রয়োজন অনুসারে আলোকিত করা হয়। আইরিস ডায়াফ্র্যামের রন্ধ্র বা অ্যাপারচার (aperture) কমালে পরিধির দিকে আলোর রশ্মি যেতে পারে না এবং কেবল কেন্দ্র ও তার কাছের রশ্মির সাহায্যে দ্রষ্টব্য বস্তুকে দেখা হয়। এর ফলে দ্রষ্টব্য বস্তুর বৈষম্য (contrast) বাড়ে কিন্তু কনডেন্সারের N.A. কমে যায়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

অণুবীক্ষণ যন্ত্র অনেক রকমের হয়। নিচে কয়েক রকমের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

(1) দৃশ্যমান আলো ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র (bright field microscope)— এই অণুবীক্ষণ যন্ত্র সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এখানে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষেত্রকে (field) উজ্জ্বলভাবে আলোকিত করা হয়। আয়না

ও কনডেন্সারের সাহায্যে দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর আলো ফেলা হয়। ঐ আলোর রশ্মি দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে গিয়ে অবজেকটিভে প্রবেশ করে। অবজেকটিভ বস্তুটির একটি বড় প্রতিবিম্ব (image) তৈরি করে এবং আই পিস এই প্রতিবিম্বকে আরো বড় করে (চিত্র 11)। এইরকম অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কোনও বস্তুকে হাজার গুণ বড় দেখায়, তবে উচ্চ ক্ষমতাযুক্ত লেন্স ব্যবহার করলে কোনও বস্তুকে দুই, তিন হাজার গুণও বড় দেখায়। দৃশ্যমান আলোক ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা মোটামুটি 2000 Å।

(2) **অন্ধকার ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র (dark field microscope)**— এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বিশেষ ধরনের কনডেন্সার (যেমন কারডয়েড কনডেন্সার, চিত্র 10) ব্যবহার করা হয়। কারডয়েড কনডেন্সার প্রত্যক্ষ আলোর রশ্মিকে রোধ করে এবং দ্রষ্টব্য বস্তুকে প্রতিফলিত বা বিচ্ছুরিত আলোর সাহায্যে দেখা হয়। এখানে কালো পশ্চাৎপটের (background) উপর দ্রষ্টব্য বস্তুকে উজ্জ্বলভাবে আলোকিত দেখায়। অন্ধকার ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র বর্ণহীন জীবাণু, সেন্ট্রোজোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, নিউক্লিয়াস, ভ্যাকুওল, স্পিন্ডিল ইত্যাদি দেখবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

(3) **অতিবেগুনী আলোক ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র (ultra-violet microscope)**— এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অতিবেগুনী রশ্মি ও কোয়ার্টজ (quartz) লেন্স ব্যবহার করা হয়। কোয়ার্টজ লেন্সের মধ্যে দিয়ে স্বল্প দৈর্ঘ্যের অতিবেগুনী রশ্মি যেতে পারে। সাধারণ আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে অতিবেগুনী রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় এই অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কোনও বস্তুকে সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তুলনায় দুই তিন গুণ বড় দেখায়। যেহেতু অতিবেগুনী রশ্মি দেখা যায় না, সেজন্য দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রতিবিম্বকে একটা পর্দার উপর ফেলে আলোক চিত্র তোলা হয়।

ক্রোমোসোমীয় গবেষণার জন্য অতিবেগুনী রশ্মি ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র উপযোগী, কারণ সাইটোপ্লাজমের তুলনায় ক্রোমোসোম অতিবেগুনী রশ্মি বেশি শোষণ করে ও আলোকচিত্রে ক্রোমোসোমগুলি পরিষ্কার দেখা যায়।

সুবিধা ঃ উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তুলনায় অতিবেগুনী রশ্মি ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সুবিধাগুলি হল—

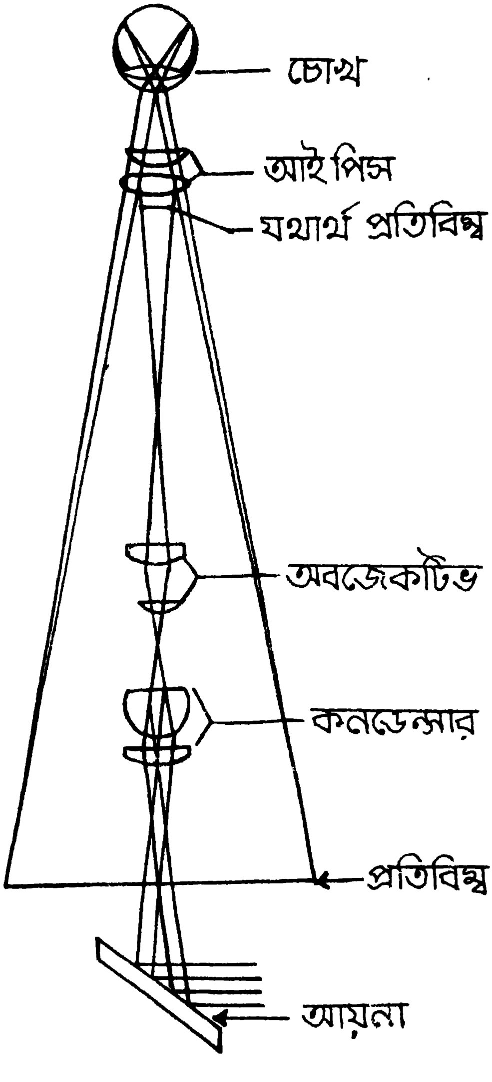
a) যেহেতু নিউক্লিওপ্রোটিন যথেষ্ট অতিবেগুনী আলো শোষণ করে, সেজন্য অরঞ্জিত বা বর্ণহীন কোষ অতিবেগুনী রশ্মি ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়।

b) এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নিউক্লিক অ্যাসিডের অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

c) কোষে নিউক্লিওপ্রোটিনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

(4) **প্রতিপ্রভ বা ফ্লুরেসেন্স অণুবীক্ষণ যন্ত্র (fluorescence microscope)** (চিত্র 12)— এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অতিবেগুনী রশ্মি ব্যবহার করা হয়। কিছু রাসায়নিক পদার্থ অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দৃশ্যমান আলো বের করতে পারে। এইসব বস্তুকে প্রতিপ্রভ বা ফ্লুরেসেন্ট (fluorescent) পদার্থ এবং এই প্রক্রিয়াকে প্রতিপ্রভা বা ফ্লুরেসেন্স বলে। ক্লোরোফিল, রাইবোফ্লেভিন প্রভৃতি পদার্থ

ফ্লুরেসেন্ট বা প্রতিপ্রভ। এইসব পদার্থ প্রতিপ্রভ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ভাল করে দেখা যায়। কোনও কোনও বিশেষ রঙের সাহায্যে ফ্লুরেসেন্ট নয় এমন পদার্থে ফ্লুরেসেন্স বা

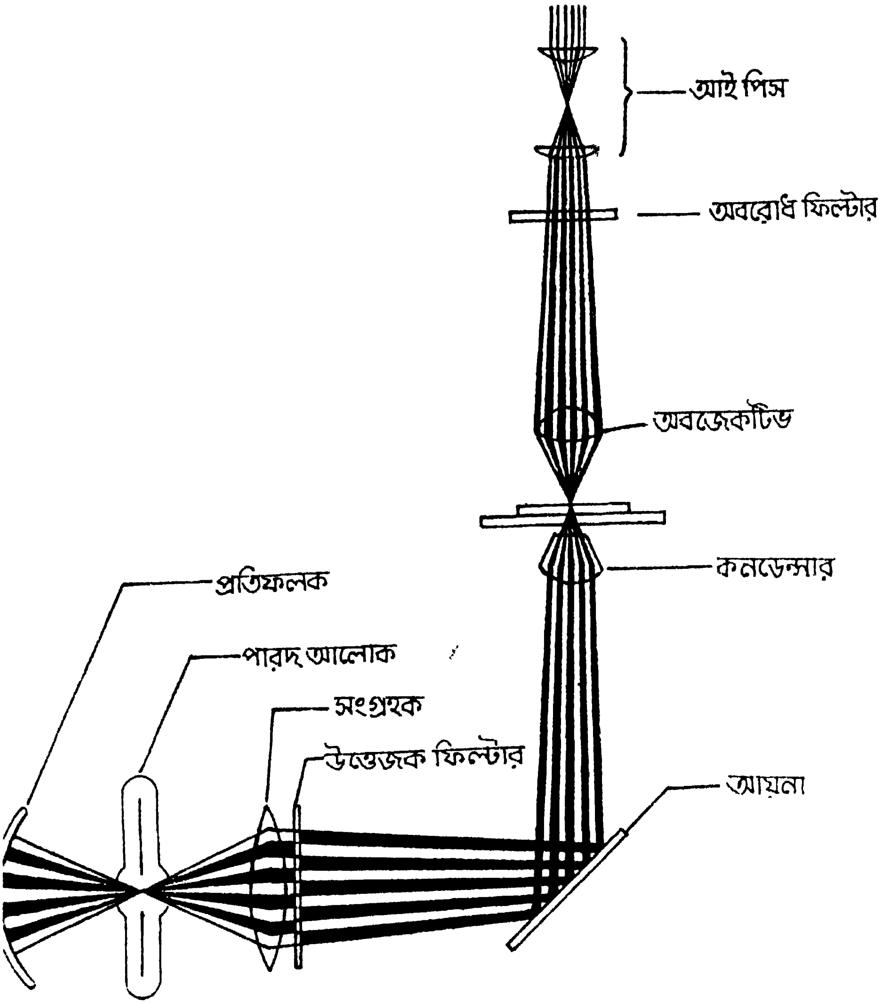


চিত্র—11

উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আলোর গতিপথের এবং কোনও বস্তুর বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠনের নক্সা

প্রতিপ্রভা দেখা যায়। এইসব রঙকে (stain) ফ্লুরোক্রোম (fluorochrome) বা প্রতিপ্রভাকারী বর্ণ বলে। অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ (acridine orange), অ্যানালিন ব্লু

(analine blue), অ্যারামিন (auramine), থিয়োফ্লেভিন (thioflavin) ইত্যাদি হল ফ্লুরোক্রোম। কোনও বস্তুর ফ্লুরেসেন্স ঐ বস্তুর রাসায়নিক গঠনের উপর নির্ভর করে।



চিত্র—12

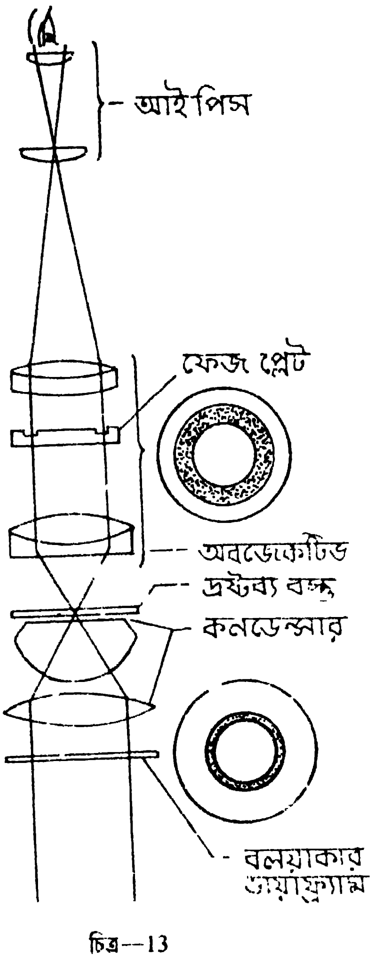
প্রতিপ্রভ বা ফ্লুরেসেন্স অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আলোর গতিপথের নক্সা

এইজন্য বিশেষ ধরনের ফ্লুরেসেন্সের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি থেকে কোনও বস্তুর রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। ফ্লুরোক্রোম বর্ণ কোষের কোনও ক্ষতি করে না, ফলে এই রঙ ব্যবহার করার পরেও কোষটি সজীব ও কর্মক্ষম থাকে। অতিবেগুনী আলোর কেবল একটি অংশ প্রতিপ্রভ বা ফ্লুরেসেন্ট হয় বলে এই রকমের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে জোরালো অতিবেগুনী আলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ a) প্রতিপ্রভ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোষের বিভিন্ন গঠন ভালভাবে দেখা যায়।

b) ফ্লুরোক্রোমের সাহায্যে প্রতিপ্রভ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোনও বস্তু অত্যন্ত অল্প পরিমাণে থাকলেও তা নির্ণয় করা যায়।

(5) **ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র (phase contrast microscope)** (চিত্র 13) — এই যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণহীন সজীব কোষ দেখা যায়। দৃশ্যমান আলো ব্যবহৃত



চিত্র—13

ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন লেন্স, বলয়াকার ডায়াফ্রাম ও ফেজ প্লেটের মধ্যে দিয়ে আলোর গতিপথের নক্সা।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সজীব কোষ স্বচ্ছ দেখায় এবং কোষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে স্থূলতার এবং প্রতিসরাঙ্কের (refractive index) সামান্য তারতম্য বোঝা যায় না। কিন্তু ফেজ

কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোষের বিভিন্ন অংশের প্রতিসরাঙ্কের পার্থক্য বোঝা যায় কারণ, এখানে বিভিন্ন প্রতিসরাঙ্কের বস্তু ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোর গতি ও পথকে পরিবর্তিত করে। বেশি প্রতিসরাঙ্কের বস্তুর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আলোর গতি বেশি হ্রাস পায়, ফলে বিভিন্ন প্রতিসরাঙ্কের বস্তু ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোকিত হয়, অর্থাৎ, তাদের মধ্যে উজ্জ্বলতার তারতম্য হয়। ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বিশেষ ধরনের অবজেকটিভ ও কনডেন্সারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত আলো ব্যবহার করা হয়। কনডেন্সারের নিচে একটি বলয়াকার পর্দা (annular diaphragm) থাকে যার সাহায্যে দ্রষ্টব্য বস্তুকে যথাযথভাবে আলোকিত করা যায়। অবজেকটিভের ভিতরে বা উপরে ডিফ্র্যাকশন প্লেট (defraction plate) বা ফেজ প্লেট থাকে। কোষের বিভিন্ন প্রতিসরাঙ্কের অংশ আলোর রশ্মিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিসরিত (refract) করে। ফেজ প্লেটটা দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে আসা প্রতিসরিত ও অপ্রতিসরিত আলোকে আলাদা করে। এই প্লেটের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিসরিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে যায়। ফেজ কনট্রাস্ট দুই রকমের হয়। পজেটিভ (positive) ফেজ কনট্রাস্টে দ্রষ্টব্য বস্তুকে পাশের স্থানের চেয়ে গাঢ় দেখায়। নেগেটিভ (negative) ফেজ কনট্রাস্টে কোনও বস্তুকে পার্শ্ববর্তী স্থানের চেয়ে উজ্জ্বল দেখায়।

ব্যবহার ঃ a) সজীব কোষ দেখার জন্য ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

b) 'in vitro' কালচারের কোষগুলি এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়।

c) এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক বস্তুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

d) সময়-বিরাম (time lapse) আলোকচিত্রের সাহায্যে ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রে নিম্নলিখিত ঘটনা লক্ষ্য করা যায়।

i) কোষ বিভাজন ও কোষের চলনের সময় নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়।

ii) সূক্ষ্ম পর্দার উৎপাদন দেখা যায়।

iii) পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়া দেখা যায়।

(6) **পোলারাইজেশন বা সমবর্তিত অণুবীক্ষণ যন্ত্র (polarization microscope)**— এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কনডেন্সারের নিচে ক্যালসাইটের nicol প্রিজম ব্যবহার করা হয়। কোনও কোনও সময় এর বদলে পোলারাইজড ফিল্ম কিম্বা আয়োডিন দিয়ে রঞ্জিত পলিভিনাইল অ্যালকোহলের সীট্ (sheet) ব্যবহৃত হয়। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দু'টি ঘূর্ণায়মান অংশ— পোলারাইজার ও অ্যানালাইজার (বা বিশ্লেষক) থাকে। পোলারাইজার কনডেন্সারের নিচে থাকে এবং দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে সাধারণ পোলারাইজড আলো যেতে দেয়। অ্যানালাইজার অবজেকটিভের উপরে থাকে। এটা যখন 360^0 ঘুরানো হয় তখন প্রত্যেক 180^0 ঘুরানোর ফলে

দৃশ্যমান ক্ষেত্র (visual field) পর্যায়ক্রমে আলোকিত বা অন্ধকার দেখায়। যখন পোলারাইজার ও অ্যানালাইজারের অক্ষ পরস্পরের সমান্তরাল থাকে, তখন সবচেয়ে বেশি আলো প্রেরিত হয়। অ্যানালাইজার 90° ঘুরালে পোলারাইজড আলোর গতিপথ রুদ্ধ হয় এবং অন্ধকার ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। দ্রষ্টব্য বস্তুকে ঘুরিয়ে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উজ্জ্বলতা বোঝা যায়। যখন দ্রষ্টব্য বস্তু পোলারাইজার ও অ্যানালাইজারের সাথে ± 45° কোণে থাকে, তখন সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়।

পোলারাইজড আলো দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে সবদিকে সমান গতিতে যেতে পারে (আইসোট্রপিক) কিম্বা বিভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে যায় (অ্যানআইসোট্রপিক)। এটা নির্ভর করে দ্রষ্টব্য বস্তুর ধর্মের উপর। যেসব বস্তুর মধ্যে দিয়ে পোলারাইজড আলো বিভিন্ন গতিতে যায় তাদের birefringent বস্তু বলে।

দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রতিসরাঙ্কের পার্থক্যের ফলে আলো বিভিন্ন গতিতে প্রেরিত হয় এবং এজন্য birefringence দেখা যায়। দু'টি প্রতিসরাঙ্কের পার্থক্যই (n_1-n_2) হল birefringence।

ব্যবহার ঃ পোলারাইজেশন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে

a) কোষের বিভিন্ন বস্তুর আকার জানা যায়।

b) বিভাজনশীল কোষের মাইটোটিক স্পিন্ডিলের গঠন লক্ষ্য করা যায়।

c) বিভিন্ন তন্তুর গঠন দেখা যায়।

d) বিভিন্ন কোষস্থ বস্তুর আণবিক গঠন পরিমাপ করা যায়।

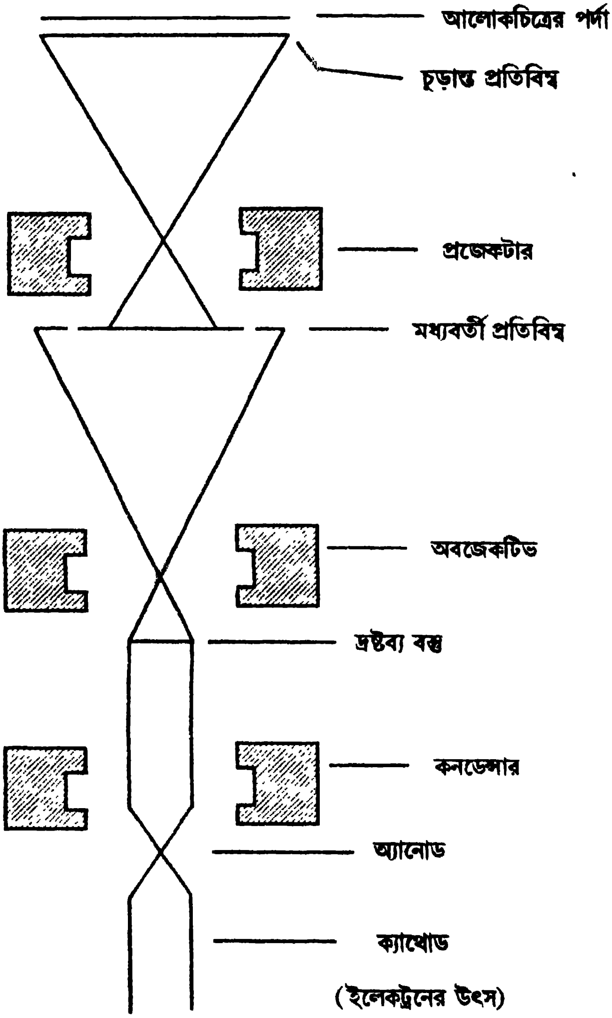
(7) **এক্স রশ্মি ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র (X-ray microscope)**— এই রকম অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দ্রষ্টব্য বস্তুর আণবিক গঠন জানার জন্য অত্যন্ত কম দৈর্ঘ্যের এক্স রশ্মি 'আলোর' উৎস হিসাবে ব্যবহার কর হয়। 1μ বা তার চেয়ে কম স্থূল সেকশন (বা ছেদ) সূক্ষ্ম আলোকচিত্রের ইমালশনে রেখে এর মধ্যে দিয়ে 1 - 10Å-এর এক্স রশ্মিকে (soft x-ray) যেতে দেওয়া হয়। আরেকটি পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য বস্তুকে আলোকচিত্রের পর্দা ও এক্স রশ্মির উৎসের মাঝে রাখা হয় (প্রজেকশন পদ্ধতি)।

এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তড়িৎ চুম্বক (ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক) লেন্স কিংবা বাঁকা প্রতিফলনকারী আয়না এক্স রশ্মি ফোকাস করার জন্য ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদ বা প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন কোষের এই soft এক্স রশ্মির শোষণের পরিমাণ নির্ভর করে তাদের রাসায়নিক গঠন ও ভৌত বিন্যাসের উপর। এক্স রশ্মি ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কেবল সংরক্ষিত বস্তু পরীক্ষা করা যায়।

আর একটি উন্নততর পদ্ধতিতে এক্স রশ্মির বিচ্ছুরণের (diffraction) ব্যবহার করা হয়। এক্স রশ্মির বিচ্ছুরণে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এক্স রশ্মির একটি সূক্ষ্ম রশ্মি (beam) দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে যেতে দেওয়া হয়। দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে কিছুটা দূরের আলোকচিত্রের পর্দা বিচ্ছুরণের প্যাটার্ন লিপিবদ্ধ করে। বিচ্ছুরণের প্যাটার্ন সমকেন্দ্রিয় (concentric) বলয় বা বিন্দু (spot) হিসাবে দেখা দেয়। M.H.F Wilkins DNA-র গঠন এক্স রশ্মির

বিচ্ছুরণের (x-ray diffraction) মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন।

(4) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (electron microscope) (চিত্র 14) — বিজ্ঞানী Ruska 1934 খ্রিস্টাব্দে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র দিয়ে ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া, প্রোটিন অণু ও কোষের সূক্ষ্ম অভ্যন্তরীণ গঠন স্পষ্ট দেখা যায়।



চিত্র—14

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইলেকট্রনের গতিপথের এবং কোনও বস্তুর বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠনের নক্সা

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা অন্যান্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতার চেয়ে অনেকগুণ বেশি কারণ, এখানে আলোর পরিবর্তে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের

(0.05Å) উচ্চ বেগসম্পন্ন (high velocity) ইলেকট্রন ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা 1Å।

এই যন্ত্রে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে ইলেকট্রনগুলি ফোকাস করা হয়। ইলেকট্রন রশ্মি কেবল বায়ুশূন্য স্থানের মধ্যে দিয়ে যথেষ্ট দূরত্বে যেতে পারে। সেইজন্য ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে বায়ুশূন্য স্থানে আবদ্ধ রাখা হয়। একটা ক্যাথোড ফিলামেন্ট (cathode filament) থেকে ইলেকট্রন রশ্মি বেরিয়ে আসার পর ওই রশ্মিকে তড়িৎ-চৌম্বক (electromagnetic) কনডেন্সার দিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর কেন্দ্রীভূত করা হয়। দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর ইলেকট্রন তড়িৎ-চৌম্বক অবজেকটিভ দিয়ে সংগৃহীত হয় এবং অবজেকটিভ দ্রষ্টব্য বস্তুর কিছুটা বড় প্রতিবিম্ব গঠন করে। তড়িৎ-চৌম্বক প্রজেকটার লেন্স বা আই পিস ওই প্রতিবিম্বকে আরও বিবর্ধিত করে। যেহেতু ইলেকট্রন দেখা যায় না, সেইজন্য এই রশ্মিকে একটা প্রতিপ্রভ বা ফ্লুরেসেন্ট পর্দার ওপর ফেলা হয়। ওই পর্দার ওপর দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। এখানে আলোকচিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে। প্রজেকটার লেন্সের তড়িৎ-প্রবাহ কমিয়ে বাড়িয়ে বিবর্ধনের (magnification) মাত্রার তারতম্য করা হয়। অবজেকটিভের চৌম্বক ক্ষেত্রের (magnetic field) পরিবর্তন করে 1000 × থেকে 6000 × পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রার ম্যাগনিফিকেশন পাওয়া যায়।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করার জন্য দ্রষ্টব্য বস্তুকে ফিক্স করতে হয়। এজন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ফিক্সেটিভ হল অসমিয়াম টেট্রাঅক্সাইড (OsO_4) ও ফরমালডিহাইড। শুষ্ক করার সময় লিপিড জাতীয় পদার্থের ভেঙে যাওয়া অসমিয়াম টেট্রাঅক্সাইড রোধ করতে পারে। শুষ্ক করার বা শীতল করার (freezing) ফলে দ্রষ্টব্য বস্তুর কোনও রকম বিকৃতি অসমিয়াম টেট্রাঅক্সাইড বন্ধ করে। ফরমালডিহাইড বিশেষত যখন ক্যালসিয়াম আয়নের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়, তখন কোনও কোনও লিপিডকে (স্নেহজাতীয় পদার্থ) অদ্রবণীয় করে। কোষের বিভিন্ন পর্দার সংরক্ষণে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট ব্যবহার করলে কনট্রাস্ট (বৈষম্য) বাড়ে। pH-7.4-এ ফিক্সেটিভ সবচেয়ে বেশি সফল হয়।

ফিক্স করার পর দ্রষ্টব্য বস্তুকে প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ যেমন, মিথাইল অ্যাক্রিলেট বা কোনও রেসিন যেমন অ্যারালডাইটে নিহিত করা হয়। এরপর বিশেষ ধরনের আলট্রা মাইক্রোটোমে কাঁচ বা হীরার (diamond) ছুরি ব্যবহার করে দ্রষ্টব্য বস্তুর অত্যন্ত পাতলা সেকশন (ছেদ) কাটা হয়। এই সেকশন 10 ন্যানোমিটারের চেয়ে কম স্থূল হওয়া দরকার। এরপর সেকশনটিকে একটি খুব পাতলা (150Å কম স্থূল) পর্দার উপর রাখা হয়। এই পর্দা এমন হওয়ার দরকার যা সহজে ছিঁড়ে যায় না এবং যত কম সম্ভব ইলেকট্রন ছড়িয়ে দেয়। এরকম পর্দা কোলোয়ডিয়ন (নাইট্রোসেলুলোজ) বা ফরমভার (পলিভিনাইল ফরমাল) বা কার্বন বা অ্যালুমিনিয়াম বা বেরিলিয়াম দিয়ে

তৈরি হয়। প্রথম দুই ধরনের পর্দা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। বেরিলিয়াম দিয়ে তৈরি পর্দা সবচেয়ে পাতলা ও স্বচ্ছ। পর্দাটি একটি ধাতব (স্টিল বা তামার সূক্ষ্ম জাল) অবলম্বনের ওপর রেখে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয়।

বৈষম্য (contrast) বাড়াবার জন্য ভারী ধাতুর লবণ ব্যবহার করা হয়।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবহৃত অন্য কয়েকটি পদ্ধতি হল—

a) Shadowing বা ছায়া গঠন— ভাইরাস এবং আরও কিছু জৈব বস্তু ইলেকট্রনকে যথাযথভাবে বিচ্ছুরিত করতে পারে না। সেজন্য ভাল বৈষম্য বা 'কনট্রাস্ট' পাওয়া যায় না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য 'shadowing' করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বায়ুশূন্য পরিবেশে ভারী ধাতুর বাষ্প উৎপাদন করা হয়। এই বাষ্প দ্রষ্টব্য বস্তুর যে দিকে বাষ্পীভবন ফিলামেন্ট রয়েছে সেই দিকে ঘনীভূত হয়। দ্রষ্টব্য বস্তুর অন্য দিকে ছায়া (shadow) থাকে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ঘনীভূত ধাতুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই ছায়ার আয়তন থেকে দ্রষ্টব্য বস্তুর আয়তন নির্ণয় করা যায়।

b) Spreading বা ছড়ান— DNA, ক্রোমোসোম, ভাইরাস ইত্যাদির সূত্রযুক্ত অণু জলের উপর প্রোটিন স্তরে ছড়িয়ে দিয়ে ভাল করে দেখা যায়।

c) Negative Staining বা বিপরীত রঞ্জিতকরণ— রাইবোজোম, মাইটোকন্ড্রিয়ার পর্দা ইত্যাদি দেখবার জন্য এই পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়। দ্রষ্টব্য বস্তুটি এক ফোঁটা রঞ্জক, যেমন— ফসফোটাঙ্গস্টিক অ্যাসিডে রাখা হয়। ধাতুর অণুগুলি দ্রষ্টব্য বস্তুর সূক্ষ্ম গঠনগুলির চারিদিকে ও মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে দ্রষ্টব্য বস্তু ভালভাবে দেখা যায়।

d) Freeze replication পদ্ধতিতে টিস্যুটি দ্রুত তরল নাইট্রোজেন বা তরল হিলিয়ামে হিমায়িত (freeze) করা হয়। এরপর টিস্যুটি যান্ত্রিকভাবে ভাগ করা হয়। এর ফলে পর্দার গঠন অনুযায়ী বরফ সাধারণত ফেটে যায়। বায়ুশূন্য অবস্থায় ছায়া-গঠন (shadow-cast) করতে দেওয়া হয়। টিস্যুটি বিগলনের পর ধাতব আবরণটি ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করা হয়।

এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কিছু অসুবিধা আছে, যেমন—

a) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সজীব কোষ দেখা যায় না কারণ, দ্রষ্টব্য বস্তুটা সম্পূর্ণ শুষ্ক হওয়া দরকার। এই শুষ্কতার ফলে কোষের গঠন পরিবর্তিত হতে পারে।

b) দ্রষ্টব্য বস্তুর রাসায়নিক গঠনের কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

c) সেকশনটা খুব পাতলা (0.1μ বা কম) হওয়া প্রয়োজন।

d) দ্রষ্টব্য বস্তুব প্রতিবিম্ব কেবল সাদা ও কালোয় দেখা যায়।

দৃশ্যমান আলো ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র (light microscope) এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পার্থক্য—

a) দৃশ্যমান আলো ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে

আলোক রশ্মি দ্রষ্টব্য বস্তুকে আলোকিত করে। কিন্তু ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ক্যাথোড থেকে **ইলেকট্রন** বিচ্ছুরিত হয়।

b) উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একটি অবতল আয়না আলোকে প্রতিফলিত করে এবং একটি দ্বিঅবতল লেন্স আলোক কনডেন্সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইলেকট্রন রশ্মিকে (beam) সংগ্রহ ও ফোকাস করার জন্য একটি **ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক (তড়িৎ-চুম্বক) কনডেন্সার** থাকে।

c) উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অবজেকটিভটি হল একটি অ্যাক্রোমাটিক লেন্স। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অবজেকটিভটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক প্রকৃতির।

d) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রতিবিম্বটি একটি পর্দার উপর বা আলোকচিত্রের প্লেটের উপর ফেলা হয়। কিন্তু উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এরকম পর্দার প্রয়োজন হয় না।

e) উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দ্রষ্টব্য বিভিন্ন অঞ্চল আলোর ভিন্ন ভিন্ন অংশ শোষণ করে ও এইভাবে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইলেকট্রনের বিচ্ছুরণের (diffraction) ফলে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

f) উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে রকম প্রতিবিম্ব গঠিত হয়, ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সেরকম প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় না। এই (শেষোক্ত) প্রতিবিম্বে দ্রষ্টব্য বস্তুর অণুর অবস্থান জানা যায়। এই অণুগুলি বিচ্ছুরণের দ্বারা সমকেন্দ্রিক বলয় বা দাগের (spot) সৃষ্টি করে।

উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির ও পদ্ধতির তুলনা—

পদ্ধতি	উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র	ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র
ফিক্সেশন	ফরমালডিহাইড, জেঙ্কারের দ্রবণ, অ্যাসিটিক অ্যালকোহল, কার্ণয় দ্রবণ, নাভাসিন দ্রবণ ইত্যাদি ফিক্সেটিভ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।	সাধারণত অসমিয়াস টেট্রাক্সাইড ফিক্সেটিভ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
জলহীন করা (dehydration)	ইথাইল অ্যালকোহলের মাত্রা ক্রমশ বাড়ান হয়। যেমন— 30%, 50%, 70%, 80%, 90%, অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল ও শেষে জাইলল দেওয়া হয়।	ইথাইল অ্যালকোহল বা অ্যাসিটোনের মাত্রা ক্রমশ বাড়ান হয়। পরে প্রোপিলিন অক্সাইড দেওয়া হয়।

নিহিতকরণ (embedding)	প্যারাফিন মোমে নিহিত করা হয়।	অ্যাক্রিলিক মোনোমার বা ইপক্সিরেসিনে নিহিত করা হয়। যেমন— অ্যারালডাইট, ভেসেটো-পল w, ইপন 812, মারাগ্লাস, ডুরকোপান।
ছেদন (sectioning)	i) ছেদ 5-10μ স্থূল। ii) মাইক্রোটোমে খুরের (razor) সাহায্যে ছেদ কাটা হয়।	i) ছেদ 50-100mμ স্থূল। ii) আলট্রামাইক্রোটোমে কাঁচ বা হীরার ছুরির সাহায্যে ছেদ কাটা হয়।
মাউন্ট করা	কাঁচের স্লাইডে ছেদ রাখা হয়। স্লাইডে Myer's adhesive লাগান হয় যাতে ছেদটি স্লাইডের সঙ্গে যুক্ত থাকে।	ছেদটি ছিদ্রযুক্ত একটি ধাতব চাকতিতে (grid) রাখা হয় এবং পারলো-ডোন বা মর্মভার দিয়ে আবৃত করা হয়।
স্টেইনিং (রঞ্জিত করা)	বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। যেমন— হেমাটক্সিলিন এবং ইয়োসিন বা সাফরানিন এবং লাইট গ্রিন ইত্যাদি। ক্রোমো-সোমের ক্ষেত্রে অরসিন, কারমিন বা হেমাটক্সিলিন ব্যবহৃত হয়। ইথানল গ্রেডে জলহীন করা হয়। জাইললে দেওয়ার পর কানাডা বালসাম বা DPX-এ মাউন্ট করা হয়।	ভারী ধাতু, যেমন লেড অ্যাসিটেট, লেড সাইট্রেট, লেড হাইড্রোক্লোরাইড, ফসফোটাঙ্গস্টিক অ্যাসিড এবং ইউরানিল অ্যাসি-টেট ইত্যাদি রঞ্জিত করা হয়।
পর্যবেক্ষণ	স্লাইডটি স্টেজের উপর কনডেনসার এবং অবজেকটিভের মাঝে রাখা হয়। প্রতিবিম্বটি আইপিস দিয়ে দেখা হয়।	বায়ুশূন্য অবস্থায় (vacu-um) কনডেনসার এবং অবজেকটিভের মাঝে রাখা হয়। প্রতিবিম্বটি ফসফোরেসেন্ট পর্দায় দেখা হয়।

X-ray অণুবীক্ষণ যন্ত্র

এই অণুবীক্ষণ যন্ত্র কোষের অণু বা বড় অণুর (macromolecule) ত্রিমাত্রিক গঠন দেখার জন্য উপযোগী। এই অণুগুলি কেলাসিত অবস্থায় থাকা দরকার। x-রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম এবং সজীব কলায় এর ভেদ্যতা খুব বেশি। বিভিন্ন মৌলের x-রশ্মি শোষণ করার ক্ষমতার তারতম্য রয়েছে। যেমন— কার্বনের নির্দিষ্ট শোষণ প্রান্ত (edge) হল 43.5Å, নাইট্রোজনের 31.1Å এবং অক্সিজেনের 23.5Å। x-রশ্মির অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তড়িৎ-চুম্বক লেন্স বা প্রতিফলক বাঁকানো আয়নার সাহায্যে x-রশ্মিকে ফোকাস করা হয়। এর ফলে আলোক চিত্রের ফিল্মের উপর একটি প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

x-রশ্মির অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য বস্তু পর্যবেক্ষণ করা হয়।

i) **প্রত্যক্ষ সংযোগ পদ্ধতি (direct contact method)** — এই পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য বস্তুর খুব পাতলা (1μ বা কম স্থূল) ছেদ সূক্ষ্ম দানাবিশিষ্ট (fine-grained) আলোকচিত্রের ইমালশনের উপর রাখা হয়। এর ওপর 1- 10Å ক্ষমতাসম্পন্ন x-রশ্মির (soft x-ray) সম্পাত করা হয়।

ii) **অভিক্ষেপ পদ্ধতি (projection method)** -- এই পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য বস্তুটি আলোকচিত্রের ফিল্ম এবং x- রশ্মির উৎসের মাঝে রাখা হয়। আলোকচিত্রের ফিল্মের উপর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

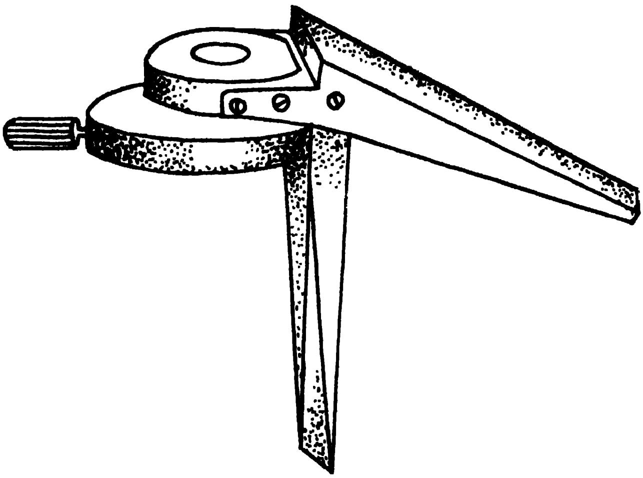
iii) **বিচ্ছুরণ পদ্ধতি (deffraction method)** — এই পদ্ধতিতে কেলাসিত দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে x-রশ্মি যায় এবং আলোকচিত্রের প্লেটের উপর একটি বিচ্ছুরণ (বা অপবর্তন) প্যাটার্ন গঠন করে। বিভিন্ন বিচ্ছুরিত রশ্মিগুলির মধ্যে প্রতিবন্ধকতার (interference) ফলে আলোকচিত্রের প্লেটে পরপর কতকগুলি সমকেন্দ্রিক বিন্দু বা ব্যান্ডের সৃষ্টি হয়। কেন্দ্র থেকে এসব ব্যান্ড বা বিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় করে কোনও কেলাসিত অণুর গঠন জানা যায়।

এই পদ্ধতিতে DNA, হিমোগ্লোবিন, মায়োগ্লোবিন (অক্সিজেন সঞ্চয়কারী রঞ্জক), লাইসোসোম ইত্যাদির গঠন জানা গেছে।

ক্যামেরা লুসিডা (camera lucida) (চিত্র 15)

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা বস্তুকে যথাযথভাবে আঁকবার জন্য camera lucida-র দরকার হয়। এটা প্রিজিম (prism) ও আয়না দিয়ে তৈরি। ক্যামেরা লুসিডাটা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আই পিসের ওপর লাগান হলে পাশে রাখা আঁকার কাগজের ও পেন্সিলের ছায়াটা আই পিসের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়। এর ফলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা কোনও বস্তুর যথাযথ চিত্র ক্যামেরা লুসিডার মাধ্যমে আঁকা সম্ভব। অঙ্কিত চিত্রের বিবর্ধনের মাত্রা (magnification) জানবার জন্য stage micrometer-এর

প্রয়োজন। স্টেজ মাইক্রোমিটার হল একটা স্লাইড, যার উপর 1-2mm এর একটা স্কেল থাকে। এই স্কেলে 100-200টি ভাগ থাকে। যে অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি আঁকা হয়েছে সেই একই অবস্থায় মাইক্রোমিটারের স্কেলের একটা অংশ ক্যামেরা লুসিডার সাহায্যে কাগজে আঁকা হয় ও এর থেকে বিবর্ধনের পরিমাণ জানা যায়।



চিত্র—15

ক্যামেরা লুসিডা

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা কোনও বস্তুর পরিমাপ করবার জন্য oculometer eye piece ব্যবহৃত হয়। এখানেও একটি স্কেল থাকে।

অকিউলারের (ocular) সাহায্যে কোনও বস্তুর পরিমাপের পদ্ধতি

Ocular-এর সাহায্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোনও বস্তুর পরিমাপ করা যায়। এজন্য oculometer ও stage micrometer-এর প্রয়োজন। স্টেজ মাইক্রোমিটার হচ্ছে একটি স্লাইড, যার মধ্যে স্কেলের মত দাগ কাটা থাকে। অকিউলারেও স্কেলের মতো দাগ থাকে। এটি একটি গোল কাঁচ যা আই পিসের মধ্যে ঢোকানো যায়। কোনও বস্তু পরিমাপ করতে হলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের স্টেজ বা মঞ্চে স্লাইড মাইক্রোমিটারটি রাখা হয়। আই পিস খুলে এর ভিতর অকিউলার রাখা হয়। অকিউলারে 5mm এর স্কেল থাকে। এই স্কেলে 100টি ভাগ রয়েছে। সুতরাং, প্রত্যেক ভাগ হল 0.05mm। স্টেজ মাইক্রোমিটারে সাধারণত 2mm স্কেল থাকে। এই স্কেলে 200টি ভাগ থাকে অর্থাৎ প্রত্যেক ভাগ হল 0.01mm। এবার স্টেজ মাইক্রোমিটারের স্কেলকে ফোকাস করা হয়। অকিউলার স্কেলের 0-র সঙ্গে স্টেজ মাইক্রোমিটারের 0 দাগটি মিলান হয়।

এরপর লক্ষ্য করা হয় অকিউলারের কোন দাগটি স্টেজ মাইক্রোমিটারে কোন দাগের সঙ্গে একেবারে মিলছে।

ধরা যাক, স্টেজ মাইক্রোমিটারের 20টি দাগ অকিউলারের 100টি দাগের সমান। স্টেজের প্রত্যেক দাগ হল 0.01mm। সুতরাং, 20টি দাগ হল 20×0.01mm = 0.20mm। অকিউলারের 100টি ভাগ হল 0.20mm। তাহলে একটি দাগ হবে 0.002mm অর্থাৎ 2μ ।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোনও বস্তু মাপতে হলে ওই বস্তুটি ফোকাস করে অকিউলারের স্কেল দিয়ে এর পরিমাপ করা হয়। যেমন, ধরা যাক, কোনও বস্তুর দৈর্ঘ্য 10টি অকিউলারের ভাগের সমান। সুতরাং, এর দৈর্ঘ্য হল $10 \times 2\mu$ বা 20μ।

তৃতীয় অধ্যায়

সাইটোলজিয় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখবার জন্য বিভিন্ন উপায়ে কোষের প্রস্তুতিকরণকে 'মাইক্রোটেকনিক' (microtechnique) বলে। সাইটোলজিয় পরীক্ষার জন্য কোষকে সাধারণত ফিক্স (fix) করে তারপর রঞ্জিত করা (stain) হয়। স্মিয়ার (smear) করে, স্কোয়াশ (squash) করে, কিম্বা সেকশন (ছেদ) কেটে কোনও বস্তুর স্লাইড (slide) তৈরি করা যায়।

ফিক্সেশন (fixation) বা স্থায়ীকরণ

কোষের বিভিন্ন অংশের স্বাভাবিক বা প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় সংরক্ষণকে ফিক্সেশন বা স্থায়ীকরণ বলে। বিভিন্ন কারণে ফিক্স করা হয়। সজীব কোষে যে সব বস্তু প্রায় অদৃশ্য থাকে, তাদের ভাল করে দেখবার জন্য ও নরম কোনও গঠনকে দৃঢ় করবার জন্য কোষগুলিকে ফিক্স করা হয়। এছাড়া এই প্রক্রিয়া কোষকে ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, অটোলাইসিস (autolysis) থেকে রক্ষা করে এবং কোষকে রঞ্জিত করার উপযোগী করে। ভাল ফিক্সেটিভ (fixative) কোষের সঙ্কোচন ও বিকৃতি রোধ করে।

(1) **রাসায়নিক বস্তুর সাহায্যে ফিক্সেশন**— সাধারণত ফিক্সেটিভ কোষের প্রোটিনকে অদ্রবনীয় করে এবং এর ফলে রঞ্জিত করার সময় কোষ বিকৃত হয় না। কোষের যথাযথ সংরক্ষণের জন্য ফিক্সেটিভের কোষে দ্রুত প্রবেশ করা দরকার। কোষের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষার জন্য আলাদা আলাদা ফিক্সেটিভ ব্যবহার করা হয়। সাধারণত দুই বা তিনটি পদার্থ একসাথে মিশিয়ে ফিক্সেটিভ তৈরি করা হয়। ফিক্সেটিভ তৈরি করার সময় বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। যেমন, কোনও পদার্থ সাইটোপ্লাজমের সংকোচন ঘটালে, অন্য আরেকটা পদার্থ যা সাইটোপ্লাজমকে স্ফীত করে তার সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। কোষের কোন অংশ পরীক্ষা করা হবে তার উপর নির্ভর করে ফিক্সেটিভ নির্বাচিত করা হয়। ক্রোমোসোমের ফিক্সেশনের জন্য অ্যাসিটিক অ্যালকোহল (acetic alcohol) বা নাভাসিন দ্রবণ বা কার্ণয় দ্রবণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অ্যাসিটিক অ্যাসিডযুক্ত অ্যালকোহলীয় ফিক্সেটিভ কোষ প্রাচীরকে নরম করে। অ্যাসিটিক অ্যাসিড কোষে দ্রুত প্রবেশ করে, তবে এটি প্রোটোপ্লাজমকে সামান্য স্ফীত করে। অ্যালকোহল কোষের

বিভিন্ন বস্তুকে শক্ত করে এবং ক্রোমোসোমকে যথাযথ অবস্থায় রাখে।

A **কার্ণয় দ্রবণ**— (carnoy solution) যেসব পদার্থ মিশিয়ে কার্ণয দ্রবণ তৈবি করা হয় সেগুলি হচ্ছে—

(a) অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল (absolute alcohol)	—	30 সিঃ সিঃ
(b) গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (glacial acetic acid)	—	5 সিঃ সিঃ
(c) ক্লোরোফর্ম (chloroform)	—	15 সিঃ সিঃ

কার্ণয দ্রবণ খুব তাড়াতাড়ি কোষে প্রবেশ করতে পারে। এই দ্রবণেব ক্লোবোফর্ম স্নেহ পদার্থকে (fat) দ্রবীভূত করে।

তিন ভাগ ইথাইল অ্যালকোহলের সাথে এক ভাগ গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড মিশিয়েও কার্ণয দ্রবণ তৈরি করা হয়।

B Belling-এর **পরিবর্তিত নাভাসিন দ্রবণ** (Navaschin solution)— Navaschin 1910 খ্রিস্টাব্দে এই দ্রবণ প্রথম তৈবি করেন। পরে Belling এর কিছু পরিবর্তন করেন।

নাভাসিন A		
ক্রোমিক অ্যাসিডের কেলাস (crystal)	—	5 গ্রাম
গ্লেসিযাল অ্যাসিটিক অ্যাসিড	—	50 সিঃ সিঃ
পাতিত জল (distilled water)	—	320 সিঃ সিঃ
নাভাসিন B		
ফবমালিন	—	200 সিঃ সিঃ
পাতিত জল	—	175 সিঃ সিঃ

মেটাফেজ অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি দেখবার জন্য অনেক সময় নাভাসিন 'B'-র উপাদানগুলির কিছু পবিবর্তন করা হয়। এসব ক্ষেত্রে ফরমালিন 100 সিঃ সিঃ ও পাতিত জল 275 সিঃ সিঃ মিশিয়ে নাভাসিন 'B' তৈরি করা হয়।

নাভাসিন 'A' ও 'B' স্মিয়ার কববার ঠিক আগেই সমপরিমাণে মেশান হয়। নাভাসিন দ্রবণ 'A'-তে জারক (oxidising) দ্রব্য ও 'B'-তে বিজারক (reducing) দ্রব্য থাকায় ঐ দুইটি দ্রবণ ব্যবহারের আগে পর্যন্ত আলাদা রাখা হয়।

কখনও কখনও পরীক্ষণীয় বস্তুকে তরল নাইট্রোজেনের সাহায্যে তাড়াতাড়ি খুব ঠাণ্ডা করে এবং পরে জলহীন (dehydrate) করে ফিক্স করা হয়। এই পদ্ধতিতে ফিক্স করার জন্য কোনও বাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় না বলে এবং দ্রুত ঠাণ্ডা করার ফলে কোষগুলি খুব কম বিকৃত হয়।

কতকগুলি ফিক্সেটিভ ও তাদের ব্যবহার নিচের তালিকায় দেওয়া হল—

ফিক্সেটিভ	প্রভাব	ব্যবহার
অ্যাসিটিক অ্যাসিড (0.3-50%), একক ভাবে কিম্বা অন্য পদার্থের সাথে মিশ্রণে ব্যবহৃত হয়।	সাইটোপ্লাজমীয় প্রোটিন ফিক্স করে না, তবে নিউক্লিওপ্রোটিন ফিক্স করে। গলগি বস্তু ও মাইটোকন্ড্রিয়াকে বিনষ্ট করে। টিস্যুকে স্ফীত ও নরম করে।	ক্ষারধর্মী রঞ্জক পদার্থের সাথে ব্যবহৃত হয়। নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোমকে ফিক্স করে।
ইথাইল অ্যালকোহল (70-100%), এককভাবে বা মিশ্রণে	প্রোটিনকে ফিক্স করে, লিপিডকে দ্রবণীয় করে, টিস্যু সঙ্কুচিত ও শক্ত হয়।	বেসিক বা ক্ষার-ধর্মী রঞ্জক পদার্থের সাথে ব্যবহৃত হয়। নিউক্লিয়াসকে ফিক্স করে।
কার্ণয় দ্রবণ (3 ভাগ ইথানল ও 1 ভাগ গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড)	ইথাইল অ্যালকোহল ও অ্যাসিটিক অ্যাসিডের মিলিত প্রভাব	নিউক্লিওপ্রোটিন ও ক্রোমোসোমকে ফিক্স করে।
ফরমালডিহাইড 4-10%, মিশ্রণে ব্যবহৃত হয়।	লিপিডকে ফিক্স করে। প্রোটিনকে অধঃক্ষেপ (precipitate) করে না, সঙ্কুচিত করে না, তবে শক্ত করে।	ক্ষারধর্মী রঞ্জক পদার্থের সাথে ব্যবহৃত হয়। গলগি বস্তু, মাইটোকন্ড্রিয়া ও এনজাইমকে ফিক্স করে।
ক্রোমিক অ্যাসিড (0.5-1%)	কার্বোহাইড্রেট ও লিপিডকে ফিক্স করে, সবরকম প্রোটিন অধঃক্ষিপ্ত হয়।	মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বস্তুকে ফিক্স করে।

ফিক্সেটিভ	প্রভাব	ব্যবহার
Bouin-এর দ্রবণ (5 ভাগ পিকরিক অ্যাসিড, 5 ভাগ 40% ফরমালডিহাইড ও 1 ভাগ গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড)	সব রকম প্রোটিনকে ফিক্স করে, সঙ্কুচিত ও নরম করে।	ক্রোমোসোমকে ফিক্স করে।
অসমিয়াম টেট্রাঅক্সাইড (0.5-2%), এককভাবে বা মিশ্রণে	লিপিডকে ফিক্স করে। গাঢ় বর্ণের করে। রঞ্জিত করা (staining) যায় না।	সাইটোপ্লাজম, গলগি বস্তু, মাইটোকন্ড্রিয়া ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ ফিক্স করে।
মারকিউরিক ক্লোরাইড	অম্ল রঞ্জকের সাথে ব্যবহৃত হয়। প্রভাব ক্রোমিক অ্যাসিডের মত।	ব্যবহার ক্রোমিক অ্যাসিডের মত।

(2) **হিমায়িত করে (freezing) ফিক্সেশন**— ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষার জন্য টিস্যুকে দ্রুত ঠাণ্ডা করে ফিক্স করা যায়। একটি হিমায়িত প্রকোষ্ঠে যেখানে –100°C থেকে –190° C তাপমাত্রা বজায় রাখা হয়, সেখানে এরকম ফিক্সেশন করা হয়। হিমায়িত করে ফিক্স করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

A. হিমায়িত করে শুষ্ক করা (freeze drying)— সজীব টিস্যুর খুব ছোট অংশ তরল নাইট্রোজেন দিয়ে -160°C বা -190°C ঠাণ্ডা করে প্রোপেন বা আইসোপেনটেনে ডুবান হয়। এরপর টিস্যুটি শুষ্ক করার প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। এই প্রকোষ্ঠ বায়ুশূন্য (vacuum) থাকে ও এর তাপমাত্রা -40°C থেকে -60°C রাখা হয়।

এই পদ্ধতিতে টিস্যু সঙ্কুচিত হয় না এবং ফিক্সেশন সমভাবে হয়। দ্রবণীয় বস্তু স্থানান্তরিত হয় না অর্থাৎ, কোষের রাসায়নিক গঠন অপরিবর্তিত থাকে।

B. হিমায়িত করে প্রতিস্থাপিত করা (freeze substitution)— এই পদ্ধতিতে ফ্রিজ ড্রাইং-এর মত সজীব টিস্যুকে দ্রুত ঠাণ্ডা করা হয়। তারপর এমন রাসায়নিক পদার্থ যা বরফের কেলাস দ্রবীভূত করতে পারে, সেই পদার্থে -60°C থেকে -70°C তাপমাত্রায় রাখা হয়। ইথানল, মিথানল বা অ্যাসিটোন হল এইরকম রাসায়নিক পদার্থ।

এই পদ্ধতিতে টিস্যু সঙ্কুচিত হয় না ও এর গঠন অপরিবর্তিত থাকে। তবে এই পদ্ধতি ফ্রিজ ড্রাইং-এর মত উপযোগী নয়।

C. হিমায়িত করে এচিং (freeze etching)— এই পদ্ধতি প্রথমে 1957 খ্রিস্টাব্দে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ভাইরাস পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে টিস্যুটি 20% গ্লিসারলে রেখে -100°C তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করা হয়। টিস্যুটি বরফের মধ্যে হিমায়িত করা হয়। একই তাপমাত্রায় বায়ুশূন্য (vacuum) অবস্থায় সেকশন কাটা হয়। বরফের একটা পাতলা স্তর সেকশনের উপর থেকে বাদ যায়। টিস্যুটি ফ্রিজ ড্রাই করা হয়। টিস্যুর খোদাই করা (etched) তল কার্বন দিয়ে ঢাকা হয়। এর ফলে দ্রষ্টব্য বস্তুর একটি প্রতিলিপি (replica) তৈরি হয়। টিস্যুটি হিমায়িত শুষ্ক অবস্থায় জলে রাখা হয়। এর ফলে প্রতিলিপিটি আলাদা হয়ে জলে ভাসে। প্রতিলিপিটি ক্ষারধর্মী দ্রবণে ধোওয়া হয় ও পরীক্ষা করা হয়। প্রতিলিপিতে কোষের বিভিন্ন পরিলেখগুলি (outline) দেখা যায়।

স্মিয়ার করার পদ্ধতি (smearing)

সেকশন না কেটে স্মিয়ার (smear) বা স্কোয়াশ (squash) পদ্ধতিতে তাড়াতাড়ি স্লাইড তৈরি করা যায়। যে সব কোষ পরস্পরের সাথে যুক্ত নয় অর্থাৎ যেখানে মধ্য পর্দা (middle lamella) নেই, সেখানে স্মিয়ার পদ্ধতি উপযোগী। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের পরাগরেণু মাতৃকোষগুলির (pollen mother cell) বিভাজন দেখবার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। স্মিয়ার পদ্ধতির সাহায্যে কোষগুলিকে স্লাইডের উপর এক স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে এদের ভালভাবে ফিক্স করা সম্ভব। স্মিয়ার করার পর কোষগুলি স্লাইডের সাথে আটকে থাকে ও এদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে রঙ করা যায়।

যে স্লাইডে স্মিয়ার করা হবে, তা খুব পরিষ্কার হওয়া দরকার। স্লাইডগুলিকে সালফিউরিক অ্যাসিড ও পটাশিয়াম বাইক্রোমেটের দ্রবণে অনেকক্ষণ ডুবিয়ে রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়। এরপর এগুলি সামান্য অ্যামোনিয়া মিশ্রিত অ্যালকোহলে রেখে আবার জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ভালভাবে মুছে নিলেই স্লাইডগুলি পরিষ্কার হয়ে যায়।

পরাগরেণু মাতৃকোষগুলি নিচের পদ্ধতি অনুসারে স্মিয়ার করা হয়। স্মিয়ার করার পর ফিক্স করবার জন্য আগেই ফিক্সেটিভ প্রস্তুত রাখা দরকার। মুকুল থেকে পরাগধানী (anther) বের করে স্লাইডে রাখা হয়। পরাগধানী যথেষ্ট বড় হলে সেটিকে ছুরি দিয়ে কয়েকটা টুকরো করা হয় বা পরাগধানীর দুই প্রান্ত কেটে ফেলা হয়। একটা পরিষ্কার ছুরি দিয়ে তাড়াতাড়ি ও সমানভাবে পরাগধানীগুলিকে চাপ দিয়ে এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে কোষগুলি এক স্তরে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্লাইডটাকে

নাভাসিন দ্রবণে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সব স্মিয়ার করা কোষগুলি ঐ তরল পদার্থের সংস্পর্শে থাকে। পরাগধানীগুলিকে স্মিয়ার করা ও তরল পদার্থে ডুবাবার মধ্যে সময়ের ব্যবধান চার সেকেন্ডের বেশি হওয়া উচিত নয়। স্লাইডটাকে ঐ দ্রবণে দেড় ঘন্টা রাখা যেতে পারে ও পরে স্লাইডটাকে আধ ঘন্টা প্রবহণশীল জলে ধুয়ে ফেলা হয়। স্লাইডে পরাগধানীর যেসব অপ্রয়োজনীয় অংশ থাকে তা ফরসেপ (forcep) দিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে খারাপ স্লাইড বাদ দেওয়ার পর ভাল স্লাইড বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে রঙ করা হয়। এই অধ্যায়ের শেষে কতকগুলি প্রচলিত পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

স্কোয়াশ (squash) করার পদ্ধতি

এই পদ্ধতি Schneider প্রথম ব্যবহার কবেন। পরে Belling 1921 খ্রিস্টাব্দে ক্রোমোসোম দেখবার জন্য এর ব্যবহার করেন। স্কোয়াশ করার জন্য কোষগুলি সরাসরি ফিক্সেটিভে দেওয়া হয়। পরাগরেণু মাতৃকোষ দেখবার জন্য কারমিন ব্যবহৃত কয়েকটা পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হল।

(1) আয়রন অ্যাসিটো কারমিন (iron-aceto-carmine) পদ্ধতি — Belling 1926 খ্রিস্টাব্দে আয়রন অ্যাসিটো কারমিন পদ্ধতি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। এই পদ্ধতি খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। পরে Johanson Belling-এর আয়রন অ্যাসিটো কারমিন পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করেছেন।

[**কারমিন তৈরি করার পদ্ধতি**— একটা ফ্লাস্কে 100 সিঃ সিঃ 45 শতাংশ অ্যাসিটিক অ্যাসিড নিয়ে ফুটান হয়। তারপর এটা আগুন থেকে সরিয়ে সাথে সাথে এক গ্রাম কারমিন (carmine) আস্তে ঢেলে দেওয়া হয়। মিশ্রণ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ফিলটার করা হয়। কারমিনের মিশ্রণে কয়েক ফোঁটা ফেরিক অ্যাসিটেটের (ferric acetate) জলীয় দ্রবণ যোগ করা হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা গাঢ় লাল হয়। তবে বেশি ফেরিক অ্যাসিটেট যোগ করলে কারমিনের তলানি পড়ে যায়। ফেরিক অ্যাসিটেট কারমিনের জন্য মরড্যান্ট হিসাবে কাজ করে এবং এর ব্যবহারের ফলে ক্রোমোসোমগুলি গাঢ় রঙ নেয়।]

অ্যাসিটো কারমিন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হয়। এখানে সাধারণত যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তার বর্ণনা করা হল।

স্লাইডে কয়েক ফোঁটা অ্যাসিটো কারমিন (aceto-carmine) দিয়ে তার মধ্যে কয়েকটা ছোট পরাগধানী (anther) কিংবা পরাগধানী বড় হলে তার কয়েকটা অংশ রাখা হয়। একটা ছুরি দিয়ে পরাগধানীর ওপর চাপ দিয়ে পরাগরেণুগুলি বের করা হয়। পরাগধানীর প্রাচীর ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় অংশ সরিয়ে ফেলে একটা কভার স্লিপ দিয়ে চাপা দিয়ে স্লাইডটাকে 4-5 বার এক সেকেন্ড গরম করলে কোষগুলি চ্যাপটা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তবে কারমিন যেন ফুটে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা

দরকার। অতিরিক্ত কারমিন মুছে ফেলা হয় ও মোম দিয়ে কভার স্লিপের ধারগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ক্রোমোসোমগুলি ভাল করে রঙ না নিলে স্লাইডটাকে ওই অবস্থায় রঙ ধরবার জন্য কয়েকদিন রেখে দেওয়া হয়। কারমিনের স্লাইড দেখবার সময় সবুজ ফিলটার ব্যবহার করলে ক্রোমোসোমগুলি কুচকুচে কালো দেখায়।

ক্রোমোসোম ও নিউক্লিয়াস দেখবার জন্য কখনও কখনও অ্যাসিটো কারমিনে ক্লোরাল হাইড্রেটের অল্প কয়েকটি কেলাস যোগ করা হয়। এর ফলে পরাগরেণুগুলি স্বচ্ছ দেখায়।

(2) **McClintock-এর স্থায়ী অ্যাসিটো কারমিন পদ্ধতি**— সদ্য সংগৃহীত বা সংরক্ষিত মুকুল থেকে পরাগরেণুগুলিকে এই পদ্ধতিতে রঙ করা যায়। [সংরক্ষণের পদ্ধতি হল— গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল (1:2 বা 1:3) একটা ছোট শিশিতে নিয়ে তার মধ্যে পরাগধানীগুলি ডুবিয়ে দেওয়া হয়। চব্বিশ ঘণ্টা বাদে ওই পরাগধানীগুলিকে সত্তর শতাংশ অ্যালকোহলে রাখা হয়। এইভাবে পরাগধানীগুলি অনির্দিষ্টকাল সংরক্ষিত রাখা যায়।]

পরাগধানী কারমিনে স্কোয়াশ (squash) করে স্লাইড তৈরি করা হয়। স্লাইডটাকে স্থায়ী করবার জন্য সাবধানে কভার স্লিপের (cover slip) ধারের মোম ব্লেড দিয়ে চেঁছে ফেলা হয়। কভার স্লিপটা যাতে সরে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

(a) এরপর একটি পেট্রিডিশে 45 শতাংশ অ্যাসিটিক অ্যাসিডে ওই স্লাইডটিকে উল্টে রাখা হয়। কিছুক্ষণ বাদে কভার স্লিপটি স্লাইড থেকে আলাদা হয়ে যায়। স্লাইড ও কভার স্লিপে কোষগুলি আটকে থাকে। এই অবস্থায় স্লাইড ও কভার স্লিপ পাঁচ মিনিট রাখা হয় ও এরপর নিচের দ্রবণগুলির প্রত্যেকটিতে পাঁচ মিনিট করে রাখা হয়।

(b) অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল	1 : 1	অনুপাতে
(c) " " " " "	1 : 3	"
(d) " " " " "	1 : 9	"
(e) অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল ও জাইলল (xylol)	1 : 1	"
(f) জাইলল (বিশুদ্ধ)		

(g) জাইলল থেকে স্লাইডটা তুলে নিয়ে কোষগুলির উপর কানাডা বালসাম (canada balsam) দেওয়া হয় ও নতুন কভার স্লিপ দিয়ে চাপা দেওয়া হয়। একইভাবে একটা পরিষ্কার স্লাইডে এক ফোঁটা কানাডা বালসাম নিয়ে তার উপর কোষযুক্ত কভার স্লিপ চাপা দেওয়া হয়ে থাকে। সদ্য তৈরি করা স্লাইড ওই দিনই স্থায়ী করলে বিশুদ্ধ জাইলল ব্যবহার করা হয় না, কারণ এর ব্যবহারের ফলে রেণু মাতৃকোষগুলি বিকৃত দেখায়।

(3) **McCallam-এর আয়রন প্রোপিয়োনো কারমিন (iron-propiono-car-**

mine) পদ্ধতি— অ্যাসিটিক অ্যাসিডের তুলনায় প্রোপিয়োনো কারমিনে অনেক বেশি ভালভাবে স্থায়ীকরণ (fixation) ও রঞ্জিতকরণ (staining) সম্ভব। বিভিন্ন উদ্ভিদে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার প্রোপিয়োনো কারমিন ব্যবহার করা হয়। অ্যাসিটো কারমিনের মত একই পদ্ধতিতে প্রোপিয়োনো কারমিন তৈরি করা হয়। কেবল এখানে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের পরিবর্তে প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড (propionic acid) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রোপিয়োনিক অ্যাসিডে কারমিন বেশি দ্রবীভূত হয় ও এর ব্যবহারের ফলে সাইটোপ্লাজম আরও স্বচ্ছ দেখায়।

1 : 2 প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড ও অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহলের মিশ্রণে পরাগধানীকে ফিক্স করার পর, আয়রন প্রোপিয়োনো কারমিনে 2-3 মিনিট রাখা হয়। স্লাইডে এক ফোঁটা প্রোপিয়োনো কারমিন দিয়ে তার মধ্যে পরাগধানীগুলি স্মিয়ার করা হয়। স্মিয়ার করতে অসুবিধা হলে স্লাইডটা সামান্য গরম করা দরকার। 50 শতাংশ প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড কভার স্লিপের একটা ধারে দিয়ে, অন্য পাশে ব্লটিং দিয়ে প্রোপিয়োনো কারমিনটা শুষে নিয়ে রঙটা প্রয়োজন অনুযায়ী কমান যায়।

স্লাইডটিকে নিচের পদ্ধতিতে স্থায়ী করা যায়।

(a) 5% জলীয় প্রোপিয়োনিক অ্যাসিডে স্লাইডটা উল্টে রাখা হয়। কভার স্লিপটা (cover slip) স্লাইড থেকে আলাদা হয়ে গেলে পর পাঁচ মিনিট রাখা হয়। এরপর স্লাইড ও কভার স্লিপ নিচের দ্রবণগুলিতে নির্দিষ্ট সময় রাখা হয়।

(b) টারসিয়ারি বিউটাইল অ্যালকোহল, (tartiary butyl alcohol) প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড ও জলের মিশ্রণ (1 : 2 : 1 অনুপাতে)	– 5 মিনিট
(c) টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল, প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড (1 : 1 অনুপাতে)	– 5 মিনিট
(d) টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল ও প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড (3 : 1 অনুপাতে)	– 5 মিনিট
(e) টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল ও প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড (9 : 1 অনুপাতে)	– 5 মিনিট
(f) বিশুদ্ধ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল	– 5 মিনিট

(g) স্লাইডে ইউপারল (euparol) দিয়ে কভার স্লিপ চাপা দেওয়া হয়।

এমবেডিং (embedding) বা নিহিত করা

ফুলের মুকুল কিংবা মূলের অগ্রভাগ বিশেষ পদ্ধতিতে মোমের ভিতর রেখে মাইক্রোটোমের (microtome) সাহায্যে পাতলা সেকশন বা ছেদ তৈরি করা হয়। অ্যাসিটো কারমিন পদ্ধতিতে স্কোয়াশ করে যথাযথ আয়তনের মুকুল নির্বাচিত করার পর মুকুলের বৃতি (calyx) ও দলমণ্ডল (corolla) বাদ দিয়ে কার্ণয় দ্রবণে 1-2

সেকেন্ড রাখা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ওই মুকুলটা এক মিনিট জলে ধুয়ে Navaschin দ্রবণে ফিক্স করা হয়। মূলের ক্ষেত্রে Lewitsky-র মিশ্রণ ফিক্সেটিভ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক শতাংশ ক্রোমিক অ্যাসিড ও দশ শতাংশ ফরমালিন ফিক্স করার ঠিক আগে সমপরিমাণে মিশিয়ে Lewitsky-র মিশ্রণ তৈরি হয়। মুকুল ও মূল সারারাত্রি ফিক্স করার পর একদিন প্রবহণশীল জলে ধুতে হয়, যাতে কোষ থেকে সব ফিক্সেটিভ ধুয়ে যায়। এরপর এগুলি বিভিন্ন অ্যালকোহলের মধ্যে রেখে জলহীন করে (dehydrate) পরে মোমের ভিতর রাখা হয়। Klebs 1869 খ্রিস্টাব্দে ফিক্সড টিস্যুকে মোমের মধ্যে নিহিত করার পদ্ধতি প্রথম উদ্ভাবন করেন। বিভিন্ন মাত্রার (grade) অ্যালকোহল ব্যবহার করে টিস্যুকে জলহীন করার উদ্দেশ্য হল— (a) এই পদ্ধতি টিস্যুকে পচন থেকে রক্ষা করে, (b) কোষকে অবিকৃত রাখতে সাহায্য করে এবং (c) কোষ পর্দা জলীয় দ্রবণে সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, কিন্তু অ্যালকোহল কোষ পর্দার এরকম ক্ষতি রোধ করতে পারে। জলহীন করবার পদ্ধতির (dehydration) বর্ণনা দেওয়া হল।

(1) ক্লোরোফর্মের সাহায্যে— মুকুল বা মূলগুলি যথাক্রমে অ্যালকোহল, ক্লোরোফর্ম, মোম ইত্যাদিতে নিচের বর্ণনা অনুযায়ী রাখা হয়।

(a)	30 শতাংশ অ্যালকোহল			—	1	ঘণ্টা
(b)	50 " "			—	1	"
(c)	70 " "			—	সারারাত্রি	
(d)	80 " "			—	1	"
(e)	90 " "			—	1	"
(f)	95 " "			—	1	"
(g)	অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল	I এ		—	সারারাত্রি	
(h)	" "	II এ		—	10 মিনিট	
(i)	অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল ও ক্লোরোফর্মে		(3:1)	—	2	ঘণ্টা
(j)	" " "		(1:1)	—	2	"
(k)	" " "		(1:3)	—	2	"
(l)	ক্লোরোফর্ম	I এ		—	10	মিনিট
(m)	"	II এ		—	48	ঘণ্টা

দ্বিতীয় বার ক্লোরোফর্ম দেবার পর শিশিতে মোমের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে 35–38°C তাপমাত্রার হট প্লেটে (hot plate) অন্তত 48 ঘণ্টা রাখা হয়। এরপর শিশির ছিপি খুলে 45°C তাপমাত্রার ওভেনে সারারাত্রি রাখার পর শিশিটা 56–60°C

তাপমাত্রার ওভেনে স্থানান্তরিত করা হয়, যাতে কোনও ক্লোরোফর্ম না থাকে। এবার মোমটা ঢেলে ফেলে নতুন মোম দেওয়া হয়। এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর আরও দুইবার মোম বদল করা হয়। ওভেনের তাপমাত্রা যাতে অত্যাধিক বেড়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

মুকুল বা মূলগুলি মোমে নিহিত করার জন্য শীতকালে 49—52°C ও গ্রীষ্মকালে 56—60°C গলনাঙ্কের (melting point) মোম ব্যবহার করা উচিত।

(2) **টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহলের (tertiary butyl alcohol) সাহায্যে**— মুকুল বা মূলগুলি বিভিন্ন তরল পদার্থে নিচের তালিকা অনুযায়ী রাখা হয়।

(a)	20 শতাংশ অ্যালকোহলে	2 ঘণ্টা
(b)	30 শতাংশ অ্যালকোহলে	2 "
(c)	50 শতাংশ অ্যালকোহলে জল— 50 ভাগ ইথাইল অ্যালকোহল— 40 ভাগ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল— 10 ভাগ	2 "
(d)	70 শতাংশ অ্যালকোহলে জল— 30 ভাগ ইথাইল অ্যালকোহল— 50 ভাগ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল— 20 ভাগ	সারারাত্রি
(e)	85 শতাংশ অ্যালকোহলে জল— 15 ভাগ ইথাইল অ্যালকোহল— 50 ভাগ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল— 35 ভাগ	1 ঘণ্টা
(f)	95 শতাংশ অ্যালকোহলে জল— 5 ভাগ ইথাইল অ্যালকোহল— 40 ভাগ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল— 55 ভাগ	1 "
(g)	100 শতাংশ অ্যালকোহলে ইথাইল অ্যালকোহল— 25 ভাগ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল— 75 ভাগ	1 "

100% অ্যালকোহলে সামান্য এরিথ্রোসিন দিলে পরীক্ষণীয় বস্তুগুলি লাল রঙের দেখায় ও মোমের মধ্যে এগুলি সাজাতে সুবিধা হয়।

(h) তিনবার বিশুদ্ধ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহলে রাখা হয়। এরমধ্যে একবার সারারাত্রি বিশুদ্ধ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহলে রাখা হয়।

(i) সমপরিমাণ প্যারাফিন অয়েল (paraffin oil) ও টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহলের মিশ্রণে এক ঘণ্টা রাখা হয়।

(j) এবার একটা শিশিতে মোম দিয়ে তারপর মুকুল বা মূলগুলি রেখে অল্প প্যারাফিন অয়েল দিয়ে ঢেকে শিশিটা ওভেনে রাখা হয়। আস্তে আস্তে মুকুল বা মূলগুলি শিশির তলায় ডুবে যায়।

(k) এক ঘণ্টা পর ওই শিশি থেকে মোম ঢেলে ফেলে নতুন মোম দিয়ে আবার শিশিটা ওভেনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। দুই বার এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করা হয়।

সাইটোলজির পরীক্ষার জন্য টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহলের পদ্ধতিই বেশি উপযোগী।

মুকুল বা মূলের অগ্রভাগ মোমের মধ্যে স্থাপিত করার পদ্ধতির বর্ণনা করা হল। প্রথমে মোম সমেত মুকুল বা মূলগুলি শিশি থেকে একটা পাত্রে ঢেলে সাজিয়ে ফেলা হয়। সাধারণত কাগজ ভাঁজ করে পাত্রটা তৈরি করা হয়ে থাকে।

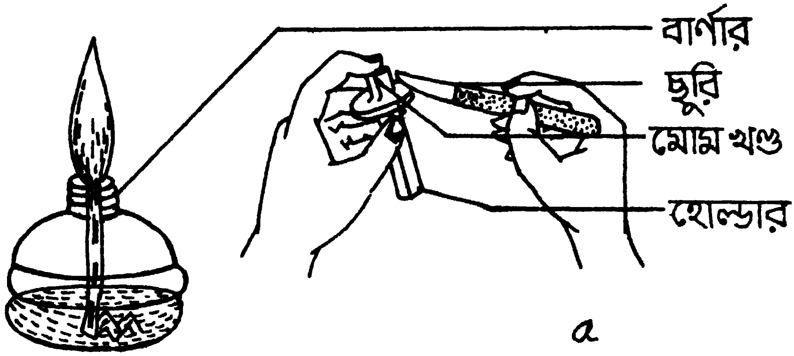
এবার মোমে মুকুল বা মূল স্থাপিত করবার জন্য কাগজের পাত্রটা ওভেনের (oven) কাছে রাখা হয়। একটা বুনসেন বার্ণার কাছেই রাখা হয়, যাতে নিডিলটা প্রয়োজন মত গরম করা যায়। ওভেন থেকে শিশিটা বের করে ঝাঁকে নিয়ে কাগজের পাত্রে মোম ও মুকুল বা মূলগুলি তাড়াতাড়ি ঢেলে দেওয়ার পর প্রয়োজন মত অন্য পাত্র থেকে তরল মোম ঢেলে দেওয়া হয়, যাতে বস্তুগুলি ঢাকা থাকে। এবার গরম নিডিল দিয়ে বস্তুগুলিকে যথাযথভাবে সাজিয়ে ফেলা হয়। মূলের অগ্রভাগ বা ছোট মুকুল কয়েকটা একসাথে সাজান হয়। একটু বাদে পাত্রটা আস্তে আস্তে তুলে ঠাণ্ডা জলের পাত্রে রাখা হয়। শক্ত না হওয়া পর্যন্ত কাগজের পাত্রটা জলের উপর ভাসতে দেওয়া হয়। এরপর পাত্রটা জলের তলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। একটু পরে কাগজের পাত্রটা তুলে নেওয়া হয়। মোমের খণ্ডটা যথাযথভাবে চিহ্নিত করে রেখে দেওয়া হয়।

সেকশনিং (sectioning) বা ছেদন

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষার জন্য প্লাস্টিক, রেসিন, অ্যারালডাইট, ইপান (epan) 812, ডুরকোপান (durcopan) ইত্যাদিতে টিস্যুটি নিহিত করা হয়।

মাইক্রোটোমের সাহায্যে মোমের মধ্যে নিহিত বস্তুর সূক্ষ্ম সেকশন কাটা হয়। একটা ছুরি দিয়ে মোমকে এমনভাবে কাটা হয়, যার ফলে প্রত্যেক খণ্ডে একটা কিম্বা একগুচ্ছ মুকুল বা মূলের অগ্রভাগ থাকে। পাশের অতিরিক্ত মোম চেঁছে ফেলা হয়। বস্তুটির চারিদিকে অন্তত তিন মিলিমিটার এবং নিচে অন্তত পাঁচ মিলিমিটার পুরু মোম থাকা প্রয়োজন। এবার এই মোম খণ্ডটাকে মাইক্রোটোমের গোল ধাতব হোল্ডারের (holder) সাথে লাগান হয়। তরল মোমের মধ্যে ডুবিয়ে ধাতব হোল্ডারের উপরে একটা মোমের স্তরের সৃষ্টি করা হয়। খানিকটা অর্ধতরল মোম হোল্ডারের ঠিক মাঝখানে দেওয়া হয়। একটা ছুরি গরম করে একবার হোল্ডারের মাঝখানের মোমে

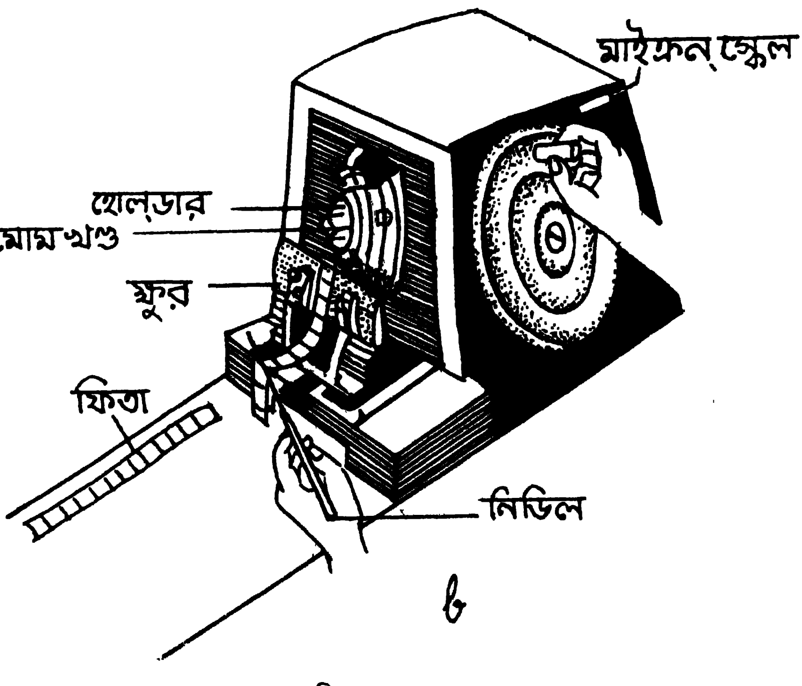
ও অরেকবার মোম খণ্ডের নিচের দিকে স্পর্শ করা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে মোম খণ্ডটা হোল্ডারের মাঝখানে বসিয়ে দেওয়া হয়। আবার ছুরিটা গরম করে সংযোগস্থলে



চিত্র—16a

মাইক্রোটোমের ধাতব হোল্ডারের উপর 'প্যারাফিন ব্লক' (মোম খণ্ড) বসাবার পদ্ধতি

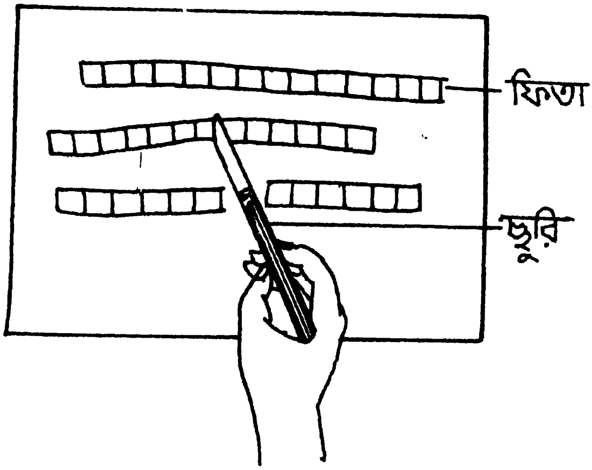
সাবধানে ধরা হয় যাতে মোমের খণ্ডটা ও হোল্ডারের মোম একসাথে মিশে যায়। মোমের খণ্ড থেকে মোম ধীরে চেঁছে ফেলে (চিত্র 16a) ঐ খণ্ডটা চারকোনা করা হয়।



চিত্র—16b

মাইক্রোটোমের সাহায্যে সেকশন কাটার পদ্ধতি

মোমের খণ্ডটা হোল্ডারের উপর সোজাভাবে বসান উচিত এবং এর বিপরীত পাশগুলি সমান্তরাল হওয়া প্রয়োজন। এবার হোল্ডারটা মাইক্রোটোমের ক্ল্যাম্পের

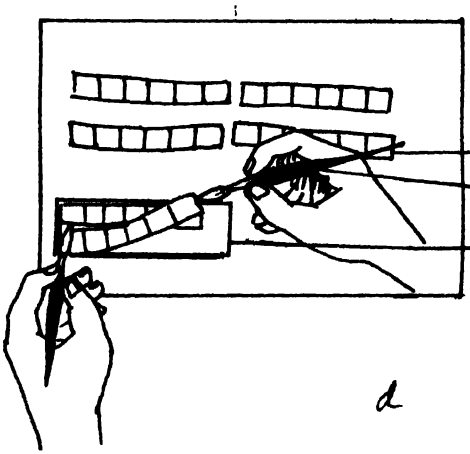


চিত্র—16c

ফিতাটিকে মাপ অনুযায়ী ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা হচ্ছে

(clamp) মধ্যে ঢুকিয়ে স্ক্রুটি (screw) আঁট করে দেওয়া হয়। মোমের খণ্ডের উপরের দিকটা ক্ষুরের সাথে সমান্তরালভাবে থাকা দরকার। কতখানি মোটা সেকশন কাটতে হবে তা মাইক্রন স্কেলে (micron scale) ঠিক করে নেওয়া হয়। সেকশন কাটার জন্য মাইক্রোটোমের চাকা সমানভাবে ঘোরান হয়। রোটারী মাইক্রোটোমের সেকশনগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে একটা ফিতার সৃষ্টি করে। মোম খণ্ডটি ক্ষুরকে স্পর্শ করলে সামান্য উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপের ফলে একটা সেকশন অন্য সেকশনের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। একটা নিডিল দিয়ে ফিতাটিকে আলগা করে ধরে রাখতে হয় যাতে ক্ষুরের সাথে ফিতাটি জড়িয়ে না যায় (চিত্র 16b)। ভালভাবে সেকশন কাটা হলে ফিতাটি সোজা হয়। কিন্তু অনেক সময় বাঁকা ফিতা দেখা যায়। এর প্রধান কারণ হল, মোম খণ্ডের দুই পাশটা সমান্তরাল নয়। বস্তুটি অসমান ঘনত্বযুক্ত হলে কিম্বা মোম সমানভাবে না জমলেও বাঁকা ফিতার সৃষ্টি হতে পারে। কখনও কখনও ফিতাটি লম্বালম্বিভাবে দু'টি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। এর কারণ হল, ক্ষুরে কাটার জায়গায় কোনও খাঁজ রয়েছে, কিম্বা ঐ অঞ্চলে কোনও ছোট শক্ত বস্তু আটকিয়ে রয়েছে। কোনও কোনও সময় ফিতায় পাতলা ও মোটা সেকশন পর্যায়ক্রমে দেখা যায়। ব্লক হোল্ডার কিম্বা ক্ষুরটি আলগাভাবে লাগান হলে এরকম অসুবিধা দেখা দিতে পারে। স্ক্রুগুলি যথাযথভাবে আঁট করে দিয়ে এই অসুবিধা দূর করা যায়। কখনও কখনও

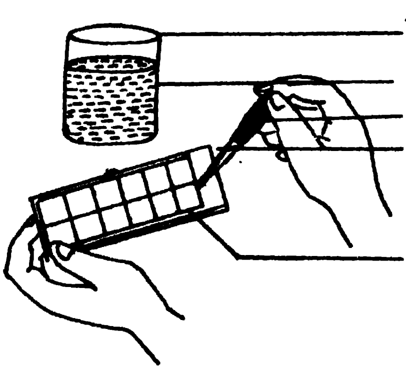
ফিতায় সেকশনগুলি চেপে যায় (compressed)। এই অসুবিধা ক্ষুরটি ভোঁতা হলে দেখা দিতে পারে। কোনও কোনও সময় সেকশনগুলি ফিতা গঠন করতে পারে না।



চিত্র—16d

স্লাইডে ফিতা রাখার পদ্ধতি

মোম খণ্ড বা ব্লকে ব্যবহৃত মোমের গলনাঙ্ক বেশি হলে এরকম হতে পারে। এছাড়া কখনও কখনও দেখা যায় যে, টিস্যু মোমের থেকে আলাদা হয়ে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে।



চিত্র—16e

স্লাইডে ফিতার অংশগুলি যথাযথভাবে সাজান হচ্ছে

এর কারণ হল, ব্লক তৈরির সময় প্যারাফিন বাথে বেশিক্ষণ রাখা হয়েছে, কিম্বা যথাযথভাবে ডিহাইড্রেশন (বা জলহীন) করা হয়নি।

ফিতাগুলি একটা কাগজ বা কার্ডবোর্ডে রাখা হয়। ফিতাটিকে মাপ অনুযায়ী ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা হয় (চিত্র 16c)। পরিষ্কার স্লাইডে এক ফোঁটা Mayer-এর আঠা (adhesive) নিয়ে ঘষে সমস্ত স্লাইডে আঠাটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। স্লাইডে যথেষ্ট জল দেওয়ার পর এক বা একাধিক ফিতা ঐ স্লাইডে রাখা হয় (চিত্র 16d,e)। স্লাইডটি জল সমেত একটা হট প্লেটের উপর অল্পক্ষণ রাখলে ফিতার কোঁচকান অংশ সোজা হয়ে যায়। এবার স্লাইডটি বাঁকা করে অতিরিক্ত জল ফেলে দেওয়া হয়।

মাইক্রোটোমের স্লাইড রঞ্জিত করার আগে জাইলল দিয়ে মোম সরিয়ে ফেলা দরকার। মোম সরাবার জন্য স্লাইডগুলি বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থে নির্দিষ্ট সময় রাখা হয়।

(a) জাইলল (xylol) I-এ	—	30	মিনিট
(b) জাইলল II-এ	—	15	”
(c) জাইলল-অ্যালকোহলে (1: 1)	—	15	”
(d) অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহলে (absolute alcohol)	—	15	”
(e) 95 শতাংশ অ্যালকোহলে	—	15	”
(f) 80 ” ”	—	5	”
(g) 70 ” ”	—	15	”
(h) 50 ” ”	—	5	”
(i) 30 ” ”	—	5	”
(j) জল	—	5	”

অ্যালকোহলে দ্রবীভূত রঞ্জক পদার্থ (stain) ব্যবহার করলে 70% অ্যালকোহল থেকেই স্লাইডটি ঐ রঞ্জক পদার্থে ডুবান হয়। জলীয় রঞ্জক পদার্থ (যেমন, ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট) ব্যবহার করলে স্লাইডটিকে 30% অ্যালকোহল থেকে তুলে রঙ করবার আগে 5 মিনিট জলে রাখা হয়।

সাধারণ মাইক্রোটোম ছাড়াও অন্য মাইক্রোটোম, যেমন ফ্রিজিং (freezing) মাইক্রোটোম বা আলট্রামাইক্রোটোম সূক্ষ্ম সেকশন কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(1) **ফ্রিজিং মাইক্রোটোম** (freezing microtome)— যেসব টিস্যু বরফে নিহিত করা হয়েছে, সেগুলির ফ্রিজিং মাইক্রোটোমের সাহায্যে সেকশন করা হয়। মাইক্রোটোমটি অত্যন্ত শীতল একটি প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। টিস্যুটি একটি মঞ্চে (stage) রেখে, এর উপর জল ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তরল কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। টিস্যুটির চারিদিকে বরফের আস্তরণ গঠিত হয় ও এরপর টিস্যুটির সেকশন কাটা হয়। এই পদ্ধতিতে সজীব (fresh) বা সংরক্ষিত টিস্যু ব্যবহার করা যায়।

(2) আলট্রা-মাইক্রোটোম (ultra-microtome)— ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত পাতলা সেকশন (50-200 mμ) করা দরকার। এরকম সেকশন

কাঁচ বা হীরার ছুরি ব্যবহার করে আলট্রা-মাইক্রোটোমে করা হয়। প্লাস্টিক বা রজনে নিহিত টিস্যুর এভাবে সেকশন করা হয়।

রঞ্জক পদার্থ বা রঙ (stain)

কোষের বিভিন্ন অংশ ভাল করে দেখার জন্য রঙের ব্যবহার করা হয়। রঞ্জক পদার্থে একটি ক্রোমাটোফোর (chromatophore) ও একটি অক্সোক্রোম (auxochrome) গ্রুপ থাকে। ক্রোমাটোফোর গ্রুপের উপস্থিতিতে কোনও বস্তুকে রঙিন দেখায়। কোনও পদার্থে অক্সোক্রোম গ্রুপ উপস্থিত থাকলে, ঐ পদার্থ অন্য পদার্থকে রঞ্জিত করতে পারে। রঙ অ্যাসিড (অম্লধর্মযুক্ত) কিম্বা বেসিক (ক্ষারধর্মযুক্ত) হয়। অ্যাসিড রঙে সাধারণত নাইট্রো ($-NO_2$) বা কুইনোনয়েড গ্রুপ ক্রোমাটোফোর হিসাবে থাকে। বেসিক রঙের ক্রোমাটোফোর হল অ্যাজো ($-N=N$) ও ইন্ডামিন ($-N=$) গ্রুপ। অ্যাসিড রঙের অক্সোক্রোমে সাধারণত হাইড্রোক্সিল ($-OH$) বা কার্বোক্সিল ($-COOH$) কিম্বা সালফোনিক ($-SO_3H$) গ্রুপ থাকে। বেসিক রঙের অক্সোক্রোম হল অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$)। অ্যাসিড ও বেসিক রঙ ছাড়া কিছু নিরপেক্ষ (neutral) রঙ আছে। এই সব রঙে অম্ল (অ্যাসিড) ও ক্ষার (বেসিক) উভয় ধর্মই দেখা যায়। সাধারণত রঙ কোষের প্রোটিন অংশকে রঞ্জিত করে। তবে কিছু নির্দিষ্ট রঙ আছে যা কোষের বিশেষ অংশকে রঞ্জিত করে। যেমন, ফালগেন (feulgen) রঙ DNA-কে রঞ্জিত করে। কোনও কোনও রঙ ব্যবহার করবার সময় মরড্যান্টের (mordant) দরকার হয়। হেমোটোক্সিলিন (hematoxylin) এই ধরনের রঙ। যেসব রঙ ব্যবহার করবার সময় মরড্যান্টের দরকার হয় না, তাদের প্রত্যক্ষ রঙ (direct stain) বলে। কারমিন, অরসিন, মিথিলিন ব্লু ইত্যাদি প্রত্যক্ষ রঙ।

কোনও কোনও বেসিক রঙ কোষের বিভিন্ন অংশকে ভিন্ন ভিন্নভাবে রঞ্জিত করে। এদের মেটাক্রোমেসিয়া (metachromasia) বলে। টোলুইডিন ব্লু, থায়োনিন, অ্যাজ্যার A (azure A) ইত্যাদি এরকম রঙ। টোলুইডিন ব্লু নিউক্লিয়াসকে নীলাভ সবুজ এবং সাইটোপ্লাজমকে গোলাপী বা পারপেল বর্ণে রঞ্জিত করে।

রঙ বিভিন্ন কারণে ব্যবহার করা হয়। খুব ছোট স্বচ্ছ বস্তুর আকার, আয়তন ও গঠন দেখবার জন্য রঙের প্রয়োজন। কোনও বস্তুর একটা অংশ থেকে আরেকটা অংশ আলাদাভাবে বুঝবার জন্যও রঙ করা হয়। এছাড়া রঙ নেবার ক্ষমতা থেকে কোনও পদার্থের উপস্থিতি বোঝা যায়।

কয়েকটি বেশি ব্যবহৃত রঙের বিবরণ দেওয়া হল।

(i) কারমিন (carmine) — কারমিন একটি লাল রঙ, যা দিয়ে ক্রোমোসোম ও নিউক্লিয়াসকে রঞ্জিত করা হয়। কারমিনিক অ্যাসিডের (carminic acid) উপস্থিতির জন্যই কারমিন রঙ হিসাবে কাজ করতে পারে। কারমিনিক অ্যাসিডের ($C_{22}H_{20}O_{18}$) আনবিক ওজন হল 492.38। *Coccus cacti* নামের পতঙ্গের দেহ থেকে কারমিন

তৈরি করা হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ক্যাকটাসে এই পতঙ্গ আক্রমণ করে। স্ত্রী C. cacti-র শুকনো দেহ ছেঁচে জল দিয়ে রস বের করা হয়। এই রসকে কচিনিয়েল (cochineal) *বলে। কচিনিয়েলকে অ্যালুমিনিয়াম বা ক্যালসিয়ামযুক্ত পদার্থের সাথে* মিশালে কারমিন তৈরি হয়। Parkin 1856 খ্রিস্টাব্দে প্রথম কারমিন ব্যবহার করেন। কারমিনে সামান্য ফেরিক অ্যাসিটেট (ferric acetate) বা ফেরিক ক্লোরাইড (ferric chloride) দিলে ক্রোমোসোমগুলি গাঢ় রঙ নেয়।

(2) **অরসিন (orcein)** — অরসিনের আণবিক ওজন 500.48 ও এর সংকেত (formula) হল $C_{28}H_{24}N_2O_7$। অরসিন অরসিনল (orceinol) থেকে তৈরি হয়। অরসিনলের আণবিক ওজন ও সংকেত যথাক্রমে 160.166 এবং $C_7H_8O_2$। লাইকেন *Lacanora parella* ও *Rocella tinctoria* থেকে অরসিনল তৈরি হয়। তবে কৃত্রিম উপায়েও অরসিনল তৈরি করা যায়। অরসিনল বর্ণহীন। হাইড্রোজেন পারক্সাইড ও অ্যামোনিয়ার প্রভাবে এর থেকে অরসিন তৈরি হয়। La Cour (1941) অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে অরসিন ক্রোমোসোম রঙ করবার জন্য প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। অরসিন অ্যাসিড ও বেসিক রঙ হিসাবে কাজ করতে পারে। অরসিন ক্রোমোসোমের প্রোটিন অংশকেই রঞ্জিত করে বলে মনে করা হয়। প্রোটিনের পেপটাইড লিঙ্কেজের (CO–NH) অ্যামিনো গ্রুপের সাথে অরসিনের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের বিক্রিয়ার ফলে এক অণু জল বের হয় ও ক্রোমোসোমটি রঙিন দেখায়।

(3) **ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট (crystal violet)** — ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট একটি নীলাভ বেগুনি ক্ষারধর্মী (basic) রঙ। এর সঙ্কেত ও আনবিক ওজন যথাক্রমে $C_{25}H_{30}N_3Cl$ ও 407.97। রাসায়নিকভাবে এটি হেক্সামিথাইল প্যারারোসানিলিন (hexamethyl pararosaniline)। ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেটের বিভিন্ন নাম আছে যেমন— মিথাইল ভায়োলেট (methyl violet), 10B হেক্সামিথাইল ভায়োলেট (hexamethyl violet) এবং জেনসিয়ান ভায়োলেট (gentian violet) ইত্যাদি। আমেরিকার জেনসিয়ান ভায়োলেট ও ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট এক। কিন্তু অন্য জেনসিয়ান ভায়োলেটে ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেটের চেয়ে দুইটি CH_3 গ্রুপ কম থাকে। Newton ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট আয়োডিন মরড্যান্টের সাথে ক্রোমোসোম দেখবার জন্য প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।

(4) **হেমাটোক্সিলিন (hematoxylin)** — হেমাটোক্সিলিন *Hematoxylin campechianum* (Leguminosae, গোত্রের উদ্ভিদ) থেকে পাওয়া যায়। এই উদ্ভিদ প্রধানত মেক্সিকো ও অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে পাওয়া যায়। *Hematoxylin campechianum*-এর কাঠের টুকরো জলে সেদ্ধ করার পর বাষ্পীভবন করে জলটি শুকিয়ে ফেলা হয়। শুষ্ক তলানিতে জল দিয়ে তলানি দ্রবীভূত করা হয়। এই তরল পদার্থকে ফিলটার করে রেখে দিলে জলীয় দ্রবণ থেকে কেলাসগুলি আলাদা হয়ে যায়। হেমাটোক্সিলিনের রঙ করবার ক্ষমতা নেই। হেমাটোক্সিলিন অক্সিজেনের সাহায্যে

জারিত হলে হেমাটিনে (haematin) পরিবর্তিত হয়। হেমাটিনের রঙ লালচে হলুদ ও এটি মরড্যান্টের সাথে রঙ করবার জন্য ব্যবহৃত হয়। হেমাটোক্সিলিনকে হেমাটিনে পরিবর্তিত করবার জন্য মাসাধিক কাল বাতাসের সংস্পর্শে রেখে দিতে হয়। তবে সামান্য পরিমাণ হাইড্রোজেন পারক্সাইড বা সোডিয়াম আয়োডেট দিলে এই পরিবর্তন দ্রুততর হয়। কিন্তু হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2) দিলে বেশি জারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। Johanson (1940) ও Emig (1941) ক্রোমোসোম রঙ করবার জন্য হেমাটোক্সিলিন ব্যবহার করেছিলেন। তারা ফেরিক অ্যালুমিনিয়াম সালফেট (ferric aluminium sulphate) মরড্যান্ট (mordant) হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়া পটাশ অ্যালামও (potash alum) মরড্যান্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 1892 খ্রিস্টাব্দে ক্রোমোসোম রঙ করবার জন্য Heidenhein প্রথম আয়রন হেমাটোক্সিলিন প্রয়োগ করেছিলেন। এই রঙ দিয়ে রঞ্জিত নিউক্লিয়াস কালো দেখায়।

(5) বেসিক **ফুকসিন (basic fuchsin)** — ফুকসিন ট্রাইফিনাইল মিথেন (triphenyl methane) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হালকা লাল রঙ। প্যারারোসানিলিন (pararosaniline), রোসানিলিন (rosaniline) ও ম্যাজেন্টা II (magenta II) মিলিত হয়ে বেসিক ফুকসিন তৈরি করে। এই তিনটি পদার্থই স্নেহ দ্রব্যে (fat) দ্রবীভূত হয়। প্যারারোসানিলিন, রোসানিলিন ও মেজেন্টা দুইয়ের আণবিক ওজন যথাক্রমে হল 328.815, 337.841 এবং 365.893। বেসিক ফুকসিনের সাথে সালফিউরাস অ্যাসিড মিশালে বর্ণহীন ফালগেন রঙ (feulgen stain) তৈরি হয়। কয়েক সিঃ সিঃ অ্যানিলিনের সাথে প্যারাটোলুইডিনের (paratoluidin) কয়েকটি ক্রিস্ট্যাল (কেলাস) ও মারকিউরাস ক্লোরাইড দিয়ে ওই মিশ্রণকে ফুটিয়ে তারপর 70% অ্যালকোহলে ঢেলে বেসিক ফুকসিন তৈরি করা হয়।

মরড্যান্ট (mordant)

মরড্যান্ট রঙের সাথে মিলিত হয়ে একটা অদ্রবণীয় পদার্থ গঠন করে ও কোষে রঙকে স্থায়ী করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন পদার্থ মরড্যান্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট (crystal violet), মিথাইল ভায়োলেট (methyl violet) ইত্যাদির জন্য আয়োডিন (iodine) ও পিকরিক অ্যাসিড (picric acid) মরড্যান্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া অন্যান্য কতকগুলি মরড্যান্ট হল— 4% অ্যামোনিয়াম ক্রোমেট (ammonium chromate), 3% অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেট (ammonium dichromate), 3—4% অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (aluminium hydroxide) বা অ্যালুমিনিয়াম পটাশিয়াম সালফেট (aluminium potassium sulphate), 1% পটাশিয়াম পারমাঙ্গেনেট (potassium permanganate), ট্যানিক অ্যাসিড (tannic acid) ইত্যাদি। এইসব মরড্যান্ট সাধারণত 5–10 মিনিট ধরে ব্যবহার করা হয়। পরে অতিরিক্ত মরড্যান্ট জলে ধুয়ে ফেলা হয়। বেসিক বা

ক্ষারধর্মযুক্ত রঙের জন্য অম্লধর্মযুক্ত মরড্যান্ট এবং বেশিরভাগ অম্লধর্মযুক্ত রঙের জন্য সামান্য বেসিক বা ক্ষারধর্মযুক্ত মরড্যান্ট ব্যবহার করা হয়। অম্লধর্মযুক্ত রঙের জন্য 2% – 4% বেরিয়াম ক্লোরাইড (barium chloride) ও ক্ষারধর্মযুক্ত রঙের জন্য 4% সিলিকোটাঙ্গস্টিক অ্যাসিড (*silicotangstic acid*) ব্যবহৃত হয়।

রঞ্জিতকরণ (staining)

কোনও বস্তুকে রঙের সাহায্যে রঞ্জিত করাকে রঞ্জিতকরণ বলে। কেবল একটি রঙের সাহায্যে কোনও বস্তুকে রঙ করাকে সাধারণ রঞ্জিতকরণ এবং একাধিক রঙ ব্যবহার করে রঞ্জিত করাকে পার্থক্যমূলক রঞ্জিতকরণ (differential staining) বলে। এখানে রঞ্জিতকরণের কতকগুলি পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হল।

(1) ফালগেন পদ্ধতি (Feulgen technique)— Feulgen ও Rossenbeck (1924) এই পদ্ধতি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। ফালগেন রঙ দিয়ে কেবল ডি এন এ-কে রঞ্জিত করা যায়। সেজন্য কোথাও ডি এন এ-র উপস্থিতি জানবার জন্য ফালগেন রঙের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

[**ফালগেন দ্রবণের প্রস্তুতিকরণ**—ফুটন্ত 100 সিঃ সিঃ পাতিত (distilled) জলে আস্তে আস্তে 0.5 গ্রাম বেসিক ফুকসিন (basic fuchsin) ঢেলে আগুন থেকে পাত্রটা সরিয়ে ফেলা হয়। দ্রবণটি 58°C তাপমাত্রায় ফিলটার করে রেফ্রিজারেটারে রেখে দেওয়া হয় এবং এটি ঠাণ্ডা হয়ে 26°C তাপমাত্রায় আসলে 10 সিঃ সিঃ HCl দেওয়া হয়। পরে 0.5 গ্রাম পটাশিয়াম মেটাবাইসালফাইট (potassium metabisulphite) দেওয়া হয়। এবার এই দ্রবণযুক্ত ফ্লাস্কটি ভাল করে বন্ধ করে মোম দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। ফ্লাস্কটি কালো কাগজ দিয়ে মুড়ে ঠাণ্ডা শুকনো জায়গায় সারারাত্রি রেখে দেওয়ার পরের দিন সামান্য পটাশিয়াম মেটাবাইসালফাইট দিলে ফুকসিন রঙটি সালফার ডাইঅক্সাইডের (sulpher dioxide) প্রভাবে বর্ণহীন ফুকসিন সালফিউরাস অ্যাসিড বা ফালগেন দ্রবণে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু পটাশিয়াম মেটাবাইসালফাইট দিয়েও দ্রবণটা বর্ণহীন না হলে 1 গ্রাম অ্যাকটিভেটেড চারকোল (activated charcoal) দিয়ে ভাল করে ঝাঁকে ফিলটার বা পরিশ্রুত করলেই দ্রবণটি বর্ণহীন হয়ে যায়।]

ফালগেন দ্রবণ ব্যবহার করে ক্রোমোসোমকে রঞ্জিত করার পদ্ধতি— নতুন মূলের আগাগুলি অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইথাইল অ্যালকোহল মিশ্রণে (1:2) 30 থেকে 45 মিনিট ফিক্স করা হয়। এরপর 45% অ্যাসিটিক অ্যাসিডে 5–10 মিনিট রাখা হয়। N HCl-এ 56°C তাপমাত্রায় 12 মিনিট রেখে হাইড্রোলাইসিস (hydrolysis) করার পর, জলে ধুয়ে ফেলা হয়। তারপর ফালগেন দ্রবণে আধ থেকে দেড় ঘণ্টা রাখা হয়।

মূলতত্ত্ব— ফালগেন দ্রবণ দিয়ে রঞ্জিতকরণ অ্যালডিহাইডের (aldehyde) 'শিফের' বিক্রিয়ার (Schiff's reaction) ওপর প্রতিষ্ঠিত। মূলগুলি N HCl (নরম্যাল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড) দিয়ে হাইড্রোলাইসিস করলে পিউরিন বেসগুলি

(purine base) শর্করা থেকে আলাদা হয়ে যায় ও এর ফলে অ্যালডিহাইড গ্রুপ (CHO) মুক্ত হয়। এই অ্যালডিহাইড ও ফুকসিন সালফিউরাস অ্যাসিডের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে রঙের সৃষ্টি হয়। Lea ও Stacy (1949) বলেন যে, এইভাবে বিক্রিয়া হয় না। প্রাণীতে তাঁরা দেখতে পান যে, কম সময় ধরে হাইড্রোলাইসিস করলে ক্রোমোসোমগুলি রঙ নিলেও কোনও মুক্ত বেস পাওয়া যায় না। কিন্তু বেশি সময় ধরে হাইড্রোলাইসিস করলে ক্রোমোসোমগুলি গাঢ় রঙ নেয় ও মুক্ত বেস পাওয়া যায়। Lea ও Stacy বলেন যে, ফালগেন বিক্রিয়া দুইটি ধাপে হয়। প্রথম ধাপে নিউক্লিওটাইডের মধ্যবর্তী সংযোগ ভেঙে যায় এবং শর্করার অ্যালডিহাইড গ্রুপ ও ফালগেন রঙের মধ্যে বিক্রিয়া হয়। দ্বিতীয় ধাপে অনেকক্ষণ হাইড্রোলাইসিসের ফলে বেসগুলি মুক্ত হয়। আরও অ্যালডিহাইড গ্রুপ ও ফালগেনের মধ্যে বিক্রিয়া হয় ও রঙটি গাঢ় দেখায়। সুতরাং, Lea ও Stacy-র মতে, ফালগেন দ্রবণ দিয়ে রঞ্জিত-করণের মৌলিক তথ্য বেশ জটিল। Stedman ও Stedman বলেন যে, হাইড্রোলাইসিসের পর ফালগেন দ্রবণ দিলে নিউক্লিওপ্লাজমে বিক্রিয়া হয়। এই বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট রঞ্জক পদার্থ ক্রোমোসোমের ত্বকে সঞ্চিত হয়। কিন্তু পরে Dannielli বলেন যে, ফালগেন বিক্রিয়া যথাযথভাবে হলে কেবল ক্রোমোসোমই রঞ্জিত হয় এবং অন্যান্য অংশ সম্পূর্ণভাবে বর্ণহীন থাকে। এর থেকেই ফালগেন পরীক্ষার বৈধতা প্রমাণিত হয়। হাইড্রোলাইসিস কম সময় ধরে করলে সাইটোপ্লাজমটি কিছু পরিমাণে রঞ্জিত দেখায় কারণ, কম সময় হাইড্রোলাইসিস করে সাইটোপ্লাজমের সব মুক্ত অ্যালডিহাইড দূর করা যায় না। আবার বেশিক্ষণ ধরে হাইড্রোলাইসিস করলে সাইটোপ্লাজমটি রঞ্জিত দেখায় কারণ, এর ফলে সম্পূর্ণ নিউক্লিওটাইড প্রোটিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই মুক্ত নিউক্লিওটাইড সাইটোপ্লাজমে আসে ও ঐখানে ফালগেন দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া হয়।

(2) **অরসিনের সাহায্যে ক্রোমোসোমকে রঞ্জিত করার পদ্ধতি**— নতুন, সতেজ মূলের আগাগুলি কেটে জলে ধুয়ে প্রি-ট্রিটমেন্ট (pre-treatment) করা হয়। বিভিন্ন পদার্থ, যেমন— প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন (P.D.B), এসকুলিন (aesculine), অক্সিকুইনোলিন (oxyquinoline), কলচিসিন (colchicine) ইত্যাদি প্রি-ট্রিটমেন্ট করবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কোন উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে প্রি-ট্রিটমেন্টের জন্য কোন পদার্থ ব্যবহার করা হবে তা নির্বাচিত করা হয়। এছাড়া কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় ও কতক্ষণ ধরে প্রি-ট্রিটমেন্ট করা হবে তা নির্দিষ্ট উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে। এইজন্য বারবার পরীক্ষা করে কোনও উদ্ভিদের জন্য যথাযথ প্রি-ট্রিটমেন্ট করবার পদার্থ নির্বাচিত করতে হয়। অনেক সময় ক্রোমোসোম খুব ছোট ও অসংখ্য হলে ছড়ান মেটাফেজ প্লেট (plate) পাওয়া যায় না, সেজন্য কখনো কখনো 0.01% কলচিসিনে মূলের অগ্রভাগ তিন ঘণ্টার চেয়ে কম সময় রাখা হয়। এছাড়া হঠাৎ ঠাণ্ডা প্রয়োগ করেও মেটাফেজে ক্রোমোসোমগুলি ছড়ান অবস্থায়

দেখা যায়। পাতায় বেশি হারে মেটাফেজ প্লেট পাওয়ার জন্য অনেক সময় অগ্র মুকুল কেটে 0.2% কলচিসিনে 1-2 ঘণ্টা রাখা হয় (Meyer 1943)। প্রি-ট্রিটমেন্টের পর মূলগুলি জলে ধুয়ে অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের মিশ্রণে (1:2) ফিক্স করা হয়ে থাকে। এরপর মূলগুলি অরসিন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে (2% অ্যাসিটো অরসিন ও নরম্যাল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড 9 : 1 অনুপাতে) 5 থেকে 10 সেকেন্ড সামান্য গরম করা হয়। এই মিশ্রণে মূলগুলি এক ঘণ্টা বা বেশি সময় রেখে 45 শতাংশ অ্যাসিটিক অ্যাসিডে স্কোয়াশ করা হয়।

[**অ্যাসিটো অরসিন তৈরি করার পদ্ধতি**— 100 সিঃ সিঃ 45 শতাংশ অ্যাসিটিক অ্যাসিডে 2 গ্রাম অরসিন দ্রবীভূত করে, ওই দ্রবণকে ফিলটার করে 2% অ্যাসিটো অরসিন তৈরি করা হয়।]

মাইক্রোটোমের সাহায্যে কাটা সেকশন বিভিন্ন পদ্ধতিতে রঙ করা হয়।

(3) **ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট (crystal violet) পদ্ধতি**— Newton (1927) এই পদ্ধতি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।

[**ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট তৈরি করার পদ্ধতি**— এক গ্রাম ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট 100 সিঃ সিঃ পাতিত গরম জলে ঢেলে তারপর ফিলটার করে ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট তৈরি করা হয়। মরড্যান্ট হিসাবে পটাশিয়াম আয়োডাইড ও আয়োডিন ব্যবহার করা হয়। 80% অ্যালকোহলে এক গ্রাম পটাশিয়াম আয়োডাইড (KI) এবং এক গ্রাম আয়োডিন দ্রবীভূত করে মরড্যান্ট তৈরি করা হয়।]

ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট পদ্ধতিতে রঙ করলে ক্রোমোসোমগুলি রঙ নেয় এবং সাইটোপ্লাজম স্বচ্ছ দেখায়। স্লাইডগুলিকে মোম সরাবার পর জল থেকে তুলে নিচের বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন তরল পদার্থে নির্দিষ্ট সময় রাখা হয়।

(a)	ক্রিস্টাল ভায়োলেট দ্রবণ	—	20 মিনিট বা বেশি
(b)	জলে ধোয়া হয়		
(c)	পটাসিয়াম আয়োডাইড আয়োডিন দ্রবণ	—	45 সেকেন্ড
(d)	অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল I	—	3–4 বার ডুবান হয়
(e)	" " II	—	" " "
(f)	" " III	—	" " "
(g)	ক্লোভ অয়েল দিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে স্লাইডগুলি বাছা হয়।		
(h)	ক্লোভ অয়েল II	—	5 মিনিট
(i)	জাইলল I	—	20 - 30 মিনিট
(j)	জাইলল II	—	30 মিনিট
(k)	জাইলল III	—	30 মিনিট
(l)	কানাডা বালসাম দিয়ে কভার স্লিপ চাপা দেওয়া হয়।		

কানাডা বালসাম মাধ্যম অম্ল হওয়ায় ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেটে রঞ্জিত ক্রোমোসোমের

রঙ কিছুদিন রাখলে হালকা হয়ে যায়। Smith-এর (1934) মতে, রঙ করার পর স্লাইডটি অ্যালকোহলে সংপৃক্ত (saturated) পিকরিক অ্যাসিডে ডুবালে ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেটের রঙ স্থায়ী হয়।

(4) Kaufmann-এর আয়রন-হেমাটোক্সিলিন পদ্ধতি — স্মিয়ার করার পর নাভাসিন (Navaschin) দ্রবণ বা ক্রোমো-অসমোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডে ফিক্স করা হয়। স্লাইডগুলি জলে ধোয়ার পর নিচের তরল পদার্থগুলিতে নির্দিষ্ট সময় রেখে রঞ্জিত করা হয়।

(a) 2% ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেটে এক ঘণ্টা রাখা হয়
(b) প্রবহণশীল জলে ধোয়া হয়।
(c) 0.5% হেমাটোক্সিলিনে এক ঘণ্টা বা তার চেয়ে বেশি সময় রঙ করা হয়।
(d) জলে ধোয়া হয়।
(e) 2% ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেটে অতিরিক্ত রঙটি ধুয়ে ফেলা হয়।
(f) প্রবহণশীল জলে দেড় ঘণ্টা ধোয়া হয়।

(g)	30%	অ্যালকোহলে	—	2–3	মিনিট	রাখা	হয়
(h)	50%	”	—	5	”	”	”
(i)	70%	”	—	5	”	”	”
(j)	80%	”	—	5	”	”	”
(k)	90%	”	—	5	”	”	”
(l)	অ্যাবসোলিউট	”	—	5	”	”	”
(m)	অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল, জাইললে (3:1)		—	5	”	”	”
(n)	” ” ” (1:1)		—	5	”	”	”
(o)	” ” ” (1:3)		—	5	”	”	”
(p)	বিশুদ্ধ জাইললে		—	5–10	”	”	”

(q) কানাডা বালসাম দিয়ে কভার স্লিপ চাপা দেওয়া হয়।

(5) লাইট গ্রিনের (Light green) সাথে ফালগেন পদ্ধতি— ফালগেন দ্রবণে 45 মিনিট থেকে 1 ঘণ্টা রঙ করার পর নিচের বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন পদার্থে রাখা হয়।

(a)	30	শতাংশ	অ্যালকোহলে	—	5	মিনিট	রাখা	হয়
(b)	50	”	”	—	5	”	”	”
(c)	70	”	”	—	5	”	”	”
(d)	80	”	”	—	5	”	”	”

(e) 80 শতাংশ অ্যালকোহলে সোডিয়াম কার্বোনেটের সংপৃক্ত (saturated) দ্রবণে এক ঘণ্টা রাখা হয়।

(f) 80 শতাংশ অ্যালকোহল 1-এ — এক সেকেন্ড রাখা হয়
(g) 80 শতাংশ অ্যালকোহল 11-এ — " " " "
(h) " " " III-এ — " " " "
(i) লাইট গ্রীনের দ্রবণে আধ ঘণ্টা বা বেশি সময় রাখা হয়।
(100 সিঃ সিঃ 95 শতাংশ অ্যালকোহলে 0.5 গ্রাম লাইট গ্রীন দিয়ে এই দ্রবণ তৈরি করা হয়।)
(j) 80 শতাংশ অ্যালকোহল ও সোডিয়াম কার্বোনেটের সংপৃক্ত দ্রবণে (1: 1) তিন মিনিট রেখে অতিরিক্ত রঙটি ধুয়ে ফেলা হয়।
(k) 95% অ্যালকোহলে — 5 মিনিট রাখা হয়।
(l) অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহলে —5—10 " " "
(m) অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল ও জাইললে (1 : 1) — 5 " " "
(n) অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল ও জাইললে (1 : 3) — 5 " " "
(o) বিশুদ্ধ জাইললে — 5 " " "
(p) বালসাম দিয়ে কভার স্লিপ চাপা দেওয়া হয়।

(6) **পাইরোনিন (pyronine) ও মিথাইল গ্রীন (methyl green) পদ্ধতি**— Unna এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। পাইরোনিনের 2% জলীয় (aqueous) দ্রবণ ও মিথাইল গ্রীনের 2% জলীয় দ্রবণ 12.5 : 7.5 অনুপাতে মিশিয়ে পাইরোনিন ও মিথাইল গ্রীন দ্রবণ তৈরি করা হয়। নিচের পদ্ধতি অনুযায়ী কোষগুলি রঞ্জিত করা হয়।
(a) পাইরোনিন ও মিথাইল গ্রীন দ্রবণে 10 মিনিট রাখা হয়।
(b) ইথাইল অ্যালকোহল ও বিউটাইল (butyl) অ্যালকোহলের মিশ্রণে (1:1) রাখা হয়।
(c) বিউটাইল অ্যালকোহল 1-এ — 5 মিনিট রাখা হয়।
(d) বিশুদ্ধ ক্লোরোফর্মে — 3–5 " " "
(e) বিউটাইল অ্যালকোহল 11-এ — 5–10 " " "
(f) বিশুদ্ধ জাইললে — 5 " " "
(g) কানাডা বালসামে মাউন্ট করা হয়।

পাইরোনিন ও মিথাইল গ্রীন দিয়ে রঞ্জিত কোষে ক্রোমাটিন সবুজ রঙের ও সাইটোপ্লাজম লাল দেখায়। সাইটোপ্লাজমের RNA এবং নিউক্লিয়াসের নিউক্লিক অ্যাসিডের পরিমাণের ওপর যথাক্রমে লাল ও সবুজ রঙের গাঢ়তা নির্ভর করে।

(7) **টোলুইডিন ব্লু (toluidine blue) পদ্ধতি**— টোলুইডিন ব্লু DNA ও RNA-কে

ভিন্ন ভিন্নভাবে রঞ্জিত করে। এর প্রভাবে DNA নীলচে সবুজ ও RNA গাঢ় বেগুনী বর্ণের দেখায়। নিউক্লিয়াস নীলচে সবুজ হয় ও এর থেকে DNA-র উপস্থিতি বোঝা যায়। সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিও পর্দা গাঢ় বেগুনী বর্ণের হয়। এর থেকে ঐসব অঞ্চলে RNA-র উপস্থিতি বোঝা যায়।

স্লাইডের সেকশনগুলি নিচের পদ্ধতি অনুযায়ী রঞ্জিত করা হয়।

(a) mallivine বাফারে pH 4-এ 37°C তাপমাত্রায় স্লাইডগুলি তিন মিনিট রাখা হয়।

(b) সেকশনগুলি পরিস্রুত জলে ধোওয়া হয়।

(c) টলুইডিন ব্লুতে 37°C তাপমাত্রায় 15 মিনিট রাখা হয়।

(d) পরিশ্রুত জলে ধোওয়া হয়।

(e) টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহলে 12-14 ঘণ্টা রাখা হয়।

(f) জাইললে রাখা হয়।

(g) কানাডা বালসামে মাউন্ট করা হয়। Mallivine বাফারে স্লাইড রাখার সময়, তাপমাত্রা, pH ইত্যাদি যথাযথ হওয়া দরকার। এর কোনোটার পরিবর্তন হলে, রঞ্জিতকরণের বিক্রিয়ারও পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

কোষস্থ বিভিন্ন পদার্থের রঞ্জিতকরণ

(1) **প্রোটিনের রঞ্জিতকরণ**— কোষে দুই রকম প্রোটিন আছে— অম্লধর্মী ও ক্ষারধর্মী। এই দুই রকম প্রোটিন একই বস্তুতে থাকতে পারে, তখন তাকে সম্পূর্ণ প্রোটিন বলে।

(a) ফাস্ট গ্রীন (fast green) সম্পূর্ণ প্রোটিন এবং ক্ষারধর্মী বেসিক প্রোটিনকে রঞ্জিত করতে পারে। ফাস্ট গ্রীন হল, প্যারাডাইবেনজাইল ডাইইথাইল ডাইঅ্যামিন প্যারাহাইড্রক্সি ট্রাইফিনাইল ট্রাইসালফনিক অ্যাসিড অ্যালডিহাইডের ডাইসোডিয়াম-যুক্ত লবণ। এছাড়া প্রোটিনের জন্য অন্যান্য রঞ্জক পদার্থও ব্যবহার করা হয়।

(b) ডায়াজোনিয়াম হাইড্রক্সাইড (diazonium hydroxide), হিস্টিডিন, টাইরোসিন ও ট্রিপ্টোফেনকে রঞ্জিত করে।

(c) Million এর রিএজেন্ট— এই রঞ্জকটি হল নাইট্রাস মারকিউরিক পদার্থ। এটি টাইরোসিনকে রঞ্জিত করে ও লোহিত বর্ণের অধঃক্ষেপের সৃষ্টি করে।

(d) মারকিউরি (mercury) অরেঞ্জ— এই রঙ সালফাহাইড্রেল গ্রুপযুক্ত প্রোটিনকে রঞ্জিত করে।

(e) Sakaguchi রিএজেন্ট— এই রঞ্জক পদার্থ হল ন্যাপথল α-ন্যাপথল ও সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইটের ক্ষারধর্মী মিশ্রণ। এই রঞ্জক পদার্থ আর্জিনিনকে রঞ্জিত করে।

(2) **লিপিডের রঞ্জিতকরণ**— ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয় রঞ্জক পদার্থের

সাহায্যে লিপিড রঞ্জিত করা হয়। সুদান ব্ল্যাক B হল এরকম একটি বহুল ব্যবহৃত রঞ্জক পদার্থ। এটি ফসফোলিপিড ও গলগি বস্তুকে রঞ্জিত করে। এছাড়া সুদান রেড ও অসমিয়াম টেট্রাঅক্সাইডও লিপিড রঞ্জিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(3) **কার্বোহাইড্রেটের রঞ্জিতকরণ**— *স্টার্চ, সেলুলোজ, কাইটিন ইত্যাদি* Schiff-এর রিএজেন্টের সাহায্যে রঞ্জিত করা হয়।

সজীব কোষের রঞ্জিতকরণ (vital staining)

সজীব কোষকে রঞ্জিত করার পদ্ধতিকে ভাইট্যাল স্টেইনিং বলে। যেসব রঞ্জক পদার্থ সজীব কোষকে রঞ্জিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাদের ভাইট্যাল স্টেইন বলে। এই রঙগুলি হল, জেইন্যাস গ্রীন-B (Janus green B), নিউট্রাল রেড, মিথিলিন ব্লু, ট্রাইপান ব্লু ইত্যাদি। জেইন্যাস গ্রীন-B মাইটোকন্ড্রিয়াকে রঞ্জিত করে, নিউট্রাল রেড উদ্ভিদ কোষের ভ্যাকুওলকে এবং মিথিলিন ব্লু বিভাজনশীল কোষকে রঞ্জিত করে। সজীব কোষকে রঞ্জিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কখনও কখনও সজীব কোষকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তারপর রঞ্জক পদার্থে রাখা হয়। এই পদ্ধতিকে সুপ্রাভাইট্যাল (supravital) রঞ্জিতকরণ বলে। যদি রঞ্জক পদার্থ সজীব জীব দেহে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করান হয়, তাহলে এই পদ্ধতিকে ইন্ট্রাভাইট্যাল (intravital) রঞ্জিতকরণ বলা হয়।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষার জন্য রঞ্জিতকরণ

সাধারণত ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষার জন্য রঞ্জিতকরণের প্রয়োজন হয় না। কারণ, প্রতিবিম্বটির আলোকচিত্র সাদা ও কালোতে তোলা হয়। তবে কনট্রাস্ট বা বৈষম্য বাড়াবার জন্য কতকগুলি পদ্ধতি রয়েছে।

(1) **'ইলেকট্রন রঞ্জিতকরণ'**— অসমিয়াম টেট্রাঅক্সাইড, সীসা বা ইউরানিলের (uranyl) ভারী পরমাণুগুলি ইলেকট্রনের সাথে নির্বাচিতভাবে মিলিত হতে পারে। এর ফলে কোষের কোনও কোনও অঞ্চল গাঢ় দেখায়। এজন্য এইসব পদার্থ 'ইলেকট্রন রঞ্জিতকরণে'র জন্য ব্যবহৃত হয়।

(2) **ভারী ধাতুর ছায়া নিক্ষেপণ** (heavy metal shadow casting)— এই পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য বস্তুর একদিকে ভারী ধাতু যেমন, ক্রোমিয়াম, প্ল্যাটিনাম, প্যালাডিয়াম কিম্বা ইউরেনিয়ামের বাষ্প সঞ্চিত হয় ও অন্যদিকে ছায়া পড়ে।

(3) **নেগেটিভ রঞ্জিতকরণ**— ভাইরাস কিম্বা বড় অণু ঘন ইলেকট্রন (electron dense) মাধ্যমে (যেমন, ফসফোটাঙ্গস্টেন) নিহিত করা হয়। ঘন মাধ্যমটি অণুগুলির মধ্যবর্তী সব ফাঁকা জায়গায় প্রবেশ করে ও ঐসব অঞ্চল গাঢ় দেখায়। কিন্তু অণুগুলি স্বচ্ছ দেখায়।

অটোরেডিওগ্রাফী (autoradiography)

কোষের মধ্যে তেজস্ক্রিয় (radioactive) পদার্থের উপস্থিতি অলোকচিত্রের সাহায্যে নির্ধারণ করাই হল অটোরেডিওগ্রাফী। নির্দিষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থ কোষে প্রবেশ করিয়ে কোষের কোন অংশ এই পদার্থ গ্রহণ করছে তা অটোরেডিওগ্রাফীর সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। তেজস্ক্রিয় সাইটিডিন (cytidin) কোষে প্রবেশ করালে আর এন এ এবং ডি এন এ-তে তেজস্ক্রিয়তা দেখা যায়। এর থেকে বলা যায় যে, ডি এন এ ও আর এন এ উৎপাদনে সাইটিডিনের প্রয়োজন হয়।

বিকিরণের উৎস হিসাবে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। যেমন, হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ট্রিটিয়াম (H_3) সাইটোলজির পরীক্ষায় DNA-র স্বজনন বোঝার জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া S^{35}, C^{14}, P^{32}, I^{131}, Fe^{59}, K^{42} ইত্যাদি বিভিন্ন পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়।

মৌলিক পদার্থ	আইসোটোপ	ব্যবহার
কার্বন	C^{14}	পুষ্টিসাধনকারী কোনও পদার্থের বা ভেষজের পরিণতি দেখার জন্য প্রয়োজন হয়।
সালফার	S^{35}	অ্যামিনো অ্যাসিড সংক্রান্ত পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়।
ফসফরাস	P^{32}	লোহিত কণিকার উৎপাদন সংক্রান্ত পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়।
হাইড্রোজেন	H^3	DNA-র স্বজনন বোঝার জন্য সাইটোলজিয় পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়।
লোহা	Fe^{59}	লোহার বিপাকে ব্যবহৃত হয়।
পটাশিয়াম	K^{42}	কোষ পর্দার ভেদ্যতা সংক্রান্ত পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়।

মৌলিক পদার্থ	*আইসোটোপ*	*ব্যবহার*
সোডিয়াম	Na^{24}	*সোডিয়াম স্থানান্তরণের হার নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।*
স্ট্রনটিয়াম	Sr^{90}	তেজস্ক্রিয়তা সঞ্চয় সংক্রান্ত পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়।
আয়োডিন	I^{131}	থাইরয়েড বিপাক কিম্বা ব্রেন টিউমার নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়।
সোনা	Au^{198}	ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

অটোরেডিওগ্রাফী পদ্ধতি DNA-র স্বজনন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া জানার জন্য, DNA থেকে RNA-র ট্রান্সক্রিপশন বোঝার জন্য, প্রোটিন উৎপাদন ও কোষের জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায় জানার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

অটোরেডিওগ্রাফী পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে প্রথমে তেজস্ক্রিয় কোষগুলি থেকে স্লাইড প্রস্তুত করতে হয়। তেজস্ক্রিয় পরীক্ষণীয় বস্তুগুলি অ্যাসিটিক অ্যালকোহল বা ঠাণ্ডা অ্যালকোহলে ফিক্স করার পর স্মিয়ার করা হয়, কিম্বা মোমের মধ্যে নিহিত করে 'ব্লক' (block) তৈরি করা হয়। ব্লকের থেকে সেকশন কেটে স্লাইড তৈরি করে পরে জাইলল ও বিভিন্ন অ্যালকোহলের মধ্যে রেখে মোম সরান হয়। অটোরেডিওগ্রাফী পরীক্ষার জন্য সেকশনটি খুব পাতলা (5µ থেকে 7µ) হওয়া দরকার। এছাড়া ইমালশনও খুব পাতলা অর্থাৎ মোটামুটি 5µ হওয়া প্রয়োজন। স্লাইডগুলি জলে আনার পর অটোরেডিওগ্রাফী পদ্ধতি আরম্ভ করা হয়।

অটোরেডিওগ্রাফীতে ব্যবহৃত ফিল্ম (film) হল, একটি কাচের উপর সিলভার হ্যালাইডের (silver halide) কেলাসযুক্ত জিলেটিনের স্তর। অন্ধকার ঘরে এই ফিল্মটি কাচ থেকে আলাদা করা হয় ও ঠাণ্ডা জলে ইমালশনের (emulsion) দিকটি নিচের দিকে দিয়ে ভাসতে দেওয়া হয়। এবার তেজস্ক্রিয় (radioactive) পরীক্ষণীয় বস্তু থেকে তৈরি স্লাইডটি জলে আলোকচিত্রের ফিল্মের (photographic film) ঠিক নিচে এনে আস্তে আস্তে জলের উপরে তোলা হয়। এর ফলে ইমালশন স্লাইডের সাথে আটকে যায়। বাতাসে স্লাইডটি শুকিয়ে গেলে একটি ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরে অন্তত 14 দিন রেখে দেওয়া হয়। স্লাইডটি কতদিন অন্ধকারে রাখা হবে তা নির্ভর করে কোন

আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়েছে, আইসোটোপের ঘনত্ব এবং দ্রষ্টব্য বস্তু ও ইমালশনের স্থূলতার উপর। এই সময় কয়েকদিন থেকে মাসাধিক কাল পর্যন্ত হতে পারে। এরপর স্লাইডটি আলোকচিত্রের মতই পরিস্ফুটিত (develop) করা হয়। সাধারণত হাইড্রোকুইনল (hydroquinol) দিয়ে 18^0C তাপমাত্রায় ডেভেল্যাপ করা হয় ও সালফেট দ্রবণ দিয়ে ফিক্স করা হয়। এরপর স্লাইডটি জলে ধুয়ে ফেলে বিভিন্ন অ্যালকোহলের সাহায্যে জলহীন করে (dehydrate) মাউন্ট (mount) করা হয়। তেজস্ক্রিয় বস্তুযুক্ত কোষগুলি রঙ করে নিলে (যেমন, ফালগেন দ্রবণ দিয়ে) ক্রোমোসোমগুলি আরও স্পষ্ট দেখা যায়।

ইমালশনে সিলভার ব্রোমাইড (Ag Br) থাকে। যখন ইমালশন বিকিরণপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐ বিজারিত রূপার (সিলভার) দানা ফিল্মের উপর দেখা দেয়। এইসব কালো দানাগুলির অবস্থান তেজস্ক্রিয় অঞ্চলের অবস্থান নির্দেশ করে। দানার সংখ্যা থেকে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বোঝা যায়।

এখন অটোরেডিওগ্রাফী পদ্ধতিতে তরল ইমালশনও ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে অটোরেডিওগ্রাফী ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাচ্ছে। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষণীয় বস্তুর উপর একটা তারের লুপ (loop) দিয়ে ইমালশনের খুব পাতলা স্তর লাগিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ দৃশ্যমান আলো ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষার ক্ষেত্রেও তরল ইমালশন ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্মিয়ার বা সেকশনযুক্ত স্লাইডটি তরল ইমালশনে ডুবিয়ে নেওয়া হয়।

অটোরেডিওগ্রাফের তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি হল—

(a) **Opposition method :** এই প্রক্রিয়ায় অন্ধকারে দ্রষ্টব্য বস্তু বা স্পেসিমেনটি সরাসরি আলোকচিত্রের ইমালশনের সংলগ্ন অবস্থায় রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি কোষ বা স্থূল বস্তুর অটোরেডিওগ্রাফী করা যায়।

(b) **Track autoradiography :** এই পদ্ধতিতে প্যারফিনে রাখা কলার ছেদ উষ্ণ জলে ভাসতে দেওয়া হয়। আলোকচিত্রের পাতলা ইমালশনযুক্ত স্লাইডে এই কলার ছেদ রাখা হয়। আরেকটি পদ্ধতিতে স্লাইডে আগে কলার ছেদ রাখা হয় এবং তার উপর আলোকচিত্রের ইমালশন দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে কলা ও আলোকচিত্রের ইমালশনের মধ্যে সংযোগ আরো নিবিড় হয়।

(c) **Stripping film method :** একটি কাচের প্লেটের উপর জিলেটিনের একটি স্তর ($10\ \mu$) দেওয়া হয়। এর উপর আলোকচিত্রের ইমালশনের পাতলা স্তর (5μ) দেওয়া হয়। এই স্তর দু'টি শুকিয়ে যাওয়ার পর প্লেট থেকে টেনে তুলে ফেলা হয় এবং জলের উপর ইমালশন দিক নিচের দিকে দিয়ে ভাসতে দেওযা হয়। একটি স্লাইডে কলার ছেদ রাখা হয়। এই স্লাইডটি ভাসমান ফিল্মের নিচে ডুবিয়ে উপরে তোলা হয়। এর ফলে ছেদটি আলোকচিত্রের ইমালশন দিয়ে আবৃত হয়ে যায়।

কোষের বিভিন্ন উপাদানের পৃথকীকরণ (cell fractionation)

কোষের বিভিন্ন উপাদান যেমন, নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড, রাইবোসোম, লাইসোসোম, গলগি বস্তু, এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা ইত্যাদি পৃথক করাকে cell fractionation বলে। প্রথমে কোষ প্রাচীর ও কোষ পর্দা ভেঙে কোষের উপাদানগুলি বের করা হয় ও সেন্ট্রিফিউজ করে উপাদানগুলি পরস্পর থেকে পৃথক করা হয়। প্রথমোক্ত পদ্ধতিকে হোমোজেনাইজেশন (homogenization) ও শেষোক্ত পদ্ধতিকে সেন্ট্রিফিউগেশন বলে।

(1) **হোমোজেনাইজেশন**— সাধারণত কম তাপমাত্রায় (0^0 থেকে 4^0C) কোষ চূর্ণ করা হয়। কোষ চূর্ণ করার (homgenization) বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

(a) কোষগুলি হামান দিস্তায় (mortar ও pestle) বালু বা অ্যালুমিনা, কিম্বা ঘসা কাচের (ground glass) টুকরার সাথে পেষা হয়।

(b) Omni-mixer-এ স্টীলের ব্লেড থাকে যা টিস্যুর সাসপেনশনের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে থাকে ও এভাবে কোষ প্রাচীর বা কোষ পর্দা ভেঙে যায়।

(c) ইনসোনেশনে (inosonation) শব্দ অপেক্ষা দ্রুতগামী (ultrasonic) কম্পন (প্রতি সেকেন্ডে 20,000 আবর্তন) কোষ সাসপেনশনের মধ্যে দিয়ে যেতে দেওয়া হয়। এর ফলে কোষ প্রাচীর ও পর্দা চূর্ণ হয়ে যায়।

(d) রাসায়নিক পদ্ধতি যেমন, প্রোটিওলাইটিক ও লাইপোলাইটিক এনজাইম কোষ প্রাচীর ও কোষ পর্দা চূর্ণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

0.25 M সুক্রোজের দ্রবণে টিস্যু রাখা হয়। হোমোজিনাইজ করার পর দ্রবণে অবিকৃত নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, লাইসোসোম, প্লাস্টিড, গলগি বস্তু, মাইক্রোসোম ইত্যাদি এবং এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা ও প্লাজমা পর্দার ভগ্ন অংশ থাকে। এই দ্রবণকে হোমোজিনেট (homogenate) বলে।

(2) **সেন্ট্রিফিউগেশন** (centrifugation)— (বা কেন্দ্রাতিগ করা) কোষের বিভিন্ন উপাদান, আয়তন, আকৃতি ও ঘনত্ব অনুসারে সেন্টিফিউজ করে পৃথক করা যায়। A. Claude 1940 খ্রিস্টাব্দে এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। হোমোজিনেটে বিভিন্ন উপাদান সমভাবে ছড়ান থাকে। পার্থক্যমূলক বা differential সেন্টিফিউগেশনে কোষের উপাদানযুক্ত দ্রবণ একটি সেন্টিফিউজে বা আলট্রাসেন্ট্রিফিউজে নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরান হয়। মাধ্যাকর্ষণের টানের ফলে বিভিন্ন উপাদানগুলি অধঃক্ষেপের অনুপাত অনুসারে পাত্রের নিচে থিতিয়ে পড়ে। বড় বড় উপাদানগুলি আগে থিতিয়ে পড়ে, ছোট উপাদানগুলি পরে থিতিয়ে পড়ে।

প্রথমে দ্রবণটি (হোমোজিনেট) কম বেগে, অর্থাৎ 700×g গতিতে 10 মিনিট ধরে সেন্ট্রিফিউজ করা হয়। এর ফলে টিউবের নিচে নিউক্লিয়াসগুলি জমা হয়। এই প্রথম তলানিকে (sediment-1) **নিউক্লিওফ্র্যাকশন** (nuclear fraction) বলে। এর মধ্যে কিছু অভগ্ন কোষও থাকতে পারে।

এরপর আরেকটি টিউবে উপরের তরল ঢেলে নিয়ে 105,00×g গতিতে 15 মিনিট সেন্ট্রিফিউজ বা কেন্দ্রতিগ করা হয়। এর ফলে টিউবের নিচে মাইটোকন্ড্রিয়াগুলি জমা হয়। এই দ্বিতীয় তলানিকে (sediment II) **মাইটোকন্ড্রিয় ফ্র্যাকশন** বলা হয়।

এরপর আরেকটি টিউবে উপরের তরল ঢেলে নিয়ে 105,000×g গতিতে 10 মিনিট সেন্ট্রিফিউজ করা হয়। এর ফলে রাইবোসোম, গলগি বস্তু, এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার ছোট অংশ ইত্যাদি তলানি পরে। এই তলানিকে **মাইক্রোসোম ফ্র্যাকশন** বলে। উপরের তরলটিকে সাইটোসল (cytosol) বলে। সাইটোসলে প্রোটিন, দ্রবণীয় নিউক্লিক অ্যাসিড, দ্রবণীয় পলিস্যাকারাইড, লিপিডের বিন্দু ও অন্যান্য পদার্থ থাকে। এগুলিকেআবার ডায়ালাইসিস, ইলেক্ট্রোফোরেসিস কিম্বা ক্রোমাটোগ্রাফী করে আলাদা করা যায় DNA, RNA ইত্যাদি আলাদা করার জন্য গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউগেশন (gradiat centrifugation) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

সেন্ট্রিফিউগেশনের মূলতত্ত্ব— আকার, আয়তন ও ঘনত্ব অনুসারে কোষের বিভিন্ন স্তর যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াকে সেন্ট্রিফিউগেশন বলে। একটি সেন্ট্রিফিউজে ঘূর্ণণে সক্ষম রোটার (rotor) থাকে। একটি মোটর (motor) রোটারকে ঘোড়া।

ন্ট্রিফিউজের আপেক্ষিক শক্তি নিচের সমীকরণ থেকে নির্ণয় করা যায়।

$$RCF = \frac{\omega^2 r}{g}$$

$$= \frac{\omega^2 r}{980}$$

RCF = সেন্ট্রিফিউজের আপেক্ষিক শক্তি (relative centrifugal force).
r = ঘূর্ণনের ব্যাসার্ধ
ω = প্রতি মিনিটে ঘূর্ণনের সংখ্যা (revolution per minute)
g = মাধ্যাকর্ষণ শক্তি

$$\omega = \frac{\Pi\,(rpm)}{30}$$

তরল মাধ্যমে বিভিন্ন আয়তনের কণা ছড়ান থাকে (homgenate)। এই মাধ্যম ফিউজে ঘোরার সময় মাধ্যাকর্ষণের ফলে কণাগুলি অধক্ষেপের (sedimenta- অনুপাত অনুসারে থিতিয়ে পড়ে। বড় বড় কণাগুলি প্রথমে এবং ছোট ছোট লি ক্রমশ পরে থিতিয়ে পড়ে।

সন্টিফিউজ করার বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি—

সন্ট্রিফিউজ করার তিনটি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে।

১) অত্যন্ত দ্রুত বেগে সেন্ট্রিফিউজ করার পদ্ধতি— এই পদ্ধতি সবচে

ব্যবহৃত হয়। সেন্ট্রিফিউজের রোটারটি প্রতি মিনিটে 20,000 বার (rpm) ঘোরে। মাধ্যাকর্ষণের টান হল 50,000g। এই বেগে বেশিরভাগ জীবাণু, কোষ অবশেষ (debris) এবং কোষ অঙ্গাণু থিতিয়ে পড়ে। উপরের তরলটি পুনরায় সেন্ট্রিফিউজ করলে অপেক্ষাকৃত কম আণবিক ওজনযুক্ত বস্তুগুলি পৃথক হয়ে যায়।

কোষের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন বেগে সেন্ট্রিফিউজ করে পৃথক করা যায়। এই প্রক্রিয়াকে পার্থক্যমূলক সেন্ট্রিফিউগেশন বলে।

(b) আলট্রাসেন্ট্রিফিউজ করা— সেন্ট্রিফিউজটি অত্যন্ত দ্রুতবেগে (মোটামুটি 15000 rpm) ঘোরান হয়। মাধ্যাকর্ষণের টান হল 5000,000g। Svedberg 1920 খ্রিস্টাব্দে এই পদ্ধতি প্রথম ব্যবহার করেন।

3. **বিশ্লেষণমূলক আলট্রাসেন্ট্রিফিউজ করা**— এটি আধুনিকতম সেন্ট্রিফিউজ পদ্ধতি। এই যন্ত্রে বিভিন্ন বস্তুর অধঃক্ষেপ হওয়া দেখা যায় এবং অধঃক্ষেপের হার নির্ণয় করা যায়। এর নমুনা ধারণকারী অংশে কোয়ার্টজের একটি জানলা এবং রোটারে দৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যবস্থা (optical system) থাকে।

সেন্ট্রিফিউগেশনের ইলুট্রিয়েশন (elutriation) পদ্ধতি*

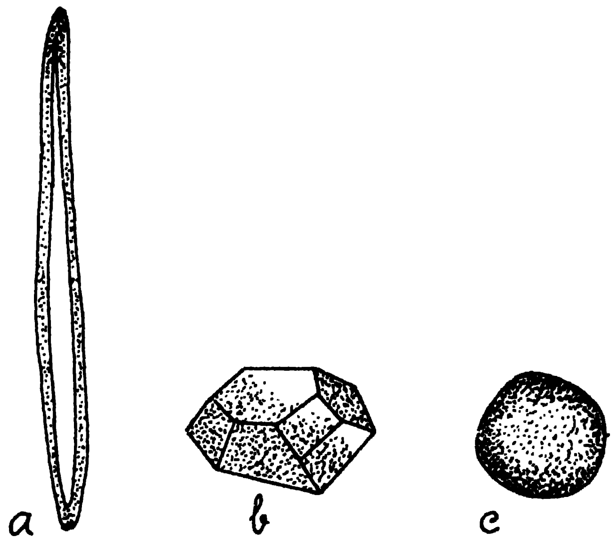
এই পদ্ধতির সাহায্যে সম্পূর্ণ কোষ পৃথক করা যায়। Lindal 1940 খ্রিস্টাব্দে প্রথম এই পদ্ধতির ব্যবহার করেন। একটি বিশেষ আকারের রোটারের সাহায্যে প্রকোষ্ঠটির একটি সরু প্রান্তে অবিরাম তরল মাধ্যম প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা থাকে। প্রকোষ্ঠে কোষ সাসপেনশন দেওয়া হয়। সেন্ট্রিফিউজ করলে অধঃক্ষিপ্ত কোষ সমষ্টি ও অনুপ্রবিষ্ট তরল মাধ্যমের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলে ছোট ছোট কোষগুলি বিপরীত দিক দিয়ে বেরিয়ে যায় ও একটি পাত্রে সংগ্রহ করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

কোষ (Cell)

সব জীব দেহই কোষ দিয়ে গঠিত। কোষ মতবাদ অনুসারে জীবের গঠনগত ও কার্যগত একক হল কোষ। সজীব কোষের শারীরবৃত্তীয় একক হল কোষ অর্থাৎ কোষের মধ্যেই জীবের সব বিপাকীয় কাজগুলি হয়ে থাকে। কোষ বংশধারার একক, কারণ কোষের নিউক্লিক অ্যাসিড বংশগতি নিয়ন্ত্রণ করে। কোষ হল জীবনের ক্ষুদ্রতম একক। নতুন কোষের উদ্ভব পুরনো কোষ থেকেই হয়।

যেসব উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহে কেবল একটি কোষ থাকে, তাদের এককোষী (unicellular) জীব বলে। অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহ অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে তৈরি বলে এদের বহুকোষী (multicellular) জীব বলে।

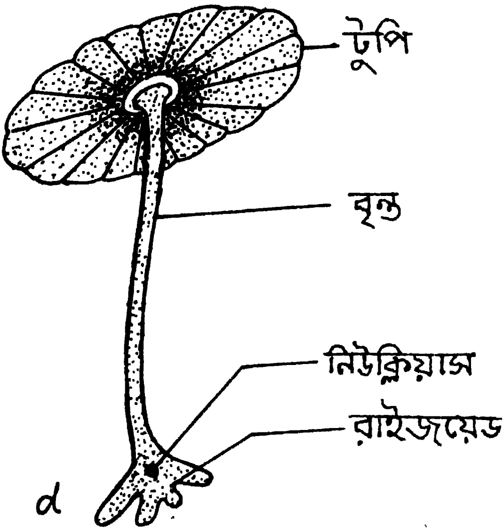


চিত্র—17a - c

বিভিন্ন আকৃতির কোষ a —লম্বাটে; b — বহুতল এবং c — গোলাকার

কোষের আকার বিভিন্ন ধরনের হয়। এককোষী জীবের কোষ সাধারণত গোল বা ডিম্বাকৃতির হয়। তবে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটিরিয়ায় লম্বাটে, বা সর্পিল আকারের

কোষ দেখা যায়। অ্যামিবায় কোষের আকৃতি বারবার পরিবর্তিত হয়। *Acetabularia*-র (শৈবাল) কোষ একটা সবৃন্তক টুপির মত (চিত্র 17d)। ঐ বৃন্তের নিচের দিকে একটি রাইজয়েড (rhizoid) থাকে। বহুকোষী জীবের দেহে নানা

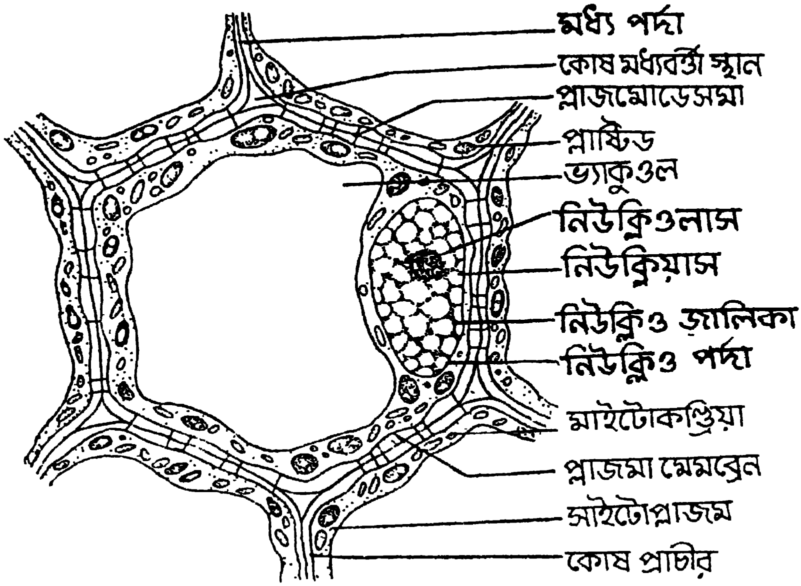


চিত্র—17 d

এককোষী শৈবাল *Acetabularia*

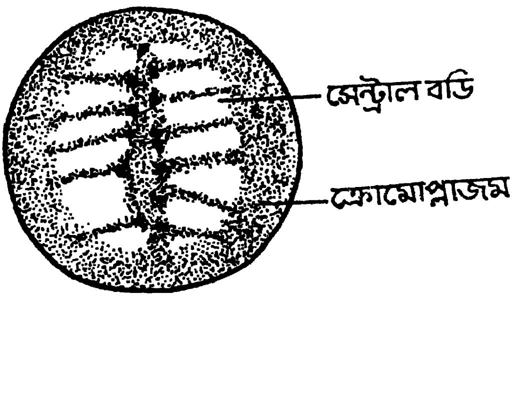
রকমের কোষ থাকে। বহুকোষী প্রাণীর স্নায়ু কোষে শাখা-প্রশাখা দেখা যায়। সাধারণত বহুকোষী উদ্ভিদের কোষ ঘনক (cubical), লম্বাটে বা বহুতলক (polyhedral) (চিত্র 17a, b) হয়। এর মাঝামাঝি অনেক রকম আকৃতির কোষ দেখা যায়। যেমন, গোলাকার (চিত্র 17c), সূচ্যাকার, উপবৃত্তাকার, ডিম্বাকার, চাকতির বা পিপের আকারের ইত্যাদি। কোষের আকার প্রধানত এর কাজের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া পাশের কোষের চাপে অনেক সময় কোষ বহুতলক হয়।

কোষের আয়তন বিভিন্ন রকমের হয়। কোষের আকারের সাথে আয়তনের একটা নিকট সম্পর্ক আছে। কোনও কোনও ব্যাকটিরিয়ার কোষের আয়তন 0.1μ থেকে 5μ পর্যন্ত হয়। তবে উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে এত ছোট কোষ দেখা যায় না। বহুতলক কোষের ব্যাস গড়ে 10μ থেকে 100μ হয়। তবে এর চাইতে বড় বা ছোট কোষও দেখতে পাওয়া যায়। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের আঁশ বা তন্তু (fibre) সচরাচর 1-8 মিঃ মিঃ লম্বা হয়। কিন্তু কোনও কোনও উদ্ভিদের যেমন, আরটিকেসী (Urticaceae) গোত্রের তন্তু বা আঁশ 550 মিঃ মিঃ পর্যন্ত লম্বা হয়। প্রাণীর ডিম (কয়েক ইঞ্চি পর্যন্ত ব্যাসযুক্ত, উট



চিত্র—14

উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা উদ্ভিদ কোষের গঠন



চিত্র—19 .

নীলাভ সবুজ শৈবালের (blue green algae) কোষ

পাখীর ডিম ছয় ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত হয় ও খোলা বাদ দেওয়ার পর এর ব্যাস হয় তিন ইঞ্চি) জীব জগতের অন্যান্য কোষের তুলনায় বেশ বড়।

কখনও কখনও কোষের আয়তন ক্রোমোসোম সংখ্যার উপর নির্ভর করে। যেমন, কোনও কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হলে, ঐ কোষের আয়তন বাড়ে।

বিবর্তনে কোষের আয়তন অপরিবর্তিত থাকে। সক্রিয় কোষগুলি সাধারণত ছোট হয় কারণ, কোষের আয়তন বাড়লে কোষ পর্দার (cell surface) আয়তনের তুলনায় কোষের আয়তন অনেক বেশি বেড়ে যায়।

কোনও একটি নির্দিষ্ট ধরনের কোষের আয়তন বিভিন্ন জীবে একই রকম থাকে। যেমন, ইঁদুর, ঘোড়া, ষাঁড় ইত্যাদির যকৃতের কোষের আয়তন একই রকম। বিভিন্ন জীবের আয়তনের পার্থক্য কোষের সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল। মানুষের কোষের আয়তন সাধারণত $200\mu^3$-$15000\mu^3$ হয়। বিভিন্ন জীবের কোষের আয়তনের এই সামঞ্জস্যকে কখনও কখনও law of constant volume (নির্দিষ্ট আয়তনের সূত্র) বলা হয়।

গঠন— প্রত্যেক উদ্ভিদ কোষে সজীব প্রোটোপ্লাস্টের চারিদিকে একটি কোষ প্রাচীর থাকে (চিত্র 18)। কোষ প্রাচীরের তুলনায় প্রোটোপ্লাজমের গুরুত্ব অনেক বেশি কারণ, এখানেই কোষের সব রকম প্রয়োজনীয় কাজ হয়। নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমকে একসাথে প্রোটোপ্লাজম (protoplasm) বলা হয়।

নিম্নশ্রেণীর কোনও কোনও উদ্ভিদে, উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের জনন কোষে এবং প্রাণীর কোষে প্রাচীর থাকে না। ভাইরাসে কোনও প্রকৃত কোষ নেই। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের পরিণত সীভ (scive) নালীতে নিউক্লিয়াস থাকে না। আবার সিনোসাইটিক (coenocytic) দেহযুক্ত কিছু শৈবাল ও ছত্রাকে অসংখ্য নিউক্লিয়াস থাকে। ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ-সবুজ শৈবালে (blue green algae) অন্য জীবের মত সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না (চিত্র 19)। এইসব কোষকে প্রোক্যারিওট (prokaryote) কোষ বলে। প্রোক্যারিওট কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস না থাকলেও, এখানে নিউক্লিও পদার্থ (ডি এন এ) থাকে। নীলাভ সবুজ শৈবালে নিউক্লিয়াসের বদলে 'সেন্ট্রাল বডি' (central body) দেখা যায়। ব্যাকটিরিয়ার কোষে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও মাইটোকন্ড্রিয়া নেই। প্রোক্যারিওট কোষে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন না থাকায় নিউক্লিও পদার্থের সাথে সাইটোপ্লাজমের প্রত্যক্ষ যোগ থাকে। ইউক্যারিওট কোষে রাইবোসোমগুলি সাধারণত এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে যুক্ত থাকে। কিন্তু প্রোক্যারিওট কোষে এগুলি সাইটোপ্লাজমে মুক্তভাবে থাকে। ইউক্যারিওট কোষে ডি এন এ বেসিক প্রোটিন হিস্টোনের সাথে যুক্ত থাকে, কিন্তু প্রোক্যারিওট কোষে হিস্টোন পাওয়া যায় না।

কোষ প্রাচীর

সব উদ্ভিদ কোষে প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরের দিকে কোষ প্রাচীর থাকে। তবে নিম্ন

শ্রেণীর কোনও কোনও উদ্ভিদে এবং উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের জনন কোষে কোষ প্রাচীর থাকে না। কোষ প্রাচীর সাইটোপ্লাজম থেকে তৈরি, কিন্তু এটি সজীব নয়। কোষ প্রাচীর সূক্ষ্ম বা স্থূল, মসৃণ কিম্বা অমসৃণ হয়।

কোষ প্রাচীরের আকারের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রকারের কোষ (যেমন— প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা ও স্কেলেরেনকাইমা) দেখা যায়। প্যারেনকাইমা কোষের প্রাচীর পাতলা, কোলেনকাইমা কোষের প্রাচীর অসমভাবে স্থূল এবং স্কেলেরেনকাইমার কোষ প্রাচীর সমভাবে স্থূল।

রাসায়নিক গঠন— কোষ প্রাচীর সাধারণত সেলুলোজ দিয়ে তৈরি। সেলুলোজের রাসায়নিক সঙ্কেত হল ($C_6H_{10}O_5$)। তবে এখানে লিগনিন, পেকটিন, সুবারিন, মিউসিলেজ, মোম কিম্বা বিভিন্ন ধরনের লবণ থাকতে পারে। কোষ প্রাচীরে যথেষ্ট পরিমাণ জল থাকে। কোষ প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাধারণত প্রাথমিক কোষ প্রাচীরের বিভিন্ন উপাদানের শতকরা পরিমাণ হল— জল 60%, হেমিসেলুলোজ 21.2%, সেলুলোজ 12.0%, পেকটিন জাতীয় পদার্থ 2.0%, প্রোটিন 2.0% এবং লিপিড 2.8%।

প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী কোষ প্রাচীর প্রধানত পলিস্যাকারাইড সেলুলোজ দিয়ে তৈরি। তবে বিশেষত সেকেন্ডারী কোষ প্রাচীরে অন্যান্য পদার্থ, যেমন, লিগনিন, সুবারিন ইত্যাদি সঞ্চিত হয়। ত্বকের কোষ প্রাচীরে কিউটিন বা মোম সঞ্চিত হয় ও প্রস্বেদন হ্রাস করে। ছত্রাকের কোষ প্রাচীরে কাইটিন (গ্লুকোজ অ্যামিনের পলিমার) থাকে। এছাড়া কোষ প্রাচীরে কিছু খনিজ পদার্থ, যেমন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি যথাক্রমে কার্বোনেট ও সিলিকেট হিসাবে থাকে।

সেলুলোজ অণু দীর্ঘ চেনের (শৃঙ্খল) ন্যায় ও এগুলি গ্লুকোজের ছোট ছোট অংশ (unit) দিয়ে তৈরি। একটি সেলুলোজের অণুতে গ্লুকোজের সংখ্যার তারতম্য হয়। এই সংখ্যা 1000, 3000 অথবা 10,000 পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণত 3000টি গ্লুকোজ অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি সেলুলোজ অণু গঠন করে। সেলুলোজ অণুতে β গ্লুকোজের এককগুলি সরল শাখাবিহীন শৃঙ্খল বা চেনে যুক্ত থাকে। দীর্ঘ সেলুলোজ অণুগুলি সমান্তরাল বাণ্ডিলে (বা গোছা) অবস্থান করে। একটি বাণ্ডিলে 2000টি চেন থাকে। 100টি চেনের একটি গোছা একসাথে একটি প্রাথমিক সূত্র অর্থাৎ মাইসেলি (micelle) গঠন করে। কুড়িটি মাইসেলি সমান্তরালভাবে অবস্থান করে ও একটি সূত্র বা মাইক্রোফাইব্রিল (microfribil) গঠন করে। একটি মাইক্রোফাইব্রিলের ব্যাস 80 থেকে 300Å হয়। অনেকগুলি মাইক্রোফাইব্রিল সমান্তরালভাবে অবস্থান করে ও একটি ম্যাক্রোফাইব্রিল (macrofibril) গঠন করে। ম্যাক্রোফাইব্রিলের ব্যাস 0.5μ।

হেমিসেলুলোজে বিভিন্ন মনোস্যাকারাইড থাকে। এগুলি হল অ্যারাবিনোজ, জাইলেজ, ম্যানোজ ও গ্যালকটোজ। সেলুলোজের ম্যাক্রোফাইব্রিলের মাঝে হেমিসেলুলোজ থাকে। পেকটিনে গ্লুকোইউরোনিক অ্যাসিড ও গ্যালাকটোইউরোনিক

অ্যাসিড থাকে। লিগনিনে কনিফেরিল (coniferyl) অ্যালকোহল থাকে। ***কাইটিন (chitin)*** *হল গ্লুকোজঅ্যামিনের পলিমার। কিউটিনে স্নেহ জাতীয় অ্যাসিড থাকে।*

সেলুলোজ স্থিতিস্থাপক, অর্ধ স্বচ্ছ, ভেদ্য ও জল, অ্যালকোহল ও ক্ষার দ্রবণে অদ্রবণীয়। সেলুলোজ 72% সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবণীয়। আয়োডিন ও সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করলে সেলুলোজ নীল বর্ণের হয়। ক্লোর-জিঙ্ক আয়োডিনের প্রভাবে এটি নীল হয়।

লিগনিননযুক্ত প্রাচীর দৃঢ়, শক্ত ও সামান্য স্থিতিস্থাপক। স্কেলেরেনকাইমা কোষের প্রাচীরে লিগনিন থাকে। আয়োডিন ও সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করলে লিগনিনযুক্ত প্রাচীর স্ফীত ও বাদামী বর্ণের হয়। ফ্লোরোগ্লুসিন ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের প্রভাবে এটি লাল বর্ণের হয়।

কিউটিন ও সুবারিনযুক্ত প্রাচীর মোম এবং স্নেহ জাতীয় পদার্থ। সুবারিনযুক্ত প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে জল ও বাতাস যেতে পারে না। কর্ক কোষের প্রাচীরে সুবারিন থাকে। ত্বকের কোষের প্রাচীরে কিউটিন থাকে। কিউটিন ও সুবারিনযুক্ত প্রাচীরে আয়োডিন ও সালফিউরিক অ্যাসিড দিলে গাঢ় বাদামী বর্ণের হয়, কিন্তু স্ফীত হয় না। সুদান III, IV এর প্রভাবে এরকম প্রাচীর গোলাপী রঙের হয়।

মিউসিলেজযুক্ত প্রাচীরে মিথিলিন ব্লু দিলে গাঢ় নীল বর্ণের হয়।

খনিজ পদার্থ যেমন— ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের কার্বোনেট ও সিলিকেট উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে থাকতে পারে। বাঁশ, ঘাস ইত্যাদির পাতার কোষ প্রাচীরে সিলিকা সঞ্চিত হতে পারে। কোনও কোনও শৈবাল ও কিছু উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পাওয়া গেছে।

কোষ প্রাচীরের গঠন— কোষ প্রাচীরের গঠন জটিল। কোষ প্রাচীরের তিনটি স্তর রয়েছে। এগুলি হল প্রাথমিক বা প্রাইমারী কোষ প্রাচীর, গৌণ বা সেকেন্ডারী কোষ প্রাচীর এবং টারসিয়ারী কোষ প্রাচীর।

(i) **প্রাথমিক বা প্রাইমারী কোষ প্রাচীর—** প্রথম উৎপন্ন কোষ প্রাচীরকে প্রাথমিক কোষ প্রাচীর বলে। এটি কোষের সবচেয়ে বাইরের স্তর। এটি অপেক্ষাকৃত পাতলা ও ভেদ্য এবং প্রধানত পলিস্যাকারাইড সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। তবে কখনও কখনও এই প্রাচীরে অন্যান্য পদার্থ, যেমন— লিগনিন, সুবারিন বা কিউটিন সঞ্চিত হতে পারে। এর ফলে প্রাথমিক কোষ প্রাচীর অভেদ্য (impermeable) হয়। ছত্রাকের প্রাথমিক কোষ প্রাচীর কাইটিন দ্বারা গঠিত।

প্যারেনকাইমা বা অপরিণত ভাজক কলার কোষ প্রাচীরে কেবল প্রাথমিক কোষ প্রাচীর থাকে।

উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের প্রাথমিক প্রাচীরে মাইক্রোফাইব্রিলগুলি আলগাভাবে ছড়ান থাকে।

(iii) **গৌণ বা সেকেন্ডারী কোষ প্রাচীর—** প্রাথমিক কোষ প্রাচীরের ভিতরের

দিকে গৌণ কোষ প্রাচীর থাকে। এই প্রাচীর স্থূল ও ভেদ্য। গৌণ কোষ প্রাচীরে তিনটি স্তর দেখা যায়। এই স্তরগুলি হল S_1, S_2 এবং S_3। এই তিনটি স্তরের মধ্যে S_2 স্তরটি সবচেয়ে স্থূল। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের কাষ্ঠল তন্তুর গৌণ প্রাচীরে S_3 স্তরটি অনুপস্থিত থাকে।

স্কেলেরেনকাইমা কোষের (যেমন, জাইলেম বাহিকা, ট্র্যাকীড ইত্যাদি) প্রাচীরে গৌণ প্রাচীর থাকে।

গৌণ কোষ প্রাচীরে সেলুলোজের মাইক্রোফাইব্রিলগুলি অপেক্ষাকৃত ঘনবিন্যস্ত ও সমান্তরালভাবে সাজান থাকে। মাইক্রোফাইব্রিলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে (interfibrillar) কখনও কখনও লিগনিন সঞ্চিত হয়।

(iii) টারসিয়ারী (tertiary) কোষপ্রাচীর— কোনও কোনও উদ্ভিদ কোষের প্রাচীরে (যেমন, ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ট্র্যাকীডে) গৌণ কোষ প্রাচীরের ভিতরের দিকে টারসিয়ারী কোষ প্রাচীর গঠিত হয়। এর ত্বকে সাধারণত ছোট ছোট গুটিকা (warts) দেখা যায়।

এই কোষ প্রাচীরে সেলুলোজ ছাড়া জাইলান (xylan) থাকে।

টারসিয়ারী কোষ প্রাচীরের গঠন, রাসায়নিক প্রকৃতি ও রঞ্জক ধর্ম প্রাথমিক এবং গৌণ কোষ প্রাচীর থেকে আলাদা।

মধ্য পর্দা বা মিডিল ল্যামেলা (middle lamella)— দু'টি পাশাপাশি কোষ পরস্পর একটি অন্তঃকোষীয় ম্যাট্রিক্স দিয়ে যুক্ত থাকে। এই ম্যাট্রিক্সকে মধ্য পর্দা বা মিডিল ল্যামেলা বলে। অর্থাৎ, মধ্যপর্দা পাশাপাশি দু'টি কোষের প্রাথমিক কোষ প্রাচীরের মাঝে থাকে। মধ্যপর্দা প্রধানত পেকটিন ও লিগনিন দিয়ে গঠিত। এছাড়া মধ্যপর্দায় কিছু প্রোটিন থাকে।

প্লাজমোডেসমাটা (plasmodesmata)— উদ্ভিদ কোষের কোষপ্রাচীর এবং মধ্য পর্দা কখনও অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে না, এর মাঝে মাঝে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র থাকে। এসব রন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি কোষের মধ্যে সাইটোপ্লাজমীয় সংযোগ স্থাপিত হয়। এরকম সূক্ষ্ম সাইটোপ্লাজমীয় সূত্রকে প্লাজমোডেসমাটা (Gr. desmos-ফিতা) বলে।

ভাজক কলার পাশাপাশি কোষের প্লাজমোডেসমাটা অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে। এসব প্লাজমোডেসমাটার সাহায্যে পাশাপাশি কোষের সাইটোপ্লাজম এবং এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা সংযুক্ত থাকে। সম্ভবত বিভিন্ন পুষ্টিকর পদার্থ, দ্রবীভূত গ্যাস, আয়ন এবং অন্যান্য পদার্থের আন্তঃকোষীয় প্রবাহ প্লাজমোডেসমাটার সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

কোষ প্রাচীরের সূক্ষ্ম গঠন (Ultrastructure)

উদ্ভিদ কোষের প্রাচীর ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে এর দু'টি অংশ দেখা যায়।

(i) হেমিসেলুলোজ ও পেকটিন অপসারণ করার পর সেলুলোজের মাইক্রোফাইব্রিল দেখা যায়।

(ii) ম্যাট্রিক্স-এর মধ্যে মাইক্রোফাইব্রিলগুলি নিহিত থাকে।

বিভিন্ন কোষের প্রাচীরে মাইক্রোফাইব্রিলের বিন্যাসের তারতম্য হয়। প্রাথমিক কোষ প্রাচীরে মাইক্রোফাইব্রিলগুলি আলগাভাবে বিভিন্ন দিকে বিন্যস্ত থাকে। গৌণ কোষ প্রাচীরে মাইক্রোফাইব্রিলগুলি ঘনবিন্যস্ত ও সমান্তরালভাবে সাজান থাকে।

টারসিয়ারী কোষ প্রাচীর সাধারণত দেখা যায় না। এই প্রাচীর সেকেন্ডারী কোষ প্রাচীরের ভিতরের দিকে থাকে। এই প্রাচীর কোষ প্রাচীরের অংশ কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে টারসিয়ারী কোষ প্রাচীরের কিছু ধর্ম প্রাথমিক কোষ প্রাচীরের মত।

কোষ প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা উদ্ভিদ হরমোন বা অক্সিন নিয়ন্ত্রণ করে। কোষের বৃদ্ধি ও বিস্তারণের (expansion) সময় সম্ভবত মাইক্রোফাইব্রিলগুলি আলগা হয় ও যে দিকে সম্প্রসারণ হচ্ছে সেই দিকে বিন্যাসিত হয়। ভিতরের দিকে নতুন যেসব ফাইব্রিল গঠিত হয়, সেগুলিও একই দিকে সাজান থাকে।

কাজ— কোষ প্রাচীর প্রোটোপ্লাস্টকে রক্ষা করে এবং কোষকে দৃঢ় করে। কোষের নির্দিষ্ট আকার কোষ প্রাচীরের জন্যই সম্ভব।

উৎপত্তি— কোষ প্রাচীরের উৎপত্তি হয় কোষ বিভাজনের পরই সাইটোপ্লাজমের বিভাজনের সময়। এই সময় বিষুবরেখায় এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার অংশ কোষের পরিধির থেকে এসে জমা হয়। গলগি বস্তুর ছোট ছোট ভেসিকেলও (20mμ ব্যাসযুক্ত) বিষুবরেখায় আসে। কোষ পর্দা গঠনের আগে বিষুবরেখায় পিপাকার ফ্রাগমোসোমও (250mμ ব্যাসযুক্ত) দেখা যায়। ফ্র্যাগমোসোম এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার ছোট ভেসিকল থেকে উৎপন্ন হয়। স্পিন্ডিলের মাইক্রোটিউবিউলগুলিও বিষুব অঞ্চলে আসে। এগুলি সব পরস্পর যুক্ত হয়ে কোষ পর্দা গঠন করে। কোষ পর্দার কোনও কোনও জায়গায় ছিদ্র থাকে। ঐসব অঞ্চল দিয়ে এক কোষ থেকে অন্য কোষে প্লাজমোডেসমাটা সংযোগ স্থাপন করে। কোষ পর্দা রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে মধ্য পর্দা বা মিডিল ল্যামেলা গঠন করে। পরে এই পর্দার উভয় দিকে সেলুলোজ, পেকটিন ও অন্যান্য পদার্থ সঞ্চিত হয়ে প্রাইমারী বা প্রাথমিক কোষ প্রাচীর গঠন করে। প্রাথমিক কোষ প্রাচীরের উপর সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, পেকটিন ও অন্যান্য পদার্থ সঞ্চিত হয়ে গৌণ কোষ প্রাচীর গঠিত হয়।

ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীর

ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীরের গঠন অন্যান্য উদ্ভিদ কোষের প্রাচীরের চেয়ে জটিল। এই কোষ প্রাচীরে মিউকোকমপ্লেক্স থাকে, যা কোষ প্রাচীরকে দৃঢ় করে। মিউকোকমপ্লেক্সে দুই রকমের শর্করা ও তিন চার রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। শর্করাগুলি হল -N- অ্যাসিটাইল-গ্লুকোসঅ্যামিন এবং N- অ্যাসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিড। এই শর্করা দুইটি পর্যায়ক্রমে থাকে এবং গ্লাইকোসাইডীয় লিঙ্কেজ দিয়ে পরস্পর যুক্ত থাকে। অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি হল— অ্যালানিন, গ্লাইসিন, লাইসিন,

গ্লুটামিক অ্যাসিড, ডাইঅ্যামিনো পামেলিক অ্যাসিড। এগুলি ছোট পেপটাইড শৃঙ্খল গঠন করে। এই শৃঙ্খল পলিস্যাকারাইড শৃঙ্খলের সাথে যুক্ত হয় এবং পরস্পর আড়াআড়িভাবে সংযুক্ত (cross-link) থাকে।

গ্রামপজিটিভ ব্যাকটিরিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণ মিউকোকমপ্লেক্স থাকে। এরকম ব্যাকটিরিয়ার প্রাচীরে মিউকোকমপ্লেক্সই হল একমাত্র ম্যাক্রোমলিকিউল। কোনও কোনও গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটিরিয়ায় সরল পলিস্যাকারাইড (যেমন, টিকোইক অ্যাসিড) থাকে। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ায় অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ মিউকোকমপ্লেক্স থাকে। এই প্রাচীরে টিকোইক অ্যাসিড অনুপস্থিত থাকে। তবে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণ লিপিড (20-30%), প্রোটিন এবং পলিস্যাকারাইড থাকে।

গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটিরিয়ার প্রাচীর স্থূল (150-200Å স্থূল) ও সম্পূর্ণভাবে প্লাজমা পর্দার সাথে যুক্ত থাকে, যেমন *Bacillus subtilis*-এ। কিন্তু গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীর অপেক্ষাকৃত পাতলা (75-120Å স্থূল) এবং কেবল কোনও কোনও অঞ্চলে প্লাজমা পর্দার সাথে যুক্ত থাকে।

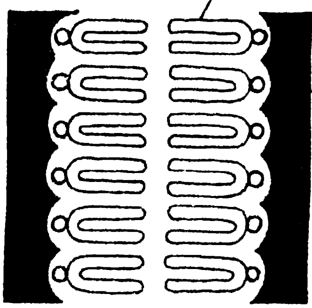
কাজ— ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীর কোষের আকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। কোষকে দৃঢ় করে এবং প্রোটোপ্লাজমকে রক্ষা করে।

প্লাজমা মেমব্রেন (Plasma membrane)

প্রোটোপ্লাজমের বাইরের সীমানা নির্দেশকারী পর্দাকে প্লাজমা মেমব্রেন বা সেল মেমব্রেন বলে। উদ্ভিদের কোষে এই পর্দা কোষ প্রাচীরের ভিতরের দিকে থাকে, কিন্তু প্রাণী কোষে কোনও কোষ প্রাচীর না থাকায় প্লাজমা মেমব্রেনই কোষের আকার নিয়ন্ত্রণ করে। 1855 খ্রিস্টাব্দে C. Nageli প্রথম সেল মেমব্রেন নামকরণ করেন। এই পর্দাকে কোষ পর্দা বা প্লাজমালেমাও (plasmalemma) বলা হয়। J. Q. Power 1931 খ্রিস্টাব্দে প্লাজমালেমা নামটি প্রথম ব্যবহার করেন।

রাসায়নিক গঠন— প্লাজমা পর্দা লিপিড ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি। প্রোটিন অংশ পর্দাকে স্থিতিস্থাপক (elastic) করে। এখানে উৎসেচক জাতীয় প্রোটিন পাওয়া যায়। প্লাজমা পর্দায় সামান্য পরিমাণ (1-5%) অলিগোস্যাকারাইড থাকে। প্লাজমা মেমব্রেনে লিপিডের দ্বি-আণবিক স্তরের (bimolecular layer) চারিদিকে প্রোটিনের আবরণ থাকে। এখানে প্রোটিনের চেয়ে লিপিডের পরিমাণ কম থাকে। Robertson ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্লাজমা মেমব্রেনে তিনটি স্তর দেখতে পান (চিত্র 2a)। দুই পাশের স্তর দুইটি অস্বচ্ছ ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি। মাঝের স্তরটি মোটামুটি স্বচ্ছ ও লিপিড দিয়ে গঠিত। প্রোটিনের প্রত্যেক স্তর 20Å ও লিপিডের স্তর 35Å চওড়া। লিপিডের স্তর নেগেটিভ (-) চার্জযুক্ত ও প্রোটিনের স্তর পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট (+)। লিপিড ও প্রোটিনের স্তর দুইটি তড়িৎ স্থৈতিকভাবে (electro-static) পরস্পর যুক্ত

থাকে। লিপিডের দুইটি স্তরের লাইপোফিলিক প্রান্তগুলি পরস্পরের দিকে সাজান থাকে, আর লিপিডের হাইড্রোফিলিক মাথাগুলি প্রোটিন স্তরে নিহিত থাকে। Branton ('69) ও Singer ('72) বলেন যে, প্লাজমা পর্দার প্রোটিন কতকগুলি সঙ্কোচনশীল দানা দিয়ে তৈরি। এই দানাগুলি একটি ম্যাট্রিক্সের মধ্যে থাকে। কোষের অভ্যন্তরের বিভিন্ন পর্দার গঠন মূলত প্লাজমা পর্দারই মত, অর্থাৎ এগুলিও প্রোটিন-লিপিড-প্রোটিন দিয়ে তৈরি। সেজন্য এই পর্দাকে Robertson (1959) ইউনিট মেমব্রেন (unit membrane) নাম দিয়েছেন।



চিত্র—20a

প্লাজমা মেমব্রেনের গঠন

বিভিন্ন জীবে এবং বিভিন্ন টিস্যুতে লিপিডের পরিমাণের (কোষ পর্দায় 28%-73%) তারতম্য হয়। কোষ পর্দার প্রধান লিপিডগুলি হল— ফসফোলিপিড, গ্যালাক্টোলিপিড ও কোলেস্টেরল। বিভিন্ন কোষে এইসব লিপিডের পরিমাণের পার্থক্য দেখা যায়। 20% পর্যন্ত ফসফোলিপিড অম্লধর্মী ও এগুলি নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট। এই লিপিড প্রোটিনের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে।

অবস্থান অনুযায়ী কোষ পর্দার প্রোটিন দুই রকমের— (a) extrinsic প্রোটিন বা পরিধির প্রোটিন এবং (b) intrinsic বা integral প্রোটিন। extrinsic প্রোটিন পর্দার ত্বকে থাকে ও সহজেই আলাদা করা যায়। স্পেকট্রিন ও অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফাটেজ হল এরকম প্রোটিন। ইনট্রিনসিক প্রোটিন লিপিডের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে ও সহজে আলাদা করা যায় না। রোডপসিন ও সাইটোক্রোম অক্সিডেজ এরকম প্রোটিন। প্রোটিন প্লাজমা পর্দাকে দৃঢ় করে এবং কোষে বিভিন্ন বস্তুর প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে।

প্লাজমা পর্দায় নানা রকম (প্রায় 30টি) উৎসেচক পাওয়া গেছে। যেসব উৎসেচক বেশি পাওয়া যায় সেগুলি হল— 5 নিউক্লিওটাইডেস্, Mg^{++}ATPase, Na^+ ও K^+ সক্রিয়ক, Mg^+ATPase, ক্ষারীয় (অ্যালকালাইন) ফসফাটেজ, ফসফোমোনো-এস্টারেজ, অ্যাডিনিল সাইক্লেজ, RNAse ইত্যাদি। Na^+ ও K^+ সক্রিয়ক Mg^+ATP ase

উৎসেচকটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই উৎসেচক প্লাজমা পর্দার মধ্যে দিয়ে আয়ন চলাচলে সহায়তা করে। এই উৎসেচক লিপিড অণুর উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল। লিপিডের অনুপস্থিতিতে এই উৎসেচক নিষ্ক্রিয় হয়।

প্লাজমা পর্দার রন্ধ্র

প্লাজমা পর্দার 1% অঞ্চলে রন্ধ্র থাকে। প্লাজমা পর্দার রন্ধ্র মোটামুটি 0.35 ন্যানোমিটার।

প্লাজমা পর্দার রন্ধ্রের গঠন সম্বন্ধে বিভিন্ন মডেল রয়েছে।

(i) গঠনগত রন্ধ্র বা structural pore— এগুলি স্থায়ী বেলনাকার রন্ধ্র ও প্লাজমা পর্দায় থাকে।

(ii) গতিশীল রন্ধ্র বা dynamic pore— এগুলি বেলনাকার, অস্থায়ী রন্ধ্র। কোষ কিছু গ্রহণ করার (intake) সময় এরকম রন্ধ্র দেখা দেয়।

(iii) ফলক খণ্ডের রন্ধ্র বা paving block pore— এই মত অনুসারে, প্লাজমা পর্দায় ঘন বিন্যস্ত ছ'কোণা (hexagonal) লিপিড ও প্রোটিনের উপএকক (subunit) থাকে। এসব উপএককের কিনারায় রন্ধ্র দেখা দেয়।

(iv) প্রোটিন নালিকার রন্ধ্র বা protein channel pore— এই মত অনুসারে, প্লাজমা পর্দা হল লিপিড ও গোলাকার প্রোটিনের মোজাইক। এই মোজাইক পর্দায় নির্দিষ্ট প্রোটিনের ছোট ছোট নালিকা নিহিত থাকে। এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে আয়ন ও ছোট ছোট অণু যাতায়াত করতে পারে।

(v) আয়নোফোর (ionophore)— আয়োনোফোর ছোট পলিপেপটাইড, যার বাইরের প্রান্ত জলবিকর্ষী (hydrophobic) এবং ভিতরের প্রান্ত জলাকর্ষী (hydrophilic)। জলবিকর্ষী প্রান্তটি পর্দার সাথে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। জলাকর্ষী প্রান্তটি আয়ন ও জলে দ্রবণীয় পদার্থগুলি আকর্ষণ করে ও অন্য পাশে সঞ্চিত করে। আয়নোফোর কোষে বিভিন্ন বস্তুর প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে।

গঠন— Overton (1902) প্রথম প্লাজমা পর্দার গঠনের বিবরণ দেন। তাঁর মতে, প্লাজমা পর্দা অবিচ্ছিন্ন লিপিড স্তর দিয়ে গঠিত। এই মতকে lipoidal theory বলে। পরে Collander ও Barlund (1933) এই মতের কিছু পরিবর্তন করেন। তাঁদের মতে, এই অবিচ্ছিন্ন লিপিড স্তরে কিছু রন্ধ্র থাকে। Gortner ও Grendell (1935) বলেন যে, প্লাজমা পর্দায় লিপিড দ্বিআণবিক (bimolecular leaflet) স্তরে থাকে। Cole (1932) এবং Harvey ও Sharpiro (1934) বলেন যে, প্লাজমা পর্দায় লিপিড ছাড়াও অন্য পদার্থ রয়েছে। J. Danielli ও E. N. Harvey (1935) বলেন যে, প্লাজমা পর্দায় লিপিড ছাড়া প্রোটিন থাকে। বিভিন্ন গবেষণা ও প্রধানত অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর ভিত্তি করে *H. Davson* ও *J. Danielli* প্লাজমা পর্দার আনবিক মডেল (bimolecular leaflet model) গঠন করেন। প্লাজমা পর্দার প্রস্থ সাধারণত 75A।

প্লাজমা পর্দার গঠন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মডেলগুলি হল—

(i) দ্বিআনবিক পত্রক মডেল বা bimolecular leaflet model— *এই মডেল Davson ও Danielli 1935 খ্রিস্টাব্দে গঠন করেন।* তাঁরা বলেন যে, প্লাজমা পর্দায় ফসফোলিপিডের দুইটি স্তর এমনভাবে সাজান থাকে যাতে লিপিডের মেরু (polar) অঞ্চল বা hydrophilic (জলকর্ষী) অংশ বেষ্টনকারী জলীয় ফেজের সংস্পর্শে থাকে। লিপিডের অমেরু (non-polar) অঞ্চল বা hydrophobic (জলকর্ষী) অংশ কেন্দ্রের দিকে থাকে। লিপিডের মেরু প্রান্তগুলি এক স্তর গোলাকার (গ্লোবিউলার) প্রোটিন অণুর সাথে যুক্ত থাকে। সুতরাং, লিপিডের দ্বিআণবিক স্তরকে বেষ্টন করে প্রোটিনের দুইটি অবিচ্ছিন্ন স্তর থাকে। 1956 খ্রিস্টাব্দে এই মডেলের কিছু পরিবর্তন করা হয়। লিপিডের মেরু অঞ্চলগুলি দ্বিআণবিক স্তর থেকে কিছুটা প্রসারিত থাকে এবং সম্ভবত প্রোটিন দিয়ে আবৃত থাকে। প্লাজমা পর্দায় ছোট রন্ধ্র দেখা যায়। এই রন্ধ্রগুলির ব্যাস 7-10Å বা 0.7-1.0μm স্থূল।

(ii) একক পর্দা প্রকল্প (unit membrane hypothesis)— ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে J. D. Robertson (1960) এই মত গঠন করেন। কোষগুলিকে অসমিয়াম টেট্রোক্সাইড এবং পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট দ্রবণে ফিক্স করে অ্যাসিটোন এবং অ্যালকোহলের জলবিয়োজক (dehydrating) দ্রবণে রাখা হয়। এরপর প্লাস্টিকে নিহিত করে ছেদ করা হয়। Robertson প্রোক্যারিওটের প্লাজমা পর্দার এবং বিভিন্ন ইউক্যারিওট কোষের প্লাজমা পর্দার ও অন্যান্য পর্দার গঠন লক্ষ্য করেন।

তিনি এসব পর্দার ত্রিস্তরবিশিষ্ট (trilamella) গঠন দেখেন। এসব পর্দা 75-100Å (7.5-10nm) স্থূল। দুইটি গাঢ় ইলেকট্রন ঘন স্তর (20-25Å বা 2-2.5nm স্থূল) একটি হালকা ইলেকট্রন স্বচ্ছ স্তর (35-50Å বা 3.5-5nm স্থূল) দিয়ে পৃথক থাকে। Robertson বলেন যে, কোষের সব পর্দার গঠন একই রকম এবং এসব পর্দাকে তিনি একক পর্দা বা unit membrane নাম দিয়েছেন (একক পর্দা প্রকল্প বা unit membrane hypothesis)।

Robertson এর মডেল এবং Danielli ও Davson-এর মডেলের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। তবে Robertson-এর মতে দ্বিস্তর লিপিডের উভয় দিকে এক স্তর করে প্রসারিত প্রোটিন অণু থাকে (β-sheet)। প্রোটিন অণুর স্তর 20Å চওড়া এবং দ্বিস্তর লিপিড 35Å চওড়া। কিন্তু Davson ও Danielli-র বর্ণিত গোলাকার প্রোটিন স্তরের স্থূলতা 20Å বেশী। সুতরাং Robertson-এর মডেলের সাথে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের সমতা রয়েছে।

একক পর্দা মডেলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এর বাইরের ও ভিতরের পর্দার কিছু পার্থক্য এই মডেল কোষের পর্দা, যার একদিকে স্যাকারাইড এবং কনজুগেটেড প্রোটিন (যেমন, মিউকোপলিস্যাকারাইড এবং মিউকোপ্রোটিন) যুক্ত

থাকে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এজন্য এই মডেলকে বৃহত্তর পর্দার মডেলও বলা হয়।

একক পর্দা মডেলের সপক্ষে কতকগুলি তথ্য হল—

(i) লিপিডের ঘন বিন্যস্ত স্তর 40% লিপিডের উপস্থিতি সমর্থন করে।

(ii) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা পর্দার ত্রিস্তর রঞ্জক প্যাটার্ন ও একক পর্দার মডেলের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

(iii) স্বাভাবিক পর্দার অবিচ্ছিন্ন হাইড্রোকার্বন স্তর এর উচ্চ বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সমর্থন করে, কারণ হাইড্রোকার্বন বিদ্যুৎ অপরিবাহী বা কম পরিবাহী।

(iv) ছোট ছোট আয়ন যা লিপিডে অদ্রবণীয়, তা পর্দার মধ্যে দিয়ে সহজে যেতে পারে না। কিন্তু লিপিডে দ্রবণীয় অণুগুলি (non-polar molecules) সহজে ঐ পর্দার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে।

একক পর্দা মতবাদের বিরোধীতা—

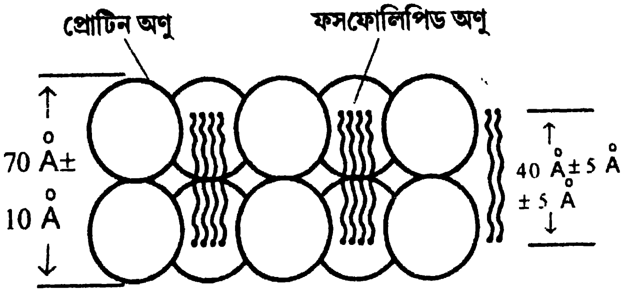
F. S. Sjostrand (1960) বলেন যে, প্লাজমা পর্দার গঠন এবং মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টের পর্দার গঠনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পর্দার মোজাইক মডেলের সাহায্যে এই রকম পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যায়।

(iii) মাইসিলীয় মডেল (micellar model)— 1953 খ্রিস্টাব্দে Hilleir ও Hoffman এই মডেল গঠন করেন। তাঁদের মতে, কোষের পর্দার গঠন স্তরীয় নয় (non-lamellar)। কোষের পর্দা কতকগুলি গোলাকার মাইসেলীর মোজাইক দিয়ে গঠিত। মাইসেলীর কেন্দ্রে লিপিড থাকে ও চারিদিকে জলাকর্ষী (hydrophilic) পোলার গ্রুপের আবরণ থাকে। লিপিড মাইসেলীর উভয় দিকে এক স্তর প্রোটিন থাকে। মাইসেলীয় মোজাইকের কোনও কোনও এককের পরিবর্তে উৎসেচকের অণু থাকতে পারে। গোলাকার মাইসেলীগুলির মধ্যবর্তী স্থানে জলপূর্ণ রন্ধ্র থাকে। এই রন্ধ্রের ব্যাস 4Å।

ইলেকট্রন অণুক্ষীণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা আংশিকভাবে পর্দার স্তরীয় গঠন (lamellar) ও আংশিকভাবে মাইসেলীয় গঠনকে সমর্থন করে। De Robertis-এর (1975) মতে, প্লাজমা পর্দার গঠন স্তরীয়, কিন্তু অন্তঃকোষীয় (intracellular) পর্দাগুলির গঠন মাইসেলীয় প্রকৃতির। এক ধরনের পর্দা অপর ধরনের পর্দায় পরিবর্তিত হতে পারে (গোলাকার দ্বিস্তর রূপান্তর বা globular bilayer transformation)।

(iv) প্রোটিন-কেলাস মডেল (protein crystal model)— David Green ও তাঁর সহকর্মীরা এই মডেল গঠন করেন। তাঁদের মতে, পর্দায় গোলাকার প্রোটিনগুলি দু'টি স্তরে আলগাভাবে সাজান থাকে। গোলাকার প্রোটিন অণুর ব্যাস 30-40Å (3-4μm)। প্রোটিনে অমেরু (non-polar) এবং মেরু (polar) অঞ্চল (ত্বকে) থাকে। প্রোটিন অণুর অমেরু অঞ্চলের সাথে ফসফোলিপিড অণুর অমেরু গোষ্ঠী জলবিকর্ষী (hydropholic) বন্ধন (bond) গঠন করে। গ্লোবিউলার প্রোটিন

অণুগুলির মাঝের ফাঁকা অঞ্চলে ফসফোলিপিডের অণুগুলি থাকে। ফসফোলিপিড অণুর মেরু প্রান্তগুলি পর্দার ত্বকে থাকে।



প্রোটিন কেলাস মডেল- Vander Kool ও Green-এর (1970) মত অনুসারে বড় প্রোটিন অণুর মাঝের ফাঁকা স্থানে ফসফোলিপিডের দ্বিস্তর থাকে।

চিত্র—20b

প্রোটিন কেলাস মডেল—Vanderkool ও Green-এর (1970) মতে বড় প্রোটিন অণুর মাঝের ফাঁকা স্থানে ফসফোলিপিডের দ্বিস্তর থাকে।

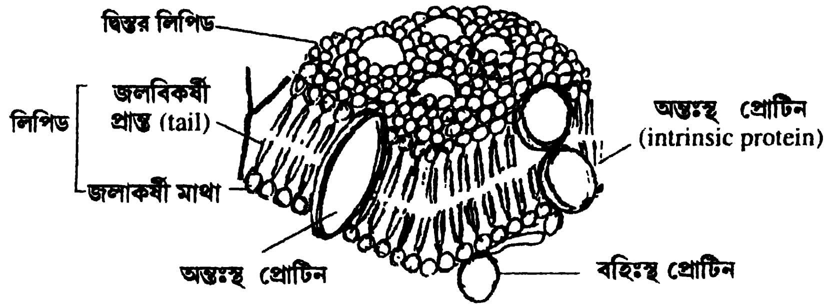
এই মডেলের সাহায্যে পর্দার রাসায়নিক ও কার্য সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন— a) পর্দার থেকে পৃথকীকৃত প্রোটিন অপেক্ষাকৃত ঘন বিন্যস্ত এবং এর ব্যাস 40Å বা বেশি। কিন্তু Robertson-এর একক পর্দা মডেলে প্রোটিনের স্তর চ্যাপ্টা ছিল। b) এছাড়া পর্দার প্রোটিন সাধারণত (ডিটারজেন্ট ছাড়া) জলীয় দ্রবণে অদ্রবণীয়। লিপিডে প্রোটিন নিহিত থাকলে এরকম ধর্ম প্রত্যাশা করা যায়।

পরে Green এই মডেলের কিছু পরিবর্তন করেন। এই গতিশীল (dynamic) মডেল অনুসারে প্রোটিন ও লিপিডের অণুগুলি পর্দার তলে (plane) সঞ্চরনশীল। লিপিডের দ্বিস্তর সাধারণত অবিচ্ছিন্ন থাকে এবং প্রোটিন-প্রোটিন সংযোগ সাময়িক।

(iv) **তরল মোজাইক মডেল (fluid mosaic model)**— S. J. Singer ও G. D. Nicholson 1972 খ্রিস্টাব্দে এই মত প্রকাশ করেন। বিভিন্ন বিজ্ঞানী (Lee 1975) এই মতকে সমর্থন করেছেন। Singer ও Nicholson-এর মতে কোষ পর্দা হল লিপিড ও প্রোটিনের পরিবর্তনশীল তরল মোজাইক। লিপিড দ্বিস্তরে সজ্জিত থাকে ও এর মধ্যে প্রোটিন নিহিত থাকে। এই প্রোটিন 'লিপিড সমুদ্রে ভাসমান বরফখণ্ডের' মত পাশাপাশি সঞ্চরণে সক্ষম। এই ধারনার সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাপমাত্রা কমে গেলে লিপিড তরল অবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত কঠিন বা কেলাসিত অবস্থায় (crystalline) পরিবর্তিত হয় ও এই অবস্থায় প্রোটিনের সঞ্চরণশীলতা যথেষ্ট হ্রাস পায়। ঠিক কোন তাপমাত্রায় লিপিডের 'ফেজ পরিবর্তন' হয়, তা নির্ভর করে পর্দার ফ্যাটি অ্যাসিডের উপাদানের উপর। প্রাণী কোষের পর্দায় কোলেস্টেরল থাকে এবং এটি লিপিড 'ফেজে'র পরিবর্তনের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা কমিয়ে দেয় বা বাতিল করে। ব্যাকটিরিয়া ও উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ কোষের পর্দায় কোলেস্টেরল অনুপস্থিত। এখানে

ছোট শৃঙ্খলের ফ্যাটি অ্যাসিডে আরো বেশি দ্বিবন্ধনে আবদ্ধ থেকে তরল কেলসিত অবস্থা বজায় রাখে।

ফ্রিজ ইচিং (etching) পদ্ধতিতে পরীক্ষাও কোষের পর্দার মোজাইক প্রকৃতি সমর্থন করে। লিপিড স্তরের তরল প্রকৃতি (fluidity) X-রশ্মি বিচ্ছুরণ পরীক্ষা ও



চিত্র—20c

প্লাজমা পর্দার তরল মোজাইক মডেল। লিপিড সমুদ্রে প্রোটিন অণু ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। কোনও কোনও প্রোটিন অণুর একাংশ কেবল একটি স্তরকে উম্মুক্ত রয়েছে। আবার কিছু প্রোটিন লিপিডের দ্বিস্তর ধরে বিস্তৃত রয়েছে।

কোষ-সংযোগ পরীক্ষা দিয়েও সমর্থিত হয়েছে। অনেক বিজ্ঞানী এই মডেল সমর্থন করেছেন। কোষের বিভিন্ন পর্দার লিপিড ও প্রোটিনের উপাদানের কিছু পার্থক্য থাকলেও 'তরল মোজাইক মডেল' সব পর্দার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেসব পর্দায় প্রোটিন ও উৎসেচক কম থাকে (যেমন— মায়েলিন), সেখানে পর্দায় লিপিডের দ্বিস্তর ভালভাবে বোঝা যায় ও 'একক পর্দা' গঠন দেখা যায়। মাইটোকন্ড্রিয়া ও প্লাস্টিডের পর্দায় খুব বেশি প্রোটিন এবং নানা রকম উৎসেচক থাকে। এসব পর্দায় 'একক পর্দা' গঠন ভালভাবে বোঝা যায় না ও এরকম পর্দা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যথেষ্ট দানাদার দেখায়।

বৈশিষ্ট্য— প্লাজমা পর্দার তরল বা অঘনীভূত প্রকৃতির জন্য সামান্য কোনও আঘাত বা রাসায়নিকের প্রভাবে স্থানীয় ক্ষতি সহজেই মেরামত হয়। কিন্তু উৎসেচকের দ্বারা বড় কোনও ক্ষতি যেমন, ব্যাকটিরিয়া, সাপ বা পতঙ্গের দংশনের ফলে নিঃসৃত টক্সিনের প্রভাবে বা T-লিম্ফোসাইট থেকে নিঃসৃত লিম্ফোটক্সিনের প্রভাবে পর্দা বিনষ্ট হয় ও কোষটি মারা যায়। জারনের ফলেও কোষ পর্দা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সাইটোপ্লাজমীয় বিজারক পদার্থ যেমন, গ্লুটাথিয়ন এরকম ক্ষতি সংস্কার করতে পারে। এছাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণীতে ভিটামিন C (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড), E (টোকোফেরল) ইত্যাদি পর্দার ক্ষতি সংস্কার করতে পারে।

প্লাজমা পর্দার গঠন সব জায়গায় একরকম হয় না। যদিও লিপিড ও কিছু প্রোটিন

পার্শ্বীয় সঞ্চালনে সক্ষম, কিন্তু এই সঞ্চালন যেমন খুশীভাবে হয় না। পর্দার কিছু প্রোটিন নিচের মাইক্রোটিউবিউল এবং মাইক্রোফাইব্রিলের জালিকার সাথে যুক্ত থাকায় স্বাধীনভাবে সঞ্চালনে অক্ষম। এজন্য পর্দার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রোটিনের পরিমাণের তারতম্য হয়। পর্দায় প্রোটিনের তুলনায় লিপিডের সঞ্চালন ক্ষমতা বেশি।

প্লাজমা পর্দার দু'টি ত্বকের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। প্লাজমা পর্দার সাধারণত বাইরের ত্বকের সাথে শ্বেতসার বা কার্বোহাইড্রেট যুক্ত থাকে। যেমন, প্রাণী কোষের অন্ত্রের কিনারার কোষের প্লাজমা পর্দা। প্লাজমা পর্দার দুই ত্বকে প্রোটিনের তারতম্য হতে পারে। পর্দার কাজের জন্য এর দুই দিকের অসমতা গুরুত্বপূর্ণ।

রন্ধ্র (pore)— অসমোটিক চাপ সম্বন্ধে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন যে, প্লাজমা পর্দায় ছোট ছোট রন্ধ্র থাকে। এই রন্ধ্রের ব্যাস মোটামুটি 10Å পর্যন্ত। পর্দার বিভিন্ন অণুগুলি সঞ্চরণশীল হওয়ায় সাময়িক রন্ধ্র (dynamic pore) বা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী রন্ধ্রের (structural pore) সৃষ্টি হয়। Capaldi (1974) বলেন যে, প্লাজমা পর্দায় কিছু ব্যবধানে নালিকা (channel) প্রোটিন থাকে ও এর মধ্যে দিয়ে আয়ন ও ছোট ছোট অণু যাতায়াত করতে পারে। কোনও কোনও বিজ্ঞানী মনে করেন যে, প্লাজমা পর্দায় আয়নোফোর (ionophore) থাকে যা রন্ধ্রহিসাবে কাজ করে। আয়নোফোর হল ছোট পলিপেপটাইড যার এক প্রান্ত জলবিকর্ষী (hydrophobic) এবং অপর প্রান্ত জলাকর্ষী (hydrophilic)। বিপাকীয় অবস্থার উপর প্লাজমা পর্দার রন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ হওয়া নির্ভর করে।

কোষ মধ্যবর্তী স্থান— বহুকোষী প্রাণীতে দু'টি পাশাপাশি কোষের প্লাজমা পর্দা 10-150Å ব্যবধানে থাকে। দু'টি কোষের মধ্যবর্তী এই স্থানে কম ইলেকট্রন ঘনত্বের সিউডোপলিস্যাকারাইড থাকে।

কাজ— প্লাজমা মেমব্রেন সজীব কোষের কার্যকরী অংশ ও এটি কোষের (প্রাণী কোষের) আকার নিয়ন্ত্রণ করে, কোষকে রক্ষা করে, কোষের সারফেস টেনশন (surface tension) বা পৃষ্ঠ টান বাড়ায়, কোষে কোনও বস্তুর প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। প্লাজমা পর্দার নির্বাচিত ভেদ্যতা (selective permeability) দেখা যায়, অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়ে নির্বাচিত বস্তু কোষে প্রবেশ করতে পারে।

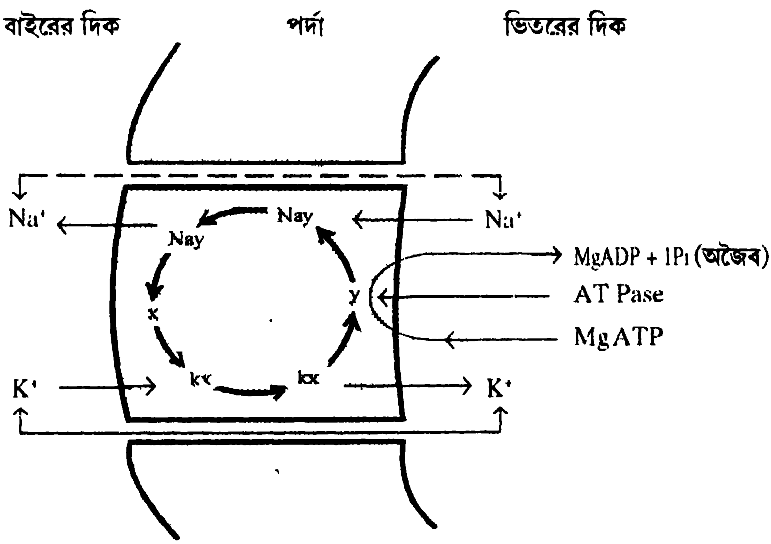
প্লাজমা পর্দার মধ্যে দিয়ে আয়ন ও অণুগুলি দুই ভাবে যেতে পারে— নিষ্ক্রিয় ব্যাপন (passive diffusion) এবং সক্রিয় (active) ব্যাপন। সক্রিয় ব্যাপনে শক্তির প্রয়োজন। নিষ্ক্রিয় ব্যাপনে শক্তির প্রয়োজন হয় না। ব্যাপনে বেশি ঘনত্ব থেকে অণুগুলি কম ঘনত্বের দিকে ধাবিত হয়। অসমোসিস বা অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় যখন দু'টি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি অর্ধভেদ্য দিয়ে পৃথক থাকে, তখন দ্রবণ প্রধানত কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে যায়।

প্লাজমা পর্দার একদিক থেকে অন্যদিকে অণুগুলি তিনটি ধাপে যেতে পারে। (a) দ্রব (solute) বাইরের জলীয় ফেজ (phase) থেকে পর্দার জলবিকর্ষী (hydrophobic)

অঞ্চলে প্রবেশ করে, (b) লিপিড স্তরের মধ্যে দিয়ে যায়, (c) লিপিড স্তরের থেকে ভিতরের জলীয় ফেজে প্রবেশ করে। Collander ও Barlund-এর মতে, পর্দার মধ্যে দিয়ে কী হারে অণু বা আয়নগুলি যাবে তা নির্ভর করে ওই অণুর আয়তন ও লিপিডে দ্রবণীয়তার ওপর। ছোট অণুগুলি পর্দার মধ্যে দিয়ে বেশি দ্রুত যেতে পারে। লিপিডে বেশি দ্রবণীয় অণুগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুত হারে প্লাজমা পর্দার মধ্যে দিয়ে যায়। পর্দার মধ্যে দিয়ে আয়নের ব্যাপন তড়িৎ নতিমাত্রার (electrical gradient) ওপর নির্ভরশীল।

সক্রিয় সংবহনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে—

a) পর্দার মধ্যে দিয়ে যেই অণু (s) যাবে, সেটি পর্দার কোনও রাসায়নিক বস্তুর (c) সাথে বিক্রিয়া করে ও একটি যৌগ (cs) গঠন করে। এই যৌগ পর্দার মধ্যে দিয়ে যায় ও পর্দার ভিতর দিকে আরেকটি বিক্রিয়ার ফলে ওই অণুটি (s) মুক্ত হয়। নির্দিষ্ট রাসায়নিক বস্তুটি (c) প্রোটিন বা লাইপোপ্রোটিন পর্দার ভিতর দিকে অণুটি যৌগ থেকে উন্মুক্ত হওয়ার সময় প্রয়োজনীয় শক্তি ATP সরবরাহ করে। বহনকারী পদার্থটি (c) পুনরায় পর্দার বাইরের ত্বকে যায় ও আরেকটি অণুর সাথে যৌগ গঠন করে। কোষ পর্দায় ভিন্ন ভিন্ন বহনকারী (carrier) পদার্থ থাকে, যা নির্দিষ্ট অণু বা আয়নের সাথে যৌগ গঠন করে ও ওইগুলিকে পর্দার ভিতরের দিকে নিয়ে আসে।

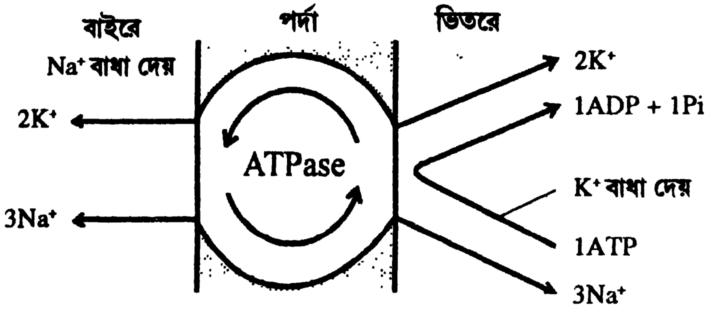


চিত্র—20d

Na ও K-এর সক্রিয় শোষণের ছক

(b) কোষের বিপাকীয় কাজের ফলে কোষস্থ অণু বা আয়নগুলি কমে যেতে

পারে। যেমন, অজৈব ফসফেট জৈব ফসফেটে (ATP) পরিবর্তিত হওয়ায় ফসফেট আয়ন কমে যায়। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বাইরের থেকে ফসফেট আয়ন প্রবেশ করে।



চিত্র—20e

কোষ পর্দায় Na^+K^+ATPase

অধিকাংশ কোষ থেকে Na^+ আয়ন সক্রিয়ভাবে বেরিয়ে যায় এবং K^+ আয়ন প্রবেশ করে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে জানা গেছে K^+ দ্রুত প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু Na^+ অপেক্ষাকৃত ধীরে কোষ থেকে নির্গত হয় (Harris, 1950) যথা— ইস্টে, *Nitella*-এ। তড়িৎ-রসায়ন (electro-chemical) নতিমাত্রার (gradient) বিপরীতে সোডিয়াম আয়নের চলন বাহকের (carrier) সাহায্যে হয় ('সোডিয়াম পাম্প')।

কোষ পর্দার ভিতরের দিকে Na^+ বাহক Y-এর সাথে যুক্ত হয়ে NaY যৌগ গঠন করে। এটি কোষ পর্দার মধ্যে দিয়ে যায় ও বাইরের দিকে Na^+-কে মুক্ত করে। Y-এর কিছু রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে X-এ পরিবর্তিত হয়। X এরপর K^+ সাথে যুক্ত হয় (KX)। যৌগটি কোষ পর্দার মধ্যে দিয়ে যায়। কোষ পর্দার ভিতরের দিকে এনজাইম ATPase-এর প্রভাবে K^+ মুক্ত হয়। এই বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি MgATP সরবরাহ করে। বাহক X Y-এ পরিবর্তিত হয়।

যদিও এই ধারণা প্রমাণিত হয়নি, কিন্তু এই মতের স্বপক্ষে তথ্য ক্রমশ পাওয়া যাচ্ছে।

উৎপত্তি — প্লাজমা পর্দার উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি প্রধান মত আছে। (a) প্লাজমা পর্দা একটি স্বাধীন অঙ্গাণু ও এটা কোষের বৃদ্ধির সাথে সাথে স্বাধীনভাবে গঠিত হয়। (b) দ্বিতীয় মত অনুসারে প্লাজমা পর্দা সাইটোপ্লাজমের বর্হিভাগে সক্রিয় বস্তুর সঞ্চয়ের ফলে গঠিত হয়। এই মতের সপক্ষে দেখা গেছে যে, যেখানেই প্লাজমা পর্দা বিনষ্ট হয়ে যায় সেখানেই আবার নতুন প্লাজমা পর্দা তৈরি হয়।

অনেক ক্ষেত্রে প্লাজমা পর্দার সাথে এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা এবং নিউক্লিও পর্দার

সংযোগ দেখা গেছে। কোনও কোনও বিজ্ঞানীর মতে প্লাজমা পর্দা থেকে এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার সৃষ্টি হয়। তবে এই নিয়ে মতভেদ রয়েছে। প্লাজমা পর্দার সাথে গলগি বস্তুর নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা হয়েছে।

প্লাজমা পর্দার বিশেষ বৈশিষ্ট্য—

(i) মাইক্রোভিলি (microvilli)— কখনও কখনও প্লাজমা পর্দা ভাঁজ হয়ে বাইরের দিকে আঙুলের মত প্রসারিত অবস্থায় থাকে। এগুলিকে মাইক্রোভিলি বলে। অন্ত্রের এপিথেলিয় (epithelial) কোষের মুক্ত ত্বকে মাইক্রোভিলি দেখা যায়। এগুলি 0.6-0.8μm লম্বা ও এর ব্যাস 0.1μm (100Å)। মাইক্রোভিলিতে সাইটোপ্লাজমের সরু প্রসারিত অঞ্চলকে আবৃত করে প্লাজমা পর্দা থাকে। এই সাইটোপ্লাজমের দৈর্ঘ্য বরাবর মাইক্রোফিলামেন্ট থাকে। এর ব্যাস 30-60Å। এই মাইক্রোফিলামেন্টে অ্যাকটিন ও মায়োসিন থাকে। এই সূত্র মাইক্রোভিলির অগ্রভাগের সাথে α-অ্যাকটিনিন দিয়ে যুক্ত থাকে এবং মাইক্রোফিলামেন্টগুলি পাশাপাশি সাজান জালিকার মাইক্রোফাইব্রিলের সাথে যুক্ত (terminal web বা bar)। প্লাজমা পর্দার বাইরের ত্বক সূত্রাকার বস্তু (fuzzy coat) দিয়ে আবৃত থাকে। এই সূত্রগুলি গ্লাইকোপ্রোটিনের বড় অণু। একটি কোষে প্রায় 3000টি মাইক্রোভিলি থাকতে পারে। অন্ত্রের ত্বকে এক বর্গ মিলিমিটার অঞ্চলে 200,000,000 মাইক্রোভিলি থাকতে পারে। প্রাণীর অন্যান্য কিছু কোষে মাইক্রোভিলি দেখা যায়, যেমন, বৃক্কের (kidney) টিউবিউলের কোষে, পিত্তথলির (gall bladder) এপিথেলিয় কোষে, যকৃতের (liver) কোষে। তবে এসব কোষে মাইক্রোভিলির সংখ্যা অন্ত্রের কোষের চেয়ে কম। মাইক্রোভিলি শোষণ ত্বক বাড়ায়। মাইক্রোভিলিগুলির মাঝের সরু অঞ্চল শোষণের সময় ছাঁকনির মত কাজ করে ও এসব অঞ্চল দিয়ে বিভিন্ন বস্তু যেতে পারে।

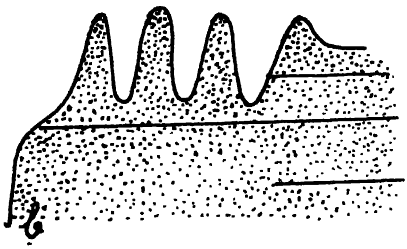
কাঁকড়াবিছার বিষগ্রন্থির কোষের মাইক্রোভিলি শাখাযুক্ত হয়। এগুলিকে বৃক্ষাকার (বা dendritic) মাইক্রোভিলি বলে।

(ii) ক্যাভিওলি (Caveolae)— কোনও কোনও সক্রিয় সংবহনকারী কোষে (যেমন বৃক্কের কোষ) প্লাজমা পর্দার নিচের দিকে অনেক ভাঁজ দেখা যায়। প্লাজমা পর্দার এসব ভাঁজের নিচের অংশ কখনও কখনও পর্দা দিয়ে পৃথক হয়। এর ফলে ছোট প্রকোষ্ঠের সৃষ্টি হয়। সক্রিয় শোষণ যেসব কোষে (যেমন, বৃক্কের কোষে) হয়, সেখানে এরকম প্রকোষ্ঠ দেখা যায়। এসব অঞ্চলে অনেক মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। সম্ভবত এসব মাইটোকন্ড্রিয়া এবং উৎসেচক সক্রিয় লবণ শোষণের জন্য প্লাজমা পর্দায় প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায়।

Yamada (1955) ক্যাভিওলি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। প্লাজমা পর্দার গুহার আকারের (cave-like) ভাঁজকে তিনি এই নাম দিয়েছেন। এর রকম ভাঁজ যেসব কোষ নিঃসরণ (secretion) করে বা কোনও বস্তু encytosis প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করতে পারে সেখানে দেখা যায়।

(iii) প্লাজমা পর্দার বিভিন্ন রকম সংযোগ (junction)

কখনও কখনও প্রাণীর পাশাপাশি কোষের প্লাজমা পর্দা পরস্পরের সংলগ্ন থাকে ও একটি বন্ধন বা সংযোগ গঠন করে। পাশাপাশি কোষের প্লাজমা পর্দার প্রোটিনের মধ্যে নির্দিষ্ট বিক্রিয়া হয় ও সংযোগ (junction) সৃষ্টি হয়। এই সংযোগ নানা রকম হয়, যেমন— (a) দৃঢ় সংযোগ (tight junction বা zonula occludens), (b) ফাঁক সংযোগ (gap junction বা nexus), (c) মধ্যবর্তী সংযোগ (intermediary junction বা zonula adherens) এবং (d) ডেসমোজোম (macula adherens) ইত্যাদি।



চিত্র—20f

প্লাজমা মেমব্রেনের কোনও কোনও জায়গায় ভাঁজ হওয়ার ফলে মাইক্রোভিলাই-এর সৃষ্টি হয়েছে

(a) **দৃঢ় সংযোগ** বা zonula occludens— পাশাপাশি দু'টি কোষের প্লাজমা পর্দাদ্বয় কোনও কোনও অঞ্চলে পরস্পরের সাথে এত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে যে, কোষ মধ্যবর্তী স্থান অনুপস্থিত থাকে ও আপাত দৃষ্টিতে একটি পাঁচ স্তর বিশিষ্ট পর্দার সৃষ্টি হয়। এরকম অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ব্যাপন হয় না। এরকম সংযোগ মস্তিষ্কের কোষে, অন্ত্রের কোষে, পিত্ত থলির কোষে এবং গ্রন্থির কিনারার কোষে দেখা যায়।

(b) **ফাঁক সংযোগ** বা nexus fascia occludens— McNutt বা Weinstein (1970) দেখেন, কোনও কোনও পাশাপাশি কোষের প্লাজমা পর্দা খুব কাছে অবস্থান করে। এরকম দু'টি পর্দার মাঝের কোষ মধ্যবর্তী স্থান 20Å চওড়া। এই কোষ মধ্যবর্তী স্থানে অনেক প্রোটিনের দানা থাকে। প্রত্যেক প্রোটিন অণুর মধ্যে নালিকা (channel) রয়েছে, যার মধ্যে দিয়ে এক কোষ থেকে অপর কোষে আয়ন ও অণু যাতায়াত করতে পারে। স্পর্শক (tangential) ছেদে দু'টি কোষের মধ্যের এই ফাঁক অঞ্চল ছ'কোণা (70-75Å চওড়া) দেখায়। ফাঁক সংযোগ ভেদ্যতা Ca^{++} দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।

ফাঁক সংযোগ ভ্রূণের কোষে এবং পরিণত কলার পেশী কোষে এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীর স্নায়ু কোষে দেখা যায়।

যদি দু'টি পাশাপাশি কোষের মধ্যবর্তী স্থান 40-70Å চওড়া হয়, তাহলে ঐ সংযোগকে বদ্ধ সংযোগ বা close junction বলে।

(c) **মধ্যবর্তী সংযোগ** বা zonula adherens— দু'টি পাশাপাশি অবস্থিত বেলনাকার কোষের প্লাজমা পর্দায় এরকম সংযোগ দেখা যায়। এরকম সংযোগকে terminal barও বলা হয়। এটি ডেসমোজোমের অনুরূপ, কেবল এখানে টোনোফাইব্রিল থাকে না। অগ্রস্থ 'বার'-এ প্লাজমা পর্দা স্থূল এবং এই অঞ্চলে ঘন সাইটোপ্লাজম থাকে। মধ্যবর্তী সংযোগে পাশাপাশি কোষের প্লাজমা পরস্পরের খুব কাছে থাকে ও একটি জালিকাকার গঠন সৃষ্টি করে, যা কোষের অগ্রস্থ অঞ্চলেও বিস্তৃত থাকে।

(d) **ডেসমোজোম (desmosome)** বা macula adherens— কোনও কোনও পাশাপাশি অবস্থিত এপিথেলিয় (ত্বকের) কোষের প্লাজমা পর্দাদ্বয় কিছু অঞ্চলে স্থূল হয়। এরকম স্থূল অঞ্চল থেকে অনেক সূত্রাকার টোনোফাইব্রিল বা টোনোফিলামেন্ট কোষের ভিতর দিকে প্রসারিত থাকে। এরকম স্থূল অঞ্চলকে ডেসমোজোম বলে। এই গোলাকার বা চাকতির মত অঞ্চলের ব্যাস 0.5μm। এই অঞ্চলে দু'টি প্লাজমা পর্দার মধ্যে ব্যবধান হল 300-500Å। এই কোষ মধ্যবর্তী স্থানে ঘন আবরণী পদার্থ থাকে। এই পদার্থে অ্যাসিড মিউকো-পলিস্যাকারাইড ও প্রোটিন থাকে, যা ডেসমোজোম অঞ্চলে প্লাজমা পর্দা দু'টিকে সংযুক্ত রাখে। টোনোফাইব্রিল যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করে। কোনও কোনও বিজ্ঞানী (Trinkaus 1969) মনে করেন যে, কেবল মেরুদণ্ডী প্রাণীর কলায় ডেসমোজোম দেখা যায়।

(e) হেমিডেসমোজোম— কোনও কোনও এপিথেলিয় কোষের নিচের ত্বকে হেমিডেসমোজোম দেখা যায়। এগুলি ডেসমোজোমের অনুরূপ, কেবল এর বাইরের ত্বকে কোলাজেনের আবরণ থাকে।

(f) পর্দাবিশিষ্ট ডেসমোজোম— অমেরুদণ্ডী প্রাণীর এপিথেলিয় কোষে এরকম ডেসমোজোম দেখা যায় (Wood 1959, Locke 1965 ও Gauranten 1967)। এরকম ডেসমোজোমে দু'টি প্লাজমা পর্দার ব্যবধান হল 150-200Å। প্লাজমা পর্দা দু'টি অনেক সমান্তরাল প্রস্থ পর্দা দিয়ে যুক্ত থাকে। এরকম ডেসমোজোমে সংলগ্নকারী পদার্থ এবং টোনোফিলামেন্ট অনুপস্থিত।

(g) মধ্যবর্তী ভাঁজ বা inter-digitation— দু'টি পাশাপাশি কোষের প্লাজমা পর্দা কোনও কোনও অঞ্চলে ভাঁজ হয়ে আঙ্গুলের মত প্রসারিত অবস্থায় থাকে। এরকম ভাঁজকে interdigitation বলে। ডেসমোজোম এবং অগ্রস্থ ভাঁজের উপস্থিতির ফলে মধ্যবর্তী ভাঁজ আরো জটিল হয়।

প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm)

কোষ প্রাচীর ছাড়া কোষের বাকী সব অংশকে একসাথে প্রোটোপ্লাজম বলে। তবে ভ্যাকুওলকে এর মধ্যে ধরা হয় না। প্রোটোপ্লাজম সান্দ্র, জিলেটিন সদৃশ ও এখানে বিভিন্ন কোলয়েড সল (sol) ও জেল (gel) অবস্থায় থাকে।

ভৌত (Physical) ধর্ম — প্রোটোপ্লাজম সজীব ও কোলয়ডীয় প্রকৃতির। এর স্বচ্ছ হায়ালোপ্লাজমে (hyaloplasm) বিভিন্ন কোলয়ডীয় পদার্থের নানা রকম আয়তনের পরমাণু, অণু বা অণু সমষ্টি থাকে। এরকম পদার্থগুলি জলে দ্রবণীয় হ'লে এদের জলাকর্ষী বা hydrophilic বলে। আর যেসব কোলয়েড জলে অদ্রবণীয় সেগুলিকে জলবিকর্ষী বা hydrophobic বলে।

প্রোটোপ্লাজম বিভিন্ন ধরনের দেখতে হয়—

i) দানাদার বা granular - 1893 খ্রিস্টাব্দে Altman বলেন যে, প্রোটোপ্লাজমে বিভিন্ন আয়তনের নানা রকম দানা ভিন্ন ভিন্নভাবে সাজান থাকে।

ii) সূত্রাকার বা filbriller - Flemming বলেন যে, প্রোটোপ্লাজমের ধাত্রে (matrix) বিভিন্ন রকম সূত্র নিহিত থাকে। এসব সূত্র প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এগুলিকে মাইসেলি (micelle) বলে।

iii) জালিকাকার বা reticular - কোনও কোনও জীবে প্রোটোপ্লাজম জালিকাকার দেখায়।

iv) অ্যালভিওলিযুক্ত বা alveolar - 1902 খ্রিস্টাব্দে Butschli বলেন, প্রোটোপ্লাজম ইমালশনের ফেনার মত ছোট ছোট বুদবুদ বা অ্যালভিওলি দিয়ে গঠিত।

প্রোটোপ্লাজম সল (sol) ও জেলের (gel) কোলয়ডীয় প্রক্রিয়া। জেল অবস্থা অর্ধ কঠিন ও জেলীর মত। এখানে অণুগুলি বিভিন্ন শক্তির বন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকে। কোলয়েডগুলি জল শোষণ করলে অধিক তরল 'সল' (sol) অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়াকে 'সল' গঠন বা solation বলে। কোষের শারীরবৃত্তিয়, জৈবিক ও যান্ত্রিক কাজের ওপর নির্ভর করে প্রোটোপ্লাজম 'সল' অবস্থায় কিংবা 'জেল' অবস্থায় থাকে। এই দু'টি অবস্থা পরস্পর পরিবর্তনশীল।

প্রোটোপ্লাজমের কোলয়ডীর প্রকৃতির জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা হয়েছে—

i) বিভিন্ন **ফেজ** বা দশার (সল বা জেল ফেজ) **পরিবর্তন** তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল। কোষের কেন্দ্রের দিকে প্রোটোপ্লাজম 'সল' অবস্থায় থাকে। কারণ নিউক্লিয়াসের নিকটবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন বিক্রিয়া হওয়ায় তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। কোষের পরিধির দিকে প্রোটোপ্লাজম 'জেল' অবস্থায় থাকে কারণ এই অঞ্চলে বিপাকীয় বিক্রিয়া কম হওয়ায় তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হয়। কোষের বিভিন্ন পর্দা (কোষ পর্দা, ER) জেল সদৃশ।

ii) **Tyndall-এর প্রভাব** ঃ যদি কোলয়ডীয় দ্রবণের মধ্যে দিয়ে জোরালো আলোর সরু রশ্মি যেতে দেওয়া হয় এবং এর সমকোণে দেখা হয়, তাহলে বিক্ষিপ্ত অণুগুলি থেকে আলো ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ওই অণুগুলি দেখা যায়।

iii) **সংকোচন ও স্থিতিস্থাপকতা (elasticity)** — প্রোটিন অণুর ভাঁজ হওয়া এবং ভাঁজ খুলে যাওয়ার ওপর সংকোচন ও স্থিতিস্থাপকতা নির্ভরশীল। এই ধর্মের জন্য কোষ যথেষ্ট জল ও অন্যান্য দ্রবণ শোষণ করতে পারে।

iv) **সান্দ্রতা বা viscosity** ঃ দ্রব (solute) ও দ্রাবকের (solvent) অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণের ফলে সান্দ্রতার সৃষ্টি হয়। প্রোটোপ্লাজম সান্দ্র। বিভিন্ন কোষে অথবা একই কোষের বিভিন্ন অঞ্চলে সান্দ্রতার পার্থক্য হয়। এছাড়া একই কোষের একই অঞ্চলে কিন্তু বিভিন্ন সময়ে সান্দ্রতার পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রভাবকের (যেমন, তাপ, বৈদ্যুতিক কারেন্ট) প্রভাবে সান্দ্রতার তারতম্য হয়।

v) **আলোর প্রতিসরণ (refraction)** ঃ প্রোটোপ্লাজমের প্রতিসরাঙ্ক হল 1.4, অর্থাৎ এটি মোটামুটি হোমোজিনিয়াস (সম প্রকৃতির)। তবে নিউক্লিওজালিকা, ক্রোমোজোম, মাইটোকন্ড্রিয়া ইত্যাদি থেকে আলো প্রতিসরিত (birefrigence) হয়। আলোর প্রতিসরণ লক্ষ্য করে কোষ পর্দায় বিভিন্ন অণুর বিন্যাস সম্বন্ধে জানা যায়।

vi) **অ্যাডসরপশন (adsorption)** ঃ কোনও কোনও তরল বা কঠিন বস্তুর ত্বকে কিছু অণু, পরমাণু বা অণুসমষ্টির লেগে থাকার ধর্মকে অ্যাডসরপশন বলে। কোলয়ডের এই ধর্ম রয়েছে। এই ধর্ম ধাত্র বা ম্যাট্রিক্সে প্রোটিন সীমানা গঠনে সহায়তা করে।

vii) **অধঃক্ষেপ (precipitation)** ঃ কোনও কোনও ইলেক্ট্রোলাইট কোলয়ডীয় সাসপেনশনে দিলে বিক্ষিপ্ত কণাগুলি পরস্পরকে ধাক্কা দেয় এবং যুক্ত হয় ও পরিশেষে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

viii) **বৈদ্যুতিক ধর্ম** ঃ কোলয়ডীয় কণাগুলির বৈদুতিক চার্জ [যথা + iv (বা ধনাত্মক) বা — iv (ঋণাত্মক) চার্জ] থাকে। একটি কোলয়ডীয় প্রক্রিয়ার সব কণাগুলির হয় + iv না হয় - iv চার্জ থাকে।

ix) **প্রোটোপ্লাজমের চলন (movement)** ঃ প্রোটোপ্লাজমের সান্দ্রতা ও সংকোচনের প্রকৃতির জন্য চলন দেখা যায়। চলন নানা রকমের —

a) **সাইক্লোসিস** ঃ কোষ প্রাচীরে আবদ্ধ প্রোটোপ্লাজমের চলনকে **সাইক্লোসিস** বলে। এই চলন স্থানিক। সাইক্লোসিস (cyclosis) আবার দুই ধরনের — **প্রবাহগতি** ও **আবর্তনগতি**। প্রবাহগতিতে প্রোটোপ্লাজম একটি নির্দিষ্ট দিকে চালিত হয়। আবর্তন গতিতে প্রোটোপ্লাজম বিভিন্ন দিকে চালিত হয়।

b) **অ্যামিবার চলন** ঃ অ্যামিবায় এরকম চলন হয়। এই চলনে সম্পূর্ণ প্রোটোপ্লাজমের চলন হয়। প্রোটোপ্লাজমের একটি দিক প্রসারিত হয় ও অন্য দিকটি সংকুচিত হয় ও অন্য দিকে সরে আসে। সাইটোপ্লাজম সমগ্রভাবে (অর্থাৎ বিভিন্ন কণা ইত্যাদি নিয়ে) চালিত হয়।

c) **ব্রাউনিয় গতি (Brownian movement)** ঃ কোলয়ডীয় কণাগুলির যদৃচ্ছ চলন। এই চলনে কোলয়ডীয় কণাগুলির পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ হয়। মাইটোসিসের প্রফেজে এই চলন ভাল করে দেখা যায়। তাপমাত্রার বৃদ্ধিতে ব্রাউনিয় চলন বাড়ে।

প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন বস্তু কোলয়ডীয় অবস্থায় থাকে বলে এটিকে 'polyphasic colloid' বলে। সেন্ট্রিফিউজ করলে কোষের বিভিন্ন উপাদান পৃথক হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, এসব উপাদানগুলি প্রোটোপ্লাজমে 'সাসপেনশন' অবস্থায় থাকে।

রাসায়নিক গঠন— প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক গঠন জটিল। সাধারণত প্রোটোপ্লাজমে 75 শতাংশ জল থাকে। কিন্তু জলজ উদ্ভিদে এই পরিমাণ 95 শতাংশ পর্যন্ত হয়। রেণু ও সুপ্ত বীজে (dormant seed) জলের পরিমাণ মাত্র 10—15%। প্রোটোপ্লাজমের শুষ্ক ওজনের 90% জৈব পদার্থ ও 10% অজৈব পদার্থ। জৈব পদার্থের মধ্যে প্রোটিন, লিপিড (স্নেহ পদার্থ) কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এইসব উপাদানের মধ্যে প্রোটিনই প্রধান। প্রোটোপ্লাজমে বিভিন্ন রকমের অজৈব লবণ (যেমন, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির ক্লোরাইড, সালফেট, ফসফেট, কার্বোনেট) থাকে।

প্রোটোপ্লাজমে 34 রকমের এলিমেন্ট (element) থাকতে পারে, তবে বারো রকমের element সর্বত্র দেখা যায়। এছাড়া কিছু উপাদান যেমন, আয়োডিন, কপার (বা তামা), সিলিকন, কোবাল্ট, জিঙ্ক (দস্তা), বোরন ইত্যাদি থাকতে পারে। এগুলি কোনও বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে সহায়ক কো-ফ্যাক্টর হিসাবে থাকতে পারে।

প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন মৌলের (এলিমেন্টের) নাম ও এদের কাজের তালিকা দেওয়া হল—

নাম	কাজ
I অতিমাত্রিক মৌল	
i) কার্বন (c)	সব জৈব অণুতে থাকে।
ii) হাইড্রোজেন (H)	বেশিরভাগ জৈব অণুতে থাকে, জলের উপাদান।
iii) অক্সিজেন (O)	a) কোষের শ্বসনে প্রয়োজন। b) বেশিরভাগ জৈব পদার্থে থাকে। c) জলের উপাদান।
iv) নাইট্রোজেন (N)	a) সব প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের উপাদান। b) ATP, সহ উৎসেচক ও ক্লোরোফিলের উপাদান।
স্বল্পমাত্রিক মৌল	
i) ফসফরাস (P)	a) নিউক্লিক অ্যাসিডের উপাদান। b) শক্তি স্থানান্তরণে প্রয়োজন। c) প্রাণীর হাড়ের (bone) একটি উপাদান। d) সহ উৎসেচক, ATP ফসফোলিপিড, শর্করা-ফসফেট ইত্যাদির উপাদান।
ii) পটাশিয়াম (K)	a) উৎসেচক সক্রিয়ক। b) পত্ররন্ধ্র উন্মোচনে প্রয়োজন।

c) কোষের প্রধান পজেটিভ আয়ন।
d) প্রাণী কোষে পেশীর সঙ্কোচনে সহায়তা করে।
c) এছাড়া স্নায়ুর উদ্দীপনা চলাচলে সহায়তা করে।

(iii) সোডিয়াম (Na)
a) কোষের একটি প্রধান পজেটিভ আয়ন।
b) কোষের জলের ভারসাম্য বজায় রাখে।
c) প্রাণী কোষের স্নায়ুর উদ্দীপনা চলাচলে সহায়তা করে।

(iv) ক্যালসিয়াম (Ca)
a) মধ্য পর্দার উপাদান,
b) α-অ্যামাইলেজের উপাদান,
c) কোষ পর্দার গঠন ও ভেদ্যতায় ভূমিকা রয়েছে।
d) প্রাণীর দাঁত ও হাড়ের উপাদান,
c) স্নায়ুর উদ্দীপনা চলাচলে সহায়তা করে,
f) প্রাণীতে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

(v) সালফার (S)
অনেক প্রোটিনের উপাদান, যেমন, থায়ামিন, বায়োটিন, কো-এনজাইম A।

(vi) ম্যাগনেসিয়াম (Mg)
a) ক্লোরোফিলের উপাদান,
b) উৎসেচকের সক্রিয়ক,
c) রাইবোসোমের গঠন যথাযথ রাখে।

(vii) ক্লোরিন (Cl)
a) গুরুত্বপূর্ণ নেগেটিভ আয়ন।

viii) আয়রন (Fe) বা লোহা
a) উৎসেচকের সক্রিয়ক,
b) সাইটোক্রোম ও ফেরডক্সিন গঠনে প্রয়োজন,
c) ক্লোরোফিল গঠনে ভূমিকা রয়েছে।
d) প্রাণী কোষের হিমোগ্লোবিন ও মায়ালোগ্লোবিনের উপাদান।

প্রোটোপ্লাজমে বিভিন্ন রকম প্রোটিন থাকে। এর মধ্যে জলে অদ্রবণীয় গ্লোবিউলিন জাতীয় প্রোটিনই প্রধানত এর কোলয়ডীয় ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া সরল প্রোটিন হিস্টোন ক্রোমোসোমে থাকে। অন্য পদার্থের সাথে যুক্ত প্রোটিন অর্থাৎ যুগ্ম প্রোটিনও (conjugated protein) প্রোটোপ্লাজমে থাকে। ক্রোমোসোমের নিউক্লিও প্রোটিন হল

যুগ্ম প্রোটিন। লিপিডের সাথে যুক্ত প্রোটিন, লাইপোপ্রোটিনও প্রোটোপ্লাজমে থাকে। তাছাড়া কোষের বিভিন্ন উৎসেচকেও প্রোটিন থাকে। প্রোটোপ্লাজমের স্নেহ পদার্থ বা লিপিডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফসফরাসযুক্ত লিপিড বা ফসফোলিপিড। কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা প্রোটোপ্লাজমে বিভিন্ন খাদ্যরূপে সঞ্চিত থাকে। পেন্টোজ জাতীয় শর্করা DNA ও RNA-র প্রধান উপাদান।

প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন অজৈব পদার্থ প্রধানত আয়ন হিসাবে থাকে। এর মধ্যে ফসফেট আয়ন (PO_4) উল্লেখযোগ্য। এটি ফসফোলিপিড, ফসফোপ্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড এবং অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেটে (ATP) থাকে। ATP হল কোষের শক্তির আধার স্বরূপ। সালফার অ্যামিনো অ্যাসিডের উপাদান হিসাবে থাকে। বিভিন্ন উৎসেচকের কো-ফ্যাক্টর (co-factor) হিসাবে ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা ইত্যাদি কাজ করে। প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন রকম শ্বেতসার, প্রোটিন, লিপিড ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদভাবে অলোচনা করা হয়।

কার্বহাইড্রেট বা শ্বেতসার

কার্বোহাইড্রেটে (ল্যাতিন carbo - কয়লা, গ্রিক hydro - জল) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 1 : 2 : 1 অনুপাতে থাকে। এর রাসায়নিক সঙ্কেত হল $(CH_2O)_n$। n পরমাণুর সংখ্যা নির্দেশ করে। উদ্ভিদ দেহের 80% হল কার্বোহাইড্রেট। সালোকসংশ্লেষের ফলে কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন হয়।

কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিন্যাস

কার্বোহাইড্রেটের প্রধান তিনটি শ্রেণী হল মনোস্যাকারাইড, অলিগোস্যাকারাইড এবং পলিস্যাকারাইড। প্রথম দুই ধরনের কার্বোহাইড্রেটকে শর্করা (sugar) বলে। এগুলি জলে দ্রবণীয় ও মিষ্টি। পলিস্যাকরাইড হল স্টার্চ, সেলুলোজ ইত্যাদি।

কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসারের শ্রেণীবিন্যাস

নাম	রাসায়নিক উপাদান	উদাহরণ
I) মনোস্যাকারাইড (গ্লাইকোজ, অ্যালডোজ ও কিটোজ)		
i) ট্রায়োজ	$C_3H_6O_3$ (3 কার্বনযুক্ত)	গ্লিসার‍্যালডিহাইড, ডাইহাইড্রক্সি-অ্যাসিটোন ফসফেট
ii) টেট্রোজ	$C_4H_8O_4$ (4 কার্বনযুক্ত)	এরিথ্রোজ, এরিথ্রুলোজ
iii) পেন্টোজ	$C_5H_{10}O_5$ (5 কার্বনযুক্ত)	রাইবোজ, জাইলোজ, ডিঅক্সি-রাইবোজ, অ্যারাবিনোজ,

		জাইলুলোজ, রাইবুলোজ
iv) হেক্সোজ	$C_6H_{12}O_6$ (6 কার্বনযুক্ত)	গ্লুকোজ, গ্যালাকটোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ
v) হেপ্টোজ	$C_7H_{14}O_7$ (7 কার্বনযুক্ত)	সেডুহেপ্টুলোজ

II) উদ্ভূত (derived) মনোস্যাকারাইড

i) গ্লাইকোসাইড	শর্করা C_1 কার্বনের সাথে OH গ্রুপের পরিবর্তে অন্য কোনও র‍্যাডিকেল থাকে।	মিথাইল গ্লুকোসাইড, মিথাইল গ্যালাক্টোসাইড
ii) শর্করা ফসফেট	গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের C_1 বা C_6 কার্বনের সাথে ফসফেট সংযুক্তি	গ্লুকোজ 6 ফসফেট ফ্রুক্টোজ 1 ফসফেট ফ্রুক্টোজ 1-6- ডাইফসফেট
iii) গ্লুকোনিক অ্যাসিড	গ্লুকোজের C_1 কার্বনে কার্বোক্সিল গ্রুপ (COOH) যুক্ত থাকে।	
iv) গ্লুকোরোনিক অ্যাসিড	গ্লুকোজের C_6 কার্বনে কার্বোক্সিল গ্রুপ যুক্ত থাকে।	
v) হেক্সোজ অ্যামাইন	হেক্সোজের সাথে অ্যামাইনো গ্রুপ (NH_2) যুক্ত থাকে।	গ্লুকোজ অ্যামাইন

III অলিগোস্যাকারাইড (oligosaccharide) (2-10টি মনোস্যাকারাইডযুক্ত)

i) ডাইস্যাকারাইড	2টি মনোস্যাকারাইডযুক্ত	সুক্রোজ, মল্টোজ, সেলোবায়োজ
ii) ট্রাইস্যাকারাইড	3টি মনোস্যাকারাইডযুক্ত	র‍্যাবিনোজ, জেন্টিয়ানোজ, র‍্যাফিনোজ
iii) টেট্রাস্যাকারাইড	4টি মনোস্যাকারাইডযুক্ত	স্ট্যাকিয়োজ
iv) পেন্টাস্যাকারাইড	5টি মনোস্যাকারাইডযুক্ত	ভারবেকোজ

IV পলিস্যাকারাইড (গ্লাইকান)

A হেমোপলিস্যাকারাইড (কেবল এক ধরনের মনোস্যাকারাইডযুক্ত)

i) গ্লুকোন	গ্লুকোজ মনোমারযুক্ত	স্টার্চ, সেলুলোজ, কাইটিন, গ্লাইকোজেন
ii) গ্যালাক্টান	গ্যালাক্টোজ মনোমারযুক্ত	পেকটিন

iii) মিউন্যান	ম্যানোজ মনোমারযুক্ত	ইস্টের মিউন্যান
iv) জাইলান	জাইলোজ মনোমারযুক্ত	হেমিসেলুলোজ, জাইলান
v) ফ্রুক্টান	ফ্রুক্টোজ মনোমারযুক্ত	ইনুলিন
B. হেটারোপলিস্যাকারাইড (বিভিন্ন ধরনের ২ বা ততোধিক মনোমারযুক্ত)		
i) নিরপেক্ষ (neutral) শর্করা		গঁদ, মিউসিলেজ, পেকটিক পদার্থ, হেমিসেলুলোজ
ii) মিউকো পলিস্যাকারাইড	অ্যামাইনো শর্করা, ইউরোনিক অ্যাসিড	হেপারিন
C. উদ্ভূত (derived) পলিস্যাকারাইড		
i) গ্লাইকোপ্রোটিন	গ্লাইকোজেন ও প্রোটিন	প্লাজমা প্রোটিন
ii) মিউকোপ্রোটিন		রক্তের গ্রুপের পদার্থ

মনোস্যাকারাইড (monosaccharide)

মনোস্যাকারাইড হল সরল শর্করা ও একটি স্যাকারাইড অণুযুক্ত। এর রাসায়নিক সংকেত $n(CH_2O)$। n-এর সংখ্যা 3, 4, 5, 6 বা 7 হয় ও এটি কার্বন অণুর সংখ্যা নির্দেশ করে।

রাসায়নিক গঠন অনুসারে মনোস্যাকারাইড অ্যালডোজ বা কিটোজ হতে পারে।

অ্যালডোজ (aldose) শর্করা শৃঙ্খলের এক প্রান্তে অ্যালডিহাইড গ্রুপ $(HC = O)$ এবং অন্য প্রান্তে CH_2OH থাকে।

কিটোজে (ketose) দ্বিতীয় কার্বন অণুর সাথে কিটো গ্রুপ $(C = O)$ থাকে।

মনোস্যাকারাইডের অ্যালডিহাইড ও কিটোন গ্রুপ অন্য কোনও জৈব পদার্থের অ্যালকোহলীয় গ্রুপের সাথে যুক্ত থাকতে পারে। এই বন্ধনকে **গ্লাইকোসাইডীয় বন্ধন** (glycosidic bond) বলে।

গ্লুকোজ বা grape sugar বা ডেক্সট্রোজ (dextrose) সাধারণত ফলে, মধুতে ও রক্তে পাওয়া যায়। এটি প্রধান বিপাকীয় জ্বালানী। সব শ্বেতসার গ্লুকোজে ভেঙ্গে যায় ও এই গ্লুকোজ রক্তে শোষিত হয় এবং দেহের সব অংশে পরিবাহিত হয়।

গ্লুকোজ হল অ্যালডোজ। গ্লুকোজের গঠন বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন— সোজা শৃঙ্খল, বলয়াকার অথবা নৌকা বা চেয়ারের আকারের। গ্লুকোজ α ধরনের বা β ধরনের হতে পারে।

ফ্রুক্টোজ বা fruit sugar বা লেভুলোজ (levulose)– ফলে ফ্রুক্টোজ থাকে। এটি কিটোহেক্সোজ। এটি গ্লুকোজের মত রাসায়নিক গঠনযুক্ত। তবে এর OH গ্রুপের অবস্থানে পার্থক্য রয়েছে।

অ্যামিনোশর্করা বা হেক্সোজঅ্যামিন

অ্যালডোজের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের পরিবর্তে অ্যামিনো বা অ্যাসিটাইল অ্যামিনো

গ্রুপ যুক্ত হয়ে অ্যামিনোশর্করা উৎপন্ন হয়। **গ্লুকোজঅ্যামিন** কাইটিনে, মিউকোপলিস্যাকারাইডে ও ব্যাকটিরিয়ার পলিস্যাকারাইডে থাকে।

অলিগোস্যাকারাইডে কেবল কয়েকটি মনোস্যাকারাইড থাকে। দু'টি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রক্সিল গ্রুপের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে এক অণু জল নির্গত হয়। এই বন্ধনকে **গ্লাইকোসাইডিক** লিঙ্কেজ বলে।

ডাইস্যাকারাইডের রাসায়নিক সঙ্কেত হল $C_{12}H_{22}O_{11}$। দু'টি মনোস্যাকারাইড যুক্ত হয়ে এবং এক অণু জল নির্গত হয়ে ডাইস্যাকারাইড গঠিত হয়। উদ্ভিদে সুক্রোজ ও মল্টোজ ও প্রাণীতে ল্যাক্টোজ হল প্রধান ডাইস্যাকারাইড।

সুক্রোজে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ সম পরিমাণে থাকে। সুক্রোজ বা cane sugar আখে, বীটে, গাজরে এবং ফলে থাকে। এটি মিষ্টি ও জলে দ্রবণীয়।

মল্টোজ— উৎসেচক যেমন, অ্যামাইলেজ বা টায়ালিন দ্বারা স্টার্চের আর্দ্র বিশ্লেষের ফলে মল্টোজ উৎপন্ন হয়।

ট্রাইস্যাকারাইডে তিনটি মনোস্যাকারাইড থাকে।

ম্যানোট্রায়োজ— 2 টি গ্যালাক্টোজ + 1 টি গ্লুকোজ

র‍্যাবিনোজ— 1 টি গ্যালাক্টোজ + 2 টি র‍্যামনোজ

জেনটিয়ানোজ— 2 অণু গ্লুকোজ + 1 অণু ফ্রুক্টোজ
জেনসিয়ানের মূলে পাওয়া যায়।

টেট্রাস্যাকারাইডে চারটি মনোস্যাকারাইড থাকে।

স্কোরোডোজ— পেঁয়াজ ও রসুনে থাকে।

পলিস্যাকারাইডে অনেকগুলি (10 থেকে সহস্রাধিক) মনোস্যাকারাইড থাকে। এর রাসায়নিক সঙ্কেত হল $(C_6H_{10}O_5)_n$

হোমোপলিস্যাকারাইড যথা— স্টার্চ, সেলুলোজ, কাইটিন, ইনুলিন ইত্যাদি।

স্টার্চ— সোজা, শাখাবিহীন, সর্পিল অ্যামাইলোজ এবং শাখাযুক্ত অ্যামাইলোপেকটিন দ্বারা গঠিত। এই দু'টি হল দীর্ঘ পলিমার অণু। এটি বিভিন্ন উদ্ভিদে সঞ্চিত খাদ্য হিসাবে থাকে, যেমন— আলুর স্টার্চ দানা।

সেলুলোজ— শতাধিক মনোস্যাকারাইড থাকে। এটি কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান।

কাইটিন— ছত্রাকের কোষ প্রাচীরে থাকে। **কাইটিনে** N-অ্যাসিটাইল - D - গ্লুকোসঅ্যামিন থাকে।

ডেক্সট্রিন— স্টার্চের অসম্পূর্ণ বিশ্লেষের ফলে ডেক্সট্রিন উৎপন্ন হয়। **ইনুলিন** ডালিয়ার মূলে পাওয়া যায়। এটি ফ্রুক্টোজের পলিমার।

পলিস্যাকারাইডের শ্রেণীবিন্যাস

I উপাদানের প্রকৃতি অনুসারে

i) পেন্টোসান — পেন্টোজ দ্বারা গঠিত

ii) হেক্সোসান — হেক্সোজ দ্বারা গঠিত

II উপাদানের নাম অনুসারে

i) গ্লুকোসান — গ্লুকোজ দ্বারা গঠিত

ii) ফ্রুক্টোসান — ফ্রুক্টোজ দ্বারা গঠিত

III পলিস্যাকারাইডের রাসায়নিক প্রকৃতি অনুসারে

i) হোমোপলিস্যাকারাইড— এক রকমের মনোস্যাকারাইড দ্বারা গঠিত।

a) স্টার্চ — অ্যামাইলোজ ও অ্যামাইলোপেকটিনের পলিমার

b) সেলুলোজ — গ্লুকোজের পলিমার

ii) হেটারোপলিস্যাকারাইড — বিভিন্ন রকম মনোস্যাকারাইড দ্বারা গঠিত।

a) নিরপেক্ষ হেটারোপলিস্যাকারাইড, যথা— কাইটিন।

এগুলি N-অ্যাসিটাইল গ্লুকোজঅ্যামিনের পলিস্যাকারাইড। এখানে অ্যালকোহল গ্রুপের পরিবর্তে অ্যামাইনো গ্রুপ থাকে।

b) অম্ল হেটারোপলিস্যাকারাইড — মনোস্যাকারাইডগুলি সালফিউরিক অ্যাসিড বা ফসফোরিক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত থাকে। যথা— হেপারিন। এটি রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয় না।

c) মিউকোপ্রোটিন — অ্যাসিটাইল গ্লুকোজঅ্যামিন, মনোস্যাকারাইড ও প্রোটিন যুক্ত হয়ে মিউকোপ্রোটিন বা গ্লাইকোপ্রোটিন গঠন করে।

IV কাজ অনুসারে

i) গঠনগত পলিস্যাকারাইড— যথা, উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরের সেলুলোজ।

ii) সঞ্চিত পলিস্যাকারাইড — যথা, স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন।

শ্বেতসার বা কার্বোহাইড্রেটের তাৎপর্য

1. **শক্তির উৎস** — সজীব কোষের প্রধান শক্তির উৎস হল শ্বেতসার। সবাত শ্বসনের সময় গ্লুকোজ জারিত হয়। এসময় অক্সিজেন ব্যবহৃত হয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড, জল ও শক্তি নির্গত হয়।
2. **কোষের উপাদান** — উদ্ভিদ কোষের কোষ প্রাচীর প্রধানত সেলুলোজ দ্বারা গঠিত।
3. **সঞ্চিত শ্বেতসার** — অতিরিক্ত শ্বেতসার দেহে সঞ্চিত থাকে। যেমন— উদ্ভিদে স্টার্চ এবং প্রাণীতে গ্লাইকোজেন সঞ্চিত হয়। প্রয়োজন হলে এসব সঞ্চিত শ্বেতসার থেকে শক্তি পাওয়া যায়।
4. **বিপাকে ভূমিকা** — মনোস্যাকারাইডের বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সালোকসংশ্লেষের সময় গ্লুকোজ তৈরি হয়। এই সংশ্লেষে ট্রায়োজ, পেন্টোজ ইত্যাদি মধ্যবর্তী পদার্থ হিসাবে দেখা দেয়।
5. **নিউক্লিক অ্যাসিডের উপাদান হল রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা।**

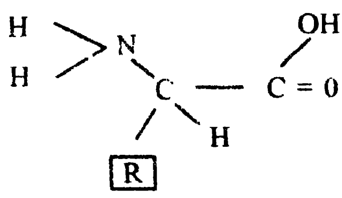
6. **স্নেহ পদার্থ ও অ্যামিনো অ্যাসিড** উৎপাদনে গ্লুকোজের প্রয়োজন।
7. **বিশেষ কাজ** — প্রাণীতে কোনও কোনও গ্লাইকোপ্রোটিন প্রতিরোধ ক্ষমতা বা অনাক্রম্যতা (**immunity**) বাড়ায়। কোনও কোনও শ্বেতসার হর্মোন হিসাবে কাজ করে। মিউকোপলিস্যাকারাইড হেপারিন রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয় না (**anticoagulant**)।

প্রোটিন

প্রোটোপ্লাজমের একটি প্রধান উপাদান হল প্রোটিন। উৎসেচক, অ্যান্টিবডি এবং কোনও কোনও হর্মোন প্রোটিন দিয়ে গঠিত।

প্রোটিনে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কখনও কখনও সালফার, ফসফরাস থাকতে পারে। প্রোটিন খুব বড় অণু। এর আণবিক ওজন 5,00,000 পর্যন্ত হয়, যেখানে গ্লুকোজ অণুর (শর্করা) আণবিক ওজন 180। প্রোটিন গঠনকারী একক হল অ্যামিনো অ্যাসিড।

অ্যামিনো অ্যাসিডে অম্লধর্মী COOH গ্রুপ (কার্বোক্সিল গ্রুপ) এবং ক্ষারধর্মী অ্যামাইনো (NH_2) গ্রুপ α কার্বন অণুর (COOH গ্রুপের পাশের কার্বন) সাথে যুক্ত থাকে। যেহেতু অ্যামিনো অ্যাসিডে অম্ল ও ক্ষার উভয় ধর্ম দেখা যায়, সেজন্য এগুলিকে অ্যাম্ফোটেরিক বা বাইপোলার (দ্বিমেরুযুক্ত) বা 'zwitter' আয়ন বলে। α কার্বনের সাথে অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্শ্বশৃঙ্খল (R) যুক্ত থাকে। বিভিন্ন ধরনেব অ্যামিনো অ্যাসিডে এই পার্শ্ব শৃঙ্খলের পার্থক্য হয়।



প্রোটোপ্লাজমে বাইশ রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে।

একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের অ্যামিনো গ্রুপের সাথে অন্য অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপ যুক্ত হয়ে পেপটাইড বন্ধন (NH-CO) গঠন করে। দু'টি অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হলে ডাইপেপটাইড, তিনটি অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয়ে ট্রাইপেপটাইড এবং অনেকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড গঠন করে। কতকগুলি পলিপেপটাইড যুক্ত হয়ে পেপটোন, প্রটিয়োজ এবং প্রোটিন গঠন করে।

একটি প্রোটিন অণুতে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পরপর সারিবদ্ধভাবে (linear order) সাজানো থাকে। প্রোটিন অণুতে পলিপেপটাইড শৃঙ্খল ভাঁজ অবস্থায় থাকে ও

অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে অতিরিক্ত লিঙ্কেজ গঠিত হয়। প্রোটিনের গঠনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি হল প্রাথমিক বা প্রাইমারী, সেকেন্ডারী, টারিসিয়ারী এবং কোয়ার্টারনারী।

i) **প্রাথমিক গঠন**— নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি যথাযথভাবে সজ্জিত হয়ে পলিপেপটাইড শৃঙ্খল গঠন করে।

ii) **সেকেন্ডারী গঠন**— পলিপেপটাইড শৃঙ্খল পেঁচিয়ে যায় ও ত্রিমাত্রিক গঠনের সৃষ্টি করে। কার্বক্সিল গ্রুপের অক্সিজেন এবং অ্যামাইডের হাইড্রোজনের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হওয়ায় নিকটবর্তী অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পরস্পর যুক্ত হতে পারে।

সেকেন্ডারী গঠনে তিন ধরনের পেঁচ (α হেলিক্স, β হেলিক্স এবং কোলাজেন হেলিক্স) দেখা যায়।

a) α - পলিপেপটাইড শৃঙ্খলটি একটি কাল্পনিক রেখাকে সর্পিলভাবে বেষ্টন করে থাকে। একটি পেঁচে 3, 6 অণু অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন দেখা যায়।

b) β হেলিক্স — দুই বা ততোধিক পলিপেপটাইড শৃঙ্খল আঁকাবাঁকাভাবে (zigzag) সাজান থাকে। অ্যামিনো অ্যাসিডের হাইড্রোজেন বন্ধন এরকম ভাঁজকে সুদৃঢ় করে।

c) কোলাজেন হেলিক্স— তিনটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খল পরস্পর ডানদিকে পেঁচিয়ে সুপার হেলিক্স গঠন করে। হাইড্রক্সিপ্রোলিনের মধ্যের হাইড্রোজেন বন্ধন এই পেঁচকে সুদৃঢ় করে।

iii) **টারসিয়ারি গঠন** — α হেলিক্স বা β হেলিক্স ভাঁজ হয়ে টারসিয়ারী গঠন সৃষ্টি করে। অ্যামিনো অ্যাসিডের ডাইসালফাইড বন্ড (S-S) এবং অন্যান্য বন্ডের ফলে টারসিয়ারী গঠনটি দৃঢ় হয়।

iv) **কোয়ার্টারনারী গঠন**— একটি প্রোটিন অণুতে একাধিক পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের বিন্যাস কোয়ার্টারনারী গঠন সৃষ্টি করে। যেমন, একটি হিমোগ্লোবিন অণুতে দু'টি অনুরূপ α শৃঙ্খল এবং দু'টি অনুরূপ β শৃঙ্খল থাকে।

প্রোটিনের শ্রেণীবিন্যাস

প্রোটিন তিন রকমের — সরল, যৌগিক এবং উদ্ভূত।

সরল প্রোটিন-এর আর্দ্রবিশ্লেষের ফলে কেবল অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। সরল প্রোটিন আবার গ্লোবিউলার বা ফাইব্রিলার হতে পারে।

গ্লোবিউলার প্রোটিন সাধারণত জলে দ্রবণীয়। এরকম প্রোটিন বেশি দেখা যায়। যেমন উৎসেচক, প্লাজমা পর্দা।

দ্রবণীয় গ্লোবিউলার প্রোটিন

a) অ্যালবুমিন— উদ্ভিদ ও প্রাণীতে যথেষ্ট দেখা যায়। যেমন— সয়াবিনের

অ্যালবুমিন, প্রোটিন লেগুমেলিন (ডাল জাতীয় উদ্ভিদের, প্রোটিন ফ্যাসিওলিন বীনের প্রোটিন)।

b) **প্রোটামিন** - ক্ষারধর্মী ও কম আণবিক ওজনযুক্ত প্রোটিন। পরিণত শুক্রাণুব নিউক্লিয়াসে প্রোটামিন থাকতে পারে।

c) **হিস্টোন** - ক্ষাবধর্মী ও উচ্চ আণবিক ওজনযুক্ত প্রোটিন, যথা— নিউক্লিওপ্রোটিন।

অদ্রবণীয় গ্লোবিউলার প্রোটিন

a) গ্লুটোলিন— যথা, ধান, গমের বীজে থাকে।

b) গ্লোবিউলিন— যথা, টিউবাবিন (আলুব)

c) প্রোটোমিন— যথা, ভুট্টাব জিইন (Zeen)

সরল তন্তুসদৃশ (fibrous) প্রোটিন

এগুলি জলে অদ্রবণীয ও তন্তু সদৃশ এবং প্রধানত প্রাণীতে থাকে, যথা— চুলের কেবাটিন।

যৌগিক প্রোটিন— এই প্রোটিনেব সাথে কিছু অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকে। এই অপ্রোটিন অংশকে 'প্রসথেটিক গ্রুপ' বলে। প্রসথেটিক গ্রুপেব প্রকৃতির ওপর নির্ভর কবে যৌগিক প্রোটিন নানা রকমের হয়।

a) **ক্রোমোপ্রোটিন**— প্রোটিন ও রঞ্জক পদার্থ, যথা— সাইটোক্রোম, ফ্লোভোপ্রোটিন।

b) **নিউক্লিওপ্রোটিন**— প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড, যথা— DNA ও হিস্টোন দ্বাবা গঠিত ক্রোমাটিন।

c) **লাইপোপ্রোটিন**— প্রোটিন ও লিপিড, যথা— রক্তের প্লাজমা।

d) **ফসফোপ্রোটিন**— প্রোটিন ও ফসফবিক অ্যাসিড বা ফসফোপ্রোটিন, যথা— দুধেব ক্যাসিন।

উদ্ভূত বা derived প্রোটিন— পূর্বেকাব প্রোটিনের আর্দ্রবিশ্লেষের ফলে এই প্রোটিন উৎপন্ন হয়। এই প্রোটিন আবার বিভিন্ন রকমের—

a) **মেটাপ্রোটিন**— প্রোটিনেব উপর উৎসেচক, অ্যাসিড বা ক্ষাবেব বিক্রিযার ফলে এই প্রোটিন উৎপন্ন হয় যথা— প্রোটিয়োজেস, পেপটাইডস, অ্যাসিড মেটাপ্রোটিন, অ্যালকালি (ক্ষাব) মেটাপ্রোটিন।

b) **ঘনীভূত বা coagulated প্রোটিন**— প্রোটিনে ভাপ প্রযোগ কবলে এরকম প্রোটিনের সৃষ্টি হয়।

প্রোটিনের কাজ

1) **উৎসেচক**— প্রোটিন উৎসেচক হিসাবে কাজ কবে এবং বিভিন্ন বিক্রিয়াকে

প্রভাবিত করে।

ii) পরিবাহক প্রোটিন— এরকম প্রোটিন কোষ পর্দায় থাকে এবং কোনও বস্তুর কোষে প্রবেশ বা নির্গমনে সহায়তা করে।

iii) পুষ্টিসাধক ও সঞ্চয়কারী প্রোটিন— অনেক উদ্ভিদের বীজে পুষ্টিসাধনকারী প্রোটিন সঞ্চিত থাকে।

iv) বাফার প্রোটিন (buffer protein)— এই প্রোটিন অম্ল ও ক্ষার উভয়ের সাথে যুক্ত হতে পারে। এভাবে প্রোটোপ্লাজমে অম্ল বা ক্ষার আধিক্য দূর করতে পারে।

v) গঠনগত (structural) প্রোটিন— কোনও কোনও প্রোটিন দেহের কোনও অংশ গঠন করে। যেমন পালক, চুলের কেরাটিন ও ইলাস্টিন।

vi) সঙ্কোচী (contractile) বা সচল প্রোটিন— সিলিয়া এবং ফ্ল্যাজেলায় এরকম প্রোটিন টিউবিউলিন থাকে।

vii) নিয়ন্ত্রক (regulatory) প্রোটিন— কোনও কোনও প্রোটিন কোষের কিছু শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

viii) প্রতিরক্ষা (defense) প্রোটিন— কোনও কোনও প্রোটিন জীবের প্রতিরক্ষায় সহায়তা করে, যেমন— প্রাণীতে অ্যান্টিবডি।

ix) জৈবরাসায়নিক বৈশিষ্ট্য— বিশেষ প্রোটিনের উপস্থিতি কোনও কোনও জীবে দেখা যায়। অর্থাৎ, একটি জীবের প্রোটিনের সাথে অন্য জীবের প্রোটিনের পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন— রক্তের প্রোটিন।

লিপিড (স্নেহ পদার্থ)

স্নেহ জাতীয় পদার্থকে Bloor লিপিড (গ্রিক lipos-ফ্যাট) নাম দেন। এগুলি জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু জৈব দ্রবণ, যেমন— বেনজিন, ইথার, ক্লোরোফর্ম ও গরম অ্যালকোহলে দ্রবণীয়। তেল, মোম, ফসফোলিপিড, ক্যারোটিনয়েড, স্টেরল ইত্যাদি হল স্নেহ পদার্থ। হায়ালোপ্লাজমে স্নেহ পদার্থ বিন্দু হিসাবে থাকে।

রাসায়নিক উপাদান—

লিপিডে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে। তবে শ্বেতসারের তুলনায় এখানে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। লিপিডে অপেক্ষাকৃত বেশি হাইড্রোজেন থাকে। লিপিডের জারণের জন্য বেশি অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। এই জারণের ফলে অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তি নির্গত হয়। এক অণু লিপিড বা ফ্যাট থেকে মোটামুটি 9 ক্যালরি শক্তি হয়।

লিপিড হল ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের এস্টার (ester)।

ফ্যাটি অ্যাসিড হল জৈব অ্যাসিডের দীর্ঘ শৃঙ্খল, যার সাথে হাইড্রোকার্বনের একটি সোজা শৃঙ্খল থাকে। এই হাইড্রোকার্বনে বিভিন্ন সংখ্যক কার্বন থাকে এবং প্রত্যেক কার্বনের সাথে একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ (COOH) যুক্ত থাকে।

ফ্যাটি অ্যাসিড দুই রকমের— সংপৃক্ত ও অসংপৃক্ত।

i) **সংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড**— সংপৃক্ত বা saturated ফ্যাটি অ্যাসিডের সব কার্বন অণুর সাথে দু'টি হাইড্রোজেন অণু যুক্ত থাকায় C অণুর মধ্যে কোনও ডাবল বন্ড থাকে না। যথা—

পামেটিক অ্যাসিড— $CH_3(CH_2)_{14}$ COOH

স্টিয়ারিক অ্যাসিড— $CH_3(CH_2)_{16}$ COOH

ii) **অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড**— অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডে সব বা কতকগুলি কার্বন অণু হাইড্রোজেন অণু দ্বারা সম্পূর্ণ সংপৃক্ত অবস্থায় থাকে না। এজন্য ডাবল বন্ড দেখা যায়। ওলিক অ্যাসিড, লিনোলিক অ্যাসিড, লিনোলিনিক অ্যাসিড ইত্যাদি হল অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড। এসব অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডে যথাক্রমে 1, 2 এবং 3টি ডাবল বন্ড থাকে।

যেসব অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডে যত বেশি সংখ্যক ডাবল বন্ড থাকে, সেগুলি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় অপেক্ষাকৃত বেশি তরল অবস্থায় থাকে। সংপৃক্ত ফ্যাট তুলনায় বেশি কঠিন।

ওলিক (oleic) অ্যাসিড— $CH_3(CH_2)CH = CH(CH_2)_7COOH$

(একটি ডাবল বন্ডযুক্ত)

লিনোলিক অ্যাসিড— $CH_3(CH_2)CH = CH\ (CH_2)CH =$

$(CH)(CH_2)_7COOH$

(দু'টি ডাবল বন্ডযুক্ত)

লিপিডের শ্রেণীবিন্যাস

লিপিড বিভিন্ন রকমের— সরল, জটিল, উদ্ভূত।

1. **সরল লিপিড**— এই লিপিডে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল থাকে।

i) **নিরপেক্ষ ফ্যাট ও তেল**— এরকম স্নেহ পদার্থে তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিড এবং এক অণু গ্লিসারল থাকে।

ক্ষার, যেমন— সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং উৎসেচক লাইপেজ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলের মধ্যবর্তী বন্ধন ভেঙে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে স্যাপোনিফিকেশন বলা হয়।

ii) **মোম (wax)**— মোমে দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের অণু এবং উচ্চ আণবিক ওজনযুক্ত মনোহাইড্রক্সি-অ্যালকোহলের একটি অণু থাকে। মোম বায়ুমণ্ডলীয় জারণ প্রতিরোধ করতে পারে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন অংশে মোমের আবরণ থাকে যা ঐসব অংশকে রক্ষা করে, যেমন, উদ্ভিদের ত্বকে মোমের আবরণ দেখা যায়।

2. **জটিল লিপিড**— এই লিপিডের সাথে অন্য কোনও পদার্থ যুক্ত থাকে।

i) **ফসফোলিপিড বা ফসফোটিড** — এইসব পদার্থে ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারল ছাড়া ফসফোরিক অ্যাসিড থাকে। ফসফোলিপিডে দু'টি ফ্যাটি অ্যাসিড ও একটি গ্লিসারল অণু থাকে। তৃতীয় হাইড্রক্সিল গ্রুপে ফসফোরিক অ্যাসিডের এস্টার থাকে। এই ফসফেট গ্রুপ আবার দ্বিতীয় অ্যালকোহল অণুর সাথে যুক্ত থাকে। এই দ্বিতীয় অ্যালকোহল অণুটি ফসফোলিপিডের প্রকৃতি নির্ণয় করে।

ফসফোলিপিড অণু দ্বিমেরুযুক্ত। এর দু'টি ফ্যাটি অ্যাসিডের অণু জলবিকর্ষী (hydrophobic) প্রান্ত নির্দেশ করে। ফসফেটযুক্ত প্রান্তটি জলাকর্ষী (hydrophilic)।

জলীয় মাধ্যমে ফসফোলিপিডের অণুগুলি দ্বিস্তর পর্দায় বিন্যাসিত থাকে। সব কোষ পর্দা এরকম দ্বিস্তর লিপিড দিয়ে গঠিত। এরকম পর্দা কোষে ভেদত্য, পরিবহন এবং বিপাক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

লেসিথিন হল এক ধরনের ফসফোলিপিড। লেসিথিনে (ফসফোটিডিল কোলিন) ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারল, ফসফোরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রোজেনযুক্ত অ্যালকোহল কোলিন (choline) থাকে। সুতরাং, লেসিথিন হল মনোঅ্যামিনো—মনোফসফোলিপিড।

অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের উপস্থিতির জন্য লেসিথিন সহজেই জারিত হয়। কোষের ভেদ্যতা, অভিস্রবণীয় চাপ ইত্যাদিতে লেসিথিনের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

ii) **গ্লাইকোলিপিড (glycolipid)** : এই লিপিডে ফ্যাটি অ্যাসিড, নাইট্রোজেন এবং শ্বেতসারের র্যাডিকেল থাকে। প্রাণীর স্নায়ু কলায় ও ডিমে এরকম লিপিড থাকে।

iii) **ক্রোমোলিপিড (chromolipid)** : এরকম লিপিডে ক্যারোটিনয়েড বা এর নিকট সম্পর্কীয় রঞ্জক থাকে। ক্যারোটিনের রাসায়নিক সঙ্কেত হল $C_{40}H_{56}$। এটি একটি প্রোভিটামিন A, যথা— ক্যারোটিন, ভিটামিন A। ক্যারোটিনয়েড জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু জৈব দ্রবণে দ্রবণীয়।

3. **উদ্ভূত (derived) লিপিড** : সরল ও জটিল লিপিডের আর্দ্র বিশ্লেষের ফলে এরকম লিপিড উৎপন্ন হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভূত লিপিড হল স্টেরাইড।

i) *স্টেরাইড*— স্টেরয়েড এবং স্টেরল এর অন্তর্গত। এগুলি উদ্ভিদ, প্রাণী এবং জীবাণুতে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। এগুলি মোম সদৃশ লিপিড। স্টেরাইডে একটি বলয়কার গঠন দেখা যায়, কিন্তু লিপিডে এরকম গঠন থাকে না।

a) *স্টেরল*— যথা, ইস্টের আরগোস্টেরল, উদ্ভিদের স্টিগমাস্টেরল, স্পাইনাস্টেরল ও সিটোস্টেরল ইত্যাদি এবং প্রাণীর কোলেস্টেরল। এগুলি মোম জাতীয় কঠিন অ্যালকোহল।

b) *স্টেরয়েড*— এগুলি প্রাণীর হর্মোন।

লিপিডের সংশ্লেষ — প্রাণীতে শ্বেতসার থেকে লিপিডের সংশ্লেষ হয়। এই সংশ্লেষে প্রোটিন সহায়তা করে। উদ্ভিদে লিপিড সংশ্লেষিত হয়। মাইটোকন্ড্রিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসিডের সংশ্লেষ হয়। ফ্যাট বা লিপিড স্বচ্ছ তেলের বিন্দু বা মোম হিসাবে সঞ্চিত হতে পারে।

লিপিডের কাজ—

i) লিপিড থেকে শক্তি পাওয়া যায়। এক গ্রাম ফ্যাট থেকে 9.3 কিলো ক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

ii) লিপিড দেহে সঞ্চিত খাদ্য হিসাবে থাকে।

iii) প্রাণীতে লিপিড তাপ নিরোধকের কাজ করে। ত্বকের নিচে সঞ্চিত ফ্যাট দেহের তাপমাত্রা যথাযথ রাখতে সহায়তা করে।

iv) দ্রাবক (solvent) হিসাবে লিপিড কাজ করে। ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন ভিটামিন A, D, E ইত্যাদির দ্রাবক হিসাবে লিপিড থাকে।

v) ফসফোলিপিড কোষস্থ সব পর্দার উপাদান যেমন— কোষ পর্দা, নিউক্লিয় পর্দা, এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার পর্দা, মাইটোকন্ড্রিয়ার পর্দা ইত্যাদি।

vi) ফ্যাটের পরিবহন— ফসফোলিপিড ফ্যাটি অ্যাসিডের শোষণ এবং পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়।

vii) বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর— প্রাণীর স্নায়ু তন্তুর উপরে ফ্যাট দ্বারা গঠিত মায়ালিন সীদ বৈদ্যুতিক ইনসুলেটেরের কাজ করে।

viii) হর্মোন উৎপাদনে লিপিডের ভূমিকা রয়েছে। যেমন— কোলেস্টেরল থেকে অ্যাড্রিনোকর্টিকয়েড, ভিটামিন D, কোলিক অ্যাসিড ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।

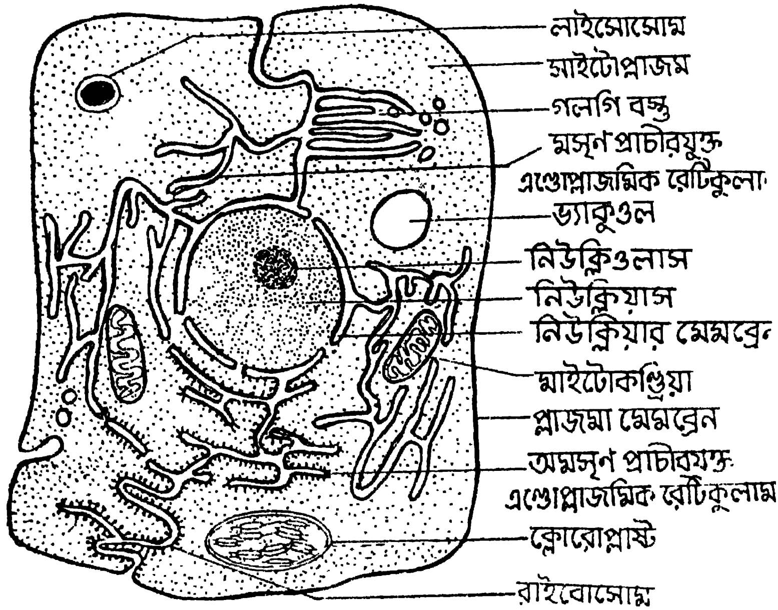
ধর্ম— প্রোটোপ্লাজম স্বচ্ছ, দানাদার, স্থিতিস্থাপক, জেলির মত কোলয়ডীয় পদার্থ। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) জলের চেয়ে কিছু বেশি। উত্তাপ, বিদ্যুৎ প্রবাহ ও বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগ করলে প্রোটোপ্লাজমে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়াকে ইরিটেবিলিটি (irritability) বলে। কোনও কোনও সময় প্রোটোপ্লাজমে বিভিন্ন রকমের প্রবাহ দেখা যায়, যেমন— প্রবাহ গতি, আবর্তন গতি ইত্যাদি।

সাইটোপ্লাজম

প্রোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াস বাদ দিলে যে অংশটা থাকে তাকে সাইটোপ্লাজম (cytoplasm) বলে। Frey-wyssling ও Muhlethaler-এর মতে, নিউক্লিয়াসের বাইরে প্লাস্টিড ও মাইটোকন্ড্রিয়াকে (যেগুলি নিউক্লিয়াসের মতনই স্বজননশীল) বাদ দিয়ে যে অংশ থাকে, তাকে সাইটোপ্লাজম বলে। কোষের অঙ্গাণু (organelle) ও অন্যান্য কোষস্থ বস্তু বাদ দিলে সাইটোপ্লাজমের যে তরল অংশ থাকে, তাকে হায়ালোপ্লাজম (hyaloplasm) বলে। সাইটোপ্লাজমীয় ম্যাট্রিক্স কোলয়ডীয় প্রকৃতির। এখানে মাইক্রোফিলামেন্ট এবং মাইক্রোটিউবিউল গঠিত হয়। মাইক্রোফিলামেন্টগুলি প্লাজমা পর্দার সমান্তরালভাবে থাকে। মাইক্রোটিউবগুলি গ্লোবিউলার প্রোটিন দিয়ে তৈরি এবং ফাঁপা নলের মত। সাইটোপ্লাজমের পরিধির অঞ্চলকে এক্টোপ্লাজম এবং ভিতরের দানাদার প্লাজমাকে এন্ডোপ্লাজম বলে।

সেন্টিফিউজ করে কোষের বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ নিউক্লিও, মাইটোকন্ড্রিয় এবং

মাইক্রোসোমীয় অংশ পৃথক করলে যে তরল পড়ে থাকে, তাকে cytosol বলে। সাইটোসলে প্রোটিন, এনজাইম ও দ্রবণীয় RNA থাকে।



চিত্র—21

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা একটি আদর্শ ইউক্যারিওট কোষের গঠন

সাইটোপ্লাজমের যে অংশ ক্ষারীয় রঞ্জক পদার্থ দিয়ে রঞ্জিত হয়, তাকে এরগ্যাস্টোপ্লাজম (ergastoplasm) বলে। এখানে RNA থাকে ও এই অঞ্চল প্রোটিন সংশ্লেষের সাথে জড়িত। অপরিণত কোষের বেশিরভাগ অঞ্চলেই সাইটোপ্লাজম থাকে। উদ্ভিদ কোষ বড় হওয়ার সময় অনেক ছোট ছোট সাইটোপ্লাজমবিহীন অঞ্চল (ভ্যাকুওল) দেখা দেয়, যা পরে মিলিত হয়ে কোষের মাঝখানে একটা বড় ভ্যাকুওল (vacuole) গঠন করে। কোষের ভিতর জালের আকারে অনেক সূক্ষ্ম নালিকা ছড়ানো থাকে। এই জালিকাকার নালিকাগুলিকে (canals) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (endoplasmic reticulum) বলা হয়। Porter (1947) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন। এছাড়া সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন বস্তু যেমন, মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোসোম, প্লাস্টিড, গলগি বস্তু ইত্যাদি পাওয়া যায় (চিত্র 18, 21)।

ভ্যাকুওল (vacuole)

সব উদ্ভিদের কোষেই ভ্যাকুওল দেখা যায়। ভ্যাকুওল বিভিন্ন আয়তনের হয়। দ্রুত বিভাজনশীল কোষে ভ্যাকুওলগুলি ছোট থাকে। সাধারণত পরিণত উদ্ভিদ কোষে *বেশিরভাগ স্থান জুড়ে বড় ভ্যাকুওল (চিত্র 18) দেখা যায়।*

রাসায়নিক উপাদান— ভ্যাকুওলের মধ্যের কোষ রসে বিভিন্ন পদার্থ থাকে। এইসব পদার্থগুলি হল— জৈব অ্যাসিড (organic acid), শর্করা, বিভিন্ন ধরনের রঞ্জক পদার্থ, অজৈব লবণ ইত্যাদি। ভ্যাকুওলে নানা রকমের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত থাকে। তাছাড়া কোষের অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থগুলিও (excretory substance) ভ্যাকুওলে জমা হয়। ফুল, ফল, পাতা কিংবা কখনও কখনও কাণ্ডের রঙ ভ্যাকুওলের রঞ্জক পদার্থের জন্য হয়ে থাকে। জলে দ্রবণীয় অ্যান্থোসায়ানিন (anthocyanin) এই রঞ্জক পদার্থের অন্যতম। কোষের pH-এর ওপর নির্ভর করে অ্যান্থোসায়ানিন লাল, বেগুনি কিংবা নীল রঙের সৃষ্টি করে।

অন্তঃকোষীয় পর্দা দিয়ে আবৃত স্থানগুলিকে Robertis, Nowinki ও Saez (1970) এবং De Robertis (1975) **সাইটোপ্লাজমীয় ভ্যাকুওল তন্ত্র** (cytoplasmic vacuolar system) নাম দিয়েছেন। ফাইব্রোব্লাস্ট কোষের কালচারে Porter (1945) প্রথম এই ভ্যাকুওল তন্ত্র লক্ষ্য করেন। পরে Palade (1956), Sjostrand (1956), Haguenau (1956) ও Porter (1961) বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ভ্যাকুওল তন্ত্র নিয়ে গবেষণা করেন। ব্যাকটিরিয়া, অপরিণত ভ্রূণের কোষে, ডিম্বাণু ও এরিথ্রোসাইটে ভ্যাকুওল তন্ত্র অনুপস্থিত থাকে। সাইটোপ্লাজমীয় ভ্যাকুওল তন্ত্র বিভিন্ন রকম ও এর মধ্যে a) ভ্যাকুওল, b) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা, c) গলগি বস্তু, d) নিউক্লিও পর্দা এবং e) সেন্ট্রোস্ফিয়ারের ভেসিকুলার অংশ ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত।

কোষের প্রয়োজনীয় কাজের জন্য অনেক পর্দা দিয়ে আবৃত প্রকোষ্ঠ রয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন উৎসেচকগুলি পৃথক অবস্থান (বহু উৎসেচক তন্ত্র বা multienzyme system) করে। অন্তঃকোষীয় অঞ্চলে বিভিন্ন pH দেখা যায়।

সাইটোপ্লাজমীয় ভ্যাকুওল তন্ত্রের কাজ

a) ভ্যাকুওল তন্ত্র কোষকে **যান্ত্রিক দৃঢ়তা** প্রদান করে। কোষের তরলকে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভাগ করে ভ্যাকুওল তন্ত্র সাইটোপ্লাজমের কোলয়ডীয় গঠনকে অতিরিক্ত যান্ত্রিক দৃঢ়তা দেয়।

b) ভ্যাকুওল তন্ত্রের পর্দার মধ্যে দিয়ে অভিস্রবন, ব্যাপন, সক্রিয় সংবহন ইত্যাদি হয়। এই সব পর্দা বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে এবং সাইটোপ্লাজমীয় ম্যাট্রিক্সে বিভিন্ন বস্তুর প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে।

c) সাইটোপ্লাজমীয় ভ্যাকুওল তন্ত্র অন্তঃকোষীয় **সংবহন তন্ত্র** হিসাবে কাজ করে। এর মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন বস্তু কোষের ভিতরে ও বাইরেও যায়।

d) সাইটোপ্লাজমীয় ভ্যাকুওল তন্ত্রে নানা পদার্থ **সঞ্চিত** হয়। উদ্ভিদ কোষে ভ্যাকুওল তন্ত্রে জল, ফেনল, ফ্ল্যাভোন, অ্যানথোসায়ানিন, উপক্ষার, স্নেহ পদার্থ, শর্করা প্রোটিন ইত্যাদি থাকে। প্রাণী কোষে গ্লাইকোজেন, প্রোটিন ইত্যাদি ভ্যাকুওল তন্ত্রে সঞ্চিত থাকে।

e) ভ্যাকুওল তন্ত্রে নানা রকম উৎসেচক সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথক অবস্থায় থাকে। এই ভ্যাকুওল তন্ত্রে বিভিন্ন পদার্থের (যেমন— গ্লাইকোজেন, লিপিড, স্টেরয়েড ইত্যাদি) সংশ্লেষ ও বিপাক উৎসেচকের প্রভাবে হয়ে থাকে।
f) কোনও কোনও এককোষী জীবে (যেমন— *Paramecium*) ভ্যাকুওল তন্ত্র অভ্যন্তরীণ অভিস্রবণ চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
g) ভ্যাকুওল কোষের রসস্ফীতি (turgor) বজায় রাখে ও ছোট ছোট গাছকে সোজা থাকতে সাহায্য করে।
h) কোনও কোনও নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীতে সঙ্কোচক বা কন্ট্রাকটাইল ভ্যাকুওল (contractile vacuole) থাকে। এই ভ্যাকুওলগুলি পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় ও এইভাবে কোষের বর্জ্য পদার্থগুলিকে কোষ থেকে বের করে দেয়।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (endoplasmic reticulum)

K. R. Porter ও তাঁর সহকর্মীরা (1945 ও 1947) সাইটোপ্লাজমে কিছু জালিকাকার নালিকা (canals) দেখতে পান। Porter এর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (চিত্র 21) নাম দেন (1948)।

Fawcett ও Ito (1958), Thiery (1958) এবং Rose ও Pomerat (1960) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা নিয়ে গবেষণা করে নানা তথ্য জানতে পারেন।

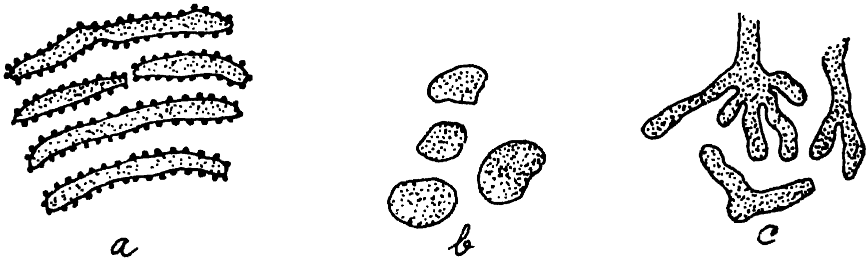
বিভিন্ন রকম কোষে এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার তারতম্য হয়। যেমন ভ্রূণের কোষ, ডিম্বাণুতে এবং লোহিত কণিকায় এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা অনুপস্থিত। শুক্রাণুতে এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা সুগঠিত নয়। কোনও কোনও কোষে কেবল মসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা দেখা যায়, যেমন--- অ্যাডিপোজ কলা। যেসব কোষ সক্রিয়ভাবে প্রোটিন উৎপাদন করে, সেখানে সুগঠিত এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা, বিশেষত অমসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা দেখা যায়। যকৃতের কোষে অমসৃণ ও মসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট উভয় প্রকার এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা পাওয়া যায়। এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা দ্বিস্তরযুক্ত ইউনিট মেমব্রেন বা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। বিভিন্ন নালিকাগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে সাধারণত একটি অবিচ্ছিন্ন জালের সৃষ্টি করে। এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা একদিকে নিউক্লিও পর্দা ও অন্যদিকে প্লাজমা পর্দার সাথে যুক্ত থাকে।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বা ER সাইটোপ্লাজমের দুইটি phase বা অবস্থাকে আলাদা করে রাখে। এই দুইটি হল— (a) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের নালিকার ভিতরের পদার্থ, (b) নালিকাগুলির বাইরের সাইটোপ্লাজমীয় ম্যাট্রিক্স।

কোষকে সেন্ট্রিফিউজ করে যে মাইক্রোসোমীয় অংশ (fraction) পাওয়া যায় তার মধ্যে প্লাজমা পর্দা, গলগি বস্তু এবং এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা থাকে। এই মাইক্রোসোমীয় অংশকে গ্রেডিয়েন্ট (gradient) সেন্ট্রিফিউজ করে গলগি বস্তু, মসৃণ প্রাচীরযুক্ত

এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা, অমসৃণ প্রাচীরযুক্ত এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা ইত্যাদি আলাদা আলাদা করা যায়।

গঠন— এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তিন রকমের (চিত্র 22a, b, c) হয়। যেমন— (a) ল্যামেলা বা সিস্টারনা (lamella বা cisterna); (b) ভেসিকেল (vesicle), (c) টিউবিউল (tubule)। ল্যামেলাগুলি লম্বা চ্যাপ্টা ও শাখাবিহীন হয় ও পরপর সমান্তরালভাবে সাজান থাকে। এগুলি 50-40 mμ স্থূল। ভেসিকেলগুলি মোটামুটি গোল ও এর ব্যাস 25-530 mμ। টিউবিউলের আকৃতি বিভিন্ন রকমের হয় ও এদের ব্যাস 50-190 mμ পর্যন্ত হয়ে থাকে। কোনও কোষে এই তিন ধরনের এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (ল্যামেলা, ভেসিকেল, টিউবিউল) একই সাথে দেখা যেতে পারে কিংবা এরা কোষের পরিণতির ভিন্ন ভিন্ন সময় দেখা যায়।



চিত্র—22
এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের বিভিন্ন উপাদান
a-ল্যামেলা বা সিস্টারনা, b-ভেসিকেল, c-টিউবিউল

যেসব কোষে সংশ্লেষ হয় সেখানে সাধারণত সিস্টারনি দেখা যায়। যেমন-প্যানক্রিয়াসের কোষে। ভেসিকেল সব কোষে দেখা যায়, তবে প্যানক্রিয়াসের কোষে এগুলি যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায়। টিউবিউলগুলি প্রায় সব কোষেই দেখা যায়।

এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা দুই প্রকারের— অমসৃণ ও মসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট।

(a) কোনও কোনও এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মেমব্রেনের বহির্গাত্রে কিছু খুব ছোট ছোট দানার (granule) মত বস্তু থাকে। এগুলিকে রাইবোসোম (ribosome) বলা হয়। রাইবোসোমে প্রচুর পরিমাণে RNA থাকে এবং প্রোটিন উৎপাদনে এদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এদের ব্যাস 100–150Å। সাধারণত এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সিস্টারনা বা ল্যামেলার বহির্গাত্রেই রাইবোসোম থাকে। রাইবোসোম থাকায় এদের বহির্গাত্র অমসৃণ হয় ও এদের অমসৃণ প্রাচীরযুক্ত এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলে। যেসব কোষ প্রোটিন উৎপাদনে সক্রিয় অংশ নেয়, সেখানে অমসৃণ প্রাচীরযুক্ত এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দেখা যায়। অমসৃণ প্রাচীরযুক্ত এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম প্যানক্রিয়াসের কোষে ও যকৃতের কোষে সুগঠিত থাকে।

রাইবোজোমের RNA-র উপস্থিতির জন্য অমসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয়

জালিকা ক্ষার রঞ্জক (basophilic stain) গ্রহণ করে। এজন্য আগেকার কোষতত্ত্ববিদগণ এর নাম এরগ্যাস্টোপ্লাজম, বেসোফিলিক বস্তু, ক্রোমোফিলিক বস্তু, নিসিল (Nissl) বস্তু ইত্যাদি নাম দিয়েছেন।

(b) যেসব এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মেমব্রেনের সাথে রাইবোসোম যুক্ত থাকে না তাদের **মসৃণ প্রাচীরযুক্ত** এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলে। সাধারণত টিউবিউলের প্রাচীর মসৃণ হয়। যেসব কোষে সক্রিয় প্রোটিন সংশ্লেষ হয় না, সেখানে সাধারণত মসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা পাওয়া যায়। যেসব কোষ প্রধানত লিপিড সংশ্লেষ করে, সেখানে অমসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা বেশি থাকে। গ্রন্থির (gland) কোষ, স্নায়ু কোষ, যকৃতের কোষ, শুক্রাণু, শ্বেত কণিকা ইত্যাদিতে মসৃণ প্রাচীরযুক্ত এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দেখা যায়। যেসব অঞ্চলে প্রচুর গ্লাইকোজেন থাকে, সেখানে মসৃণ প্রাচীরযুক্ত এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সাধারণত দেখা যায়।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মেমব্রেন লিপিড ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি।

এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার পর্দায় দ্বিস্তর ফসফোলিপিডে বিভিন্ন রকম প্রোটিন 'ভাসমান' অবস্থায় থাকে। এই পর্দা 50-60μ চওড়া হয়। এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার গহ্বর সুগঠিত ও এর মধ্যে দিয়ে ক্ষরিত (secretory) বস্তু যেতে পারে। Palade (1956) এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার গহ্বরে ক্ষরিত দানা দেখেছেন।

এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকায় সাধারণত কোনও রন্ধ্র বা বলয় (অ্যানুলাস) থাকে না। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকায় নিউক্লিও পর্দার অনুরূপ রন্ধ্র বা বলয় দেখা যায়। যেমন— অমেরুদণ্ডী প্রাণীর কোষে এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কোষে। নিউক্লিও পর্দার রন্ধ্রের মত এই রন্ধ্রগুলিও আট কোণা ও পাশাপাশি ডায়াফ্র্যামযুক্ত (Ward ও Ward 1968, Maul 1968)। এরকম এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা নিউক্লিও পর্দা থেকে উদ্ভূত হয়েছে (Marriam 1949, Kessel 1963)। এরকম এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার সাথে রাইবোজোম যুক্ত থাকতে পারে।

মসৃণ ও অমসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার (ER) পার্থক্য

মসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট ER	অমসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট ER
i) এই এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার বহিঃত্বকে রাইবোজোম যুক্ত থাকে না।	i) এই এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার বহিঃত্বকের স্থানে স্থানে রাইবোজোম যুক্ত থাকে।
ii) অপেক্ষাকৃত কম স্থায়ী, সহজেই অটোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ভেঙে যায়।	ii) অপেক্ষাকৃত বেশি স্থায়ী, কোষের মৃত্যুর পরও কিছুক্ষণ স্থায়ী থাকে।
iii) প্রধানত টিউবিউল দ্বারা গঠিত।	iii) প্রধানত সিস্টারনা দ্বারা গঠিত।

iv) এই এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা সাধারণত নিউক্লিও পর্দায় থাকে।	iv) এই এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা প্রধানত গলগি বস্তুর সাথে থাকে।
v) গ্লাইকোপ্রোটিন রাইবোফোরিন I ও II মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার সাথে যুক্ত থাকে না।	v) রাইবোফোরিন I ও II অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার সাথে যুক্ত থাকে (Kreibich 1978)।
vi) প্রাণীতে স্টেরয়ডীয় হর্মোন নিঃসরণকারী কোষে সুগঠিত থাকে।	vi) প্রোটিন নিঃসরণকারী কোষে সুগঠিত থাকে।

অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা (RER) ও প্লাজমা পর্দার পার্থক্য

অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা	প্লাজমা পর্দা
i) এই পর্দায় রাইবোজোমীয় RNA থাকে।	i) প্লাজমা পর্দায় রাইবোজোমীয় RNA থাকে না।
ii) 50-80Å স্থূল।	ii) 75-100Å স্থূল।
iii) পর্দা সমতাযুক্ত ও ঘন ক্রস ব্রিজযুক্ত।	iii) পর্দার ত্রিস্তর গঠন বেশি সুস্পষ্ট। ভিতরের ল্যামিনা অসমভাবে স্থূল।
iv) সামান্য কোলেস্টেরল থাকতে পারে।	iv) কোলেস্টেরল থাকে না।
v) নেগেটিভ বর্ণযুক্ত অবস্থায় ত্বক থেকে কোনও গোলাকার উপবৃদ্ধি দেখা যায় না।	v) নেগেটিভ বর্ণযুক্ত অবস্থায় ত্বকে গোলাকার উপবৃদ্ধি দেখা যায়।

এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার উৎসেচকগুলি

এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকায় নানা রকম উৎসেচক থাকে, যা বিভিন্ন সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এরকম কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উৎসেচক হল— NADH সাইটোক্রোম C-রিডাকটেজ, স্টিয়ারেজেস, NADH ডায়াফোরেজ গ্লুকোজ-6-ফসফাটেজ এবং Mg^{++} সক্রিয় ATPase। কোনও কোনও উৎসেচক (যেমন— নিউক্লিওটাইড ডাইফসফেট) ফসপোলিপিড, অ্যাসকরবিক অ্যাসিড, স্টেরয়ড সংশ্লেষে এবং হেক্সোজ বিপাকের জন্য প্রয়োজন।

এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার বিভিন্ন উৎসেচকের কাজ হল—

a) ফ্যাটি অ্যাসিডের সংশ্লেষ,

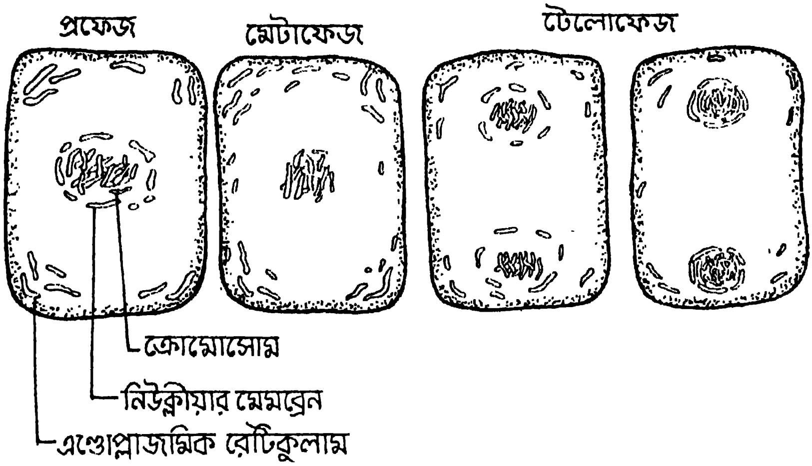
b) গ্লিসারাইডের (যেমন, ট্রাইগ্লিসারাইড, ফসফোলিপিড, গ্লাইকোলিপিড, প্লাজমোলোজেন ইত্যাদি) সংশ্লেষ,

c) প্লাজমোলোজেনের বিপাক,

d) ℓ - অ্যাসকববিক অ্যাসিডের সংশ্লেষ,

e) UDP-ইউরোনিক অ্যাসিডের বিপাক,
f) UDP- গ্লুকোজ ফসফেটবিহীনকরণ (dephosphorylation)
g) স্টেরয়েডের (যেমন— কোলেস্টেরল) সংশ্লেষ,
h) $NADPH_2$ এবং অক্সিজেনের উপস্থিতিতে স্টেরয়েডের রূপান্তর।

কাজ— (i) প্রোটিন উৎপাদনে অমসৃণ প্রাচীরযুক্ত এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। (a) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মেমব্রেনের সাথে বিভিন্ন এনজাইম যুক্ত থাকে এবং এইসব এনজাইমগুলি কোষের বিভিন্ন বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। সেজন্য এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মেমব্রেন অঞ্চলেই কোষের নানা রকম মেটাবলিক (metabolic) কাজ সাধিত হয়। এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা বিভিন্ন উৎসেচকের বিক্রিয়ার জন্য ত্বকের পরিমাণ বাড়ায়। (b) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের নালিকার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষরিত (secretory) বস্তু সঞ্চিত হয়ে থাকে। (c) এইসব নালিকার মধ্যে দিয়ে কোষের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কিংবা কোষ থেকে কোষের বাইরে বিভিন্ন পদার্থ যেতে পারে। অমসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার মধ্যে দিয়ে ক্ষরিত পদার্থ বিভিন্ন অঙ্গাণুতে, যেমন— মসৃণ প্রাচীর বিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা, গলগি বস্তু ও লাইসোসোম ইত্যাদিতে যায়। (d) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে RNA ও নিউক্লিওপ্রোটিনের সংবহনে সাহায্য করে। (e) মনে করা হয় যে, স্নায়ু ও পেশীর কোষে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম উত্তেজনা (impulse) চলাচলে সাহায্য করে। (f) নিউক্লিয়ার মেমব্রেন গঠনে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের বিশেষ ভূমিকা প্রমাণিত হয়েছে। কোষ বিভাজনের প্রফেজের শেষে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ভেঙে গিয়ে ছোট ছোট ল্যামেলা ও ভেসিকেল তৈরি করে। এদের তখন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে আলাদা করে চেনা যায় না। এগুলি তখন কোষের ধারের দিকে চলে যায়। টেলোফেজে যখন ক্রোমোসোমগুলি মেরুতে এসে জমা হয় তখন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কিছু উপাদান মেরুতে আসে ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেন গঠন করে (চিত্র 23)। আগের নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের ভগ্ন অংশগুলি নতুন মেমব্রেন গঠনের সময় কখনও কখনও অংশ নেয়। (g) এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা কোলয়ডীয় সাইটোপ্লাজমের একটি জালাকার কাঠামো গঠন করে ও কোষকে দৃঢ় করে। (h) এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার পর্দার মধ্যে দিয়ে অভিস্রবণ, ব্যাপন ও সক্রিয় সংবহন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অণু যাতায়াত করে। এই পর্দায় প্লাজমা পর্দার মত পারমিয়েজেস থাকে। (i) মসৃণ প্রাচীরযুক্ত এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম লিপিড ও গ্লাইকোজেন উৎপাদনে অংশ নেয়। (j) পেশিতে উদ্দীপকের প্রভাবে মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা (সারকোপ্লাজম) থেকে ক্যালসিয়াম নিঃসৃত হয় ও উত্তেজনা বন্ধ হলে ক্যালসিয়াম সারকোপ্লাজমে ফিরে যায়।



চিত্র—23

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের সৃষ্টি

মসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার কাজ

মসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকায় বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন ও সঞ্চিত হয়।

a) স্নেহপদার্থ (লিপিড) উৎপাদন— Christensen (1961) ও Claude (1968) প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, মসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা লিপিড ও লাইপোপ্রোটিনের সংশ্লেষ ও বিপাকের সাথে জড়িত। যেসব কোষে সক্রিয়ভাবে লিপিডের বিপাক হয়, সেখানে প্রচুর মসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা থাকে।

b) গ্লাইকোজেনের বিনষ্টিকরণ (glycogenolysis)—সাইটোপ্লাজমে গ্লাইকোজেন উৎপন্ন হয়। কিন্তু মসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকায় উৎসেচক গ্লুকোজ-6-ফসফাটেজেসের প্রভাবে গ্লাইকোজেন ভেঙে যায়। এরকম দেখা যায় উপোসী প্রাণীতে।

c) বিষক্রিয়ানাশক— যকৃতে বিভিন্ন রকম ক্ষতিকর পদার্থ, যেমন— ওষুধ অ্যাসপ্রিন (অ্যাসিটাইল স্যালিস্যালিক অ্যাসিড), ফিনাইল অরবিটল, দূষণকারী পদার্থ ইত্যাদি মসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার প্রভাবে অক্ষতিকর পদার্থে পরিবর্তিত হয় ও পরে কোষ থেকে নিঃসৃত হয়। এসব পরিবর্তনের সময় নানারকম বিক্রিয়া হয়, যেমন— জারণ, বিজারণ, আর্দ্র বিশ্লেষ এবং ছোট দ্রবণীয় অণুর সংযোগ (linking বা conjugation) ইত্যাদি। বিপাকের ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ, যেমন— ফ্যাটি অ্যাসিড, স্টেরয়েড, হিম ইত্যাদি হিমোগ্লোবিন ভেঙে উৎপন্ন ক্ষতিকর পদার্থও পরিবর্তিত হয়।

H. S. Mason এই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, এই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন অণু, NADPH এবং সাইটোক্রোম P450 এনজাইম জড়িত।

d) উদ্ভিদে মসৃণপ্রাচীর বিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা কোষ প্রাচীর গঠনে সহায়তা করে।

e) প্রাণী কোষে মসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার লিপিড ও কোলেস্টেরল বিপাকে ভূমিকা আছে। এছাড়া পাকস্থলী থেকে ক্লোরাইড আয়ন নিঃসরণে, অন্ত্রে ট্রাইগ্লিসারাইড সংশ্লেষে, অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি থেকে স্টেরয়ডীয় হর্মোন উৎপাদনে এবং চোখের রেটিনার বিশেষ রঞ্জক উৎপাদনে সহায়তা করে।

অমসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার কাজ—

a) অমসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার (ER) ত্বকে রাইবোসোম যুক্ত থাকে। এজন্য এই এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার প্রধান কাজ হল প্রোটিন সংশ্লেষ করা।

রাইবোসোমের 60S উপএকক অমসৃণ ER-এর সাথে যুক্ত থাকে ও ছোট 40S উপএকক উপরে থাকে। পর্দার প্রোটিনের সাথে 60S অংশ যুক্ত থাকে। উৎপন্ন প্রোটিন অমসৃণ ER-এর সিস্টারনার ভিতরে সঞ্চিত হয়। সিস্টারনায় প্রবেশ করার পর পলিপেপটাইড চেন বিভিন্ন ভাঁজ হয়ে প্রোটিনের সেকেন্ডারী ও টারসিয়ারী গঠনের সৃষ্টি করে। এরকম বড় প্রোটিন অণু সিস্টারনা থেকে বাইরে আসতে পারে না।

b) যেসব প্রোটিন নিঃসৃত হয় তার বেশিরভাগই হল গ্লাইকোপ্রোটিন। পলিপেপটাইড শৃঙ্খল সম্পূর্ণ উৎপন্ন হওয়ার আগেই এর সাথে শর্করা যুক্ত হতে পারে। সুতরাং, অমসৃণ ER উৎপন্ন প্রোটিনের সাথে শর্করা যুক্ত করতে সহায়তা করে।

প্রোটিনের সাথে শর্করার সংযুক্তি অন্য পদ্ধতিতেও হতে পারে। শর্করার শৃঙ্খলগুলি ধাপে ধাপে কোনও লিপিডের সাথে যুক্ত হতে পারে। এই লিপিড রেটিনল (ভিটামিন A) অথবা ডলিকল (dolichol) হতে পারে। পরে শর্করার শৃঙ্খলটি অবিকৃত অবস্থায় লিপিড থেকে প্রোটিনে স্থানান্তরিত হয়। পর্দার প্রোটিনের এরকম লিপিডের মাধ্যমে শর্করার সাথে সংযুক্তি অমসৃণ ER-এর পর্দার সাইটোপ্লাজমের দিকে হয়।

অমসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা থেকে নিঃসৃত প্রোটিন মসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা, গলগি বস্তু, ক্ষরণকারী ভেসিকেল (secretary vescicle) ইত্যাদিতে যায় ও পরে কোষ থেকে নিঃসৃত হয়ে যেতে পারে।

উৎপত্তি — এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের সাদৃশ্য এবং অবিচ্ছিন্নতা থেকে মনে করা হয় যে, নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের পরিবর্তিত অবস্থা কিংবা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কোনও কোনও উপাদানের উৎপত্তি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থেকেই হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, অমসৃণ প্রাচীরযুক্ত এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা আগে তৈরি হয়, পরে এর থেকে মসৃণ প্রাচীরযুক্ত এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার সৃষ্টি হয় (Seikevitz ও Palade 1966)।

উভচর প্রাণীর ভ্রূণের ওপর পরীক্ষা থেকে মনে করা হয় যে, অপরিণত কোষে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থেকেই সৃষ্টি হয়।

Eyen (1971), Eyen ও Ohan (1972) বলেন যে, একটি কোষের সম্পূর্ণ এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা আগেকার কোষ থেকে আসে, পরে এই পর্দা প্রসারিত হয়।

মাইক্রোসোম— মাইক্রোসোম এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার খণ্ড এবং রাইবোজোমে থাকে। উচ্চ গতিবেগে সেন্ট্রিফিউজ করলে কোষ থেকে মাইক্রোসোম আলাদা করা যায়। Claude (1951) মাইক্রোসোম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। মাইক্রোসোমে কোষের 50-60% RNA এবং ফসফোলিপিড থাকে। এখানে প্রোটিন সংশ্লেষ হয়। মাইক্রোসোমে নানা রকম বস্তু থাকে। অর্থাৎ, এখানে এরগ্যাস্টোপ্লাজমীয় উপাদান, গলগি পর্দা, প্লাজমা পর্দার বিচ্ছিন্ন অংশ এবং কোষের অন্য ভগ্ন অংশ থাকে। মাইক্রোসোমে বিভিন্ন রকম উৎসেচক, যেমন, Mg^{++} সক্রিয় ATPase, স্টিয়ারেজেস ইত্যাদি।

কাজ— মাইক্রোসোম লিপিডের জৈব সংশ্লেষের সাথে জড়িত যেমন, ট্রাইগ্লিসারাইড ও স্টেরয়েডের সংশ্লেষ। মাইক্রোসোমে নানা রকম উৎসেচক থাকায় এখানে নানা রকম বিক্রিয়া হয়। যেমন, অ্যামোনিয়া দূরীকরণ (ডিঅ্যামাইনেশন), হাইড্রক্সিলেশন ইত্যাদি। এসব বিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন রকম সক্রিয় পদার্থ নিষ্ক্রিয় হয়।

মায়েলয়েড বডি (Myeloid bodies)—

এগুলি বিশেষ ধরনের মসৃণ প্রাচীর বিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা এবং রেটিনার বর্ণযুক্ত এপিথেলিয় কোষে দেখা যায়। এখানে রাইবোসোম থাকে না। মায়েলয়েড বডিতে পরপর সাজান টিউবিউল থাকে। এগুলির ব্যাস 75mμ। মায়েলয়েড বডির ল্যামেলাগুলি চ্যাপ্টা, চাকতির মত। কেন্দ্রের চাকতিগুলি অপেক্ষাকৃত বড় এবং পরপর চাকতিগুলি ক্রমশ ছোট। বড় ল্যামেলার মধ্যে কখনও কখনও দানাদার ভ্যাসিকুলার পদার্থ থাকে। Haguenan (1958) এগুলিকে এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার প্যারানিউক্লিয়াস নাম দিয়েছেন। এগুলি পিট্যুইটারি গ্রন্থিতে পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য গ্রন্থিতেও এরকম প্যারানিউক্লিয়াস দেখা যেতে পারে।

লাইসোসোম (lysosome)

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যকৃতের কোষে কিছু গোলাকার, ঘন অন্তস্থলযুক্ত বস্তু (dense body) দেখা গিয়েছিল এবং এদের প্রথমে

'পেরিক্যানালিকিউলার ডেন্স বডিজ' (pericanalicular dense bodies) নাম দেওয়া হয়েছিল কারণ, এগুলি পিত্ত নালিকার পরিসীমায় থাকে। Christian de Duve 1955 খ্রিস্টাব্দে এদের লাইসোসোম (অর্থাৎ digestive body বা পরিপাককারী অঙ্গ, lysis ধ্বংসকারী soma- দেহ) নাম দেন, কারণ এখানে পরিপাক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নানা রকম এনজাইম থাকে। যকৃত ছাড়া কিডনী (বৃক্ক), মস্তিক, থাইরয়েড গ্রন্থির কোষে, প্রোটোজোয়ায় এবং ইস্ট প্রভৃতি কোনও কোনও উদ্ভিদে লাইসোসোম পাওয়া গিয়েছে। যেসব কোষে পরিপাক কাজ সম্পন্ন হয়, সেখানে অনেক লাইসোসোম দেখা যায়।

গঠন— লাইসোসোম সাধারণত গোলাকার, কিন্তু এদের আকৃতির যথেষ্ট তারতম্য হয়। এদের ব্যাস 0.25μ-0.8μ হয়। তবে কিডনীর কোষে 5μ ব্যাসযুক্ত লাইসোসোম পাওয়া গিয়েছে। লাইসোসোমের বাইরের দিকে একটি মেমব্রেন বা পর্দা থাকে। এটি ভিতরের ঘন ম্যাট্রিক্সকে আবৃত করে রাখে। ম্যাট্রিক্সের অভ্যন্তরীণ গঠনের তারতম্য দেখা যায়। কোনও কোনওটির ভিতর ঘন, কোনওটির বা পাশ ঘন ও মাঝখান তুলনামূলকভাবে কম ঘন, আবার কতকগুলির ভিতরে ভ্যাকুওল দেখা যায়। লাইসোসোমের পর্দাটি লাইপোপ্রোটিন দিয়ে গঠিত।

রাসায়নিক গঠন— লাইসোসোমে রাইবোনিউক্লিয়েজ, ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ, ফসফাটেজ, গ্লাইকোসাইডেজ, সালফাটেজ, ক্যাথেপসিনস্ (cathepsins) প্রভৃতি নানা রকমের এনজাইম থাকে। লাইসোসোমে বিভিন্ন রকম আর্দ্রবিশ্লেষণকারী এনজাইম থাকে, যেমন, গ্লাইকোসাইডেজ এবং অ্যাসিড ফসফাটেজ। লাইসোসোমের গঠনের তারতম্য এদের বিভিন্ন কাজের ওপর নির্ভর করে। লাইসোসোমে প্রায় পঞ্চাশ রকমের আর্দ্রবিশ্লেষণকারী উৎসেচক থাকতে পারে। এসব উৎসেচক অধিকাংশ জৈব পদার্থ (যেমন, প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, পলিস্যাকারাইড, লিপিড, জৈব সালফেট, জৈব ফসফেট ইত্যাদি) পরিপাক করতে পারে। তবে কোনও একটি লাইসোসোমে সব উৎসেচকগুলি একসাথে থাকে না। এই উৎসেচকগুলি সাধারণত সামান্য অম্ল (pH5) মাধ্যমে বেশি কার্যকর। এজন্য এসব উৎসেচকগুলিকে acid hydrolases বলে। লাইসোসোমের পর্দার ভিতরে H^+ সঞ্চিত হয়। এর ফলে লাইসোসোমের ভিতরের মাধ্যম অম্ল হয় (Reijngoud, 1978)।

লাইসোসোমে জারণকারী উৎসেচক থাকে না। এটি লাইসোসোমের সাথে মাইটোকন্ড্রিয়ার একটি পার্থক্য। লাইসোসোমের পর্দা লাইপোপ্রোটিন দ্বারা গঠিত। লাইসোসোমের উৎসেচকগুলি এই পর্দার কোনও ক্ষতি করে না। কোনও কোনও পদার্থ, যেমন, কোলেস্টেরল, কর্টিসোন, কর্টিসল, ক্লোরোকুইন ইত্যাদি লাইসোসোমের পর্দাকে স্থায়ী করে। আবার কিছু পদার্থ লাইসোসোমের পর্দাকে ভাঙতে সহায়তা করে। এরকম কিছু পদার্থ হল— প্রোজেস্টেরন, এন্ডোটক্সিন, টেস্টোস্টেরন, প্রোটিয়েজেল, ডিজিটনিন, ভিটামিন A ও E, পিত্তের লবণ (bile salts), X-রশ্মি,

অতি বেগুনী রশ্মি ইত্যাদি লাইসোসোমের কতকগুলি উৎসেচক এবং এগুলি যেসব পদার্থের উপর কাজ করে তার একটি তালিকা দেওয়া হল—

উৎসেচক	যেসব পদার্থের উপর কার্যকর	লাইসোসোমের উৎস
a. **স্নেহ পদার্থ পরিপাককারী উৎসেচক**		
এস্টারেজেস	ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার	উদ্ভিদ, প্রাণী ও প্রোটিস্টায়।
ফসফোলাইজেস	ফসফোলিপিড	
b. **নিউক্লিয়জেস**		
অ্যাসিড রাইবোনিউক্লিয়েজ	RNA	বেশিরভাগ প্রাণী, উদ্ভিদ ও প্রোটিস্টায়।
অ্যাসিড ডিঅক্সি-রাইবোনিউক্লিয়েজ	DNA	
c. **ফসফাটেজ**		
অ্যাসিড ফসফাটেজ	ফসফো মনোএস্টার,	
অ্যাসিড ফসফোডাই-এস্টার	অলিগো-নিউক্লিওটাইড, ফসফোডাইএস্টার	
d. **পলিস্যাকারাইড পরিপাককারী উৎসেচক**		
α-গ্লুকোসাইডেজ	গ্লাইকোজেন	প্রাণীতে
β-গ্যালাক্টোসাইডেজ	গ্যালাক্টোসাইড	প্রাণী, উদ্ভিদ, প্রোটিস্টায়।
β-গ্লুকোরোনিডেজ	পলিস্যাকারাইড ও মিউকোপলিস্যাকারাইড	উদ্ভিদ, প্রাণীতে
লাইসোজাইম	ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীর ও মিউকো-পলিস্যাকারাইড	প্রাণীর বৃক্কে
অ্যারিলসালফাটেজ	জৈব সালফেট	প্রাণীর যকৃতে, উদ্ভিদে

e. প্রোটিয়েজ

ক্যাথেপসিন	প্রোটিন	প্রাণীতে
কোলাজেলেস	কোলাজেন	প্রাণীর অস্থিতে
পেপ্টাইজেস	পেপটাইড	প্রাণী উদ্ভিদ ও প্রোটিস্টায়।

বিভিন্ন প্রকারের লাইসোসোম

বিভিন্ন রকমের কোষে অথবা একই কোষে বিভিন্ন সময়ে লাইসোসোমের পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়েছে। লাইসোসোম সাধারণত চার রকমের— প্রাথমিক লাইসোসোম, গৌণ লাইসোসোম, অবশিষ্ট বস্তু (residual bodies) এবং সাইটোলাইসোসোম বা স্বপরিপাককারী (autophagic) ভ্যাকুওল।

a) **প্রাথমিক লাইসোসোম**— নব গঠিত লাইসোসোমকে প্রাথমিক লাইসোসোম বলে। গলগি পর্দা থেকে ভেসিকেল রূপে এগুলি উৎপন্ন হয়। অথবা কোনও কোনও কোষে বিশেষ ধরনের এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা GERL বা গলগি সংযুক্ত এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা থেকে গঠিত হয় (Dyson1978)।

b) **গৌণ বা সেকেন্ডারী লাইসোসোম**— পরিপাককারী ভ্যাকুওল বা হেটারোফ্যাগোসোমকে গৌণ লাইসোসোম বলে। পিনোসাইটোসিস বা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় প্লাজমা পর্দা যে ভেসিকেল (পিনোসোম বা ফ্যাগোসোম) গঠন করে তা প্রাথমিক লাইসোসোমের সাথে যুক্ত হয়। এরকম লাইসোসোমকে গৌণ লাইসোসোম বা হেটারোফ্যাগোসোম বলে। গৌণ লাইসোসোমে লাইসোসোমের আর্দ্রবিশ্লেষকারী উৎসেচকের সাথে গৃহীত বস্তু মিশে যায় ও এর পরিপাকে সাহায্য করে। পরিপাকের ফলে উৎপন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড, নিউক্লিওটাইড ইত্যাদি কম আণবিক ঘনত্বের হওয়ার জন্য লাইসোসোমের পর্দার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যায় ও কোষকে শক্তি দেয়। এসব পদার্থ বেরিয়ে যাওয়ার ফলে গৌণ লাইসোসোমটি ক্ষুদ্রতর হয়। এ সময়ে গৌন লাইসোসোমের পর্দা ভিতরের দিকে মুকুল গঠন করে। এরকম অনেক ছোট ছোট ভেসিকেল এবং খণ্ডযুক্ত গৌণ লাইসোসোমকে multivesicular body বা বহু ভেসিকেলযুক্ত বস্তু বলে (G. Braaten 1975)। পরে এই ভেসিকেলগুলির পরিপাক হয়।

এন্ডোসাইটিক ভ্যাকুওলের সাথে লাইসোসোমের সংযুক্তি একটি নির্বাচিত প্রক্রিয়া। এই ভ্যাকুওল এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা বা মাইটোকন্ড্রিয়ার সাথে সংযুক্ত হয় না। লাইসোসোমও সাধারণ অবস্থায় নিউক্লিও পর্দার সাথে যুক্ত হয় না। তবে সাইটোচালাসিন b-র উপস্থিতিতে লাইসোসোম থেকে উৎসেচক নির্গত হয়। প্লাজমা পর্দার নিচে মাইক্রোফিলামেন্টের জাল থাকে এবং এটি প্লাজমা পর্দার সাথে লাইসোসোমের সংযুক্তিতে বাধা দেয়।

কোনও কোনও **কোষে কলচিসিন**, cAMP ইত্যাদি পরিপাককারী ভ্যাকুওল

গঠনে বাধা দেয়। আবার অন্যদিকে cGMP এই ভ্যাকুওল গঠনে সহায়তা করে।

অনেক জীবাণু যা গৌণ লাইসোসোমে থাকতে পারে তা সজীব অবস্থায় এর আর্দ্র বিশ্লেষকারী উৎসেচক দিয়ে প্রভাবিত হয় না। সেজন্য গৃহীত (ingested) জীবকে আগে বিনাশ করে পরে পরিপাক করা হয়।

লাইসোসোমে উৎসেচক লাইসোজাইম থাকে, যা ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীর (বিশেষত গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটিরিয়ার) বিনষ্ট করে। পরিপাককারী ভ্যাকুওলের pH যথেষ্ট অম্ল (সাধারণত 4), যা অনেক ব্যাকটিরিয়ার বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। নিউট্রোফিলের লাইসোসোমে ল্যাক্টোফেরিন থাকে, যা লোহা ও অন্যান্য ধাতব আয়নকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং জীবাণুর বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। পরিপাককারী ভ্যাকুওলের পর্দার ভিতরে অক্সিডেজ থাকে, যা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন পারক্সাইড উৎপাদনে সহায়তা করে। এটি জীবাণুনাশক। নিউট্রোফিলে ও মাইক্রোফাজে উৎসেচক মায়ালোপেরক্সিডাইজেস থাকে যা জীবাণুর সাথে ক্লোরিন ও আয়োডিন আয়নের সংযুক্তিতে সহায়তা করে। এর ফলে জীবাণু সহজেই বিনষ্ট হয়।

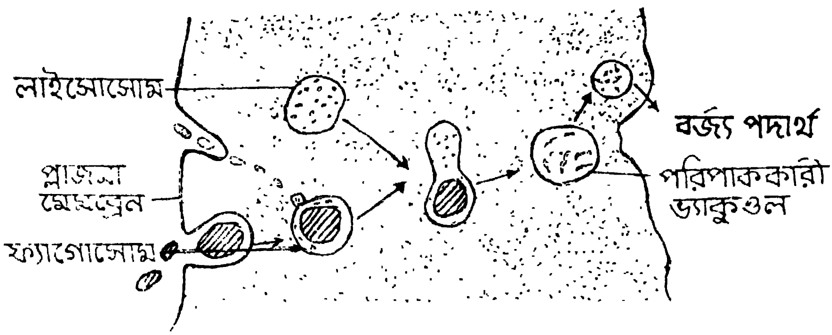
c) **অটোফ্যাগি (autophagy)**— পরিপাককারী লাইসোসোমে কেবল বাইরের থেকে গৃহীত বস্তুর বিনাশ করার উৎসেচক থাকে তাই নয়, এখানে কোষ অন্তঃস্থ বস্তুর পরিপাকও হতে পারে। শেষোক্ত প্রক্রিয়াকে অটোফ্যাগি বলে। কোষের কিছু অঙ্গাণু স্বল্পস্থায়ী। যেমন, যকৃতের কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ার অর্ধ জীবন 5-6 দিন, পেরক্সিসোমের অর্ধ জীবন 1-2 দিন এবং রাইবোসোমের মোটামুটি পাঁচ দিন। লাইসোসোম এসব পরিণত অঙ্গাণুর বিনাশ করে।

সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুকে একটি মসৃণ প্রাচীরযুক্ত পর্দা বেষ্টন করে। এই পর্দা এন্ডোপ্লাজমিয় পর্দা বা গলগি বস্তু (1975) থেকে উৎপন্ন হয়। এই পর্দা দিয়ে বেষ্টিত অঙ্গাণুকে isolation body বলে। এর সাথে লাইসোসোম মিলিত হয়ে autophagic digestive vacuole সৃষ্টি করে। পরিপাকের ফলে উৎপন্ন পদার্থ সাইটোপ্লাজমে যায় ও শক্তি সরবরাহ করে।

d) **অবশিষ্ট বস্তু** বা residual bodies— লাইসোসোমে পরিপাকের পর কিছু পদার্থ থেকে যায়, যার পরিপাক হয় না। এইসব পদার্থ কোষের বাইরে নিঃসৃত করার (exocytosis) জন্য পরিপাককারী ভ্যাকুওল প্লাজমা পর্দার সাথে যুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়া প্রোটোজোয়ায় যথেষ্ট সক্রিয়, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর প্রাণীতে তেমন কার্যকর না হতে পারে। এর ফলে কিছু বর্জ্য পদার্থ সঞ্চিত হতে পারে। এরকম পদার্থযুক্ত ভ্যাকুওলকে residual body বলে। যেসব কোষ সহজেই বিনষ্ট হয় (যেমন, নিউট্রোফিল), সেখানে এরকম ভ্যাকুওলের উপস্থিতি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেসব কোষ সহজে বিনষ্ট হয় না অথবা বিভাজিত হয় না, সেখানে এরকম residual body যথেষ্ট সঞ্চিত হতে পারে। যেমন, স্নায়ু ও পেশীর কোষে। ঐসব কোষের residual body বা অবশিষ্ট বস্তুকে লাইপোফুসিন দানা বলে। কোনও জীবের বয়স এসব দানার

ঘনত্ব থেকে বোঝা যেতে পারে। মনে করা হয় যে, এরকম **residual body**-র কোষের বার্ধক্যে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

কাজ— ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষে যেসব বস্তু প্রবেশ করে লাইসোসোম সেগুলি পরিপাক করতে পারে। [ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) প্রক্রিয়ায় কোনও বস্তু কোষে প্রবেশ করলে প্লাজমা মেমব্রেন প্রথম ঐ বস্তুকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে ও কোষের মধ্যে নিয়ে আসে। পরে মেমব্রেন ঘেরা অবস্থায় বস্তুটি প্লাজমা মেমব্রেন থেকে আলাদা হয়ে যায় ও সাইটোপ্লাজমে থাকে। মেমব্রেন দিয়ে আবদ্ধ বস্তুটিকে ফ্যাগোসোম (phagosome) বলে। ফ্যাগোসোম লাইসোসোমের সংস্পর্শে আসলে মধ্যবর্তী প্রাচীর বিনষ্ট হয়ে যায় ও লাইসোসোমের এনজাইমগুলি ঐ পদার্থকে পরিপাক করে। ফ্যাগোসোম ও লাইসোসোমের মিলনের ফলে সৃষ্ট ভ্যাকুওলকে পরিপাককারী ভ্যাকুওল (digestive vacuole) বলা হয়। যেসব পদার্থ পরিপাক হয় না, তা ঐ ভ্যাকুওলে থাকে। পরে ভ্যাকুওলটি কোষ প্রাচীরের দিকে যায় ও বিপরীত ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বর্জ্য পদার্থগুলিকে কোষ থেকে বের করে দেয় (চিত্র 24a)।]



চিত্র—24a

লাইসোসোমের সাহায্যে কোনও বস্তুর পরিপাক

খাদ্যের অভাব হলে লাইসোসোম কোষের কিছু অংশ পরিপাক করতে পারে। কখনও কখনও লাইসোসোমের মেমব্রেন ভেঙে গিয়ে এনজাইমগুলি বের হয়ে আসে ও সম্পূর্ণ কোষটিকেই পরিপাক করে। দেহের কোনও অংশে কোষের মৃত্যু ঘটলে কিছু আবর্জনা অপসারণকারী কোষ ঐ স্থানে যায় ও মৃত কোষকে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় নিজের দেহের মধ্যে নিয়ে আসে। এরপর ঐসব কোষের লাইসোসোমগুলি মৃত কোষকে পরিপাক করে ফেলে। কোনও কোনও কোষের লাইসোসোম কোষের বাইরে উৎসেচক নিঃসৃত করে। যেমন, নিষেকের উৎসেচক ডিম্বাণুর পর্দার অংশ পরিপাক করে। এই পথের মধ্যে দিয়ে শুক্রাণু প্রবেশ করতে পারে। কন্ড্রিয়ব্লাস্ট এবং

অস্টিওব্লাস্ট কোষ বহিঃকোষীয় পরিপাক দ্বারা যথাক্রমে তরুণাস্থি ও অস্থির পরিপাক করতে পারে।

সুতরাং, লাইসোসোমের প্রধান কাজগুলি হল— (a) কোষের ভিতরে যেসব বস্তু প্রবেশ করে তা পরিপাক করা, (b) কোষ মধ্যস্থ কোনও পদার্থের পরিপাক করা, (c) কোষের পরিপাক, (d) কোষের বাইরের কোনও বস্তুর পরিপাক, (e) কোনও কোনও কোষে লাইসোসোম মাইটোসিস বিভাজনের সূচনা করে। (f) Allison ও Mallucci-র (1964) মতে, লাইসোসোম ও এর উৎসেচকের সাথে ক্যানসার বা কর্কট রোগের সম্পর্ক রয়েছে। (g) লাইসোসোম কোষকে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সহায়তা করে। এই পরিবর্তন খাদ্যের সরবরাহ, অক্সিজেনের ঘনত্ব ইত্যাদির তারতম্যের ফলেও হতে পারে।

বিভাজনশীল কোষে খুব কম সংখ্যক লাইসোসোম থাকে এবং এই লাইসোসোমগুলি পরিধির দিকে থাকে। এর থেকে মনে করা হয় যে, লাইসোসোম ভেঙে যায় ও সম্ভবত কোষ বিভাজনের সূচনা করে।

উৎপত্তি— (a) লাইসোসোম এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা (Novikoff 1965) বা গলগি বস্তু থেকে উৎপন্ন হতে পারে। গলগি বস্তু থেকে এনজাইম অ্যাসিড হাইড্রোলেজেস লাইসোসোমে যায়। (b) আরেকটি মত অনুসারে, লাইসোসোম কেবল গলগি বস্তু থেকে তৈরি হয়।

লাইসোসোম ও রোগ

লাইসোসোম স্বাভাবিকভাবে কাজ না করতে পারলে নানা রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

(a) লাইসোসোমে অক্সিডেজ উৎসেচকের ঘাটতি থাকলে ক্রনিক **গ্র্যানুলোমেটাস** রোগ হতে পারে। এই উৎসেচকের অভাবের ফলে ম্যাক্রোফাজ ও নিউট্রোফিলগুলি সাধারণ ব্যাকটিরিয়াকেও বিনাশ করতে পারে না। এই ব্যাকটিরিয়াগুলি কোষের মধ্যে বাস করে ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও কোষকে বিনষ্ট করে। এজন্য এরকম লোকেদের সহজেই ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাকজনিত রোগ হতে পারে।

(b) কখনও কখনও লাইসোসোম এন্ডোসাইটিক ভ্যাকুওলের সাথে মিলিত হতে পারে না। এক বা একাধিক উৎসেচকের অনুপস্থিতির ফলে কোনও নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ বা জীবাণু পরিপাক করতে পারে না। যেমন, যক্ষা বা লেপ্রসীর সজীব জীবাণু বা সজীব টক্সোপ্লাজমা (প্রোটোজোয়ার সাধারণ পরজীবী)। এন্ডোসাইটিক ভ্যাকুওলের সাথে লাইসোসোমের সংযুক্তি না হওয়ার ফলে ঐসব জীব ভ্যাকুওলে থেকে যায় ও রোগের সৃষ্টি করে। দেখা গেছে যে, কনকাভেলিন A বা Con A-র (এক ধরনের লেসিথিন) উপস্থিতিতে ভ্যাকুওল লাইসোসোমের সাথে সংযুক্ত হতে পারে না। পর্দার গ্লাইকোপ্রোটিনও এরকম সংযুক্তিকে প্রভাবিত করে।

বয়স্ক লোকেদের লাইসোসোমে অনেক সময় পরিপাক হয়নি এমন কিছু বস্তু সঞ্চিত হয় ও এর ফলে রোগের সৃষ্টি হয়। যেমন, গ্লাইকোজেন সঞ্চয়ের ফলে

Pompe's রোগ দেখা দেয়। এই রোগ লাইসোসোমে একটি নির্দিষ্ট আর্দ্র বিশ্লেষকারী উৎসেচকের অনুপস্থিতির জন্য হয়। এই উৎসেচক উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট জিন না থাকায় এই রোগের সৃষ্টি হয়। এরকম লাইসোসোম সংশ্লিষ্ট আরো কিছু বংশগত রোগ দেখা যায়, যেমন, মিউকোপলিস্যাকারাইড বা গ্লাইকোলিপিডের সঞ্চয়।

লাইসোসোমে নির্দিষ্ট আর্দ্র বিশ্লেষকারী উৎসেচকের অনুপস্থিতির ফলে যেসব রোগ (লাইসোসোমীয় storage disease) দেখা দেয়, সেগুলি সাধারণত অটোসোমীয় প্রচ্ছন্ন জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব রোগে পরিপাক হয়নি এমন স্নেহ পদার্থ বা পলিস্যাকারাইড কোষে সঞ্চিত হয়। এর ফলে বিভিন্ন রোগ (যেমন, Hunter, Hurler, Jay-Sach ও Niemanh-Pick ইত্যাদি) হয়।

কোনও কোনও রোগ, যেমন, গোদ (gout), সিলিকোসিস, রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, অ্যাসবেসটোসিসে লাইসোসোম থেকে উৎসেচক নিঃসৃত হয়। এছাড়া অ্যাসিডোসিন, অ্যানোক্সিয়া ইত্যাদিতেও লাইসোসোম থেকে উৎসেচক নিঃসৃত হয় এবং রক্তে উৎসেচক বৃদ্ধি পায়।

ফ্যাগোসাইটিক ভ্যাকুওলের সাথে লাইসোসোমের সংযুক্তি নির্দিষ্ট সময়ের আগে হতে পারে। প্লাজমা পর্দা সম্পূর্ণ ভ্যাকুওল গঠনের আগেই এই সংযুক্তি হলে লাইসোসোমের উপাদান এই ভ্যাকুওলের মধ্যে দিয়ে কোষের বাইরে বেরিয়ে যায়। লাইসোসোমের উৎসেচকের বিনাশকারী প্রকৃতির জন্য স্থানীয় স্ফীতি ও প্রদাহ দেখা দিতে পারে। এই কারণেই সম্ভবত গাউট, রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস ইত্যাদি হয়। গাউট বা গোদের চিকিৎসায় কলচিসিনের সফলতার সম্ভাব্য কারণ হল, এটি লাইসোসোমের সংযোগ (fusion) ও দানার চলনে বাধা দেয়।

লাইসোসোমের পর্দার স্থায়িত্ব

কোনও কোনও পদার্থের উপস্থিতিতে লাইসোসোমের পর্দা বিনষ্ট হয়। এরকম পদার্থকে labilizer বা বিনাশকারক বলে। এর ফলে লাইসোসোমের স্ববিনাশ বা autolysis হয়। লাইসোসোমের বিনাশকারক এরকম কয়েকটি labilizer হল এন্ডোটক্সিন, টেস্টোস্টেরন, প্রোজেস্টেরন, স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন A, D, E ও K, ডিটারজেন্ট, অতি বেগুনী রশ্মি ইত্যাদি। আবার কিছু পদার্থ আছে যা লাইসোসোমের পর্দার স্থায়িত্ব বাড়ায়। যেমন, কোলেস্টেরল, কর্টিসোন, হাইড্রোকর্টিসোন, ক্লোরোকুইনোন ইত্যাদি। এরকম পদার্থকে stabilizer বলে। দেখা গেছে যে, হঠাৎ অক্সিজেনের অভাব হলে লাইসোসোমের প্রাচীর ভেঙে যায় ও উৎসেচকগুলি বেরিয়ে আসে ও কোষের স্ববিনাশ ঘটে।

স্ফিরোসোম (spherosome)

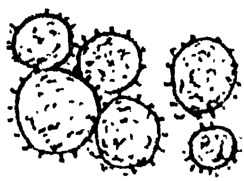
Dangeard ('19) কোষে প্রথম স্ফিরোসোম দেখতে পান। Parner 1952 খ্রিস্টাব্দে স্ফিরোসোমের নামকরণ করেন। এগুলি সাইটোপ্লাজমে ছড়ান থাকে। উদ্ভিদ

কোষের স্ফিরোসোম প্রাণী কোষের লাইসোসোমের সাথে তুলনীয়।

গঠন— স্ফিরোসোম ছোট, গোলাকার (চিত্র 24b) এবং একক পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। এদের ব্যাস 0.5 থেকে 2.5μ পর্যন্ত হয়।

রাসায়নিক গঠন— স্ফিরোসোমে প্রচুর লিপিড (98% পর্যন্ত) সঞ্চিত থাকে। এছাড়া এখানে প্রোটিন পাওয়া যায়। স্ফিরোসোমে হাইড্রোলাইটিক এনজাইমও থাকে।

কাজ— লিপিড সংশ্লেষের সাথে স্ফিরোসোমের সম্পর্ক রয়েছে। এখানে যথেষ্ট লিপিড সঞ্চিত হয়। ভুট্টার মূলাগ্রে (Matile 1968) ও তামাকের শস্যে (Spichiger 1969) যথেষ্ট আর্দ্র বিশ্লেষক পরিপাককারী উৎসেচক থাকে। সুতরাং, স্ফিরোসোমের সাথে লাইসোসোমের সামঞ্জস্য রয়েছে। ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় যেসব পদার্থ সাইটোপ্লাজমে আসে, এসব উৎসেচক সেগুলির পরিপাক করে।



চিত্র—24b

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা চিনাবাদামের স্ফিরোসোম

উৎপত্তি— স্ফিরোসোম এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে মুকুলের আকারে (প্রোস্ফিরোসোম) উৎপন্ন হয়। এর সাথে সাথে প্রোটিনের পরিমাণ হ্রাস পায় ও লিপিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

গ্লিঅক্সিসোম (glyoxysome)

কোষের এই ছোট ছোট অঙ্গাণুগুলি R. W. Breidenbach ও Beevers ('67) রেড়ীর বীজের শস্যে প্রথম দেখতে পান। গ্লিঅক্সিসোম একক পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। উদ্ভিদ কোষের এই গ্লিঅক্সিসোম আর প্যারক্সিসোম একই।

রাসায়নিক কাজ— এর মধ্যে নানারকম উৎসেচক থাকে। গ্লিঅক্সিলেট চক্রের বিভিন্ন এনজাইমগুলি যেমন, ম্যালেট সিন্থেটেজ, গ্লাইকলেট অক্সিডেজ, আইসোসাইট্রেট অক্সিডেজ ইত্যাদি গ্লিঅক্সিসোমে থাকে। এখানে অ্যাসিটাইল CoA এবং অক্সাল-অ্যাসিটেট যুক্ত হয়ে আইসোসাইট্রেট গঠন করে। এর থেকে সাকসিনেট ও গ্লিঅক্সিলেট উৎপন্ন হয়। এই গ্লিঅক্সিলেট অ্যাসিটাইল CoA-র সাথে যুক্ত হয়ে ম্যালেট তৈরি করে। এর থেকে আবার আইসোসাইট্রেট উৎপন্ন হয়।

প্যারক্সিসোম (peroxisome)

প্যারক্সিসোম হল কোষের ছোট ছোট অঙ্গাণু। কখনও কখনও এগুলি ক্লোরোপ্লাস্টিডের সাথে যুক্ত থাকে। যকৃতের কোষে ও বৃক্কের কোষে সাধারণত প্যারক্সিসোম পাওয়া গেছে। de Duve ('65) প্রথম প্যারক্সিসোম দেখতে পান।

গঠন— প্যারক্সিসোম ডিম্বাকার এবং একটি পর্দা দিয়ে আবৃত। এর কেন্দ্রে সূক্ষ্ম দানাদার বস্তু ঘনীভূত অবস্থায় থাকে। এজন্য কেন্দ্রস্থল (core) অস্বচ্ছ এবং সমসত্ত্ব প্রকৃতির (opaque homogeneous) হয়। প্যারক্সিসোমের সংখ্যা কোষ প্রতি 70-100 এবং যকৃতের কোষে এর ব্যাস 0.6-0.7μ হয়।

প্যারক্সিসোমে বিভিন্ন রকম এনজাইম যেমন, D-অ্যামিনো অ্যাসিড অক্সিডেজ, α হাইড্রক্সিঅ্যাসিড অক্সিডেজ, ইউরিক অ্যাসিড অক্সিডেজ, NADH, গ্লিঅক্সিলেট রিডাকটেজ, NADP আইসোসাইট্রিক ডিহাইড্রোজিনেজ, ক্যাটালেজ, পারক্সিডেজ ইত্যাদি থাকে।

কাজ— বিভিন্ন উদ্ভিদের আলোক শ্বসনের (photo-respiration) সাথে প্যারক্সিসোমের সম্পর্ক রয়েছে। প্যারক্সিসোম স্নেহপদার্থকে শর্করায় পরিণত করতে পারে।

প্যারক্সিসোম থেকে এনজাইম প্যারক্সিডেজ বের হয় এবং অক্সিডেজের প্রভাবে উৎপন্ন হাইড্রোজেন পারক্সাইডের জল ও অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট করে।

উৎপত্তি— প্যারক্সিসোম এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা থেকে উৎপন্ন হয়। এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার কোনও কোনও অংশ স্ফীত হয় ও প্যারক্সিসোম গঠন করে। অমসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার রাইবোসোম অঞ্চলে প্যারক্সিসোমের এনজাইমগুলি তৈরি হয়। উৎপন্ন হওয়ার চার পাঁচ দিন পরই প্যারক্সিসোম বিনষ্ট হয়ে যায় (autophagy বা স্ববিনাশ)। এনজাইম ক্যাটালেজের প্রভাবে এরকম হয়।

গলগি বস্তু (Golgi body)

ইতালীয় বিজ্ঞানী Camilo Golgi 1898 খ্রিস্টাব্দে স্নায়ু কোষকে (nerve cell) সিলভার নাইট্রেট (silver nitrate) ও অসমিয়াম টেট্রাঅক্সাইড (Osmium tetraoxide) দিয়ে রঞ্জিত করে কতকগুলি জালিকাকার বস্তু দেখতে পান। এইসব বস্তুকে আবিষ্কারকের নামানুসারে গলগি বস্তু বলা হয়। প্রাণী কোষে গলগি বস্তু পাওয়া যায়। গলগি বস্তুর (golgi body) বিভিন্ন নাম আছে, যেমন— গলগি অ্যাপারেটাস (golgi apparatus), গলগি কমপ্লেক্স (golgi complex), ডিকটিওসোম (dictyosome, Gr. dictyes–জালিকা), লাইপোকন্ড্রিয়া (lipochondria), ইডিওসোম (idiosome) ইত্যাদি।

বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা গলগি বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁদের মতে, কোষকে স্থায়ী (fix) ও রঞ্জিত করবার সময় বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর প্রভাবে গলগি বস্তুর আবির্ভাব হয়। কিন্তু ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে গলগি বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়েছে।

গলগি বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই সব বিতর্কের মূলে ছিল অনুন্নত কলাকৌশল ও শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভাব। এই বিতর্কের প্রধান কারণগুলি হল— (a) বিভিন্ন প্রাণীতে বা একই প্রাণীর বিভিন্ন কোষে গলগি বস্তুর আয়তন ও চেহারার তারতম্য। (b) সজীব কোষে গলগি বস্তুর সমতুল্য কোনও বস্তু দেখা যায়নি। সেজন্য তখনকার দিনের কিছু বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে, সাইটোপ্লাজমের লিপিড অংশ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে গলগি বস্তুর মত দেখায়। (c) কোনও কোনও বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, মাইটোকন্ড্রিয়ার পরিবর্তিত রূপ হ'ল গলগি বস্তু। (d) অন্যদের মতে মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সমষ্টিই গলগি বস্তু। (e) জনন কোষে গলগি বস্তু থাকে, কিন্তু দেহ কোষে এদের দেখা যায় না।

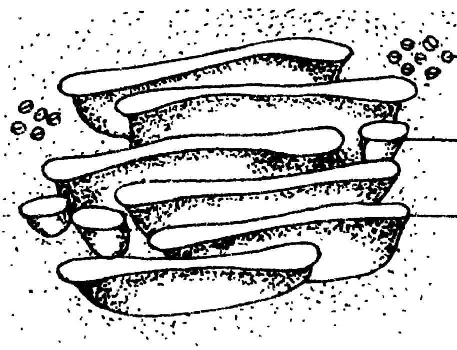
কিন্তু এখন গলগি বস্তুর অস্তিত্বের সপক্ষে নানা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। (a) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে গলগি বস্তু দেখা গিয়েছে। এই গলগি বস্তু এবং এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কিংবা মাইটোকন্ড্রিয়া এক নয়। (d) দেহ কোষেও জনন কোষের মত গলগি বস্তু দেখা গিয়েছে। (c) ফেজ কনট্রাস্ট (phase contrast) অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সজীব কোষে যে গলগি বস্তু দেখা গিয়েছে, তাদের গঠন রঞ্জিত কোষের গলগি বস্তুরই মতন। (d) সেন্ট্রিফিউজ (centrifuge) করে গলগি বস্তুকে আলাদা করা সম্ভব হয়েছে।

প্রোক্যারিওট কোষ (যেমন, ব্যাকটিরিয়া, নীল সবুজ শৈবাল, মাইকোপ্লাজমা), কিছু ইউক্যারিওট কোষ (যেমন, কোনও কোনও ছত্রাক, ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটার শুক্রাণু, পরিণত সীভ নল এবং প্রাণীর লোহিত কণিকা ও পরিণত শুক্রাণু) ছাড়া আর সব কোষেই গলগি বস্তু দেখা যায়। প্রতি কোষে গলগি বস্তুর সংখ্যার তারতম্য হয়। কোনও কোনও শৈবালের কোষে একটি মাত্র গলগি বস্তু থাকে। আবার কোনও কোনও কোষে কয়েকশ গলগি বস্তু থাকে, যেমন, ভুট্টার মূল ও কিছু শৈবালের রাইজয়েডে। Sievers (1965) শৈবালের রাইজয়েডের একটি কোষে 25,000 গলগি বস্তু পেয়েছিলেন। প্রাণীতে সাধারণত একটি কোষে কেবল একটি গলগি বস্তু থাকে। তবে কর্ডাটার অপরিণত ডিম্বাণুতে অনেকগুলি গলগি বস্তু পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন কোষের কিংবা একই কোষের গলগি বস্তুর আকৃতির তারতম্য হয়। মূলত গলগি বস্তুর কাজের ওপরই তাদের আকৃতি নির্ভর করে।

গলগি বস্তুর আয়তনেরও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। স্নায়ু ও গ্রন্থির কোষে গলগি বস্তু বড় হয় ও পেশীর কোষে ছোট হয়। ব্যস্ত কোষে গলগি বস্তুগুলি সুগঠিত হয়, কিন্তু নিষ্ক্রিয় কিংবা তুলনামূলকভাবে নিষ্ক্রিয় কোষে এগুলি সুগঠিত হয় না। পুরনো কোষে গলগি বস্তুগুলি ক্রমশ ছোট হতে হতে অদৃশ্য হয়ে যায়। উদ্ভিদ কোষের গলগি বস্তু মোটামুটি 1-3mμ লম্বা, 0.5mμ চওড়া। গলগি বস্তু কোষের সব জায়গায় ছড়িয়ে থাকতে পারে কিংবা নির্দিষ্ট স্থানে থাকে। এন্ডোক্রাইন গ্রন্থির (endocrine gland) কোষে গলগি বস্তু নিউক্লিয়াসের পাশে থাকে।

গঠন— গলগি বস্তুর গঠন কোন ধরনের কোষে এটা অবস্থান করছে এবং এর নিজস্ব কাজের ওপর নির্ভরশীল। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে এই বস্তুর তিনটি উপাদান (চিত্র 25) দেখা যায়। এই উপাদানগুলি হল— (a) চ্যাপ্টা থলি (flattened sac) বা সিস্টারনি (cisternae) (b) বড় ভ্যাকুওল (large vacuole), (c) টিউবিউল, (d) ছোট ছোট ভেসিকেলের (vesicle) সমষ্টি। চ্যাপ্টা থলিগুলি পরপর সাজান থাকে। এগুলি মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মত। এই থলিগুলির (সিস্টারনি) প্রাচীর 60-70Å চওড়া। দুই দিকের প্রাচীরের মাঝের ব্যবধান হল 50-90Å। দুইটি থলির মাঝের ব্যবধান হল 100-130Å। পরপর বিন্যস্ত সিস্টারনিগুলি পরস্পর যুক্ত থাকে। একটি গলগি বস্তুতে 3-7টি চ্যাপ্টা নলাকার বা সূত্রাকাব সিস্টারনি বা স্যাকিউল (saccules) থাকে। তবে এই সংখ্যা নিম্নশ্রেণীর জীবে (যেমন, পতঙ্গে) 30 বা তারচেয়ে বেশি হতে পারে। কোনও কোনও নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের গলগি বস্তুতে কেবল একটি সিস্টারনি থাকে।



চিত্র—25

গলগি বস্তুর গঠন

গলগি বস্তুর সিস্টারনিগুলি কিছুটা বাঁকানো থাকে। অর্থাৎ, একদিক উত্তল ও অন্য দিক অবতল থাকে। উত্তর দিকটা নিউক্লিও পর্দা বা এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার সাথে যুক্ত থাকে। এই দিকটি (proximal pole বা forming face) অপেক্ষাকৃত অপরিণত ও এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার অনুরূপ। এর বিপরীত দিকে (distal pole বা maturing face) অর্থাৎ, অবতল দিক অধিক পরিণত ও প্লাজমা পর্দার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত। এই দিক থেকেই ভেসিকেলগুলি উৎপন্ন হয়।

দু'টি সিস্টারনির মধ্যবর্তী অঞ্চলে কোনও কোনও কোষে কতকগুলি সমান্তরাল তন্তু (inter-cisternal element) দেখা যায়। এগুলি সিস্টারনির মাঝের নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখে ও দৃঢ়তা প্রদান করে (Hall ও সহকর্মীগণ 1974)।

টিউবিউল বা বড় ভ্যাকুওলগুলি চ্যাপটা থলির থেকেই তৈরি হয়। সিস্টারনির

পরিধির অঞ্চল থেকে টিউবিউলগুলি উৎপন্ন হয়। টিউবিউলের ব্যাস 300-500Å। ছোট ছোট ভেসিকেলগুলিও ওই থলির প্রান্ত থেকে মুকুলোদগম প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়।

ভেসিকেল দুই রকম হয়।

a) মসৃণ ভেসিকেলের ব্যাস 20-80mμ। এসব ভেসিকেলে নিঃসারী পদার্থ (secretory material) সঞ্চিত থাকে। সাধারণত একাধিক টিউবিউল এরকম অপরিণত ভেসিকেলের সাথে যুক্ত থাকে।

b) আবৃত ভেসিকেলগুলি (coated vescicle) মোটামুটি গোলাকার ও এদের ব্যাস মোটামুটি 50mμ। এই ভেসিকেলগুলির ত্বক অমসৃণ। এরকম ভেসিকেল একটি টিউবিউলের প্রান্তে পাওয়া যায়।

গলগি বস্তু সাইটোপ্লাজমের এমন অঞ্চলে অবস্থান করে যেখানে রাইবোসোম, গ্লাইকোজেন এবং সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু যেমন, মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড ইত্যাদি খুব কম থাকে বা অনুপস্থিত থাকে। এই অঞ্চলকে zone of exclusion বা বহিষ্কাব অঞ্চল বলে (Moore 1971)। এই অঞ্চলের এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা মসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট। এই অঞ্চলে মাইক্রোটিউবিউল, সেন্ট্রিওল ইত্যাদি থাকে (Bainton ও Farquhar 1966)।

রাসায়নিক গঠন— গলগি বস্তু লিপিড ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি। এখানে 60:40 অনুপাতে প্রোটিন ও লিপিড থাকে। গলগি বস্তুতে RNA, DNA ও পলিস্যাকারাইড খুব কম পরিমাণে থাকে। গলগি বস্তুর পর্দায় যথেষ্ট ফসফোলিপিড (যেমন, লেসিথিন ও সেফলিন), প্রোটিন ও বিভিন্ন রকম উৎসেচক থাকে। গলগি বস্তুর কতকগুলি উৎসেচক হল ADPase, ATPase, CTPase, থায়ামিন পাইরোফসফাটেজ, NADPH, সাইটোক্রোম C রিডাকটেজ, UDP-N অ্যাসিটাইল গ্লুকোজঅ্যামিন ট্র্যান্সফারেজ, গ্যালাকটোসিল ট্র্যান্সফারেজ, গ্লুকোজ-6-ফসফাটেজ ইত্যাদি। গলগি বস্তুর প্রধান এনজাইম হল পাইরোফসফাটেজ এবং গ্লাইকোসিল ট্র্যান্সফারেজ। গলগি অঞ্চলে ভিটামিন C সঞ্চিত হয়। ক্যারোটিনয়েড ও স্নেহ পদার্থ থাকে।

কাজ— গ্রন্থির কোষে সুগঠিত গলগি বস্তুর উপস্থিতি ওই সব কোষের ক্ষরণে (secretion) গলগি বস্তুর গুরুত্ব প্রমাণ করে। তবে সাধারণত ক্ষরিত (secretory) পদার্থ উৎপাদনে গলগি বস্তু অংশ নেয় না। ক্ষরিত পদার্থ তৈরি হওয়ার পর গলগি বস্তু ওইসব পদার্থকে ঘনীভূত করে ক্ষরিত দানায় (granule) পরিবর্তিত করে। এই ক্ষরিত দানা প্লাজমা মেমব্রেনের দিকে যায় এবং পরে কোষ থেকে বের হয়ে যায়। যেমন, প্রাণীর প্যানক্রিয়াসের কোষের জাইমোজেন দানা, উদ্ভিদ কোষের কোষ প্রাচীর গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় কোনও কোনও বস্তু। বিশেষ ধরনের কোনও কোনও কোষে (যেমন, অ্যাক্রোসোম) গলগি বস্তু ক্ষরিত পদার্থ উৎপাদনে অংশ নেয়।

উদ্ভিদ কোষে পলিস্যাকারাইড এবং প্রোটিন উৎপন্ন হয়, যা কোষ প্রাচীর গঠনের জন্য প্রয়োজন।

কোষে উৎপন্ন ক্ষরিত পদার্থ তখনই নিঃসৃত হতে পারে, অথবা ওইখানে সঞ্চিত হয়। ক্ষরিত পদার্থ প্রথমে জাইমোজেন দানায় সঞ্চিত হয়। এই দানা পরে কোষ থেকে নিঃসৃত হয়।

কোষের ক্ষরিত পদার্থ কতকগুলি ধাপে উৎপন্ন হয়। এই ধাপগুলি হল—

a) রাইবোসোমীয় অবস্থা— অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার সাথে যুক্ত পলিসোম প্রোটিন উৎপাদন করে।

b) সিস্টারনি অবস্থা-উৎপন্ন প্রোটিন এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার গহ্বরে (লিউমেনে) স্থানান্তরিত হয়। এই প্রোটিন সাধারণত লঘু অবস্থায় থাকে, তবে কখনও কখনও প্রোটিন ছোট ছোট দানায় (intra cisternal granule) থাকে।

c) অন্তঃকোষীয় পরিবহন (intracellular transport)— এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা ও গলগি বস্তুর সীমানার টিউবিউল বা ভেসিকেলে নিঃসৃত প্রোটিন প্রবেশ করে। এগুলি পরপর ঘনীভূতকারী ভ্যাকুওলে যায়। এই পরিবহনে প্রয়োজনীয় শক্তি ATP সরবরাহ্ করে। প্যারোটিড গ্রন্থিতে জাইমোজেন দানার স্থায়িত্ব কেবল 52.4 মিনিট।

d) নিঃসৃত বস্তুর ঘনত্ব— ঘনীভূতকারী ভ্যাকুওলে প্রোটিন ক্রমশ সঞ্চিত ও ঘনীভূত হয়ে ইলেকট্রন অস্বচ্ছ (opaque) জাইমোজেন দানা গঠন করে। এই পরিবর্তনে শক্তির প্রয়োজন হয় না। ঘনীভবনের সময় জল পার্শ্ববর্তী সাইটোপ্লাজমে নিঃসৃত হয়।

e) অন্তঃকোষীয় মজুত— ক্ষরণকারী বস্তু ক্ষরণকারী দানায় (secretory granule) সঞ্চিত হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী ও যথাযথ উদ্দীপকের প্রভাবে এই ক্ষরণকারী বস্তু নিঃসৃত হয়।

f) এক্সোসাইটোসিস (exocytosis)— ক্ষরিত দানার নিঃসরণের সময় এসব দানার পর্দার সাথে প্লাজমা পর্দা যুক্ত হয়। এক্সোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় Ca^{++} এবং শক্তি (ATP) প্রয়োজন। সম্পূর্ণ ক্ষরণ প্রক্রিয়ায় এটি প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় ধাপ।

ii) লাইসোসোমের উৎপাদন— গলগি পর্দা থেকে প্রাথমিক লাইসোসোম গঠিত হয়। লাইসোসোমের বেশিরভাগ উৎসেচক হল গ্লাইকোপ্রোটিন প্রকৃতির। গলগি বস্তুতেই কার্বোহাইড্রেট প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে গ্লাইকোপ্রোটিন (যেমন— মিউকোপলিস্যাকারাইড) গঠন করে।

iii) কার্বোহাইড্রেটের সংশ্লেষ— গলগি অঞ্চলে কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসারের সংশ্লেষ ও ঘনীভূতকরণ হয়। উদ্ভিদ কোষে গলগি বস্তুর ভেসিকেলে পেকটিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। কখনও কখনও গলগি অঞ্চলে কার্বোহাইড্রেট সালফারযুক্ত হয়।

iv) গলগি বস্তুর সাথে নিউক্লিয়াসের সংযোগ থাকায় এগুলি নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন বস্তুর পরিবহনে সাহায্য করে।

v) গলগি বস্তু এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও পেরিনিউক্লিও স্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

vi) তাছাড়া গলগি বস্তুর প্লাজমা পর্দার সাথেও সংযোগ রয়েছে।

vii) গলগি বস্তু কোষ বিভাজনের পর কোষ পর্দা গঠনে অংশ নেয়। গলগি বস্তুর ভেসিকেলগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে কোষ পর্দা গঠন করে (Fery-Wysling 1964)। সম্ভবত সেকেন্ডারী বা গৌণ কোষ প্রাচীরের কোনও কোনও পদার্থ গলগি বস্তু উৎপাদন করে। গলগি অঞ্চলে পেকটিক পদার্থ উৎপন্ন হয়।

viii) কোনও কোনও প্রোটোজোয়ায় গলগি বস্তু সঙ্কোচী ভ্যাকুওলের কাছে অবস্থান করে। সেজন্য কোনও কোনও বিজ্ঞানী মনে করেন যে, সঙ্কোচী ভ্যাকুওলের কাজের সাথে গলগি বস্তুর কিছু সম্পর্ক রয়েছে।

ix) পরিবেশ থেকে কোনও বস্তু গ্রহণে গলগি সক্রিয় অংশ নিতে পারে। যেমন, অন্ত্রের ত্বকের কোষে যেখানে প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থ শোষণ বেশি হয়, সেখানে গলগি বস্তু সুগঠিত ও স্ফীত হয়।

x) শুক্রাণু উৎপাদনের সময় অ্যাক্রোসোম গঠনে গলগি বস্তু সহায়তা করে (Burgos ও Fawcett 1955)। গলগি বস্তু প্রথম অবস্থায় মোটামুটি গোলাকার থাকে। সিস্টারনি থেকে উৎপন্ন ছোট ভেসিকেলগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ক্রমশ গলগি অনিয়মিত আকারের হয় এবং বড় ভ্যাকুওল দেখা দেয়। এসব বড় ভ্যাকুওলের কেন্দ্রে ঘন অ্যাক্রোসোমীয় দানা দেখা যায়। এই দানা ক্রমশ accretion প্রক্রিয়ায় বড় হয়। দানা সহ ভ্যাকুওল নিউক্লিও পর্দার কাছে আসে। দানাকে অ্যাক্রোসোমীয় দানা বলে। শুক্রাণু দীর্ঘ হওয়ার সাথে সাথে অ্যাক্রোসোমীয় ভেসিকেল নিউক্লিও পর্দার উপর চ্যাপ্টা হয়ে বিস্তৃত হয় ও এভাবে নিউক্লয়াসের উপরে Cap material গঠন করে।

xi) গলগি বস্তু কোলাজেনের পৃথকীকরণে সহায়তা করে (Porter 1964)। প্রাণী কোষে গলগি বস্তু বিভিন্ন হর্মোন ও রঞ্জকগুলির পৃথকীকরণে সহায়তা করে (Rinchart ও Farguhar 1953, Kessel ও Beams 1965)।

উৎপত্তি— গলগি বস্তুর উৎপত্তির সম্পর্কে কয়েকটি মত আছে। (a) গলগি বস্তুর সাথে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সামঞ্জস্য থেকে মনে করা হয় যে, এই বস্তুগুলি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকেই তৈরি হয়েছে। Essner ও Novikoff ('62) এবং Beams ও Kessel ('68) গলগি বডি এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা থেকে কীভাবে উৎপন্ন হয় তার বিবরণ দেন। প্রোটিন উৎপাদনের পর অমসৃণ প্রাচীরযুক্ত এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা থেকে রাইবোসোম আলাদা হয়ে গিয়ে মসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার সৃষ্টি করে। এর থেকে ছোট ছোট ভেসিকেল তৈরি হয়। এগুলি পরে মিলিত হয়ে সিস্টারনি গঠিত হয়।

(b) Bousch ('65) বলেন যে, নিউক্লিও পর্দা থেকে গলগি বস্তু তৈরি হতে পারে। বাদামী শৈবালে নিউক্লিও মেমব্রেনের বাইরের পর্দা থেকে ভেসিকেল উৎপন্ন হয়। এগুলি পরে মিলিত হয়ে সিস্টারনি গঠন করে। সাম্প্রতিক ধারণা গলগি বস্তুর এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা থেকে উৎপত্তিকেই সমর্থন করে (Whaley 1971)।

(c) এছাড়া কোষ বিভাজনের সময় পুরনো ডিক্টিওসোমের বিভাজনের ফলেও নতুন ডিক্টিওসোমের সৃষ্টি হতে পারে।

জারণকারী অঙ্গাণু (Oxidative organelles)

ইউক্যারিওট কোষের ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া, মাইক্রোবডিজ বা প্যারক্সিসোম ইত্যাদি হল জারণকারী অঙ্গাণু। ক্লোরোপ্লাস্টিড কেবল উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায়। ক্লোরোপ্লাস্টে সালোকসংশ্লেষ হয় এবং আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই শক্তি ATP-তে সঞ্চিত থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়া প্রাণী ও উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায়। মাইটোকন্ড্রিয়ায় বিজারিত সহউৎসেচকের জারণ হয় ও এই শক্তি ATP-তে সঞ্চিত থাকে। প্যারোক্সিসোমও অক্সিজেনের ব্যবহার করে কিন্তু ATP উৎপন্ন হয় না।

মাইটোকন্ড্রিয়া (mitochondria) বা কন্ড্রিয়োসোম (chondriosome)

1880 খ্রিস্টাব্দে Kolliker মাইটোকন্ড্রিয়া প্রথম দেখেন। 1882 খ্রিস্টাব্দে W. Flemming মাইটোকন্ড্রিয়ার সূতোর মত অংশ দেখতে পান। 1890 খ্রিস্টাব্দে R. Altman এর দানার (granule) মত অংশের বর্ণনা করেন। প্রাণী কোষেই প্রথম মাইটোকন্ড্রিয়া দেখা গিয়েছিল। উদ্ভিদ কোষে প্রথম মাইটোকন্ড্রিয়া দেখা যায় *Nymphaea*-তে। 1934 খ্রিস্টাব্দে Bensly ও Hoerr কোষ থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া প্রথম পৃথক (isolate) করেন।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষের সাইটোপ্লাজমে সূতোর মত কিম্বা লম্বাটে বা গোলাকার কতকগুলি বস্তু দেখা যায়। এইসব বস্তুকে Benda মাইটোকন্ড্রিয়া (Gr. mitos সূত্র, chondrion দানা বা গ্র্যানিউল) নাম দিয়েছেন। সূত্রাকার মাইটোকন্ড্রিয়া ভেঙে গিয়ে লম্বাটে বা গোলাকার মাইটোকন্ড্রিয়ার সৃষ্টি করে। কখনও কখনও সূত্রাকার মাইটোকন্ড্রিয়া পরস্পর যুক্ত হয়ে জালের সৃষ্টি করে। তবে এই রকম মাইটোকন্ড্রিয়া বিরল। অন্ধকার ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র (dark field microscope) ও ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র (phase contrast microscope) দিয়ে সজীব কোষের মাইটোকন্ড্রিয়া দেখা যায়। এছাড়া রঞ্জিত কোষে এদের উপস্থিতি উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র (bright field microscope) দিয়ে দেখা যায়। মাইটোকন্ড্রিয়াকে জেনস গ্রীন (Janes green) রঙ দিয়ে রঞ্জিত করা হয়। একটি কোষের মাইটোকন্ড্রিয়াগুলিকে একসাথে কনড্রিয়োসোম বলে।

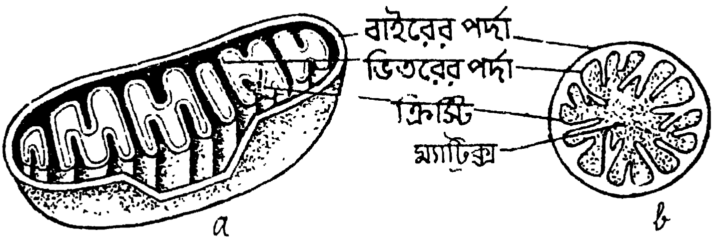
মাইটোকন্ড্রিয়ার **আকার** ও **আয়তন** অনেক রকমের হয়। গোলাকার মাইটোকন্ড্রিয়ার ব্যাস 0.2-2μ বা তার চেয়ে বেশি হয়। সূত্রাকার মাইটোকন্ড্রিয়ার দৈর্ঘ্য 3-7μ হয়ে থাকে। লম্বাটে (rod) মাইটোকন্ড্রিয়ার ব্যাস 0.5μ এবং দৈর্ঘ্য 1.5μ হয়। কোনও বিশেষ কোষে মাইটোকন্ড্রিয়ার আকৃতি সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে,

কিন্তু কোষের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের পরিবর্তন হলে তার প্রভাব মাইটোকন্ড্রিয়ার ওপরও পড়ে।

বিভিন্ন কোষে মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যার তারতম্য হয়। একটি কোষে 50-5000টি পর্যন্ত মাইটোকন্ড্রিয়া থাকতে পারে। এই সংখ্যা কোষের ধরন ও কাজের ওপর নির্ভর করে। যকৃতের (liver) কোষে মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা সাধারণত 1,400 হয়। তবে এখানে 2,500 পর্যন্ত মাইটোকন্ড্রিয়া থাকতে পারে। সী অর্চিনের (sea urchin) ডিম্বাণুতে (egg) এই সংখ্যা 14,000-15,50,000 পর্যন্ত হয়। কোনও কোনও প্রোটোজোয়ায় মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা 500,000।

সাধারণত মাইটোকন্ড্রিয়াগুলি কোষের সব জায়গায় ছড়ান থাকে। কিন্তু কোনও কোনও বিশেষ কোষে এরা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। অনেক সময় মাইটোকন্ড্রিয়াগুলি সেন্ট্রোসোমের (centrosome) কাছে অবস্থান করে। শুক্রাণুতে (sperm) ফ্ল্যাজেলার কাছে মাইটোকন্ড্রিয়াগুলি অবস্থান করে। *Paramecium*-এর কোষের পরিধির কাছে এদের দেখা যায়। মাইটোকন্ড্রিয়াব এই রকম বিশেষ বিশেষ স্থানে অবস্থানের কারণ হল যে, ঐসব জায়গায় বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি মাইটোকন্ড্রিয়াই সরবরাহ করে।

গঠন— উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন একই রকম। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে মাইটোকন্ড্রিয়ার অভ্যন্তরীণ গঠন (চিত্র 26a, b) দেখা গিয়েছে।



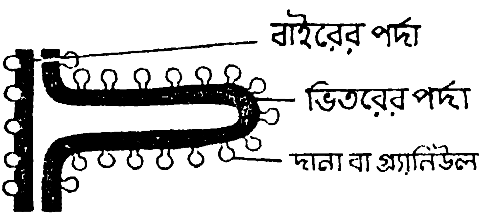
চিত্র—26

মাইটোকন্ড্রিয়ার ছেদ (সেকশন)— অভ্যন্তরীণ গঠনের (a) ত্রিমাত্রিক (three dimensional) এবং (b) দ্বিমাত্রিক (two dimensional) চিত্র

প্রত্যেক মাইটোকন্ড্রিয়ার চারিদিকে দু'টি পর্দা (unit membrane) থাকে। বাইরের ও ভিতরের পর্দা দু'টিই 60-70Å চওড়া। এই দু'টি পর্দার মধ্যে ব্যবধান 60-80Å। ভিতর ও বাইরের পর্দার মাঝে অর্থাৎ perimitochondrial স্থানে কম ঘনত্বযুক্ত তরল থাকে। ভিতরের পর্দাটি স্থানে স্থানে ভাঁজ হয়ে ভিতরের দিকে ঝুলে থাকে। এই ভাঁজ

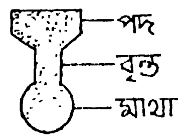
অংশগুলিকে ক্রিস্টি (cristae) বলে। ক্রিস্টিগুলি শাখাযুক্ত বা শাখাবিহীন হয়। এগুলি মাইটোকন্ড্রিয়ার লম্বালম্বি অক্ষের সমকোণে থাকে, তবে কোনও কোনও সময় সমান্তরালভাবেও থাকতে পারে। ভিতরের পর্দার নিচে মাইটোকন্ড্রিয়ার কেন্দ্রের জেলীর মত পদার্থযুক্ত স্থানকে কনড্রিয় ম্যাট্রিক্স (chondrial matrix) বলা হয়। এই ম্যাট্রিক্সে বিভিন্ন আয়তনের ছোট অস্বচ্ছ দানা থাকে। ভাজক কলার (meristematic tissue) মাইটোকন্ড্রিয়ায় খুব কম সংখ্যক ক্রিস্টি থাকে ও ম্যাট্রিক্সের পরিমাণ বেশি হয়। সালোকসংশ্লেষকারী কোষের (photosynthetic cell) মাইটোকন্ড্রিয়ায় ক্রিস্টির সংখ্যা বেশি থাকে।

David Green দেখেন যে, মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরের পর্দার বাইরের দিকে ও ভিতরের পর্দার ভিতরের দিকে খুব ছোট ছোট দানা থাকে (চিত্র—27a)। বাইরের



চিত্র—27a

মাইটোকন্ড্রিয়ার একটা অংশ বড় করে দেখান হয়েছে



চিত্র—27b

মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের পর্দার একটা দানা (গ্রানিউল) বড় করে দেখান হয়েছে

দানাগুলি গোলাকার ও এদের ব্যাস 90-100Å। এই দানাগুলি কাছাকাছি থাকায় বাইরের দিকটা অমসৃণ হয়। কোনও কোনও বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, বাইরের পর্দার বাইরের দিকে কোনও দানা থাকে না। বাইরের পর্দার গঠন ভাঁজ করা ব্যাগের মত। বাইরের পর্দায় কূপ থাকে। এই কূপের ব্যাস 2-3mμ। এগুলি বাইরের পর্দায় অনিয়মিতভাবে থাকে (Parson, Bonner ও Verdoon '65)। ভিতরের পর্দার দানাগুলির গঠন (চিত্র 27b) একটু অন্য রকমের। একটি বৃন্তের উপর গোলাকার মাথা নিয়ে এই দানাগুলি তৈরি। বৃন্তের নিচে পদ বা base থাকে। বৃন্তের দৈর্ঘ্য 35-50Å ও প্রস্থ 30-35Å। বৃন্তের পদ ও মাথার ব্যাস 75-90Å। দুইটি দানার মধ্যে ব্যবধান 20Å। সম্পূর্ণ দানার দৈর্ঘ্য মোটামুটি 160Å হয়। একটি দানার কেন্দ্র থেকে পাশের দানার কেন্দ্রের ব্যবধান 100Å। ভিতরের পর্দার এই দানাগুলিকে F_1 কণিকা বা ভিতরের পর্দার উপএকক (inner membrane subunit) বা মৌলিক কণিকা (elementary particle) বলে। প্রতি মাইটোকন্ড্রিয়ায় F_1 কণিকার সংখ্যা 10^4–10^5 পর্যন্ত হতে পারে। F_1 কণিকায় বিভিন্ন এনজাইম থাকে। Racker-এর ('67) মতে, F_1 কণিকায় ATP সিন্থেটেজ থাকে ও এগুলি অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশনের সাথে

জড়িত। Maclenaan ('70) এবং Green ও Baum ('70) বলেন যে, F_1 কণিকার পদ (base) অঞ্চলে ইলেকট্রন ট্র্যান্সপোর্ট প্রক্রিয়ার এনজাইম থাকে। বৃন্ত বা মাথা কিন্তু ইলেকট্রন ট্র্যান্সফার প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় না। মাথায় ATP সিন্থেটেজ থাকে।

বিভিন্ন পদার্থের প্রভাবে মাইটোকন্ড্রিয়ার পরিবর্তন হয়। এরকম বেশিরভাগ পরিবর্তন প্রত্যাবর্তনীয় (reversible)। তবে কখনও কখনও এরকম পরিবর্তন এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তা আর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে না। যেখানে অটোলাইসিস হচ্ছে, সেখানে মাইটোকন্ড্রিয়া পরিবর্তিত হয়ে এক ধরনের লাইসোসোম গঠন করতে পারে। এগুলিকে সাইটোলাইসোসোম (cytolysosome) বলে। কখনও কখনও কতকগুলি মাইটোকন্ড্রিয়া সংযুক্ত হয়ে খুব বড় কনড্রিয়োস্ফেয়ার (chondriosphere) গঠন করে।

সেন্ট্রিফিউজ করে কোষ থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া আলাদা করা যায়। তাছাড়া মাইটোকন্ড্রিয়ার পর্দা দুইটি density gradient centrifugation পদ্ধতিতে ডিটারজেন্ট ডিজিটনিন (digitonin) এবং লুবরল (lubrol) ব্যবহার করে পৃথক করা যায়।

মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠনের তারতম্য —

বিভিন্ন জীবের মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠনের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়েছে। এসব মাইটোকন্ড্রিয়ায় ক্রিস্টির আকৃতি, আয়তন, সংখ্যা এবং বিন্যাসের তারতম্য হতে পারে।

a) ক্রিস্টির সংখ্যার পার্থক্য— বেশিরভাগ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন কোষে মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্রিস্টির সংখ্যার পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়েছে। যেমন, যকৃতের কোষে, অপরিণত কোষ ইত্যাদির মাইটোকন্ড্রিয়ায় কম সংখ্যক ক্রিস্টি থাকে। কিন্তু বৃক্কের কোষে ও পেশীর কোষে অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক ক্রিস্টি থাকে। পতঙ্গের ডানার কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ায় ক্রিস্টির সংখ্যা খুব বেশি।

b) ক্রিস্টির গঠন ও বিন্যাসের পার্থক্য— সাধারণত ক্রিস্টিগুলি মাইটোকন্ড্রিয়ার দীর্ঘ অক্ষের সমকোণে থাকে। কিন্তু কিছু কোষে এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে।

i) ক্রিস্টিগুলি মাইটোকন্ড্রিয়ার দীর্ঘ অক্ষের সমান্তরালভাবে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বরাবর সাজান থাকে, যেমন— সরেখ পেশির কোষে এবং স্নায়ু কোষে।

ii) ক্রিস্টিগুলি দীর্ঘ অক্ষের সমান্তরালভাবে এবং সমকেন্দ্রিক বলয়ে সাজান থাকে, যেমন— মানুষের শুক্রাণুতে।

iii) ক্রিস্টিগুলি ছোট ছোট ও শাখাযুক্ত ও পরস্পর জড়ান থাকে, যেমন— মানুষের লিউকোসাইটে।

iv) ক্রিস্টিগুলি মাইটোকন্ড্রিয়ায় অনিয়মিতভাবে ছড়ান থাকতে পারে, যেমন— বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত অ্যামিবা (*Chaos chaos*) ইত্যাদিতে।

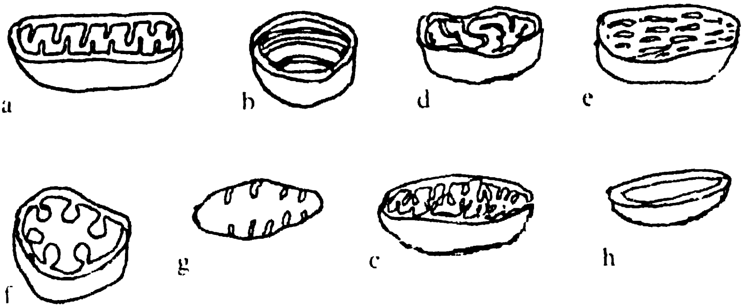
v) ক্রিস্টিগুলি গোলাকার হতে পারে, যেমন— শুক্রাণুতে।

vi) ক্রিস্টিগুলি নিয়মিতভাবে মাইটোকন্ড্রিয়ায় সাজান থাকে। এগুলি লম্বভাবে থাকতে পারে, যেমন— প্রোটোজোয়ায়।

vii) ক্রিস্টিগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অনিয়মিতভাবে ছড়ান থাকে, যেমন— অপসামের শুক্রগ্রন্থিতে।

viii) কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্রিস্টিবিহীন মাইটোকন্ড্রিয়া দেখা গেছে।

c) De Robertis (1957) কোনও কোনও শুক্রাণুর কোষে দেখেন যে, সব মাইটোকন্ড্রিয়াগুলি নিউক্লিয়াসের কাছে আসে ও পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি মাইটোকন্ড্রিয়া গঠন করে।



চিত্র—27c

মাইটোকন্ড্রিয়ায় বিভিন্ন রকম ক্রিস্টি। a- লম্বভাবে সাজান ক্রিস্টি, b- সমকেন্দ্রিক বলয়ে সাজান ক্রিস্টি, C- শাখাযুক্ত ক্রিস্টি, d- অনিয়মিতভাবে সাজান ক্রিস্টি, e- নিয়মিতভাবে সাজান ক্রিস্টি, f- গোলাকার ক্রিস্টি, g- হ্রাসপ্রাপ্ত ক্রিস্টি, h-ক্রিস্টিবিহীন মাইটোকন্ড্রিয়া।

রাসায়নিক গঠন— মাইটোকন্ড্রিয়ার পর্দাগুলি লিপিড ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি। এখানে 65-70 শতাংশ প্রোটিন এবং 25-30 শতাংশ লিপিড থাকে। এই লিপিডের দুই তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে বেশি (90%) হ'ল ফসফোলিপিড (phospholipid)। এছাড়া মাইটোকন্ড্রিয়ায় সামান্য লোহা, তামা, গন্ধক, ভিটামিন (যেমন, ভিটামিন E), কোলেস্টেরল, 10% ক্যারোটিনয়েড, DNA ও RNA থাকে। ম্যাট্রিক্সে দ্রবণীয় প্রোটিন, কিছু লিপিড, বলয়াকার DNA অণু এবং 70S রাইবোসোম পাওয়া যায়। মাইটোকন্ড্রিয়ায় বিভিন্ন রকমের এনজাইম ও কো-এনজাইম (co-enzyme) পাওয়া যায়। Lehninger-এর (1960) মতে, প্রত্যেক মাইটোকন্ড্রিয়ায় 500 থেকে 10,000 এনজাইম থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব ভিন্ন ভিন্ন এনজাইম পাওয়া যায় সেগুলির নাম এখানে দেওয়া হল—

a) মাইটোকন্ড্রিয়ার **বাইরের পর্দার এনজাইম**— ফ্যাটি অ্যাসিড CoA লাইগেস, কাইনুরেনিন হাইড্রক্সিলেজ, মনোঅ্যামিনেট অক্সিডেজ, NADH এবং সাইটোক্রোম C

রিডাকটেজ, নিউক্লিওসাইড ডাইফসফোকাইনেজ ও গ্লিসারল ফসফেট অ্যাসাইল ট্র্যান্সফারেজ।

b) **পেরিমাইটোকন্ড্রিয় স্থানের এনজাইমগুলি হল**— অ্যাডিনিলেট কাইনেজ এবং নিউক্লিওসাইড ডাইফসফোকাইনেজ, নিউক্লিওসাইড মনোফসফোকাইনেজ।

c) **ভিতরের পর্দায় যেসব এনজাইম থাকে সেগুলি হল**— ATP সিন্থেটেজ, β হাইড্রক্সিবিউটারেট ডিহাইড্রোজিনেজ, কার্নিটিন ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাসাইল ট্র্যান্সফারেজ, শ্বাসকাজের এনজাইমগুলি এবং সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ, ফেরোচিলেটেজ ও জাইলিটল ডিহাইড্রোজিনেজ।

d) **কনড্রিয় ম্যাট্রিক্সে যে এনজাইমগুলি থাকে তা হল**— α-কিটো অ্যাসিড ডিহাইড্রোজিনেজ, β - জারণের এনজাইম, সাইট্রেট সিন্থেটেজ, অ্যাকোনাইটেজ, ফিউমারেজ এবং আইসোসাইট্রিক গ্লুটামেট ও ম্যালিক ডিহাইড্রোজিনেজ, পাইরুভেট কার্বোক্সিলেজ।

মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরের পর্দার দানায় জারণের (oxidation) জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলি থাকে। অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফাটেস (adinosine triphosphatase) ও ফসফেট সংযুক্তিকরণের (phosphorylation) এনজাইমগুলি ভিতরের পর্দায় থাকে। সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র বা Krebs cycle-এর এনজাইমগুলি এবং প্রোটিন ও লিপিড উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলি ম্যাট্রিক্সে থাকে।

মাইটোকন্ড্রিয়ায় DNA এবং RNA থাকে। এসব নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে নিউক্লিয়াসের নিউক্লিক অ্যাসিডের কিছু পার্থক্য রয়েছে।

মাইটোকন্ড্রিয়ার DNA-এর পরিমাণ কোষের সম্পূর্ণ DNA-র 1%। মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্স অঞ্চলে ফালগেন (Feulgen) পজিটিভ ফাইব্রিল থাকে। এই DNA ফাইব্রিলের ব্যাস 25 থেকে 100Å হয়। অধিকাংশ জীবে মাইটোকন্ড্রিয় DNA-র গুয়ানিন-সাইটোসিনের পরিমাণ নিউক্লিও DNA থেকে বেশি হয়। তাছাড়া মাইটোকন্ড্রিয় DNA-ব ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি। মাইটোকন্ড্রিয় DNA নিউক্লিও DNA-র চেয়ে ছোট ও কম সঙ্কেতযুক্ত। বেশিরভাগ মাইটোকন্ড্রিয় DNA বলয়াকার যেমন, প্রাণীতে এবং ইস্টে। অন্যান্য উদ্ভিদের মাইটোকন্ড্রিয় DNA বলয়াকার নয়, এগুলি সরল রেখায় (linear) থাকে। মাইটোকন্ড্রিয় DNA দ্বিসূত্রযুক্ত এবং খুব বেশি পেঁচান। এর দৈর্ঘ্য সাধারণত 5μ ও আণবিক ওজন 9-10 মিলিয়ন (9,000,000-10,000,000) হয়। একটি মাইটোকন্ড্রিয়ায় একাধিক DNA অণু থাকতে পারে।

মাইটোকন্ড্রিয়ায় DNA পলিমারেজ থাকে (Parsons ও Simpson 1967) মাইটোকন্ড্রিয়ার RNA-র (mt. RNA) পরিমাণ মাইটোকন্ড্রিয় DNA-র (mt. DNA) প্রায় দশ থেকে কুড়ি গুণ: মাইটোকন্ড্রিয়ায় সব রকমের RNA পাওয়া গেছে। মাইটোকন্ড্রিয়ায় সব ধরনের t-RNA, রাইবোসোমীয় RNA, অ্যামিনো অ্যাসাইল RNA সিন্থেটেজ ইত্যাদি থাকে। এসব RNA-র সাথে সাইটোপ্লাজমীয় RNA-র কিছু

পার্থক্য রয়েছে। মাইটোকন্ড্রিয়ায় ব্যাকটিরিয়ার রাইবোসোমের মত ছোট 55S রাইবোসোম থাকে। এই রাইবোসোমকে মাইটোরাইবোসোম (mitoribosome) বলে। মাইটোকন্ড্রিয়ায় পলিরাইবোসোমও পাওয়া গেছে। এছাড়া মাইটোকন্ড্রিয়ায় DNA নির্ভরশীল RNA পলিমারেজ ও অ্যামিনো অ্যাসিড সক্রিয়কারী উৎসেচক থাকে। মাইটোকন্ড্রিয় DNA মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যেই স্বজনন করতে (replicate) পারে। তাছাড়া এই DNA RNA উৎপাদন করতে পারে। সাধারণত মেসেঞ্জার RNA উৎপন্ন হয় ও এই RNA প্রোটিন উৎপাদনের সঙ্কেত বহন করে। রাইবোসোমীয় RNAও মাইটোকন্ড্রিয়ায় তৈরি হতে পারে। ছত্রাক *Neurospora crassa*-র মাইটোকন্ড্রিয়ায় রাইবোসোম পাওয়া গিয়েছে। মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন ও কাজ আংশিকভাবে মাইটোকন্ড্রিয় DNA নিয়ন্ত্রণ করে। তবে মাইটোকন্ড্রিয়ার ওপর নিউক্লিয়াসেরও প্রভাব রয়েছে। মাইটোকন্ড্রিয়ার জিন কোনও কোনও ফেনোটাইপের চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন ভুট্টার সাইটোপ্লাজমীয় পুংবন্ধ্যতা, ইস্টের সাইটোপ্লাজমীয় পেটিট চরিত্র।

মাইটোকন্ড্রিয়ায় কিছু প্রোটিন (মোটামুটি দশটি) সংশ্লেষ হয়। তবে mtDNA মাইটোকন্ড্রিয়ার সব প্রোটিন সংশ্লেষ করতে পারে না। mtDNA ভিতরের পর্দার কিছু প্রোটিন, tRNA ও রাইবোসোমীয় প্রোটিন উৎপাদন করতে পারে। ম্যাট্রিক্সের বেশিরভাগ দ্রবণীয় প্রোটিন, বাইরের পর্দার প্রোটিন এবং ক্রিস্টির প্রোটিন নিউক্লিও DNA-র প্রভাবে সাইটোসলের রাইবোসোম অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। নিউক্লিও DNA থেকে উৎপন্ন mRNA সাইটোপ্লাজমে আসে ও ঐখানে প্রোটিন উৎপন্ন হয়। এই প্রোটিন পরে মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রবেশ করে। প্রোটিনের মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রবেশ সম্বন্ধে দুটি মত রয়েছে। a) প্রোটিনে প্রাথমিক অবস্থায় মাইটোকন্ড্রিয়া প্রবেশ করে ও পরে এর গঠন সম্পূর্ণ হয়। b) লাইপোপ্রোটিন ভেসিকেল তৈরি হয়, যা বৃদ্ধিশীল মাইটোকন্ড্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়।

কাজ— মাইটোকন্ড্রিয়ায় বিভিন্ন এনজাইমের যথাযথ অবস্থান সজীব কোষে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার (reaction) সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন। ক্রেবস চক্রের বিভিন্ন বিক্রিয়াগুলি মাইটোকন্ড্রিয়ায় হয়। শ্বাসকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক এনজাইম মাইটোকন্ড্রিয়ায় পাওয়া যায় ও এখানে প্রচুর ATP (adenosine triphosphate) উৎপন্ন হয়। এই ATP-ই কোষের নানা রকম কাজে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণু গঠনেও মাইটোকন্ড্রিয়ার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজগুলি আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

a) মাইটোকন্ড্রিয়া শক্তির আধার—

মাইটোকন্ড্রিয়ায় ATP উৎপন্ন হয়। ATP হল অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট। এতে পিউরিন বেস অ্যাডিনিন, পেন্টোজ শর্করা রাইবোজ এবং তিন অণু ফসফোরিক অ্যাসিড থাকে। অ্যাডিনিন ও রাইবোজ মিলিত হয়ে অ্যাডিনোসিন গঠন করে।

অ্যাডিনোসিনের সাথে একটি, দু'টি বা তিনটি ফসফরিক অ্যাসিড যুক্ত হয়ে যথাক্রমে অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট (AMP), অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট (ADP) এবং অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) গঠন করে। ADP-র সাথে ফসফেট বিশেষ বন্ধন (energy rich bond) দিয়ে যুক্ত হয়। এই বন্ধন যখন ভেঙে যায় অর্থাৎ, ATP থেকে ADP গঠিত হয়, তখন যথেষ্ট শক্তি (7000 ক্যালরি) নির্গত হয়। সাধারণ রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে গেলে কেবল 300 ক্যালরি শক্তি নির্গত হয়।

$$\underset{ATP}{A - P \sim P \sim P} = \underset{ADP}{AP \sim P} + iP + 7000 \text{ ক্যালরি}$$

মাইটোকন্ড্রিয়ায় বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর জারণের ফলে নির্গত শক্তি ATP-র শক্তি সমৃদ্ধ ~P বন্ধনে সঞ্চিত থাকে। প্রয়োজন হলে, যেমন, শ্বসন চক্রে, কোষ বিভাজনে, নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন সংশ্লেষের সময় এই শক্তি দ্রুত নির্গত হয়।

ATP উৎপাদনের জন্য মাইটোকন্ড্রিয়ায় যেসব প্রয়োজনীয় রাসায়নিক থাকে, সেগুলি হল ADP, ফসফেট, অক্সিজেন এবং অ্যাসিটাইল CoA ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন উৎসেচক এবং সহউৎসেচকও থাকে।

ATP ছাড়াও কোষের বিপাকে আরও কয়েকটি শক্তিসমৃদ্ধ রাসায়নিক লক্ষ্য করা হয়েছে। এগুলি হল— সাইটোসিন ট্রাইফসফেট (CTP), গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট (GTP) এবং ইউরিডিন ট্রাইফসফেট (UTP)। তবে এসব রাসায়নিক পদার্থগুলি ATP থেকেই শক্তি সংগ্রহ করে। এসব বিক্রিয়ায় নিউক্লিওসাইড ডাইফসফোকাইনেজ উৎসেচক প্রয়োজন।

সবাত শ্বসন দু'টি পর্যায়ে (অর্থাৎ গ্লাইকোলাইসিস ও ক্রেবস চক্র) হয়। গ্লাইকোলাইসিসে গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেন ভেঙে পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই পাইরুভিক অ্যাসিড মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রবেশ করে এবং ওইখানেই ক্রেবস চক্র, ইলেকট্রন স্থানান্তরণ প্রক্রিয়া এবং ফসফোরিলেশন সম্পন্ন হয়।

i) মাইটোকন্ড্রিয়ায় অ্যাসিটাইল CoA প্রবেশ করে। এটি (অ্যাসিটেট গ্রুপ) পাইরুভিক অ্যাসিড ও অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড উৎপন্ন করে (ক্রেবস চক্র)। এসব বিভিন্ন পর্যায়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। ক্রেবস চক্রের বিভিন্ন ধাপে ডিহাইড্রোজিনেজের প্রভাবে চার জোড়া ইলেকট্রন (অথবা এর সমপরিমাণ হাইড্রোজেন) নির্গত হয়। এসব ইলেকট্রন জোড়া শ্বসন শৃঙ্খলে প্রবেশ করে।

$$C_2H_4O_2 + 2H_2O = 2CO_2 + 8H$$

ii) ইলেকট্রন স্থানান্তরণ (transport) প্রক্রিয়া (শ্বসন শৃঙ্খল) — ক্রেবস চক্রে উৎপন্ন 8H অণু ব্যবহৃত হয় এবং জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার ফলে 11টি ATP অণু উৎপন্ন হয়।

হাইড্রোজেন অণু অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে জল উৎপন্ন করে।

জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন একটি দাতা থেকে গ্রহীতায় (acceptor) স্থানান্তরিত হয়। জারণে ইলেকট্রন কমে যায় এবং বিজারণে ইলেকট্রন বাড়ে। বেশিরভাগ জৈব জারণে NADH $+H^+$ অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া হয় ও ইলেকট্রন স্থানান্তরণ হয়। এই বিক্রিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। শ্বসন প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রন স্থানান্তরণ ধাপে ধাপে হয়। এর ফলে শক্তি অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে নির্গত হয়। Slater (1973) বলেন যে, মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রায় ত্রিশটি অঞ্চলে NADH থেকে ইলেকট্রন গৃহীত হতে পারে।

শ্বসন শৃঙ্খলের বেশিরভাগ উপাদান NADH-Q-রিডাকটেজ (Q = ইউবিকুইনোন), সাকসিনেট-Q-রিডাকটেজ, সাইটোক্রোম b, এবং সাইটোক্রোম a মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের পর্দার সাথে আলগাভাবে যুক্ত থাকে।

ATP

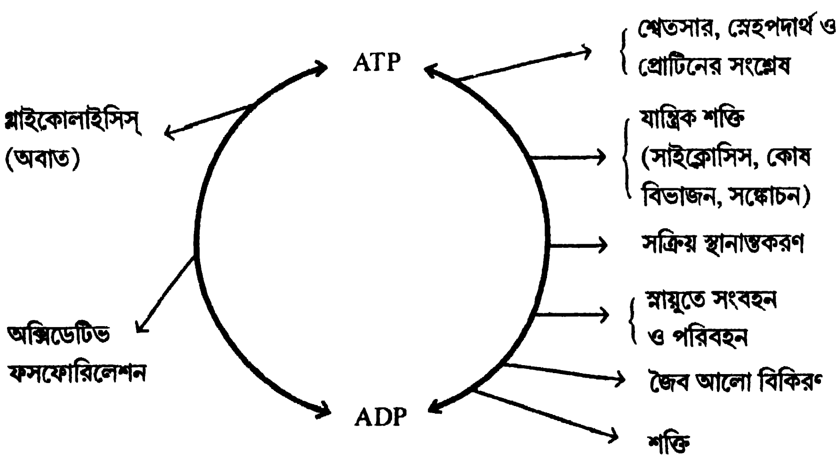
NAD → ফ্লেভোপ্রোটিন → সাইটোক্রোম b

ATP ATP

→ সাইটোক্রোম c → সাইটোক্রোম a → O_2

ইলেকট্রন স্থানান্তরণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ।

ATP-র সংশ্লেষ ও ব্যবহারের ছক (Robertis '70)



শ্বেতসারের জারণ

কোষে গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেন বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্লিষ্ট হয়ে 3-কার্বনযুক্ত পাইরুভিক অ্যাসিড গঠন করে। এই পাইরুভিক অ্যাসিড মাইটোকন্ড্রিয়ায়

প্রবেশ করে এবং সম্পূর্ণ জারিত হয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন করে। এর বিভিন্ন ধাপগুলি হল—

a) গ্লাইকোলাইসিস বা Embden - Meyerhof pathway (পথ)

b) অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন

c) ক্রেবস চক্র

d) শ্বসন শৃঙ্খল ও অক্সিডেটিভ ফসফরিলেশন

i) **গ্লাইকোলাইসিস** প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেন (ছয় কার্বনযুক্ত) বিভিন্ন ধাপে আর্দ্র বিশ্লিষ্ট হয়ে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড (তিন কার্বনযুক্ত) গঠন করে। প্রত্যেকটি ধাপ নির্দিষ্ট এনজাইম বা উৎসেচক দিয়ে প্রভাবিত হয়। দুইজন জার্মান জৈবরসায়নবিদ— Embden এবং Myerhof এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধাপগুলি আবিষ্কার করেন বলে একে EMP Pathway বলে। গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন নেই। এই প্রক্রিয়া সাইটোপ্লাজমে হয়। এ সময়ে দুই অণু ATP-র সংশ্লেষ হয়।

পাইরুভিক অ্যাসিড অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে ইথাইল অ্যালকোহল বা ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়, যেমন ইস্টের কোষে বা পেশির কোষে।

ইস্টের কোষে—

$$\text{পাইরুভিক অ্যাসিড} \xrightarrow{-CO_2} \text{অ্যাসিটালডিহাইড} \rightarrow \text{ইথাইল অ্যালকোহল} + \text{শক্তি}$$

পেশির কোষে

$$\text{পাইরুভিক অ্যাসিড} + NADH \xrightarrow{\text{ল্যাকটিক ডিহাইড্রোজিনেজ}} \text{ল্যাকটিক অ্যাসিড} + NAD + \text{শক্তি}$$

ii) **অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন**— সবাত কোষে পাইরুভিক অ্যাসিড মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রবেশ করে ও অ্যাসিটাইল CoA-তে পরিবর্তিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় জারণ হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। সেজন্য এই প্রক্রিয়াকে অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন বলে। এই প্রক্রিয়ায় তিনটি উৎসেচক—(পাইরুভিক অ্যাসিড ডিকার্বক্সিলেজ, ডাইহাইড্রক্সিলাইপল ট্র্যান্সঅ্যাসিটাইলেজ এবং ডাইহাইড্রক্সিলাইপল ডিহাইড্রোজিনেজ এবং পাঁচটি কো-ফ্যাক্টরের (কো-এনজাইম A, NAD, লিপোইক অ্যাসিড, Mg^{++} এবং থায়ামিন পাইরোফসফেট) প্রয়োজন।

পাইরুভিক অ্যাসিডের অ্যাসিটাইল অংশ কো-এনজাইম A-র সাথে যুক্ত হয় এবং কার্বোক্সিল গ্রুপের কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। এছাড়া NAD-র সাথে দুই অণু হাইড্রোজেন (পাইরুভিক কার্বোক্সিলেট গ্রুপের একটি ও সালফাহাইড্রেল কো-এনজাইম A-র আরেকটি হাইড্রোজেন) যুক্ত হয়।

পাইরুভিক অ্যাসিড

↓⟶ CO_2 পাইরুভিক ডিকার্বক্সিলেজ—

অ্যাসিট্যালডিহাইড

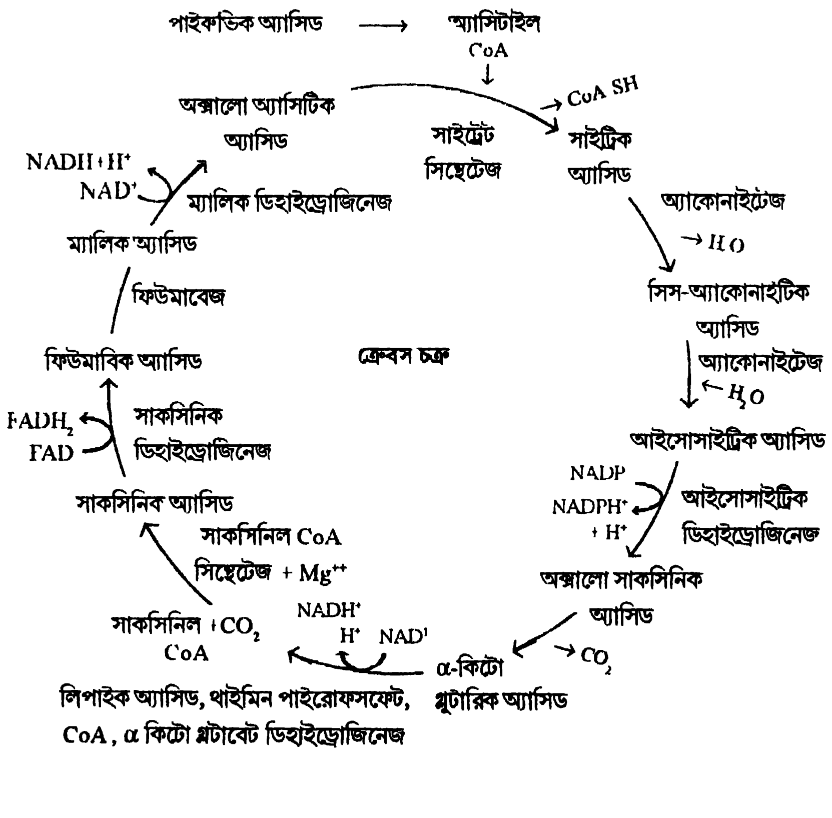
↓ + লিপোইক অ্যাসিড ডাইহাইড্রোপল ট্র্যান্সঅ্যাসিটাইলেজ

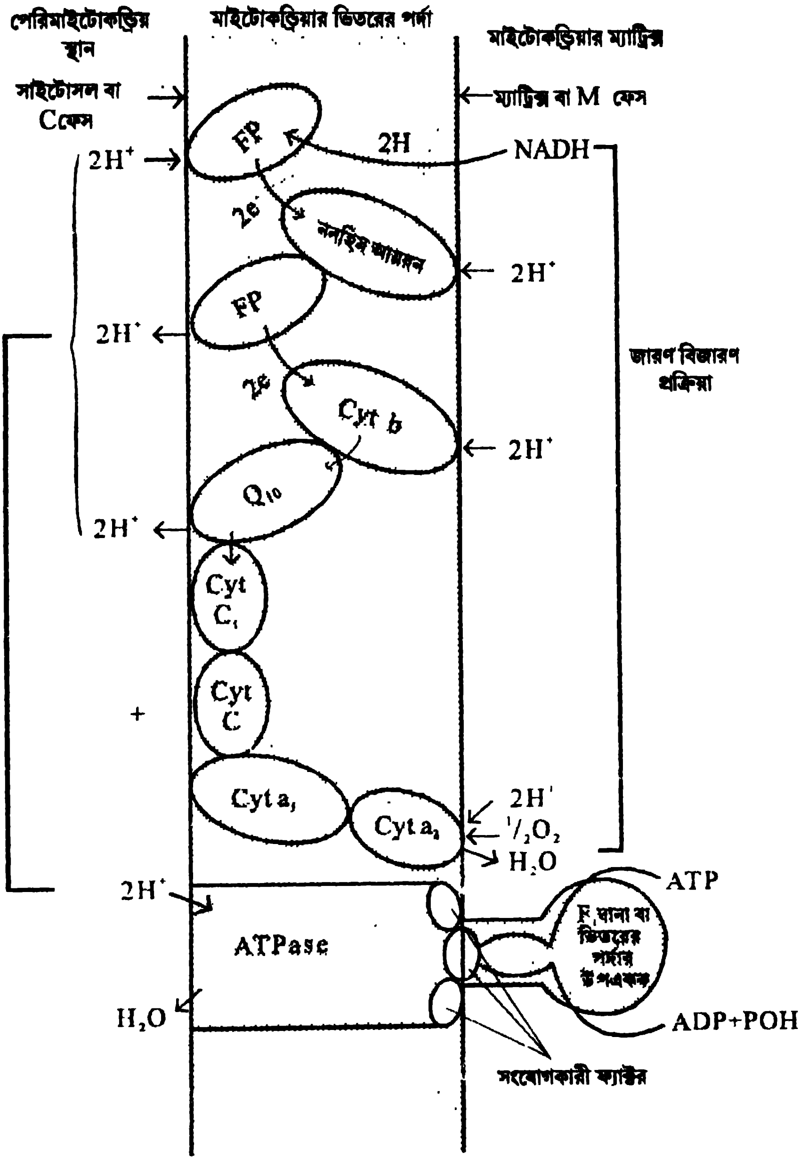
অ্যাসিটাইল লিপোইক অ্যাসিড

↓ + কো-এনজাইম A পাইরুভিক ডিহাইড্রোজিনেজ

অ্যাসিটাইল CoA

iii) ক্রেবস চক্র— মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে ক্রেবস চক্র সম্পন্ন হয়। আবিষ্কারক Hans Krebs-এর (1837) নামানুসাবে এই চক্রের নাম ক্রেবস চক্র হয়েছে। এই চক্রের প্রথম উৎপন্ন পদার্থ সাইট্রিক অ্যাসিডে তিনটি কার্বোক্সিল মূলক থাকায় এই চক্রকে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র বা ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড (TCA) চক্র বলে। সাইট্রেট সিন্থেটেজ উৎসেচকের উপস্থিতিতে অ্যাসিটাইল CoA ও অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড থেকে সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। সাইট্রিক অ্যাসিড নির্দিষ্ট উৎসেচকের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ধাপে অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।





মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের পর্দায় শ্বসন শৃঙ্খলের উৎসেচক বা সহউৎসেচকগুলির সম্ভাব্য বিন্যাস (Mitchell '68 এবং Racker '72)

iv) শ্বসন শৃঙ্খল ও অক্সিডেটিভ ফসফরিলেশন

ক্রেবস চক্রে এক অণু অ্যাসিটাইল CoA-র জারণের সময় তিন অণু NADH (নিকোটিনেমাইড অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ডিহাইড্রোজিনেজ) ও এক অণু FPH বা FADH (বিজারিত ফ্ল্যাভোপ্রোটিন) উৎপন্ন হয়। মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের পর্দায় এসব বিজারিত সহউৎসেচক অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। এসব বিক্রিয়াকে ইলেকট্রন পরিবহন প্রক্রিয়া (electron transport system) বা শ্বসন শৃঙ্খল (respiratory chain) বলে। এসময়ে যথেষ্ট শক্তি নির্গত হয়। ভিতরের পর্দার F কণায় ATPase উৎসেচকের উপস্থিতিতে এই শক্তি ব্যবহার করে ATP উৎপন্ন হয়। জারণের সময় ATP-র এই উৎপাদনকে অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন বলে।

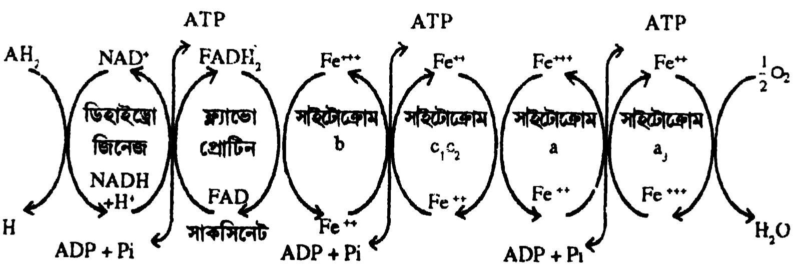
Mitchell-এর (1968) 'chemi-osmotic hypothesis অনুসারে মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের পর্দায় শ্বসন শৃঙ্খলের বিভিন্ন উপাদানগুলি পরপর সাজান থাকে। যেমন— সাকসিনিক ডিহাইড্রোজিনেজ (SDH) ও সহ উৎসেচক NAD, হিমবিহীন লোহা-সালফার প্রোটিন, ফ্ল্যাভোপ্রোটিন FP বা FAD, সাইটোক্রোম b, সহউৎসেচক Q10 (ইউবিকুইনোস), সাইটোক্রোম c, সাইটোক্রোম a, সাইটোক্রোম a_3 এবং তিনটি সংযোগকারী (binding) অঞ্চল। এসব অঞ্চলে ATPase উৎসেচকের উপস্থিতিতে ফসফোরিলেশন ও জারণ হয়।

সাবস্ট্রেট থেকে ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের প্রভাবে হাইড্রোজেন অণু নির্গত হয়। এটি আয়নিত হয়ে H^+ ও e^- গঠন করে। এই H^+ সহউৎসেচক NADকে বিজারিত করে NADH উৎপন্ন করে :

$2H \rightarrow 2H^+ + e^-$

$NAD + 2H^+ \rightarrow NADH + H^+$

NADH অণু মাইটোকন্ড্রিয়ার পর্দায় যায় ও শ্বসন শৃঙ্খলে প্রবেশ করে।



চিত্র—২৪

শ্বসন শৃঙ্খলে ইলেকট্রনের প্রবাহ ও ATP-র উৎপাদন

NADH জারিত হয়ে NAD^+ গঠন করে। এর হাইড্রোজেন অণু ফ্ল্যাভোপ্রোটিনে (FP ব' FAD) স্থানান্তরিত হয়। ফ্ল্যাভোপ্রোটিন থেকে প্রত্যেক হাইড্রোজেন অণু

পেরিমাইটোকন্ড্রিয় স্থানে যায়। ইলেকট্রনগুলি নন-হিম আয়রন প্রোটিনে যায় এবং এখান থেকে শ্বসন শৃঙ্খলের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পরিশেষে জল উৎপাদন করে। মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের পর্দা প্রোটিনের ক্ষেত্রে অভেদ্য। ভিতরের পর্দার ভিতরে শ্বসন শৃঙ্খলের উপাদানগুলি এমনভাবে সাজান থাকে যাতে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াগুলি পর্যায়ক্রমে ($2H^+$ এবং $2e^-$) হয়। শ্বসন শৃঙ্খলে যখন ক্রমশ ইলেকট্রন বা প্রোটনগুলি যায়, তখন ভিতরের পর্দায় প্রোটনের অসাম্য দেখা দেয়। ভিতরের পর্দায় প্রোটনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে প্রোটনগুলি F_1 কণার মধ্যে দিয়ে মাইটোকন্ড্রিয়ায় ম্যাট্রিক্সের দিকে যায়। এই সময়ে ATP উৎপন্ন হয়।

শ্বসনে উৎপন্ন বিভিন্ন উপাদান এবং গ্লুকোজের সম্পূর্ণ জারণে গ্লাইকোলাইসিস, অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন এবং ক্রেবস চক্রে উৎপন্ন ATP-র পরিমাণ।

বিক্রিয়া	হাইড্রোজেন	উচ্চ-শক্তি ফসফেট	কার্বন ডাই-অক্সাইড
a. **গ্লাইকোলাইসিস**			
গ্লুকোজ → পাইরুভিক অ্যাসিড	$2NADH_2$	2ATP	
b. **অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন**			
পাইরুভিক অ্যাসিড → অ্যাসিটাইল CoA	$2NADH_2$		$2CO_2$
c. **ক্রেবস চক্র বা TCA চক্র**			
i) আইসোসাইট্রেট → α -কিটোগ্লুটারেট	$2NADH_2$		$2CO_2$
ii) α -কিটোগ্লুটারেট → সাকসিনেট	$2NADH_2$	2GTP	$2CO_2$
iii) সাকসিনেট → ফিউমারেট	$2FADH_2$		
iv) ম্যালেট → অক্সালোঅ্যাসিটেট	$2NADH_2$		
	$10NADH_2$ $2FADH_2$	4~P	$6CO_2$

একটি $NADH_2$ থেকে ইলেকট্রন স্থানান্তরণ শৃঙ্খলের মাধ্যমে তিনটি ATP উৎপন্ন হয়। সুতরাং, দশটি $NADH_2$ থেকে ত্রিশটি ATP উৎপন্ন হয়।

একটি $FADH_2$ থেকে ইলেকট্রন স্থানান্তরণ প্রক্রিয়ায় দু'টি ATP উৎপন্ন হয়। সুতরাং, দু'টি $FADH_2$ থেকে চারটি ATP উৎপন্ন হয়।

দু'টি GTP সরাসরি ব্যবহৃত হতে পারে অথবা ADP থেকে ATP উৎপন্ন করে।

$2\ GTP + 2\ ADP \rightleftharpoons 2\ GDP + 2\ ATP$

সুতরাং, গ্লুকোজের সম্পূর্ণ জারণের ফলে মোট 30 + 4 + 4 = 38 ATP উৎপন্ন হয়।

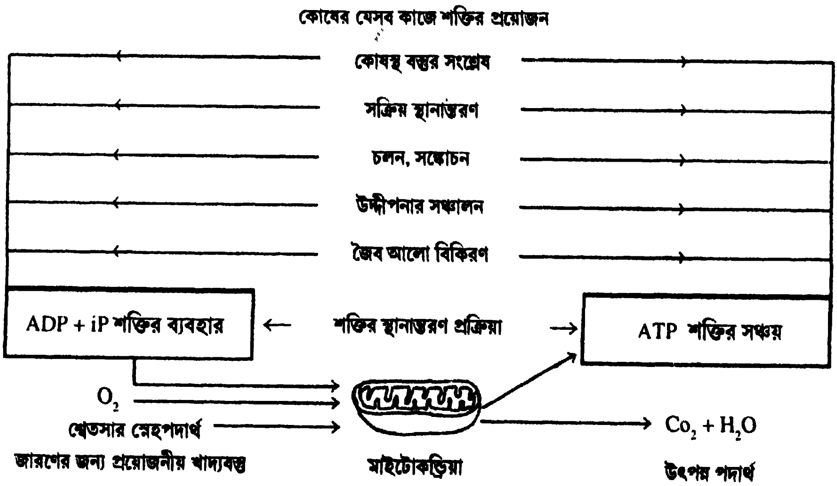
$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 38\ ADP + 38\ Pi \xrightarrow{\text{শ্বসনের উৎসেচক}} 6CO_2 + 6H_2O + 38\ ATP$$

মাইটোকন্ড্রিয়া পর্দা দিয়ে কতকগুলি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। বাইরের পর্দার ভিতরে, ভিতরের পর্দার ভিতরে, এই দুই পর্দার মধ্যবর্তী স্থানে এবং কেন্দ্রীয় ম্যাট্রিক্স অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ উৎসেচক থাকে। এসব উৎসেচকগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত।

ম্যাট্রিক্সে ক্রেবস চক্রের সব উৎসেচকগুলি থাকে। এছাড়া ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণের উৎসেচকগুলি DNA, প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় RNAও থাকে।

ভিতরের পর্দায় সাইটোক্রোম প্রক্রিয়ার উৎসেচকগুলি, ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকগুলি থাকে। শেষোক্ত উৎসেচকগুলি F_1 দানায় থাকে।

কোষের যেসব কাজে শক্তির প্রয়োজন



স্নেহপদার্থের (Fat) জারণ

স্নেহপদার্থে এক অণু গ্লিসারল তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে যুক্ত থাকে। উৎসেচক লাইপেস গ্লিসারল থেকে এই তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিডকে বিচ্ছিন্ন করে তিনটি

জলের অণু যুক্ত করে। গ্লিসারল (3C যুক্ত) ও ফ্যাটি অ্যাসিড বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জারিত হয়।

গ্লিসারল ATP ও NAD-র সাথে বিক্রিয়া করে ডাইহাইড্রক্সিঅ্যাসিটোন ফসফেট (DHAP) গঠন করে।

গ্লিসারল + ATP + NAD → ডাইহাইড্রক্সিঅ্যাসিটোন ফসফেট + ADP + $NADH_2$

DHAP ও ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইডে (PGA) পরিণত হয়। গ্লিসারলের সম্পূর্ণ জারণের ফলে 22ATP উৎপন্ন হয়।

সাধারণত ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বক্সিল প্রান্তের সাথে কো-এনজাইম A যুক্ত হয়। এজন্য একটি ATP অণুর প্রয়োজন। বিভিন্ন বিক্রিয়ায় জলের প্রয়োজন ও চারটি হাইড্রোজেন অণু নির্গত হয় (দু'টি NAD ও দু'টি FAD-র দ্বারা)।

ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণকে 'বিটা অক্সিডেশন' বলে, কারণ দ্বিতীয় বা বিটা কার্বন অঞ্চলে ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়। বিটা অক্সিডেশন সাইটোপ্লাজমে হয়।

একটি নিরপেক্ষ স্নেহ পদার্থে (neutral fat) তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড ও একটি গ্লিসারল থাকে। একটি 14 কার্বনবিশিষ্ট ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণের ফলে 147টি ATP উৎপন্ন হয়।

এই পরিমাণ এক অণু গ্লুকোজের জারণের ফলে উৎপন্ন শক্তির বার গুণের চেয়েও বেশি। তবে গ্লুকোজের চেয়ে স্নেহ পদার্থের অণু অনেক বড়। সেজন্য প্রতি গ্রাম জারিত পদার্থের তুলনা করলে দেখা যায় যে, স্টার্চের চেয়ে স্নেহ পদার্থ দ্বিগুণের বেশি ATP উৎপাদন করে।

প্রোটিনের জারণ

প্রোটিন কোষে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত থাকে না। প্রোটিন উৎসেচক হিসাবে অথবা কোষের গঠনকারী উপাদান হিসাবে থাকে, যেমন— কোষ পর্দায়। এজন্য প্রোটিন সাধারণত শ্বসনে ব্যবহৃত হয় না, কেবল খাদ্যাভাব হলে প্রোটিন জারিত হতে পারে।

প্রোটিন প্রথমে অ্যামিনো অ্যাসিডে ভেঙে যায়। জলের উপস্থিতিতে হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির সংযোগকারী পেপটাইড বন্ধন ভেঙে যায়। এই বিক্রিয়ায় প্রোটিয়েজ উৎসেচকের প্রয়োজন। এরপর অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে নাইট্রোজেন ট্রান্সঅ্যামাইনেশন এবং অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ায় বাদ যায়। অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে অ্যামাইনো গ্রুপ আলাদা হয়ে যায় এবং অ্যামোনিয়া গঠন করে। অ্যামিনো অ্যাসিডের বাকি অংশ তখন কিটো অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ায় জলের প্রয়োজন এবং NAD দুইটি হাইড্রোজেন অণু গ্রহণ করে। উৎপন্ন অ্যামোনিয়া ওই অবস্থায় বা অন্য পদার্থের সাথে বিক্রিয়ার পর নির্গত হয়। অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রকৃতির ওপর নির্গত

শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে। $NADH_2$ থেকে হাইড্রোজেন সাইটোক্রোম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয় এবং এই সময়ে ATP উৎপন্ন হয়।

ট্র্যান্সঅ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ায় একটি অণু থেকে অপর অণুতে অক্সিজেনের পরিবর্তে অ্যামাইনো গ্রুপের স্থানান্তরণ হয়। এর ফলে অ্যামিনো অ্যাসিডটি কিটো অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয় এবং কিটো অ্যাসিডটি অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়, যেমন—

গ্লুটামিক অ্যাসিড + অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড
(অ্যামিনো অ্যাসিড) (কিটো অ্যাসিড)
→ α - কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড + অ্যাসপারটিক অ্যাসিড
(কিটো অ্যাসিড) (অ্যামিনো অ্যাসিড)

বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের গঠনে পার্থক্য রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে কার্বনের সংখ্যার তারতম্য দেখা যায়। এগুলি বিপাকীয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে আবদ্ধ হয়। যেমন, 3-কার্বন বিশিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড (অ্যালানিন, সিস্টিন, সেরিন, ভ্যালিন) 3-কার্বনযুক্ত পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়। 2-কার্বনযুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড (গ্লাইসিন) অ্যাসিটাইল CoAতে, 5-কার্বনযুক্ত গ্লুটামিক অ্যাসিড ∝ কিটো-গ্লুটারিক অ্যাসিডে, 4-কার্বনযুক্ত অ্যাসপারটিক অ্যাসিড অক্সাল-অ্যাসিটিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়।

মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্যান্য কাজ

ATP উৎপাদন ছাড়া মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্যান্য কাজও আছে।

a) গ্লুকোজের জারণের ফলে উৎপন্ন শক্তির কেবল 45% ATP-তে আবদ্ধ হয়, বাকী 55% শক্তি তাপ হিসাবে নির্গত হয়, অথবা উষ্ণ রক্তের প্রাণীর ক্ষেত্রে দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে।

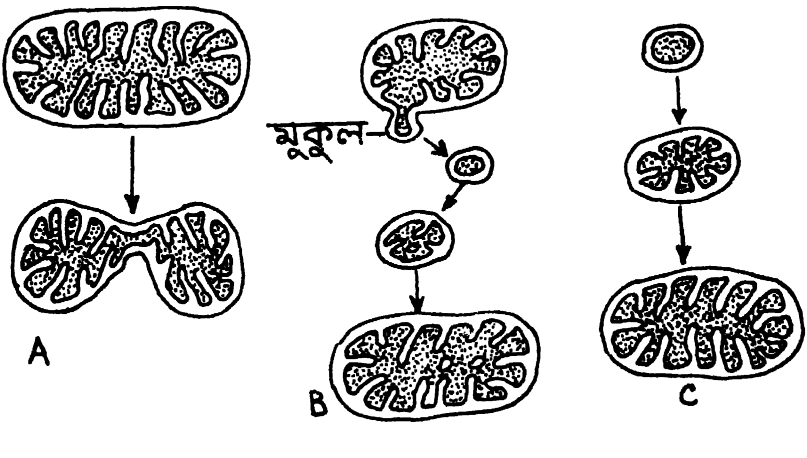
b) মাইটোকন্ড্রিয়ায় DNA থাকে। তাই DNA মাইটোকন্ড্রিয়ায় কয়েকটি প্রোটিন উৎপাদন (12-র কম) নিয়ন্ত্রণ করে। যেসব প্রোটিন উৎপন্ন হয় তার কয়েকটি হল— ATPase-এর উপএকক, রিডাকটেজের অংশ। মাইটোকন্ড্রিয়ার উপাদানের অধিকাংশ নিউক্লিও জিনের প্রভাবে গঠিত হয় ও পরে মাইটোকন্ড্রিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। মাইটোকন্ড্রিয়ার উপাদানের কেবল 5–10% মাইটোকন্ড্রিয় DNA-র প্রভাবে গঠিত হয়।

c) মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরের পর্দা অপেক্ষাকৃত ভেদ্য। মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের পর্দার মধ্যে দিয়ে কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট পদার্থ যেতে পারে, বাকী পদার্থগুলি যেতে পারে না। অর্থাৎ, মাইটোকন্ড্রিয়ায় বিভিন্ন পদার্থের প্রবেশ ও নির্গমন ভিতরের পর্দা নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন— ADP ও ATP-র, ফসফেট-হাইড্রক্সিলের, কার্বক্সিল

অ্যাসিডের এবং ক্যালিসিয়ামের বিনিময়। প্রাণী কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম সঞ্চিত হতে পারে।

উৎপত্তি— মাইটোকন্ড্রিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ (চিত্র 29) আছে। প্রধান দু'টি মতবাদ হল—

a) পুরনো মাইটোকন্ড্রিয়ার থেকে উৎপত্তি (autonomous replication) – (i) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মাইটোকন্ড্রিয়ার বিভাজন দেখা গিয়েছে। নতুন মাইটোকন্ড্রিয়া পুরনো মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে মুকুলোদগম (budding) বা ফিশন (fission) পদ্ধতিতে গঠিত হয়। মাইটোকন্ড্রিয়ার বিভাজনের প্রাথমিক অবস্থায় এর ভিতরের বস্তু অভ্যন্তরীণ পর্দা দিয়ে বা সংকোচনের মাধ্যমে দুই বা তারচেয়ে বেশি অংশে বিভক্ত হয়। কোনও কোনও বিজ্ঞানীর মতে, এই রকম মাইটোকন্ড্রিয়া দু'টি বা তার চেয়ে বেশি মাইটোকন্ড্রিয়ার মিলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। ব্যস্ত কোষে অনেক মাইটোকন্ড্রিয়া পরস্পর যুক্ত অবস্থায় থাকে। ফার্নের কোষেও এই রকমের মাইটোকন্ড্রিয়া দেখা গিয়েছে। মনে করা হয়, ফিশনের প্রাথমিক অবস্থার জন্যই মাইটোকন্ড্রিয়াগুলি পরস্পর যুক্ত থাকে।



চিত্র—29

মাইটোকন্ড্রিয়ার উৎপত্তি

A — মাইটোকন্ড্রিয়ার কোনও স্থানে সঙ্কোচনের ফলে বিভাজন,

B — মুকুলোদগমের ফলে উৎপত্তি,

C — প্রোমাইটোকন্ড্রিয়ন থেকে উৎপত্তি

ii) মাইটোকন্ড্রিয়ার মুকুলোদগম (budding) পরিণত বা অপরিণত (undifferentiated) কোষে হতে পারে। এরকম মুকুলোদগমের ফলে উৎপন্ন

প্রারম্ভিক মাইটোকন্ড্রিয়া ক্রমশ বড় হয় ও এর মধ্যে ক্রিস্টি গঠিত হয়। পরিশেষে পরিণত মাইটোকন্ড্রিয়া তৈরি হয়। কোষ বিভাজনের সময় দু'টি অপত্য কোষে মোটামুটি সম সংখ্যক মাইটোকন্ড্রিয়া যায়।

b) প্রোমাইটোকন্ড্রিয়া থেকে উৎপত্তি— প্রোমাইটোকন্ড্রিয়া থেকে উৎপত্তির মত অনুসারে মাইটোকন্ড্রিয়া ছোট ছোট প্রোমাইটোকন্ড্রিয়ন থেকে উৎপন্ন হয়। প্রোমাইটোকন্ড্রিয়ন আবার আরও ছোট ছোট প্রারম্ভিক বস্তু বা initial থেকে তৈরি হয়। এইসব বস্তু দুইটি পর্দা দিয়ে আবৃত। মনে করা হয় যে, initialগুলি নিউক্লিও পর্দা থেকে তৈরি হয়। নিউক্লিও পর্দা ভাঁজ হয়ে ভেসিকেল গঠন করে এবং এগুলি নিউক্লিয়াস থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ও পরে প্রোমাইটোকন্ড্রিয়ায় পরিণত হয়। ভাজক কোষে এরকম প্রারম্ভিক বস্তু বা initial দেখা যায়। কোষের বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের আয়তন বাড়ে ও ভিতরের পর্দা সমকোণে ভাঁজ হয়। এই অবস্থায় এদের প্রোমাইটোকন্ড্রিয়ন বলে। এগুলি দ্রুত বাড়ে ও ভাঁজগুলি ক্রিস্টি বা টিউবিউল গঠন করে।

c) Robertson (1959) বলেন যে, কোষের বিভিন্ন পর্দা বা মেমব্রেন (এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা বা প্লাজমা পর্দা) থেকে মুকুলোদগম পদ্ধতিতে মাইটোকন্ড্রিয়া তৈরি হয়। সী আর্চিনের (sea urchin) ডিম্বাণুকে সেন্ট্রিফিউজ (centrifuge) করে প্রথম মাইটোকন্ড্রিয়া শূন্য করা হয়। পরে দেখা গিয়েছে যে, ওই ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া তৈরি হয়েছে (Nevicoff, 1961)। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সেন্ট্রিফিউজ করে সাইটোপ্লাজমকে মাইটোকন্ড্রিয়া মুক্ত করা যায় না।

d) মাইটোকন্ড্রিয়ার উৎপত্তি নতুন করে হয়। অর্থাৎ, এর উৎপত্তি হল de novo (লাতিন, নতুন করে)। কোষের অ্যামিনো অ্যাসিড, স্নেহ পদার্থ ইত্যাদি থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া উৎপন্ন হয়। তবে এই মতের স্বপক্ষে তেমন কোনও প্রমাণ নেই। সেজন্য এই মতবাদ আজকাল সমর্থিত হয় না।

মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য

i) মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের পর্দায় শ্বসন শৃঙ্খলের উৎসেচকগুলি থাকে। ব্যাকটিরিয়ার প্লাজমা পর্দায় এইরকম উৎসেচকগুলি থাকে।

ii) ব্যাকটিরিয়ার কোষের প্লাজমা পর্দা কোনও কোনও স্থানে ভাঁজ হয়ে মেসোজোম গঠন করে। এগুলির সাথে মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্রিস্টির সামঞ্জস্য রয়েছে।

iii) মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরের পর্দার সাথে প্লাজমা পর্দার সামঞ্জস্য রয়েছে। সুতরাং, মনে করা যেতে পারে যে, মাইটোকন্ড্রিয় ম্যাট্রিক্স ও ভিতরের পর্দা মিথোজীবীর মত, যা কোষীয় পর্দা (মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরের পর্দা) দিয়ে আবৃত রয়েছে।

iv) ব্যাকটিরিয়ার কোষের মত মাইটোকন্ড্রিয়ার DNAও বলায়কার। এই দুই DNA-র স্বজননেও সামঞ্জস্য রয়েছে।

v) মাইটোকন্ড্রিয়ার রাইবোসোম ব্যাকটিরিয়ার রাইবোসোমের মত ছোট।

vi) মাইটোকন্ড্রিয়ার এবং ব্যাকটিরিয়ায় প্রোটিন সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ক্লোরামফেনিকল বাধা দেয় (inhibitor)। মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রোটিন সংশ্লেষ আংশিকভাবে মাইটোকন্ড্রিয় DNA ও ম্যাট্রিক্সের উপর এবং আংশিকভাবে নিউক্লিয় DNA ও সাইটোপ্লাজমের উপর নির্ভরশীল। এটি মাইটোকন্ড্রিয়ার মিথোজীবী প্রকৃতি নির্দেশ করে।

মাইটোকন্ড্রিয়া ও ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে এসব সামঞ্জস্য মিথোজীবী মতকে (symbiont hypothesis) সমর্থন করে। ইউক্যারিওট পোষক কোষ অবাত শ্বসনকারী জীবের মত, যা গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় খাদ্য জারণ করে শক্তি সংগ্রহ করত। মাইটোকন্ড্রিয়া মিথোজীবী এবং মাইটোকন্ড্রিয়ায় সবাত শ্বসন হয়। মাইটোকন্ড্রিয়ায় ক্রেবস চক্র ও শ্বসন শৃঙ্খলের উৎসেচকগুলি থাকে। এখানে পোষক (host) কোষের আংশিক জারিত খাদ্যবস্তু (পাইরুভিক অ্যাসিড) অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন প্রক্রিয়ায় জারিত হয় ও শক্তি উৎপন্ন হয়।

e) ব্যাকটিরিয়ার কোষের সাথে মাইটোকন্ড্রিয়ার অনেক সামঞ্জস্য লক্ষ করা হয়েছে। এজন্য কোনও কোনও বিজ্ঞানী (Altmann ও Schimber 1890) মনে করেন যে, ইউক্যারিওট কোষের অভ্যন্তরে বহুদিন ব্যাকটিরিয়ার কোষের মিথোজীবী (symbiotic) অবস্থানের ফলে মাইটোকন্ড্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

মাইটোকন্ড্রিয়ার বিনাশ

বিভিন্ন কারণে মাইটোকন্ড্রিয়ার পরিবর্তন হতে পারে। মাইটোকন্ড্রিয়া ছোট ছোট খণ্ডে বিভাজিত হতে পারে বা স্ফীত হয়, কিংবা এর মধ্যে কোনও কোনও বস্তু সঞ্চিত হতে পারে। এরকম পরিবর্তিত মাইটোকন্ড্রিয়া পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। তবে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু আছে যার পরে মাইটোকন্ড্রিয়া পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারে না এবং মাইটোকন্ড্রিয়ার বিনাশ হয়। তিন রকমের পরিবর্তন মাইটোকন্ড্রিয়ায় দেখা যায়, যেমন—

a) মাইটোকন্ড্রিয়া খণ্ডিত হয়ে দানাদার হয়, পরে এগুলি বিনষ্ট হয়।

b) মাইটোকন্ড্রিয়া যথেষ্ট স্ফীত হয়ে বড় ভ্যাকুওল গঠন করে।

c) মাইটোকন্ড্রিয়ায় বিভিন্ন পদার্থ সঞ্চিত হয়। এগুলি স্বচ্ছ দানার মত দেখায়। পরে এগুলি বা সম্পূর্ণ কোষটি বিনষ্ট হয়।

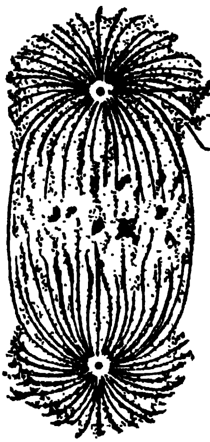
কোনও কোনও সময় কয়েকটি মাইটোকন্ড্রিয়া পরস্পর যুক্ত হয়ে কন্ড্রিয়োস্ফেয়ার (chondriosphere) গঠন করে (Bourne 1951)। এরকম পরিবর্তন স্কার্ভি রোগগ্রস্থ ব্যক্তিতে দেখা গেছে।

সেন্ট্রোসোম (centrosome)

অনেক প্রাণী ও কোনও কোনও নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে (ছত্রাক ও শৈবাল)

নিউক্লিয়াসের ঠিক বাইরে সাইটোপ্লাজমে সেন্ট্রোসোম দেখা যায়। 1888 খ্রিস্টাব্দে T. Boveri সেন্ট্রোসোম নাম ব্যবহার করেন। সেন্ট্রিওল প্রোটোজোয়া, শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইটা, ফার্ণ ও কোনও কোনও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে দেখা যায়।

গঠন— সেন্ট্রোসোম অঞ্চল স্বচ্ছ থাকে এবং স্বচ্ছ স্থানের কেন্দ্রে এক বা দুইটি ছোট গাঢ় বর্ণযুক্ত দানা থাকে (চিত্র 30a)। এই দানাকে সেন্ট্রিওল (centriole) বলে। সেন্ট্রিওল দুইটি পরস্পরের সমকোণে থাকে। সেন্ট্রিওল সাধারণত জোড়ায় থাকে। এরকম সেন্ট্রিওলের জোড়াকে ডিপ্লোসোম (diplosome) বলে।



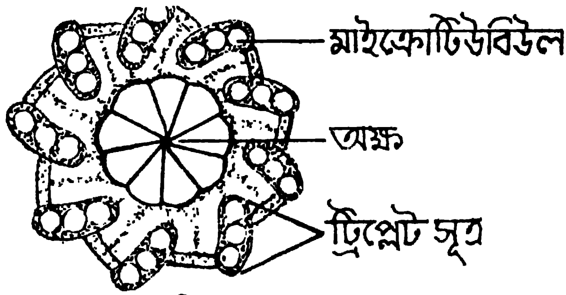
চিত্র—30a

দুই মেরুতে দুইটি সেন্ট্রোসো- দেখা যাচ্ছে

প্রত্যেক সেন্ট্রিওল (চিত্র 30b) বেলনাকার। এর দৈর্ঘ্য 300-500nm এবং প্রস্থ 150-180 nm। প্রত্যেক সেন্ট্রিওলে একটি কেন্দ্রীয় অক্ষের চারিদিকে নয়টি ট্রিপ্লেট সূত্র থাকে। প্রত্যেক ট্রিপ্লেট সূত্রে আবার তিনটি টিউবিউল (200Å) থাকে। এগুলি 40^0 কোণে সাজান থাকে। অক্ষের চারিদিকে ট্রিপ্লেট সূত্র ছাড়াও নয়টি উপাঙ্গ (append-age) কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে প্রসারিত থাকে। এদের প্রান্ত গোলাকার। এগুলিকে স্যাটেলাইট বলে। সেন্ট্রিওলের এইসব সূত্রগুলি পরস্পর যুক্ত থাকে ও একটি স্থূল পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। সেন্ট্রিওলের চারিদিকের স্বচ্ছ পদার্থকে সেন্ট্রোস্ফিয়ার (centrosphere) বলে। সেন্ট্রিওলে সামান্য পরিমাণ DNA ও RNA পাওয়া গেছে।

কাজ— কোষ বিভাজনের আগেই সাধারণত সেন্ট্রোসোম বিভাজিত হয়ে নিউক্লিয়াসের দুই মেরুতে অবস্থান করে ও স্পিন্ডিল গঠনে সাহায্য করে। কোষ বিভাজনের কোনও কোনও অবস্থায় সেন্ট্রোসোম থেকে কতকগুলি রশ্মি চারিদিকে

ছড়িয়ে পড়ে এবং এদের astral ray বা অ্যাষ্টারীয় রশ্মি (চিত্র 30a) বলে। ফ্ল্যাজেলা উৎপাদনে সেন্ট্রোসোমের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কিছু প্রাচীন মস, ফার্ন, *Cycas*, *Ginkgo* ইত্যাদিতে পুং গ্যামেট উৎপাদনের সময় সেন্ট্রোসোম দেখা গিয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোষ বিভাজনের সময় সেন্ট্রোসোম দেখা যায় এবং কোষ বিভাজনের পরে এরা অদৃশ্য হয়ে যায়।



চিত্র—30b

সেন্ট্রিওলের প্রস্থচ্ছেদ

উৎপত্তি— সেন্ট্রিওলের বিভাজনের ফলে সেন্ট্রোসোমের উৎপত্তি হয়। সেন্ট্রিওল পৃথক হওয়ার সময় প্রত্যেক সেন্ট্রিওল থেকে একটি অপত্য সেন্ট্রিওল গঠিত হয়। প্রোফেজের শেষে অপত্য সেন্ট্রিওল পরিণত হয় এবং মাতৃ সেন্ট্রিওলের সমকোণে থাকে। নিউক্লিও বিভাজনের পর যখন অপত্য নিউক্লিয়াস তৈরি হয় তখন আবার প্রত্যেক নিউক্লিয়াসের পাশে দুইটি সেন্ট্রিওলযুক্ত একটি সেন্ট্রোসোম থাকে।

মাইক্রোটিউবিউল ও মাইক্রোফিলামেন্ট

কোষের আকৃতির নিয়ন্ত্রণ, সাইটোপ্লাজমের চলন, ক্রোমোসোমের পৃথক হওয়া এবং সাইটোকাইনেসিস ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মাইক্রোটিউবিউল ও মাইক্রোফিলামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

মাইক্রোটিউবিউল (microtubule)

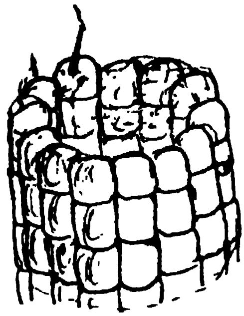
Robertis ও Franchi (1953) স্নায়ুতন্তুতে প্রথম মাইক্রোটিউবিউল দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা এগুলিকে নিউরোটিউবিউল (neurotubule) নাম দিয়েছিলেন। Sabatini, Bensch ও Barnett 1963 খ্রিস্টাব্দে মাইক্রোটিউবিউলের যথাযথ বিবরণ দেন। উদ্ভিদে মাইক্রোটিউবিউলের প্রথম বর্ণনা করেন Lelbetter ও Porter (1963)।

অবস্থান— উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের বিভিন্ন অঞ্চলে মাইক্রোটিউবিউল দেখা যায়। যেমন— সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলা অঞ্চলে, স্নায়ু কোষে, সেন্ট্রিওল ও বেসাল বডিতে, মাইটোটিক গঠনে (apparatus-এ), ভাজক কলায়, কোনও কোনও পতঙ্গের শুক্রাণু

মাতৃকোষে এবং প্রোটোজোয়ার বিশেষ কতকগুলি গঠনে মাইক্রোটিউবিউল দেখা যায়।

যেসব কোষে মাইক্রোটিউবিউল অনুপস্থিত থাকে তার কতকগুলি হল— অ্যামিবা, স্লাইম মোল্ড, মানুষের পরিণত লোহিত কণিকায়।

গঠন— এগুলি দীর্ঘ, শাখাবিহীন ফাঁপা নল। এর ব্যাস মোটামুটি 210-250Å। মাইক্রোটিউবিউলের প্রাচীরে গোলাকার উপএকক (subunit) থাকে। এগুলি (profilament) তেরটি সারিতে সাজান থাকে। উপএককের ব্যাস 40Å। এরকম গোলাকার প্রোটিনকে টিউবিউলিন বলে।



চিত্র—31

মাইক্রোটিউবিউল (ফাঁপা, বেলনাকার ও শাখাবিহীন)

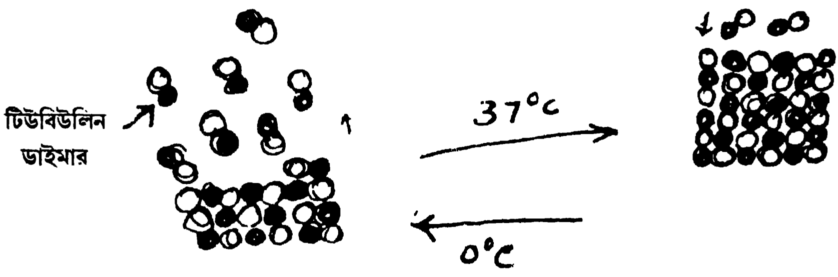
মাইক্রোটিউবিউলগুলি সাধারণত এককভাবে থাকে। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কতকগুলি মাইক্রোটিউবিউল পরস্পর সূক্ষ্মভাবে যুক্ত অবস্থায় থাকে ও মোটামুটি স্থায়ী গঠন সৃষ্টি করে। যেমন— সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলার অ্যাক্সোনিমাটায় (axonemata) 9 + 2 বিন্যাসে মাইক্রোটিউবিউল থাকে। মাইক্রোটিউবিউলগুলি পাতলা সূত্রাকার সেতু দিয়ে পরস্পর যুক্ত থাকতে পারে। যেমন, সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলায়, অ্যাক্সোনিমাটায়, ফ্ল্যাজেলেটসের অ্যাক্সোস্টাইলে, উদ্ভিদের বিভাজন কোষের কোষপাতে, মাইটোটিক অ্যাপ্যারেটাস ইত্যাদিতে। Tilney এর (1971) মতে, এরকম সেতু মাইক্রোটিউবিউল সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়।

রাসায়নিক উপাদান— প্রাণী কোষের মাইক্রোটিউবিউলের রাসায়নিক গঠন জানা গেছে। প্রত্যেক মাইক্রোটিউবিউলের উপএককের অধঃক্ষেপের গুণাঙ্ক (sedimentation coefficient) হল 6S। এরকম উপএককে দুইটি গোলাকার পলিপেপটাইড (α ও β টিউবিউলিন) থাকে।

এই দু'টি পলিপেপটাইডের প্রত্যেকটির আণবিক ওজন হল 60,000 ডালটন। এসব উপএককে উৎসেচক প্রোটিন কাইনেসের কার্যকারিতা এবং ATPase-এর কার্যকারিতা লক্ষ্য করা হয়েছে। উপএককের সাথে এক অণু GTP যুক্ত থাকে।

মাইক্রোটিউবিউলের ভগ্নতা এবং পুনঃগঠন

স্বাভাবিক অবস্থায় সিলিয়া, ফ্ল্যাজেলা ইত্যাদির মাইক্রোটিউবিউলগুলি স্থায়ী অর্থাৎ এগুলি ভেঙে যায় না ও পুনঃসংযুক্ত হয় না। কিন্তু সাইটোপ্লাজমের মাইক্রোটিউবিউলগুলি সহজেই ভেঙে যায় ও পুনরায় সংযুক্ত হয়। মাইক্রোটিউবিউলের পলিমার এবং মনোমারের (উপএকক) মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় থাকে। কোষ বিভাজনের সময় সাইটোপ্লাজমের মাইক্রোটিউবিউলের অগ্রভাগে এরকম ভগ্নতা লক্ষ্য করা হয়েছে। তাপমাত্রা, pH, ক্যাটায়নের ঘনত্ব ইত্যাদির প্রভাবে মনোমার এককগুলি কীভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত হবে তা নির্ভর করে। যেমন, 37°C তাপমাত্রায় টিউবিউলিনগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে প্রোটোফিলামেন্ট গঠন করে। কিন্তু 0°C তাপমাত্রায় সেন্ট্রিফিউজ করলে বড় বড় অণু ভেঙে গিয়ে ছোট ছোট টিউবিউলিন ডাইমার উৎপন্ন হয়। MAP (microtubule associated protein) বা মাইক্রোটিউবিউলের সাথে যুক্ত প্রোটিনের উপস্থিতিতে টিউবিউলিন অণুর পলিমারাইজেশন দ্রুত হয়। এর অনুপস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরে হয়। কলচিসিনের প্রভাবে মাইক্রোটিউবিউল ভেঙে যায় কারণ কলচিসিন মনোমারগুলির সাথে যুক্ত হওয়ায় পলিমার ও মনোমারের মধ্যে ভারসাম্য ব্যাহত হয়।



চিত্র—32
উচ্চ তাপমাত্রায় (যেমন, 37°C) মাইক্রোটিউবিউল ক্রমশ দীর্ঘ হয়, কম তাপমাত্রায় এগুলি ভেঙে যায় (Dyson 1978 অনুসারে)

মাইক্রোটিউবিউলগুলি কোষের বিশেষ স্থানে থাকে এবং এদের নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। মাইক্রোটিউবিউলের উৎপাদন মাইক্রোটিউবিউল গঠনকারী কেন্দ্র বা MTOC (mitcrotubule organizing centre) অঞ্চলে আরম্ভ হয়।

MTOC সেন্ট্রিওলে (প্রধানত প্রাণী কোষে), বিভাজনশীল কোষের স্পিন্ডিলে (যেমন— উদ্ভিদ কোষে), ক্রোমোসোমের কাইনেটোকোরে, বিভিন্ন পর্দায় ইত্যাদিতে দেখা যায়। MTOC অঞ্চলে কোনও পরিবর্তন, ক্যালসিয়াম অণুর ঘনত্ব, MAP-র উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি মাইক্রোটিউবিউলের উৎপাদন প্রভাবিত করে।

সাইটোস্কেলিটন (cytoskeleton)

বেশিরভাগ ইউক্যারিওট কোষে প্লাজমা পর্দার ঠিক নিচেই মাইক্রোটিউবিউল ও মাইক্রোফিলামেন্টের সাইটোপ্লাজমীয় জালিকা থাকে। এই জালিকাকে সাইটোস্কেলিটন বলে। মাইক্রোফিলামেন্টের সূত্রগুলির ব্যাস মোটামুটি 100Å।

সাইটোস্কেলিটনের প্রধান দু'টি কাজ হল—

i) কোষের আকৃতি বজায় রাখা এবং

ii) প্রোটোপ্লাজমের চলন (যেমন- সাইক্লোসিস এবং অ্যামিবা সদৃশ চলন) নিয়ন্ত্রণ করা।

কোষের আকৃতির সামান্য পরিবর্তন মাইক্রোফিলামেন্টের জন্য হয় না। কিন্তু কোষের আকৃতির যথেষ্ট পরিবর্তন হলে ওই পরিবর্তনে মাইক্রোটিউবিউলের ভূমিকা থাকে।

সংকোচী প্রোটিন সূত্র

অনেক ইউক্যারিওট কোষে সংকোচী প্রোটিন সূত্র থাকে। এসব সূত্রের বিভিন্ন কাজ রয়েছে। যেমন কোষের চলন, সাইটোপ্লাজমের চলন, কোষ বিভাজন, কোষের আকার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

প্রাণীর পেশী কোষের সংকোচী সূত্র

পেশী দুই রকমের। সরেখ (striated) বা অরেখ (smooth)। সরেখ পেশীতে পর্যায়ক্রমে গাঢ় ও হালকা দাগ থাকে। এই দাগ প্রোটিন সূত্র মায়োফিলামেন্টে নির্দিষ্ট গুচ্ছে (bundle) অর্থাৎ মায়োফাইব্রিলের অবস্থানের জন্য হয়। মায়োফাইব্রিল ব্যাস 1-2μ। এই সূত্র কতকগুলি খণ্ডে বিভক্ত। এই খণ্ডগুলিকে সারকোরমিয়ার বলে। এই খণ্ডগুলির মাঝে পাতলা, গাঢ় Z লাইন বা Z ডিস্ক থাকে।

অরেখ পেশীতে মায়োফিলামেন্ট সরেখ পেশীর তুলনায় কম সুসংগঠিত অবস্থায় থাকে।

মায়োফাইব্রিলের (myofibril) স্থূল সূত্রগুলি বড় ও যথেষ্ট দীর্ঘ। প্রোটিন অণুর এক প্রান্তে সেরোমায়োসিন বা 'মাথা' এবং অপরপ্রান্তে অপেক্ষাকৃত সরু মিয়োমায়োসিন থাকে।

মায়োফাইব্রিলের সূক্ষ্ম সূত্রগুলি প্রকৃতপক্ষে দু'টি সূত্র। এতে ছোট গোলাকার প্রোটিন-অ্যাকটিন (actin) থাকে। সূত্র দু'টি পরস্পর পেঁচান থাকে। এই পেঁচের ফলে যে গহ্বরের (groove) সৃষ্টি হয়, সেখানে দণ্ডাকার ট্রোপোমায়োসিন (tropomyosin) থাকে। এগুলি গোলাকার ট্রোপোনিন (troponin) দিয়ে পৃথক থাকে।

অস্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডী প্রাণীর নিউক্লিয়াসযুক্ত লোহিত কণিকার আয়তাকার আকৃতি ব্যান্ডযুক্ত মাইক্রোটিউবিউলের উপস্থিতির জন্য হয় (Bertholinie ও Monaco 1976)। স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোহিত কণিকায় (এরিথ্রোসাইট)

মাইক্রোটিউবিউল থাকে না। এসব কোষের দ্বিঅবতল আকৃতি দীর্ঘ, সূক্ষ্ম ফসফেটযুক্ত প্রোটিন-স্পেকট্রিন (spectrin) দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় (Kirkpatrick 1976)। স্পেকট্রিন পর্দার প্রোটিনের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করে।

মাইক্রোটিউবিউলের কাজ—

i) সিলিয়া, ফ্ল্যাজেলা ও অ্যাক্সোস্টাইল (axostyle) ইত্যাদির চলন মাইক্রোটিউবিউল নিয়ন্ত্রণ করে।

ii) কোষ বিভাজনের সময় মাইক্রোটিউবিউল স্পিন্ডিল গঠন করে ও ক্রোমোসোমের কাইনেটোকোর অঞ্চলের সাথে যুক্ত থাকে। অ্যানাফেজে স্পিন্ডিল তন্তুর সংকোচনের ফলে ক্রোমোসোমগুলি মেরুতে পৌঁছতে পারে।

iii) উদ্ভিদ কোষে সাইটোপ্লাজমের চলনে মাইক্রোটিউবিউলের ভূমিকা রয়েছে।

iv) ভ্রূণের বিকাশে মাইক্রোটিউবিউলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

v) বিভিন্ন কোষে মাইক্রোটিউবিউল একটি কাঠামো বা সাইটোস্কেলিটন গঠন করে। এটি কোষকে দৃঢ় করে ও স্থানীয় চাপ সহনে সহায়তা করে। সাইটোস্কেলিটন সাইটোপ্লাজমের নালিকা (channels) নির্দেশ করে।

vi) মাইক্রোটিউবিউলগুলি ছোট ছোট জলের অণু ও অজৈব অণুর অন্তঃকোষীয় সংবহনে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়াকে microcirculatory পদ্ধতি বলে।

vii) কোনও কোনও প্রোটোজোয়ায় খাদ্য আহরণে মাইক্রোটিউবিউল সহায়তা করে।

রাইবোসোম (ribosome)

সাইটোপ্লাজমে কতকগুলি ছোট ছোট দানার মত বস্তুর মধ্যে প্রচুর RNA পাওয়া যায়। এইসব বস্তুকে Robert (1958) রাইবোসোম নামে অভিহিত করেছিলেন। 1955 খ্রিস্টাব্দে Palade রাইবোসোম দেখেছিলেন। এরও আগে 1941 খ্রিস্টাব্দে A. Claude এইসব বস্তুকে মাইক্রোসোম (microsome) নাম দিয়েছিলেন। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যে, রাইবোসোম এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে যুক্ত থাকে।

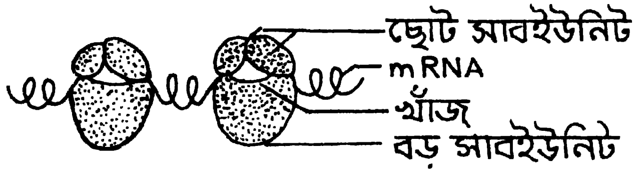
ব্যাকটিরিয়া, ইস্ট (yeast), উদ্ভিদের ভাজক কলায় (meristematic tissue), স্নায়ু কোষে এবং যকৃতের কোষে রাইবোসোম দেখা যায়। এছাড়া অন্যান্য কোষেও রাইবোসোম থাকে। বিভিন্ন কোষে রাইবোসোমের গঠন ও আয়তন মোটামুটি এক। সাধারণত রাইবোসোম গোল কিম্বা উভয় প্রান্ত একটু চ্যাপ্টা হয়। এদের ব্যাস 100-230Å।

রাইবোসোমের সংখ্যা কোষের RNA-র পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। *E.coli*-র প্রতি কোষে রাইবোসোমের সংখ্যা 2,000 থেকে 20,000 পর্যন্ত হয়। খরগোসের রেটিকুলোসাইটে রাইবোসোমের সংখ্যা 1×10^5 হয়। অপুষ্টিজনক অবস্থায় রাইবোসোমের সংখ্যা কমে যেতে পারে।

গঠন— ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে, দেখা গিয়েছে যে, প্রত্যেক

রাইবোসোমে দু'টি অংশ (subunit বা উপএকক) থাকে। একটি অংশ বড় ও অন্যটি ছোট (চিত্র 33, 34a)। *Escherichia coli*-তে বড় অংশটি পেয়ালার বা গম্বুজের আকৃতির, ছোট অংশটি টুপির মত ও বড় অংশটির সোজা দিকে আটকান থাকে। উচ্চতর উদ্ভিদ ও প্রাণীতে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে রাইবোসোমের বড় অংশটি সংযুক্ত থাকে।

রাইবোসোমের সূক্ষ্ম গঠন সম্বন্ধে এখন জানা গেছে। Y. Nonomura ও তাঁর সহকর্মীরা 1971 খ্রিস্টাব্দে যকৃতের (liver) রাইবোসোমের গঠন বর্ণনা করেন (চিত্র 33a)। রাইবোসোমের বড় সাবইউনিটটি (60S) গোলাকার বা ত্রিকোণাকার। এর



চিত্র—33a

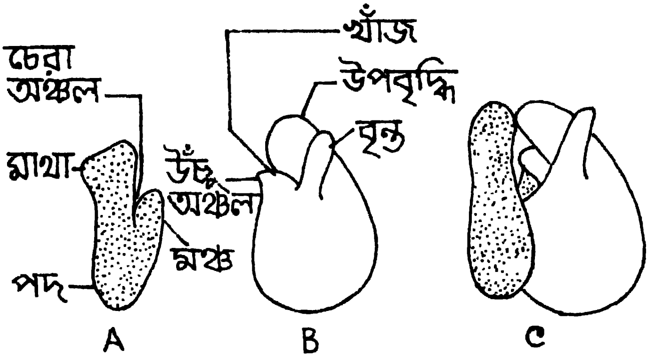
Y. Nonomura-র রাইবোসোমের মডেল

একটি উত্তল ও একটি চ্যাপ্টা দিক রয়েছে। চ্যাপ্টা দিকের মাঝামাঝি অঞ্চল কিছুটা চাপা (notch)। ছোট সাবইউনিটটি (40S) লম্বাটে। এর একটি দিক উত্তল ও অন্যদিক অবতল। একটি পর্দা দিয়ে ছোট সাবইউনিটটি দুইটি অসমান অংশে বিভক্ত। বড় সাবইউনিটের চ্যাপ্টা দিকের সাথে ছোট সাবইউনিটের অবতল দিক এমনভাবে যুক্ত থাকে যাতে ছোট সাবইউনিটের পর্দাটি (partition) বড় সাবইউনিটের খাঁজ বা চাপা অঞ্চলের (notch) বরাবর থাকে। এর ফলে দুইটি সাবইউনিটের মাঝে কিছুটা ফাঁকা অঞ্চল থাকে।

E coli-র রাইবোসোমের গঠন সম্প্রতি জানা গেছে (চিত্র 33b)। এখানে বড় সাব-ইউনিটে একটি উঁচু অঞ্চল বা ridge, কেন্দ্রে একটি উপবৃদ্ধি (protuberance) এবং একটি বৃন্ত (stalk) থাকে। উঁচু অঞ্চল ও উপবৃদ্ধি অঞ্চল পরস্পর থেকে একটি খাঁজের (valley) মাধ্যমে পৃথক থাকে। ছোট সাবইউনিটে একটি মাথা (head) ও একটি পদ (base) থাকে। মাথা ও পদ একটি চেরা অঞ্চলের (cleft) মাধ্যমে পরস্পর থেকে আলাদা থাকে।

রাইবোজোমের আয়তন Svedberg এককে (S) প্রকাশ করা হয়। আলট্রাসেন্ট্রিফিউজ করলে রাইবোসোম বা এর উপএককগুলি যে হারে থিতিয়ে পরে

তার পরিমাপ হল Svedberg একক। 1×10^{-13} সেকেন্ড হল এক Svedberg একক। রাইবোসোমের আয়তন বড় হলে Svedberg এককের মান বাড়ে। থিতনোর (sedimentation) প্রকৃতি, উপএককের আকার, আয়তন, আণবিক ওজনের ওপর নির্ভর করে।



চিত্র—33b

E. coli-র রাইবোসোমের গঠন
A- ছোট সাবইউনিট,
B- বড় সাবইউনিট,
C- দুইটি সাবইউনিটযুক্ত রাইবোসোম

আলট্রাসেন্ট্রিফিউজ (ultra-centrifuge) করে দেখা গিয়েছে যে, বিভিন্ন রাইবোসোম বা রাইবোসোমের অংশ ভিন্ন ভিন্ন হারে থিতিয়ে (sedimentation rate) পড়ে। এর ওপর ভিত্তি করে রাইবোসোমগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। (a) ব্যাকটিরিয়ার রাইবোসোমের থিতনোর গুণাঙ্ক (sedimentation coefficient) 70S (S = Svedberg একক)। এদের আণবিক ওজন সাধারণত 2.7×10^6 হয়। এগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। ব্যাকটিরিয়া ছাড়া অন্যান্য প্রোক্যারিওট কোষ, যেমন নীল-সবুজ শৈবালে 70S রাইবোসোম দেখা যায়। এছাড়া অনেক শৈবাল ও উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ায় এরকম রাইবোসোম থাকে। (b) ইউক্যারিওট কোষের রাইবোসোমের থিতনোর গুণাঙ্ক 80S এবং এদের আণবিক ওজন মোটামুটি 4×10^6। (c) ছত্রাকের মাইটোকন্ড্রিয়ায় সাধারণত 77S রাইবোসোম থাকে। প্রাণী কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ায় 60S রাইবোসোম পাওয়া যায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীর

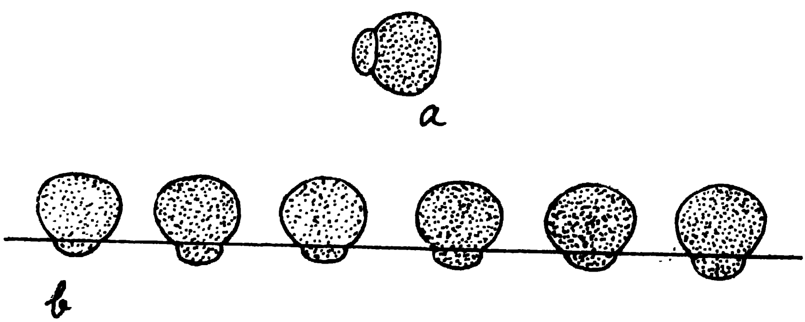
মাইটোকন্ড্রিয়ার রাইবোসোম হল 55S।

এখন জানা গেছে যে, রাইবোসোমের সাবইউনিট দু'টি সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং প্রোটিন উৎপাদনের আগে সাবইউনিট দু'টি যুক্ত হয়। প্রোটিন উৎপাদনের পর এগুলি আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

রাইবোসোমের অংশগুলি ম্যাগনেসিয়ামের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। ম্যাগনেসিয়ামের অনুপস্থিতিতে রাইবোসোমের বড় অংশ আরো ছোট ছোট অংশে বিভাজিত হয়ে যায়। যেমন, 70S রাইবোসোম 50S ও 30S উপএককে (subunit) আলাদা হয়ে যায়। 80S রাইবোসোম 60S ও 40S উপএককে বিভাজিত হয়। এইসব 50S, 60S ইত্যাদি উপএককগুলিও আরো ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হতে পারে। 60S ও 40S সাবইউনিটগুলি ভেঙে ছোট 28S এবং 16S সাব-ইউনিট গঠন করে। 50S এবং 30S সাবইউনিটগুলি ভেঙে ছোট ছোট 23S এবং 16S সাবইউনিটের সৃষ্টি করে। রাইবোসোমের এইসব ছোট ছোট অংশগুলি প্রোটিন উৎপাদন করতে পারে না। কেবল 70S ও 80S রাইবোসোম প্রোটিন উৎপাদনে সক্ষম। ম্যাগনেসিয়াম আয়নের ঘনত্ব দশ গুণ বাড়িয়ে দিলে দু'টি রাইবোসোম যুক্ত হয়ে dimer গঠন করে।

যেসব রাইবোসোম কোনও পর্দার সাথে যুক্ত থাকে, সেগুলি কোনও পর্দার সাথে যুক্ত নয় এমন রাইবোসোমের চেয়ে প্রোটিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক সক্রিয়। সাধারণত রাইবোসোম অমসৃণ প্রাচীরযুক্ত এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে যুক্ত থাকে। অপরিণত ভাজক (micristematic) কোষের রাইবোসোমগুলি যুক্ত অবস্থায় থাকে।

অনেক সময় কতকগুলি রাইবোসোম একসাথে থাকে। এদের পলিসোম (polysome) বা পলিরাইবোসোম (polyribosome) বলা হয় (চিত্র 34b)। কখনও কখনও এদের ergosomeও বলা হয়ে থাকে।



চিত্র—34a.b

রাইবোসোম

a - দু'টি অংশ দিয়ে গঠিত একটি রাইবোসোম

b - পলিরাইবোসোম

এই রাইবোসোমগুলি খুব সূক্ষ্ম (10-15Å) mRNA সূত্র দিয়ে যুক্ত থাকে। পলিরাইবোসোমের রাইবোসোম অংশগুলি একসাথে কাজ করে। প্রজাতির ওপর নির্ভর করে পলিরাইবোসোমে রাইবোসোমের সংখ্যা বিভিন্ন হয়। কোনও কোনওটায় তিনটি আবার কোনওটায় সত্তরটা পর্যন্ত রাইবোসোম থাকে। একটা রাইবোসোম থেকে অন্য রাইবোসোমের দূরত্ব 50-150Å হয়। পলিসোমের রাইবোসোমগুলি সক্রিয়ভাবে প্রোটিন সংশ্লেষে অংশ নেয়।

রাসায়নিক গঠন— 70S রাইবোসোমের 60 শতাংশ rRNA এবং 40 শতাংশ প্রোটিন থাকে। 80S রাইবোসোমে এগুলি সমপরিমাণে থাকে। তবে বিভিন্ন জীবে rRNA ও প্রোটিনের পরিমাণের কিছু তারতম্য লক্ষ্য করা হয়েছে। ইঁদুরেব যকৃতের (liver) রাইবোসোমে ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া সামান্য পরিমাণ ক্রোমিয়াম (chromium), ম্যাঙ্গানিজ (manganese), নিকেল (nickel), লোহা, ক্যালসিয়ামও (calcium) রাইবোসোমে থাকতে পারে।

দেখা গেছে যে, রাইবোসোমের RNA 60% দ্বিসূত্রযুক্ত অর্থাৎ ভাঁজ অবস্থায় থাকে।

রাইবোসোমে নানা রকম প্রোটিন থাকে, যেমন কেন্দ্রগত (core) প্রোটিন এবং বিযুক্ত (split) প্রোটিন। *E. coli*-র বড় সাবইউনিটে 34 রকমের প্রোটিন পাওয়া গেছে ও এগুলিকে s1 – s34 দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। ছোট সাবইউনিটের বিভিন্ন রকম প্রোটিনের সংখ্যা হল 21। এগুলিকে s1 – s21 দিয়ে নির্দেশ করা হয়।

রাইবোসোমের প্রোটিনকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে বিশ্লিষ্ট করা যায় এবং আবার পুনর্গঠন করা যায়। রাইবোসোমের সাবইউনিটে (যেমন, 16S) 4M ইউরিয়া, 2M লিথিয়াম ক্লোরাইড প্রয়োগ করলে প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। RNA-র নেগেটিভ চার্জের জন্য রাইবোসোম যথেষ্ট নেগেটিভ চার্জসম্পন্ন হয়। এজন্য এগুলি বেসিক রঙ দিয়ে রঞ্জিত হয়।

রাইবোসোমের রাসায়নিক প্রকৃতি বিশদভাবে আলোচনা করা হল।

a) **রাইবোসোমীয় RNA** –a) 70S রাইবোসোমে তিন রকমের (23S, 16S, 5S) rRNA থাকে। 23S ও 5S rRNA বড় অর্থাৎ 50S রাইবোসোমীয় উপএককে থাকে। 16S rRNA ছোট এবং 30S রাইবোসোমীয় উপএককে থাকে। যদি একটি নিউক্লিওটাইডের আণবিক ওজন মোটামুটি 330 ডালটন হয়, তবে 23S rRNA-তে 3300 নিউক্লিওটাইড, 16S rRNA-তে 1650 নিউক্লিওটাইড এবং 5S rRNA-তে 120টি নিউক্লিওটাইড থাকতে পারে (Fellner 1972)।

b) 80S রাইবোসোমে চার রকমের (28S / 25.26S, 18S, 5S, 5.8S) rRNA থাকে। বড় অর্থাৎ 60S রাইবোসোমীয় উপএককে 28S, 5S, 5.8S r-RNA থাকে। ছোট 40S রাইবোসোমীয় উপএককে 18S r-RNA থাকে। 28S r-RNA দ্বিসূত্রযুক্ত ও এর আণবিক ওজন 1.6×10^6 ডালটন। 18S rRNA-এর আণবিক ওজন 0.6×10^6

ডালটন ও এখানে 2100 নিউক্লিওটাইড থাকে। 28S এবং 18S rRNA-তে মিথাইল গ্রুপ থাকে। 5S rRNA-তে 120টি নিউক্লিওটাইড থাকে। এর আকার 'ক্লোভার পাতা'র মত। 5.8S rRNA 28.S rRNA-র সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকে। সেজন্য এটিকে 28S 'associated' rRNA বা 28S-A-rRNA বলে।

c) স্তন্যপায়ী প্রাণীর 55S রাইবোসোমে 21S ও 12S rRNA থাকে। বড় অর্থাৎ 35S রাইবোসোমীয় উপএককে 21S rRNA থাকে। ছোট অর্থাৎ 25S রাইবোসোমীয় উপএককে 12S rRNA থাকে।

যেহেতু রাইবোসোম ক্ষার রঞ্জক দিয়ে সহজেই রঞ্জিত হয়, সেজন্য মনে করা হয় যে, রাইবোসোমের ভিতরের দিকে প্রোটিন ও বাইরের দিকে rRNA থাকে।

2. **রাইবোসোমীয় প্রোটিন**— a) 70S রাইবোসোমে মোটামুটি 55টি রাইবোসোমীয় প্রোটিন থাকে। এর মধ্যে 50S রাইবোসোমীয় উপএককে 32-34 রকমের প্রোটিন থাকে। 30S রাইবোসোমীয় উপএককের প্রোটিন অণুর সংখ্যা 21।

50S ও 30S রাইবোসোমকে 5M সিসিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে সেন্ট্রিফিউজ করলে এটি দু'টি নিষ্ক্রিয় কেন্দ্রগত অংশে (40S ও 23S) ভেঙে যায়। এই অংশে কেন্দ্রগত বা core প্রোটিন (CP) এবং কিছু বিযুক্ত বা split প্রোটিন (SP) থাকে। নির্দিষ্ট কেন্দ্রগত অংশে SP50 বা SP30 দিলে পুনরায় কার্যকর রাইবোসোমীয় উপএকক গঠিত হয়। বিযুক্ত বা split প্রোটিন দুই রকমের— ক্ষারধর্মী ও অম্লধর্মী।

রাইবোসোমে S14 প্রোটিনের উপস্থিতি প্রয়োজনীয়। এই প্রোটিন উপস্থিত থাকলে রাইবোসোম সক্রিয় হয় এবং এর অনুপস্থিতিতে রাইবোসোম নিষ্ক্রিয় থাকে।

বিভিন্ন জীবের রাইবোসোমের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—

জীব	সম্পূর্ণ রাইবোসোম	রাইবোসোমের উপএকক	rRNA-এর উপএকক	প্রোটিনের উপএককের সংখ্যা
প্রোক্যারিওট	70S	30S	16S	21
		50S	23S,5S	32-34
ইউক্যারিওট	80S	40S		–30
		60S		–50
উদ্ভিদে		40S	18S	
		60S	25, 26S, 5S, 5.8S	
প্রাণীতে		40S	18S	
		60S	28S, 5S, 5.8S	
ছত্রাকে		40S	18S	
		60S	25-265, 5S, 5.8S	
প্রোটোজোয়ায়		40S	18S	
		60S	25-265, 5S, 5.8S	

2. রাইবোসোমের উৎসেচক ও প্রোটিন ফ্যাক্টর—

প্রোটিন উৎপাদনের সময় রাইবোসোমে বিভিন্ন কাজ হয়। যেমন- a) mRNA-র কোডনকে tRNA-র অ্যান্টিকোডন চিনতে পারে। b) অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির মধ্যে পেপটাইড বন্ধন গঠিত হয়। c) mRNA-র কোডনগুলি পরপর উন্মুক্ত হয়, যাতে যথাযথ tRNA-র সাথে যুক্ত হতে পারে। রাইবোসোমের সংযুক্তি ও চলন, এবং tRNA-র সঞ্চালন ইত্যাদির জন্য রাইবোসোমে নানা রকম উৎসেচক ও প্রোটিন ফ্যাক্টর থাকে।

a) প্রারম্ভিক ফ্যাক্টর — তিনটি প্রারম্ভিক ফ্যাক্টর— IF_1, IF_2 ও IF_3 ফ্যাক্টর 30S উপএককের সাথে আলগাভাবে সংলগ্ন থাকে। এই ফ্যাক্টরগুলি প্রোটিন। IF_1 ক্ষারধর্মী প্রোটিন। এর আণবিক ওজন 9200 ডালটন। IF_1 ফ্যাক্টর F-মেথ-tRNAএর সংযুক্তিতে সহায়তা করে। IF_2 ফ্যাক্টরের আণবিক ওজন হল 80,000 ডালটন ও এর এক প্রান্তে SH গ্রুপ থাকে, যা GTP বা গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেটের সাথে যুক্ত হতে পারে। IF_3 ফ্যাক্টর ক্ষারধর্মী প্রোটিন। এর আণবিক ওজন 30,000 ডালটন। এই ফ্যাক্টর 30S উপএককের সাথে mRNA-র বন্ধনে সহায়তা করে। *E. coli*-তে কতকগুলি বাধাদায়ক বা interferencc ফ্যাক্টর (i ফ্যাক্টর) থাকে। এটি IF_3-র সাথে যুক্ত হলে এর নির্দিষ্টতার পবিবর্তন করে এবং এভাবে জেনেটিক সংকেতের অনুবাদ (translation) নিয়ন্ত্রণ করে।

b) দীর্ঘায়তকরণ বা elongation ফ্যাক্টর— এরকম দু'টি ফ্যাক্টর হল EFT ও EFG। প্রথম ফ্যাক্টরে আবার দু'টি প্রোটিন-তাপমাত্রা-অস্থায়ী Tu (temperature unstable) এবং তাপমাত্রা-স্থায়ী Ts (temperature stable) রয়েছে। রাইবোসোমের গ্রহণকারী অঞ্চলের সাথে বন্ধন সৃষ্টি করার ঠিক আগে EFTu ও GTP অ্যামিনো অ্যাসাইল tRNA-র সাথে যৌগ গঠন করে। এই যৌগ গঠনের সময় Ts ফ্যাক্টর উৎসেচকের কাজ করে।

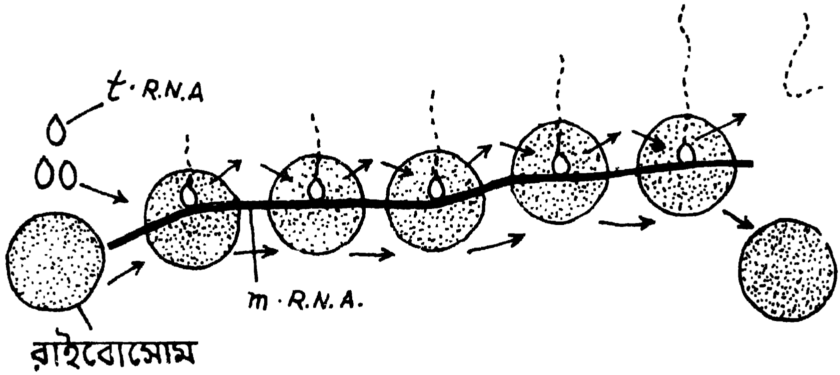
mRNA-র ট্রান্সলেশনে EFG ফ্যাক্টর বা G ফ্যাক্টর বা ট্রান্সলেশন ফ্যাক্টরের প্রয়োজন। EFG এবং GTP সদ্য দীর্ঘায়ত পেপটিডেল- tRNA-র (peptidyl - tRNA) স্থানান্তরণে (translocation) সহায়তা করে। *E. coli*-র EFG ফ্যাক্টর একটি পলিপেপটাইড চেন দ্বারা গঠিত এবং এর আণবিক ওজন 72,000 ডালটন।

50S উপএককে পেপটাইড সিন্থেটেজ উৎসেচক থাকে, যা পেপটাইড বন্ধন গঠনে সহায়তা করে।

c) প্রান্তসূচক বা termination ফ্যাক্টর— এরকম দু'টি ফ্যাক্টর হল R_1 ও R_2। এগুলি প্রোটিন প্রকৃতির।

কাজ— 1962 খ্রিস্টাব্দে Rich ও Warner-এর গবেষণা থেকে প্রোটিন উৎপাদনে পলিরাইবোসোমের গুরুত্ব উপলব্ধি করা গিয়েছে। রাইবোসোম অঞ্চলেই প্রোটিন তৈরি হয়। বার্তাবহ (messenger) আর এন এ ডি এন এ-র প্রোটিন উৎপাদনের বার্তা

সাইটোপ্লাজমে নিয়ে আসে। Rich-এর (1963) মতে, একটি রাইবোসোমকে যদি কোনও mRNA-র এই বার্তা জানতে হয়, তবে ওই রাইবোসোমকে mRNA সূত্রের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে হবে। রাইবোসোম যখন mRNA-র এক প্রান্ত থেকে চলতে থাকে, তখন এটি নির্দেশ অনুসারে একটির পর একটি অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত করে পলিপেপটাইড চেন (polypeptide chain) গঠন করে (চিত্র 34c)। mRNA (মেসেঞ্জার আর এন এ) সূত্রের সব নির্দিষ্ট স্থানে tRNA নির্বাচিত অ্যামিনো অ্যাসিডকে নিয়ে আসে। এইভাবে যখন পলিপেপটাইড চেন অর্থাৎ প্রোটিন অণুর গঠন সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তখন রাইবোসোম ওই পলিপেপটাইড চেনকে মুক্ত করে দেয় এবং নিজেও ওই mRNA সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঠিক ওই সময় আরেকটি রাইবোসোম mRNA-র অন্য প্রান্তে যুক্ত হয়ে নতুন পলিপেপটাইড চেন বা প্রোটিন অণু গঠন করতে আরম্ভ করে। একটি mRNA-র সাথে 1-20টি রাইবোসোম যুক্ত থাকতে পারে। এইসব রাইবোসোম mRNA-র একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাবার সময় প্রত্যেকে একটি করে প্রোটিন অণু গঠন করে। ব্যাকটিরিয়ায় রাইবোসোমের একটা প্রোটিন অণু তৈরি করতে মাত্র 10 সেকেন্ড সময় লাগে।



চিত্র—34c

প্রোটিন উৎপাদনে রাইবোসোমের ভূমিকা

রাইবোসোমের উৎপাদন (biogenesis) — বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ নিউক্লিওলাস ও রাইবোসোমের মধ্যে নিকট সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন। জৈব রাসায়নিক পরীক্ষা ও অন্যান্য গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে, রাইবোসোম গঠনের জন্য নিউক্লিওলাসের একান্ত প্রয়োজন।

রাইবোসোমের rRNA ও প্রোটিন নিউক্লিও জিনের প্রভাবে গঠিত হয়। প্লাস্টিড ও মাইটোকন্ড্রিয়ায় কিন্তু নিজস্ব রাইবোসোম রয়েছে। সাইটোপ্লাজমীয় রাইবোসোমের sedimentation coefficient হল 80S. কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়ার ও প্লাস্টিডের

রাইবোসোমের এই মান 70S। সুতরাং, শেষোক্ত রাইবোসোমের সাথে ব্যাকটিরিয়ার রাইবোসোমের সামঞ্জস্য রয়েছে। এরকম রাইবোসোমের উৎপত্তি প্লাস্টিডের DNA ও মাইটোকন্ড্রিয়ার DNA দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।

ইউক্যারিওটে রাইবোসোমের বায়োজেনেসিস বেশ জটিল। পঞ্চাশটির চেয়ে বেশি জিন এই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। রাইবোসোমের বায়োজেনেসিসে নিউক্লিওলাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নিউক্লিওলাসের সাথে সম্পর্কিত DNA রাইবোসোমীয় RNA-র কোডের সংকেত বহন করে।

ব্যাকটিরিয়ার 70S RNA-র বায়োজেনেসিসের সাথে ইউক্যারিওটের 80S RNA-র বায়োজেনেসিসে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

70S রাইবোসোমের বায়োজেনেসিস— 70S রাইবোসোমের বায়োজেনেসিস সাইটোপ্লাজমে হয়।

ব্যাকটিরিয়ার 5S, 16S এবং 23S rRNA-র কোডের জন্য দায়ী RNA-র জিনগুলি ক্রোমোসোমের একটি বিশেষ অঞ্চলে অর্থাৎ একটি 'অপেরনে' থাকে। এই জিনগুলির একসাথে ট্রান্সক্রিপশন হয় এবং 16S, 23S এবং 5S একক বিশিষ্ট বড় rRNA এর সংশ্লেষ হয়। *E. coli* ক্রোমোসোমের কেবল 0.4% rRNA-র সংশ্লেষে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু দেখা গেছে যে, *E. coli*-র মোট RNA-র 80% শতাংশ হল rRNA। এর কারণ হল, rRNA অন্যান্য RNA-র (tRNA ও mRNA) চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি স্থায়ী। রাইবোসোমীয় প্রোটিন rRNA-কে স্থায়িত্ব দেয় এবং রক্ষা করে। এছাড়া rRNA-র সংকেত বা কোডের জন্য দায়ী জিনগুলির ক্রমাগত ট্রান্সক্রিপশন হয়। rRNA-র প্রোমোটার অঞ্চলে একটি পলিমারেজ উৎসেচক যুক্ত হয়ে ওই জিনে কিছুদূর যাবার পর দ্বিতীয় পলিমারেজ আবার প্রোমোটার অঞ্চলে যুক্ত হয়ে অগ্রসর হতে থাকলে আবার আরেকটি পলিমারেজ ওই অপেরনের প্রারম্ভে যুক্ত হয়। কোনও একটি সময়ে অন্তত ত্রিশটি পলিমারেজ অণু কার্যকর থাকে। এই প্রক্রিয়াটি ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে Hamkalo ও Miller (1973) সরাসরি দেখেছেন।

16S, 23S এবং 5S rRNA উৎপন্ন হলে বড় এককগুলির কাটছাট এবং রাসায়নিক পরিবর্তন হওয়ার পর এগুলি পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 16S rRNA প্রথমে 23S এবং 5S rRNA থেকে আলাদা হয়। এটি বিভিন্ন প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়। এরপর এর দৈর্ঘ্য হ্রাস পায় [অর্থাৎ কিছু 'বেস' (base) বাদ যায়] ও এটি মিথাইল যুক্ত হয়। 5S রাইবোসোমে কিন্তু এরকম পরিবর্তন (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য হ্রাস ও মিথাইল যুক্ত হওয়া) হয় না।

80S রাইবোসোমের বায়োজেনেসিস—

ইউক্যারিওটে 80S রাইবোসোমের বায়োজেনেসিস অপেক্ষাকৃত জটিল এবং দীর্ঘ সময় ধরে হয়। ইউক্যারিওটে রাইবোসোম উৎপাদনকারী জিনগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে

থাকে। নিউক্লিওলার অরগেনাইজারে rRNA উৎপাদনকারী DNA-র অনেকগুলি প্রতিলিপি থাকে।

রাইবোসোমীয় RNA-এর সংশ্লেষ

যেসব বিভিন্ন ধাপে rRNA-র সংশ্লেষ হয়, সেগুলি হল—

a) নিউক্লিওলার অরগেনাইজার (organizer) অর্থাৎ rDNA থেকে আদি rRNA এর ট্রান্সক্রিপশন হয়। এই আদি rRNA বেশ বড়, প্রায় 45S rRNA এর আয়তনের। ট্রান্সক্রিপশনের সময় এর কিছু অংশ, যার থেকে পরে 28S এবং 18S rRNA গঠিত হবে, তা মিথাইলযুক্ত হয়।

b) 45S rRNA এন্ডোনিউক্লিয়েজের প্রভাবে ভেঙে গিয়ে 41S ও 20S rRNA গঠন করে। 45S rRNA-র জীবন সীমা মোটামুটি পনের মিনিট।

c) এক্সোনিউক্লিয়েজের প্রভাবে 29S rRNA-র অমিথাইলযুক্ত অঞ্চল থেকে 45S rRNA গঠিত হয় এবং এটি সাইটোপ্লাজমে দ্রুত চলে আসে।

d) এক্সোনিউক্লিয়েজের প্রভাবে 41S rRNA পরপর জল বিয়োজন (dehydration) প্রক্রিয়ায় মধ্যবর্তী পদার্থ হিসাবে 36S এবং 32S rRNA তৈরি হয়। 32S rRNA থেকে পরে নিউক্লিওলাসের দানাদার অঞ্চলে 28S rRNA উৎপন্ন হয়। এই rRNA এরপর সাইটোপ্লাজমে চলে আসে।

সুতরাং, 45S rRNA ভেঙে গিয়ে 28S এবং 18S rRNA উৎপন্ন হয়ে থাকে।

5S রাইবোসোমীয় RNA এর সংশ্লেষ—

5S rRNA-এর সংশ্লেষ নিউক্লিওলাসের বাইরে হয়। এই rRNA-র সঙ্কেত বা কোড বহনকারী DNA যথেষ্ট পুনরাবৃত্তিসম্পন্ন (repetitive)। *Drosophila melanogaster*-এর 5S rRNA-র কোড একটি অটোসোমে থাকে (Pardue 1973)।

DNA-RNA সংকরণ প্রক্রিয়া থেকে জানা গেছে যে, *Xenopus laevis*-এ 18S এবং 28S rRNA-র জিনের তুলনায় 5S rRNA-র জিন অনেক বেশি সংখ্যায় (মোটামুটি 27000) থাকে (Brown ও Waber 1968)। এজন্য নিউক্লিয়াসবিহীন মিউটেশনযুক্ত *X. laevis*-এ 5S rRNA পাওয়া যায়। তবে *Drosophila*-এ 5S rRNA-র জিন এবং 28S ও 18S rRNA-র জিনের সংখ্যা মোটামুটি একই (Perry 1970)।

নিউক্লিওলার অরগেনাইজার ও রাইবোসোমীয় DNA

ইউক্যারিওটে 5.8S, 28S এবং 18S rRNA-র জিনগুলি একসাথে ক্রোমোসোমীয় নিউক্লিওলার অরগেনাইজার (NO) বা নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চলে থাকে। নিউক্লিওলাসের যে rRNA-এর সংশ্লেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় 1964 খ্রিস্টাব্দে। এই সময়ে জানা গিয়েছিল যে, উভচর *Xenopus laevis*-এর নিউক্লিওলাসবিহীন মিউটেশন rRNA উৎপাদন

করতে পারে না। এছাড়া DNA-RNA সংকরণ করে Hall ও Spiegelman (1961) বলেন যে, নিউক্লিওলাসের সাথে জড়িত DNA-তে rRNA-র কোড থাকে। *X. laevis*-এর জিনোমের 0.2% নিউক্লিওলার অরগেনাইজারে থাকে, কিন্তু 5.8S, 18S এবং 28S rRNA-এর জিনগুলির মোটামুটি 400টি প্রতিলিপি থাকে। তবে এর হেটারোজাইগাস মিউট্যান্টে স্বাভাবিকের (wild type) অর্ধেক rDNA সিস্ট্রোন থাকে। অর্থাৎ, এই *X-laevis*-এ 5.8S, 18 S এবং 28S rRNA-র প্রত্যেকটির জন্য 200টি rDNA সিস্ট্রোন থাকে। হোমোজাইগাস মিউট্যান্টে rDNA সিস্ট্রোন অনুপস্থিত।

Drosophila melanogaster-এ নিউক্লিওলার অরগেনাইজার (NO) Y বা X ক্রোমোসোমের হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের সাথে যুক্ত থাকে। সুতরাং, স্বাভাবিক পুং (XY) এবং স্ত্রীতে (XX) দু'টি করে নিউক্লিওলার অরগেনাইজার থাকে। X ক্রোমোসোমের 'NO' অঞ্চল দ্বিগুণ হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে পুরুষে (XY) তিনটি এবং স্ত্রীতে (XX) চারটি নিউক্লিওলার অরগেনাইজার থাকে। *Drosophila*-র ববড্ মিউটেশনে 'NO'-র সংখ্যা হ্রাস পায়। Ritossa (1968) বলেন যে, rDNA-এর চল্লিশটির চেয়ে কম প্রতিলিপি থাকলে *Drosophila*-র মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

নিউক্লিওলার অরগেনাইজারের (NO) মাত্রার (dose) সাথে rDNA-এর পরিমাণের সম্পর্ক রয়েছে। *Drosophila melanogaster*-এ জিনোমের 0.3% হল NO এবং 18S এবং 28S rRNA-এর জিনের 130টি প্রতিলিপি রয়েছে। যদি *Xenopus laevis, Drosophila melanogaster* এবং *E.coli*-র নিউক্লিওলার অরগেনাইজারে rDNA-এর তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যায় যে, জিনোমের বৃদ্ধির সাথে সাথে rRNA-এর জিনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তবে *Xenopus, Drosophila* এবং *E. coli*-তে জিনোম ও rRNA-এর জিনের আপেক্ষিক অনুপাত (0.2-0.4%) মোটামুটি একই থাকে।

নিউক্লিওলার অরগেনাইজারের আনবিক গঠন

a) স্যাটেলাইট রাইবোসোমীয় DNA ও স্পেসার DNA— নিউক্লিওলার অরগেনাইজারের রাইবোসোমীয় DNA-তে GC-র পরিমাণ বেশি থাকে। *Xenopus laevis*-এ বেশি GC-র (70%) উপস্থিতির জন্য অন্য DNA-র চেয়ে এই DNA-র ঘনত্ব বেশি (1.723, অন্য DNA-র 1.698) হয়। যদিও সম্পূর্ণ DNA-র কেবল 0.15-0.20% হল rDNA। এই DNA-কে স্যাটেলাইট রাইবোসোমীয় DNA বলে। স্যাটেলাইট রাইবোসোমীয় DNA-এর সাথে রেডিওআইসোটোপ দ্বারা চিহ্নিত 18S ও 28S rRNA-এর সংকরণ করে দেখা যায় যে, নিউক্লিওলার অরগেনাইজার (নিউক্লিওলাস গঠনকারী) অঞ্চলে DNA-এর বেশিরভাগ অংশ rRNA-এর পরিপূরক নয়। এই অতিরিক্ত DNA যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন একে spacer DNA নাম দেওয়া হয়েছিল।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, উভচর প্রাণীতে NO অঞ্চলের spacer DNA-র ট্রান্সক্রির্পশন হয় না।

b) rDNA এর সম্প্রসারণ— rDNA জিনের সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা হয়েছে। উভচর প্রাণীর উসাইটে নিউক্লয়াসের আয়তন 0.5μ হয় এবং এতে এক হাজার বা তার চেয়ে বেশি নিউক্লিওলাস থাকতে পারে। এই রকম জিনের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রাইবোসোমীয় RNA-র উৎপাদনও বাড়ে। যেমন, যকৃতের কোষের তুলনায় উসাইটের rRNA-র সংশ্লেষ এক লক্ষ গুণ বেশি হতে পারে।

বিভিন্ন জীবে rRNA উৎপাদনে প্রয়োজনীয় DNA-এর শতকরা হার এবং হ্যাপ্লয়েড জিনোম প্রতি rDNA-র জিনের সম্প্রসারণের পরিমাণের তালিকা (de Robertis 1975)।

জীব	DNA-র পরিমাণ	হ্যাপ্লয়েড জিনোম প্রতি rDNA জিন
Bacilus subtilis	0.38%	9-10
E. coli	0.42-0.65%	8-22
Drorophila	0.27%	130
Xenopus	0.06-0.11%	1200-3000

রাইবোসোমীয় প্রোটিনের সংশ্লেষ সম্বন্ধে দু'টি মত রয়েছে।

a) Otaka ও তাঁর সহকর্মীদের (1964) মতে, নবগঠিত rRNA নিজস্ব rRNA হিসাবে কাজ করে এবং রাইবোসোমের প্রোটিন সংশ্লেষ করে।

b) দ্বিতীয় মত অনুসারে, সাইটোপ্লাজমের রাইবোসোমে mRNA-র সাহায্যে রাইবোসোমীয় প্রোটিনের সংশ্লেষ হয়। এই মতটি বেশি সমর্থন পেয়েছে।

রাইবোসোমের উপএককগুলির সংযোগ—

নিউক্লিয়াসে উৎপন্ন রাইবোসোমের উপএককগুলি (28S, 18S ইত্যাদি) সাইটোপ্লাজমে আসে। সাইটোপ্লাজমে এই সব উপএককগুলি প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়।

সাইটোপ্লাজমীয় রাইবোসোম ও মাইটোকন্ড্রিয় রাইবোসোমের পার্থক্য ঃ

জীব	মাইটোকন্ড্রিয় রাইবোসোম	সাইটোপ্লাজমীয় রাইবোজোম
ইস্টে	1. 75S রাইবোসোম থাকে।	1. 80S রাইবোসোম থাকে।
	2. রাইবোসোমে 53S ও 35S সাবইউনিট থাকে।	2. রাইবোসোমে 60S ও 40S সাবইউনিট থাকে।
	3. রাইবোসোমীয় RNA-র 21S এবং 14S সাবইউনিট থাকে।	3. রাইবোসোমীয় RNA-র 26S এবং 18S সাবইউনিট থাকে।

জীব	মাইটোকন্ড্রিয় রাইবোসোম	সাইটোপ্লাজমীয় রাইবোজোম
Neurospara-এ		
	4. 73S রাইবোসোম থাকে।	4. 77S রাইবোসোম্‌ থাকে।
	5. 50S এবং 37S রাইবোসোমীয় সাবইউনিট থাকে।	5. 60S ও 37S উপএকক থাকে।
	6. রাইবোসোমীয় RNA-র 25S ও 19S সাবইউনিট থাকে।	6. রাইবোসোমীয় RNA 20S ও 17S সাবইউনিট থাকে।
মানুষে (Hela কোষ)		
	7. 60S রাইবোসোম থাকে	7. 14S দেখা যায়।
	8. রাইবোসোমের RNA-র 16S ও 12S সাবইউনিট থাকে।	8. রাইবোসোমের RNA-র 28S ও 18S সাবইউনিট থাকে।
	9. 45S ও 35S সাবইউনিট থাকে।	9. 60S ও 40S সাবইউনিট থাকে।

ক্লোরোপ্লাস্ট রাইবোসোম এবং সাইটোসল রাইবোসোমের পার্থক্য

ক্লোরোপ্লাস্ট রাইবোসোম	সাইটোসল রাইবোসোম
1. সেডিমেন্টেশন কোয়েফিসেন্ট (অধঃক্ষেপের গুণাঙ্ক) 70S।	1. সেডিমেন্টেশনের কোয়েফিসেন্ট হল 80S।
2. ব্যাকটিরিয়ার মত প্রোটিন সংশ্লেষের সময় ফরমাইল মেথিওনিন দ্বারা অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রারম্ভ হয়।	2. মেথিওনিন দ্বারা অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রারম্ভ হয়।
3. বড় ও ছোট সাবইউনিটের অধঃক্ষেপের গুণাঙ্ক হল 50S এবং 30S।	3. বড় ও ছোট সাবইউনিটের অধঃক্ষেপের গুণাঙ্ক হল 60S এবং 40S।
4. বড় সাবইউনিটের (উপএকক) রাইবোসোমীয় RNA-র অধঃক্ষেপের গুণাঙ্ক হল 23S, 5S ও 4.5S।	4. বড় সাবইউনিটের রাইবোসোমীয় RNA-র অধঃক্ষেপের গুণাঙ্ক হল 25S, 5.8S এবং 5S।

ক্লোরোপ্লাস্ট রাইবোসোম	সাইটোসল রাইবোসোম
5. ছোট সাবইউনিটের রাইবোসোমীয় RNA-র অধঃক্ষেপের গুণাঙ্ক হল 16S।	5. এই গুণাঙ্ক 18S।

প্লাস্টিড (Plastid)

A. Meyer (1883), F. Schmitz (1884) এবং A.F.W. Schimper এর (1885) গবেষণার ফলে প্লাস্টিড আবিষ্কৃত হয়। A.F. W. Schimper (1883) এই অঙ্গাণুর প্লাস্টিড নাম দেন। প্লাস্টিড শব্দটি গ্রীক শব্দ plastikas (=formed) থেকে এসেছে।

ক্রোমাটোফোর (Chromatophore)

নিম্নশ্রেণীর কিছু উদ্ভিদে যেমন, ব্যাকটিরিয়া, নীল সবুজ শৈবাল ও ছত্রাকে প্লাস্টিড সদৃশ যেসব অঙ্গে রঞ্জক পদার্থ থাকে, সেগুলিকে ক্রোমাটোফোর (গ্রীক- chrom-রঙ, phor-বহন করা) বলে। ক্রোমাটোফোরে রঞ্জকগুলি সমকেন্দ্রিক বলয় বা প্লেটে সাজান থাকে।

ক্রোমাটোফোর বিভিন্ন রকমের হয়।

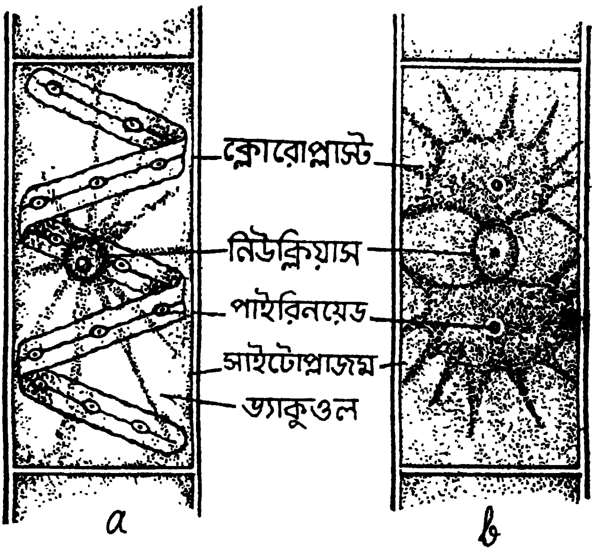
a) **ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমাটোফোর**— কোনও কোনও ব্যাকটিরিয়া, যেমন, সবুজ সালফার ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমাটোফোরে রঞ্জক ব্যাকটিরিয় ভিরিডিন থাকে। আবার পারপেল সালফার ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমাটোফোরে রঞ্জক ব্যাকটিরিয় ক্লোরোফিল থাকে। এই রঞ্জক আলোর ইনফ্রা রেড অর্থাৎ অতি লোহিত অংশ শোষণ করে।

b) **নীল-সবুজ ক্রোমাটোফোর**— নীল-সবুজ শৈবালে নীল-সবুজ ক্রোমাটোফোর থাকে। এই ক্রোমাটোফোরে ক্লোরোফিল, ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল ছাড়া নীল রঞ্জক ফাইকোসায়ানিন এবং লাল রঞ্জক ফাইকোএরিথ্রিন থাকে। শেষোক্ত দুইটি রঞ্জক সালোক সংশ্লেষে অংশ নেয়।

c) **ক্যারোটিনয়েড**— কোনও কোনও ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক, লাল রঙের ফুল ও ফলে (যেমন পাকা টমেটো, লঙ্কা ইত্যাদি) ক্যারোটিনয়েড থাকে। ক্যারোটিনয়েড রঞ্জক লাইকোপেনের উপস্থিতির জন্য পাকা টমেটো বা লঙ্কার রঙ লাল হয়। ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাকে ক্যারোটিনয়েড রঞ্জক ক্যাপস্যানথিন (capsanthin) থাকে। শৈবাল ও অন্যান্য উদ্ভিদে ক্লোরোফিলের সাথে ক্যারোটিনয়েড রঞ্জক, যেমন, ফিউকোজ্যান্থিন, জ্যান্থোফিল ও ক্যারোটিন থাকে।

উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিড দেখা যায়। তবে কিছু নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে (যেমন ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদি) প্লাস্টিড থাকে না। প্রাণীতে প্লাস্টিড পাওয়া যায় না। তবে এককোষী জীব *Euglena*-এ প্লাস্টিড থাকে। একই

প্রজাতির বিভিন্ন রকমের কোষে প্লাস্টিডের আকার, আয়তন এবং শ্রেণীর তারতম্য হয়। প্লাস্টিডের আকার বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন— গোল, ডিম্বাকৃতি, ফিতাকৃতি, চাকতির মত, জালিকাকার, পেয়ালার মত (চিত্র 35a-f) ইত্যাদি। প্লাস্টিডের ব্যাস 4-10μ ও স্থূলতা 1-3μ হয়ে থাকে। কোনও জীবের সব প্লাস্টিডকে একসাথে প্লাস্টিডোম (plastidome) বলে (Dangerd, 1920)।



চিত্র—35a-b

বিভিন্ন রকমের ক্লোরোপ্লাস্ট।

a-*Spirogyra*-এ ফিতাকৃতির, b-*Zygnema*-এ তারকাকৃতির

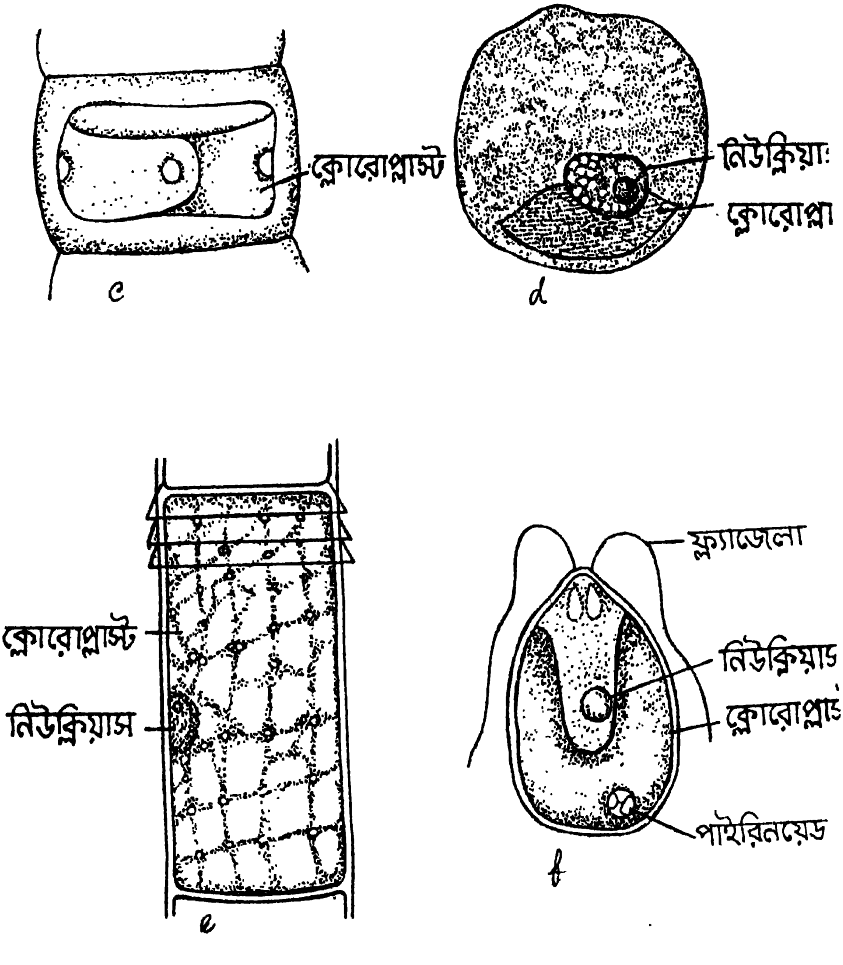
বিভিন্ন উদ্ভিদের কোষ প্রতি প্লাস্টিডের সংখ্যার তারতম্য হয়। এমনকি একই উদ্ভিদের বিভিন্ন টিস্যুতেও কোষ প্রতি ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যার পার্থক্য হতে পারে। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের পাতার কোষে অনেক ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। এরকম উদ্ভিদে 20-40টি ক্লোরোপ্লাস্ট প্রতি কোষে থাকে।

প্লাস্টিডকে Schimper কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করছেন। এই শ্রেণীগুলি হল—

1. ক্রোমোপ্লাস্ট (chromoplast)— ক্রোমোপ্লাস্ট (গ্রীক chroma-বর্ণযুক্ত, plast-সজীব) হল বর্ণযুক্ত প্লাস্টিড। এই প্লাস্টিডে বিভিন্ন রকম রঞ্জক থাকতে পারে। এগুলি আবার বিভিন্ন প্রকারের।

a) ক্লোরোপ্লাস্ট (chloroplast)— ক্লোরোপ্লাস্ট (গ্রীক- chloro - সবুজ, plast-

সজীব) হল সবুজ বর্ণের প্লাস্টিড। এই প্লাস্টিড প্রায় সব উদ্ভিদেই অর্থাৎ শৈবাল, উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ ইত্যাদিতে থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টে ক্লোরোফিল a, b, ছাড়া DNA ও RNA থাকে। ক্লোরোপ্লাস্ট সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শর্করা উৎপন্ন করে।



চিত্র—35c-f

বিভিন্ন আকৃতির ক্লোরোপ্লাস্ট c-*Ulothrix*-এ বলয়াকার, d-*Anthoceros*-এ পিণ্ডিল আকারের, e-*Oedogonium*-এ জালিকাকার, f- *Chlamydomonas*-এ পেয়ালার আকৃতির . .

b) ফিওপ্লাস্ট (phaeoplast)— ফিওপ্লাস্ট (গ্রীক phaeo বাদামী, plast-সজীব) হল বাদামী রঙের প্লাস্টিড। এই প্লাস্টিডে রঞ্জক পদার্থ ফিউকোজ্যান্থিন থাকে, যা আলো শোষণ করতে পারে। এই প্লাস্টিড বাদামী শৈবাল, ডায়াটম ও

ডিনোফ্ল্যাজেলেটে পাওয়া যায়।

c) **রোডোপ্লাস্ট** (rhodoplast)— রোডোপ্লাস্টে (গ্রীক rhode-লাল, plast-সজীব) লাল রঙের রঞ্জক ফাইকোএরিথ্রিন থাকে, যা আলো শোষণ করতে পারে। লোহিত শৈবাল রোডোফাইসীতে এই রঞ্জক থাকে।

2. **লিউকোপ্লাস্ট** (leucoplast) লিউকোপ্লাস্ট (গ্রীক - leuco - সাদা, plast-সজীব) হল বর্ণহীন প্লাস্টিড। এই প্লাস্টিডে কোনও রঞ্জক থাকে না। লিউকোপ্লাস্ট দণ্ডাকার বা গোলাকার হয়। এই প্লাস্টিড ভ্রূণের কোষে, জনন কোষে এবং ভাজক কোষে দেখা যায়। লিউকোপ্লাস্টে খাদ্য (যেমন— শ্বেতসার, স্নেহপদার্থ ও প্রোটিন) সঞ্চিত থাকে। সঞ্চিত খাদ্যের ভিত্তিতে লিউকোপ্লাস্ট বিভিন্ন প্রকারের—

a) **অ্যামাইলোপ্লাস্ট** (amyloplast)— অ্যামাইলোপ্লাস্টে (লাতিন amyl-স্টার্চ, গ্রীক- plast-সজীব) স্টার্চ সঞ্চিত থাকে। যেসব কোষে স্টার্চ সঞ্চিত হয়, সেখানে এই প্লাস্টিড পাওয়া যায়।

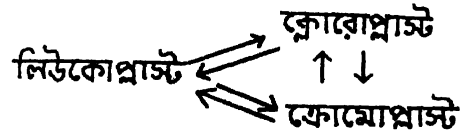
b) **ইলিওপ্লাস্ট** (elaioplast)— এই প্লাস্টিডে স্নেহপদার্থ বা লিপিড (তেল) সঞ্চিত থাকে। এরকম প্লাস্টিড একবীজপত্রী বীজে পাওয়া যায়।

c) **প্রোটিনোপ্লাস্ট** (proteinoplast বা proteoplast)— এই প্লাস্টিডে প্রোটিন সঞ্চিত থাকে। প্রোটিনোপ্লাস্ট প্রধানত বীজে (যেমন, রেড়ীর বীজে) পাওয়া যায়। এছাড়া থাইলাকয়েডে এই প্লাস্টিড থাকতে পারে (Heinrich 1966)।

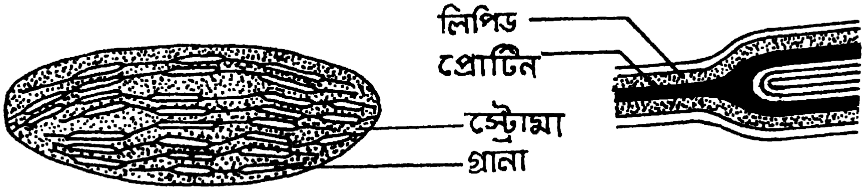
এই সব বিভিন্ন রকমের প্লাস্টিডের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। Schimper বলেন যে, এক শ্রেণীর প্লাস্টিড পরিবর্তিত হয়ে অন্য শ্রেণীর প্লাস্টিড তৈরি করতে পারে। লিউকোপ্লাস্ট থেকে ক্লোরোপ্লাস্ট বা ক্রোমোপ্লাস্ট ও ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে ক্রোমোপ্লাস্টের সৃষ্টি হতে পারে। এক শ্রেণীর প্লাস্টিড থেকে অন্য শ্রেণীর প্লাস্টিডের পরিবর্তন কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনীয় (reversible)। আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে এই রকম পরিবর্তন স্থায়ী। যেমন, আলোর অভাবে যদি ক্লোরোপ্লাস্ট যথেষ্ট হলুদ হয়ে যায়, তাহলে আলোর উপস্থিতিতেও এটি আর সবুজ না হতে পারে। ক্লোরোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্টে পরিবর্তিত হলে ক্লোরোফিল অদৃশ্য হয়। এই পরিবর্তন অপ্রত্যাবর্তনীয় হতে পারে। সুতরাং, মনে করা হয় যে, ক্রোমোপ্লাস্ট হল ক্লোরোপ্লাস্টের বিনষ্ট অবস্থা।

বিভিন্ন রকম প্লাস্টিডের পারস্পরিক সম্পর্ক নিচে দেখান হল—

প্রোপ্লাস্টিড — অপরিণত অবস্থা
↓ বৃদ্ধি ও বিকাশ
লিউকোপ্লাস্ট } *সক্রিয় অবস্থা*
ক্লোরোপ্লাস্ট } (বিপাক)
↓ বিনষ্ট
ক্রোমোপ্লাস্ট — বৃদ্ধ অবস্থা
(নিষ্ক্রিয় বিনষ্ট অবস্থা)



গঠন— একটি পরিণত ক্লোরোপ্লাস্টিডে তিনটি অংশ থাকে। এই অংশগুলি হচ্ছে— (a) সীমানা নির্দেশকারী পর্দা (membrane), (b) স্ট্রোমা (stroma), (c) গ্রানা (grana) (চিত্র 36)।



চিত্র—36

ক্লোরোপ্লাস্টের অভ্যন্তরীণ গঠন, গ্রানা ও ইন্টারগ্রানার অংশ বড় করে দেখান হয়েছে

(a) সীমানা নির্দেশকারী মেমব্রেন দুইটি স্তরযুক্ত ও মসৃণ হয়। প্রত্যেকটি স্তর 40-60Å চওড়া। এই পর্দা প্লাস্টিডে বিভিন্ন পদার্থের প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। দুইটি পর্দার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে পেরিপ্লাস্টিডিয় অঞ্চল বলে। *Nicotiana*-এ এই অঞ্চল 100-300Å চওড়া।

(b) স্ট্রোমা বা ম্যাট্রিক্স— প্রাচীরের ভিতরের এই স্বচ্ছ অংশ লাইপোপ্রোটিন দিয়ে তৈরি। স্ট্রোমায় কিছু এনজাইম থাকে। সালোকসংশ্লেষের অন্ধকার দশা স্ট্রোমায় সম্পন্ন হয়। এই দশার জন্য প্রয়োজনীয় সব উৎসেচক স্ট্রোমায় থাকে। স্ট্রোমায় DNA সূত্র (25Å স্থূল), 70S রাইবোসোম (150-200Å স্থূল) এবং RuDP কার্বক্সিলেজ অণু থাকে।

(c) গ্রানা— গ্রানা চ্যাপ্টা চাকতির আকারের। এগুলি একটির উপর আরেকটি পরপর সাজান থাকে। গ্রানার আয়তন 0.3-1.7μ। একটি প্লাস্টিডে 1-60 বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক গ্রানা থাকে। প্রাচীন ধরনের উদ্ভিদের প্লাস্টিডে উন্নত উদ্ভিদের প্লাস্টিডের তুলনায় কম সংখ্যক গ্রানা থাকে। যেমন, *Euglena*-র প্লাস্টিডে কেবল একটি গ্রানা থাকে, কিন্তু পালং-এর প্রত্যেক প্লাস্টিডে 40-60টি গ্রানা থাকে। প্রত্যেক গ্রানায় দু'টি মেমব্রেনযুক্ত ল্যামেলা (lamella) থাকে। এরকম দ্বিমেমব্রেনযুক্ত চাকতি বা ল্যামেলাকে থাইলাকয়েড (thylakoid অর্থাৎ, থলের ন্যায়) বলে। থাইলাকয়েড

দুই রকমের— ছোট ও বড়। প্রত্যেক ল্যামেলা 30-35Å স্থূল। দু'টি ল্যামেলার মধ্যে ব্যবধান 65-70Å। ল্যামেলায় 45% প্রোটিন ও 55% লিপিড পাওয়া যায় (চিত্র 36)। একটি গ্রানা অন্য গ্রানার সাথে ল্যামেলা দিয়ে যুক্ত থাকে। এই ল্যামেলাকে স্ট্রোমা ল্যামেলা বলে। প্রত্যেক গ্রানায় অনেকগুলি থাইলাকয়েড থাকে। ছোট ও পরপর সাজান থাইলাকয়েড গ্রানা ল্যামেলা এবং বড় থাইলাকয়েডগুলি স্ট্রোমা ল্যামেলা বা ইন্টারগ্রানার ল্যামেলা গঠন করে। গ্রানা প্রতি থাইলাকয়েডের সংখ্যার পার্থক্য দেখা যায়। গ্রানায় একটি থাইলাকয়েড দেখা যায় Chrysophyceae-তে এবং বহু থাইলাকয়েড সবুজ শৈবালের প্রতি কোষে থাকে। থাইলাকয়েডের (thylakoid—থলের মত) ব্যাস মোটামুটি 0.25-0.8μm। এই থাইলাকয়েডকে বেষ্টন করে যে পর্দা থাকে, তার স্থূলতা মোটামুটি 100Å (0.01μm)। Weier '66 ও অন্যান্য কিছু বিজ্ঞানীরা পার্শ্ববর্তী গ্রানার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী স্ট্রোমা ল্যামেলাকে ফ্রেট (fret) নামে অভিহিত করেছেন।

গ্রানা ল্যামেলা ও স্ট্রোমা ল্যামেলার উৎপত্তি একই রকম। Steinmann ও Sjostrand-এর (1995) মতে, গ্রানা ল্যামেলা বর্ধিত হয়ে স্ট্রোমা ল্যামেলা হয়। তাঁরা দেখেন যে, গ্রানা ল্যামেলা স্ট্রোমা ল্যামেলার তুলনায় স্থূল। স্ট্রোমা ল্যামেলা 3mm এবং গ্রানা ল্যামেলা 6.5 nm স্থূল।

সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, গ্রানার ল্যামেলার ভিতরের ত্বকে কিছু দানা আছে। এই দানাগুলিকে Park (1963) কোয়ান্টোসোম (quantosome) নাম দিয়েছেন। এগুলি 185Å লম্বা, 155Å চওড়া এবং 100Å স্থূল। কোয়ান্টোসোমের আণবিক ওজন 2 মিলিয়ন এবং এর মধ্যে 230টি ক্লোরোফিল অণু থাকতে পারে। কোয়ান্টোসোমকে সালোকসংশ্লেষের একক বলা হয়, কারণ একটি কোয়ান্টোসোম এক মোল কোয়ান্টাম আলো শোষণ করতে পারে। স্ট্রোমা ল্যামেলাতেও কোয়ান্টোসোম থাকতে পারে, তবে এখানে কোয়ান্টোসোমের সংখ্যা গ্রানা ল্যামেলার তুলনায় অনেক কম হয়।

থাইলাকয়েডের পর্দায় চার রকম দানা থাকে (Arntzen ও Armond 1977)।

a) অপেক্ষাকৃত বড় ও দূরে দূরে রঞ্জক তন্ত্র II (পিগমেন্ট সিস্টেম II) বা PS II-র দানা থাকে। এই দানার কোয়ান্টোসোম থাইলায়েডের পর্দার এক্সোপ্লাজমীয় ত্বকের কাছে থাকে।

b) অপেক্ষাকৃত ছোট ও মোটামুটি কাছে কাছে পিগমেন্ট সিস্টেম I বা PSI এর দানাগুলি থাকে।

c) সংযোগকারী ফ্যাক্টর বা coupling factor I বা CFI দানাগুলি গোলাকার ও 90Å ব্যাসযুক্ত। এই দানাগুলি থাইলাকয়েডের পর্দার বাইরের দিকে থাকে। CFI হল ক্লোরোপ্লাস্টের ATPase।

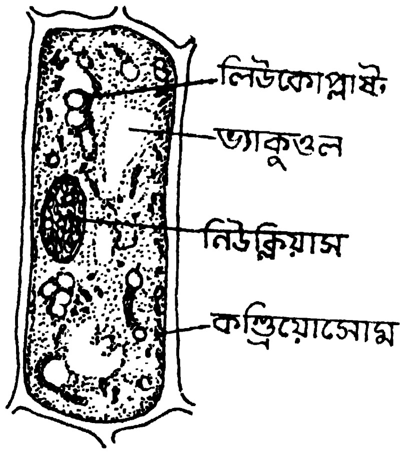
d) থাইলাকয়েডের পর্দার বাইরের দিকে উৎসেচক রাইবুলোজ ডাইফসফেট

(RuDP) কার্বক্সিলেজ থাকে।

বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল—

a) লিউকোপ্লাস্ট (leucoplast)— লিউকোপ্লাস্ট বর্ণহীন ও স্বচ্ছ। যেসব কোষ সূর্যালোক পায় না, সেইখানে লিউকোপ্লাস্ট দেখা যায়। ভ্রূণ কোষে (embryonic cell), জনন কোষে, ভাজক (meristematic) কোষে এবং অপরিণত কোষে লিউকোপ্লাস্ট পাওয়া যায়।

গঠন— লিউকোপ্লাস্ট গোল, লম্বাটে বা অনিয়মিত আকারের হয় (চিত্র 37a)। এখানে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ (fat) সঞ্চিত হয়।



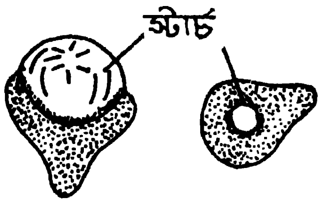
চিত্র—37a

রাই-এ লিউকোপ্লাস্ট

কাজ— আলুর যেসব লিউকোপ্লাস্ট হেক্সোজ শর্করাকে স্টার্চে পরিবর্তিত করে এবং স্টার্চ সঞ্চয় করে, তাদের অ্যামাইলোপ্লাস্ট (amyloplast) বলে (চিত্র 37a)। যেসব লিউকোপ্লাস্ট স্নেহ জাতীয় পদার্থ সঞ্চিত করে, তাদের ইলিওপ্লাস্ট (elioplast) বলে। যেসব লিউকোপ্লাস্ট প্রোটিন সঞ্চয় করতে পারে, তাদের অ্যালিউরোন দানা (aleurone grain) বা অ্যালিউরোপ্লাস্ট (aleuroplast) বলা হয়।

অ্যামাইলোপ্লাস্টিডের সাথে প্রোপ্লাস্টিডের যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। কেবল অ্যামাইলোপ্লাস্টে তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক ল্যামেলা থাকে। আলোর উপস্থিতিতে অ্যামাইলোপ্লাস্টও থাইলাকয়েড গঠন করতে পারে।

অ্যামাইলোপ্লাস্টে স্টার্চ দীর্ঘ সময় সঞ্চিত থাকে, সেজন্য এই স্টার্চকে reserved starch বলে। ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমা অঞ্চল কখনও কখনও স্বল্প সময়ের জন্য স্টার্চ সঞ্চিত করতে পারে। এরকম স্টার্চকে transitory স্টার্চ বলে। অ্যামাইলোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় স্টার্চ উৎপন্ন হতে শুরু করে। এরকম অ্যামাইলোপ্লাস্টে অনেক টিউবিউলি ও থাইলাকয়েড থাকে। স্টার্চের বৃদ্ধির সাথে সাথে টিউবিউলিগুলি প্রাচীরের সাথে লেগে যায়। স্টার্চের পরিমাণ আরো বেড়ে গেলে প্রাচীর ফেটে যায় ও পরিশেষে এগুলি শুকিয়ে যায়।



37b

অ্যামাইলোপ্লাস্ট

b) ক্লোরোপ্লাস্ট (chloroplast)— গাছের যেসব অংশে সূর্যের আলো পড়ে, সেখানে ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা যায়। ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতি বিভিন্ন রকমের হয় (চিত্র 35a-f)। ক্লোরোপ্লাস্টে যেসব বর্ণ থাকে সেগুলি হল— ক্লোরোফিল (chlorophyll) 'a', ক্লোরোফিল 'b', ক্যারোটিন (carotene) এবং জ্যান্থোফিল (xanthophyll)। এই বর্ণগুলি গ্রানায় থাকে। গ্রানাগুলি বর্ণহীন স্ট্রোমার মধ্যে অবস্থিত। কোনও কোনও উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টে পাইরিনয়েড (pyrenoid) থাকে। পাইরিনয়েডগুলি প্রোটিন দিয়ে তৈরি ও সাধারণত এর চারিদিকে স্টার্চের স্তর থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানার সংখ্যা দশ থেকে কয়েকশ' পর্যন্ত হয়।

বিভিন্ন কোষে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যার তারতম্য হয়। কোনও কোনও উদ্ভিদ— যেমন *Zygnema*-তে প্রতি কোষে দু'টি ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। *Chlomydomonas*, *Ulothrix* ও অন্যান্য কোনও কোনও উদ্ভিদে একটা কোষে একটা মাত্র ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। *Recinus communis*-এর একটা কোষে 400000 পর্যন্ত ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

পাইরিনয়েড এবং স্টিগমা বা চক্ষুবিন্দু

কিছু শৈবাল ও ফ্ল্যাজেলেটে পাইরিনয়েড ও স্টিগমা বা চক্ষুবিন্দু দেখা যায়। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টে এগুলি দেখা যায় না। পাইরিনয়েড অঞ্চল দানাদার বা সূত্রাকার। এই অঞ্চলে অল্প কয়েকটি (একটি বা দু'টি থাইলাকয়েড) ল্যামেলা থাকে।

এগুলি সমান্তরালভাবে থাকে না। পাইরিনয়েডে পলিস্যাকারাইড স্টার্চ বা প্যারামাইলন দানা হিসাবে সঞ্চিত হয়।

চক্ষু বিন্দু বা স্টিগমা আলোক সংবেদনশীল। চক্ষু বিন্দু হলুদ বা লাল রঙের। চক্ষু বিন্দুতে সম আকৃতির ক্যারোটিন দানা এক বা কয়েকটি স্তরে সাজান থাকে। বিভিন্ন স্তরগুলি পর্দা দিয়ে পৃথক থাকে। এই পর্দা ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েডের সাথে যুক্ত থাকে। *Chlamydomonas, Volvox, Eudorina* ইত্যাদি শৈবালে চক্ষু বিন্দু দেখা যায়।

ক্লোরোপ্লাস্টে মিউটেশন— মিউটেশনের ফলে প্লাস্টিড পরিবর্তিত হতে পারে। von Wattstein (1956) বলেন যে, স্বাভাবিক বার্লিতে সুগঠিত গ্রানা ও স্ট্রোমা থাকে। কিন্তু অ্যালবিনো মিউটেশনযুক্ত বার্লিতে সুগঠিত গ্রানা ও স্ট্রোমা থাকে না। হলদে-সবুজ মিউটেশনযুক্ত বার্লিতে এই দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থা দেখা যায়।

রাসায়নিক গঠন— ক্লোরোপ্লাস্টে সাধারণতঃ 50% জল থাকে। গ্রানায় প্রোটিন ও লিপিড ছাড়া বিভিন্ন অজৈব পদার্থ যেমন, ক্যালসিয়াম, লোহা, তামা ও দস্তা থাকতে পারে।

ক্লোরোপ্লাস্টের শুষ্ক ওজনে যেসব উপাদান থাকে সেগুলি হল— প্রোটিন (35-55%), লিপিড (20-30%), ক্লোরোফিল (75% a, 25% b) (9%), ক্যারোটিনয়েড (75%), জ্যান্থোফিল (25%), অ্যারোটিন (4.5%) কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার (3-7%) এবং নিউক্লিক অ্যাসিড (RNA 3-4% এবং DNA 0.02-0.01%), সাইটোক্রোম f (0.1%), ভিটামিন K (0.004%), ভিটামিন E (0.08%), Mg, Cu, Mn, Fe, Zn, P সামান্য।

ক্লোরোপ্লাস্টে DNA ও RNA পাওয়া যায়। বিভিন্ন উদ্ভিদের (যেমন, *Chlamydomonas Euglena*, তামাক, পালং ইত্যাদি) ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় DNA ও RNA-র উপস্থিতি লক্ষ্য করা হয়েছে। ক্লোরোপ্লাস্টের DNA বলয়াকার ও দ্বিসূত্রযুক্ত। DNA সূত্রের ব্যাস সাধারণত 25Å হয়। কোষের মোট DNA-র খুব সামান্যই ক্লোরোপ্লাস্টে থাকে। তবে এই DNA শতাধিক জিনের সংকেত বহন করে। নিউক্লিয় DNA-র তুলনায় ক্লোরোপ্লাস্টের DNA-তে অ্যাডিনিন ও থাইমিনের পরিমাণ বেশি থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের DNA স্বজননশীল এবং মেসেঞ্জার RNA উৎপাদন করতে পারে। ক্লোরোপ্লাস্টের বেশিরভাগ RNA-ই ক্লোরোপ্লাস্টের DNA থেকে তৈরি হয়। এরকম RNA-তে নিউক্লিও RNA-র তুলনায় অ্যাডিনিন ও গুয়ানিনের অনুপাত বেশি হয়। ক্লোরোপ্লাস্টে DNA, DNA পলিমারেজ, RNA পলিমারেজ এবং প্রোটিন সংশ্লেষকারী এনজাইমগুলি থাকে।

ক্লোরোপ্লাস্টে রাইবোসোম থাকে। এই রাইবোসোম সাইটোপ্লাজমের রাইবোসোমের তুলনায় ছোট। ক্লোরোপ্লাস্টের রাইবোসোম 70S ধরনের এবং ব্যাকটিরিয়ার রাইবোসোমের অনুরূপ। ক্লোরোপ্লাস্টের রাইবোসোমের উপএককগুলি

হ'ল 16S rRNA এবং 23S rRNA। ক্লোরোপ্লাস্টে পলিরাইবোসোমও দেখা গেছে। ক্লোরোপ্লাস্টে অ্যামিনোঅ্যাসাইল tRNA, মিথিয়নিল tRNA এবং অ্যামিনোঅ্যাসাইল tRNA সিন্থেটেজ পাওয়া যায়।

সেন্ট্রিফিউজ করে ক্লোরোপ্লাস্ট আলাদা করা যায়। R. J. Ellis পৃথকীকৃত (isolated) ক্লোরোপ্লাস্টে প্রোটিন সংশ্লেষ লক্ষ্য করেন। যেসব প্রোটিন ক্লোরোপ্লাস্টে উৎপন্ন হয় সেগুলি হল— (a) ফ্র্যাকশন-I প্রোটিনের বড় উপএকক (subunit), (b) আভ্যন্তরীণ ল্যামেলার পাঁচ রকম প্রোটিন এবং (c) দুই থেকে তিন রকমের আবরণী (envelope) পলিপেপটাইড। দেখা গেছে যে ফ্র্যাকশন 1 প্রোটিনের বড় উপএকক ক্লোরোপ্লাস্ট DNA-র প্রভাবে তৈরি হয়, কিন্তু এর ছোট উপএকক সাইটোপ্লাজমে নিউক্লিও DNA-র প্রভাবে তৈরি হয়। পরে ছোট সাবইউনিটটি ক্লোরোপ্লাস্টে আসে ও বড় সাবইউনিটের সাথে যুক্ত হয় ও সম্পূর্ণ ফ্র্যাকশন 1 প্রোটিন তৈরি করে।

ক্লোরোপ্লাস্টের সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক

তিন রকমের সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পাওয়া যায়। এগুলি হল ক্লোরোফিল, ক্যারোটিন এবং ফাইকোবিলিন। সব সালোকসংশ্লেষকারী কোষে এক বা একাধিক ধরনের ক্লোরোফিল ও ক্যারোটিন থাকে। কিন্তু ফাইকোবিলিন নীল সবুজ শৈবাল ও লোহিত শৈবালে থাকে।

a) **ক্লোরোফিল**— ক্লোরোফিল হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক। একটি ক্লোরোফিল অণুতে কার্বন ও নাইট্রোজেনযুক্ত চারটি রিঙ একসাথে একটি পরফাইরিন (porphyrin) রিঙ গঠন করে। এর কেন্দ্রে একটি ম্যাগনেসিয়াম অণু থাকে। ক্লোরোফিল অণুর একদিকে কার্বন ও হাইড্রোজেন অণু দিয়ে গঠিত দীর্ঘ ফাইটল শৃঙ্খল থাকে।

ক্লোরোফিল বিভিন্ন রকমের হয়। এসব ক্লোরোফিলের গঠনে সামান্য পার্থক্য থাকে। শৈবাল ও উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে ক্লোরোফিল a থাকে। সবুজ শৈবাল ও উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে এছাড়া ক্লোরোফিল b থাকে। বাদামি শৈবাল, ডায়াটম, ডিনোফ্ল্যাজেলেটে ক্লোরোফিল c থাকে। ক্লোরোফিল d পাওয়া যায় লোহিত শৈবালে।

b) **ক্যারোটিনয়েড** — এই রঞ্জকও সালোকসংশ্লেষে অংশ গ্রহণ করে। এই হলুদ বা কমলা রঙের রঞ্জক ক্লোরোফিলের সাথে থাকে। এজন্য পাতায় এই রঞ্জকের উপস্থিতি সহজে বোঝা যায় না, তবে শরৎকালে কখনও কখনও যখন ক্লোরোপ্লাস্ট বিনষ্ট হয়, তখন ক্যারোটিনয়েডের উপস্থিতি বোঝা যায়। ক্যারোটিনয়েডে দুইটি ছয় কার্বনযুক্ত রিঙকে সংযোগকারী কার্বন অণুর একটি শৃঙ্খল থাকে। সালোকসংশ্লেষে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি ক্যারেটিনয়েড হল— ক্যারোটিন এবং ক্যারোটিনল।

c) **ফাইকোবিলিন**— প্রোক্যারিওটিক নীল সবুজ শৈবাল এবং ইউক্যারিওটিক লোহিত শৈবালে এই রঞ্জক থাকে। এই রঞ্জক নির্দিষ্ট প্রোটিনের সাথে যুক্ত থাকে। লোহিত শৈবালের এই রঞ্জক হল ফাইকোএরিথ্রিন। এটি লাল রঙের। নীল সবুজ

শৈবালে নীল রঙের ফাইকোসায়ানিন থাকে। ফাইকোবিলিনে মুক্ত শৃঙ্খলযুক্ত পরফাইরিন রিঙ থাকে।

কাজ— ক্লোরোপ্লাস্টের উপস্থিতিতে উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষ (photosynthesis) হয়। ক্লোরোপ্লাস্টে কিছু প্রোটিন সংশ্লেষ হয়।

a) সালোকসংশ্লেষ — ক্লোরোপ্লাস্টের সবুজ রঞ্জক ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে আলোক শক্তি ব্যবহার করে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল থেকে শর্করা ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow[\text{আলো}]{\text{ক্লোরোফিল}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন জৈব পদার্থ উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা, মূল, ফুল, ফল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। আবার এসব জৈব পদার্থ উদ্ভিদ থেকে প্রাণী দেহে যায়, যখন ওই সব প্রাণী খাদ্য হিসাবে উদ্ভিদ গ্রহণ করে। সুতরাং, জীবের বেঁচে থাকার জন্য সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার একান্ত প্রয়োজন, এবং এর জন্য ক্লোরোপ্লাস্টের উপস্থিতি অপরিহার্য।

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া দু'টি পর্যায়ে হয়। এই দু'টি দশা হ'ল— আলোক দশা ও অন্ধকার দশা।

আলোক দশা— সালোকসংশ্লেষের প্রাথমিক পর্যায় হ'ল আলোক দশা বা আলোক রাসায়নিক দশা। আলোক দশায় জল বিশ্লিষ্ট হয় (photolysis)। আলোক রাসায়নিক দশার দু'টি সুস্পষ্ট পর্যায় আছে। শৈবাল নিয়ে গবেষণা করে Emerson বলেন যে, আলোক দশায় দু'টি রঞ্জক তন্ত্র বা pigment system রয়েছে ও দু'টি আলোক বিক্রিয়া দেখা যায়।

সালোকসংশ্লেষের একক— ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েডের পর্দায় বিভিন্ন রকম রঞ্জক থাকে। এসব বিভিন্ন রঞ্জক যেমন, ক্যারোটিনয়েড, ক্লোরোফিল b ইত্যাদি আলোক গ্রহণ করতে পারে। তবে এই আলোক শক্তি ক্লোরোফিল a-তে স্থানান্তরিত করে। সেজন্য ক্লোরোফিল a-কে বিক্রিয়ার কেন্দ্র বা centre বলে। যেসব অতিরিক্ত (acessory) রঞ্জক আলোক গ্রহণ করে ক্লোরোফিলে a-তে স্থানান্তরিত করে, তাদের অ্যানটেনা (antenna) অণু বা অ্যানটেনা রঞ্জক বলে।

ক্লোরোফিল a বিভিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে। ক্লোরোফিল a_I এর সর্বোচ্চ শোষণ দেখা যায় 700mμ অঞ্চলে, সেজন্য একে P_{700} বলে। ক্লোরোফিল a_{II}র সর্বোচ্চ শোষণ (absorption) দেখা যায় 690mμ অঞ্চলে, সেজন্য একে P_{690} বলে। প্রথম রঞ্জক তন্ত্রে বা pigment system I -এ P_{700} হল সক্রিয় ক্লোরোফিল এবং দ্বিতীয় রঞ্জক তন্ত্রে (pigment system II-এ) P_{690} হল সক্রিয় ক্লোরোফিল।

প্রথম রঞ্জক তন্ত্র বা pigment system I (PSI) এবং দ্বিতীয় রঞ্জক তন্ত্র

থাইলাকয়েডের পর্দায় সংঘটিত হয়।

প্রত্যেক PSI এককে দুইশটি ক্লোরোফিল a অণু এবং পঞ্চাশটি ক্যারোটিন অণু থাকে। প্রত্যেক PSII এককে, দুইশটি ক্লোরোফিল a অণু, দুইশটি ক্যারোটিন অণু, ক্লোরোফিল b, ক্লোরোফিল c, d অণু থাকতে পারে। প্রজাতির ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন রঞ্জকের উপস্থিতি ও পরিমাণের তারতম্য হয়।

রঞ্জকতন্ত্র I (pigment system I বা PSI)

ক্লোরোফিল a_1র (P_{700}) একটি অণু আলোর একটি কোয়ান্টাম শোষণ করে সক্রিয় হয় এবং এর থেকে একটি ইলেকট্রন অণু নির্গত হয়। এই ইলেকট্রন প্রথম গ্রহণ করে X অণু। এর থেকে বিভিন্ন ইলেকট্রন বাহকের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন যায়। পরিশেষে প্রান্তিয় ইলেকট্রন গ্রহণকারী পদার্থ NADP ইলেকট্রন গ্রহণ করে। X অণু থেকে ইলেকট্রন যথাযথ ফেরডক্সিন, ফেরডক্সিন NADP রিডাকটেজের মাধ্যমে NADP-তে যায়। NADP ইলেকট্রন গ্রহণ করার পর এটি H^+ সাথে বিক্রিয়া করে NADPH গঠন করে। জলের photolysis-এর ফলে উৎপন্ন দু'টি H^+ দু'টি NADPH অণু গঠন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, দুই কোয়ান্টাম আলো দু'টি ক্লোরোফিল অণুকে সক্রিয় করে এবং এর থেকে উৎপন্ন দু'টি ইলেকট্রন দু'টি NADP অণু গ্রহণ করে ও দুই অণু NADPH গঠিত হয়।

2 ক্লোরোফিল a_1 $2e^- \rightarrow 2\ X\ 2e^- \rightarrow$ 2 ফেরডক্সিন $\xrightarrow{2e}$ 2 ফেরডক্সিন NADP রিডাকটেজ
বা P_{700}

$$2e^- \rightarrow 2NADP^- + 2H^+ \rightarrow 2\ NADPH$$

রঞ্জকতন্ত্র II (PS II)– আলোর ফোটন কণা ক্লোরোফিল a_{II} বা P_{690}-কে সক্রিয় করে। এই আলোক শক্তি জলকে জারিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন PS_{II} আলোর দুই কোয়ান্টাম শোষণ করে, তখন এক অণু জল থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় এবং দুইটি হাইড্রোজেন আয়ন এবং অক্সিজেন ($^1/_2\ O_2$) উৎপন্ন হয়। জলের এই বিশ্লেষককে photolysis বলে। জলের ফটোলাইসিসের জন্য Mn^{++}-এর উপস্থিতি প্রয়োজন।

ফটোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলি হল—

$$2H_2O \rightarrow 2H^+ + 2OH^-$$
$$2OH^- \rightarrow 2\ (OH) + 2e^-$$
$$\underline{2(OH) \rightarrow H_2O + {}^1/_2\ O_2}$$
$$H_2O\ \ -2H^+ + 2e^- + {}^1/_2\ O_2$$

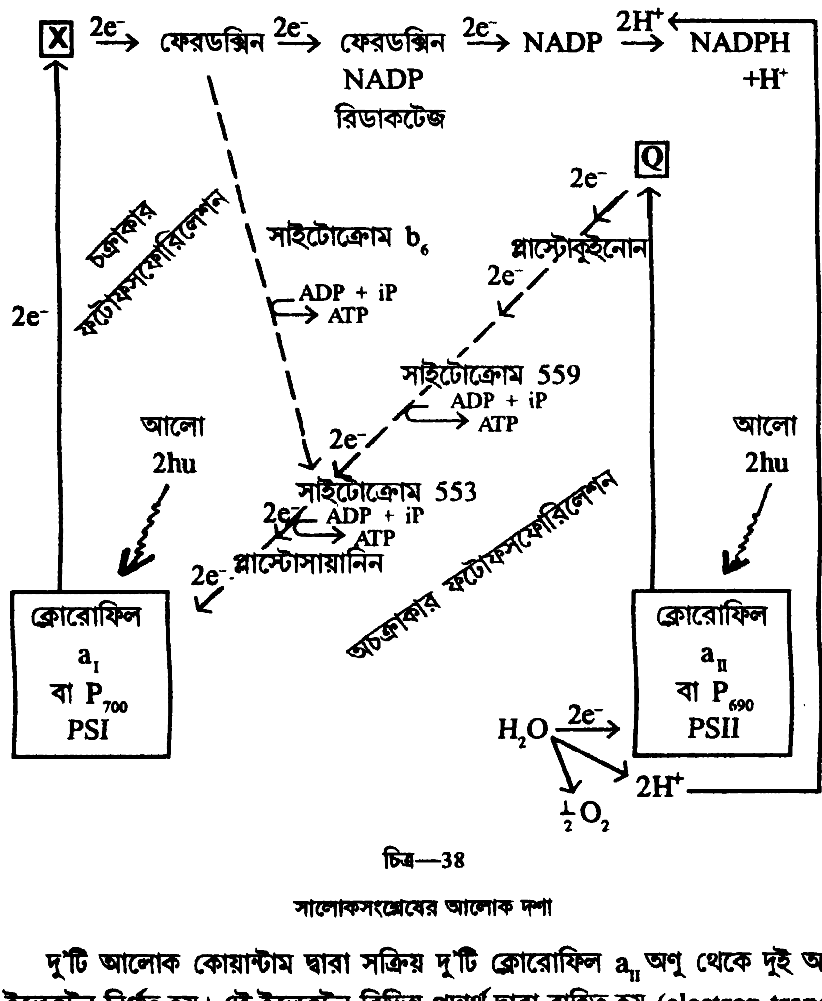
হিল বিক্রিয়া — 1934 খ্রিস্টাব্দে Robin Hill দেখেন যে, মুক্ত ক্লোরোপ্লাস্ট জলে হাইড্রোজেন গ্রহণকারী পদার্থের উপস্থিতিতে এবং আলোর সহায়তায় অক্সিজেন নির্গত করে। এই পরীক্ষায় হাইড্রোজেন গ্রহণকারী পদার্থ (A) হিসাবে ফেরিক লবণ ব্যবহার করা হয়েছিল।

$$4H_2O + 4A \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} 2H_2O + O_2 + 4\ [H]\ A$$

এই বিক্রিয়াকে হিল বিক্রিয়া বলে।

ভারী জল (H_2O^{18}) ব্যবহার করে দেখা গেছে যে, O_2^{18} নির্গত হচ্ছে। সুতরাং, বলা যায় যে, সালোকসংশ্লেষে নির্গত অক্সিজেনের উৎস হল জল।

$$H_2O + 2NADP + 2ADP + 2Pi \xrightarrow{4hv} \frac{1}{2}O_2 + 2NADPH + 2ATP$$



চিত্র—38

সালোকসংশ্লেষের আলোক দশা

দু'টি আলোক কোয়ান্টাম দ্বারা সক্রিয় দু'টি ক্লোরোফিল a_{II} অণু থেকে দুই অণু ইলেকট্রন নির্গত হয়। এই ইলেকট্রন বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা বাহিত হয় (electron transport chain)। ইলেকট্রন গ্রহণকারী পদার্থ Q থেকে চার রকম ইলেকট্রন বাহকের

(carrier) মাধ্যমে ইলেকট্রন বাহিত হয়ে PSI-এ যায় ও ওই খানের ইলেকট্রন ঘাটতি পূরণ করে। এসব ইলেকট্রন বাহকগুলি হল — প্লাস্টোকুইনোন (plastoquinone), সাইটোক্রোম 559, সাইটোক্রোম 553 (বা সাইটোক্রোম f) এবং প্লাস্টোসায়ানিন। Q হল এক ধরনের কুইনোন, যা প্রতিপ্রভার সৃষ্টি করে। প্লাস্টোকুইনোন থেকে প্লাস্টোসায়ানিন পর্যন্ত ইলেকট্রন স্থানান্তরণের সময় একটি বা দু'টি ধাপে ADP এবং অজৈব ফসফেট থেকে ATP উৎপন্ন হয়। ইলেকট্রন স্থানান্তরণের সময় নির্গত শক্তি এই ATP-তে সঞ্চিত থাকে। এই প্রক্রিয়াকে ফটোফসফোরিলেশন (photophosphorylation) বলে। সাইটোক্রোম b_6 ফটোফসফোরিলেশনের সাথে যুক্ত।

2 ক্লোরোফিল $a_{II} \xrightarrow{2e^-}$ 2Q $\xrightarrow{2e^-}$ 2 প্লাস্টোকুইনোন বা P_{690}

$\xrightarrow{2e^-}$ 2 সাইটোক্রোম 559 $\xrightarrow{2e^-}$ সাইটোক্রোম 553
ADP + iP ATP

$\xrightarrow{2e^-}$ প্লাস্টোসায়ানিন $\xrightarrow{2e^-}$ ক্লোরোফিল a_I
ADP + ip ATP

সমগ্র আলোক বিক্রিয়া হল—

$$H_2O + 2NADP + 2ADP + 2Pi \xrightarrow{4hv} {}^1/_2 O_2 + 2\ NADPH + 2ATP$$

অচক্রাকার (non-cyclic) ফটোফসফোরিলেশন এবং চক্রকার (cyclic) ফটোফসফোরিলেশন

PSI এবং PSII-এ দেখা গেছে যে, ক্লোরোফিল থেকে নির্গত ইলেকট্রন আবার ওই ক্লোরোফিলে ফিরে আসে না। PSII থেকে নির্গত ইলেকট্রন বিভিন্ন পদার্থ (প্লাস্টোকুইনোন, সাইটোক্রোম 559, সাইটোক্রোম 553 ও প্লাস্টোসায়নিন) দ্বারা বাহিত হয়ে PSI-এ যায়। এই প্রক্রিয়ায় দুই অণু ATP উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াকে অচক্রাকার ফটোফসফোরিলেশন বা non-cyclic photophosphorylation বা non-cyclic electron transport বলে।

তবে কখনও কখনও ক্লোরোফিল অণু থেকে নির্গত ইলেকট্রন পুনরায় ওই ক্লোরোফিলে ফিরে আসে। ওই প্রক্রিয়াকে চক্রাকার ফটোফসফোরিলেশন বা cyclic photophosphorylation বা cyclic electron transport বলে।

PSI থেকে নির্গত ইলেকট্রন ফেরডক্সিন থেকে সাইটোক্রোম b_6-এর মাধ্যমে সাইটোক্রোম 553 ও প্লাস্টোসায়ানিন হয়ে আবার P_{700}-এ ফিরে আসে। সাইটোক্রোম b_6 থেকে সাইটোক্রোম 553-এ ইলেকট্রন স্থানান্তরণের সময় এক অণু ATP উৎপন্ন হয়। আরেকটি ATP উৎপন্ন হয় সাইটোক্রোমে 553 থেকে প্লাস্টোসায়ানিনে ইলেকট্রন

স্থানান্তরণের সময়। এই চক্রাকার ফটোফসফোরিলেশনে NADPH এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয় না। জলের ফটোলাইসিস এবং দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র দেখা যায় না।

অন্ধকার দশা (dark phase)

অন্ধকার দশা ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমা অঞ্চলে বিভিন্ন উৎসেচকের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপগুলির বিবরণ চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী Melvin Calvin ও তাঁর সহকর্মী James Bassham ও Andrew Benson দিয়েছিলেন। এজন্য এই বিক্রিয়াগুলির চক্রকে Calvin-Benson-Bassham চক্র অথবা Calvin চক্র বলে। এই বিক্রিয়ার উৎসেচকগুলি সনাক্ত করেন E. Racker ও B. Horecker। (এককোষী শৈবাল *Chlorella* এবং $C^{14}O_2$ ব্যবহার করে Calvin ও তাঁর সহকর্মীরা দেখেন কার্বন ডাই-অক্সাইড কোষের রাইবুলোজ ডাইফসফেটের সাথে বিক্রিয়া করে প্রথমে ছয় কার্বনযুক্ত অস্থায়ী শর্করা গঠন করে, যার থেকে পরে তিন কার্বনযুক্ত স্থায়ী ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় উৎসেচক কার্বক্সিডিসমিউটেজ প্রয়োজন। আলোক দশায় উৎপন্ন ATP এবং NADPH অন্ধকার দশায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিজারণের জন্য প্রয়োজন। ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড ATP ও NADPH-র সাথে বিক্রিয়া করে ফসফোগ্লিসারেলডিহাইড, ADP, NADP ও ফসফোরিক অ্যাসিড গঠন করে। ফসফোগ্লিসারেলডিহাইড অ্যালডোলেজের উপস্থিতিতে ফ্রুকটোজ 1,6 ডাইফসফেট উৎপন্ন করে। ফ্রুকটোজ 1,6 ডাইফসফেট ADP-র সাথে বিক্রিয়া করে ফ্রুকটোজ- 6 - ফসফেট এবং ATP গঠন করে। এর থেকে গ্লুকোজ - 6 - ফসফেট উৎপন্ন হয়।

$$\text{RuDP} + CO_2 \xrightarrow{\text{Carboxy dismutase}} 2\ \text{PGA}$$

$$\text{PGA} + \text{ATP} \longrightarrow 1{,}3\ \text{di PGA} + \text{ADP}$$

$$1{,}3\ \text{diPGA} + \text{NADPH} + H^+ \longrightarrow \text{PGAld} + \text{NADP} + H_3PO_4$$

$$\text{PGAld} \xrightarrow{\text{aldolase}} \text{Fructose 1,6 diphosphate}$$

$$\text{Frictose 1,6 diphosphate} + \text{ADP} \longrightarrow \text{Fructose 6 - phosphate} + \text{ATP}$$

$$\text{Fructose 6 - phosphate} \longrightarrow \text{Glucose - 6 - phosphate}$$

$$\text{Glucose 6 - phosphate} + \text{ADP} \longrightarrow \text{Glucose} + \text{ATP}$$

ফ্রুক্টোজ ডাইফসফেটের কিছু অণু গ্লুকোজ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়' গ্লুকোজ থেকে পরে স্টার্চ বা সেলুলোজ উৎপন্ন হয়। বারো অণু ফসফোগ্লিসারেলডিহাইডের কেবল দুই অণু ফ্রুক্টোজ ডাইফসফেট উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাকী দশ অণু RuDP-র পুনরুৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে কেলভিন চক্র ছাড়া অন্য পথেও কার্বন ডাই-অক্সাইডের স্থিতিকরণ হয়।

Hatch ও Slack এর পথ বা C_4 ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিডের পথ — 1966 খ্রিস্টাব্দে Hatch ও Slack দেখেন যে, কার্বন ডাই-অক্সাইড ফসফোএনোল পাইরুভেটের (PEP) সাথে বিক্রিয়া করে একটি চার কার্বনযুক্ত মধ্যবর্তী পদার্থ গঠন করে। এই পদার্থটি হল অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড (OAA)। এর থেকে ম্যালিক অ্যাসিড এবং অ্যাসপারটিক অ্যাসিড ইত্যাদি চার কার্বনযুক্ত অ্যাসিড গঠনের পরে 3 ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (PGA) উৎপন্ন হয়।

2. **প্রোটিন সংশ্লেষ** — ক্লোরোপ্লাস্টের DNA ক্লোরোপ্লাস্টের mRNA, tRNA, rRNA এবং রাইবোসোমীয় প্রোটিনের 'কোড' বা সংকেত বহন করে। এছাড়া থাইলাকয়েডের পর্দার কোনও কোনও প্রোটিনের 'কোড'ও ক্লোরোপ্লাস্টের DNA-তে থাকে। তবে ক্লোরোপ্লাস্টের অন্যান্য উপাদান, যেমন— ক্লোরোফিল, ক্যারোটিন এবং জ্যান্থোফিল, স্নেহপদার্থ, সালোকসংশ্লেষকারী ও স্টার্চ উৎপাদনকারী উৎসেচক এবং ইলেকট্রন স্থানান্তরণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি নিউক্লিও জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।

ক্লোরোপ্লাস্টের প্রোটিন সংশ্লেষে ব্যাকটিরিয়া এবং মাইটোকন্ড্রিয়ার মত ক্লোরামফেনিকল দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়। *Euglena*-র ক্লোরোপ্লাস্টের 70s রাইবোসোমের স্থায়িত্বের জন্য Mn^{++}-এর প্রয়োজন। ব্যাকটিরিয়ার মত *Euglena*-র ক্লোরোপ্লাস্টে প্রোটিন সংশ্লেষের প্রারম্ভিক শৃঙ্খল গঠন (chain initiation) প্রক্রিয়ায় N-ফরমাইল মিথিয়নিল - tRNA-র প্রয়োজন।

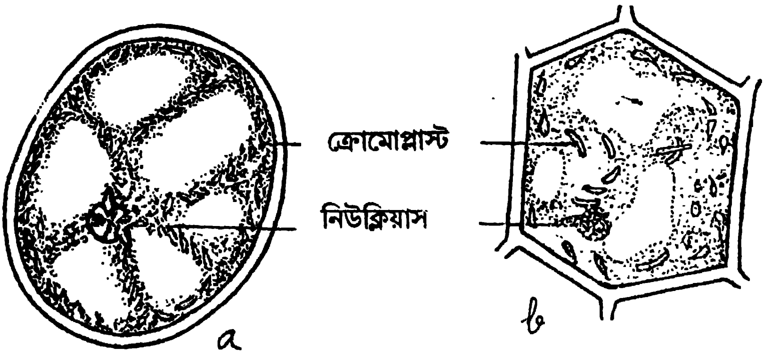
c) **ক্রোমোপ্লাস্ট** (chromoplast) — সবুজ ছাড়া অন্য বর্ণযুক্ত প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলে। এখানে ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল ও অন্যান্য বর্ণ থাকে। এদের বর্ণ হলুদ বা লাল হয়। ফল, ফুলে ক্রোমোপ্লাস্ট পাওয়া গিয়েছে। ক্রোমোপ্লাস্টের কোনও নির্দিষ্ট আকৃতি নেই। এরা লম্বাটে, সূচ্যাকার, খণ্ডিত বা কোণযুক্ত হয় (চিত্র 39a, b)। ক্রোমোপ্লাস্টের বিভিন্ন বর্ণ স্ট্রোমার মধ্যে ছড়ানো থাকে। বাদামি শৈবালের রঙ ফিউকোজ্যান্থিনের (fucoxanthin) জন্য, লাল শৈবালের রঙ ফাইকোএরিথ্রিনের জন্য এবং টমেটোর লাল রঙ লাইকোপেনের (lycopen) জন্য হয়ে থাকে।

কাজ— ক্রোমোপ্লাস্টের উজ্জ্বল বর্ণ পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে ও ফুলের পরাগযোগে সাহায্য করে।

ক্রোমোপ্লাস্টের উৎপত্তি— ক্রোমোপ্লাস্টের উৎপত্তি ক্লোরোপ্লাস্ট কিম্বা লিউকোপ্লাস্ট থেকে হয়।

(a) ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে ক্রোমোপ্লাস্টের উৎপত্তির সময় ক্লোরোফিল ও স্টার্চের পরিমাণ হ্রাস পায়, ল্যামেলা ভেঙে যায় এবং স্ট্রোমা নষ্ট হয়ে যায় ও কেন্দ্র অঞ্চল ফাঁকা দেখায়। এই সঙ্গে বড় বড় হলদে রঙের বিন্দু দেখা দেয়। এগুলিকে গ্লোবিউলি বলে এবং এইসব বিন্দুগুলি প্লাস্টিডের পর্দার পাশে সাজান থাকে।

(b) লিউকোপ্লাস্ট থেকে ক্রোমোপ্লাস্টের উৎপত্তির সময় লিউকোপ্লাস্টে কিছু ফাইব্রিল দেখা দেয়, যা পরে কেলাসে পরিবর্তিত হয়। এই কেলাসগুলি পাতের মত (sheet) গঠন সৃষ্টি করে এবং এই অঞ্চলে প্রচুর ক্যারোটিনয়েড সঞ্চিত হয়।



চিত্র—39

ক্রোমোপ্লাস্ট। a - টমেটোর কোষে, b - গাজরের কোষে

প্লাস্টিডের উৎপত্তি— প্লাস্টিডের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। এখানে কয়েকটি মতবাদের বিবরণ দেওয়া হল।

(a) প্রোপ্লাস্টিড থেকে উৎপত্তি— প্লাস্টিডের উৎপত্তি শুরু হয় প্লাস্টিড প্রারম্ভিক বস্তু (initials) থেকে। এগুলি গোলাকার এবং এখানে ঘন স্ট্রোমা এবং দ্বিস্তরযুক্ত প্রাচীর থাকে। এদের ভিতরের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভাঁজ হয় ও প্রোপ্লাস্টিড গঠন করে। এই ভাঁজগুলি চ্যাপ্টা এবং প্রাচীরের তলের (surface) সমান্তরালভাবে থাকে। প্রোপ্লাস্টিডের (proplastid) বিভাজনের ফলে প্লাস্টিড তৈরি হয়। আদি প্লাস্টিড বা প্রোপ্লাস্টিড খুব ছোট ছোট গোল কিম্বা লম্বাটে। এদের ব্যাস 0.5μ এর চেয়ে বেশি। প্রোপ্লাস্টিডে যে চ্যাপ্টা থলের ন্যায় অংশ দেখা যায় তাদের থাইলাকয়েড বলে। এগুলি যদি পর পর সাজান থাকে তাহলে গ্রানা ল্যামেলা তৈরি হয়। যখন থাইলাকয়েড এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রসারিত অবস্থায় থাকে, তখন স্ট্রোমা ল্যামেলা গঠিত হয়। আলোর উপস্থিতিতেই কেবল ল্যামেলা গঠিত হয়।

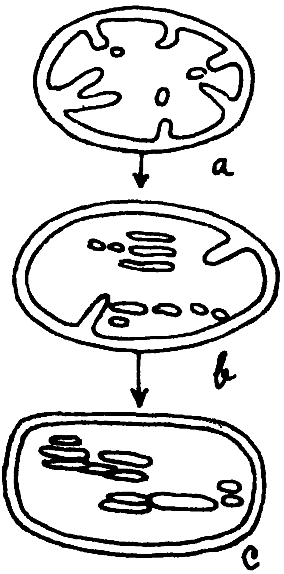
উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের প্লাস্টিডের সৃষ্টি সূর্যের আলো দিয়ে প্রভাবিত হয়। প্রোপ্লাস্টিডের ভিতরের পর্দাটা ভিতরের দিকে ঢুকে অনেক জায়গায় ছোট ছোট ভেসিকেল (vescicle) তৈরি করে। এই ছোট ছোট অংশগুলি পরে আলাদা হয়ে যায় ও পরিণত প্লাস্টিডের ল্যামেলার সৃষ্টি করে (চিত্র 40)। কাণ্ডের অগ্রভাগ ও পাতার কোষ বিভাজনের সময় প্রোপ্লাস্টিডও বিভাজিত হয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। যখন কাণ্ড ও

পাতার কোষগুলি পরিণত হতে থাকে, তখন ঐ সব প্রোপ্লাস্টিড বড় হয় ও পরে ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয়। মূলেও একইভাবে ভাজক কোষের বিভাজন ও বৃদ্ধির সময় প্রোপ্লাস্টিডও বিভাজিত হয় ও পরে ঐসব প্রোপ্লাস্টিড পরিণত হয়ে লিউকোপ্লাস্ট তৈরি করে। সবসময় কোষ বিভাজনের সাথে সাথে প্রোপ্লাস্টিডের বিভাজন হয় না। তবে কোনও কোনও উদ্ভিদে যেমন, *Anthoceros, Zygnema*-এ কোষ বিভাজনের আগে কিম্বা সাথে সাথে নিয়মিতভাবে প্লাস্টিডের বিভাজন হয়। ক্লোরোপ্লাস্ট বা লিউকোপ্লাস্ট থেকে নানা পরিবর্তনের পর ক্রোমোপ্লাস্ট তৈরি হয়।

(b) পুরনো প্লাস্টিডের বিভাজনের বা মুকুলোদগমের ফলে উৎপত্তি— পুরনো প্লাস্টিডের বিভাজনের ফলে প্লাস্টিডের উৎপত্তি হতে পারে।

শৈবালে ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে প্লাস্টিডের বিভাজনের সময় প্লাস্টিডের ভিতরের পর্দাটা ভাঁজ হয়ে যায়, পরে ঐ জায়গায় বাইরের পর্দাটা সঙ্কুচিত হতে থাকে যতক্ষণ না ঐ প্লাস্টিডটি দু'টি অংশে বিভক্ত হচ্ছে (চিত্র 41)। এইভাবে সৃষ্ট প্লাস্টিড দু'টি সমান কিম্বা অসমান হয়।

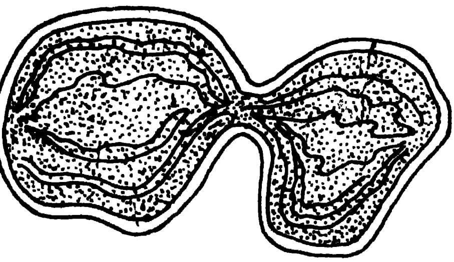
বিশেষ অবস্থায় (যেমন, কর্তৃত পাতা থেকে উদ্ভিদের পুনরুৎপাদনের সময়) প্লাস্টিডের উৎপত্তি মুকুলোদগমের মাধ্যমে হয়। প্লাস্টিড বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সময় ছোট মুকুল উৎপন্ন করে ও এগুলি পরে পরিণত হয়ে প্লাস্টিড গঠন করে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় মুকুলোদগম দেখা যায় না।



চিত্র—40

প্লাস্টিডের উৎপত্তি

c) নিউক্লিও পর্দা থেকে উৎপত্তি— কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের কাছে অনেক প্রারম্ভিক বস্তু বা initials দেখা গেছে। এর থেকে মনে করা হয় যে, নিউক্লিও পর্দা ভাঁজ হয়ে প্লাস্টিড ও মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রারম্ভিক বস্তুর সৃষ্টি করে।



চিত্র—41

প্লাস্টিডের বিভাজন

d) ক্লোরোপ্লাস্টের মিথোজীবী (symbiotic) উৎপত্তি— ক্লোরোপ্লাস্ট ও নীল সবুজ শৈবালের আকার, গঠন ও কাজে সামঞ্জস্য দেখা গেছে। মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ব্যাকটিরিয়ার মধ্যেও এরকম সামঞ্জস্য রয়েছে। এদের DNA নিউক্লিও DNA থেকে ছোট ও বলয়াকার এবং এদের রাইবোসোমও মোটামুটি একই আয়তনের। এই রাইবোসোম উদ্ভিদ বা প্রাণী কোষের সাইটোপ্লাজমীয় রাইবোসোম থেকে ছোট। ব্যাকটিরিয়ায় শ্বসন প্লাজমা পর্দার মাইক্রোভিলি অঞ্চলে হয়। এই পর্দার সাথে মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের পর্দা ও ক্রিস্টির সাদৃশ্য রয়েছে। এছাড়া ব্যাকটিরিয়া, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট ইত্যাদির প্রোটিন সংশ্লেষ ক্লোরামফেনিকল দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ কোষের প্রোটিন সংশ্লেষে (সাইটোপ্লাজমে) ক্লোরামফেনিকল বাধা দেয় না।

এসব সামঞ্জস্য থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ার উৎপত্তি হয়েছে প্রাচীন, স্বভোজী, মুক্তভাবে বসবাসকারী নীল সবুজ শৈবাল ও ব্যাকটিরিয়া থেকে। এসব ক্ষুদ্র জীব (micro-organism) সুদূর অতীতে পরভোজী ইউক্যারিওট কোষের মধ্যে প্রবেশ করে মিথোজীবী হিসাবে বসবাস করতে থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের মিথোজীবী উৎপত্তির ধারণা যথেষ্ট আকর্ষণীয় হলেও Kirk (1966) দেখেন যে, ক্লোরোপ্লাস্টের বিকাশ ও সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উৎসেচক নিউক্লিও জিনের প্রভাবে উৎপন্ন হয়।

ক্লোরোপ্লাস্টে মিউটেশন— কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্লোরোফিলের পার্থক্য মেন্ডেলীয় সূত্র (Mendel's Law) অনুযায়ী আচরণ করে। এখানে অনেক সময় অপরিবর্তনশীল মিউটেশন (mutation) হয়। এজন্য এদের প্লাস্টোজিন (plastogene) বলা হয়ে থাকে। Wettstein 1959 খ্রিস্টাব্দে বার্লিতে প্লাস্টিডের

অ্যালবিনো এবং হলদেটে সবুজ মিউটেশন লক্ষ্য করে। প্লাস্টিডের মিউটেশনের বেশিরভাগই নিউক্লিও জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। তবে কতকগুলি মিউটেশনের নিয়ন্ত্রণে নিউক্লিয়াসের কোনও প্রভাব নেই (extranuclear), যেমন— *Chlmydomonas*-এ স্ট্রেপটোমাইসিনের প্রভাবে সৃষ্ট হলদে মিউটেশন। এই মিউটেশনে ক্লোরোফিল উৎপাদনের একটি ধাপ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এরকম মিউটেশনযুক্ত কোষ সালোকসংশ্লেষ করতে পারে না। এই মিউটেশনের উৎপত্তি নিউক্লিয়াসে হয়েছিল।

সিলিয়া (cilia), ফ্ল্যাজেলা (flagella) ও বেসাল বডি (basal body)

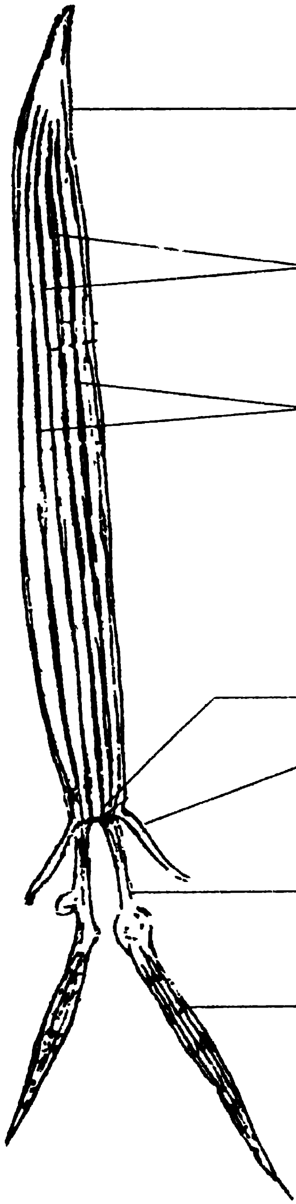
কোনও কোনও কোষে (যেমন, শুক্রাণু) সূতার ন্যায় দীর্ঘ উপাঙ্গ দেখা যায়। এদের ফ্ল্যাজেলা বলে। অপেক্ষাকৃত খর্ব সূত্রাকার উপাঙ্গকে সিলিয়া (cilia লাতিন - cili - আঁখি পল্লব) বলে। সিলিয়া এবং ফ্ল্যাজেলার (flagella, লাতিন - ছোট চাবুক) অঙ্গসংস্থানিক এবং শারীরবৃত্তীয় প্রকৃতির সাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

ফ্ল্যাজেলা	সিলিয়া
i) অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ (150 μm পর্যন্ত)।	i) অপেক্ষাকৃত খর্ব (5-10μm)।
i) সংখ্যা কম (এক দুই বা অল্প কয়েকটি)।	i) সংখ্যা বেশি। কখনও কখনও অসংখ্য (3000-14000 বা বেশি)।
i) ফ্ল্যাজেলা কোষের এক প্রান্তে থাকে।	i) কোষের ত্বকের সর্বত্র থাকতে পারে।
i) ফ্ল্যাজেলার চলন সাধারণত স্বাধীনভাবে হয়।	i) সিলিয়ার চলন সুসংবদ্ধ ছন্দে হয়।
i) ফ্ল্যাজেলার তরঙ্গায়িত চলন দেখা যায়।	i) সিলিয়ার চলন দোলায়মান বা দ্রুত বক্র ঝাঁটান (sweeping)।

কোনও কোনও সিলিয়ার চলন দেখা যায় না। এদের sterocilia (স্টিরোসিলিয়া) বলে। যথার্থ সিলিয়ার চলন দেখা যায় এবং এদের kinocilia (কাইনোসিলিয়া) বলে।

ফ্ল্যাজেলা প্রোটোজোয়ায় (ফ্ল্যাজেলেটস শ্রেণীর), স্পঞ্জে, মেটাজোয়ার শুক্রাণুতে, শৈবালে এবং গ্যামেটে ও চলরেণুতে দেখা যায়। সিলিয়া প্রোটোজোয়ায় (সিলিয়াটা শ্রেণীর), মেটাজোয়ার সিলিয়াযুক্ত এপিথেলিয়ামে এবং কোনও কোনও প্রাণীর লার্ভায় থাকে।

সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলার গঠনে মূল উপাদানগুলি হল— a) কোষের ত্বক থেকে গঠিত সরু, বেলনাকার উপাঙ্গকে স্যাফট (shaft) বা **সিলিয়াম** (cilium) বলে। b) ফ্ল্যাজেলা বা সিলিয়া যে দানা বা **বেসাল বডি** থেকে উৎপন্ন হয় তা সেন্ট্রিওলের মত। c) কোনও কোনও কোষে ফ্ল্যাজেলা বা সিলিয়ার নিচে সরু মূলের মত অংশ (rootlet) থাকে।



চিত্র—42

ফ্ল্যাজেলা বা সিলিয়ার দীর্ঘচ্ছেদ

সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলার মূল উপাদান হল অ্যাক্সোনিম (axoneme)। এর কেন্দ্রে অপেক্ষাকৃত সরু দু'টি সূত্র এবং পরিধিতে তুলনামূলকভাবে স্থূল নয়টি সূত্র থাকে। কেন্দ্রের সূত্র একটি করে মাইক্রোটিউবিউল দিয়ে তৈরি। পরিধির প্রত্যেক সূত্রে দু'টি করে মাইক্রোটিউবিউল (doublet) থাকে। কোনও কোনও ফ্ল্যাজেলায় এই অ্যাক্সোনিম ছাড়াও কিছু সূত্র, মাইক্রোটিউবিউল বা কেলাসিত গঠন বা মাইটোকন্ড্রিয়ার অংশ থাকতে পারে। তবে এগুলি ফ্ল্যাজেলার চলনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল উপাদান নয়। অ্যাক্সোনিম (axoneme বা axial complex) সিলিয়াম বা স্যাফটের দৈর্ঘ্য বরাবর থাকে এবং এটি চলনের জন্য অপরিহার্য।

অ্যাক্সোনিমকে বেষ্টন করে 95Å স্থূল, ত্রিস্তরবিশিষ্ট একটি লাইপোপ্রোটিনের পর্দা থাকে। এই পর্দা প্লাজমা পর্দার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে। অ্যাক্সোনিম ম্যাট্রিক্সের মধ্যে নিহিত থাকে।

অ্যাক্সোনিমের সূক্ষ্ম গঠন— ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সব ইউক্যারিওট জীবের (উদ্ভিদ, প্রোটোজোয়া ও মেটাজোয়া) ফ্ল্যাজেলা ও সিলিয়ার মূল গঠন একই। অ্যাক্সোনিমে (axoneme) সাধারণত 9+2 মাইক্রোটিউবিউলের বিন্যাস থাকে। কেন্দ্রের মাইক্রোটিউবিউল দু'টি গোলাকার, কিন্তু পরিধির মাইক্রোটিউবিউল উপবৃত্তাকার। পরিধির প্রত্যেক মাইক্রোটিউবিউলের (doublet) ব্যাস 360Å। এর মধ্যে আবার দু'টি মাইক্রোটিউবিউল রয়েছে। এদের সাবফাইবার A ও সাবফাইবার B বলে। এদের ব্যাস 180-250Å। একটি মাইক্রোটিউবিউল (doublet) থেকে অপর মাইক্রোটিউবিউলের দূরত্ব 200Å। ডাবলেটের থেকে বাইরের পর্দার দূরত্ব হল 250Å। সাবফাইবার A ছোট, সম্পূর্ণ এবং অক্ষের অপেক্ষাকৃত কাছে থাকে। সাবফাইবার B বড় ও অসম্পূর্ণ অর্থাৎ সাবফাইবার A-র সংলগ্ন অঞ্চলে প্রাচীর অনুপস্থিত।

সাবফাইবার A-র দু'টি উপাঙ্গ বা বাহু আছে। বাইরের দিকের বাহু হুকের ন্যায়। ভিতরের দিকের বাহুর প্রান্ত peripheral link (পরিধির সংযোগ) বা interdoublet link এর সাহায্যে পাশের মাইক্রোটিউবিউলের সাবফাইবার B-র সাথে যুক্ত থাকে। সব মাইক্রোটিউবিউলগুলির সাবফাইবার A-র বাহুগুলি একই দিকে অর্থাৎ ডানদিকে থাকে (clockwise orientation)।

কেন্দ্রের মাইক্রোফাইব্রিল দু'টির প্রত্যেকটির ব্যাস 250Å। এই দু'টি মাইক্রোফাইব্রিলের মধ্যে ব্যবধান 350Å। এই মাইক্রোফাইব্রিলের প্রাচীর 60Å স্থূল। কেন্দ্রের মাইক্রোফাইব্রিল দু'টি একটি সাধারণ আবরণ (central sheath) দিয়ে আবৃত থাকে।

কেন্দ্রীয় মাইক্রোটিউবিউলের আবরণের (সীদ) সাথে পরিধির প্রত্যেক ডাবলেট মাইক্রোটিউবিউল অরীয় সংযোগ (cross link) দ্বারা যুক্ত থাকে। এই সংযোগ 360Å। দীর্ঘ অরীয় সংযোগে একদিকে সাবফাইবার A-র সাথে যুক্ত থাকে ও অন্য

দিকে একটি নব বা মাথা (head) গঠন করে, যা কেন্দ্রীয় সীদের সাথে যুক্ত থাকে।

অ্যাক্সোনিমের রাসায়নিক গঠন— পরিধির মাইক্রোটিউবিউলে প্রোটিন টিউবিউলিন A এবং টিউবিউলিন B পাওয়া গেছে। এছাড়া অ্যাক্সোনিমে আরো অন্তত দশ রকমের দ্রবণীয় গৌণ প্রোটিন পাওয়া গেছে।

সাবফাইবার A-র বাহুগুলি এবং অরীয় সংযোগ ইত্যাদিতে মায়োসিনের মত প্রোটিন ডাইনিন (dynein) থাকে। ডাইনিনের ATPase-এর কার্যকারিতা লক্ষ্য করা হয়েছে।

মাইক্রোটিউবিউলের আণবিক গঠন

দেখা গেছে যে, কেন্দ্রীয় ফাইবার ও সাবফাইবার A-র প্রত্যেক মাইক্রোটিউবিউলে 13টি সূত্রাকার উপএকক বা **প্রোটোফিলামেন্ট** রয়েছে। এদের ব্যাস 40Å। সাবফাইবার B-তে 10-11টি প্রোটোফিলামেন্ট থাকে। প্রোটোফিলামেন্টে α ও β টিউবিউলিন থাকে।

সিলিয়া ও ফ্লাজেলার চলন (ciliary movement)

সিলিয়া সংকোচনশীল। সিলিয়ার সংকোচনে দুই রকম ছন্দ দেখা যায়। এগুলি হল মেটাক্রনিক (metachronic) এবং আইসোক্রনিক (isochronic) বা সিনক্রোনাস (sinchronus) ছন্দ (rhythm)। মেটাক্রনিক ধরনের ছন্দে একটি সারির সিলিয়াগুলির চলন একটির পর আরেকটি পরপরভাবে হয়। আইসোক্রোনাস ধরনের ছন্দে একটি সারির সব সিলিয়াগুলি একই সাথে আন্দোলিত হয়।

ফ্ল্যাজেলার চলন স্বাধীনভাবে হয় ও এই চলন তরঙ্গায়িত।

Hayastri-র (1961) মতে, সিলিয়ার কেন্দ্রের সূত্র দু'টি অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা (excitement) বাইরের নয়টি সূত্রে স্থানান্তরিত করে। ওইসব সূত্রে ATP ভেঙে যায়। সিলিয়ার চলন সাধারণত সাইটোপ্লাজম বা স্নায়ুতন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবে হয়। কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে সিলিয়ার চলন স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে দেখা গেছে সিলিয়ার চলনে সাইটোপ্লাজমের প্রয়োজন রয়েছে। এই চলনে ATP প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে।

সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলার চলন সম্বন্ধে দু'টি মতবাদ রয়েছে—

a) স্থানীয় সংকোচনের মতবাদ,

b) sliding প্রক্রিয়ার মতবাদ।

a) স্থানীয় সঙ্কোচনের মতবাদ— Bradfield 1955 খ্রিস্টাব্দে এই মতবাদ প্রকাশ করেন। এই মত অনুসারে, সিলিয়া বা ফ্ল্যাজেলার অনুদৈর্ঘ্য সূত্রের (fibril) অসমান সঙ্কোচন বা স্থানীয় সঙ্কোচনের ফলে চলন দেখা যায়। এই মত কতকগুলি ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাইরের সূত্রগুলি সঙ্কুচিত হতে পারে এবং এই সঙ্কোচন নিচ থেকে আরম্ভ করে ফ্ল্যাজেলার অগ্রভাগ পর্যন্ত হয়। কেন্দ্রের সূত্রগুলি সঙ্কুচিত হয় না।

সঙ্কোচনের জন্য উদ্দীপনা বাইরের সূত্রগুলির নিচের বেসাল বডিতে সৃষ্টি হয়।

সিলিয়া এবং ফ্লাজেলার গঠন মোটামুটি একই রকমের। এখানে কেন্দ্রে দুইটি সূত্রের চারিদিকে নয়টি সূত্র বলয়ে (ring) সাজান থাকে। এগুলি কোষের ভিতরের বেসাল বডি (basal body) থেকে উৎপন্ন হয়। বেসাল বডির গঠন সেন্ট্রিওলের মত। এগুলি সেন্ট্রিওলের মতই স্বজননশীল। বেসাল বডিকে কাইনেটোসোম (kinetosome), ব্লেফারোপ্লাস্ট (blepharoplast) ও বেসাল গ্রান্যুউলও (granule) বলা হয়।

নিউক্লিয়াস (nucleus)

1831 খ্রিস্টাব্দে Robert Brown প্রথমে নিউক্লিয়াস দেখতে পান এবং এর নামকরণ করেন।

সব উদ্ভিদের কোষেই নিউক্লিয়াস থাকে। তবে নীলাভ সবুজ শৈবাল (blue green algae) ও ব্যাকটিরিয়ায় সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না, কিন্তু নিউক্লিও পদার্থ থাকে। পরিণত সীভ টিউবে (seive tube) ও স্তন্যপায়ী (mammal) প্রাণীর রক্তের পরিণত লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না।

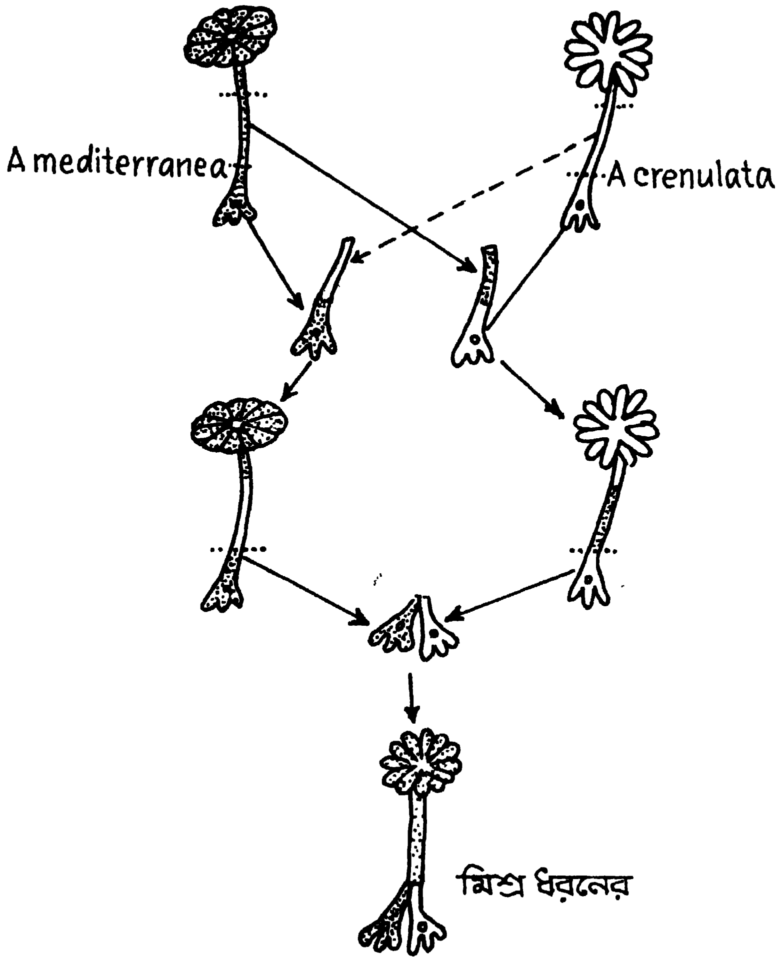
কাজ— নিউক্লিয়াসই কোষের সব কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে বংশধারার বাহক ক্রোমোসোম ও জিনগুলি থাকে।

নিউক্লিয়াসবিহীন কোষ বেশি দিন বাঁচতে পারে না। কোষের বিভাজন, বৃদ্ধি ও জনন সব কিছুতেই নিউক্লিয়াসের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। নিউক্লিয়াসই যে বংশগত চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে তা 1934 খ্রিস্টাব্দে জার্মান জীববিজ্ঞানী J. Hammerling এর পরীক্ষা (চিত্র-43) থেকে জানা যায়। তিনি সবুজ শৈবাল *Acetabularia* নিয়ে পরীক্ষা করেন। *Acetabularia*-র দুইটি প্রজাতিতে টুপির গঠনে তারতম্য হয়। A. *crenulata*-র টুপির রশ্মিগুলি আলগাভাবে সাজান থাকে, কিন্তু *A mediterranea*-র টুপি ছাতার মত। যদি অ্যাসিটেবুলেরিয়ার টুপি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আবার ওই নির্দিষ্ট প্রজাতির টুপি তৈরি হয়। যদি টুপি বাদ দেওয়ার পর নিউক্লিয়াসযুক্ত রাইজয়েডের উপর অন্য প্রজাতির বৃন্ত কলম করা হয়, তাহলে দেখা যায় যে, নবগঠিত টুপিটি যে প্রজাতির নিউক্লিয়াস রয়েছে তার মতন হয়। যদি কোনও পরীক্ষায় উভয় প্রজাতির (অর্থাৎ *A. crenulata* ও *A. mediterranea*) নিউক্লিয়াস থাকে, তখন টুপির আকৃতি *A. crenulata* এবং *A. mediterranea*-র মাঝামাঝি ধরনের হয়। সুতরাং, এই পরীক্ষা বংশধারায় নিউক্লিয়াসের অপরিসীম গুরুত্ব প্রমাণ করে।

নিউক্লিয়াস সাধারণত গোল বা ডিম্বাকার হয়। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অর্ধচন্দ্রাকার, ডাম্বেলাকার, চ্যাপ্টা শাখাযুক্ত (কোনও কোনও গ্রন্থির কোষে) বা অনিয়মিত আকারের (নিউট্রোফিলে বা লিউকোসাইটে) নিউক্লিয়াস দেখা যায়।

বেসিক স্টেইন (basic stain) বা ক্ষারীয় রঞ্জক পদার্থ দিয়ে নিউক্লিয়াসকে রঙ

করা যায়। অরসিন (orcein), কারমিন (carmine), ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট (crystal violet), হেমাটোক্সিলিন (hematoxylin), মিথাইল গ্রিন (methyl green), বেসিক ফুকসিন (basic fuchin) ইত্যাদি রঙ নিউক্লিয়াসকে রঞ্জিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।



চিত্র—43

Acetabularia-এ Hammerling-এর পরীক্ষা

বিভিন্ন কোষে নিউক্লিয়াসের আয়তনের তারতম্য হয়। সাধারণত এর আয়তন 10 থেকে 15μ পর্যন্ত হয়। তবে কিছু কোষে 1μ ব্যাসযুক্ত নিউক্লিয়াস পাওয়া গিয়েছে। কোনও কোনও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের (gymnosperm) ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস 600μ

ব্যাসযুক্ত হয়।

1895 খ্রিস্টাব্দে Bovari বলেছিলেন যে, ক্রোমোসোমের সংখ্যার ওপর নিউক্লিয়াসের আয়তন নির্ভর করে। কিন্তু Gates-এর (1909) মতে, সব সময় নিউক্লিয়াসের আয়তন ক্রোমোসোমের সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রত্যেক কোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের আয়তনের একটা নির্দিষ্ট অনুপাত থাকে এবং এই অনুপাতকে নিউক্লিয়-সাইটোপ্লাজমীয় অনুপাত (nucleo-cytoplasmic ratio) বা ক্যারিওপ্লাজমীয় অনুপাত (karyoplasmic ratio) বলে। এই অনুপাতকে Hartwig-এর (1960) নিউক্লিও সাইটোপ্লাজমীয় ইনডেক্স (nucleo-cytoplasmic indez) বা N.P. দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

$$NP = \frac{Vc}{Vc - Vn}$$

Vn = নিউক্লিয়াসের আয়তন

Vc = সাইটোপ্লাজমের আয়তন

অপরিণত কোষে নিউক্লিয়াস কোষের মাঝখানে থাকে, কিন্তু পরিণত কোষে ভ্যাকুওলের উপস্থিতির জন্য নিউক্লিয়াস পরিধির দিকে সরে যায়। তবে সব অবস্থাতেই নিউক্লিয়াসের চারিদিকে সাইটোপ্লাজম থাকে।

সাধারণত প্রত্যেক কোষে একটা নিউক্লিয়াস থাকে এবং এইসব কোষকে এক নিউক্লিয়াসযুক্ত (uninucleate) কোষ বলে। যেসব কোষে দু'টি করে নিউক্লিয়াস থাকে তাদের দ্বিনিউক্লিয়াসযুক্ত (binucleate) কোষ বলে। যেসব কোষে দু'টির চেয়ে বেশি সংখ্যক নিউক্লিয়াস থাকে, সেসব কোষকে বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত (multinucleate) কোষ বলে। *Vaucheria* ও অন্যান্য Siphonales বর্গের (order) সবুজ শৈবাল এবং ফাইকোমাইসেটিস (Phycomycetes) শ্রেণীর ছত্রাকের দেহে কোনও মধ্যবর্তী পর্দা থাকে না। এই রকম দেহকে সিনোসাইট (coenocyte) বলে এবং এখানে অসংখ্য নিউক্লিয়াস থাকে। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের কোনও কোনও কোষে বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত অবস্থা দেখা যায়। এই অবস্থা সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ছাড়া বারবার নিউক্লিয়াসের বিভাজনের ফলে কিম্বা দু'টি কোষের মাঝের প্রাচীর বিনষ্ট হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়।

নিউক্লিয়াসের রাসায়নিক গঠন— নিউক্লয়াসে যেসব রাসায়নিক বস্তু পাওয়া যায় সেগুলি হল—

(a) প্রোটিন

(i) ক্ষারীয় বা বেসিক প্রোটিন (basic protein)— হিস্টোন (histone), প্রোটামাইন (protamine) ইত্যাদি

(ii) অম্লধর্মযুক্ত বা অবশিষ্ট প্রোটিন (acidic বা residual protein)— *ট্রিপ্টোফেন, টাইরোসিন ইত্যাদি*

(b) নিউক্লিক অ্যাসিড (nucleic acid)

(i) ডি. এন. এ. (DNA), (ii) আর. এন. এ. (RNA)

(c) লিপিড

(d) অজৈব পদার্থ

(a) **প্রোটিন**— ক্রোমোসোমে, নিউক্লিওলাসে, নিউক্লিও রসে সব জায়গাতেই প্রোটিন থাকে। এখানে বিভিন্ন রকমের প্রোটিন পাওয়া যায়।

(b) **নিউক্লিক অ্যাসিড**— নিউক্লিয়াসের শুষ্ক ওজনের 15-30 শতাংশ হল নিউক্লিক অ্যাসিড। আর. এন. এ.-র পরিমাণ নিউক্লিয়াসের শুষ্ক ওজনের 1-2 শতাংশ এবং এটি প্রধানত নিউক্লিওলাসে পাওয়া যায়। ক্রোমোসোমে প্রধানত ডি. এন. এ. থাকে।

(c) **লিপিড**— লিপিড সাধারণত লাইপো প্রোটিন (লিপিড ও প্রোটিন) ও ফসপোলিপিড অবস্থায় পাওয়া যায়। ক্রোমোসোমে ও নিউক্লিওলাসে ফসফোলিপিড থাকে।

(d) **অজৈব পদার্থ**— ক্যালসিয়াম ডি. এন. এ.-র সাথে যুক্ত থাকে। লোহা, দস্তা, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির লবণও নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায়।

এছাড়া বিভিন্ন রকমের এনজাইম নিউক্লিয়াসে থাকে।

নিউক্লিয়াসের গঠন— নিউক্লিয়াসে নিউক্লিও পর্দা, নিউক্লিও রস, নিউক্লিও জালিকা ও নিউক্লিওলাস, নিউক্লিও ম্যাট্রিক্স এবং নিউক্লিও ল্যামিনা থাকে।

(a) নিউক্লিয়াসের (চিত্র 38a) চারিদিকে একটা সূক্ষ্ম পর্দা আছে। এই পর্দাকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন (nuclear membrane) বা নিউক্লিও পর্দা বলে। এই পর্দা নিউক্লিয়াসে বিভিন্ন বস্তুর প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে।

(b) নিউক্লিয়াসের ভিতর যে জেলীর মত তরল পদার্থ থাকে, তাকে নিউক্লিও রস (nuclear sap) বা নিউক্লিওপ্লাজম (nucleoplasm) বা ক্যারিওলিম্ফ (karyolymph) বলে। নিউক্লিওপ্লাজম প্রধানত প্রোটিন দিয়ে তৈরি। এছাড়া এখানে বিভিন্ন এনজাইম, আর. এন. এ. ইত্যাদি থাকে। নিউক্লিও রসে প্রধানত অম্লধর্মী প্রোটিন এবং অ্যাডিনিন ও ইউরাসিল সমৃদ্ধ RNA পাওয়া যায়।

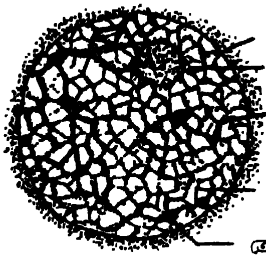
(c) নিউক্লিওপ্লাজমে নির্দিষ্ট সংখ্যক সূক্ষ্ম সূতা (ক্রোমোনিমা) পরস্পর জড়িয়ে একটা জালের সৃষ্টি করে। এই জালকে নিউক্লিও জালিকা বা নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম (nuclear reticulum) বা ক্রোমাটিন রেটিকুলাম (chromatin reticulum) বলে। কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিও জালিকা ভেঙে যায় ও ক্রোমোসোমগুলি দেখা যায়।

(d) প্রত্যেক নিউক্লিয়াসে এক বা একাধিক গোল নিউক্লিওলাস থাকে। রঞ্জিত কোষে এদের গাঢ় বর্ণের দেখায়।

(e) নিউক্লিও ম্যাট্রিক্স নিউক্লিয়াসের তন্তুযুক্ত জালিকাকার কাঠামো গঠন করে।

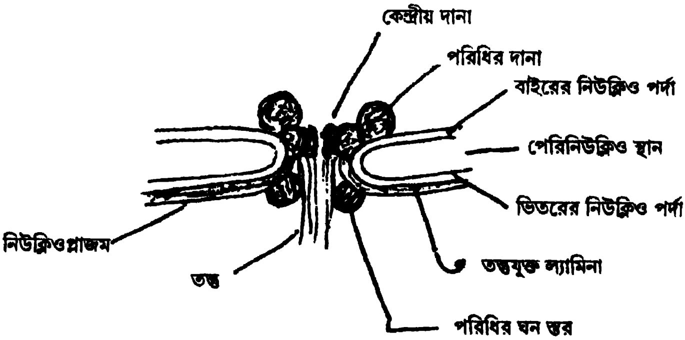
(f) নিউক্লিও ল্যামিনা নিউক্লিও পর্দার ঠিক ভিতরে একটি স্তর গঠন করে।

(g) কোনও কোনও কোষে ইন্টারফেজ অবস্থায় নিউক্লিয়াসের মধ্যে এক বা একাধিক অংশ গাঢ় রঙ নেয়। এই অঞ্চলগুলিকে প্রোক্রোমোসোম বা ক্রোমোসেন্টার (chromocenter) বলে। ক্রোমোসোমগুলির হেটোরোক্রোমাটিন অঞ্চল পরস্পর যুক্ত হয়ে ক্রোমোসেন্টার গঠন করে।



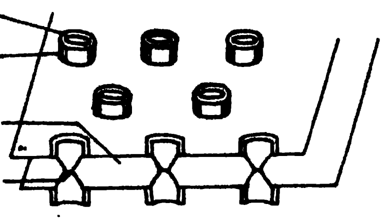
চিত্র—44a
নিউক্লিয়াসের গঠন

নিউক্লিয়ার মেমব্রেন (nuclear membrane)— এই পর্দা নিউক্লিয়াসের ভিতরের পদার্থকে সাইটোপ্লাজম থেকে আলাদা করে রাখে। কোষ বিভাজনের কোনও কোনও অবস্থায় নিউক্লিয়ার মেমব্রেনকে দেখা যায় না। নিউক্লিয়ার মেমব্রেনে দু'টি পর্দা থাকে (চিত্র 44b)। প্রত্যেকটি পর্দা 80-100Å চওড়া। দু'টি পর্দার মধ্যে ব্যবধান 100-300Å। পর্দা দু'টির মধ্যবর্তী স্থানকে পেরিনিউক্লীয় স্থান (perinuclear space) বলে। নিউক্লিয়ার মেমব্রেনে অনেক ছিদ্র (pore) থাকে। Callar ও Tomlia (1950) এই রন্ধ্র বা ছিদ্র প্রথম লক্ষ্য করেন। ছিদ্রগুলির প্রান্তে পর্দা দুটি সংযুক্ত থাকে। ছিদ্রগুলিকে ঘিরে বেলনাকার (cylindrical) বলয় (annulus) দেখা যায়। এইসব বলয় বা অ্যানুলাসের ব্যাস 40-100μ, গড়ে 80μ। প্রাণী কোষে বলয় দেখা গেছে। বিভিন্ন জীবে এবং একই জীবের বিভিন্ন কোষে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের ছিদ্রের আয়তন ও সংখ্যার তারতম্য হয়। প্রত্যেক ছিদ্রের মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম পর্দা থাকে যা নিউক্লিয়াসে বিভিন্ন বস্তুর প্রবেশ বা নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের মধ্যে দিয়ে শর্করা, অ্যামিনো অ্যাসিডের অণু, বিভিন্ন ধরনের RNA ইত্যাদি যেতে পারে। এই পর্দার মধ্যে দিয়ে নিউক্লিয়াসে উৎপন্ন mRNA সাইটোপ্লাজমে যায় ও প্রোটিন উৎপাদনে অংশ নেয়।



নিউক্লিও রন্ধ্রের বলয়ে আটটি বলয়াকার দানা থাকে। এসব দানার মোটামুটি ব্যাস

হল 15μ। এসব দানার মাঝখানে একটি কেন্দ্রীয় দানা থাকে। কেন্দ্রীয় দানা এবং বলয়াকার দানাগুলি থেকে কিছু তন্তু (fibre) বেরিয়ে থাকে। নিউক্লিও রন্ধ্রের উপর অ্যামরফাস পদার্থের দ্বারা গঠিত পর্দা থাকে।



চিত্র—44b
নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের গঠন

নিউক্লিয় পর্দায় নিউক্লিও রন্ধ্রের সংখ্যার পার্থক্য দেখা যায়। এই সংখ্যা কোষের প্রকৃতি এবং শারীরবৃত্তীয় অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। অত্যন্ত সক্রিয় কোষে এই সংখ্যা $15\text{-}20/\mu m^2$ হয়। বৃদ্ধিশীল কোষে রন্ধ্রের সংখ্যা $7\text{-}12/\mu m^2$ হয়। নিউক্লিয়াস প্রতি নিউক্লিও রন্ধ্রের সংখ্যা 100 থেকে 5×10^7 হতে পারে।

নিউক্লিও পর্দায় নিউক্লিও রন্ধ্রের বিন্যাস সমষ্টিগতভাবে বা সারিতে অথবা ছ'কোণাভাবে অথবা নিয়মিতভাবে থাকে।

নিউক্লিয়ার মেমব্রেন প্রোটিন ও লিপিড দিয়ে তৈরি। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, এই মেমব্রেন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে তৈরি হয়। কোষ বিভাজনের সময় প্রফেজের শেষে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ভেঙে যায় ও সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলিকে তখন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে আলাদাভাবে চেনা যায় না। টেলোফেজে অপত্য নিউক্লিয়াসের চারিদিকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন আবার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের অংশ থেকেই তৈরি হয়।

নিউক্লিওলাস (nucleolus)— নিউক্লিওলাসের সংখ্যা ক্রোমোসোম সেটের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। প্রতি সেট (set) ক্রোমোসোমের জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদে এক বা একাধিক নিউক্লিওলাস থাকে। তবে কোনও কোনও কোষে দুই বা ততোধিক নিউক্লিওলাস মিলিত হওয়ার ফলে এর সংখ্যা হ্রাস পেতে পারে। নিউক্লিওলাস নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন (secondary constriction) অঞ্চলের সাথে যুক্ত থাকে ও কোষ বিভাজনের কোনও কোনও অবস্থায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

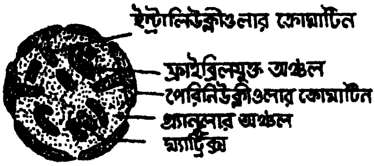
ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে নিউক্লিওলাসের ভিতরের গঠন দেখা যায় (চিত্র 44c)। নিউক্লিওলাসের চারটি অংশ দেখা যায়।

(a) গ্র্যানুলার (granular) বা দানাদার অঞ্চল— নিউক্লিওলাসের পরিধিতে অবস্থিত এই অঞ্চল ঘন দানাযুক্ত এবং 150-200Å ব্যাসযুক্ত। এই অঞ্চলে রাইবো-নিউক্লিও-প্রোটিন থাকে।

(b) নিউক্লিওনীমা (nucleonema) বা সূত্রযুক্ত (fibrillar) অঞ্চল— অনেক রাইবোনিউক্লিও প্রোটিন সূত্র নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। সূত্রগুলি সাধারণত 50-80Å

দীর্ঘ হয়। কিন্তু কখনও কখনও 500Å দীর্ঘ সূত্রও দেখা গেছে।

(c) **পার্স অ্যামরফা (pars amorpha)**— গ্র্যানুলার অঞ্চল ও নিউক্লিওনীমাকে আবৃতকারী অ্যামরফাস স্তরকে (ম্যাট্রিক্স) পার্স অ্যামরফা বলে। এই স্তর কম ইলেকট্রন ঘনত্ববিশিষ্ট ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলটি কেবল কোনও কোনও নিউক্লিয়াসে দেখা যায়।



চিত্র—44c

(d) ক্রোমাটিন— নিউক্লিওলাসের সাথে যুক্ত এই ক্রোমাটিন 100Å সূত্র দিয়ে গঠিত এবং নিউক্লিওলাসের পরিধিতে থাকে। এই ক্রোমাটিনকে পেরিনিউক্লিওলার (perinucleolar) ক্রোমাটিন বলে। এটি সাধারণত DNA দিয়ে তৈরি এবং RNA উৎপাদনের ছাঁচ হিসাবে কাজ করে। কখনও কখনও এই অঞ্চল নিউক্লিওলাসের অভ্যন্তরেও বিস্তৃত থাকে। এই ক্রোমাটিনকে ইন্ট্রানিউক্লিওলার (intranucleolar) বা আন্তঃনিউক্লিওলীয় ক্রোমাটিন বলা হয়।

নিউক্লিওলাসে প্রোটিন, RNA, DNA, সামান্য লিপিড, এনজাইম ও খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। নিউক্লিওলাসের শুষ্ক ওজনের 90 শতাংশ পর্যন্ত প্রোটিন পাওয়া গিয়েছে। RNA-র পরিমাণ শুষ্ক ওজনের 8-17 শতাংশ ও DNA-র পরিমাণ 7-10 শতাংশ। নিউক্লিওলাসে অ্যালকালাইন ফসফাটেস (alkaline phosphatase), আর. এন. এ. পলিমারেজ (R.N.A polymarase), রাইবোনিউক্লিয়েস (ribonuclease) প্রভৃতি এনজাইম পাওয়া যায়। খনিজ পদার্থের মধ্যে ফসফরাস, গন্ধক (sulpher) ও কখনও কখনও পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়াম থাকে।

বিভিন্ন ধরনের নিউক্লিওলাস

দানার প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে নিউক্লিওলাস বিভিন্ন প্রকারের হয়।

(i) সমসত্ব বা homogenous ধরনের নিউক্লিয়াসে দানাগুলি সমভাবে ছড়ান থাকে।

(ii) অসমসত্ব বা heterogenous ধরনের নিউক্লিয়াসে দানাগুলি গুচ্ছাকারে ছড়ান থাকে।

(iii) বলয়াকার ধরনের নিউক্লিওলাসে দানাগুলি পরিধিতে বলয়াকারে অবস্থান করে।

নিউক্লিওলাসের চক্র ঃ

মায়োসিসের প্রথম প্রফেজের শেষদিকে নিউক্লিওলাস অদৃশ্য হয়ে যায় এবং টেলোফেজে বিশেষ ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট অঞ্চলে পুনরায় দেখা দেয়। হ্যাপ্লয়েড সেটে

এই নিউক্লিও ক্রোমোসোম একটি বা একাধিক থাকে। সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন অঞ্চল বা নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চলে 18S এবং 28S রাইবোসোমীয় RNA-র জিন থাকে।

প্রফেজে নিউক্লিওলাসের অ্যামর্ফাস অঞ্চল অদৃশ্য হয়। নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চলে ক্রোমাটিনের লুপটি (loop) ঢুকে যায়।

টেলোফেজে নিউক্লিওলাস উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াটি হল—

(i) নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চলের ভাঁজযুক্ত ক্রোমাটিনের লুপ বা ফাঁস খুলে যায়। ইন্টারফেজ নিউক্লিয়াসের ক্রোমোসেন্টার থেকে উৎপন্ন তন্তুযুক্ত এবং দানাদার পদার্থগুলি ক্রোমাটিনের খুলে যাওয়া সূত্রকে বেষ্টন করে রাখে।

(ii) ক্রোমোসেন্টারে নিউক্লিওলাসের ম্যাট্রিক্স এবং এর বেসিক (ক্ষারীয়) প্রোটিন ও RNA (অর্থাৎ নিউক্লিও পদার্থ) উৎপন্ন হয়। এসব পদার্থ ছোট পেরিনিউক্লিয় বস্তুতে নিঃসৃত হয়। এগুলি যুক্ত হয়ে ইন্টারফেজের নিউক্লিওলাস গঠন করে। কোষের শারীরবৃত্তীয় অবস্থার ওপর নির্ভর করে নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চল বিভিন্ন রকম হতে পারে।

(i) **সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত** (fully dispersed)— নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চল বা nucleolar organizer (NOR) অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে থাকে। NOR এর জিনগুলি থেকে RNA-র ট্রান্সক্রিপশন হয়। ক্রোমাটিন সূত্রের ব্যাস মোটামুটি 2μm।

(ii) **সম্পূর্ণ ঘনীভূত** (fully condensed)— NOR সম্পূর্ণ ঘনীভূত থাকে এবং ট্রান্সক্রিপশন বন্ধ থাকে। এ সময় ক্রোমাটিন সূত্রের মোটামুটি ব্যাস হল 20μm।

(iii) **মধ্যবর্তী ঘনীভূত অবস্থা** (intermediate state of condensation)— এটি সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত এবং সম্পূর্ণ ঘনীভূত অবস্থার মাঝামাঝি। ক্রোমাটিন সূত্রের মোটামুটি ব্যাস হল 10μm।

নিউক্লিওলাসের প্রধান কাজ হল রাইবোসোমীয় আর. এন. এ উৎপাদনে সাহায্য করা। দেখা গেছে যে, rRNA-র পরিপূরক DNA-র সমাবেশ নিউক্লিয়াস গঠনকারী অঞ্চলে হয়। যেসব কোষে প্রোটিন উৎপাদন খুব তাড়াতাড়ি হয়, সেখানে নিউক্লিওলাসগুলি বড় ও সুগঠিত হয়। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, নিউক্লিওলাসে বিভিন্ন পদার্থ সঞ্চিত থাকে। Strasburger-এর মতে, নিউক্লিওলাস (nucleolus) স্পিন্ডিল তন্তু (spindle fibre) গঠন করতে সাহায্য করে। নিউক্লিয়াসে বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি নিউক্লিওলাসে থাকে। এর মাধ্যমে ক্রোমোসোম সাইটোপ্লাজমকে প্রভাবিত করে।

নিউক্লিও ম্যাট্রিক্স (nuclear matrix) :

নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে কাঠামো বা framework থাকে সেটিকে নিউক্লিও ম্যাট্রিক্স বা স্ক্যাফোল্ড (scaffold) বলে। এটি সাইটোস্কেলিটনের মত। নিউক্লিয়াস থেকে সব DNA সরিয়ে ফেলার পর প্রোটিন তন্তু দ্বারা গঠিত জালিকা দেখা যায়। এটিকে নিউক্লিও ম্যাট্রিক্স বলে। বিভিন্ন রকম জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার পর যে অদ্রবনীয়

অংশ থাকে, সেটিই হল নিউক্লিও ম্যাট্রিক্স। এই প্রোটিন নির্দিষ্ট DNA ক্রমের সাথে যুক্ত থাকতে পারে। এই DNA-র ক্রমকে SARs বা MARs (স্ক্যাফোল্ড বা ম্যাট্রিক্সের সাথে যুক্ত অঞ্চল) বলে। এই ম্যাট্রিক্সে hnRNA থাকে। ম্যাট্রিক্সের গঠন এখনও সম্পূর্ণ জানা যায়নি।

নিউক্লিও ম্যাট্রিক্সের কাজ—

(i) এটি নিউক্লিয়াসের আকার নিয়ন্ত্রণ করে।

(ii) এটি নিউক্লিয়াসকে যান্ত্রিক দৃঢ়তা দেয়। এর ফলে উচ্চ আয়নিয় শক্তিযুক্ত বাফার নিউক্লিয়াসের ক্ষতি করতে (degrade) পারে না।

(iii) এই ম্যাট্রিক্স সম্ভবত ক্রোমোসোমের বিন্যাসে সহায়তা করে। এছাড়া এই ম্যাট্রিক্স DNA-র ট্রান্সক্রিপশন এবং রেপ্লিকেশনে সহায়তা করতে পারে।

(iv) প্রোটিন তন্তুগুলি নিউক্লিয়াসের ভিতর থেকে বাইরে একটি পথের সৃষ্টি করে। এই পথ দিয়ে সম্ভবত mRNA নিউক্লিও পর্দার কাছে পৌঁছায়।

নিউক্লিও ল্যামিনা (nuclear lamina) :

ভিতরের নিউক্লিও পর্দার ভিতরের ত্বকে ইন্টারফেজে প্রোটিন দিয়ে গঠিত জালের ন্যায় নিউক্লিও ল্যামিনা থাকে। এটি 30-100μ স্থূল এবং নিউক্লিয়াসের ভিতরের পর্দার সাথে ক্রোমাটিনকে যুক্ত রাখে। এই ল্যামিনায় তিনটি প্রধান বহিঃস্থ পর্দার প্রোটিন থাকে। যথা— ল্যামিন A, B এবং C। এগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে তন্তুযুক্ত পর্দার প্রোটিন গঠন করে। ল্যামিন দু'টি অংশ দ্বারা গঠিত। (i) একটি দণ্ডাকার (rod-shaped) পুচ্ছ, যা মোটামুটি 52μm দীর্ঘ এবং (ii) দু'টি গোলাকার মাথাযুক্ত প্রান্ত। ল্যামিনের গঠন এবং ক্রম সাইটোপ্লাজমীয় মধ্যবর্তী (intermediate) সূত্র বা IF-এর অনুরূপ। ল্যামিনায় ল্যামিন পলিপেপটাইড থাকে। ল্যামিন A ও C-র গঠন মোটামুটি একই রকম। তবে ল্যামিনের A কার্বক্সিল প্রান্তে 133টি অতিরিক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। ল্যামিন B-র বিশেষ পর্দার বন্ধনে (binding) ভূমিকা রয়েছে। ল্যামিন B-র সাথে ল্যামিন A ও C যুক্ত থাকে। এগুলি ল্যামিনা এবং ক্রোমাটিনের মধ্যে মিথস্ক্রিয়াকে সহায়তা করে।

ল্যামিনার কাজ—

(i) কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিও পর্দার অবলুপ্তি এবং পুনঃগঠনে সহায়তা করে।

(ii) ক্রোমাটিনকে নিউক্লিও পর্দার সাথে যুক্ত রাখে।

(iii) কোষগুলি কলচিসিনে অনেকক্ষণ থাকলে ল্যামিনা মাইক্রোনিউক্লিয়াস গঠনে সহায়তা করে।

নিউক্লিও পর্দার ও ল্যামিনের ভেঙে যাওয়া (disasembly) এবং পুনঃসমাবেশ (assembly) :

প্রফেজের প্রারম্ভে ল্যামিন ভেঙে যায় এবং সাইটোপ্লাজমে দেখা দেয়। ল্যামিন

কাইনেজ উৎসেচক ল্যামিনার ফসফোরিলেশন বিক্রিয়াকে সহায়তা করে। এর ফলে ল্যামিনার ডিপলিমারাইজেশন হয়, নিউক্লিও পর্দাও ভেঙে যায় এবং ছোট ছোট ভেসিকেল দেখা দেয় যা সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে যে, ল্যামিন B এসব ভেসিকেলের সাথে যুক্ত থাকে। কিন্তু ল্যামিন A এবং C ডিপলিমারাইজড অবস্থায় ছোট ছোট অলিগোমার গঠন করে, যা সাইটোপ্লাজমে ছড়ান অবস্থায় থাকে।

টেলোফেজে যখন ক্রোমোজোমগুলি অঘনীভূত (decondense) হতে আরম্ভ করে, তখন নিউক্লিও পর্দা ও ল্যামিনা পুনরায় গঠিত হয়। ল্যামিনের ডিফসফোরিলেশন এবং পলিমারাইজেশন হয়। এর ফলে ল্যামিনার তন্তুযুক্ত জালিকা গঠিত হয়। এই সময়েই ছোট নিউক্লিও ভেসিকেলগুলি পরস্পর যুক্ত হয়। এরকম ভেসিকেলগুলির সাথে যুক্ত পলিমারাইজড ল্যামিন B পলিমারাইজড ল্যামিন A ও C-র সাথে যুক্ত হয়। এভাবে ল্যামিনা ক্রোমাটিন এবং নিউক্লিও পর্দার ছোট ছোট ভেসিকেলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। ল্যামিন B নিউক্লিও পর্দার সাথে অন্য ল্যামিন প্রোটিনের সংযোগ রক্ষা করে। তবে ল্যামিন B-র ক্রোমাটিনের সাথে বন্ধনের (binding) ক্ষমতা নেই। কিন্তু ল্যামিন A ও C ক্রোমাটিনের সাথে দৃঢ় বন্ধন গঠন করে।

মাইক্রোনিউক্লিয়াসের উৎপত্তি—

কোষগুলি অনেকক্ষণ কলিচিসিনে থাকলে মাইটোসিসের মেটাফেজ অবস্থা স্থায়ী হয়। ল্যামিন একেকটি ক্রোমোজোমকে আবৃত করে। এগুলি আবার নিউক্লিও পর্দা দিয়ে আবৃত হয়ে মাইক্রোনিউক্লিয়াস (micronucleus) গঠন করে।

প্রোক্যারিওট ও ইউক্যারিওট কোষ

সাধারণত সব জীবের কোষেই সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে। এই রকম কোষকে ইউক্যারিওট (eukaryote) কোষ বলে। এই সব কোষের নিউক্লিয়াসে নিউক্লিওলাস, নিউক্লিও পর্দা থাকে। কিন্তু ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল ইত্যাদিতে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না, এদের প্রোক্যারিওট (prokaryote, Gr. pro-আদি বা প্রথম, karyon— নিউক্লিয়াস) কোষ বলে।

1) এরকম কোষ অত্যন্ত সরল ও প্রাচীন। 2) প্রোক্যারিওট কোষে নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিও পর্দা থাকে না। 3) সাইটোপ্লাজমে পর্দা দিয়ে আবৃত অঙ্গাণু (membrane-bound organelle), যেমন, প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বস্তু, লাইসোসোম ও এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা ইত্যাদি দেখা যায় না। 4) এই ধরনের কোষে বেসিক প্রোটিন হিস্টোন থাকে না। কিন্তু ইউক্যারিওট কোষের ক্রোমোসোমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল হিস্টোন। 5) প্রোক্যারিওট কোষ বিভাজনের সময় স্পিন্ডিল গঠিত হয় না। 6) প্রোক্যারিওট কোষে যদি ফ্ল্যাজেলা বা সিলিয়া থাকে, তাহলে ঐসব ফ্ল্যাজেলা বা সিলিয়ার গঠন অত্যন্ত সরল ধরনের হয় এবং কখনই বহুসূত্রযুক্ত

(multistranded) হয় না। 7) প্রোক্যারিওট কোষে রাইবোসোমগুলি সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে থাকে, কিন্তু ইউক্যারিওট কোষে রাইবোসোম এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে। 8) প্রোক্যারিওট কোষে মেসোসোম অঞ্চলে শ্বসন হয়, কিন্তু ইউক্যারিওট কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া অঞ্চলে শ্বসন হয়। 9) প্রোক্যারিওট কোষে সাধারণত ভ্যাকুওল থাকে না, কিন্তু ইউক্যারিওট কোষে ভ্যাকুওল দেখা যায়।

প্রোক্যারিওট ও ইউক্যারিওটের চরিত্রের সমন্বয় দেখা যায় শৈবাল Dinophyceae-তে (Pyrrophyta)। এই উদ্ভিদগুলি ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট, সামুদ্রিক ও কখনও কখনও স্বাদুজলের শৈবাল। এই উদ্ভিদগুলিকে কোনও কোনও বিজ্ঞানী মেসোক্যারিওট বলেছেন। এদের সাইটোপ্লাজমে ইউক্যারিওটের মত মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড, রাইবোসোম, এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা, গলগি বস্তু ইত্যাদি দেখা যায়। এদের নিউক্লিয়াসের নিউক্লিও পর্দার কোনও ছিদ্র থাকে না। কোষ বিভাজনের কোনও অবস্থাতেই এই নিউক্লিও পর্দা বিনষ্ট হয় না। এদের ক্রোমোসোম সংখ্যা 24 থেকে 100 বা তার চেয়ে বেশি হয়।

ক্রোমোসোমগুলি ইলিপ্সের আকৃতির ও পেঁচান এবং ব্যান্ডবিশিষ্ট (banded) অবস্থায় থাকে। কিন্তু ইউক্যারিওটে এরকম দেখা যায় না। এছাড়া ব্যাকটিরিয়ার মত এখানে প্রত্যেক ক্রোমোসোমের একটি প্রান্ত নিউক্লিও পর্দার সাথে যুক্ত থাকে। মেটাফেজ ও অ্যানাফেজে অনিউক্লিও (extranuclear) মাইক্রোটিউবিউল গঠিত হয়। এগুলি নিউক্লিও পর্দা ভেদ করে প্রসারিত হয়। এটাকে প্রাচীন ধরনের স্পিন্ডিল বলা যেতে পারে। অ্যানাফেজে এই মেমব্রেনযুক্ত টিউবগুলি দীর্ঘ হয় ও নিউক্লিও বস্তু ডামবেল আকৃতির দেখায়। পরে নিউক্লিও মেমব্রেন মাঝে সঙ্কুচিত হয় ও দু'টি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। কোষ বিভাজনের সময় স্পিন্ডিল কলচিসিন দিয়ে প্রভাবিত হয় না। সুতরাং, এর গঠন সাধারণ ইউক্যারিওট কোষের স্পিন্ডিল থেকে আলাদা ধরনের। ক্রোমোসোমের যে অঞ্চল নিউক্লিও মেমব্রেনের সাথে যুক্ত থাকে, সেই অঞ্চলকে সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তবে এই সামঞ্জস্য কার্যগত দিক থেকে, গঠনগত দিক থেকে নয়।

রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, Dinophyceae-র ক্রোমোসোমে খুব সামান্য RNA ও অল্প পরিমাণ প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিন বেসিক প্রকৃতির অর্থাৎ হিস্টোন। Dinophyceae-র DNA-তে থাইমিনের পরিবর্তে 12-68% হাইড্রক্সিমিথাইল ইউরাসিল থাকে। এই রকম নিউক্লিওটাইড কেবল কোনও কোনও ব্যাকটিরিয়ফাজে দেখা যায়। এছাড়া *Exaviaella cassubica* এ 16% 5 মিথাইল সাইটোসিন এবং *Peridinium triquetrum*-এ 3% মিথাইল সাইটোসিন পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য ইউক্যারিওট কোষে এত বেশি পরিমাণ এই সব নিউক্লিওটাইড পাওয়া যায় না। Dinophyceae-র ক্রোমোসোমগুলি সম্ভবত বলয়াকার অবস্থায় থাকে।

Loeblich Dinophyceae-কে ইউক্যারিওট বলেছেন। এগুলি সম্ভবত

ইউক্যারিওট চরিত্র সম্পূর্ণভাবে গঠিত হওয়ার আগেই উদ্ভূত হয়েছিল। সুতরাং, এদের প্রাচীন ধরনের ইউক্যারিওট হিসাবে গণ্য করা চলে।

নিউক্লিয়ড (nucleoid)—প্রোক্যারিওট কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস না থাকলেও নিউক্লিও বস্তু থাকে যা ফালগেন রঙ দিয়ে রঞ্জিত হয়। এই রকম নিউক্লিও বস্তুকে নিউক্লিয়ড বলা হয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে যে, নিউক্লিয়ড অঞ্চল সূক্ষ্ম জালিকার ন্যায়। এই জালিকা একটি ক্রোমোসোম দিয়ে তৈরি। ক্রোমোসোমটি বলয়াকারে (ring) অবস্থান করে। এই দীর্ঘ সূত্রটি বহুশতবার ভাঁজ অবস্থায় থাকে। ব্যাকটিরিয়ার DNA-র বেশিরভাগ অঞ্চলই প্রোটিনের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে না। *E. coli*-তে দেখা গেছে যে, বলয়াকার ক্রোমোসোমের একটি অঞ্চল প্লাজমা পর্দার সাথে সংলগ্ন অবস্থায় থাকে। ঐ অঞ্চল থেকেই DNA দ্বিগুণ হতে শুরু করে।

কোষের বিভিন্ন উপাদানের গঠন ও কাজ

কোষের উপাদান	গঠন	কাজ
I. কোষ প্রাচীর ও পর্দা		
1. কোষ প্রাচীর (উদ্ভিদ কোষে)	অপেক্ষাকৃত স্থূল, দৃঢ় এবং সজীব নয়। প্রধানত সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। এছাড়া, পেকটিন, লিগনিন, সুবারিন, মিউসিলেজ ইত্যাদি থাকতে পারে।	i) উদ্ভিদ কোষের আকার নিয়ন্ত্রণ করে। ii) প্রোটোপ্লাস্টকে রক্ষা করে। iii) কোষকে দৃঢ় করে।
2. প্লাজমা পর্দা	দ্বিস্তরযুক্ত লিপিডকে বেষ্টন করে প্রোটিনের স্তর থাকে।	i) কোষে বিভিন্ন পদার্থের প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। ii) প্রোটোপ্লাস্টকে রক্ষা করে। iii) এক্সোসাইটোসিস এবং এন্ডোসাইটোসিস দেখা যায়। iv) প্রাণী কোষের আকার নিয়ন্ত্রণ করে। v) কোষের বার্তা বহনে সহায়তা করে।

কোষের উপাদান	গঠন	কাজ
II. সাইটোপ্লাজম		
1. সাইটোসল	কোলয়ডীয় পদার্থ এবং দ্রবণীয় উৎসেচক	গ্লাইকোলাইসিস
2. সাইটোস্কেলিটন	i) মাইক্রোফিলামেন্ট এবং বিক্ষিপ্ত উৎসেচক ii) মাইক্রোটিউবিউল পর্দাযুক্ত, ফাঁপা, সর্পিল ভাবে সাজান টিউবিউল দ্বারা গঠিত। এগুলি প্রোটিন টিউবিউলিন দ্বারা গঠিত।	i) কোষের সবলতা নিয়ন্ত্রণ করে। ii) কোষের সচলতা ও iii) কোষের আকার ও দৃঢ়তা নিয়ন্ত্রণ করে। iv) সেন্ট্রিওল, সিলিয়া এবং ফ্ল্যাজেলার উপাদান।
III. এন্ডোপর্দা তন্ত্র (endomembrane system) (দ্বিস্তর পর্দা যুক্ত অঙ্গাণু)		
1. এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা (ER)	সাইটোপ্লাজমে জালিকাকারভাবে বিন্যস্ত পর্দা যুক্ত নলাকার গঠন। এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা টিউবিউল ও ভেসিকেল দ্বারা গঠিত।	i) অন্তঃকোষীয় পরিবহনে সহায়তা করে। ii) কোষের বিভিন্ন কাজ ER-এর গাত্রে হয়। iii) উত্তেজনা (impulse) চলাচলে সহায়তা করে।
(a) মসৃণ প্রাচীর যুক্ত (SER)	ER-র সাথে রাইবোসোম যুক্ত থাকে না।	পরিবহনে সহায়তা করে।
(b) অমসৃণ প্রাচীরযুক্ত (RER)	ER-র সাথে রাইবোসোম যুক্ত থাকে।	প্রোটিন উৎপাদন ও পরিবহনে সহায়তা করে।
2. গলগি বস্তু	চ্যাপ্টা থলি বা সিস্টারনিগুলি পরপর সাজান থাকে ছোট ভেসিকেল এবং ক্ষরণকারী	i) কোষের ক্ষরণে (secretion) সাহায্য করে। ii) লাইসোসোম গঠন করে। iii) কোষ পর্দা গঠনে অংশ নেয়।

	ভ্যাকুওল দেখা যায়।	
3. নিউক্লিও পর্দা	গঠন প্লাজমা পর্দার অনুরূপ।	i) নিউক্লিয়াসকে রক্ষা করে। ii) নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন বস্তুর প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। iii) সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিওপ্লাজমকে পৃথক রাখে।
iv) দ্বিপর্দাযুক্ত অঙ্গাণু		
i) মাইটোকন্ড্রিয়া (শক্তির আধার)	দ্বিস্তর পর্দা দ্বারা আবৃত গোলাকার বা উপবৃত্তাকার গঠন। ভিতরের পর্দা ভাঁজ হয়ে ক্রিস্টি গঠন করে। শ্বসনের উৎসেচক -গুলি মাইটোকন্ড্রিয়ায় থাকে।	i) কোষের শক্তির আধার স্বরূপ। ii) শ্বসন মাইটোকন্ড্রিয়ায় হয়। iii) শক্তি ATP-তে সঞ্চিত থাকে। iv) ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর গঠনে সহায়তা করে।
2. প্লাস্টিড	দুই স্তর পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে।	i) সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শর্করা উৎপন্ন করে।
a) ক্লোরোপ্লাস্ট	ক্লোরোফিল চাকতি মত থাইলাকয়েডে থাকে। গ্রানা ও স্ট্রোমা থাকে।	ii) ক্রোমোপ্লাস্টের উপস্থিতির ফলে বিভিন্ন রঙের সৃষ্টি হয়। ফুলের এরকম রঙ পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে।
b) ক্রোমোপ্লাস্ট	বিভিন্ন রঞ্জক থাকে।	
i) লিউকোপ্লাস্ট	বর্ণহীন প্লাস্টিড	বিভিন্ন পদার্থ সঞ্চিত (শ্বেতসার, প্রোটিন, ফ্যাট) থাকে।
3. ভ্যাকুওল	পর্দা দ্বারা আবৃত হলে পর্দাটিকে টোনোপ্লাস্ট বলে।	বিভিন্ন বস্তু সঞ্চিত থাকে। যেমন বর্জ্য পদার্থ, কোষ থেকে ক্ষরিত বস্তু, পরিপক্ত বস্তু ইত্যাদি।
v) একটি পর্দা দ্বারা বেষ্টিত অঙ্গাণু		
i) লাইসোসোম	আর্দ্র বিশ্লেষক উৎসেচকযুক্ত	i)অন্তঃকোষীয় পরিপাকে

	(hydrolysing enzyme) পর্দাবিশিষ্ট	সহায়তা করে। প্রোটিন শ্বেতসার ইত্যাদি পরিপাকে সক্ষম উৎসেচক থাকে। ii) কোষে অনুপ্রবিষ্ট ব্যাকটিরিয়ার পরিপাক করে। iii) কোষস্থ বস্তুর স্ববিগলন (autodissolution)।
2. পেরক্সিসোম	জারণকারী (oxidative) উৎসেচকযুক্ত পর্দা বিশিষ্ট	i) বিপাকীয় বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। জলের বিশ্লেষে সহায়তা করে। ii) পিউরিন বিপাকে অংশ নেয়। iii) পেরক্সাইড বিপাকের সাথে সম্পর্কিত উৎসেচক সঞ্চিত থাকে।
3. গ্লিঅক্সিসোম	জারণকারী উৎসেচকযুক্ত পর্দা বিশিষ্ট (sac)।	গ্লাইকোজাইলেট চক্র গ্লিঅক্সিসোমে হয়।

vi) পর্দাবিহীন অঙ্গাণু

রাইবোসোম	rRNA ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত। সাইটোসলে থাকে অথবা এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার বহিঃগাত্রে যুক্ত থাকে (RER)।	প্রোটিন সংশ্লেষে সহায়তা করে।

vii) মাইক্রোটিউবিউলযুক্ত পর্দা বিহীন অঙ্গাণু

i) সেন্ট্রিওল	সেন্ট্রোসোমের এক জোড়া ফাঁপা বেলনাকার অঞ্চল। নয়টি ট্রিপল (triple) মাইক্রোটিউবিউল দিয়ে গঠিত।	i) কোষ বিভাজনে সিন্ডিল তন্তু গঠন করে। ii) 'বেসাল বডি' গঠনে সহায়তা করে। iii) ফ্ল্যাজেলা গঠনে সাহায্য করে।

2. সিলিয়া	ফাঁপা নলাকার গঠন। কেন্দ্রে দু'টি এবং পরিধিতে নয়টি মাইক্রোটিউবিউল থাকে। কোষের ত্বকের উপর থাকে।	i) কোষের চলনে সহায়তা করে। ii) কোষের বাইরে বিভিন্ন পদার্থের চলনে সহায়তা করে।
3. ফ্ল্যাজেলা	সিলিয়ার মত, তবে দীর্ঘতর	কোষের গমনে (locomotion) সহায়তা করে।
4. বেসাল বডি	সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলার অনুরূপ, তবে এগুলির পদে (base) অবস্থান করে।	সিলিয়া এবং ফ্ল্যাজেলার চলনে সামঞ্জস্য বিধান করে।
viii) নিউক্লিয়াস		
1. ক্রোমাটিন	DNA ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত দীর্ঘ সূত্রের জালিকা	i) কোষের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। ii) বংশগত চরিত্র বংশ পরম্পরায় বাহিত হতে সহায়তা করে।
2. নিউক্লিওলাস	নিউক্লিয়াসের ভিতরের গোলাকার অংশ। নিউক্লিওলাসে RNA ও প্রোটিন থাকে।	i) রাইবোসোমের উপএককগুলি সংশ্লেষে সহায়তা করে।
নিউক্লিও পর্দা	আগে বিবরণ দেওয়া হয়েছে।	

পঞ্চম অধ্যায়

কোষ বিভাজন

সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর ধর্মই হল যে, তারা বড় হতে পারে। উদ্ভিদের কাণ্ড, মূলের অগ্রভাগ ক্রমাগত বাড়তে পারে। এই বৃদ্ধির সময় নতুন নতুন কোষের সৃষ্টি হয়। সব কোষই আগের কোনও কোষের বিভাজনের ফলে তৈরি হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা কোষ বিভাজন লক্ষ্য করেন।

সাধারণত কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম দু'টি বিভাজিত হয়। কিন্তু কখনও কখনও কেবল নিউক্লিয়াস কিম্বা কেবল সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয়। যেসব উদ্ভিদের দেহ সিনোসাইটিক (অর্থাৎ যাদের দেহে মধ্যবর্তী প্রাচীর নেই) সেখানে শুধু নিউক্লিয়াসের বিভাজন হয়। সী অর্চিনের (sea urchin) ডিম্বাণুতে নিউক্লিও বিভাজন ছাড়াই সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয়। কোষ বিভাজনের হার জীবের প্রয়োজন, জেনেটিক গঠন, বয়স ও পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। একটি জীব থেকে অন্য জীবে কোষ বিভাজনের ধারার কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও, মূল প্রক্রিয়াটি মোটামুটি একই।

মাইটোসিস (mitosis)

কোষ বিভাজন বিভিন্ন রকমের হয়। যে ধরনের কোষ বিভাজন দেহ কোষে দেখা যায়, সেই বিভাজনকে মাইটোসিস (mitosis) বলে। Flemming (1882) প্রাণী কোষে এবং Strasburger উদ্ভিদ কোষে মাইটোসিস বিভাজনের বর্ণনা দেন। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের ফলে দু'টি সমান আকারের অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়। এই অপত্য কোষ দু'টির ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার সমান হয়। এই কারণে মাইটোসিস বিভাজনকে অনেক সময় সমবিভাজন (equational division) বলা হয়। মাইটোসিস দেহ কোষে, (যেমন, উদ্ভিদের কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগের কোষে) দেখা যায়। এইজন্য এই বিভাজনকে সোমাটিক (somatic) কোষ বিভাজনও বলা হয়।

মাইটোটিক বিভাজনের ফলে সমান আকৃতির ও প্রকৃতির দু'টি অপত্য কোষ গঠিত হয়। এই অপত্য কোষগুলি বিভাজিত হলে আবার একই আকৃতি ও প্রকৃতির নতুন অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়। বহুকোষী জীবের বেলায় এই রকম কোষ বিভাজনের ফলে ঐ জীবের আয়তন বাড়ে। কিন্তু এককোষী জীব কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে,

অর্থাৎ এখানে কোষ বিভাজন হল অঙ্গজ জননের একটি পদ্ধতি। অনেক সময় দেহের কোনও কোনও কোষ বিনষ্ট হয়ে যায় ও তাদের জায়গায় নতুন কোষের প্রয়োজন হয়। যেমন মানবদেহের রক্তের এরিথ্রোসাইট (erythrocyte) ও চোখের কর্ণিয়ার (cornea) বাইরের কোষগুলি। সুতরাং, জীবের বৃদ্ধি ও সংস্কারের জন্য সব সময় নতুন কোষের প্রয়োজন ও এই নতুন কোষ কোষ বিভাজনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হতে পারে। কোষ বিভাজনের মাধ্যমে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

মাইটোসিস বিভাজনের প্রথমে নিউক্লিয়াস দু'টি সমান অপত্য নিউক্লিয়াসে বিভাজিত হয়। নিউক্লিয়াসের এই বিভাজনকে **ক্যারিওকাইনেসিস** (karyokinesis) বলে। 1878 খ্রিস্টাব্দে Schleicher ক্যারিওকাইনেসিস শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। নিউক্লিয়াসের বিভাজনের পরে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয়। Whitmann 1887 খ্রিস্টাব্দে সাইটোপ্লাজমের এই বিভাজনকে **সাইটোকাইনেসিস** (cytokinesis) নামকরণ করেন। কোষ বিভাজনের সময় কোষে বিভিন্ন পরিবর্তন হয়। এইসব পরিবর্তন একটার পর আরেকটা পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে, যতক্ষণ না কোষটি সম্পূর্ণ বিভাজিত হচ্ছে। মাইটোসিস বিভাজনকে বর্ণনার সুবিধার জন্য কয়েকটি অবস্থায় বা দশায় (stage) ভাগ করা হয়। এই দশাগুলি হচ্ছে প্রফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ। অনেক সময় প্রফেজ থেকে মেটাফেজের পরিবর্তনকে প্রোমেটাফেজ বলা হয়। দু'টি মাইটোসিস বিভাজনের মধ্যবর্তী অবস্থাকে ইন্টারফেজ বলা হয়। ইন্টারফেজ ও মাইটোসিস বিভাজনের বিভিন্ন দশার বর্ণনা দেওয়া হয়।

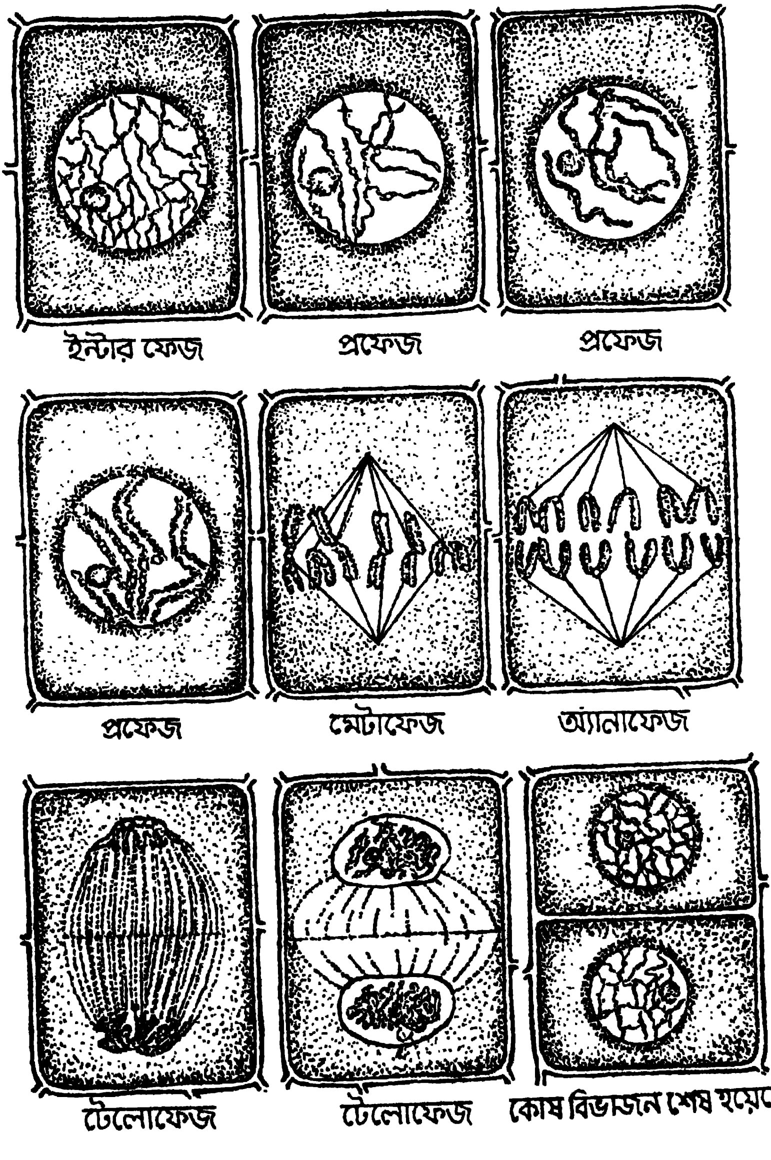
ইন্টারফেজ (interphase)— এই অবস্থায় কোষ বিভাজন হয় না বলে ইন্টারফেজকে (চিত্র 45) বিশ্রাম অবস্থাও (resting stage) বলা হয়। এই সময় কোষটি কোষ বিভাজন ছাড়া অন্য সব কাজ করে, সেইজন্য এই রকম কোষকে মেটাবলিক (metabolic) কোষও বলা হয়ে থাকে।

ইন্টারফেজ অবস্থার স্থায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীতে বিভিন্ন রকমের হয়। কোথাও ইন্টারফেজ অবস্থার স্থায়িত্ব 18-24 ঘণ্টা, আবার কোথাও বা এর স্থায়িত্ব কয়েক দিন পর্যন্ত হয়।

একটি মাইটোসিস বিভাজনের শেষ (অর্থাৎ টেলোফেজ) থেকে পরবর্তী মাইটোসিস বিভাজনের আরম্ভ (অর্থাৎ প্রফেজ) পর্যন্ত দশাকে **ইন্টারফেজ** বলে। এর তিনটি পর্যায় হল G_1, S এবং G_2। S phase বা সংশ্লেষ দশায় (synthetic phase) কেবল DNA উৎপন্ন হয়। এর আগের G_1 দশায় DNA উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সব বস্তু উৎপন্ন হয়।

i) G_1 দশা G_1 Phase (G = গ্যাপ)

টেলোফেজের শেষ (post-mitotic) থেকে S দশার আরম্ভ পর্যন্ত হল G_1 দশা বা প্রথম বৃদ্ধি দশা। G_1 অবস্থার স্থায়িত্ব বিভিন্ন রকম হয়। এই দশা ইন্টারফেজের 25-50% সময় স্থায়ী হয়। কোনও ক্ষেত্রে G_1 দশা স্বল্পস্থায়ী অথবা অনুপস্থিত হয়। যেসব



চিত্র—45

মাইটোসিস বিভাজনের বিভিন্ন অবস্থা

কোষ আর বিভাজিত হচ্ছে না (যেমন যকৃতের কোষ, লিম্ফোসাইট), সেগুলি স্থায়ীভাবে G_1 দশায় থাকে। G_1 দশায় কোষগুলি আয়তনে বাড়ে।

G_1 অবস্থায় মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, গলগি বস্তু, এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকা, লাইসোসোম, রাইবোসোম, ভেসিকেল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এছাড়া এই দশায় mRNA, tRNA, প্রোটিন, DNA উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু (substrate) এবং উৎসেচক গঠিত হয়। কিন্তু এ সময়ে কোনও DNA উৎপন্ন হয় না। G_1 দশায় কোষের বিপাকীয় হার (metabolic rate) অত্যন্ত বেশি হয়।

কোষে G_1 দশায় যখন বিভিন্ন বস্তু তৈরি হয়েছে এবং কোষের পুষ্টি সংক্রান্ত অবস্থা DNA উৎপাদনের জন্য যথাযথ, তখন S অবস্থার আরম্ভ হতে পারে। এই পর্যায়কে প্রারম্ভ (start) বা restriction point বলে।

G_0 অবস্থা

যেসব কোষ আর বিভাজিত হয় না, সেগুলি স্থায়ীভাবে G_1 অবস্থায় থাকে। এরকম কোষ S দশায় যেতে পারে না প্রধানত পুষ্টির অভাব এবং বৃদ্ধি সহায়ক ফ্যাক্টরের (growth factor) অনুপস্থিতির জন্য। যেহেতু এসব কোষ কোষচক্র (cell cycle) থেকে সরে এসেছে, সেজন্য এই দশাকে G_0 দশা বা বিশ্রাম দশা (resting stage) বলে। এরকম কোষকে বিশ্রাম কোষ (resting cell) বলা হয়। যেমন— যকৃতের কোষ।

S অবস্থা (S = সংশ্লেষ বা synthesis)

G_1 ও G_2-র মধ্যবর্তী দশা হল S। G_1 শেষ হলে S দশা আরম্ভ হয়। এই দশায় DNA এবং হিস্টোন উৎপন্ন হয়, যার থেকে ক্রোমাটিড গঠিত হতে পারে। S অবস্থায় নব গঠিত DNA সূত্র পুরনো সূত্রের এত কাছে থাকে যে, DNA-র দ্বিগুণ অবস্থা ভালভাবে বোঝা যায় না। ক্রোমাটিড দু'টি সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে যুক্ত থাকে। S অবস্থার স্থায়িত্ব হল ইন্টারফেজের 35-40%।

G_2 অবস্থা

G_2 অবস্থা মাইটোসিসের আগের (pre-mitotic) দ্বিতীয় বৃদ্ধি দশা। এই দশা ইন্টারফেজের সবচেয়ে স্বল্প স্থায়ী দশা। এই দশায় কোষের সব রকম বিপাকীয় কাজ হয়। এসময়ে মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্ট বিভাজিত হয়। কোষে শক্তির সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। এই দশায় নিউক্লিও RNA, rRNA এবং mRNA ইত্যাদি উৎপন্ন হতে পারে।

G_2 অবস্থার পরের অবস্থাকে **M অবস্থা** বলে। প্রফেজের শুরুর সাথে সাথে M অবস্থার শুরু হয় এবং টেলোফেজের শেষে দু'টি অপত্য কোষ গঠিত হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়, অর্থাৎ M অবস্থায় কোষ বিভাজন হয়।

কোষ চক্রের নিয়ন্ত্রণ—

ইন্টারফেজে দু'টি নিয়ন্ত্রক বিন্দু (control point) রয়েছে। এগুলি হল G_1/S এবং G_2/M। এই পর্যায়কে নিয়ন্ত্রক বিন্দু বা check point বলে। এসময়ে কোষ পরবর্তী

দশায় যেতে পারবে কিনা সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য কোষের যেসব ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল—

i) DNA দ্বিগুণ হওয়ার জন্য সব অবস্থা উপযোগী কিনা?

ii) সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা? যা কোষ বিভাজনের জন্য প্রয়োজন।

iii) DNA-র রেপ্লিকেশন সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা, এবং DNA অক্ষত অবস্থায় (undamaged) আছে কিনা?

কোষ চক্রের প্রয়োজনীয় উৎসেচক—

MPF বা maturation promoting faction বা পরিণতির সহায়ক ফ্যাক্টর বা M দশার সহায়ক ফ্যাক্টর কোষকে M দশায় যেতে সাহায্য করে। MPF-এর উৎসেচক কার্যকারিতা রয়েছে, সেজন্য এটিকে M Phase কাইনেজ বা M দশা কাইনেজ বলে। এর দু'টি প্রোটিন উপএকক— P^{45} এবং P^{34} রয়েছে।

P^{34} 'টার্গেট' প্রোটিনের সেরিন ও থ্রিওনিনের অবশিষ্টাংশকে (residue) ফসফেটযুক্ত (phosphorylate) করে।

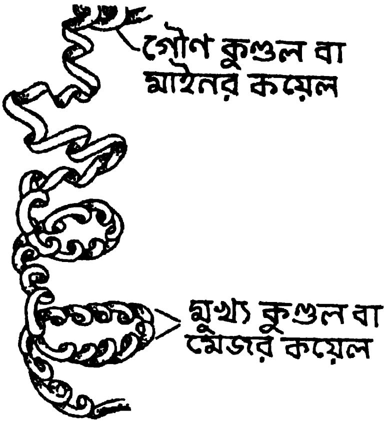
P^{45}-এর যথাযথ সাবস্ট্রেটের সাথে কাইনেজ কার্যকারিতা রয়েছে। এই উপএককে সাইক্লিন (cyclin) বলে। সাইক্লিন দুই রকমেব A ও B। ব্যাঙে এবং স্তণ্যপায়ী প্রাণীতে দু'রকমের B সাইক্লিন (B_1 ও B_2) রয়েছে।

M দশার শুরুতে P^{34} উপএকক সক্রিয় হয়। মাইটোসিসের সময় P^{45} বা সাইক্লিন ক্রমশ ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়। এর ফলে M দশার কাইনেজ P^{34} নিষ্ক্রিয় হয়। এজন্য অপত্য কোষগুলি মাইটোসিস দশা শেষ করে।

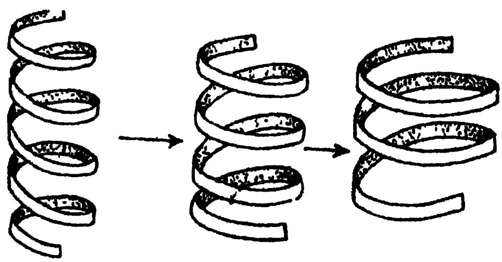
M দশার কাইনেজ সক্রিয় হলে G_2 অবস্থার কোষটি M দশায় চলে আসে। G_2 দশায় দু'টি উপএকক অর্থাৎ P^{34} এবং সাইক্লিন পরস্পর যুক্ত হয়। এর ফলে নিষ্ক্রিয় P^{34} সাইক্লিন ডাইমার গঠিত হয়। এর পরে P^{34}-এর তিনটি অঞ্চল দু'টি ধাপে ফসফেটযুক্ত হয়। প্রথম ধাপে থ্রিওনিন 14 (Thr 14) এবং টাইরোসিন 15 (Tyr 15) ফসফেটযুক্ত হয়। দ্বিতীয় ধাপে থ্রিওনিন 161 (Thr 161) ফসফেটযুক্ত হয়।

এরপরে P^{34} থেকে ফসফেট বাদ যায় (Thr 14, Thr 15 থেকে) এবং একই সময় সাইক্লিন ফসফেট যুক্ত হয়। P^{34} এর ফসফেট বাদ যাওয়া (dephosphorylation) এবং সাইক্লিনের ফসফেট যুক্ত হওয়ার (phophorylation) ফলে M দশা আরম্ভ হয়। ফসফেটযুক্ত সাইক্লিন মাইটোসিসের সময় প্রোটিওলাইসিসের ফলে বিনষ্ট হয়। সাইক্লিন বিনষ্ট হওয়ার ফলে P^{34} সম্পূর্ণ ফসফেট বিহীন হয় এবং নিষ্ক্রিয় হয়। এই অবস্থায় কোষ ইন্টারফেজ দশায় চলে আসে। নতুন কোষ চক্র শুরু করার জন্য সাইক্লিনের উৎপাদন প্রয়োজন।

প্রফেজ (prophase) — প্রফেজ (চিত্র 45) মাইটোসিস্ বিভাজনের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা। প্রফেজ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই নিউক্লিও জালিকা কতকগুলি



চিত্র—46a
ক্রোমোসোমের পেঁচ বা কয়েল



চিত্র—46b
মুখ্য পেঁচ বা মেজর কয়েলের সংখ্যা কমছে, কিন্তু ব্যাস বাড়ছে।
গৌণ পেঁচ (মাইনর কয়েল) দেখান হয়নি

সরু আকাবাঁকা সূতার মত অংশে বিচ্ছিন্ন হয়। প্রথম অবস্থায় এই সূতাগুলি পরস্পর জড়ান থাকে, পরে এগুলি আলাদা হয়ে যায়। এই সূত্রগুলিকে 'ক্রোমোনিমা' (chromonema) বলে। কোনও কোনও সময় ক্রোমোনিমায় বড় বড় পেঁচ বা কুণ্ডল দেখা যায়। এর পর প্রত্যেক ক্রোমোনিমা লম্বালম্বিভাবে দুইটি অংশে বিভাজিত হয়। প্রফেজের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রোমোনিমাটা ক্রমশ ছোট ও স্থূল হতে থাকে। ক্রোমোনিমার চারিদিকে এই সময় ম্যাট্রিক্স দেখা দেয় ও ম্যাট্রিক্সের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। এইসব সূত্রকে ক্রোমোসোম (chromosome) বলে। প্রত্যেক ক্রোমোসোমে দুইটি ক্রোমাটিড থাকে। ক্রোমাটিড দুইটি পরস্পর ভালভাবে পেঁচান থাকে। এই পেঁচগুলিকে প্লেকটোনেমিক কয়েলিং (plectonemic coiling) বলে (চিত্র 57)। জলের পরিমাণ ক্রমশ কমে যাওয়ার ফলে ক্রোমোসোমগুলি আরও ঘনীভূত (condensed) হয়। প্রত্যেক ক্রোমাটিড লম্বালম্বিভাবে আবার বিভাজিতহয়ে দুইটি অর্ধ ক্রোমাটিডের সৃষ্টি করে অর্থাৎ,

এই অবস্থায় প্রত্যেক ক্রোমোসোমে চারটি অর্ধ ক্রোমাটিড থাকে। ক্রোমাটিডে দুই রকমের পেঁচ দেখা যায়— major coil বা মুখ্য কুণ্ডল এবং minor coil বা গৌণ কুণ্ডল (চিত্র 46a, b)। প্রফেজের অগ্রগতির সাথে সাথে মুখ্য কুণ্ডলের সংখ্যা কমে যায় কিন্তু ব্যাস বাড়ে। প্রফেজের শেষভাগে নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিও পর্দা ক্রমশ অদৃশ্য হয়। প্রফেজ অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি ছড়ান থাকে। এর কারণ সম্ভবত ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে বিকর্ষণ। প্রাণীর কোষে প্রফেজ অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি নিউক্লিও পর্দার দিকে অবস্থান করে এবং সেন্ট্রোসোম (centrosome) বিভাজিত হয়ে দুইটি অপত্য সেন্ট্রোসোমের সৃষ্টি করে। সেন্টিওল দুইটি বিপরীত মেরুর দিকে যায়। প্রত্যেক অপত্য সেন্ট্রিওল থেকে অ্যাস্টারীয় রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে।

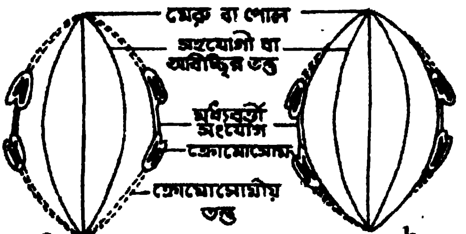
প্রোমেটাফেজ বা প্রিমেটাফেজ (pro-metaphase বা প্রাক-মেটাফেজ অবস্থা— এই অবস্থায় স্পিন্ডিল (spindle) তৈরি হয়। প্রথমে কতকগুলি সরু সূতার মতো মাইক্রোটিউবিউলের (microtubule) সৃষ্টি হয় ও পরে ওই মাইক্রোটিউবিউলগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে স্পিন্ডিল গঠন করে। বিভিন্ন জীবে স্পিন্ডিল গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোটিউবিউলের সংখ্যার তারতম্য হয়। ইস্ট কোষের স্পিন্ডিলে দশটি মাইক্রোটিউবিউল থাকে। একটি মাইক্রোটিউবিউলের ব্যাস 150–200Å হয়। একটি তন্তুতে 100টি পর্যন্ত মাইক্রোটিউবিউলের বান্ডিল থাকতে পারে। স্পিন্ডিলের মাইক্রোটিউবিউলের প্রাচীরে 12-13টি সাবফিলামেন্ট থাকতে পারে। সাবফিলামেন্টগুলি 100Å ব্যাসযুক্ত ও একটি কেন্দ্রীয় ফাঁকা অঞ্চলের (hollow core) চারিদিকে সাজান থাকে। স্পিন্ডিল প্রোটিন মাইটোসিসের ঠিক আগে G_2 অবস্থায় উৎপন্ন হয়। স্পিন্ডিল তন্তুর প্রোটিনগুলির মধ্যে বন্ধন (bond) কীভাবে হয় তা সঠিক জানা নেই। প্রাথমিক অবস্থায় প্রোটিনের পলিমার গঠনের সাথে সালফাহাইড্রেল গ্রুপ (SH) জড়িত। স্পিন্ডিল তন্তু গঠিত হওয়ার পর ডাইসালফাইড লিঙ্কেজ (S–S) তন্তুকে অটুট রাখতে সাহায্য করে। স্পিন্ডিলের প্রান্ত দুইটিকে মেরু বা pole ও মাঝখানের অঞ্চলকে নিরক্ষরেখা বা equator বলে। কোনও কোনও প্রাণীর স্পিন্ডিল পিপাকৃতির হয় ও এদের মেরু দুইটি চ্যাপ্টা থাকে, আবার কোনও কোনও পতঙ্গের স্পিন্ডিলের মেরু দুইটি ছড়ান থাকে। স্পিন্ডিল প্রধানত প্রোটিন ও সামান্য RNA (5%) দিয়ে তৈরি। স্পিন্ডিল রঙ নেয় না বলে এদের achromatic figure বা বর্ণহীন গঠন বলা হয়ে থাকে। কোষ বিভাজনে স্পিন্ডিলের গুরুত্ব অপরিসীম কারণ, স্পিন্ডিল স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে না পারলে কোষ বিভাজন অস্বাভাবিক হয়। সাধারণত স্পিন্ডিলের তন্তুগুলিকে (fibre) দেখা যায় না, কিন্তু অ্যাসিড বা অম্ল মাধ্যমে এই তন্তুগুলিকে দেখা যায়। যেহেতু বেশির ভাগ ফিক্সেটিভে অ্যাসিড থাকে, সেজন্য কিছু বিজ্ঞানী স্পিন্ডিলের উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু 1944 খ্রিস্টাব্দে Schrader সজীব কোষে স্পিন্ডিল তন্তুর উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোষ থেকে ক্রোমোসোম সমেত স্পিন্ডিলকে

বের করা সম্ভব হয়েছে এবং এর থেকে স্পিন্ডিলের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। কোনও কোনও বিজ্ঞানী মনে করেন যে, স্পিন্ডিলের সৃষ্টি দু'টি পর্যায়ে হয়। প্রথম পর্যায়ে সাইটোপ্লাজম থেকে যে স্পিন্ডিল তৈরি হয় তাকে central spindle বা কেন্দ্রীয় স্পিন্ডিল বলে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নিউক্লিও মেমব্রেনের অবলুপ্তির পর নিউক্লিও বস্তু থেকে স্পিন্ডিলের ক্রোমোসোমীয় তন্তুগুলি গঠিত হয়।

প্রোমেটাফেজ অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি নিরক্ষরেখার দিকে যেতে চায় এবং ক্রোমোসোমগুলির সেন্ট্রোমিয়ার অংশ স্পিন্ডিল তন্তুর সাথে যুক্ত থাকে।

মেটাফেজ (metaphase)— কোষ বিভাজনের অন্যান্য অবস্থার তুলনায় মেটাফেজ (চিত্র 39) স্থির অবস্থা। মেটাফেজ ক্রোমোসোমগুলি স্পিন্ডিল তন্তুর সাথে নিরক্ষরেখায় (equator) সংযুক্ত থাকে। প্রত্যেক ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার অংশ নিরক্ষরেখায় অবস্থান করে এবং বাহু দু'টি যে কোনও দিকে প্রসারিত থাকে। যেসব তন্তুর সাথে সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত থাকে তাদের আকর্ষ তন্তু (tractile fibre) বা ক্রোমোসোমীয় তন্তু (chromosomal fibre) কিংবা বিচ্ছিন্ন তন্তু বলে। স্পিন্ডিলের যেসব তন্তু এক মেরু থেকে অন্য মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাদের অবিচ্ছিন্ন বা সহযোগী (supporting fibre) তন্তু বলে। ক্রোমোসোমীয় তন্তুর প্রকৃতি বিতর্কিত। কিছু বিজ্ঞানীগণের মতে, এই তন্তু ক্রোমাটিডের সম্প্রসারিত অংশ কিংবা ক্রোমাটিড থেকে সৃষ্ট কোনও পদার্থ দিয়ে গঠিত। আবার অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতে, ক্রোমোসোমীয় তন্তু নিউক্লিও রস কিংবা সাইটোপ্লাজম থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ক্রোমোসোমীয় তন্তু ফালগেন রঙ (feulgen stain) দিয়ে রঞ্জিত করা যায়। এজন্য মনে করা হয় যে, এই তন্তু ক্রোমোসোমের থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। সহযোগী তন্তু সাইটোপ্লাজম থেকে তৈরি হয়।

Schrader 1953 খ্রিস্টাব্দে বলেন যে, স্পিন্ডিল গঠনের ওপর নির্ভর করে মাইটোসিসকে দু'টি ভাগ করা যায়— a) প্রত্যক্ষ (direct) এবং b) পরোক্ষ (indirect) মাইটোসিস (চিত্র 47a, b)। প্রত্যক্ষ মাইটোসিসে স্পিন্ডিলে ক্রোমোসোমীয় তন্তু থাকে। পরোক্ষ মাইটোসিসে কেবল সহযোগী তন্তু (supporting fibre) দেখা যায়। এইসব সহযোগী তন্তু নিউক্লিও পর্দা লোপ পাবার আগেই সৃষ্টি হয়। এই তন্তুর বাইরের দিকে ক্রোমোসোমগুলি আটকানো থাকে। ক্রোমোসোমীয় বা আকর্ষ তন্তু (tractile fibre) একদিকে সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে, অন্যদিকে মেরুর সাথে যুক্ত থাকে। এজন্য মনে করা হয় যে, ক্রোমোসোমীয় তন্তু সেন্ট্রোমিয়ার ও মেরুর প্রভাবে



চিত্র—47
বিভিন্ন ধরনের স্পিন্ডিল। a — প্রত্যক্ষ, b — পরোক্ষ

গঠিত হয়। অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতে সব মাইটোসিসই প্রত্যক্ষ ধরনের।

মেটাফেজ সেন্ট্রোমিয়ার সাধারণত অবিভাজিত অবস্থায় থাকে। ক্রোমোসোমগুলি মেটাফেজে সবচেয়ে ছোট ও মোটা দেখায়। এই সময় মুখ্য কুণ্ডলের (major coil) সংখ্যা সবচেয়ে কম হলেও এদের ব্যাস সবচেয়ে বেশি হয়। মেটাফেজ ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটির মধ্যে পেঁচ খুলে যায়, ফলে ক্রোমোটিড দু'টি আলাদা হয়ে পাশাপাশি থাকে। প্রাণীর কোষের মেটাফেজে দু'টি মেরু থেকে অনেক সূতার মত রশ্মি (ray) সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে পড়ে। এদের অ্যাস্টরীয় রশ্মি বা astral ray (চিত্র 30) বলে। একটা মেরুর অ্যাস্টরীয় রশ্মিগুলিকে একসাথে aster বলা হয়। সাধারণত ক্রোমোসোমগুলি স্পিন্ডিলের পরিধির দিকে নিরক্ষরেখায় (equator) সাজান থাকে। ক্রোমোসোমগুলি খুব ছোট ও অসংখ্য হলে ওইগুলি নিরক্ষরেখার সব জায়গায় ছড়ান থাকে। যেসব জীবে ক্রোমোসোমের আয়তনের যথেষ্ট তারতম্য আছে, সেখানে বড় ক্রোমোসোমগুলি স্পিন্ডিলের পবিধির দিকে থাকে। মেটাফেজের শেষে সেন্ট্রোমিয়ার বিভজিত হয়।

অ্যানাফেজ (anaphase) — অ্যানাফেজে (চিত্র 45) প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটি বিপরীত মেরুর দিকে যেতে আরম্ভ করে। এই সময় ক্রোমাটিডগুলিকে অপত্য (daughter) ক্রোমোসোম বলে। সেন্ট্রোমিয়ার অংশটি সবচেয়ে আগে মেরুর দিকে যায় ও বাহু দুইটি পেছনে থাকে। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমগুলি বিভিন্ন আকারের হয়। যেমন— V-আকৃতির, J-আকৃতির কিম্বা I আকৃতির। দুই মেরুর দিকে চলনশীল ক্রোমোসোমগুলি কতকগুলি তন্তু দিয়ে যুক্ত থাকে। এদের সংযোগকারী তন্তু বা ইন্টারজোনাল ফাইবার (interzonal fibre) বলে। সুতরাং, ইন্টারজোনাল ফাইবার হল, দু'টি অপত্য ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারদ্বয়ের মধ্যের সংযোগকারী সূত্র। অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের পেঁচগুলি খুলতে আরম্ভ করে। এই অবস্থার শেষ দিকে আকর্ষ তন্তু (tractile fibre) ও ম্যাট্রিক্স অদৃশ্য হয় ও ক্রোমোনিমা আবার দেখা যায়। ক্রোমোসোমগুলি মেরুতে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানাফেজের সমাপ্তি হয়।

অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের সঞ্চালনের (movement) কারণ নিয়ে বিভিন্ন মত আছে। বিভিন্ন মতগুলি হল— a) আকর্ষ তন্তুর প্রোটিন অণুগুলির সঙ্কোচনের জন্য ক্রোমোসোমগুলি মেরুর দিকে যায়। b) কোনও কোনও বিজ্ঞানীগণের মতে ক্রোমোসোমের কাছে সাইটোপ্লাজমে পর্যায়ক্রমে ঘনত্বের তারতম্যই ক্রোমোসোমগুলির সঞ্চালনের কারণ। c) মেরুর দিকে সাইটোপ্লাজমের একটা ক্ষীণ প্রবাহ দেখা যায় ও এই প্রবাহই ক্রোমোসোমগুলিকে মেরুর দিকে চালিত করে। যেসব কোষে অ্যাস্টর (aster) থাকে, সেখানে মেরুর দিকে একটা স্রোত প্রবাহিত হতে দেখা গিয়েছে। d) স্পিন্ডিলের দৈর্ঘ্য বাড়ার জন্য ক্রোমোসোমগুলি মেরুর দিকে যায় (Belar '29, Barber '39, Ris '43, '49, Hughes ও Swann '48)।

e) ক্রোমোসোমগুলিতে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ (—) ও মেরুতে ধনাত্মক বিদ্যুৎ (+) থাকে। এইজন্য ক্রোমোসোমগুলি মেরুর দিকে আকৃষ্ট হয়। Darlington-এর মতে, স্থির বৈদ্যুতিক (electrostatic) শক্তিই ক্রোমোসোমকে চালিত করে। f) ক্রোমোসোমগুলির প্রাথমিক গতি আকর্ষ তন্তুর সঙ্কোচনের জন্য হয় ও পরবর্তী গতি স্পিন্ডিলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। স্পিন্ডিলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে মাঝের অংশটি সরু হয়ে যায় এবং ওই অংশকে 'স্টেম বডি' (stem body) বলা হয়। g) কোনও কোনও বিজ্ঞানীগণের মতে, অ্যানাফেজ ক্রোমোসোমের প্রাথমিক গতি দুইটি অপত্য ক্রোমাটিডের সেন্ট্রোমিয়ারগুলির মধ্যে বিকর্ষণের জন্য হয় (Lillie 1909)।

Ris-এর (1943) মতে, প্রাণী কোষে স্পিন্ডিলের দৈর্ঘ্য বাড়ার জন্য ক্রোমোসোমগুলি মেরুর দিকে যায়। কিন্তু উদ্ভিদ কোষে স্পিন্ডিল তন্তুর সঙ্কোচনের ফলে ক্রোমোসোমগুলি মেরুর দিকে চালিত হয়।

সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য সম্ভাবনা হল, বিভিন্ন ধরনের তন্তুর সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে ক্রোমোসোমের চলন হয়। ক্রোমোসোমীয় তন্তুর সঙ্কোচনের ফলে ক্রোমোসোমগুলি মেরুর দিকে চালিত হয়। একই সময় ইন্টারজোনাল ফাইবারগুলির সম্প্রসারণ ক্রোমোসোমগুলিকে মেরুর দিকে ঠেলে দেয়। ক্রোমোসোমের চলনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ATP থেকে আসে।

অ্যানাফেজ ক্রোমোসোমের চলনের জন্য 10" dyne শক্তির প্রয়োজন। বিষুবরেখা থেকে মেরু পর্যন্ত ক্রোমোসোমের চলনের জন্য 30টি ATP অণুর প্রয়োজন।

ক্রোমোসোমের মেরুর দিকে চলনের সময় কাইনেটোকোরের মাইক্রোটিউবিউল-গুলি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এজন্য টেলোফেজে এগুলি প্রায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়।

চিহ্নিত বা লেবেলড্ (labelled) টিউবিউলিন মেটাফেজে কোষে প্রবেশ করিয়ে (inject) ক্রোমোসোমের চলনের সময় মাইক্রোটিউবিউলের কাইনেটোকোর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নির্ণয় করা যায়। লেবেলড টিউবিউলিনগুলি কাইনেটোকোরের সঙ্গে যুক্ত হয়। অ্যানাফেজের অগ্রগতির সঙ্গে এগুলি বিচ্ছিন্ন হতে থাকে।

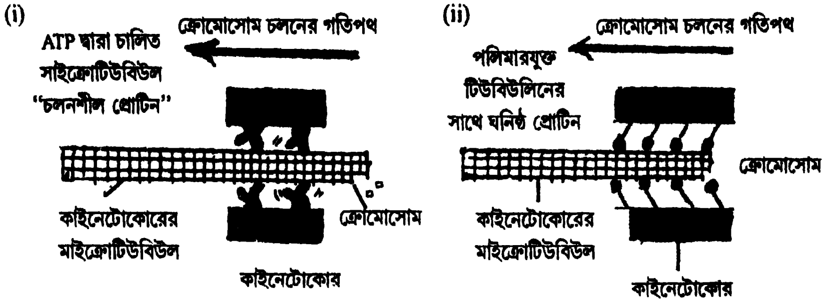
ক্রোমোসোমের চলনের সঠিক প্রক্রিয়া জানা না গেলেও এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনটি মডেল রয়েছে।

i) মাইক্রোটিউবিউলের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় কাইনেটোকোরের (বা সেন্ট্রোমিয়ারের) চলনের সময় ATP-র হাইড্রোলাইসিস হয়। মাইক্রোটিউবিউলের + প্রান্ত উন্মুক্ত হলে এর ডিপলিমারাইজেশন হয়।

ii) মাইক্রোটিউবিউলের ডিপলিমারাইজেশনের ফলে কাইনেটোকোর নিষ্ক্রিয়ভাবে (passively) চালিত হয়।

iii) কাইনেটোকোর ও মেরুর মধ্যে স্থিতিস্থাপক প্রোটিন সূত্র থাকতে পারে।

এগুলি কাইনেটোকোরকে মেরুর দিকে টেনে আনে। মাইক্রোটিউবিউলগুলি ক্রোমোসোমের চলন কেবল নিয়ন্ত্রণ করে।



মাইক্রোটিউবিল ও চলনশীল প্রোটিন কাইনেটোকোরের অংশ। ATP-র হাইড্রোলাইসিসের ফলে উৎপন্ন শক্তি ব্যবহার করে মাইক্রোটিউবিউলের দৈর্ঘ্য বরাবর ক্রোমোসোম চালিত হয়।

মাইক্রোটিউবিউলের টিউবিউলিন উপ একক-গুলি পৃথক হওয়ার জন্য কাইনেটোকোরের দিকে চালিত হয় কারণ মাইক্রোটিউবিউলের সাথে বন্ধন পূনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য।

টেলোফেজ (telophase) — টেলোফেজে (চিত্র 45) দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। স্পিন্ডিল বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে 'স্টেম বডি' থাকলে তা বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়। টেলোফেজে কোষে যেসব পরিবর্তন দেখা যায় তা ঠিক প্রফেজের বিপরীত। ক্রোমোসোমগুলির পেঁচ বা কুণ্ডল খুলে যায় ফলে ক্রোমোসোমগুলি খুব লম্বা হয়। তবে ক্রোমোসোমের কিছু কিছু গৌণ কুণ্ডল (minor coil) অবশিষ্ট থাকে। এই সময় ক্রোমোসোমের ম্যাট্রিক্স থাকে না বলে ক্রোমোনিমাগুলি দেখা যায়। এইসব ক্রোমোনিমা পরস্পর জড়িয়ে নিউক্লিও জালিকার সৃষ্টি করে। বিশেষ ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট জায়গায় নিউক্লিওলাসের সৃষ্টি হয়। নিউক্লিও রস এবং নিউক্লিও পর্দা তৈরি হয়। এইভাবে দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয়।

সাইটোকাইনেসিস (cytokinesis) বা সাইটোপ্লাজমের বিভাজন

সাধারণত টেলোফেজ অবস্থাতেই সাইটোকাইনেসিস শুরু হয়। এই সময় equator বা নিরক্ষরেখা অঞ্চলে ছোট ছোট দানার মত পদার্থ (গলগি বস্তু ও এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের অংশ) জমা হয়। পরে এইসব দানাগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে একটা পর্দা বা সেল প্লেট (cell plate) তৈরি করে। এই কোষ পর্দা রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে মিডিল ল্যামেলা (middle lamella) বা মধ্য পর্দা গঠন করে। এই মধ্য পর্দার দুই দিকে সেলুলোজের প্রাচীর তৈরি হওয়ার পর কোষ বিভাজন সমাপ্ত হয়। কোনও কোনও প্রাণীতে সাইটোকাইনেসিস খাঁজ গঠনের মাধ্যমে হয়। এইসব ক্ষেত্রে প্লাজমা মেমব্রেন একটা খাঁজ গঠন করে, যা ক্রমশ কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয় ও পরে মিলিত হয়। এইভাবে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন সম্পূর্ণ হয়। সাইটোকাইনেসিস বিভিন্ন সময় হতে পারে। কোনও কোনও কোষে নিউক্লিয়াসের বিভাজনের সাথে সাথেই সাইটোপ্লাজমের

বিভাজন হয়। আবার কখনও কখনও ক্যারিওকাইনেসিসের (karyokinesis) অনেক পরে সাইটোকাইনেসিস হয়ে থাকে।

মাইটোসিসের স্পিন্ডিল

কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোসোমের বিভাজন ছাড়া সাইটোপ্লাজমে কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন স্পিন্ডিল বা মাকু গঠিত হয় এবং প্রাণী কোষে ও কিছু উদ্ভিদ কোষে সেন্ট্রিওলের বিভাজন হয়।

স্পিন্ডিল স্পিন্ডিল তন্তুর দ্বারা গঠিত হয়।

স্পিন্ডিল বা মাকু তন্তুর গঠন—

সমান্তরাল গোছায় (bundle) সাজানো মাইক্রোটিউবিউলগুলি স্পিন্ডিল তন্তু গঠন করে। মাইক্রোটিউবিউলের প্রাচীর 50-70Å স্থূল এবং এর ব্যাস মোটামুটি 250-270Å। বিভিন্ন জীবের স্পিন্ডিল তন্তুতে মাইক্রোটিউবিউলের সংখ্যার পার্থক্য রয়েছে। ইস্টের কোষের স্পিন্ডিল তন্তুতে মাইক্রোটিউবিউলের সংখ্যা হল দশ।

স্পিন্ডিল তন্তুর রাসায়নিক প্রকৃতি—

স্পিন্ডিল তন্তুর দৈর্ঘ্য বরাবর দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত প্রোটিন অণুগুলি পরপর সাজান থাকে। প্রোটিনের মনোমারগুলি SH এবং SS বন্ধন দিয়ে পরস্পর যুক্ত হয়ে প্রোটিনের শৃঙ্খল গঠন করে। স্পিন্ডিল তন্তুতে 90% প্রোটিন এবং 5% RNA থাকে।

স্পিন্ডিল তন্তুর সৃষ্টি—

15% সাইটোপ্লাজমীয় প্রোটিন থেকে স্পিন্ডিল গঠিত হয়। স্পিন্ডিলের উৎপাদন প্রফেজের শেষে আরম্ভ হয় এবং মেটাফেজে শেষ হয়। নিউক্লিও পর্দা বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই স্পিন্ডিল দেখা দেয়।

নিউক্লিয়াস থেকে RNA নির্গত হওয়ার পর প্রোটিনের মনোমারগুলি SH এবং SS বন্ধনের দ্বারা পরস্পর যুক্ত হয়ে (পলিমারাইজেশন) স্পিন্ডিল তন্তু গঠন করে।

স্পিন্ডিল তন্তুর প্রকার—

তিন ধরনের স্পিন্ডিল তন্তু দেখা যায়।

a) **ক্রোমোসোমীয়** তন্তু বা আকর্ষ তন্তু (tractile fibre) ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার থেকে মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

b) **সহযোগী তন্তু** (supporting fibre) স্পিন্ডিলের এক মেরু থেকে অপর মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

c) **ইন্টারজোনাল** (interzonal) **তন্তু** অ্যানাফেজ ও টেলোফেজে দেখা যায়। একটি ক্রোমোজোমের দু'টি ক্রোমাটিড (অপত্য ক্রোমোজোম) পৃথক হওয়ার সময় ঐ ক্রোমাটিড দু'টির সেন্ট্রোমিয়ারের মধ্যে এই স্পিন্ডিল তন্তু দেখা যায়।

স্পিন্ডিল তন্তুর কাজ—

অ্যানাফেজে বিষুবরেখা (equator) থেকে মেরু পর্যন্ত ক্রোমোজোমের চলনে স্পিন্ডিল তন্তু সহায়তা করে।

অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের চলন ব্যাখ্যা করে কিছু মত রয়েছে।

a) সরল সঙ্কোচনের মডেল (simple contraction model) :

1883 খ্রিস্টাব্দে Van Benden বলেন যে, বিভাজনশীল কোষে স্পিন্ডিল তন্তুর সঙ্কোচনের ফলে ক্রোমোসোমগুলি মেরুর দিকে চালিত হয়। 1962 খ্রিস্টাব্দে Swann বলেন যে, ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল থেকে কিছু পদার্থ নিঃসৃত হয়, যা স্পিন্ডিল তন্তুর সঙ্কোচনে সহায়তা করে।

এই মতবাদের বিপক্ষে কিছু তথ্য লক্ষ্য করা হয়েছে। ক্রোমোসোমের চলনের সময় সমগ্র কোষটি দৈর্ঘ্যে বাড়ে ও এই প্রক্রিয়া সঙ্কোচনের ঠিক বিপরীত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমগুলি সেন্ট্রিওল ছাড়িয়ে চলে যায় কিন্তু এই সেন্ট্রিওলের সাথে স্পিন্ডিল তন্তু যুক্ত থাকে।

b) প্রসারণের মডেল (expansion model) :

1891 খ্রিস্টাব্দে Wtase বলেন যে, স্পিন্ডিল তন্তুর চাপের ফলে মেটাফেজে ক্রোমোসোমগুলি চ্যাপ্টা হয়। ক্রোমোসোমের সাথে ক্রোমোসোমীয় তন্তু যুক্ত হয়। ক্রোমোসোম মেরুর দিকে চালিত হয়।

c) সঙ্কোচন ও প্রসারণের মডেল অথবা traction model :

Baler এর মতে, অপত্য ক্রোমোসোমগুলির প্রাথমিক পৃথকীকরণ নিজের থেকে হয় (autonomous)। ক্রোমোসোমগুলির পরবর্তী চলন স্পিন্ডিলের বিভিন্ন অংশের সঙ্কোচন এবং প্রসারণের জন্য হয়। ক্রোমোসোমীয় তন্তুর সঙ্কোচনের ফলে ক্রোমোসোমগুলি মেরুর দিকে যায়। ইন্টারজোনাল তন্তু, যা দু'টি অপত্য ক্রোমোসোমের মাঝে থাকে, সেটি প্রসারিত হয় ও এর ফলে ক্রোমোসোম দু'টিকে বিপরীত মেরুর দিকে ঠেলে দেয়।

d) গতিশক্তির ভারসাম্যের মডেল (equilibrium dynamic model) :

1967 খ্রিস্টাব্দে Inove ও Sato মাইক্রোটিউবিউল সৃষ্টিকারী মনোমার সমষ্টির মধ্যে ভারসাম্য দেখা যায়। মনোমারের পলিমার গঠনের সময় কিছু জল নির্গত হয়ে যায়।

ক্রোমোসোমের চলনের সময় স্পিন্ডিল তন্তুতে নতুন মনোমারের সংযোজন বা মনোমারের বিযুক্তির ফলে স্পিন্ডিল তন্তুর প্রসারণ ও সঙ্কোচন হয়। অ্যানাফেজে স্পিন্ডিল তন্তুর মেরুর দিকের প্রান্তে মনোমারের বিযুক্তির ফলে স্পিন্ডিল তন্তু সঙ্কুচিত হতে পারে। সহযোগী তন্তুর মেরুর দিকের প্রান্তে নতুন মনোমারের সংযুক্তির ফলে সহযোগী তন্তু দীর্ঘ হয়। এর ফলে স্পিন্ডিল লম্বাটে হয় এবং দু'টি মেরুর মধ্যে ব্যবধান বাড়ে।

c) গ্লাইডিং মডেল (gliding model) :

Bajer ও Osterger এর মতে, ক্রোমোসোমের চলন হল সক্রিয় প্রক্রিয়া। সহযোগী তন্তুগুলির মাঝে ক্রোমোসোমীয় তন্তুগুলি নৌকার মত মেরুর দিকে ভেসে বেড়ায় (glide)। Ambrose এর মতে, এইরকম চলনের শক্তির উৎস হল ইলেকট্রোঅসমোসিস ও ইলেকট্রোফোরেসিস। ATP ভেঙে গিয়ে শক্তি নির্গত হয়।

f) Ratchet মডেল :

Mcinuosh, Helper, Van Wie-র মতে, পেশী তন্তুগুলির মাঝে যেমন Ratchet সংযোগ থাকে, তেমনি মাইক্রোটিউবিউলগুলিও একইভাবে সংযুক্ত থাকে। এরকম অ্যাক্টোমায়োসিন প্রক্রিয়ার সঙ্কোচনের ফলে ক্রোমোসোমগুলি মেরুর দিকে চালিত হয়। সহযোগী তন্তুর মাঝে ক্রোমোসোমীয় তন্তুগুলি মেরুর দিকে সরে আসার ফলে অপত্য ক্রোমোসোম দু'টি পৃথক হয়ে বিপরীত মেরুর দিকে যায়।

g) বৈদ্যুতিক মডেল (electrical model) :

Lillie ও Coller (1934) এবং Darlington এর (1937) মতে, নিউক্লিও পর্দায় এবং মেরুর কাছে ভেদ্যতার স্থানীয় পরিবর্তনের ফলে পর্দার বিভবের (potential) পার্থক্য দেখা যায়। এর ফলে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের (field) সৃষ্টি হয়। প্রফেজে ক্রোমোসোমগুলি নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট থাকে এবং এরকম ক্রোমোসোমগুলি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে চলে আসে।

h) 'পুশ' মডেল (push model) :

এই মডেল অনুসারে সাইটোপ্লাজমের কোলয়েডের প্রভাবে অপত্য ক্রোমোসোমগুলি পরস্পর থেকে সরে যায়। জলগ্রহণ করে কোলয়েড স্ফীত হয় এবং ক্রোমোসোমের দু'টি ক্রোমাটিডকে (অপত্য ক্রোমোসোম) পরস্পর থেকে দূরে ঠেলে দেয়। স্পিন্ডিল তন্তু ক্রোমোজোমের এই চলনে সঠিক দিক নির্দেশ করে।

মাইটোসিসে বাধাদায়ক পদার্থ

কোনও কোনও পদার্থের প্রভাবে মাইটোসিস হয় না, অথবা এই বিভাজনে গোলযোগ দেখা দেয়। এসব পদার্থকে সাধারণত mitotic poisons বা মাইটোসিসের বিষ বলা হয়। উৎসেচক এন্ডোনিউক্লিয়েজ প্রফেজের বিষ। কলচিসিন স্পিন্ডিল গঠনে বাধা দেয় এবং এর ফলে কোষটি স্থায়ীভাবে মেটাফেজ অবস্থায় থাকে। মাস্টার্ড গ্যাসের প্রভাবে ক্রোমোসোমের ভগ্নতা দেখা দেয়। এরকম কোনও কোনও পদার্থ বেশি মাত্রায় কোষের মৃত্যু ঘটায়।

কোষ বিভাজনের শক্তি

কোষ বিভাজনের সময় জারণ খুব কম হয়। এজন্য অক্সিজেনের অভাব হলে বা কার্বন মনোক্সাইড দ্বারা মাইটোসিস প্রভাবিত হয় না। বিভাজনশীল কোষ গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। কোষ বিভাজনের আগে যখন DNA সংশ্লেষ হয়, তখন অক্সিজেনের প্রয়োজন স্বাভাবিক থাকে। Swann-এর (1957) মতে, কোষ বিভাজনের আগে কোষের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত হয়। Allfrey-এর (1957) মতে, নিউক্লিয়াসে 'অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশনে'র ফলে ATP উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, মাইটোসিসের ঠিক আগে জারণ প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি হয় এবং সক্রিয় কোষ বিভাজনের সময় এই প্রক্রিয়া সবচেয়ে কম হয়।

নিউক্লিয়াসে কিছু গ্লাইকোলাইটিক উৎসেচক খুব বেশি ঘনত্বে পাওয়া গেছে। এরকম কয়েকটি উৎসেচক হল, ল্যাকটিক ডিহাইড্রোজিনেজ, অ্যালডোলেজ, ট্রায়োজফসফেট

ডিহাইড্রোজিনেজ ইত্যাদি। কিন্তু শ্বসনের অন্যান্য উৎসেচক এবং সাইটোপ্লাজমের অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশনের উৎসেচক নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায় না।

মাইটোসিস বিভাজনের সময় মাইটোকন্ড্রিয়া ছোট ছোট দানাদার খণ্ডে ভেঙে যায়। মাইটোসিস বিভাজনের শেষ পর্যায়ে মাইটোকন্ড্রিয়া পুনর্গঠিত হয়। Chevermont ও Frederic (1952) এবং Agrell (1955) এই মতের সমর্থন করেছেন।

কোষচক্র (cell cycle) এবং মাইটোসিসের শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা

i) মাইটোসিসে ক্রোমোসোম চক্রের নিয়ন্ত্রণ— মাইটোসিসে ক্রোমোসোমের বিভাজন কতকগুলি প্রোটিন প্রভাবক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।

a) S ফেজের সক্রিয়ক (activator) — এটি কেবল S-ফেজে সাইটোপ্লাজমে দেখা দেয় এবং D উৎপাদন আরম্ভ করে (switches on) (Rao ও Johanson '70)।

b) M ফেজের উন্নয়নকারী (promoting) প্রভাবক (MPF)— এই প্রভাবক কেবল M ফেজে সাইটোপ্লাজমে দেখা দেয়। এর প্রভাবে ক্রোমোসোম ঘনীভূত (condense) হয় (Johannson ও Rao '70)।

c) DNA নির্ভরশীল M ফেজের বিলম্বকারী প্রভাবক (delaying factor) — এই প্রভাবক S-ফেজে সাইটোপ্লাজমে থাকে এবং MPF উৎপাদনে বাধা দেয়।

এসব বিভিন্ন পর্যায়গুলি পরপর হতে থাকে অর্থাৎ, ক্রোমোসোম চক্রের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি একটির ওপর একটি নির্ভরশীল। যেমন—

a) MPF উৎপন্ন না হলে কোষে মাইটোসিস বিভাজন হতে পারে না।

b) M ফেজের বিলম্বকারী ফ্যাক্টর অদৃশ্য না হলে MPF উৎপন্ন হয় না।

c) S ফেজের সক্রিয়ক এবং M ফেজের বিলম্বকারী ফ্যাক্টর DNA সংশ্লেষ সম্পূর্ণ না হলে অদৃশ্য হয় না।

d) সব DNA দ্বিগুণ না হলে DNA সংশ্লেষ বন্ধ হয় না।

e) মাইটোসিসের G_1 অবস্থায় DNA-র পুনঃ দ্বিগুণীকরণে বাধা (re-replication block) অপসারিত না হলে DNA দ্বিগুণ হওয়া আরম্ভ হতে পারে না।

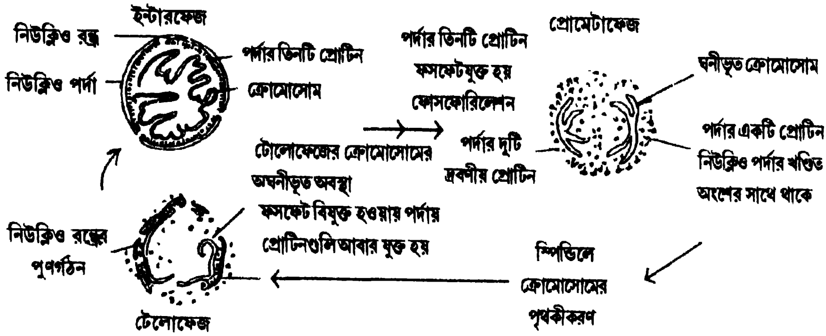
f) মাইটোসিসের স্পিন্ডিলে ক্রোমোসোমগুলি পৃথক না হলে G_1 অবস্থা আরম্ভ হতে পারে না।

MPF দু'টি উপএককযুক্ত (subunit) একটি বড় প্রোটিন অণু। একটি নিষ্ক্রিয় (inert) উপএকক এবং অন্যটি কাইনেজ (kinase) উপএকক। নিষ্ক্রিয় উপএকককে কাইনেজ ফসফোরিলেশনের মাধ্যমে সক্রিয় করে। এই প্রক্রিয়াকে স্ব-সক্রিয়করণ বা self-activation বলে (Lokha 1988)। MPF কাইনেজ বিভিন্ন পদার্থকে ফসফেটযুক্ত করে (phosphorylation)। এর মধ্যে হিস্টোন H_1ও রয়েছে। এর ফলে ক্রোমোসোম ঘনীভূত হয় (condense)। MPF এরকম বিভিন্ন ফসফোরিলেশনের মাধ্যমে মাইটোসিসের বিভিন্ন ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন—নিউক্লিও পর্দার ভেঙে যাওয়া এবং স্পিন্ডিল বা মাকুর উৎপত্তি।

ii) মাইটোসিসে নিউক্লিও পর্দার অবলুপ্তি এবং উৎপত্তি—

নিউক্লিও পর্দার অবলুপ্তি ও a) উৎপত্তিতে ভিতরের ও বাইরের নিউক্লিও পর্দা, b) পর্দার প্রোটিন এবং c) পর্দার রন্ধ্রের ভূমিকা রয়েছে।

প্রফেজে MPF-এর দ্বারা অনেক প্রোটিন ফসফেটযুক্ত হয়। নিউক্লিয় ল্যামিনের এরকম ফসফেটযুক্ত হওয়ায় নিউক্লিও পর্দা ভেঙে যেতে পারে। প্রত্যেক পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের বিভিন্ন অঞ্চলে ফসফোরিলেশন হওয়ায় নিউক্লিও পর্দা ভেঙে গিয়ে ছোট ছোট ভেসিকেল গঠন করে। মানুষের কোষের কালচারে Maul (1977) দেখেন যে, প্রফেজ থেকে প্রোমেটাফেজের মধ্যে নিউক্লিও পর্দার প্রায় সব অর্থাৎ, 4000টি রন্ধ্র অদৃশ্য হয়ে যায়।



চিত্র—48

মাইটোসিসের সময় নিউক্লিও পর্দার পরিবর্তনের চক্র

মেটাফেজ থেকে অ্যানাফেজে পরিবর্তনের সময় ডিফসফোরিলেশন হয়। এসময় অনেক প্রোটিন যেমন— H_1 হিস্টোন, ল্যামিন ইত্যাদিও ফসফেটহীন হয়ে যায়। টেলোফেজে ক্রোমোসোমের ত্বকের সাথে যুক্ত নিউক্লিও পর্দার ভেসিকেলগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিউক্লিও পর্দা গঠন করে। এসময় নিউক্লিও রন্ধ্রগুলি এবং ফসফেটবিহীন (ডিফসফোরিলেটেড) ল্যামিনগুলি যুক্ত হয় ও নিউক্লিও পর্দা গঠন করে। *ল্যামিন B হল পর্দার প্রোটিন, যা মাইটোসিসের সব পর্যায়ে নিউক্লিও পর্দার খণ্ডের* (ফ্যাগমেন্ট) সাথে থাকে এবং টেলোফেজে নিউক্লিও পর্দা গঠনে সহায়তা করে।

iii) মাইটোসিসে সাইটোপ্লাজমের কাঠামোর (cytoskeleton) ভূমিকা—

মাইটোসিসে সাইটোপ্লাজমের কাঠামো বা cytoskeleton-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। M ফেজে এই কাঠামো প্রথম দেখা দেয়। প্রথমে দ্বিমেরুযুক্ত স্পিন্ডিল বা মাকু গঠিত হয়। এটি মাইক্রোটিউবিউল ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত এবং ক্রোমোসোমের মেরু অভিমুখের চলনে সহায়তা করে। প্রাণী কোষে M ফেজে দ্বিতীয় সাইটোস্কেলিটন হল একটি **সঙ্কোচী বলয়** বা contractile ring। এটি মাইক্রোফিলামেন্ট এবং মায়োসিন দ্বারা গঠিত এবং প্লাজমা পর্দার ঠিক নিচে থাকে। এটি সাইটোকাইনেসিসে সহায়তা

করে। তৃতীয় সাইটোস্কেলিটন হল, ইন্টারফেজ নিউক্লিয়াসকে আবৃতকারী মধ্যবর্তী সূত্র দ্বারা গঠিত জালাকার গঠন (meshwork)। মাইটোসিস বিভাজনের সময় এটি দীর্ঘ হয়ে দু'টি অপত্য নিউক্লিয়াসকে আবৃত রাখে এবং পরিশেষে দু'টি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়।

মাইটোসিস বিভাজনের স্থায়িত্ব

মাইটোসিস বিভাজন সম্পূর্ণ করবার জন্য বিভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের প্রয়োজন হয়। ওই জীবের প্রকৃতি, তাপমাত্রা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর মাইটোসিস বিভাজনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। *Tradescantia*-র পুংকেশরের রোমে (staminal hair) 10^0C তাপমাত্রায় কোষ বিভাজন সম্পূর্ণ করতে 135 মিনিট সময় লাগে, 25^0C-এ কোষ বিভাজন 75 মিনিটে এবং 45^0C-এ কোষ বিভাজন 30 মিনিটে সম্পূর্ণ হয়। *Arrhenatherum*-এর গর্ভমুণ্ডের (stigma) রোমে 19^0C তাপমাত্রায় কোষ বিভাজন সম্পূর্ণ করবার জন্য 78–110 মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়। ওই একই তাপমাত্রায় বাদামী রঙের শৈবাল (Phaeophyceae) *Sphacelaria*, 39 মিনিটেব চেয়ে কম সময়ে কোষ বিভাজন সম্পূর্ণ করে।

কোষ বিভাজনের বিভিন্ন অবস্থার স্থায়িত্বও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত প্রফেজ অবস্থা সবচেয়ে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়, টেলোফেজ প্রফেজের চাইতে কম সময় স্থায়ী হয়। অ্যানাফেজ ও মেটাফেজ স্বল্পস্থায়ী। তবে বিভিন্ন উদ্ভিদে মাইটোসিসের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের স্থায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। পেঁয়াজের মূলের কোষে 20^0C তাপমাত্রায় প্রফেজ 71 মিনিট, মেটাফেজ 6.5 মিনিট, অ্যানাফেজ 2.4 মিনিট এবং টেলোফেজ 3.8 মিনিট স্থায়ী হয়। মটরশুঁটির মূলের কোষে 20^0C তাপমাত্রায় প্রফেজ 78 মিনিট, মেটাফেজ 14.4 মিনিট, অ্যানাফেজ 4.2 মিনিট ও টেলোফেজ 13.2 মিনিট স্থায়ী হয়। *Arrhenatherum*-এর গর্ভমুণ্ডের রোমের কোষে 19^0C তাপমাত্রায় প্রফেজ 36–45 মিনিট, মেটাফেজ 7–10 মিনিট, অ্যানাফেজ 15–20 মিনিট এবং টেলোফেজ 20–30 মিনিট স্থায়ী হয়।

মাইটোসিসের তাৎপর্য

1) মাইটোসিসের মাধ্যমে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

2) মাইটোসিসের ফলে যে দু'টি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়, সেগুলি মাতৃকোষের যথার্থ প্রতিলিপি অর্থাৎ তাদের ক্রোমোসোমের সংখ্যা, প্রকৃতি, আয়তন সবই মাতৃকোষের অনুরূপ হয়। বারবার মাইটোটিক বিভাজনের ফলে একই জেনেটিক গঠনের অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং, কেবল মাইটোসিসের মাধ্যমেই দেহের বৃদ্ধি সুশৃঙ্খলভাবে হতে পারে।

3) মাইটোসিসের ফলে বহুকোষী জীব বড় হতে পারে। বহুকোষী জীবের দেহে

অসংখ্য কোষ (মানুষের দেহের কোষের সংখ্যা 10^{14}) থাকে। কিন্তু একটা কোষ থেকেই জীবনের শুরু হয়, বারবার মাইটোসিসের ফলে পরে বহু সংখ্যক কোষের সৃষ্টি হয়।

4) এককোষী জীব মাইটোসিস পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে।

5) অঙ্গজ জননের জন্য মাইটোসিসের প্রয়োজন প্রশ্নাতীত।

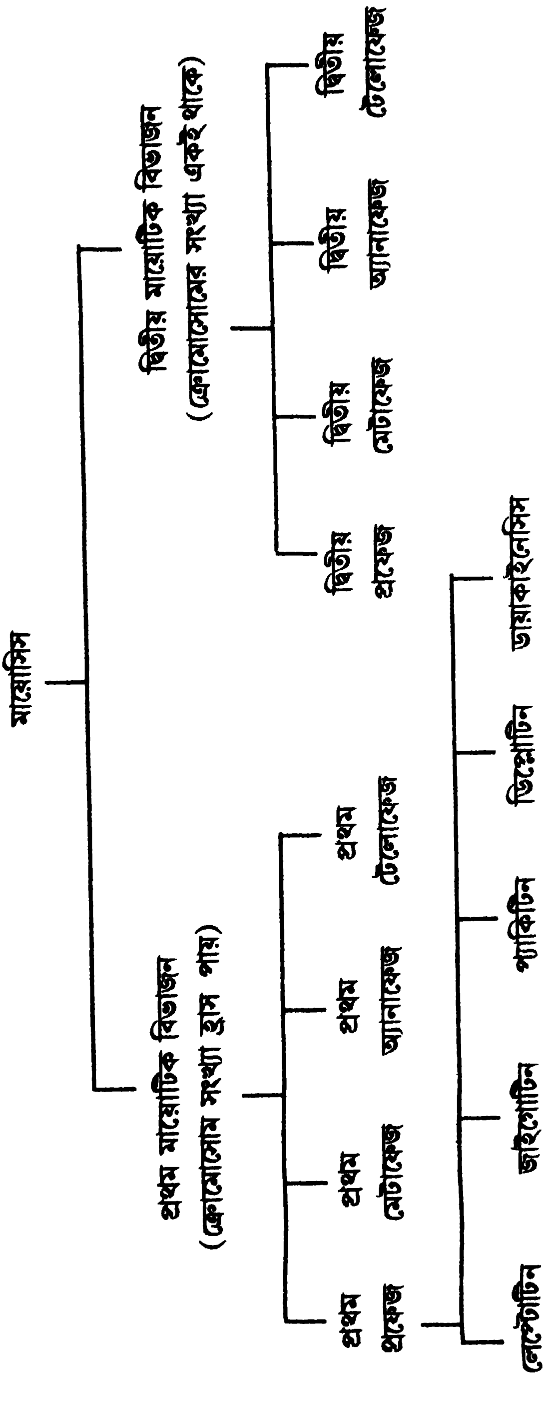
6) জীবদেহের কোনও অংশ আঘাতের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে, মাইটোসিস ওই জায়গায় নতুন কোষের প্রয়োজন মেটায়। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর দেহের কোনও অংশ ভেঙে গেলে মাইটোসিসের মাধ্যমে ওই অংশ পুনর্গঠিত (পুনরুৎপাদন) হয়।

7) দেহের কোনও কোনও কোষ (যেমন— মানবদেহের রক্তের এরিথ্রোসাইট ও চোখের কর্ণিয়ার বাইরের কোষগুলি) বেশিদিন বাঁচে না। সুতরাং, তাদের জায়গায় নতুন কোষের প্রয়োজন হয়। মাইটোসিস সেই প্রয়োজন মেটায়।

8) কোনও জীবে মাইটোটিক বিভাজন সুষ্ঠুভাবে না হলে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। দেহের কোনও অংশে মাইটোসিসের হার অস্বাভাবকিভাবে বেড়ে গেলে কর্কট রোগের (cancer) সৃষ্টি হয়।

মায়োসিস (meiosis)

মায়োসিসের ফলে কোনও কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হয়, এজন্য এই বিভাজনকে সংখ্যাহ্রাসকারী বিভাজন বা reduction division বলে। সব যৌন জননশীল জীবে দু'টি হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটের মিলনের (fertilization বা নিষেক) ফলে ডিপ্লয়েড জাইগোটের সৃষ্টি হয়। জীবন চক্রের কোনও পর্যায়ে ডিপ্লয়েড সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হ্যাপ্লয়েড হয়। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে ফার্টিলাইজেশনের পরেই ডিপ্লয়েড জাইগোটে মায়োসিস হয়, ফলে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদের (লিঙ্গধর উদ্ভিদ বা গ্যামেটোফাইট) সৃষ্টি হয়। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের দেহ ডিপ্লয়েড (রেণুধর উদ্ভিদ বা স্পোরোফাইট) এবং এখানে মায়োসিস রেণু তৈরির ঠিক আগে হয়। প্রাণীর বেলায় মায়োসিস গ্যামেট তৈরির সময় হয়ে থাকে। সুতরাং, মায়োসিস হল ফার্টিলাইজেশনের বিপরীত প্রক্রিয়া। প্রত্যেক ডিপ্লয়েড কোষে ক্রোমোসোমগুলি জোড়ায় থাকে। কোনও জোড়ার দু'টি সদস্য একটি অন্যটির অনুরূপ হয় ও এদের হোমোলোগ বা হোমোলোগাস (homologous) বা সমসংস্থ ক্রোমোসোম বলে। প্রত্যেক জোড়ার একটি ক্রোমোসোম পুং গ্যামেট থেকে অন্যটি স্ত্রী গ্যামেট থেকে আসে। একটি ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনগুলি এর হোমোলোগের জিনগুলি থেকে মিউটেশনের জন্য সামান্য আলাদা হতে পারে। মায়োসিসের ফলে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি আলাদা হয়ে বিপরীত মেরুতে যায়।

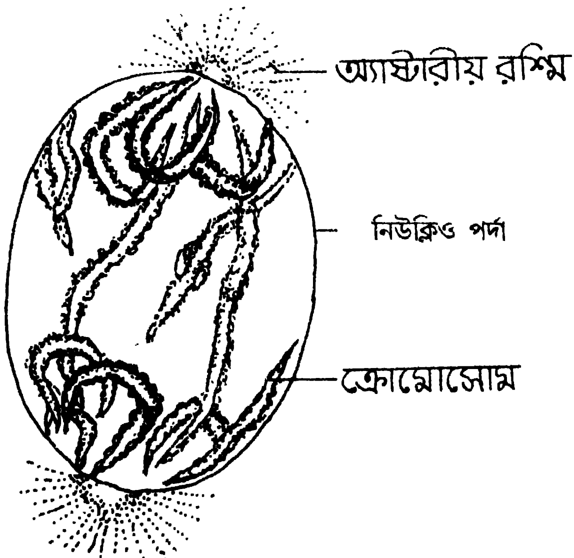


চিত্র—49
মায়োসিসের বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগগুলি দেখান হয়েছে

1883 খ্রিস্টাব্দে Strasburger মায়োসিস বিভাজন লক্ষ্য করেন। 1905 খ্রিস্টাব্দে Farmer ও Moore এই রকম বিভাজনকে 'মায়োসিস' নাম দেন। মায়োসিস কেবল জনন কোষে হয়। যেসব কোষে মায়াসিস হয় তাদের মায়োসাইট (meiocyte) বলে। এই কোষগুলি পাশের অন্য কোষের তুলনায় বড় থাকে। উদ্ভিদ এবং প্রাণীতে মায়োসিস মূলত একই রকমের। মায়োসিসে নিউক্লিয়াসটি দুই বার বিভক্তিত হয়; ফলে একটি নিউক্লিয়াস থেকে চারটি নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়। প্রথম বিভাজনে ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাস পায় ও এই বিভাজনকে প্রথম মায়োটিক বিভাজন বা হেটারোটাইপিক (heterotypic) বিভাজন বলা হয়। দ্বিতীয় বিভাজনের ফলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা একই থাকে এবং এই বিভাজনকে দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজন বা হোমোটাইপিক (homotypic) বিভাজন বলা হয়ে থাকে। মাইটোসিসের মত প্রথম ও দ্বিতীয় মায়োসিসকে কতকগুলি অবস্থা বা দশায় (stage) ভাগ করা হয়। চিত্র 49 থেকে এই বিভাজনগুলি সহজেই বোঝা যাবে।

প্রথম মায়োটিক বিভাজন

প্রথম মায়োসিসকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়— প্রথম প্রফেজ, প্রথম মেটাফেজ, প্রথম অ্যানাফেজ এবং প্রথম টেলোফেজ। অনেক সময় প্রথম প্রফেজ এবং প্রথম মেটাফেজের মাঝের অবস্থাকে প্রথম প্রোমেটাফেজ বলা হয়ে থাকে।



চিত্র—50

Stagmomantis carolina-এ প্যাকিটিনে 'বোকে' অবস্থা

প্রথম প্রফেজ (prophase I) — প্রথম প্রফেজ (চিত্র 51) দীর্ঘস্থায়ী এবং মাইটোসিসের প্রফেজের তুলনায় অনেক জটিল। বর্ণনা করার সুবিধার জন্য এই অবস্থাকে আবার পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এইসব উপবিভাগগুলি হল লেপ্টোটিন, জাইগোটিন, প্যাকিটিন, ডিপ্লোটিন এবং ডায়াকাইনেসিস।

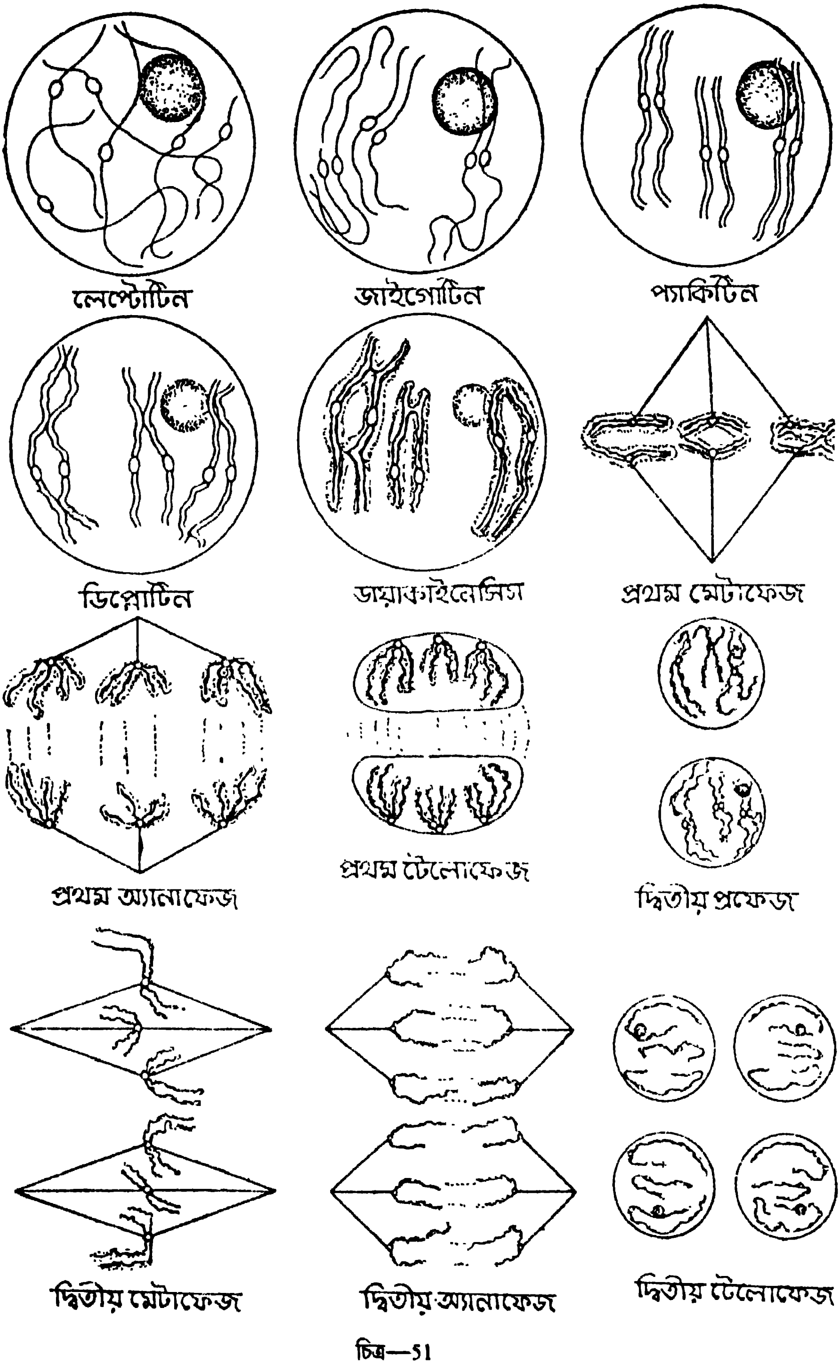
a) লেপ্টোটিন (leptotene) — লেপ্টোটিনে (চিত্র 51) নিউক্লিও জালিকা ভেঙে যায় ও ক্রোমোসোমগুলি দেখা দেয়। এই সময় ক্রোমোনিমাগুলি খুব লম্বা ও সরু থাকে ও এদের পেঁচ খুলে যায়। এর পর আস্তে আস্তে ক্রোমোনিমাগুলি কুণ্ডলিত (মুখ্য কুণ্ডল) হতে আরম্ভ করে ও ক্রমশ ছোট হয়। যেসব কুণ্ডল বা পেঁচগুলি খুব পাশাপাশি থাকে, তাদের দানার বা পুঁতির মত দেখায়। এই পুঁতির মত অংশগুলিকে ক্রোমোমিয়ার (chromomere) বলে। এই সময় ক্রোমোনিমাগুলি পুঁতির মালার মত দেখায়। কোনও নির্দিষ্ট উদ্ভিদ বা প্রাণীতে ক্রোমোমিয়ারগুলির আকৃতি, অবস্থান ও সংখ্যা একই থাকে। লেপ্টোটিনে নিউক্লিওলাস স্পষ্ট দেখা যায়।

ক্রোমোসোমগুলি নিউক্লিয়াসের মধ্যে এলোমেলোভাবে ছড়ান থাকতে পারে, তবে এর ব্যতিক্রমও দেখা গিয়েছে। *Lilium*-এর পরাগরেণু (pollen) মাতৃকোষে ক্রোমোসোমগুলি একপাশে জড়িয়ে থাকে এবং নিউক্লিয়াসের বাকি অংশ ফাঁকা থাকে। অনেক প্রাণীর শুক্রাণু (sperm) মাতৃকোষে ক্রোমোসোমগুলি মেরু অভিমুখী বা polarized অবস্থায় থাকে। এখানে ক্রোমোসোমগুলির একটা প্রান্ত নিউক্লিয়াসের যেদিকে সেন্ট্রোসোম আছে সেখানে সংযুক্ত থাকে এবং অন্য প্রান্তগুলি কেন্দ্রের দিকে প্রসারিত থাকে। এই অবস্থাকে 'বোকে অবস্থা' (bouquet stage) বলে (চিত্র 50)।

লেপ্টোটিনে ক্রোমোসোমগুলি দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় থাকে কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। কোনও কোনও জীবে এই অবস্থাতেই DNA তৈরি হয় এবং ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ হয়। *Tradescantia*-এ জাইগোটিনের আগে DNA উৎপাদন সম্পূর্ণ হয় না। *Trillium*-এ প্যাকিটিন অবস্থার আগেই DNA তৈরি সম্পূর্ণ হয়। আগেই DNA উৎপন্ন হয়ে গেলেও ক্রোমোসোমের দ্বিগুণতা উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বোঝা যায় না।

প্রাণী কোষে লেপ্টোটিন অবস্থায় সেন্ট্রোসোমটি বিভাজিত হয় ও দুইটি সেন্ট্রিওল বিপরীত প্রান্তের দিকে সরে যেতে থাকে।

b) জাইগোটিন (Zygotene) — জাইগোটিন (চিত্র 51) হল প্রফেজের স্বল্পস্থায়ী অবস্থা। এই সময় প্রত্যেক হোমোলোগাস (সমসংস্থ) ক্রোমোসোম পরস্পরের কাছে আসে ও জোড়ায় অবস্থান করে। এই অবস্থাকে synapsis বা যুগ্মতা বলে। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের কেবল অনুরূপ অংশগুলির মধ্যেই সাইন্যাপসিস হয়। একটি ক্রোমোসোমের কোনও অংশ অস্বাভাবিক হলে ওই অংশ ও হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের স্বাভাবিক অংশের মধ্যে সাইন্যাপসিস হয় না।

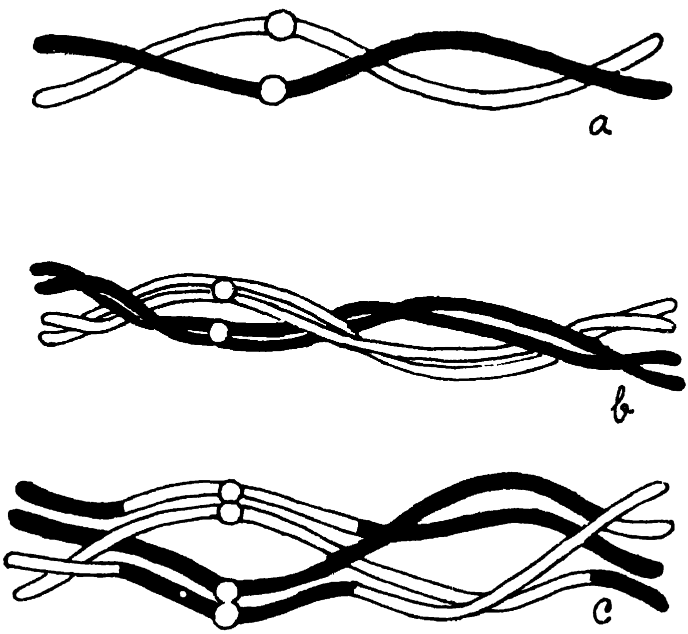


চিত্র—51

মায়োসিস বিভাজনের বিভিন্ন অবস্থা

যুগ্ম অবস্থানকারী প্রত্যেক জোড়া ক্রোমোসোমকে বাইভ্যালেন্ট (bivalent) বলে (চিত্র 51, 52)। যুগ্মতার ফলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক দেখায়। অর্থাৎ লেপ্টোটিনে 2n ক্রোমোসোম থাকলে, প্যাকিটিনে n সংখ্যক বাইভ্যালেন্ট দেখা যাবে।

সাইন্যাপসিস বা যুগ্মতা নানাভাবে হতে পারে। সাধারণত এই যুগ্মতা ক্রোমোসোমেব কোনও স্থানে আরম্ভ হয়ে প্রান্তের দিকে অগ্রসর হয়। এই যুগ্মতাকে procentric synapsis বা প্রাক-কেন্দ্রীয় যুগ্মতা বলে। যুগ্মতা প্রান্তে আরম্ভ হয়ে সেন্ট্রোমিয়ারের দিকে অগ্রসর হলে, ওই যুগ্মতাকে proterminal synapsis বা প্রাক প্রান্তীয় যুগ্মতা বলে। ক্রোমোসোমের যে কোনও অংশে কিংবা একই সাথে অনেকগুলি অংশে যুগ্মতা আরম্ভ হলে, একে মধ্যবর্তী যুগ্মতা (intermediate synapsis) বলে। কোনও অংশে যুগ্মতা আরম্ভ হলে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে।



চিত্র —52

প্রথম প্রফেজের বিভিন্ন পর্যায়ে একটি বাইভ্যালেন্ট দেখান হয়েছে।
উপরে— জাইগোটিন বা প্যাকিটিনের প্রথম দিকে ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ হয়নি;
মাঝে— প্যাকিটিনে প্রত্যেক ক্রোমোসোমে দু'টি ক্রোমাটিড রয়েছে;
নিচে — ডিপ্লোটিনে কায়েসমা দেখা যাচ্ছে।

এই সময় ক্রোমোসোমগুলি আরও কুণ্ডলিত (coiled) হতে থাকে। এজন্য এদের

খর্ব, স্থূল দেখায়। কুণ্ডলিত হওয়ার ফলে মুখ্য কুণ্ডলগুলির (major coil) ব্যাস বাড়ে (চিত্র 46b)। প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টের হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দু'টি পরস্পর পেঁচান থাকে। এই পেঁচ বা কুণ্ডলকে প্যারানেমিক কয়েল (paranemic coil) বলে (চিত্র 57b)।

সাইন্যাপটোনিম্যাল কমপ্লেক্স ঃ লেপ্টোটিনের শেষের দিকে প্রত্যেক হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটির মধ্যে পাশের দিকে নিউক্লিও প্রোটিন গঠিত হয়। যখন সাইন্যাপসিস বা যুগ্মতা হয় তখন এই পার্শ্বীয় নিউক্লিও বস্তু একটি কেন্দ্রীয় অংশের (core) সঙ্গে যুক্ত হয়ে **সাইন্যাপটোনিম্যাল কমপ্লেক্স** (synaptonemal complex) গঠন করে। Montrose J Moses (1955) এর বিবরণ দেন। কেন্দ্রীয় অংশটি হল নিউক্লিওলাস থেকে উৎপন্ন রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিন যা সম্ভবত হোমোলোগ দু'টিকে পরস্পরের সাথে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে।

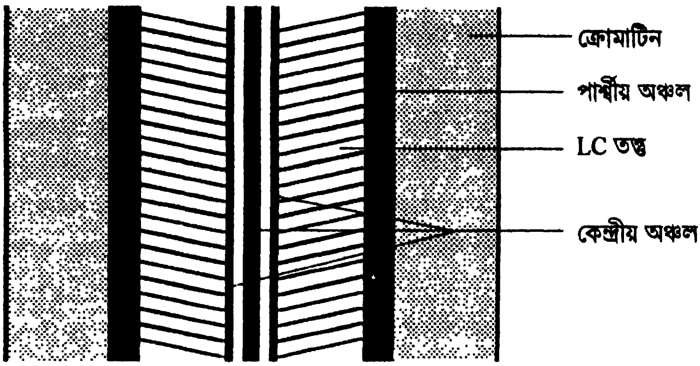
সাইন্যাপটোনিম্যাল কমপ্লেক্সের (synaptonemal complex বা SC) গঠন— জাইগোটিনে যখন সমসংস্থ ক্রোমোসোমগুলি যুগ্ম অবস্থান করে, তখন সাইন্যাপটোনিম্যাল কমপ্লেক্স প্রথম দেখা দেয়। এই গঠন প্যাকিটিনে সমাপ্ত হয়। ডিপ্লোটিনে সাইন্যাপটোনিম্যাল কমপ্লেক্সের বেশিরভাগ অদৃশ্য হয়।

সাইন্যাপটোনিম্যাল কমপ্লেক্স বা SC হল ত্রিধা বিভক্ত ফিতাকার গঠন এবং এটি সমসংস্থ ক্রোমোসোমের মাঝে থাকে। এর ঘন কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উভয় পাশে ঘন পার্শ্বীয় অঞ্চল থাকে। প্রত্যেক পার্শ্বীয় অঞ্চল সমসংস্থ ক্রোমোসোমের ভিতরের দিকে যুক্ত থাকে। কেন্দ্রীয় অঞ্চল এবং পার্শ্বীয় অঞ্চল কতকগুলি পাশাপাশি LC তন্তু দ্বারা যুক্ত থাকে। কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি 150-500Å চওড়া। পার্শ্বীয় অঞ্চলগুলি 300-500A চওড়া। পার্শ্বীয় অঞ্চল দু'টির মধ্যে ব্যবধান হল 900-1200Å। SC-র উভয় প্রান্ত নিউক্লিও পর্দার ভিতরের দিকে পার্শ্বীয় অঞ্চলগুলি দ্বারা যুক্ত থাকে। কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি সরাসরি যুক্ত থাকে না।

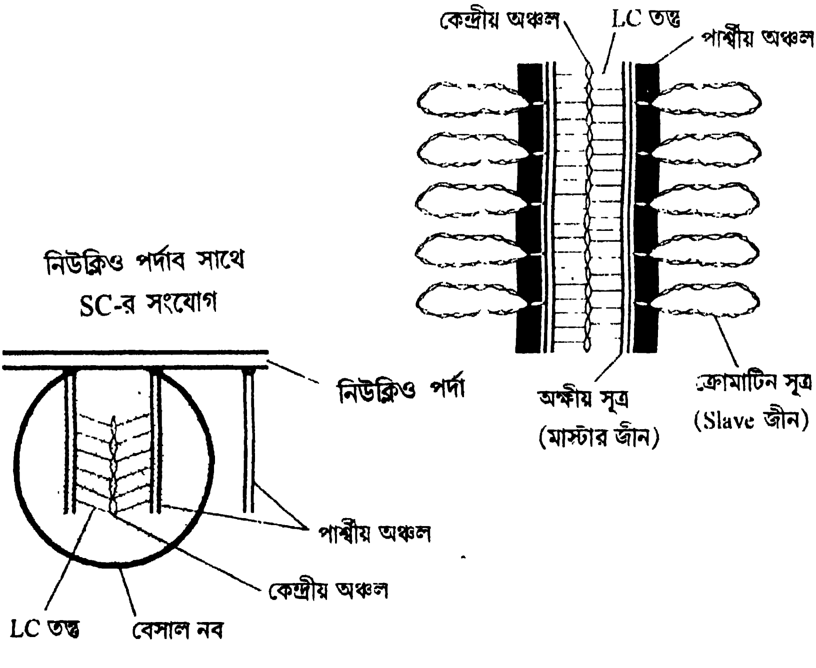
Comings এবং Okada (1971) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে জানতে পারেন যে, SC-র পার্শ্বীয় অঞ্চলের সাথে ক্রোমোটিনের পাশাপাশি লুপগুলি যুক্ত থাকে ও এভাবে ক্রোমোসোম গঠন করে। পার্শ্বীয় অঞ্চল (lateral element) থেকে কতগুলি ছোট ছোট লুপ উৎপন্ন হয়। এগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে কেন্দ্রীয় অঞ্চল (central element) গঠন করে। এই লুপগুলির পার্শ্বীয় অঞ্চল LC গঠন করে। কোনও কোনও জীবে (যেমন— ইঁদুর, ব্যাঙে) কেন্দ্রীয় অঞ্চল সরল। কেন্দ্রীয় অঞ্চল ত্রিধা বিভক্ত (tripartite) হ'লে এরকম গঠন অনেকগুলি লুপের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

পার্শ্বীয় অঞ্চল বা উপাদান দু'টি প্রোটিন সূত্র দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক সিস্টার ক্রোমাটিডের জন্য একটি করে সূত্র রয়েছে। পার্শ্বীয় অঞ্চল বা উপাদানগুলি প্রোটিন দ্বারা গঠিত, কারণ DNAase এর প্রভাবে ক্রোমাটিন লুপ বিনষ্ট হয়, কিন্তু SC

অবিকৃত থাকে। কিন্তু প্রোটিন বিশ্লিষ্টকারী উৎসেচকের প্রভাবে SC বিনষ্ট হয়। রাইবোনিউক্লিয়েজ এবং ট্রিপসিন প্রয়োগ করলে SC বিনষ্ট হয়। Giles-এর ('75) মতে, SC প্রধানত হিস্টোন জাতীয় ক্ষারধর্মী প্রোটিন দ্বারা গঠিত।



সাইন্যাপটোনিম্যাল কমপ্লেক্স



চিত্র—53

সাইন্যাপটোনিম্যাল কমপ্লেক্স

ডিপ্লোটিন এবং ডায়াকাইনেসিসে SC ক্রোমাটিন থেকে পৃথক হয় এবং বিক্ষিপ্ত হতে পারে অথবা বিনষ্ট হয়। ডিপ্লোটিনের প্রারম্ভে LC তন্তুর লুপগুলি এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চল অদৃশ্য হয়। ছত্রাকে এবং ইঁদুরে ডিপ্লোটিন এবং ডায়াকাইনেসিসে SC ক্রমশ ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়।

সাইন্যাপটোনিম্যাল কমপ্লেক্স বা SC-র কাজ— Meyer 1964 খ্রিস্টাব্দে বলেন যে, SC কায়েসমা গঠন ও ক্রসিং ওভারের জন্য প্রয়োজন। কারণ, তিনি লক্ষ্য করেন যে, যেসব মায়োসিসে কায়েসমা গঠিত হয় না (achiasmatic meiosis), সেখানে SC দেখা যায় না। তবে পরে দেখা গেছে যে, কায়েসমাবিহীন মায়োসিসে SC থাকতে পারে। সুতরাং বলা যায় যে, SC থাকলেই কায়েসমা গঠিত হবে এ ধারণা সঠিক নয়। তবে ক্রসিং ওভার ও কায়েসমা গঠনের জন্য SC-র প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সাইন্যাপটিনিম্যাল কমপ্লেক্সের গঠন ও যুগ্মতা শুরুর সাথে সাথে কোষে আরও কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন— নতুন লাইপোপ্রোটিন এবং DNA-বন্ধনকারী (binding) r -প্রোটিন গঠিত হয়। এছাড়া কিছু DNA (কোষের মোট DNA-র 0.3-0.4%) এই সময় উৎপন্ন হয়। এই DNA-তে অন্য DNA-র তুলনায় G-C-র পরিমাণ বেশি থাকে।

জাইগোটিনে DNA উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হলে ভগ্ন ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হতে পারে। সম্ভবত জাইগোটিনে যে অঞ্চলে DNA উৎপন্ন হয়, সেসব অঞ্চলেই এই ভগ্নতা দেখা দেয়। জাইগোটিনে উৎপাদিত DNA সাথে সাথেই ক্রোমোসোমের সঙ্গে যুক্ত হয় না। মায়োসিসের প্রথম প্রফেজের শেষের দিকে এই DNA ক্রোমোসোমের অন্তর্ভুক্ত হয়।

Stern ও তাঁর সহকর্মীদের মতে, DNA-র অদ্বিগুণ (unreplicated) অংশগুলি ভগিনী ক্রোমাটিডগুলিকে S পর্যায় থেকে জাইগোটিন পর্যন্ত পরস্পরের অতি নিকটে থাকতে সাহায্য করে। এই সব অঞ্চলেই জাইগোটিনে প্রথম যুগ্মতা দেখা দেয়। সাইন্যাপটিনিম্যাল কমপ্লেক্স গঠিত হওয়ার জন্য এসব অঞ্চলে DNA উৎপাদন সম্পূর্ণ হওয়া দরকার। এসব অঞ্চলেই সম্ভবত ক্রসিং ওভার হয়ে থাকে। যদিও এর স্বপক্ষে কোনও জোরালো প্রমাণ নেই।

সাইন্যাপসিসের কারণ — হোমোলোগাস বা সমসংস্থ ক্রোমোসোমের যুগ্মতার কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে। প্রধান মতবাদগুলি হল— প্রিকোসিটি মতবাদ ও রিটারডেশন মতবাদ এবং DNA ও প্রোটিন উৎপাদনের মতবাদ।

1) Darlington-এর প্রিকোসিটি (precocity) মতবাদ (1937) অনুসারে, লেপ্টোটিনে ক্রোমোসোমগুলি ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয় না। ক্রোমোসোমগুলি একক অবস্থায় (singleness) থাকায় অসংপৃক্ত বা ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়. এর ফলে সমসংস্থ ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতা হয়। কিন্তু লেপ্টোটিনে DNA-র উৎপাদন সংক্রান্ত প্রমাণ এই মতবাদকে সমর্থন করে না।

2) Sax-এর রিটারডেশন (retardation) মতবাদ অনুসারে, কোষের বিপাকীয়

কাজ বিলম্বিত হওয়ার জন্য যুগ্মতা হয়। এই সময় ক্রোমোসোমগুলি কুণ্ডলিত অবস্থায় না থাকায় এদের মধ্যে আকর্ষণ দেখা যায় না ও যুগ্মতা হয়।

3) DNA ও প্রোটিন উৎপাদনের মতবাদ— 1966 খ্রিস্টাব্দে Hotta *Lilium*-এ দেখেন যে, মোট DNA-র 0.3% জাইগোটিন এবং প্যাকিটিনে উৎপন্ন হয়। 1968 খ্রিস্টাব্দে Yuri Bogdanov *Crillus domesticus*-এর জাইগোটিনে 25% হিস্টোন উৎপাদন লক্ষ্য করেন। প্যাকিটিনে হিস্টোন উৎপাদন সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, জাইগোটিনে ক্রোমোসোমে DNA ও হিস্টোনের স্বল্পতার জন্য সমসংস্থ ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতা দেখা যায়।

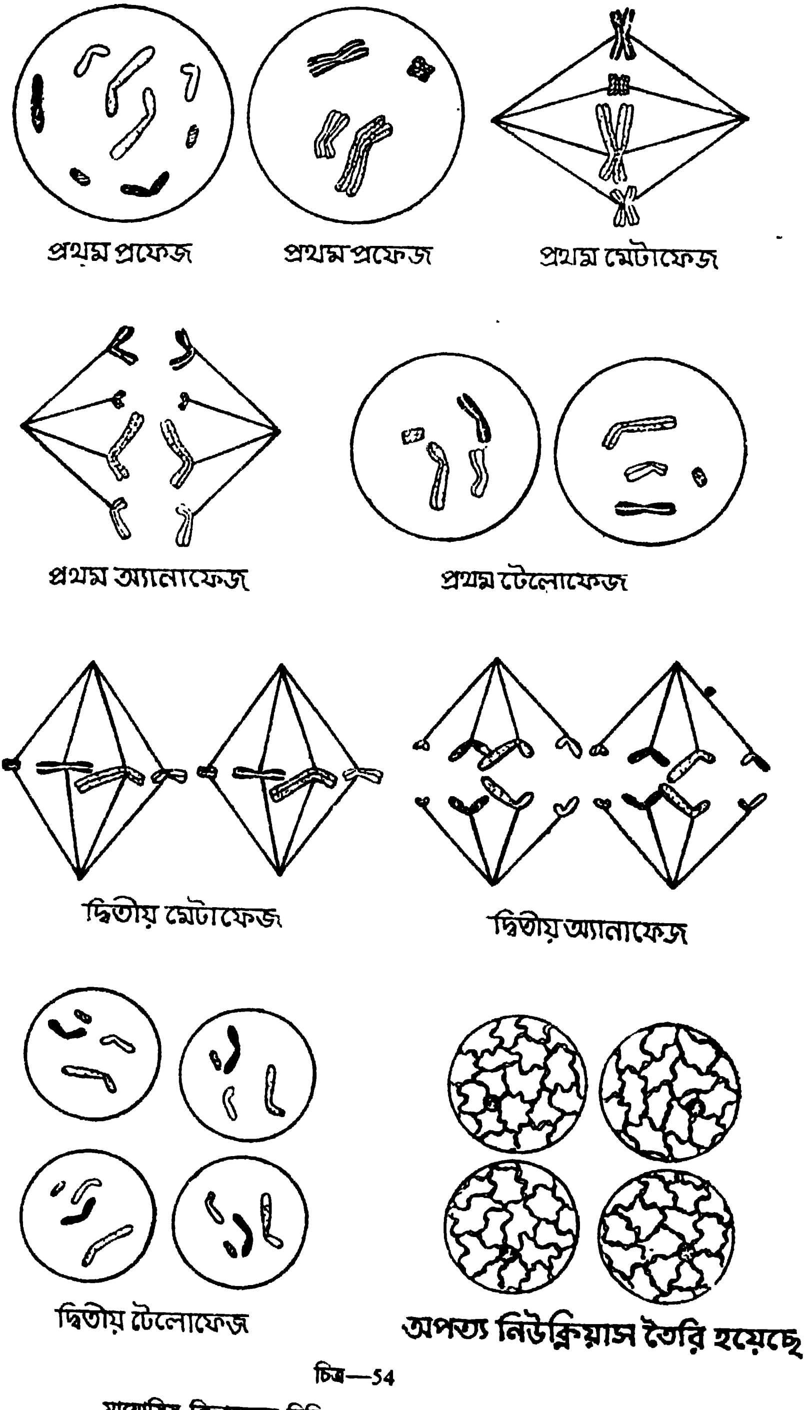
সাইন্যাপটোনিম্যাল কমপ্লেক্সের গুরুত্ব— Moses-এর মতে, কায়েসমা গঠন ও ক্রসিং ওভার হওয়ার জন্য সাইন্যাপসিসের প্রয়োজন রয়েছে।

C) প্যাকিটিন (pachytene) — জাইগোটিনের (চিত্র 51) তুলনায় প্যাকিটিন বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়। এই অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি আরও ঘনীভূত হওয়ায় ছোট ও মোটা দেখায় এবং বাইভ্যালেন্টগুলিকে আলাদাভাবে চেনা যায়। প্রত্যেক ক্রোমোসোমে দু'টি ক্রোমাটিড দেখা যায়। প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টে চারটি ক্রোমাটিড থাকে বলে এদের টেট্রাড (tetrad) বলা হয়। প্যাকিটিনে বাইভ্যালেন্টের ক্রোমোসোম দুইটির মধ্যে আকর্ষণ কমে যায়। এই সময় ক্রোমোসোমগুলি জাইগোটিনের তুলনায় আরও কুণ্ডলিত হয়। মুখ্য কুণ্ডলের (major coil) ব্যাস আরও বাড়ে এবং গৌণ কুণ্ডল (minor coil) দেখা দেয়। প্যাকিটিনে নিউক্লিওলাসের সাথে নির্দিষ্ট ক্রোমোসোম যুক্ত থাকে এবং বাইভ্যালেন্টগুলি নিউক্লিয়াসের মধ্যে ছড়ান থাকে। যেসব প্রাণীতে ক্রোমোসোমগুলি লেপ্টোটিন ও জাইগোটিনে মেরু অভিমুখী বা polarized থাকে, সেখানে প্যাকিটিনে পোলারাইজেশনের (polarization) মাত্রা কমে যায়।

প্যাকিটিনে সাইন্যাপটোনিম্যাল কমপ্লেক্সের উপস্থিতি ও প্রোটিন উৎপাদন অব্যাহত থাকায় যুগ্মতা তখনও দেখা যায়।

প্যাকিটিনে কিছু DNA উৎপন্ন হয়। তবে জাইগোটিনের উৎপাদিত DNA-র তুলনায় এর পরিমাণ কম। তাছাড়া এই DNA প্যাকিটিন নির্দিষ্ট এন্ডোনিউক্লিয়েজকে সক্রিয় করে। প্যাকিটিনে উৎপাদিত DNA-র গঠন কোষের মোট DNA-র অনুরূপ। প্যাকিটিনে DNA-র উৎপাদন মায়োসিস বিভাজনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয়। যেসব অঞ্চলে নিউক্লিওটাইডের ক্রমে পুনরাবৃত্তি থাকে, সাধারণত সেসব অঞ্চলে প্যাকিটিনে DNA উৎপন্ন হয়। প্যাকিটিনে DNA-উৎপাদন ব্যাহত হলে ক্রোমোসোমে ভগ্নতা দেখা দিতে পারে। তবে এইসব অস্বাভাবিকতা জাইগোটিনের তুলনায় অনেক কম (এক দশমাংশ)। এরকম অস্বাভাবিতা অনেক দেরিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজনের সময় দেখা দেয়।

(d) ডিপ্লোটিন (diplotene)— ডিপ্লোটিনে (চিত্র 51) চারটি ক্রোমোটিডের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টের ক্রোমোসোম দু'টি

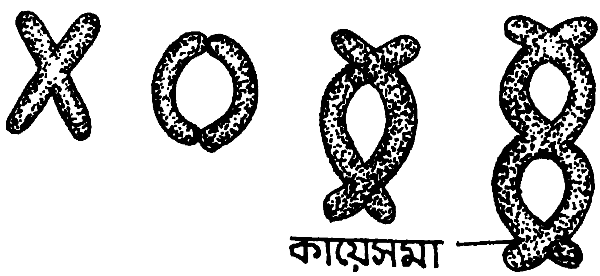


চিত্র—54

মায়োসিস বিভাজনের বিভিন্ন অবস্থা নক্সাকারে দেখান হয়েছে

যা এতক্ষণ পর্যন্ত আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে পাশাপাশি ছিল, তাদের মধ্যে বিকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়।

প্যাকিটিন শেষ হওয়ার পর সাইন্যাপটোনিম্যাল কমপ্লেক্স বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দু'টি ভালভাবে বোঝা যায়। ইন্টারফেজ ও জাইগোটিনে DNA উৎপাদনের জন্য ক্রোমোসোমের এই দ্বিগুণতা (duality) সম্ভবপর হয়। হোমোলোগাস (homologous) ক্রোমোসোমগুলি ক্রমে পৃথক হতে আরম্ভ করে, কিন্তু এক বা একাধিক স্থানে এরা যুক্ত থাকে। এইসব স্থানকে কায়েসমা (chiasma, sing-chiasmata) বলে। কায়েমসার অবস্থানের ওপর বাইভ্যালেন্টের আকৃতি নির্ভর করে। একটি কায়েসমা থাকলে বাইভ্যালেন্ট X আকৃতির হয়। দু'টি কায়েসমার উপস্থিতিতে বাইভ্যালেন্টটি একটা ফাঁস (loop) গঠন করে। অনেকগুলি কায়েসমার উপস্থিতিতে এক সারি ফাঁসের (loop) সৃষ্টি হয় (চিত্র 55)। কায়েসমা ক্রোমোসোমের প্রান্তে থাকলে একে প্রান্তীয় (terminal) কায়েসমা বলে। কায়েসমা ক্রোমোসোমের বাহুর (arm) প্রান্ত ছাড়া অন্য যে কোনও অংশে থাকলে, একে মধ্যবর্তী (interstitial) কায়েসমা বলা হয়। কোনও কোনও বিজ্ঞানী মনে করেন যে, সব কায়েসমাই মধ্যবর্তী



চিত্র—55

বাইভ্যালেন্টের আকৃতি কায়েসমার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে

ধরনের এবং মধ্যবর্তী কায়েসমা প্রান্তের দিকে সরে যাবার ফলে প্রান্তীয় কায়েসমার সৃষ্টি হয়। প্রান্তের দিকে কায়েসমার চলনকে terminalization বা প্রান্তিকরণ বলে। একটা ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দু'টিকে ভগিনী ক্রোমাটিড (sister chromatid) বলে। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডকে অ-ভগিনী ক্রোমাটিড (non-sister chromatid) বলে। কায়েসমার স্থানে অ-ভগিনী ক্রোমাটিড দু'টি ভেঙে যায় ও ভগ্ন প্রান্তের পেঁচ খুলে যায়। একটি ক্রোমাটিডের ভগ্ন অংশ অ-ভগিনী ক্রোমাটিডের ভগ্ন অংশের সাথে যুক্ত হয় অর্থাৎ, কায়েসমা অঞ্চলে দু'টি অ-ভগিনী

বা ননসিস্টার ক্রোমাটিড সমান অংশ বিনিময় করে (চিত্র 52)। এই অংশ বিনিময়কে ক্রসিং ওভার (crossing over) বলে। কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে বাইভ্যালেন্টের চারটি ক্রোমাটিডের মধ্যে কেবল দু'টি ক্রোমাটিড অংশ বিনিময় করে। 1969 খ্রিস্টাব্দে Stern ও Hotta দেখেন যে, এনজাইম এন্ডোনিউক্লিয়েজ দু'টি অ-ভগিনী ক্রোমাটিডকে একই জায়গায় ভেঙে দেয় ও এনজাইম লাইগেস ক্রোমাটিডের ভগ্ন অংশ যুক্ত করে। কায়েসমার সংখ্যা ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে। লম্বা ক্রোমোসোমে ছোট ক্রোমোসোমের তুলনায় বেশি কায়েসমা থাকে। একটি ক্রোমোসোমে কায়েসমার সংখ্যা সাধারণত 1-2 পর্যন্ত হয়ে থাকে। কোনও ক্রোমোসোমে একটি কায়েসমার উপস্থিতি দ্বিতীয় কায়েসমা গঠনে বাধার সৃষ্টি করে (interference বা প্রতিরোধ)।

কায়েসমার উৎপাদন জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। কায়েসমার সংখ্যা, অবস্থান ইত্যাদি নির্দিষ্ট প্রজাতির ওপর নির্ভরশীল।

বাইভ্যালেন্টে কায়েসমার গড় সংখ্যা অর্থাৎ কায়েসমার ফ্রিকোয়েন্সি (Fq) নির্ণয় করতে হলে কায়েসমার মোট সংখ্যাকে বাইভালেন্টের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়।

$$\text{কায়েসমার ফ্রিকোয়েন্সি (Fq)} = \frac{\text{কায়েসমার মোট সংখ্যা}}{\text{বাইভ্যালেন্টের মোট সংখ্যা}}$$

Darlington-এর মতে, ডিপ্লোটিনে ক্রোমোসোমে দুই রকম বিকর্ষণ শক্তি দেখা যায়। ক্রোমোসোমের সমস্ত দৈর্ঘ্য ধরে একটি ইলেক্ট্রোনেগেটিভ (ঋণাত্মক) চার্জ থাকে। এর ফলে ক্রোমোসোমের মধ্যে বিকর্ষণ দেখা যায়। এছাড়া সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে ইলেক্ট্রোপজিটিভ (ধনাত্মক) চার্জের উপস্থিতির জন্য কায়েসমাগুলি প্রান্তের দিকে সরে যেতে থাকে।

ডিপ্লোটিন অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি কুণ্ডলিত হয় অর্থাৎ পেঁচিয়ে যায় বলে এদের আরও ছোট ও মোটা দেখায়। এই সময় ম্যাট্রিক্স দেখা যায় ও নিউক্লিওলাসটি ক্রমশ ছোট হতে থাকে।

কোনও কোনও মেরুদণ্ডী প্রাণীর ডিম্বাশয়ের কোষে (oocyte) মায়োসিস বিভাজনের ডিপ্লোটিন দশা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। যেমন, ব্যাঙে ডিপ্লোটিন এক বছর বা বেশি সময় স্থায়ী হতে পারে। এরকম দীর্ঘ ডিপ্লোটিনকে ডিক্টিওটিন (dictyotene) বলা হয়।

e) ডায়াকাইনেসিস (diakinesis) — ডায়াকাইনেসিস (চিত্র 51) অবস্থায় ম্যাট্রিক্সের পরিমাণ বাড়ে। ক্রোমোসোমের কুণ্ডলীকরণ বা coiling অব্যাহত থাকে বলে এরা ক্রমশ ছোট ও মোটা হয়। এই অবস্থায় ক্রোমোসোমের সংখ্যা সহজেই গোনা যায়। বাইভ্যালেন্টগুলি পরস্পর বিকর্ষণ করে এবং নিউক্লিয়াসের পরিধির দিকে সরে যায়। ডায়াকাইনেসিসে কায়েসমাগুলি প্রান্তের দিকে যেতে থাকে। দীর্ঘ

ক্রোমোসোমে অনেকগুলি কায়েসমা থাকলে এদের terminalization বা প্রান্তিকরণ ডায়াকাইনেসিসে সম্পূর্ণ হয় না। কায়েসমার প্রান্তিকরণের হার নিচের সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়।

$$T = \frac{\text{প্রান্তীয় কায়েসমার সংখ্যা}}{\text{মোট কায়েসমার সংখ্যা}}$$

(T = প্রান্তিকরণের পরিমাণ)

ডায়াকাইনেসিসে নিউক্লিওলাসটি ক্রমশ ছোট হতে থাকে ও শেষে অদৃশ্য হয়।

প্রথম প্রোমেটাফেজ (prometaphase I) — এই অবস্থায় নিউক্লিও পর্দা অবলুপ্ত হয় ও স্পিন্ডিল তৈরি হয়। প্রাণী কোষে সেন্ট্রোসোম দু'টি বিপরীত প্রান্তে (মেরুতে) থাকে এবং এদের মধ্যে স্পিন্ডিল তৈরি হয়।

বাইভ্যালেন্টগুলির সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল স্পিন্ডিল তন্তুর (spindle fibre) সাথে যুক্ত হয় এবং এরা স্পিন্ডিলের নিরক্ষরেখার (equator) দিকে যায়।

প্রথম মেটাফেজ (metaphase I) — মেটাফেজে (চিত্র 51, 54) ক্রোমোসোমগুলি সবচেয়ে বেশি ঘনীভূত অবস্থায় থাকে ও এদের মসৃণ দেখায়। বাইভ্যালেন্টগুলি স্পিন্ডিলের নিরক্ষরেখা অঞ্চলে অবস্থান করে। প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টে দুইটি কার্যত অবিভাজিত সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। এই সেন্ট্রোমিয়ার নিরক্ষরেখা থেকে সমান দূরত্বে উপরে ও নিচে থাকে। বাহুগুলি নিরক্ষরেখার দিকে থাকে। দুইটি সেন্ট্রোমিয়ারের মধ্যে ব্যবধান কায়েসমার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। কায়েসমা সেন্ট্রোমিয়ারের কাছে থাকলে এই দূরত্ব কম হয়। সেন্ট্রোমিয়ার থেকে দূরে কায়েসমা থাকলে বাইভ্যালেন্টের সেন্ট্রোমিয়ার দুইটির মধ্যে ব্যবধান বেশি হয়। মেটাফেজের শেষে প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টের হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটির মধ্যে বিকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়।

যেসব জীবের কোষে সেন্ট্রোসোম থাকে সেখানে মেটাফেজে এবং এমনকি স্পিন্ডিল সম্পূর্ণ গঠিত হওয়ার আগেই বাইভ্যালেন্টের সেন্ট্রোমিয়ার দুইটি বিপরীত মেরুর দিকে আকৃষ্ট হতে পারে, যেমন দেখা গেছে ম্যান্টিডের শুক্রাণু মাতৃকোষে। এই প্রক্রিয়াকে প্রিমেটাফেজ প্রসারণ (premetaphase stretch) বলে। স্পিন্ডিলের মাইক্রোটিউবিউলগুলি বাইভ্যালেন্টগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

প্রথম অ্যানাফেজ (anaphase I) — প্রথম অ্যানাফেজে (চিত্র 51, 54) প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টের হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটি বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপরীত মেরুর দিকে যেতে শুরু করে। ক্রোমোসোমের এই পৃথক হওয়াকে ডিসজাংশন (disjunction) বলে। সেন্ট্রোমিয়ার মেরুর দিকে প্রথমে অগ্রসর হয় ও বাহু দু'টিকে টেনে নিয়ে যায়। এই সময় স্পিন্ডিল ক্রমশ লম্বা হয়। কায়েসমার টারমিন্যালাইজেশন আগেই সম্পূর্ণ হলে ক্রোমোসোমগুলি সহজেই আলাদা হয়ে যায়। কায়েসমার প্রান্তিকরণ বা টারমিন্যালাইজেশন

আগে সম্পূর্ণ না হয়ে থাকলে কায়েসমা অঞ্চলে কিছু প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয়। কিন্তু হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দু'টির মধ্যে বিকর্ষণের ফলে কায়েসমাগুলি ক্রমশ প্রান্তের দিকে সরে যেতে থাকে যতক্ষণ না ক্রোমোসোম দু'টি আলাদা হচ্ছে। মায়োসিসে সেন্ট্রোমিয়ারগুলি কার্যত অবিভাজিত থাকে ও সম্পূর্ণ ক্রোমোসোম মেরুতে যায়। এর ফলে প্রত্যেক মেরুতে হ্যাপ্লয়েড (haploid) বা 'n' সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।

প্রথম প্রফেজে যে দুইটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোম (একটি মাতা থেকে ও অন্যটি পিতা থেকে আসে) যুগ্ম অবস্থান করেছিল, তা অ্যানাফেজে আবার আলাদা হয়ে যায়। তবে ক্রসিং ওভার হয়ে থাকলে কোনও কোনও ক্রোমাটিড মাতা ও পিতার ক্রোমাটিডের সংযোগে তৈরি হয়।

প্রথম টেলোফেজ (telophase I) — মাইটোসিসের টেলোফেজের মত প্রথম টেলোফেজে (চিত্র 51) একই রকম পরিবর্তন দেখা যায়। ক্রোমোসোমগুলির পেঁচ খুলে যাবার ফলে এগুলি খুব লম্বা ও সরু হয়। নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিওপর্দা আবির্ভূত হয়।

টেলোফেজের পর কখনও কখনও সাইটোকাইনেসিস হয়। আবার কখনও বা সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয় না, যেমন নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের মায়োসাইটে (meiocyte) এবং অনেক উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের পরাগরেণু মাতৃকোষে।

Trillium-এ অ্যানাফেজ ক্রোমোসোমগুলি মেরুতে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় মেটাফেজ আরম্ভ হয়। ক্রোমোসোমের coil বা কুণ্ডলগুলি অপরিবর্তিত থাকে ও এইগুলি দ্বিতীয় টেলোফেজ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অনেক সময় প্রথম টেলোফেজের ক্রোমোসোমগুলি নিউক্লিয়াস গঠন না করে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রফেজ শুরু করে।

ইন্টারকাইনেসিস (interkinesis)

প্রথম মায়োটিক বিভাজন ও দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজনের মাঝের সময়কে ইন্টারকাইনেসিস বলে। এই সময় কোষ বিভাজন সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। দুইটি মায়োসিস বিভাজনের মধ্যে DNA উৎপাদনের S অবস্থা দেখা যায় না।

দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজন

এই বিভাজন মাইটোসিসের মত হলেও এর সাথে মাইটোসিসের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় মায়োসিসে ক্রোমোসোমগুলির সংখ্যা হ্যাপ্লয়েড থাকে, কিন্তু মাইটোসিসের সময় কোষে ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোসোম দেখা যায়। দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজনে ক্রোমোটিডগুলি আলাদা থাকে, কিন্তু মাইটোসিসে ক্রোমোসোমের ভগিনী ক্রোমোটিড দুইটি পরস্পর পেঁচান থাকে। তাছাড়া মায়োসিস আরম্ভ হওয়ার সময় ক্রোমাটিডের যে রকম জেনেটিক গঠন ছিল, তা থেকে দ্বিতীয় বিভাজনের কোনও কোনও ক্রোমাটিডের জেনেটিক গঠন ক্রসিং ওভারের জন্য

আলাদা হয়ে থাকে। কিন্তু অনেকবার মাইটোসিস বিভাজন হলেও, ক্রোমাটিডের জেনেটিক গঠন সাধারণত একই থাকে।

দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজনকে আবার চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়— যেমন— দ্বিতীয় প্রফেজ, দ্বিতীয় মেটাফেজ, দ্বিতীয় অ্যানাফেজ এবং দ্বিতীয় টেলোফেজ। দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায়ের বর্ণনা দেওয়া হল।

দ্বিতীয় প্রফেজ (prophase II) — এই অবস্থা স্বল্পস্থায়ী এবং প্রথম প্রফেজের মত জটিল নয়। দ্বিতীয় প্রফেজে (চিত্র 51, 54) প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটি সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে যুক্ত থাকে, কিন্তু বাহুগুলি ছড়ান থাকে। প্রথম টেলোফেজে ও ইন্টারফেজে ক্রোমোসোমের মুখ্য কুণ্ডল অবলুপ্ত হয়ে থাকলে এই সময় প্রথম বিভাজনের গৌণ কুণ্ডল থেকেই কুণ্ডলগুলি (coil) তৈরি হয় এবং ক্রোমোসোমগুলি ছোট দেখায়। দ্বিতীয় প্রফেজের শেষে নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিও পর্দা অদৃশ্য হয়।

দ্বিতীয় মেটাফেজ (metaphase II) — দ্বিতীয় মেটাফেজে (চিত্র 51, 54) স্পিন্ডিল তৈরি হয় এবং ক্রেমোসোমগুলি স্পিন্ডিলের নিরক্ষরেখায় অবস্থান করে। প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটির মধ্যে প্রফেজ অবস্থায় যে বিকর্ষণ দেখা গিয়েছিল তা সম্পূর্ণ দূর হয়, ক্রোমাটিড দুইটি পাশাপাশি থাকে। মেটাফেজের শেষে সেন্ট্রোমিয়ার দ্বিগুণ হয়।

দ্বিতীয় অ্যানাফেজ (anaphase II) — দ্বিতীয় অ্যানাফেজে (চিত্র 51, 54) প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটি বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপরীত মেরুর দিকে যেতে শুরু করে। এখন এই ক্রোমাটিডকে অপত্য ক্রোমোসোম বলা হয়। আগেই ক্রোমাটিডের বাহু দুইটি পৃথক এবং সেন্ট্রোমিয়ারটি কার্যকরীভাবে দ্বিগুণ হয়েছিল বলে এই সময় ক্রোমাটিড দু'টি সহজেই আলাদা হয়ে যেতে পারে। সেন্ট্রোমিয়ারগুলি মেরুর দিকে আগে যায় এবং বাহুগুলিকে টেনে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় টেলোফেজ (telophase II) — ক্রোমোসোমগুলি মেরুতে পৌছবার সাথে সাথেই টেলোফেজ (চিত্র 54) শুরু হয়। এই সময় ক্রোমোসোমগুলির পেঁচ খুলে যাবার ফলে এদের খুব লম্বা ও সরু দেখায়। নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিও পর্দা তৈরি হয় ও শেষে অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয়।

সাইটোকাইনেসিস (cytokinesis) — বিভিন্ন উদ্ভিদে সাইটোকাইনেসিস ভিন্ন ভিন্ন সময় হয়। কোনও কোনও উদ্ভিদে প্রথম মায়োটিক বিভাজনের পরই সাইটোপ্লাজমের বিভাজনের ফলে দুইটি কোষের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় বিভাজনের পর আবার সাইটোকাইনেসিস হয় ও চারটি কোষ তৈরি হয়।

Paeonia-তে প্রথম বিভাজনের পর কোনও সাইটোকাইনেসিস হয় না। দ্বিতীয় বিভাজনের পর সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয়। দু'টি প্রাচীর একটা অন্যটার সমকোণে থাকে।

সাধারণত সাইটোকাইনেসিস খাঁজ (furrow) গঠনের মাধ্যমে হয়।

কোষে DNA-র পরিমাণ

DNA-র পরিমাণ এবং কোষের ploidy-র (হ্যাপ্লয়েডি ও ডিপ্লয়েডি ইত্যাদি) মাত্রার মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। যদি একটি হ্যাপ্লয়েড কোষে DNA-র পরিমাণ C হয়, তাহলে ডিপ্লয়েড কোষের DNA-র পরিমাণ 2C হবে। এটা লক্ষণীয় যে, DNA-র পরিমাণ C ও ক্রোমোসোম সংখ্যা যা n দিয়ে বোঝান হয়, তা কিন্তু এক নয়। মায়োসিস শুরু হওয়ার আগে S অবস্থায় DNA দ্বিগুণ হয় ও এর ফলে কোষে 4C পরিমাণ DNA থাকে। প্রথম অ্যানাফেজে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি যখন আলাদা হয়, তখন প্রত্যেক কোষে DNA-র পরিমাণ কমে 2C হয়। মায়োসিসে দ্বিতীয় বিভাজনের আগে S অবস্থা অনুপস্থিত থাকায় দ্বিতীয় অ্যানাফেজে যখন ভগ্নী ক্রোমটিড দুইটি আলাদা হয়ে যায়, তখন প্রতিটি অপত্য নিউক্লিয়াসে 1C পরিমাণ DNA থাকে।

মাইটোসিসের আগের S অবস্থায় DNA-র পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে 4C হয়। অ্যানাফেজে ক্রোমাটিডগুলি আলাদা হয়ে বিপরীত মেরুতে যায়, সেজন্য অপত্য নিউক্লিয়াসের DNA-র পরিমাণ 2C হয়।

মায়োসিসের তাৎপর্য

1) মায়োসিসের মাধ্যমে কোনও জীবের জীবন চক্রে ক্রোমোসোম সংখ্যা স্বাভাবিক থাকে। মায়োসিস হ'ল নিষেকের বিপরীত প্রক্রিয়া। নিষেকের ফলে ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয় অর্থাৎ, দুইটি হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট নিষিক্ত হয়ে একটা ডিপ্লয়েড জাইগোটের সৃষ্টি হয়। মায়োসিসের মাধ্যমে ডিপ্লয়েড কোষ থেকে আবার হ্যাপ্লয়েড কোষের সৃষ্টি হয় ও এইভাবে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে ক্রোমোসোম সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। যৌন জননশীল জীবের জীবন চক্রের কোনও একটা পর্যায়ে মায়োসিস অপরিহার্য।

2) মায়োসিসে ক্রসিং ওভারের ফলে মাতৃ ও পিতৃ ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশ বিনিময় হয়। এর ফলে জিনের নতুন জোট (combination) সম্ভব।

3) মায়োসিসের সময়ে পিতৃ ও মাতৃ ক্রোমোসোমগুলির যদৃচ্ছ পৃথকীকরণ (random seggregation) হয়। প্রথম মায়োটিক বিভাজনে বাইভ্যালেন্টগুলি বিভিন্নভাবে সাজান থাকে। সেইজন্য মায়োসিসের সৃষ্ট কোষগুলিতে পিতৃ মাতৃ ক্রোমোসোমের নানা রকম জোট দেখা যায়। যদি কোনও কোষে পাঁচ জোড়া ক্রোমোসোম থাকে, তাহলে বত্রিশ রকমের গ্যামেটের সৃষ্টি হতে পারে। কত রকমের গ্যামেট তৈরি হতে পারে তা 2^n (n = বাইভ্যালেন্টের মোট সংখ্যা) থেকে নির্ধারণ করা যায়। অধিকাংশ জীবে পাঁচ জোড়ার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। সেজন্য কেবল মাতৃ ক্রোমোসোম বা কেবল পিতৃ ক্রোমোসোম নিয়ে গ্যামেট গঠনের সম্ভাবনা খুবই কম।

4) মায়োসিসের সময়ে মাতা, পিতার ক্রোমোসোমের যদৃচ্ছ বন্টন এবং ক্রসিং ওভারের জন্য জিনের নতুন জোটের সৃষ্টি হয়। এইভাবে মায়োসিস জেনেটিক বিভিন্নতা (variation বা প্রকরণ) সৃষ্টির একটা প্রক্রিয়া হিসাবে কাজ করে। এই জেনেটিক ভ্যারিয়েশনের ফলে বিবর্তনে কোনও উদ্ভিদ বা প্রাণী গোষ্ঠীর উপযোগিতা বাড়ে।

মাইটোসিস ও মায়োসিসের তুলনা

মাইটোসিস (mitosis)	মায়োসিস (meiosis)
1) মাইটোসিসের ফলে ক্রোমোসোম সংখ্যার পরিবর্তন হয় না। অপত্য কোষে মাতৃকোষের সমান সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। এইজন্য এই বিভাজনকে equational division বা সমবিভাজন বলে।	1) মায়োসিসের ফলে ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হয়। মাতৃকোষ ডিপ্লয়েড হলে অপত্য কোষ হ্যাপ্লয়েড হয়। এইজন্য এই বিভাজনকে reduction division বা সংখ্যা হ্রাসকারী বিভাজন বলে।
2) দেহ কোষে ও জনন কোষে দেখা যায়। তবে গ্যামেট কিংবা রেণু গঠনের সময় সাধারণত এই বিভাজন হয় না।	2) কেবল জনন কোষে দেখা যায়।
3) মাইটোসিসের ফলে কোষের একবার বিভাজন হয়।	3) মায়োসিসের সময় কোষের দুইবার বিভাজন হয়। প্রথম মায়োটিক বিভাজন এবং দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজন। প্রথম মায়োটিক বিভাজনে ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়। দ্বিতীয় বিভাজনে ক্রোমোসোম সংখ্যা একই থাকে।
4) একটি মাতৃকোষ থেকে দু'টি অপত্য কোষ তৈরি হয়।	4) একটি মাতৃকোষ থেকে চারটি অপত্য কোষ তৈরি হয়।
প্রফেজ (prophase)	**প্রফেজ (prophase)**
5. (a) প্রফেজ একবার হয়।	5. (a) প্রফেজ দুইবার হয়—প্রথম প্রফেজ এবং দ্বিতীয় প্রফেজ।

মাইটোসিস (mitosis)	মায়োসিস (meiosis)
b) স্বল্পস্থায়ী।	b) প্রথম প্রফেজ দীর্ঘস্থায়ী, দ্বিতীয় প্রফেজ স্বল্পস্থায়ী।
c) প্রফেজকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয় না।	c) প্রথম প্রফেজকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এই উপবিভাগগুলি হল— লেপ্টোটিন (leptotene), জাইগোটিন (zygotene), প্যাকিটিন (pachytene), ডিপ্লোটিন (diplotene), ডায়াকাইনেসিস (diakinesis)।
d) নিউক্লিয়াসের আয়তন মায়োসিসের মত বড় হয় না।	d) নিউক্লিয়াসের আয়তন বেশ বড় হয়।
e) হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি জোড়ায় অবস্থান করে না। সাইন্যাপসিস হয় না; তবে ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যান্ডে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি যুগ্ম অবস্থান করে।	e) প্রথম প্রফেজে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি জোড়ায় অবস্থান করে অর্থাৎ সাইন্যাপসিস হয়।
f) অ-ভগিনী ক্রোমাটিড (non-sister chromatid) আলাদা থাকে।	f) প্রথম প্রফেজে অ-ভগিনী ক্রোমাটিড পরস্পর পেঁচান থাকে।
g) কায়েসমা তৈরি হয় না।	g) প্রথম প্রফেজে কায়েসমা গঠিত হয়।
h) ক্রসিং ওভার (crossing over) হয় না।	h) প্রথম প্রফেজে ক্রসিং ওভার হয়। অ-ভগিনী ক্রোমাটিড দুইটি অংশ বিনিময় করতে পারে।
i) কায়েসমা থাকে না বলে কায়েসমার প্রান্তিকরণও দেখা যায় না।	i) কায়েসমার প্রান্তিকরণ বা terminalization হয়।

মাইটোসিস (mitosis)	মায়োসিস (meiosis)
j) নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিও পর্দা বিলুপ্ত হয়।	j) মাইটোসিসের মত।
প্রোমেটাফেজ (prometaphase)	**প্রোমেটাফেজ (prometaphase)**
6. স্পিন্ডিল তৈরি হয়।	6. স্পিন্ডিল গঠিত হয়।
মেটাফেজ (metaphase)	**মেটাফেজ (metaphase)**
7. (a) একবার মেটাফেজ হয়।	7. (a) মেটাফেজ দুইবার হয়— প্রথম মেটাফেজ ও দ্বিতীয় মেটাফেজ।
b) সেন্ট্রোমিয়ার স্পিন্ডিলের ঠিক নিরক্ষরেখায় থাকে।	b) প্রথম মেটাফেজে প্রতি বাইভ্যালেন্টের একটা সেন্ট্রোমিয়ার স্পিন্ডিলের নিরক্ষরেখার একটু উপরে ও অন্যটা সামান্য নিচে থাকে। দ্বিতীয় মেটাফেজে সেন্ট্রোমিয়ার নিরক্ষরেখায় থাকে।
c) সেন্ট্রোমিয়ারগুলি বিভাজিত হয়।	c) প্রথম মেটাফেজে সেন্ট্রোমিয়ার কার্যকরীভাবে বিভজিত হয় না। দ্বিতীয় মেটাফেজ মাইটোসিসের মতই।
অ্যানাফেজ (anaphase)	**অ্যানাফেজ (anaphase)**
8. (a) একবার হয়।	8. (a) দুইবার হয়— প্রথম ও দ্বিতীয় অ্যানাফেজ।
b) প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দু'টি বিপরীত মেরুর দিকে যায়।	b) প্রথম অ্যানাফেজে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দু'টি বিপরীত মেরুর দিকে যায়। দ্বিতীয় অ্যানাফেজে প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দু'টি বিপরীত মেরুর দিকে যায়।

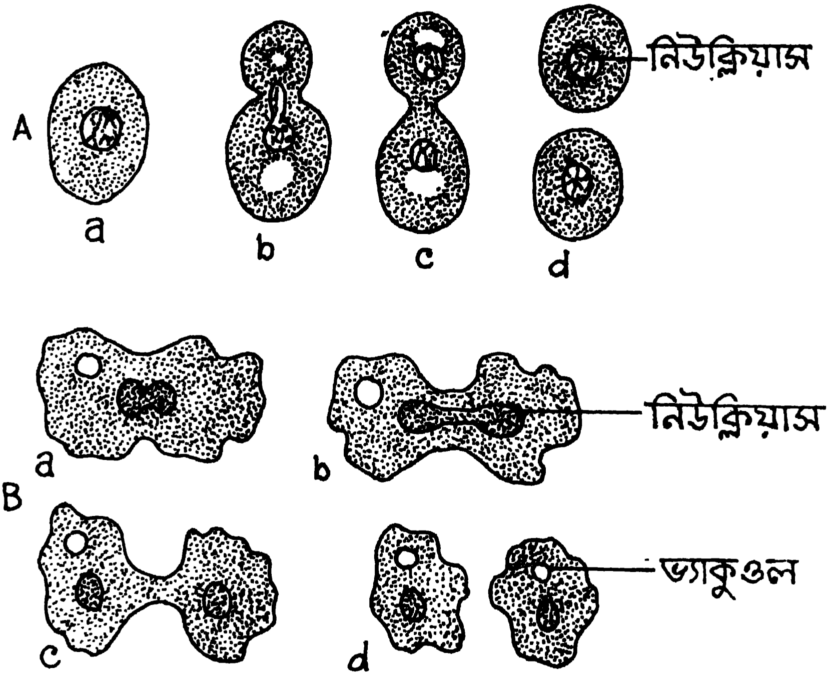
মাইটোসিস (mitosis)	মায়োসিস (meiosis)
c) ক্রোমোসোমগুলি প্রথম মায়োসিসের তুলনায় লম্বা ও সরু হয়।	c) প্রথম মায়োসিসে ক্রোমোসোমগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ও স্থূল থাকে।
d) দু'টি মেরুতেই সব ক্রোমোসোম যায়।	d) প্রথম অ্যানাফেজে প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টের ক্রোমোসোম দু'টি আলাদা হয়ে বিপরীত মেরুতে যাওয়ার ফলে প্রত্যেক মেরুতে মাতৃকোষের অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।
e) অপত্য ক্রোমোসোমেব জেনেটিক গঠন অপরিবর্তিত থাকে।	e) ক্রসিং ওভার (crossing over) হওয়ার ফলে কোনও কোনও অপত্য ক্রোমোসোমের জেনেটিক গঠন নতুন ধবনের হয়।
টেলোফেজ (telophase)	**টেলোফেজ (telophase)**
9 (a) একবার হয়।	9 (a) দুইবার হয়— প্রথম এবং দ্বিতীয় টেলোফেজ। তবে কখনও কখনও প্রথম টেলোফেজ হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় টেলোফেজ নিয়মিতভাবে হয়।
সাইটোকাইনেসিস (cytokinesis)	**সাইটোকাইনেসিস (cytokinesis)**
10 প্রত্যেক মাইটোসিস বিভাজনের পর সাইটোকাইনেসিস হয়।	10 প্রথম মায়োটিক বিভাজনের পর কখনও কখনও সাইটোকাইনেসিস হয়। দ্বিতীয় মায়োসিসের পর সাইটোকাইনেসিস হয়।

অন্যান্য ধরনের কোষ বিভাজন

অ্যামাইটোসিস (amitosis)

কোনও কোনও নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ (ইস্ট) ও প্রাণীতে (অ্যামিবা) নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি দু'টি অংশে বিভাজিত হয়। এই বিভাজনের ফলে সৃষ্ট অপত্য কোষ দু'টি অসমান হয়। এই রকমের কোষ বিভাজনকে অ্যামাইটোসিস (চিত্র 56)

বলে। অ্যামাইটোসিসের সময় নিউক্লিয়াসের মাঝের কোনও অংশ সঙ্কুচিত ও ক্রমশ সরু হওয়ার ফলে নিউক্লিয়াসটি লম্বা ও ডাম্বেল আকৃতির হয়। পরে ওই স্থানটি আরও সঙ্কুচিত হওয়ায় নিউক্লিয়াসটি দুইটি অংশে বিভাজিত হয়ে যায়। অ্যামাইটোসিসে স্পিন্ডিল গঠিত হয় না, নিউক্লিও পর্দা বর্তমান থাকে এবং ক্রোমোসোমগুলি অপত্য ক্রোমোসোমে বিভাজিত হয় না। নিউক্লিয়াসের এই ধরনের বিভাজনকে নিউক্লিয়ার



চিত্র—56

অ্যামাইটোসিস

A— ইস্টে বাডিং (budding) বা মুকুলোদগম,

B— অ্যামিবায় ফিশন (fission)

বাডিং (nuclear budding) বলে। কখনও কখনও নিউক্লিয়াসের এই রকম বিভাজনের ফলে দু'টির চেয়ে বেশি নিউক্লিয়াস তৈরি হয়; তখন ওই বিভাজনকে নিউক্লিয়ার ফ্র্যাগমেন্টেশন (fragmentation) বলে। নিউক্লিয়াসের অসমান বিভাজনের পর সাইটোপ্লাজমও ওইভাবে বিভক্ত হয়। সাইটোপ্লাজমের কোনও একটা স্থান সঙ্কুচিত হয়। ক্রমশ ওই জায়গায় সংকোচনের মাত্রা বাড়ার ফলে কোষ দু'টি আলাদা হয়ে যায়। অ্যামাইটোসিসের সময় নিউক্লিওলাস বিভাজিত হতে পারে কিংবা নাও হতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্রোমোসোমের আচরণ

ক্রোমোসোমের সঙ্কোচন (movement)

কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোসোমের নানা পরিবর্তন হয়। যেমন—ক্রোমোসোমের সঙ্কোচন, কুণ্ডলীকরণ (coiling), সাইন্যাপসিস (synapsis), কায়েসমার প্রান্তিকরণ (terminalization) ইত্যাদি। এখানে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের সঞ্চলন সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

ক্রোমোসোমের সঙ্কোচন

প্রফেজ থেকে মেটাফেজ ও অ্যানাফেজের ক্রোমোসোমগুলি অনেক বেশি সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে। এই সঙ্কোচনের ফলে সীমিত স্থানের মধ্যে দীর্ঘ ক্রোমোসোমগুলির বিভাজন ভালভাবে হতে পারে। মাইটোসিসের তুলনায় মায়োসিসে ক্রোমোসোমগুলি বেশি সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে। Manton-এর মতে, মায়োসিসে ক্রোমোসোমগুলি মাইটোসিসের তুলনায় 33-50% ছোট থাকে। মায়োসিস বিভাজনের প্যাকিটিনের তুলনায় লেপ্টোটিনের ক্রোমোসোমগুলি দীর্ঘ হয় (Manton 1939, 1950)। প্যাকিটিনের চেয়ে মেটাফেজের ক্রোমোসোমগুলি আরও ছোট হয়।

Huskin (1941) *Trillium*-এর ক্রোমোসোমের সঙ্কোচনের পরিমাণ কোষ বিভাজনের বিভিন্ন অবস্থায় লক্ষ্য করেন। ক্রোমোসোমের এবং ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। অনেক সময় ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য কমলেও একই সাথে ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্য বাড়তে পারে।

মেটাফেজে ক্রোমোসোমগুলি খুব ঘনীভূত অবস্থায় থাকে। প্রফেজ থেকে মেটাফেজে ক্রোমোসোমগুলি ক্রমশ বেশি সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে। এর কারণ হল, ক্রোমোসোমের নানা রকম কয়েলিং (coiling) বা কুণ্ডলীকরণ। প্রফেজের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে মেটাফেজ পর্যন্ত ক্রোমোসোমের সঙ্কোচনের মাত্রা ছয় গুণের চেয়ে বেশি হয়। *Trillium*-এ দেখা গেছে যে, প্রফেজের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে মেটাফেজ পর্যন্ত ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য কমে ও এর সাথে সাথে পেঁচ বা কুণ্ডলের (coil) সংখ্যাও কমে, কিন্তু ব্যাস বাড়ে। অ্যানাফেজে আবার ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য ও পেঁচের সংখ্যা বেড়ে যায়। *Trillium*-এর পরাগরেণুর কোষ বিভাজনের বিভিন্ন অবস্থায় ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য ও পেঁচের সংখ্যা কীরকম হয় তা নিচে দেওয়া হল।

কোষ বিভাজনের বিভিন্ন অবস্থা	ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য μm (মাইক্রোমিটার)	কয়েল বা পেঁচের সংখ্যা
প্রফেজের প্রারম্ভ	মোটামুটি 600	মোটামুটি 600
,, প্রথম অবস্থা	346	554
,, মধ্য ,,	203	259
,, শেষ ,,	156	169
মেটাফেজ	90	120
অ্যানাফেজ	95	130

মাইটোসিস ও মায়োসিসের সময় ক্রোমোসোমের সঙ্কোচন কুণ্ডলীকরণ বা কয়েলিং-এর (coiling) ওপর নির্ভর করে।

ক্রোমোসোমের কুণ্ডলীকরণ (coiling)

মেটাফেজে প্রত্যেক ক্রোমোসোম স্প্রিঙের মত সর্পিলভাবে পেঁচান থাকে। এই পেঁচানকে কয়েলিং বা কুণ্ডলীকরণ বলে। একটা সম্পূর্ণ পেঁচকে সোমাটিক বা মুখ্য কুণ্ডল (somatic, major বা standard coil) বলে। প্রত্যেক প্রফেজে সোমাটিক কুণ্ডল নতুন করে তৈরি হয়। কোনও নির্দিষ্ট প্রজাতিতে কুণ্ডলের সংখ্যা ও ব্যাস মোটামুটি একই থাকে। প্রফেজের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রোমোসোমগুলি ক্রমশ সঙ্কুচিত হয় ও মেটাফেজে ভগ্নী ক্রোমাটিড (sister chromatid) দু'টির পেঁচ খুলে গিয়ে এরা আলাদা হয়ে যায় ও পাশাপাশি অবস্থান করে, কেবল সেন্ট্রোমিয়ার অংশে ভগ্নী ক্রোমাটিড দু'টি যুক্ত থাকে।

মাইটোসিস বিভাজনের প্রফেজে ক্রোমাটিড দু'টি এমনভাবে পেঁচান থাকে, যার ফলে প্রান্ত দু'টি ঘুরে না গেলে এরা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে না। এই রকমের পেঁচ বা কয়েলকে **প্লেকটোনেমিক কয়েল** (plectonemic coil) (চিত্র 57) বলা হয়।

মায়োসিসে ক্রোমাটিড দু'টি এমন করে পেঁচান থাকে যে, এদের প্রান্ত দু'টি ঘুরে না গেলেও অ্যানাফেজে এরা সহজেই আলাদা হয়ে যায়। এই রকমের পেঁচকে **প্যারানেমিক কয়েল** (paranemic coil) (চিত্র 57) বলে।

কোষ বিভাজনের অগ্রগতির সাথে সাথে কুণ্ডল বা কয়েলের সংখ্যা কমতে থাকে ও এদের ব্যাস বাড়ে। মেটাফেজ ও অ্যানাফেজে কুণ্ডলের সংখ্যা কমে ও এই প্রক্রিয়াকে despiralization বা বিকুণ্ডলীকরণ বলে। লেপ্টোটিন বা তার আগেই যখন ক্রোমোসোমগুলি কুণ্ডলিত হতে আরম্ভ করে, তখন ঐ প্রক্রিয়াকে spiralization বা কুণ্ডলীকরণ বলা হয়।

মাইটোসিসের তুলনায় মায়োসিসে যে পেঁচ বা কুণ্ডল দেখা যায়, তা অপেক্ষাকৃত

জটিল। মাইটোসিসের মেটাফেজের তুলনায় মায়োসিসের বাইভ্যালেন্টে অল্প সংখ্যক কিন্তু বড় বড় মুখ্য কুণ্ডল (major coil) দেখা যায়। এছাড়া ক্রোমোসোমের সব জায়গায় একরকম ছোট ছোট কুণ্ডল দেখা যায়। এদের গৌণ কুণ্ডল (minor coil) বলে। মাইনর কয়েল মেজর কয়েলের সমকোণে থাকে। Fuji (1926) *Tradescantia*-এ প্রথম মাইনর কয়েল দেখতে পান।



চিত্র—57

প্লেকটোনেমিক ও প্যারানেমিক কয়েল

মায়োসিসে বিভিন্ন কুণ্ডলের ভাগ্য নানা ধরনের জীবে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। *Tradescantia*-এ প্রথম মায়োটিক বিভাজনের পর ইন্টারকাইনেসিসে মেজর কয়েল বিনষ্ট হয়ে গিয়ে মাইনর কয়েলগুলি ক্রমশ বড় হয় ও দ্বিতীয় মেটাফেজে বড় কুণ্ডল (বা কয়েল) গঠন করে। *Trillium*-এ প্রথম ও দ্বিতীয় মায়োসিস বিভাজনের মাঝে ইন্টারকাইনেসিস অবস্থা অনুপস্থিত থাকে। প্রথম মায়োটিক বিভাজনের মেজর কয়েলগুলি দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজনেও অপরিবর্তিত থাকে।

ক্রোমোসোমে কয়েল বা কুণ্ডলের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে। এই মতগুলিকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়— (a) টরশন (torsion) বা ব্যবর্তনের মত, (b) ম্যাট্রিক্সীয় (matrical) মত। Darlington, Kuwada, Nabel প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা প্রথমোক্ত মতের সমর্থক। Darlington-এর (1935) আণবিক মতবাদ (molecular theory) অনুসারে, ক্রোমোসোমের নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন কয়েলিং বা কুণ্ডলীকরণ নিয়ন্ত্রণ করে। নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের গঠন থেকে বোঝা যায় যে, এইসব অণুর কুণ্ডলিত অবস্থায় থাকবার প্রবণতা আছে। আণবিক কুণ্ডলের জন্য যে ব্যবর্তন (torsion) শক্তির সৃষ্টি হয়, তার প্রভাবে কয়েল দেখা দেয়। আণবিক কুণ্ডলের জন্য সূত্রগুলি বিপরীত দিকে ঘুরে গিয়ে টেনশন (tension) বা চাপ কমাতে চায় এবং এর ফলে ক্রোমোসোমে কুণ্ডল দেখা দেয়। Sax ও Wilson, Huskin প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় মতের সমর্থক। তাঁদের মতে, ম্যাট্রিক্সের মধ্যে

ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের ফলে কয়েলের সৃষ্টি হয়। Sax ও Hamphry-র (1934) মতে ম্যাট্রিক্সের সঙ্কোচনের ফলে ক্রোমোনিমার ওপর চাপ পড়ে এবং এর ফলে *Tradescantia*-এ মেজর কয়েলের উৎপত্তি হয়। Wilson ও Huskin (1939) দেখেন যে, *Trillium erectum*-এ মেজর কয়েল বা মুখ্য কুণ্ডল তৈরি হওয়ার সময় ক্রোমোসোমগুলি সামান্য সঙ্কুচিত হয় কিন্তু ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ বাড়ে। সুতরাং, সীমিত ম্যাট্রিক্সের মধ্যে ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্য বাড়ার ফলেই মেজর কয়েল গঠিত হয় (Huskin 1941)। Coleman ও Hillary (1941) এই মতেরই সমর্থক। তাঁদের মতে, ডিপ্লোটিনে গৌণ কুণ্ডল বা মাইনর কয়েল খুলে যাওয়ার ফলে ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্য বাড়ে। কোনও দু'টি সূত্র পরস্পর পেঁচিয়ে কয়েল গঠন করবে কিনা তা নির্ভর করে কয়েল গঠনের সময় তাদের মধ্যে দূরত্বের ওপর। যদি সূত্র দু'টির আলাদা ম্যাট্রিক্স থাকে ও তাদের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান থাকে তবে সূত্রগুলি পরস্পর পেঁচিয়ে যায় না এবং তাদের নিজস্ব পেঁচ যে কোনও দিকে থাকতে পারে, যেমন— সোমাটিক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডদ্বয়। যদি সূত্র দু'টি একই ম্যাট্রিক্সের মধ্যে আলাদাভাবে থাকে, তবে সূত্র দু'টি পরস্পর পেঁচিয়ে যায় না এবং এদের নিজস্ব পেঁচ একই দিকে থাকে, যেমন— প্রথম মায়োটিক বিভাজনের ভগ্নী ক্রোমাটিডগুলি। যদি সূত্র দু'টি খুব কাছে থাকে এবং কয়েলিং-এর আগে আলাদা ও সমান্তরালভাবে থাকে, তবে তারা পরস্পর পেঁচিয়ে কয়েল গঠন করে, যেমন— মাইটোসিস ও মায়োসিসের অর্ধ-ক্রোমাটিডগুলি। সুতরাং, ম্যাট্রিক্সীয় মতের সমর্থকরা মনে করেন যে, ম্যাট্রিক্স ও ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্যের তারতম্যের জন্য কুণ্ডল তৈরি হয় এবং দু'টি সূত্রের ব্যবধানের ওপর কয়েলের উৎপত্তি নির্ভর করে।

কুণ্ডলীকরণের (coiling) মাত্রা তাপমাত্রা, জেনেটিক গঠন ও পুষ্টির ওপর নির্ভর করে। Brown টমেটোতে দেখেন যে, একই কোষের বিভিন্ন ক্রোমোসোমে কুণ্ডলীকরণের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। Ris-এর (1945) মতে, ক্রোমোসোমের বিভিন্ন স্থানের কুণ্ডলীকরণের মাত্রার তারতম্যের জন্য প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন (primary, secondary constriction), হেটারোক্রোমাটিন (hetero-chromatin) প্রভৃতি অঞ্চল দেখা যায়। Gall (1956) এই মতের সমর্থন করেন। কিন্তু D' Angelo (1950) ও Duryee-র (1941) পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় যে, সব ক্ষেত্রে Ris-এর ধারণা প্রযোজ্য নয় কারণ কোনও কোনও জীবের ক্রোমোসোমকে microneedle (সূক্ষ্ম সূচ) দিয়ে টানলেও, ক্রোমোনিমার অংশ অবিকৃত থাকে।

কয়েলিং-এর কারণ সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা হল যে, ক্রোমোসোমে নানা রকম পেঁচ গঠিত হয়। *Trillium luteum*-এর হ্যাপ্লয়েড ($n = 5$) ক্রোমোসোম সেটে মোট 1.3×10^{11} নিউক্লিওটাইড থাকে। প্রতি ক্রোমোসোমে নিউক্লিওটাইডের গড় সংখ্যা হল 13×10^{9}। সুতরাং, প্রত্যেক প্রসারিত DNA অণুর দৈর্ঘ্য কয়েক মিটার, কিন্তু প্রফেজ থেকে মেটাফেজে এগুলি ঘনীভূত হয়ে 20μ হয়। DNA অণুর এত সঙ্কোচন

কতকগুলি ধাপে হয়।

(a) প্রথমত DNA অণুতে **নিউক্লিওসোম** (nucleosome) গঠিত হওয়ায় এটা কিছুটা সঙ্কুচিত হয়। DNA অণুর ব্যাস 30Å এবং নিউক্লিওসোমের ব্যাস 100Å থেকে 125Å পর্যন্ত হয়। এর ফলে ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য সাত গুণ হ্রাস পায়। DNA ও হিস্টোন বা নিউক্লিও হিস্টোনে পুঁতির মত অংশ দেখা যায়। এগুলিকেই নিউক্লিওসোম বলে। নিউক্লিওসোমগুলি কাছে কাছে থাকে। নিউক্লিওসোমে মোটামুটি 200 জোড়া নিউক্লিওটাইড থাকে, যা হিস্টোনের সাথে যুক্ত হয়ে গোলাকার গঠনের সৃষ্টি করে। এর ব্যাস 10-12.5nm (ন্যানোমিটার) হয়। নিউক্লিওসোম প্রতি নিউক্লিওটাইডের সংখ্যার তারতম্য হতে পারে। যেমন, *Aspergillus*-এ এই সংখ্যা 154 এবং সী আর্চিনের শুক্রাণুতে 241 হয়। একটি জীবের বিভিন্ন কোষেও প্রতি নিউক্লিওসোমে নিউক্লিওটাইডের সংখ্যার তারতম্য হতে পারে। নিউক্লিওসোম গঠনে চার রকম প্রধান হিস্টোনের (যেমন, H2A, H2B, H3 ও H4) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

(b) দ্বিতীয় ধাপে **সলেনয়েড** (solenoid) কয়েল গঠিত হয়। একটি সলেনয়েডে একবার পেঁচের জন্য ছয়টি নিউক্লিওসোমের প্রয়োজন হয়। এর ফলে 6.0 থেকে 12.5 গুণ সঙ্কোচন হতে পারে। সলেনয়েড পেঁচের ব্যাস 300Å হয়। এরকম পেঁচ সাধারণ দৃশ্যমান অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় না।

(c) সলেনয়েড কয়েল পরবর্তী ধাপে টিউব (tube) বা নালিকা পেঁচে পরিবর্তিত হয়। এর ফলে ক্রোমোসোমের ব্যাস বেড়ে 2000Å হয়। এই রকম পেঁচের মাধ্যমে ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য 9.42-40 গুণ হ্রাস পেতে পারে। টিউব কয়েলগুলি সাধারণত দৃশ্যমান অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যেতে পারে। এগুলি সম্ভবত আগেকার বিজ্ঞানীদের মাইনর (minor) বা গৌণ কয়েলের সমকক্ষ।

(d) পরবর্তী ও চূড়ান্ত (final) পর্যায়ের পেঁচ বা কয়েল গঠনের ফলে ক্রোমোসোমের ব্যাস 6000Å হতে পারে। এর ফলে ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য 5.0-6.28 গুণ হ্রাস পেতে পারে। এই চূড়ান্ত কয়েলগুলি সম্ভবত আগেকার বিজ্ঞানীদের বর্ণিত মেজর কয়েল বা মুখ্য পেঁচের সমকক্ষ। মানুষের প্রথম ক্রোমোসোমে 10^8 নিউক্লিওটাইড জোড়া থাকে। এই ক্রোমোসোমের মেটাফেজের দৈর্ঘ্য হল 10µm। সুতরাং, এখানে বিভিন্ন রকম পেঁচের (যেমন, DNA ডাবল হেলিক্স, নিউক্লিওসোম, সলেনয়েড পেঁচ, টিউব পেঁচ, চূড়ান্ত পেঁচ) ফলে ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য 5000-8000 গুণ হ্রাস পায়।

সুতরাং, ইন্টারফেজ থেকে মেটাফেজ পর্যন্ত ক্রোমোসোমের ক্রমশ দৈর্ঘ্য হ্রাসের কারণ হল, পরপর নানা রকম পেঁচের গঠন। এইসব পেঁচের গঠনের ফলে ক্রমশ ক্রোমোসোমের ব্যাস বাড়তে থাকে। নিউক্লিওসোমের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের পেঁচের গঠনে সম্ভবত অম্লীয় প্রোটিন এবং হিস্টোন অংশ নেয়। পেঁচের গঠনে দুই রকম

নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। নিউক্লিয়াস স্তরের নিয়ন্ত্রণের ফলে কোষের সব ক্রোমোসোমে মোটামুটি একই মাত্রার সঙ্কোচন হয়। ক্রোমোসোমের স্তরের নিয়ন্ত্রণের ফলে ক্রোমোসোমে বিভিন্ন সঙ্কুচিত স্থান (constriction), ক্রোমোমিয়ার, ব্যান্ড ইত্যাদি দেখা দেয়। সম্ভবত সেন্ট্রোমিয়ার এবং সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন অঞ্চলে চূড়ান্ত পর্যায়ের পেঁচ (final coil) গঠিত হয় না। এর ফলে ঐসব অঞ্চল সঙ্কুচিত দেখায়।

যুগ্মতা বা সাইন্যাপসিস (synapsis)

মায়োসিসে হোমোলোগাস (homologous) ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে যুগ্মতা দেখা যায়। সাইন্যাপসিস বা যুগ্মতা জাইগোটিনে আরম্ভ হয়। প্যাকিটিনে সবচেয়ে বেশি সাইন্যাপসিস দেখা যায় এবং ডিপ্লোটিনে সাইন্যাপসিস শেষ হয়ে যায়। তবে কখনও কখনও ডায়াকাইনেসিসেও সাইন্যাপসিস দেখা যায। সচবাচর দেখা না গেলেও দেহ কোষেও ক্রোমোসোমের যুগ্মতা হতে পারে, যেমন, ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যান্ডে। যেসব কোষে তিন বা তার চেয়ে বেশি হোমোলোগাস ক্রোমোসোম উপস্থিত (পলিপ্লয়েড) থাকে, সেখানে কোনও একটা স্থানে কেবল দু'টি হোমোলোগাস ক্রোমোসোম যুগ্ম অবস্থান কবতে পারে। তবে ট্রিপ্লয়েড ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের (salivary gland) ক্রোমোসোমে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এখানে তিনটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে সাইন্যাপসিস হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলির হোমোলোগাস বা অনুরূপ অংশের মধ্যে কেবল সাইন্যাপসিস হয়। ড্রসোফিলার স্যালিভাবী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমেব প্রতি ব্যান্ড অনুরূপ ব্যান্ডের সাথে যুগ্ম অবস্থান করে। ভুট্টার পরাগরেণু মাতৃকোষেও হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলির প্রত্যেক ক্রোমোমিয়ার অনুরূপ ক্রোমোমিয়ারের সাথে যুগ্মভাবে থাকে। অনুরূপ নয় এমন দু'টি অংশেব মধ্যে যুগ্মতা বিরল। ট্রাইসোমিক (trisomic) ভুট্টার তিনটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে দু'টি সাধারণত যুগ্ম অবস্থান করে এবং তৃতীয় হোমোলোগাস ক্রোমোসোমটি আলাদা থাকে। এই ক্রোমোসোমটি ভাঁজ হওয়ার ফলে একই ক্রোমোসোমের দু'টি অংশের মধ্যে যুগ্মতা হয়। এই রকমের যুগ্মতা 'B' ক্রোমোসোমেও দেখা যায়। এই ধরনের অস্বাভাবিক ও অনির্দিষ্ট যুগ্মতার ওপর হেটোরোক্রোমাটিনের প্রভাব আছে।

সাইন্যাপসিসের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে। Manton-এর (1939) মতে, ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য বাড়ার ফলে যুগ্মতা দেখা দেয়। মাইটোসিস বিভাজনের প্রফেজের তুলনায় মায়োসিস বিভাজনের জাইগোটিনে ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য বেশি হয়। স্যালিভারী গ্ল্যান্ডে ক্রোমোসোমগুলির দৈর্ঘ্য বাড়ার পর যুগ্মতা হয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি যুগ্মতা ব্যাখ্যা করতে পারে না। ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য ছাড়া অন্যান্য কারণও, যেমন, যুগ্মতার সময়, হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দু'টির মধ্যে প্রাথমিক দূরত্ব ইত্যাদি সাইন্যাপসিসকে প্রভাবিত করে।

Darlington, Frankel, La Cour (1940) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা সাইন্যাপসিস বা যুগ্মতায় সময়ের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। কিন্তু Swanson-এর মতে, সাইন্যাপসিসে সময়ের প্রভাব প্রশ্নাতীত নয়।

জাইগোটিনে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলির কোনও অংশ আকস্মিকভাবে পরস্পরকে স্পর্শ করলে ঐ স্থান থেকে দুই দিকেই যুগ্মতা আরম্ভ হয়। 'জিপ' (zip) যেমন এক প্রান্ত থেকে টেনে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বন্ধ করা হয়, তেমনি যুগ্মতা এক জায়গায় শুরু হলে প্রান্ত পর্যন্ত তা চলতে থাকে।

Darlington-এর (1937) মতে, অ্যানাফেজ থেকে পরবর্তী প্রফেজ ছাড়া আর সব অবস্থাতেই ক্রোমোসোমগুলি যুগ্ম অবস্থায় থাকে। মাইটোসিসে প্রফেজের ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ অবস্থায় থাকে বলে, এখানে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতা হয় না। মায়োসিসে ক্রোমোসোমগুলি একক অবস্থায় থাকে। সুতরাং, ক্রোমোসোমগুলিতে অপরিপূর্ণতা বা অসংপৃক্ততা (unsaturation) দেখা যায়। এইজন্য হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতা হয়। প্যাকিটিনের শেষ দিকে ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ হয়। তখন ক্রোমোসোমগুলি আর অপরিপূর্ণ থাকে না। এর ফলে ডিপ্লোটিনে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি আলাদা হয়ে যায়। এটিই হল Darlington-এর Precocity theory। তবে এই মতবাদকে কোনও কোনও বিজ্ঞানী সমর্থন করেননি কারণ, তাঁদের মতে লেপ্টোটিনে সাইন্যাপসিসের (synapsis) আগেই ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ অবস্থায় থাকে।

Sax ও Sax (1935) ও Beasley-র (1938) মতে, সব সময়েই হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে একটা আকর্ষণ থাকে। মাইটোসিসে প্রফেজের প্রথম থেকেই ক্রোমোসোমগুলি কুণ্ডলিত অবস্থায় থাকে বলে এই আকর্ষণ দেখা যায় না। মায়োটিক বিভাজনের লেপ্টোটিনে ক্রোমোসোমগুলি কুণ্ডলিত থাকে না বলে আকর্ষণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হয় এবং যুগ্মতা দেখা যায়। Beasley-র (1938) মতে, মায়োসিসের সময় নিউক্লিয়াসের স্ফীতি, নিউক্লিও রসের ঘনত্বের হ্রাস এবং প্রফেজের দীর্ঘ স্থায়ীত্ব যুগ্মতাকে প্রভাবিত করে।

Ansley 1958 খ্রিস্টাব্দে বলেন যে, মায়োসিসে হিস্টোন ও DNA-র অনুপাত 1:1 হয়, কিন্তু মাইটোসিস বিভাজনের সময় এই অনুপাত 3 : 2 থাকে। হিস্টোন ও DNA-র অনুপাতের এই পার্থক্যই মাইটোসিস না মায়োসিস বিভাজন হবে তা নির্ধারণ করে। 1960 খ্রিস্টাব্দে S. K. Sinha বলেন যে, RNA ও DNA-র অনুপাত বেশি হলে মাইটোসিস ও কম হলে মায়োসিস বিভাজন হয়।

Wilson ও Morrison-এর (1966) মতে, সাইন্যাপসিস আংশিকভাবে ক্রোমোসোমের বিন্যাসের ওপর এবং অংশত এর দ্বিগুণতার (duplication) মাত্রার ওপর নির্ভরশীল।

সাইন্যাপসিসের কারণ সম্বন্ধে কিছু বিজ্ঞানী বলেন যে, জাইগোটিনে ক্রোমোসোমে

DNA ও হিস্টোনের পরিমাণ কম থাকায় সাইন্যাপসিস হয়। *Lilium*-এ Hotta ও অন্যান্যরা 1966 খ্রিস্টাব্দে দেখেন যে, জাইগোটিন বা প্যাকিটিনে মোট DNA-র 0.3% DNA তৈরি হয়। 1968 খ্রিস্টাব্দে Yuri Bogdanoy *Crillus domesticus*-এ দেখেন যে, জাইগোটিনে 25% হিস্টোন উৎপন্ন হয়। হিস্টোন উৎপাদন প্যাকিটিনে সম্পূর্ণ হয়।

Moses-এর বর্ণিত সাইন্যাপটিনিম্যাল কমপ্লেক্স (SC) যদিও যুগ্মতা শুরু হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক নয়, তবে এর উপস্থিতিতে কায়েসমা ও ক্রসিং ওভার হয়। সেজন্য বলা যায় যে, এই কমপ্লেক্স যুগ্মতা যথাযথভাবে হতে সাহায্য করে এবং যুগ্ম অবস্থাকে নির্দিষ্ট রাখে। 1970 খ্রিস্টাব্দে Robert King বলেন যে, সাইন্যাপটিনিম্যাল কমপ্লেক্স হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের অভগিনী ক্রোমাটিডকে এমনভাবে বিন্যাসিত করে, যাতে DNA অণুর মধ্যে অংশ বিনিময় হতে পারে। Comings ও Orada-র ('71) মতে, সাইন্যাপসিস দু'টি স্তরে (ক্রোমোসোমীয় ও আণবিক স্তরে) হয়। সাইন্যাপটিনিম্যাল কমপ্লেক্স ক্রোমোসোমীয় স্তরে যুগ্মতাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু আণবিক স্তরে DNA সূত্রের যুগ্মতায় এর কোনও প্রভাব নেই।

প্যাকিটিনে সাইন্যাপটিনিম্যাল কমপ্লেক্সের কাছে 100mm আয়তনের কিছু নডিউল ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গেছে। এগুলিকে রিকমবিনেশন নডিউল বলে। এই নডিউলগুলি সম্ভবত ক্রসিং ওভারে সহায়তা করে (Zickor '77)।

কায়েসমার প্রান্তিকরণ (terminalization)

মায়োসিসের ডিপ্লোটিনে কায়েসমা প্রথম দেখা যায়। কোষ বিভাজনের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রোমোসোমে কায়েসমার অবস্থানের পরিবর্তন হয়। কায়েসমার এই সঞ্চালনকে (movement) Darlington কায়েসমার terminalization (প্রান্তিকরণ) বলেছেন।

প্রান্তিকরণ বা টারমিন্যালাইজেশনের পরিমাণ বেশি হ'লে সব কায়েসমাগুলিই ক্রোমোসোমের প্রান্তে যায় ও এদের সংখ্যা হ্রাস পায় (Moffett 1938)।

প্রান্তিকরণ সব সময় সেন্ট্রোমিয়ার থেকে ক্রোমোসোমের প্রান্তের দিকে হয়ে থাকে। বড় বাইভ্যালেন্টের তুলনায় ছোট বাইভ্যালেন্টের প্রান্তিকরণের পরিমাণ (প্রতি একক ক্রোমোসোম দৈর্ঘ্য) বেশি হয়। প্রান্তিকরণের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে।

Darlington ও Dark-এর (1932) স্থির বৈদ্যুতিক (electrostatic) মতবাদ অনুসারে কায়েসমার প্রান্তিকরণ দু'টি শক্তি দিয়ে প্রভাবিত হয়। (a) সেন্ট্রোমিয়ারে একটি শক্তিশালী বিকর্ষণ শক্তি দেখা যায়। (b) ক্রোমোসোমের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে সমভাবে বিস্তৃত আরেকটি বিকর্ষণ শক্তি থাকে। সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলের বিকর্ষণ শক্তি বেশি হওয়ার জন্য কায়েসমাগুলি প্রান্তের দিকে অগ্রসর হতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত

প্রান্তিকরণ সম্পূর্ণ হচ্ছে কিম্বা ফাঁসগুলির (loop) মধ্যে একটা ভারসাম্য আসছে। এই দু'টি শক্তি, কায়েসমার সংখ্যা ও ক্রোমোসোমের সঙ্কোচনের মাত্রার ওপর প্রফেজ ও মেটাফেজে বাইভ্যালেন্টের আকৃতি নির্ভর করে। বিভিন্ন গবেষণা ক্রোমোসোমে বিকর্ষণ শক্তির উপস্থিতির সমর্থন করে। মেটাফেজে সেন্ট্রোমিয়ার ও এর কাছের প্রথম কায়েসমার মধ্যে বাইভ্যালেন্টের প্রসারতা সেন্ট্রোমিয়ারগুলির মধ্যে জোরালো বিকর্ষণ শক্তির উপস্থিতির ইঙ্গিত করে। Darlington-এর মতে, এই বিকর্ষণের কারণ হল, প্রত্যেক সেন্ট্রোমিয়ারে একই রকম বিদ্যুৎ প্রবাহ থাকে। কিন্তু কোনও কোনও বিজ্ঞানী এই মতকে সমর্থন করেননি। অধিকাংশ জীবে মেটাফেজ ও অ্যানাফেজের প্রথম দিকে যখন বাইভ্যালেন্টগুলি স্পিন্ডিলের সংস্পর্শে থাকে, তখনই কেবল সেন্ট্রোমিয়ার ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রসারতা দেখা যায়। সেন্ট্রোমিয়ার ও মেরু অঞ্চলের মধ্যে সংযোগের জন্য বাইভ্যালেন্টে এই প্রসারতা দেখা দিতে পারে। পুরুষ mantid-এর মায়োসিস বিকর্ষণ শক্তির উপস্থিতিকে সমর্থন করে না। Hughes-Schrader (1943) দেখেন যে, ম্যান্টিডে (mantid) হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে কায়েসমা গঠিত না হলেও, তারা সমান্তরালভাবে পাশাপাশি যুগ্ম অবস্থান করে এবং ক্রোমোসোমের বাহুগুলির মধ্যে কোনও বিকর্ষণ দেখা যায় না। এইসব প্রতিবাদ সত্ত্বেও অনেক বিজ্ঞানী স্থির বৈদ্যুতিক মতবাদ (electrostatic theory) সমর্থন করেছেন। বিভিন্ন তথ্য থেকে বলা যায় যে, মায়োসিসে ক্রোমোসোমের আচরণকে কেবল সাধারণ স্থির বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

দ্বিতীয় মতবাদ হল coiling বা কুণ্ডলীকরণের মতবাদ। আমরা আগেই দেখেছি যে, প্রফেজের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রোমোসোমে কুণ্ডলের সংখ্যা কমে, কিন্তু ব্যাস বাড়ে এবং এর ফলে ক্রোমোসোমগুলি ক্রমশ ছোট ও দৃঢ় হয়। এই অবস্থায় হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি পরস্পর কায়েসমা দিয়ে যুক্ত থাকে। ক্রোমোসোমের দৃঢ়তা বাড়ার সাথে সাথে যে শক্তি সৃষ্টি হয়, তা সবচেয়ে বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে চায়। এর ফলে দু'টি পাশাপাশি কায়েসমার মাঝের অঞ্চল দুই দিকে বেঁকে যায়। যখন কুণ্ডলীকরণের ফলে সৃষ্ট শক্তি কায়েসমা অঞ্চলে যে শক্তি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলিকে একসাথে রেখেছিল তার চেয়ে বেশি হয়, তখন কায়েসমাগুলি ক্রোমোসোমের প্রান্তের দিকে অগ্রসর হয়। যেহেতু কুণ্ডলীকরণ একবার শুরু হলে চলতেই থাকে, সেজন্য প্রান্তিকরণ বা টারমিন্যালাইজেশন একবার শুরু হলে তা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকে। এই মতবাদের সত্যতা যাচাই করবার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। *Tradescantia paludosa*-এ দেখা গিয়েছে যে, ক্রোমোসোমগুলি যত ছোট হতে থাকে, তত বেশি সংখ্যক কায়েসমার টারমিন্যালাইজেশন হয়। Lesley ও Forst (1927) দেখেন যে, *Matthiola incana*-এ মায়োসিসে ক্রোমোসোমগুলি স্বাভাবিকভাবে সঙ্কুচিত হয় না এবং এখানে কায়েসমাগুলিও মধ্যবর্তী স্থানে থাকে। Upcott-ও (1937) *Lathyrus odoratus*-

এর ওপর গবেষণা করে ক্রোমোসোমের coiling-এর সাথে প্রান্তিকরণের সম্পর্ক সমর্থন করেছেন। তবে অনেক জীবে ক্রোমোসোমেব সুনির্দিষ্ট সঙ্কোচন সত্ত্বেও কায়েসমার সামান্য প্রান্তিকরণ হয় কিম্বা একেবারেই হয় না। সম্ভবত কায়েসমার প্রান্তিকরণ বা টারমিন্যালাইজেশন আরম্ভ করার জন্য ক্রোমোসোমে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার দৃঢ়তার প্রয়োজন।

Ostergen (1943) বলেন যে, নির্দিষ্ট আকৃতিযুক্ত কোনও বস্তু তার আকৃতির পরিবর্তনকে বাঁধা দেয়। কায়েসমা ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন ঘটায়, সেজন্য কায়েসমা অঞ্চলে বাঁধা বা বিকর্ষণ শক্তির সৃষ্টি হয়। এই শক্তি কায়েসমাকে প্রান্তের দিকে ঠেলে দেয়।

Swanson ('57) এর মতে, ক্রোমোসোমের বিভিন্ন পেঁচ বা কয়েলের সংখ্যা কমার এবং ব্যাস বাড়ার ফলে যে চাপের সৃষ্টি হয়, তার ফলেই কায়েসমার প্রান্তিকরণ হয়।

ক্রোমোসোমের আচরণের পার্থক্য

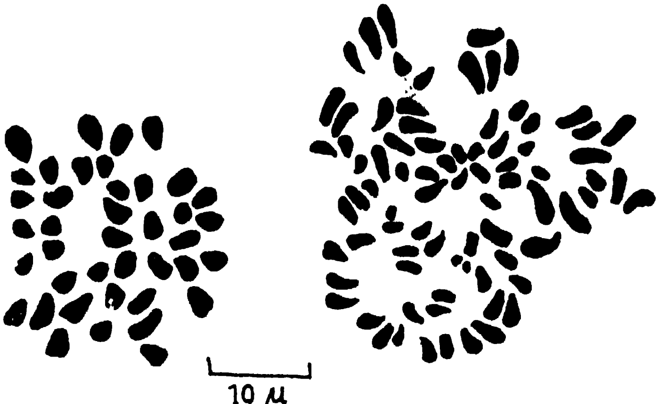
এন্ডোমাইটোসিস (endomitosis)

অনেক জীবে যেসব কোষ আর বিভজিত হতে পারে না, সেই রকম পরিণত কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা কখনও কখনও স্বাভাবিক কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার 2, 4, 8, 16 গুণ হয়ে থাকে। এই অবস্থাকে এন্ডোপলিপ্লয়েডি (endopolyploidy) বলা হয় (চিত্র 58)। Nemck 1905 খ্রিস্টাব্দে কতগুলি উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মূলের কোষে দেখেছিলেন যে, বিভাজনশীল কোষগুলি ডিপ্লয়েড কিন্তু পরিণত কোষ পলিপ্লয়েড।

Jacobj-এর (1925) মতে, এর কারণ হল নিউক্লিয়াসের বিভাজন ছাড়াই নিউক্লিও বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিভাজন। Hertwig (1953) ড্রসোফিলার গর্ভাশয়ের ধাত্রী কোষের (nurse cell) বৃদ্ধির সময় ক্রোমোসোমের এই রকমের সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন। জার্মান বিজ্ঞানী Geitler (1937, 1939, 1941) পুরুষ *Gerris lateralis*-এর স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের (salivary gland) কোষে 512 ও 1024 গুণ ক্রোমোসোমযুক্ত অতিকায় নিউক্লিয়াস দেখতে পেয়েছিলেন। মোলাস্কার অন্তর্গত *Aphysia*-এও খুব বেশি মাত্রার এন্ডোপলিপ্লয়েডি দেখা গিয়েছে। এরকম নিউক্লিয়াস খুব বড় এবং এর আয়তন $70 \times 10^6 \mu m^3$। এখানে DNA এর পরিমাণ হ্যাপ্লয়েডের 75000 গুণ হয়।

অনেক উদ্ভিদে এন্ডোমাইটোসিস দেখা গিয়েছে। Berger (1911) *Spinacia*-র পরিণত কোষে নিয়মিতভাবে এন্ডোমাইটোসিস দেখেছিলেন। *Allium*-এ টেট্রাপ্লয়েড মাত্রা পর্যন্ত এন্ডোপলিপ্লয়েডি দেখা যায়। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের পরাগধানীর ট্যাপেটামে (tapetum) এবং ভ্রূণস্থলীর অ্যান্টিপোডাল (antipodal) বা প্রতিপাদ কোষে

এন্ডোপলিপ্লয়েডি দেখা গেছে। *Papaver rhoeas* এবং *Aconitum ranunculifolium*-এ ভ্রূণস্থলীর অ্যান্টিপোডাল কোষে এন্ডোপলিপ্লয়েডি লক্ষ্য করা হয়েছে। DNA-র পরিমাণ বাড়ার ফলে 128-ploid নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়ে থাকে।



চিত্র—58

ইঁদুরের স্বাভাবিক ও এন্ডোমাইটোটিক কোষের মেটাফেজ অবস্থা

Geitler এন্ডোপলিপ্লয়েড কোষের উৎপত্তির বর্ণনা দিয়েছিলেন। এখানে কোষ বিভাজন শুরু হয়, কিন্তু সমাপ্ত হয় না। ক্রোমোসোমগুলি প্রফেজে কুণ্ডলিত (coiled) হওয়ার ফলে সঙ্কুচিত হয়। প্রফেজের শেষ দিকে কোষ বিভাজন বন্ধ হয়ে যায়। প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দু'টি পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায়, নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ভেঙে যায় না, কোনও স্পিন্ডিল গঠিত হয় না এবং মেটাফেজ, অ্যানাফেজ হয় না। এই আংশিক মাইটোসিসের ফলে ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। Geitler এই প্রক্রিয়াকে এন্ডোমাইটোসিস নাম দিয়েছেন। কোনও কোনও কোষে খুব বেশি সংখ্যক ক্রোমোসোমের উপস্থিতি ঐসব কোষে বারবার এন্ডোমাইটোসিসের জন্য হয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ এন্ডোমাইটোসিসে ক্রোমোসোমের ঘনীভূত ও অঘনীভূত অবস্থা লক্ষ্য করেছেন। তবে কোনও অবস্থাতেই ক্রোমোসোমের ঘনীভূত অবস্থা (condensation) স্বাভাবিক মেটাফেজের মাত্রায় পৌছায় না। এন্ডোপলিপ্লয়েড কোষ এন্ডোমাইটোসিসের ফলেই সৃষ্টি হয়।

সাধারণত এন্ডোপলিপ্লয়েড কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা সহজেই গোনা যায়। কিন্তু কোনও কোনও পতঙ্গে এন্ডোপলিপ্লয়েডির মাত্রা খুব বেশি হওয়ায় ঐসব কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা প্রত্যক্ষভাবে নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। সেক্স ক্রোমোসোমের

সংখ্যা গুনে কখনও কখনও পলিপ্লয়েডির মাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া কোনও কোষের DNA-র পরিমাণ থেকেও পলিপ্লয়েডির মাত্রা বোঝা যায়।

এন্ডোপলিপ্লয়েড টিস্যুর (tissue) বিভিন্ন কোষে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পলিপ্লয়েডি দেখা যায়। কোনও কোনও কোষ ডিপ্লয়েড (2n), কোনোটা টেট্রাপ্লয়েড (4n), আবার কোনোটা বা অক্টোপ্লয়েড (8n) স্তরে থাকে। খুব কম ক্ষেত্রেই সব কোষে একই মাত্রার পলিপ্লয়েডি দেখা যায়। Huskin ও তাঁর সহকর্মীরা (1948) *Rhoeo discolor*-এ এই রকমের মিক্সোপ্লয়েডির (mixoploidy) বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া তাঁরা দেখেন যে, একই কোষের বিভিন্ন ক্রোমোসোমে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পলিটেনি (polyteny) হয়েছে। Huskin-এর মতে, কোষগুলি খুব ধীরে ধীরে ডিপ্লয়েড থেকে টেট্রাপ্লয়েড এবং টেট্রাপ্লয়েড থেকে অক্টোপ্লয়েড হয়। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার আগে যদি টিস্যুকে পরীক্ষা করা হয়, তবে বিভিন্ন মাত্রার পলিপ্লয়েডি দেখা যায়। Mickey (1946, 1947) ফড়িঙে (grasshopper) মিক্সোপ্লয়েডি দেখেছিলেন।

White-এর (1934) মতে, ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসোমের পলিটেনি প্রকৃতি হল এন্ডোপলিপ্লয়েডির একটা বিশেষ অবস্থা। ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ হওয়ার পরেও ক্রোমাটিডগুলি আলাদা না হলে পলিটেনি (polyteny) বা বহুসূত্রযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। পলিটেনি অবস্থায় ক্রোমাটিডগুলি পরস্পর যুক্ত থাকে বলে ক্রোমাসোমের সংখ্যা বাড়ে না, কিন্তু ব্যাস বাড়ে। ড্রসোফিলার ধাত্রী কোষে (nurse cell) এন্ডোমাইটোসিস ও পলিটেনির মাঝামাঝি অবস্থা দেখা যায়। White (1945) বলেন যে, একই কোষে পলিটেনি ও পলিপ্লয়েডি দেখা যেতে পারে। Bauer-এর (1938) মতে, পলিটেনি নিউক্লিয়াসের ক্রোমোসোমগুলির লম্বালম্বি বিভাজনের ফলে পলিপ্লয়েড অবস্থার সৃষ্টি হয়। *Culex pipens* (মশা) নিয়ে গবেষেণা করে Berger (1938) ও Grell (1946) এই মতের সমর্থন করেছেন। সুতরাং, এন্ডোমাইটোসিস ও পলিটেনির পার্থক্য হল মাইটোসিসের মাত্রার ওপর অর্থাৎ কোষ বিভাজন শুরু হলে কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে তার ওপর। উভয় ক্ষেত্রেই S অবস্থায় DNA উৎপন্ন হয়। এন্ডোমাইটোসিসে মাইটোসিস শুরু হয় কিন্তু ক্রোমাটিডগুলি পৃথক হয়ে বিপরীত মেরুতে যেতে পারে না, কারণ অ্যানাফেজ হয় না। সুতরাং, কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা বেড়ে যায়। পলিটেনির ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমগুলি সঙ্কুচিত হয় না, মাইটোসিসের কোনও পর্যায় লক্ষ্য করা যায় না এবং ক্রোমোসোমগুলি বহুসূত্রযুক্ত দেখায়।

গ্রন্থির কোষ সাধারণত পলিপ্লয়েড (যেমন, *Gerris*-এ) কিম্বা পলিটেনি (যেমন, *Drosophila*-এ) অবস্থায় থাকে। Huskin (1947) দেখেন যে, কর্মব্যস্ত অবিভাজনশীল কোষে পলিসোমাটি (ploysomaty) বা পলিটেনি হয়। কোষ বিভাজন ছাড়া কোনও কোষ যত বেশি সময় কর্মব্যস্ত থাকবে, ততই পলিটেনি বা এন্ডোপলিপ্লয়েডির মাত্রা বাড়বে।

অধিকাংশ এন্ডোপলিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে আর মাইটোসিস বিভাজন হয় না। তবে মশায় এন্ডোপলিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে মাইটোসিস বিভাজন হতে দেখা গিয়েছে।

দেহ কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা হ্রাস বা সোমাটিক রিডাকশন (somatic reduction)

ক্রোমোসোমের বিভাজনের চেয়ে তাড়াতাড়ি যদি কোষ বিভাজন হয়, তাহলে দেহ কোষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা কমে যায়। এই রকমের বিভাজনকে সোমাটিক রিডাকশন (somatic reduction) বলে। উদ্ভিদে অনিয়মিতভাবে এই রকম বিভাজন হয়। Hughes-Schrader (1925,1927) *Icerya purchasi* নামের প্রাণীতে প্রথম নিয়মিত সোমাটিক রিডাকশনের বর্ণনা দেন। এই প্রাণী পুরুষ, স্ত্রী এবং উভলিঙ্গ (bisexual) হয়। উভলিঙ্গ *Icerya*-তে এই রকমের বিভাজন দেখা গিয়েছে। Berger (1938, 1941) ও Grell (1946) *Culex pipens*-এ (2n = 6) সোমাটিক রিডাকশন দেখেছিলেন। এখানে এই বিভাজনের সময় প্রফেজে তিন জোড়া ক্রোমোসোম দেখা যায়। প্রত্যেকটি ক্রোমোসোমে দুই থেকে বত্রিশটি সূত্র থাকে। প্রফেজের শেষ দিকে এই সূত্রগুলি আলাদা হয়ে যায়। এর পর হোমোলোগাস সূত্রগুলি যুগ্ম অবস্থান করে অর্থাৎ, দেহ কোষে সাইন্যাপসিস হয়। বড় কোষে মেটাফেজে 24 বা 48টি এই রকম জোড়া দেখা যায়। অ্যানাফেজে ক্রোমোসামগুলি আর কোনও লম্বালম্বি বিভাজন ছাড়াই পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায়। এইভাবে যেসব কোষে 48টি (16n) বা 96টি (32n) ক্রোমোসোম ছিল, সেখানে সোমাটিক রিডাকশনের ফলে 12টি (4n) বা 24টি (8n) ক্রোমোসোমযুক্ত কোষের সৃষ্টি হয়। সুতরাং, এন্ডোপলিপ্লয়েডির বিপরীত প্রক্রিয়া হল সোমাটিক রিডাকশন।

Huskin (1948), Huskin ও Steinitz (1948) *Allium*-এর মূলে ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (IAA) প্রয়োগ করে এন্ডোপলিপ্লয়েড কোষ পেয়েছিলেন। তাঁরা 1-2% রাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড (RNA) বা এর সোডিয়ামযুক্ত লবণ 6-12 ঘণ্টা প্রয়োগ করে সোমাটিক রিডাকশন পেয়েছিলেন।

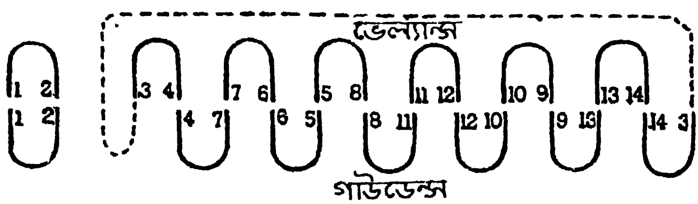
ননডিসজাংশন (nondisjunction) অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অক্ষমতা

অনেক সময় মায়োসিসের অ্যানাফেজ অবস্থায় দু'টি হোমোলোগাস ক্রোমোসোম স্বাভাবিকভাবে আলাদা হয়ে দু'টি মেরুতে না গিয়ে একসাথে যে কোনও একটা মেরুতে যায়। এই ধরনের অস্বাভাবিকতাকে ননডিসজাংশন (nondisjunction) বলে। মাঝে মাঝে দেহ কোষেও ননডিসজাংশন (somatic nondisjunction) দেখা যায়।

জাইগোটিনে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দু'টির মধ্যে যুগ্মতা না হলে বা

কায়েসমা সম্পূর্ণভাবে খুলে গেলে বাইভ্যালেন্ট গঠিত না হয়ে দু'টি ইউনিভ্যালেন্ট তৈরি হয়। ইউনিভ্যালেন্টগুলি স্বাধীনভাবে যে কোনও মেরুতে যেতে পারে। যদি দু'টি ইউনিভ্যালেন্টই একই মেরুতে যায় ও অন্য মেরুতে ঐ ক্রোমোসোমের কোনও সদস্যই না থাকে, তবে n+1 গ্যামেট ও n-1 গ্যামেট তৈরি হয়। বেশিরভাগ উদ্ভিদ ও প্রাণীতে এই কারণেই নন-ডিসজাংশন হয়।

হেটারোজাইগাস অবস্থায় রেসিপ্রোক্যাল ট্রান্সলোকেশন (reciprocal translocation) থাকলে অনেক সময় ননডিসজাংশন হয়। *Oenothera*-র কতকগুলি প্রজাতি এক বা একাধিক ট্র্যান্সলোকেশনের জন্য স্থায়ীভাবে হেটারোজাইগাস (heterozygous) ও সেজন্য এদের মায়োসিসে নিয়মিতভাবে ring বা বলয় তৈরি হয়। *O. lamerckiana*-র মায়োসিসে 12টি ক্রোমোসোমের একটা বলয় ও একটা বাইভ্যালেন্ট দেখা যায় (চিত্র 59)। এই বাইভ্যালেন্টের ক্রোমোসোম দু'টি ছাড়া অন্য সব ক্রোমোসোমে ট্র্যান্সলোকেশন হয়েছে। *O. lamerckiana*-র প্রত্যেক ক্রোমোসোমকে দু'টি সংখ্যা (যেমন 1-2, 3-4, 5-6 ইত্যাদি) দিয়ে নির্দেশ করা হয়।



চিত্র—59

প্রথম মায়োটিক বিভাজনে *O lamerckiana*-র ক্রোমোসোমের বিন্যাস

বলয়ের ক্রোমোসোমগুলির একটা সেট (set) হ'ল 3-4, 5-8, 7-6, 9-10, 11-12, 13-14, ও অন্য সেটটা হ'ল 3-14, 5-6, 7-4, 12-10, 11-8 এবং 13-9। 1-2 ক্রোমোসোম দু'টি বাইভ্যালেন্ট গঠন করে। অ্যানাফেজে বলয়ের একটা ক্রোমোসোম এক মেরুতে ও পাশেরটা অন্য মেরুতে যায়। একটা সেটের বিভিন্ন ক্রোমোসোমগুলিকে একসাথে কমপ্লেক্স (complex) বলে। প্রথম সেটের ক্রোমোসোমগুলি ও একটা 1-2 ক্রোমোসোমেকে ভেল্যান্স কমপ্লেক্স (velans complex) বলে। দ্বিতীয় সেট ও একটা 1-2 ক্রোমোসোমকে গাউডেন্স কমপ্লেক্স বলা হয়। ক্রোমোসোমগুলি এমনভাবে থাকে যার ফলে গাউডেন্স কমপ্লেক্স এক মেরুতে ও ভেল্যান্স কমপ্লেক্স অন্য মেরুতে যায়। দুটো কমপ্লেক্সেই লীথ্যাল (lethal) জিন কিংবা ছোট ঘাটতি (deficiency) থাকে। গাউডেন্সের লীথ্যাল জিন ভেল্যান্সের লীথ্যাল জিন থেকে আলাদা। সুতরাং, গাউডেন্স-গাউডেন্স কিম্বা ভেল্যান্স-ভেল্যান্স অবস্থা সব

সময়েই প্রাণনাশক কারণ, এখানে লীথ্যাল জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকে। কিন্তু গাউডেন্স-ভেল্যান্স জোটে লীথ্যাল জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় না থাকায় উদ্ভিদটি বেঁচে থাকে। *O. lamerckiana* হ'ল এই রকম একটা হেটারোজাইগোট। *O. lamerckiana*-এ কোনও কোনও কোষ বিভাজনের সময় বিশৃঙ্খলার জন্য পর্যায়ক্রমে একটি ক্রোমোসোম এক মেরুতে ও পাশেরটা অন্য মেরুতে না গিয়ে বলয়ের (ring) পাশাপাশি তিনটি ক্রোমোসোম একটা মেরুতে যায় অর্থাৎ ননডিসজাংশন হয়। এর ফলে একটি গ্যামেটে 8টি ক্রোমোসোম ও অন্যটায় 6টি ক্রোমোসোম থাকে। প্রথম গ্যামেট কার্যকরী হয় কিন্তু দ্বিতীয় গ্যামেট বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রথম গ্যামেটে 1টি গাউডেন্স ও 7টি ভেল্যান্স থাকে ও এটা স্বাভাবিক গাউডেন্স কমপ্লেক্সযুক্ত গ্যামেটের সাথে মিলিত হলে ট্রাইসোমিক *O. lamerckiana*-র সৃষ্টি হয়। কিন্তু 8টি ক্রোমোসোমযুক্ত গ্যামেটটি ভেল্যান্স কমপ্লেক্সযুক্ত গ্যামেটের সাথে মিলিত হলে ঐ উদ্ভিদটি বাঁচতে পারে না। কিন্তু যদি ঐ একটা গাউডেন্স ক্রোমোসোমে ভেল্যান্সের ক্ষতিকর জিনের প্রকাশরোধকারী ডমিন্যান্ট জিন থাকে তবে উদ্ভিদটি বেঁচে থাকতে পারে। এই রকম উদ্ভিদে 5টা বাইভ্যালেন্ট ও 5টা ক্রোমোসোম যুক্ত অবস্থায় থাকে। এই উদ্ভিদে ননডিসজাংশনের ফলে সাতটা গাউডেন্স ও একটা ভেল্যান্স ক্রোমোসোমযুক্ত গ্যামেট তৈরি হয়ে থাকে।

Roman 1947 খ্রিস্টাব্দে দেখেন যে, মাইক্রোস্পোরের দ্বিতীয় বিভাজনের সময় ভুট্টার B-ক্রোমোসোমের ননডিসজাংশন হয়। এর ফলে একটা পুং গ্যামেটে 2টি B-ক্রোমোসোম থাকে ও অন্যটায় কোনও B-ক্রোমোসোম থাকে না।

Roman ও Randolph-এর গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে, ভুট্টার এই ননডিসজাংশন B-ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের জন্য হয়। Roman বলেন যে, B-ক্রোমোসোমের যথাযথভাবে পৃথক হওয়ার অক্ষমতা সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। ভুট্টার B-ক্রোমোসোমগুলিতে সেন্ট্রোমিয়ার প্রান্তে থাকে। কিন্তু A-ক্রোমোসোমগুলিতে (অটোসোম) সেন্ট্রোমিয়ার মাঝে থাকে।

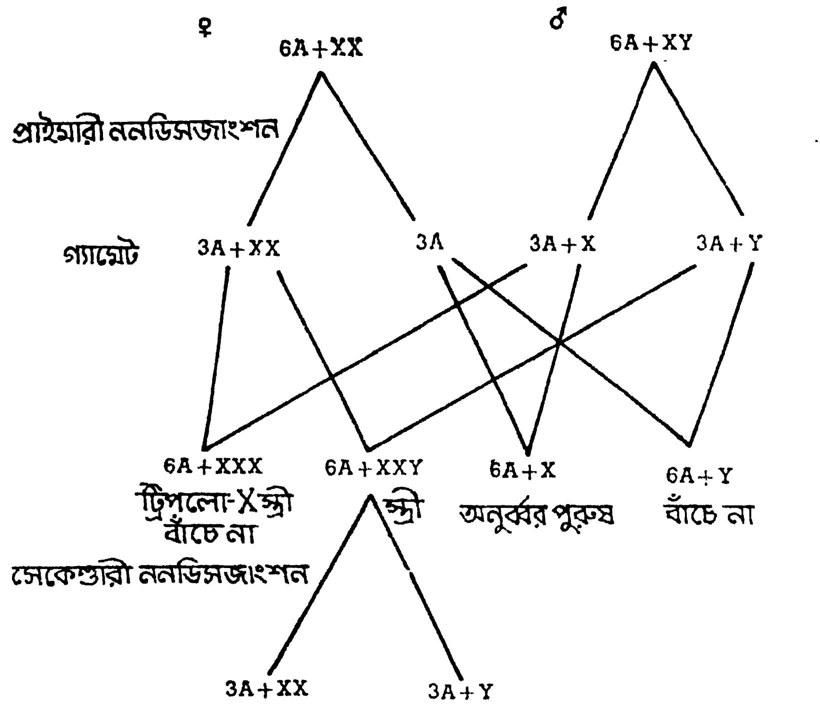
Müntzing (1946) রাইয়ে নির্বাচিত ননডিসজাংশন (nondisjunction) দেখেছিলেন। রাইয়ে তিন রকমের ফ্র্যাগমেন্ট দেখা যায়— (a) একটা বড় ও একটা ছোট বাহুযুক্ত ফ্র্যাগমেন্ট (fragment) (b) বড় বাহু থেকে তৈরি বড় আইসো-ক্রোমোসোম (iso-chromosome) (c) ছোট বাহু থেকে তৈরি ছোট আইসো-ক্রোমোসোম। মায়োসিস বিভাজনের পরের অ্যানাফেজে প্রথম ফ্র্যাগমেন্টটা কোনও মেরুতে না গিয়ে মাঝামাঝি থাকে। সেন্ট্রোমিয়ার দু'টি পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু ক্রোমাটিড দু'টি পৃথক হতে পারে না। এর কারণ, বড় বাহুতে হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের উপস্থিতি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্পিন্ডিলের প্রসারণের সাথে সাথে এই ক্রোমোসোমটি জনন (generative) কোষে যায়। বড়

আইসোক্রোমোসোমের আচরণও একই রকম। এই আইসোক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ারের দুই পাশে দু'টি হেটোরোক্রোমাটিন অঞ্চল থাকে। ছোট আইসোক্রোমোসোমে কিন্তু ননডিসজাংশন দেখা যায় না। রাই এবং ভুট্টায় কেবল মায়োসিস বিভাজনের পরের বিভাজন ছাড়া আর সব কোষ বিভাজন স্বাভাবিক হয়। ভুট্টার ননডিসজাংশন কেবল স্পার্ম বা শুক্রাণু গঠনের সময় হয়। কিন্তু রাইয়ে ডিম্বকেও (ovule) এই রকম অস্বাভাবিকতা দেখা যায়।

দেহ কোষে ননডিসজাংশনের জন্য কাইমিরা (chimera) দেখা দিতে পারে। কোনও উদ্ভিদে জিন C-র উপস্থিতিতে লাল রঙের ফুল ও এর অনুপস্থিতিতে সাদা ফুল হয়। একটা হেটেরোজাইগাস লাল ফুলযুক্ত উদ্ভিদে CCcc জিন থাকে। এই উদ্ভিদের দলমণ্ডলের (corolla) পরিণতির সময় যদি ত্বকের কোষে ননডিসজাংশন হয়, তবে একটা কোষে CCc জিন ও অন্য কোষে কোষে কেবল c জিন থাকতে পারে। দ্বিতীয় ধরনের কোষ থেকে যত কোষ তৈরি হবে সবগুলিই সাদা হবে। এর ফলে লাল ফুলে সাদা সাদা দাগ দেখা যায়। সাদা অংশটা কত বড় হবে তা নির্ভর করে দলমণ্ডলের পরিণতির কোন সময় ননডিসজাংশন হয়েছে তার ওপর। ফুলটার খুব ছোট অবস্থায় ননডিসজাংশন হলে সাদা অংশটি বেশ বড় হয়। ফুলটা প্রায় পরিণত হবার সময় ননডিসজাংশন হলে সাদা অংশটি ছোট হয়। Lawrence *Dahlia variabilis*-এ এই রকম কাইমিরার বর্ণনা করেছেন। *Nemesia strumosa*-এও এই ধরনের ননডিসজাংশন দেখা গিয়েছে।

Drosophila melanogaster-এ চার জোড়া ক্রোমোসোম থাকে। এর মধ্যে দু'টি হল সেক্স ক্রোমোসোম। স্ত্রী ড্রসোফিলায় XX ও পুরুষ ড্রসোফিলায় XY সেক্স ক্রোমোসোম থাকে। স্ত্রী ড্রসোফিলার প্রত্যেক ডিম্বাণুতে সাধারণত তিনটি অটোসোম (A) ও একটা X ক্রোমোসোম থাকে। কিন্তু ডিম্বাণু গঠনের সময় ননডিসজাংশন হলে দু'টি X-ক্রোমোসোমযুক্ত ডিম্বাণু (3A+XX) বা X-ক্রোমোসোমবিহীন ডিম্বাণু (3A) তৈরি হয়। এই ননডিসজাংশনকে primary nondisjunction (প্রাথমিক অপৃথকতা) বলা হয় (চিত্র 60)। XX ক্রোমোসোমযুক্ত ডিম্বাণু স্বাভাবিক শুক্রাণুর (3A+X বা 3A+Y) সাথে মিলিত হতে পারে। যদি X ক্রোমোসোমযুক্ত শুক্রাণু ফার্টিলাইজেশনে অংশ নেয়, তাহলে XXX ক্রোমোসোমযুক্ত ট্রাইসোমিক স্ত্রী পতঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই ট্রিপলো-X (triplo-X) ড্রসোফিলা পরিণত হবার আগেই সাধারণত মারা যায়। Y-ক্রোমোসোমযুক্ত স্পার্ম XX ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হলে 6A+XXY স্ত্রী পতঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই রকমের স্ত্রী পতঙ্গ স্বাভাবিক হয়। X-ক্রোমোসোমবিহীন ডিম্বাণু X-ক্রোমোসোমযুক্ত স্পার্মের সাথে মিলিত হলে 6A+X অনুর্বর পুরুষ পতঙ্গের সৃষ্টি হয়ে থাকে। X-ক্রোমোসোমবিহীন ডিম্বাণু Y-ক্রোমোসোমযুক্ত শুক্রাণুর সাহায্যে নিষিক্ত (fertilized) হলে 6A+Y পতঙ্গটা বেঁচে থাকতে পারে না। X-ক্রোমোসোমে চোখের রঙের জিন w (সাদা) ও w (লাল) থাকে। Bridges (1916) অপ্রত্যাশিত চোখের

রঙযুক্ত ড্রসোফিলা দেখতে পেয়েছিলেন এবং এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে X-ক্রোমোসোমের ননডিসজাংশন আবিষ্কৃত হয়েছিল। সাদা চোখযুক্ত XXX স্ত্রী ড্রসোফিলায় ননডিসজাংশন দেখা যায়। একটি X-ক্রোমোসোম Y-ক্রোমোসোমের



চিত্র—60

Drosophila-এ (n = 4) প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী ননডিসজাংশন

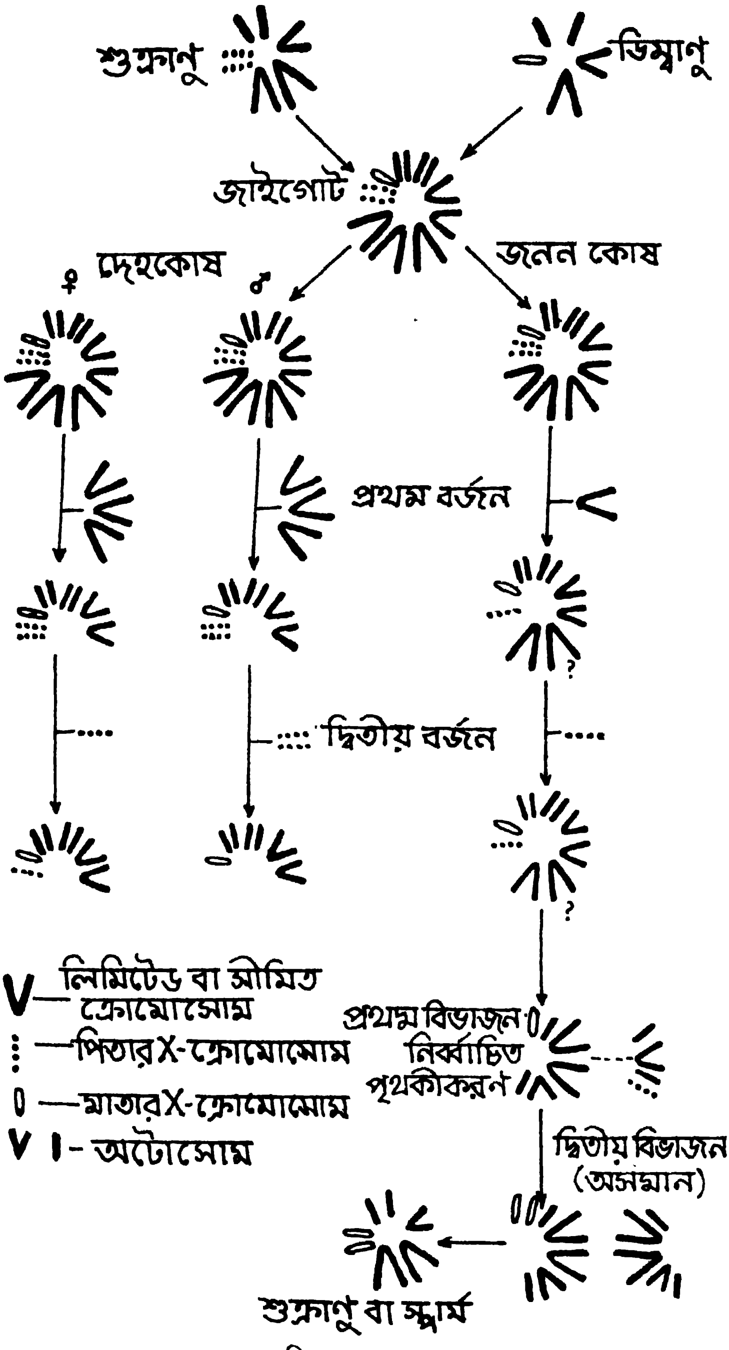
সাথে যুগ্ম অবস্থান করে, অন্য Xটি আলাদা থাকে। অ্যানাফেজে একটি মেরুতে X ক্রোমোসোম ও অন্যটায় Y-ক্রোমোসোম যায়, আলাদা Xটি আকস্মিকভাবে কোনও সময় অন্য Xটি যে মেরুতে গিয়েছিল, সেখানে যায়। এর ফলে একটা গ্যামেটে দু'টি ক্রোমোসোম ও অন্যটায় Y ক্রোমোসোম থাকে। এই রকমের ননডিসজাংশনকে secondary nondisjunction (বা পরবর্তী অপৃথকতা) (চিত্র 60) বলা হয়।

ক্রোমোসোমের বর্জন (elemination)

Rosa canina-এ ক্রোমোসোমের বর্জন (elemination) দেখা যায়। পেন্টাপ্লয়েড (5n) প্রজাতি *Rosa canina* সংকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। এই উদ্ভিদের দেহ

কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 35। এখানে পরাগরেণু ও স্ত্রীরেণুর গঠনের সময় সাতটি বাইভ্যালেন্ট ও একুশটি ইউনিভ্যালেন্ট (univalent) দেখা যায় (Tackholm '22, Gustafson '44)। উভয় ক্ষেত্রেই সাতটি বাইভ্যালেন্ট মায়োসিস বিভাজনের অ্যানাফেজে নিয়মিতভাবে আলাদা হয়ে বিপরীত মেরুতে যায়। পরাগরেণু মাতৃকোষে প্রথম মায়োটিক বিভাজনের সময় বাইভ্যালেন্টগুলি আগে আলাদা হয়ে দুই মেরুতে যায়, পরে ইউনিভ্যালেন্টগুলি মোটামুটি সম-সংখ্যায় উভয় মেরুতে যায়। তবে কোনও কোনও ইউনিভ্যালেন্ট মেরুতে পৌঁছাতে না পারায় বাতিল হয়ে যায়। দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজনেও বাইভ্যালেন্টগুলি নিয়মিতভাবে আলাদা হয়, কিন্তু বেশিরভাগ ইউনিভ্যালেন্টই কোনও মেরুতে পৌঁছাতে পারে না ও বিনষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে সাধারণত সাত, আট, নয়টি ক্রোমোসোমযুক্ত পরাগরেণু তৈরি হয়। তবে সাতটি ক্রোমোসোমযুক্ত পরাগরেণুই (pollen) সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচিত হয়। স্ত্রীরেণুর গঠনের সময়ও বাইভ্যালেন্টগুলি নিয়মিতভাবে আলাদা হয়। কিন্তু সব ইউনিভ্যালেন্টগুলি ডিম্বক রন্ধ্রের অর্থাৎ মাইক্রোপাইলের (micropyle) দিকের মেরুতে যায়, ফলে একটা নিউক্লিয়াসে কেবল 7টি ও অন্যটায় 28টি ক্রোমোসোম থাকে। দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজন নিয়মিতভাবে হয় ও 28টি ক্রোমোসোমযুক্ত দু'টি বড় স্ত্রীরেণু (মেগাস্পোর) ও 7টি ক্রোমোসোমযুক্ত দু'টি ছোট স্ত্রীরেণু তৈরি হয়। একটি বড় স্ত্রীরেণু কার্যকরী হয় ও এমব্রিয়ো স্যাক (ভ্রূণস্থলী) গঠন করে। 7টি ক্রোমোসোমযুক্ত স্পার্মের সাথে 28টি ক্রোমোসোমযুক্ত এই ডিম্বাণু মিলিত হয়ে 35টি ক্রোমোসোমযুক্ত পেন্টাপ্লয়েড *Rosa canina*-র সৃষ্টি করে। এই উদ্ভিদের সব ইউনিভ্যালেন্টগুলিই মাতা থেকে আসে ও এইসব ক্রোমোসোমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চরিত্রে মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার (maternal inheritance) লক্ষ্য করা যায়।

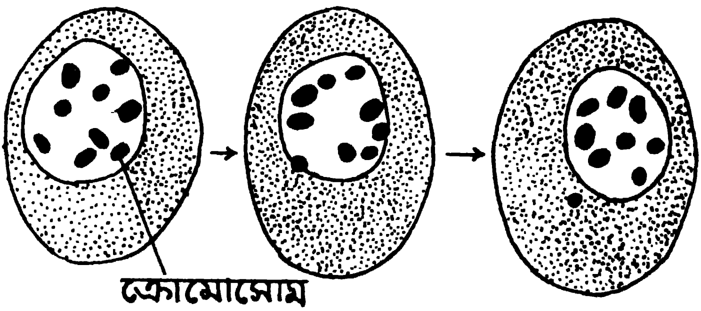
অনেক প্রাণীতেও ক্রোমোসোমের বর্জন লক্ষ্য করা গিয়েছে। দ্বিপক্ষযুক্ত পতঙ্গ (diptera) *Sciara*-তে এই ঘটনা (চিত্র 61) দেখা যায়। *Sciara coprophila*-এ Metz তাঁর সহকর্মীরা দেখেন যে, তিন জোড়া অটোসোম ও তিনটি সেক্স ক্রোমোসোম (XXX) ছাড়াও একটি থেকে তিনটি খুব লম্বা ক্রোমোসোম থাকে। এদের 'লিমিটেড' (limited) বা সীমিত ক্রোমোসোম বলে। *S.coprophila*-এ জাইগোটের প্রথম কয়েকটি বিভাজনের সময়েই দেহ কোষ ও যেসব কোষ থেকে পরে জনন কোষ তৈরি হবে, তা আলাদা হয়ে যায়। দেহ কোষের পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠ মাইটোসিসের সময় দীর্ঘ 'লিমিটেড' বা সীমিত ক্রোমোসোম তিনটি মেরুতে যেতে পারে না ও নিরক্ষরেখা অঞ্চলে থাকে। ফলে কোনও অপত্য নিউক্লিয়াসেই এরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না ও বিনষ্ট হয়ে যায়। সপ্তম বা অষ্টম বিভাজনের সময় একইভাবে X-ক্রোমোসোম বাদ যায়। স্ত্রী *Sciara*-র দেহ কোষ থেকে পিতার একটি X-ক্রোমোসোম বাতিল হয় ও পুরুষ *Sciara*-র দেহ কোষ থেকে পিতার দু'টি X-ক্রোমোসোমই বাতিল হয়ে যায়। জনন কোষেও দেহ কোষের মত ক্রোমোসোমের



চিত্র—61

Sciara coprophila-এ ক্রোমোসোমের বর্জন

বর্জন (elemination) লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে এখানে দেহ কোষের চেয়ে পরে ক্রোমোসোম বাতিল হয়। প্রথমে এক বা একাধিক limited ক্রোমোসোম বাদ যায়। সব ডিম্বাণু গঠনকারী কোষে পিতা থেকে আসা একটি X-ক্রোমোসোম বাদ যায়। সুতরাং, ডিম্বাণু গঠনকারী কোষে পিতার একটি X-ক্রোমোসোম ও মাতার একটি X-ক্রোমোসোম থাকে। স্পার্ম বা শুক্রাণু গঠনের সময় কেবল মাতা থেকে যে অটোসোম ও X-ক্রোমোসোম এসেছিল, সেগুলি এবং লিমিটেড ক্রোমোসোমগুলি থাকে, পিতা থেকে আসা সব অটোসোম ও সেক্স ক্রোমোসোম বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং, স্পার্মে কেবল মাতার ক্রোমোসোমগুলি থাকে। *S. ocellaris*-এ Berry দেখেন যে, জনন কোষ থেকে X-ক্রোমোসোম ইন্টারফেজে বাতিল হয় (চিত্র 62)। পিতার একটি X-ক্রোমোসোম নিউক্লিও মেমব্রেনের দিকে যায় ও পরে ঐ পর্দার মধ্যে দিয়ে সাইটোপ্লাজমে আসে। সাইটোপ্লাজমে কিছুকাল থাকার পর ঐ ক্রোমোসোম বিনষ্ট হয়ে যায়।



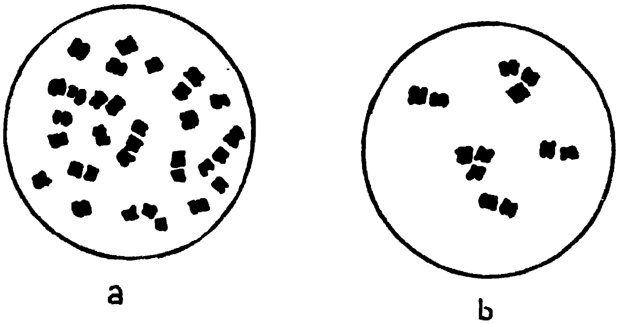
চিত্র—62

Sciara ocellaris-এ ক্রোমোসোমের বর্জন

সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশন (Secondary association)

আগেই বলা হয়েছে যে, মায়োসিসে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতা দেখা যায়। যুগ্ম ক্রোমোসোমের কায়েসমাগুলি জাইগোটিন থেকে প্রথম অ্যানাফেজ পর্যন্ত ঐ হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দু'টিকে একসাথে রাখে। এই রকমের যুগ্মতাকে প্রাইমারী অ্যাসোসিয়েশন (primary association) বলে। প্রোমেটাফেজে কোনও কোনও সময় দু'টি বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক বাইভ্যালেন্ট পরস্পরের কাছে থাকে। এই অবস্থাকে সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশন (চিত্র 63a, b) বলা হয়। মায়োসিসে সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশন দেখা যায়। Darlington প্রথম *Prunus*-এ এবং Lawrence *Dahlia*-এ সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশন দেখেছিলেন। পরবর্তী বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যে, অনেক উদ্ভিদেই ক্রোমোসোম এই রকম অবস্থায় থাকে। সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশনের কারণ হল যে, ঐসব বাইভ্যালেন্টের মধ্যে সুদূর অতীতে

কোনও সামঞ্জস্য ছিল। বিবর্তনের ফলে এইসব ক্রোমোসোমে কিছু গঠনগত পার্থক্য হওয়ায় এখন এদের মধ্যে যুগ্মতা হয় না। অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের পৃথকীকরণের (seggregation) উপর সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশনের কোনও প্রভাব নেই। সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশন কোনও উদ্ভিদের অ্যালোপলিপ্লয়েড (allopolyploid) বিশেষ করে অ্যাম্ফিডিপ্লয়েড (amphidiploid) প্রকৃতি নির্দেশ করে। ছোট ক্রোমোসোমযুক্ত অ্যালোপলিপ্লয়েডে সচরাচর সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশন দেখা যায়।



চিত্র—63

সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশন, a- *Dahlia variabilis*-এ, b- ধানে (*Oryza sativa*)

সেকেন্ডোরী অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্যে কোনও প্রজাতির সঠিক মূল সংখ্যা (basic number) বোঝা যায়। কোনও কোনও বিজ্ঞানী মনে করেন, সর্বনিম্ন সংখ্যক সমাবেশই বেসিক সংখ্যা নির্দেশ করে। কিন্তু অন্যান্যদের মতে, যে ধরনের সমাবেশ সবচেয়ে বেশি হারে দেখা যায়, তাই মূল সংখ্যা (basic number) নির্দেশ করে। প্রথম মতই ঠিক। অনেক বিজ্ঞানীরা এই মতের প্রতিবাদ করেছেন। Heilborn-এর (1936) মতে, নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিষম শক্তির বিকর্ষণের ফলে সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশন দেখা দেয়। কিন্তু এই মতও সমর্থিত হয়নি। *Cicer*-এর উপর গবেষণা করে Thomas ও Revell (1946) বলেছিলেন যে, কোষ বিভাজনের প্রথম দিকে হেটোরোক্রোমাটিন অঞ্চলগুলির যদৃচ্ছ মিলনের ফলে মেটাফেজে সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশন দেখা যায়। Commelinaceae-র বিভিন্ন উদ্ভিদে হেটোরোক্রোমাটিন অঞ্চলের মিলন ও সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশন দেখা গিয়েছে এবং এটা Thomas ও Revell-এর মতকে সমর্থন করে। তবে ক্রোমোসোমের হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের মিলন নিয়ন্ত্রিতভাবে হয়। কেবল হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলেই সংযোগ দেখা যায় কারণ, পূর্বপুরুষের হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলির হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলেই সবচেয়ে কম পরিবর্তন হয়েছে। এজন্য এদের মধ্যে এখনও বিশেষ রকমের সংযোগ হয় এবং হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের চটচটে প্রকৃতি এই প্রক্রিয়াকে সুগম করে।

সপ্তম অধ্যায়

জনন (Reproduction)

সব উদ্ভিদের জীবন চক্র (life cycle) দু'টি পর্যায়ে সম্পূর্ণ হয়। একটিকে রেণুধর উদ্ভিদ বা sporophyte এবং অন্যটিকে লিঙ্গধর উদ্ভিদ বা gametophyte বলা হয়। উদ্ভিদের জীবন চক্রে রেণুধর উদ্ভিদ এবং লিঙ্গধর উদ্ভিদের এই পর্যায়ক্রমকে জনুক্রম বা অলটারনেশন অফ জেনারেশনস্ (alternation of generations) বলে। রেণুধর উদ্ভিদ জাইগোট (zygote) থেকে তৈরি হয় ও রেণু গঠন করে। লিঙ্গধর উদ্ভিদ রেণু থেকে তৈরি হয় ও গ্যামেট (gamete) সৃষ্টি করে। রেণু গঠনের সময় মায়োসিস হওয়ার ফলে ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হয়। লিঙ্গধর উদ্ভিদ থেকে সৃষ্ট দু'টি গ্যামেটের মিলনের ফলে জাইগোট গঠিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে নিষেক বা ফার্টিলাইজেশন (fertilization) বা সীনগ্যামী (syngamy) বলে। নিষেকের ফলে ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। মায়োসিসের ফলে লিঙ্গধর উদ্ভিদের এবং নিষেকের ফলে রেণুধর উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় এবং রেণুধর উদ্ভিদে লিঙ্গধর উদ্ভিদের দ্বিগুণ সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।

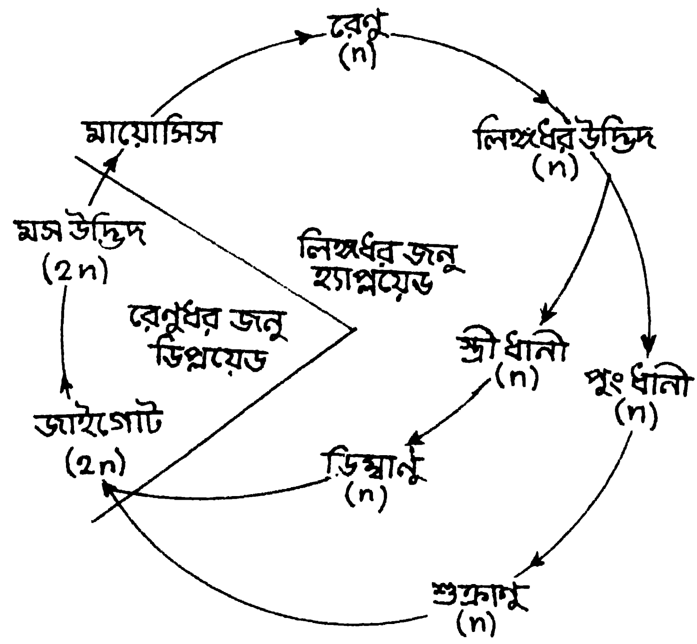
বিভিন্ন উদ্ভিদের জনুক্রমে পার্থক্য দেখা যায়। শৈবাল ও ছত্রাকের জীবন চক্রের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লিঙ্গধর উদ্ভিদ এবং কখনও কখনও রেণুধর উদ্ভিদ কিম্বা রেণুধর বা লিঙ্গধর উদ্ভিদ দু'টিই প্রাধান্য লাভ করতে পারে। ব্রায়োফাইটা (bryophyta) বা মস জাতীয় উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত ছোট, পরজীবী ও ক্ষণস্থায়ী (চিত্র 64)। টেরিডোফাইটা (pteridophyta) বা ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদে রেণুধর উদ্ভিদই প্রাধান্য লাভ করেছে। এখানে লিঙ্গধর উদ্ভিদ সাধারণত বেশ ছোট, যদিও স্বাধীন হয়। সপুষ্পক উদ্ভিদে রেণুধর উদ্ভিদটিই প্রধান এবং লিঙ্গধর উদ্ভিদ সাধারণত এত ছোট হয় যে, তা খালি চোখে দেখা যায় না এবং তার কোনও স্বাধীন অস্তিত্বও নেই।

নিষেক বা ফার্টিলাইজেশনের সময় একই উদ্ভিদ থেকে সৃষ্ট দু'টি গ্যামেট মিলিত হলে ঐ উদ্ভিদকে **হোমোথ্যালিক** (homothallic) বলে। দু'টি উদ্ভিদ থেকে সৃষ্ট গ্যামেটের মিলনের ফলে জাইগোট তৈরি হলে ঐ উদ্ভিদকে **হেটারোথ্যালিক** (heterothallic) বলা হয়।

গুপ্তবীজী উদ্ভিদে জনন (reproduction in angiosperm)

গুপ্তবীজী উদ্ভিদের জীবন চক্রে রেণুধর উদ্ভিদই প্রধান। রেণুধর উদ্ভিদের

পরাগধানী (anther) এবং গর্ভাশয়ে (ovary) মায়োসিসের ফলে রেণু তৈরি হয়। এইসব রেণু থেকে লিঙ্গধর উদ্ভিদের (gametophyte) সৃষ্টি হয়। লিঙ্গধর উদ্ভিদ পুষ্টির জন্য রেণুধর উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। পরাগধানীতে পরাগরেণু (pollen grain) এবং গর্ভাশয়ে ডিম্বক (ovule) গঠিত হয়। পরাগরেণু পুং গ্যামেট (male gamete) সৃষ্টি করে এবং ডিম্বক ডিম্বাণু (egg) তৈরি করে। গর্ভাশয়েই পুং গ্যামেট ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে। এর থেকে ভ্রূণ (embryo) ও বীজ গঠিত হয়। স্ত্রী লিঙ্গধর উদ্ভিদ স্ত্রী রেণুর প্রাচীরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে।



চিত্র—64

মসের জীবন চক্র

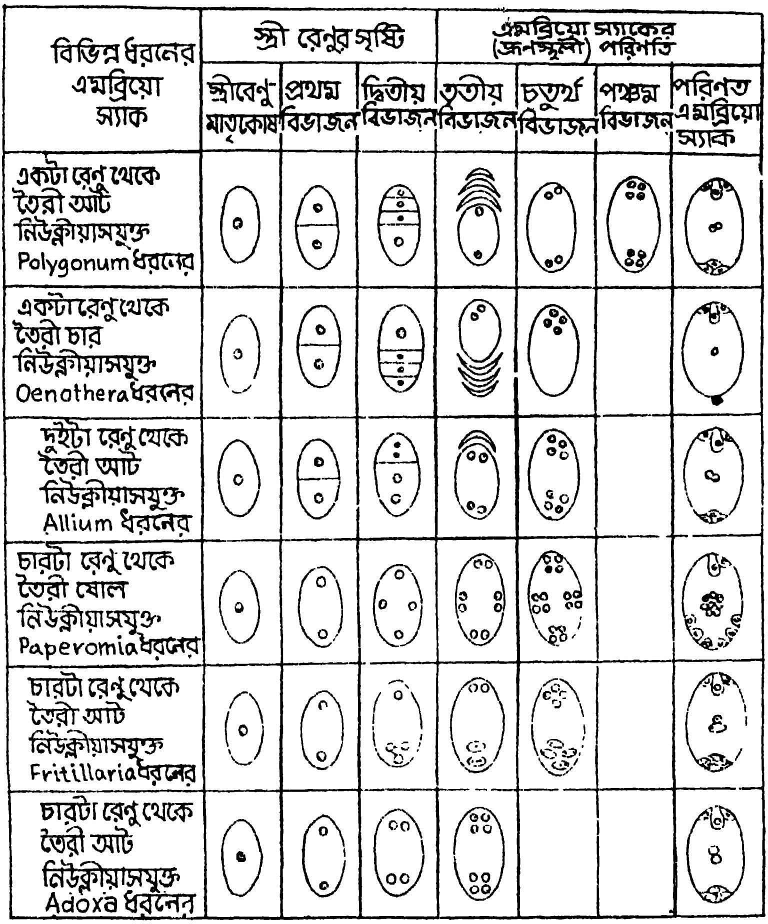
স্ত্রী রেণুর গঠন প্রণালী (megasporogenesis)— গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ডিম্বকের ভিতরের অংশকে নিউসেলাস (nucellus বা ভ্রূণপোষক) বলে। এটি ডিম্বক ত্বক বা integument দিয়ে আবৃত থাকে। ডিম্বকের যে স্থানে ডিম্বক ত্বক থাকে না, সেই অঞ্চলকে ডিম্বক রন্ধ্র বা micropyle বলা হয়। ভ্রূণ পোষকের উপরের অংশে স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ থাকে। এই কোষ ক্রমশ বড় হয়ে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। এর পরবর্তী পর্যায়গুলি বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। ভুট্টায় স্ত্রীরেণু মাতৃকোষে মায়োসিস বিভাজনের ফলে 4টি স্ত্রীরেণু গঠিত হয়। তিনটি স্ত্রীরেণু পরে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং চতুর্থটি বড় হয়ে ভ্রূণস্থলী (embryosac) গঠন করে। এমব্রিয়ো

স্যাকে প্রথম একটি হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াস থাকে। এই নিউক্লিয়াস তিনবার বিভাজিত হয়ে আটটি নিউক্লিয়াস গঠন করে। আটটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে তিনটি ডিম্বক রন্ধ্রের (microphyle) বিপরীত দিকে যায় ও ঐখানে প্রাচীর গঠনের ফলে প্রতিপাদ কোষ সমষ্টি বা antipodal cells-এর সৃষ্টি করে। বাকি পাঁচটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে তিনটি ডিম্বক রন্ধ্রের দিকে তিনটি কোষের সৃষ্টি করে। এই তিনটি কোষের মধ্যে মাঝেরটিকে ডিম্বাণু (egg) কোষ ও অন্য দু'টিকে সহকারী কোষ (synergid) বলে। অবশিষ্ট দু'টি নিউক্লিয়াস ভ্রূণস্থলীর মাঝখানে আসে। ভুট্টায় এই নিউক্লিয়াস দু'টি পাশাপাশি থাকে, কিন্তু অন্য কোনও উদ্ভিদে এরা মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড সেকেন্ডারী নিউক্লিয়াস (secondary বা fusion nucleus) গঠন করে। এছাড়া বিভিন্ন উদ্ভিদে অন্যান্য ধরনের এমব্রিয়ো স্যাক দেখা যায়। চিত্র 65এ আট নিউক্লিয়াসযুক্ত *Polygonum, Allium, Fritillaria* ও *Adoxa,* চার নিউক্লিয়াসযুক্ত *Oenothera* এবং ষোলটি নিউক্লিয়াসযুক্ত *Paperomia* ধরনের ভ্রূণস্থলীর (embryo sac) গঠন প্রণালী দেখান হয়েছে।

পরাগরেণুর (pollen) গঠন প্রণালী— ফুল ফোটার আগেই প্রত্যেক পরাগরেণু মাতৃকোষে মায়োটিক বিভাজন হয়ে থাকে। মায়োসিসের ফলে চারটি পরাগরেণু তৈরি হয়। পরাগরেণুতে দু'টি প্রাচীর থাকে–– রেণু বহিঃস্তক (exine) ও রেণু অন্তঃস্তক (intine)। এই পরাগরেণুগুলিই হল পুংলিঙ্গধর উদ্ভিদ (male gametophyte)। প্রত্যেক পরাগরেণুর নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে generative বা জনন নিউক্লিয়াস এবং tube বা নালী নিউক্লিয়াস গঠন করে। পরে জনন নিউক্লিয়াসটি বিভাজিত হয়ে দু'টি পুং গ্যামেটের সৃষ্টি করে (চিত্র 66)। বিভিন্ন উদ্ভিদে জনন নিউক্লিয়াসের বিভাজনের সময়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ভুট্টায় পরাগধানী থেকে পরাগরেণু বের হওয়ার আগেই জনন নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়। কিন্তু লিলিতে গর্ভদণ্ডের (style) মধ্যে দিয়ে যখন পরাগ নালীটি ডিম্বক রন্ধ্রের দিকে যায়, তখন জনন নিউক্লিয়াসের বিভাজন হয়।

ফার্টিলাইজেশন (fertilization) **বা সীনগ্যামী** (syngamy) **বা নিষেক**— পরাগরেণুগুলি গর্ভমুণ্ডে (stigma) এসে পড়লে ঐখানে অঙ্কুরিত হয়। পরাগনালীতে (pollen tube) নালী নিউক্লিয়াস ও জনন নিউক্লিয়াস বা দু'টি পুং গ্যামেট থাকে। পরাগনালী গর্ভদণ্ডের মধ্যে দিয়ে গিয়ে (চিত্র 67a) ডিম্বক রন্ধ্রের কোষগুলিকে ভেদ করে ভ্রূণস্থলীতে (embryo sac) প্রবেশ করে (চিত্র 67b)। ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংজনন কোষের মিলনের ফলে ডিপ্লয়েড (2n) জাইগোট এবং সেকেন্ডারী নিউক্লিয়াসের সাথে অন্য পুংজনন কোষের মিলনের ফলে ট্রিপ্লয়েড (3n) সস্য (endosperm) নিউক্লিয়াস গঠিত হয় (চিত্র 67c)। ফার্টিলাইজেশন বা নিষেকে দু'টি জনন কোষই অংশ নেয় বলে এই প্রক্রিয়াকে double fertilization বা দ্বি-নিষেক বলে।

নিষেকের পর জাইগোট থেকে ভ্রূণ (embryo) এবং সস্য নিউক্লিয়াস থেকে সস্য গঠিত হয় (চিত্র 67c-e)। ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় সস্য পুষ্টি সাধনে সাহায্য করে। সাধারণত পরাগনালীর এমব্রিয়ো স্যাকে প্রবেশের সময় একটি সহকারী কোষ বিনষ্ট হয়ে যায়, অন্য সহকারী কোষটি নিষেকের পর লুপ্ত হয়। সস্য গঠনের সময় প্রতিপাদ কোষ সমষ্টিও বিনষ্ট হয়ে যায়।



চিত্র—65

গুপ্তবীজী উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের এমব্রিয়ো স্যাকের গঠন প্রণালী

বিভিন্ন উদ্ভিদের পরিণত বীজে সস্যের পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়। ভুট্টার বীজের বেশিরভাগ অঞ্চলই সস্য দিয়ে তৈরি। এখানে সস্যের রঙ বিভিন্ন রকমের হয়

এবং নির্দিষ্ট জিন সস্যের রঙ নিয়ন্ত্রণ করে। মটরশুঁটির পরিণত বীজে সস্য থাকে না কারণ, ভ্রূণের পরিণতির সময় সস্য জীর্ণ হয়ে যায়। এই বীজের বীজপত্রে (cotyledon) খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত থাকে।

গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বীজের জেনেটিক গঠন মিশ্র ধরনের কারণ, এটা বিভিন্ন জেনেটিক গঠনযুক্ত টিস্যু (যেমন, ডিপ্লয়েড এমব্রিয়ো, ট্রিপ্লয়েড এন্ডোস্পার্ম, ইত্যাদি) দিয়ে তৈরি।



চিত্র—66

পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম ও পুং গ্যামেটের উৎপত্তি

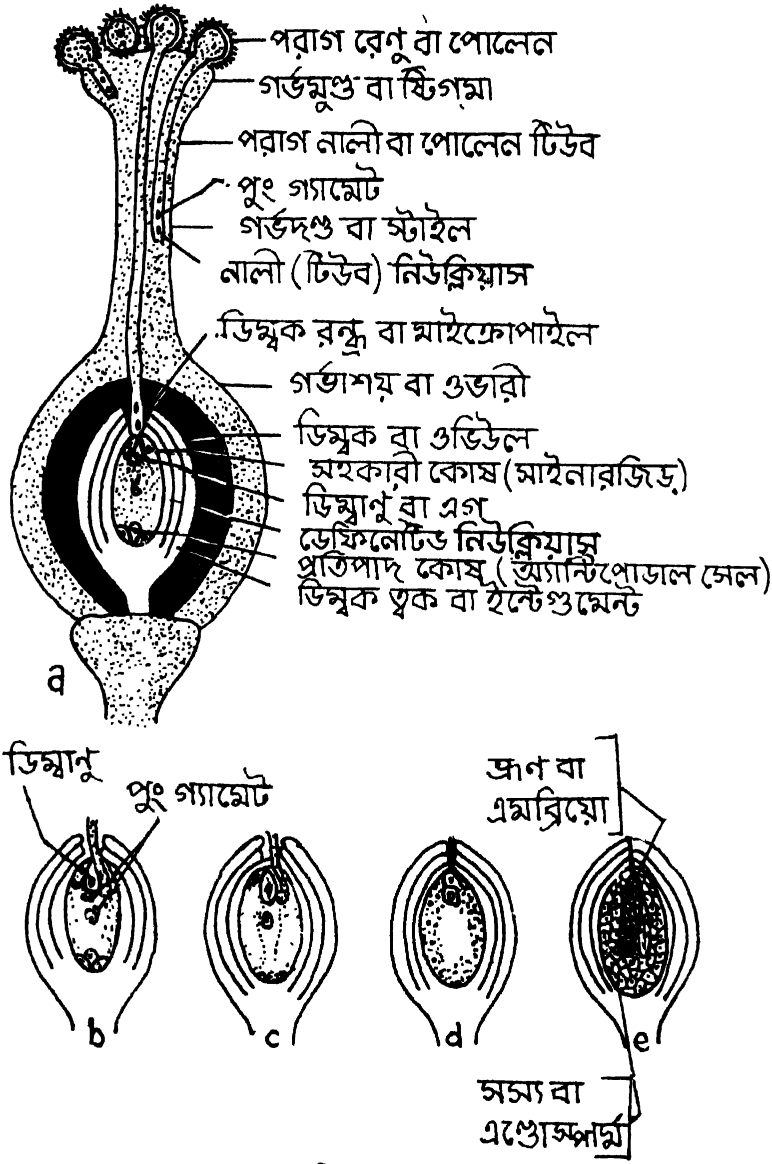
a—পরাগরেণু; b-c—দ্বিনিউক্লিয়াসযুক্ত অবস্থা ও পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম;

d—জনন কোষ বিভাজিত হয়ে দু'টি পুং গ্যামেটের সৃষ্টি হয়েছে

অ্যাপোমিক্সিস (apomixis)

অনেক জীব যৌন জননের পরিবর্তে আংশিক কিম্বা সম্পূর্ণভাবে অযৌন জননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। এই রকমের জননকে অ্যাপোমিক্সিস বলে। Fagerlind ও Stebbins অ্যাপোমিক্সিসকে প্রধানত দু'টি শ্রেণীতে (চিত্র 60) ভাগ করেছেন— (1) অঙ্গজ (vegetative) অ্যাপোমিক্সিস, (2) অ্যাগ্যামোস্পার্মি (agamospermy)– বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে আপোমিক্সিস।

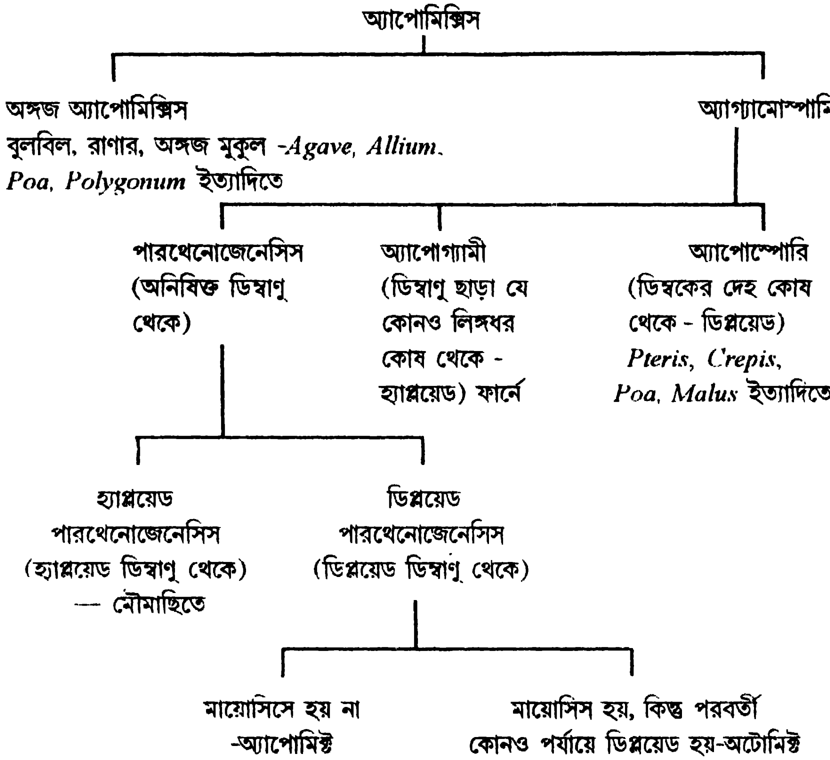
(1) **অঙ্গজ অ্যাপোমিক্সিস**— বুলবিল (bulbil), রানার (runner), স্টোলন



চিত্র—67

নিষেক বা ফার্টিলাইজেশন a—স্ত্রী স্তবক (gynoecium) ও পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম, একটা পরাগ নালী গর্ভদণ্ডের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ডিম্বক রন্ধ্রের কোষগুলি ভেদ করে ভ্রূণস্থলীতে প্রবেশ করছে; b—পরাগ নালী থেকে দু'টি পুংগ্যামেট ভ্রূণস্থলীতে প্রবেশ করছে; c— একটা পুংগ্যামেট ডিম্বাণুর সাথে এবং আরেকটা পুংগ্যামেট ডেফিনেটিভ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হচ্ছে; d—দ্বিকোষী ভ্রূণ ও মুক্ত নিউক্লিয় অবস্থা; e—দু'টি বীজপত্রযুক্ত ভ্রূণ ও বহুকোষী সস্য।

(stolon বা বক্র ধাবক), রাইজোম, টিউবার (বা স্ফীতকন্দ), বাল্ব (বা কন্দ), কর্ম (corm বা গুড়িকন্দ), অঙ্গজ মুকুল (vegetative bud) ইত্যাদির মাধ্যমে অঙ্গজ অ্যাপোমিক্সিস হয়। *Agave, Allium, Cardamine, Citrus, Festuca, Poa, Polygonum, Saxifraga* প্রভৃতিতে অঙ্গজ অ্যাপোমিক্সিস দেখা যায়।



চিত্র—68

অ্যাপোমিক্সিসের বিভিন্ন বিভাগগুলি দেখান হয়েছে

(2) অ্যাগ্যামোস্পার্মি— এখানে ফার্টিলাইজেশন ছাড়াই বীজ তৈরি হয়। অ্যাগ্যামোস্পার্মিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (a) কোনও কোনও সময় ডিম্বাণু নিষিক্ত না হয়ে সরাসরি কোনও জীবের সৃষ্টি করে। এই পদ্ধতিকে **পারথেনোজেনেসিস (parthenogenesis)** বা **অপুংজনি** বলে। অনেক নিম্নশ্রেণীর প্রাণী এবং কিছু উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবে পারথেনোজেনেসিসের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। কৃত্রিম উপায়েও পারথেনোজেনেটিক (parthenogenetic) জীবের সৃষ্টি করা সম্ভব।

স্বাভাবিক অপুংজনি দুই প্রকার— সম্পূর্ণ ও চক্রাকার। (a) কোনও কোনও জীব কেবল অপুংজনির মাধ্যমে জনন করে। এই প্রক্রিয়াকে **সম্পূর্ণ** বা বাধ্যতামূলক (obligatory) **অপুংজনি** বলে। প্রাণীতে এরকম অপুংজনির ফলে অনিষিক্ত ডিপ্লয়েড

ডিম্বাণু থেকে কেবল স্ত্রীর সৃষ্টি হয়। এরকম প্রাণীতে পুরুষরা অনুপস্থিত বা অকার্যকর। বিবর্তনে এরকম অপুংজনির কোনও গুরুত্ব নেই, কারণ এরকম জননের ফলে প্রকারণ দেখা দেয় না।

(b) সম্পূর্ণ অপুংজনির তুলনায় **চক্রাকার অপুংজনি** (cyclical parthenogenesis) বেশি দেখা যায়। এরকম জীবে অপুংজনি ও যৌন জনন পর্যায়ক্রমে হয়। এই পর্যায়ক্রম বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

(i) একটি অপুংজনির জনুর সাথে একটি যৌন জনুর পর্যায়ক্রম দেখা যেতে পারে (বদ্ধ বা closed অপুংজনি) অথবা (ii) কতকগুলি অপুংজনির জনুর পরে যৌন জনুর পর্যায়ক্রম দেখা যায় (মুক্ত বা open ধরনের অপুংজনি)। (iii) মিশ্র (mixed) মুক্ত ধরনের অপুংজনিতে একই জীবন চক্রে ডিপ্লয়েড এবং হ্যাপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস হয়। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিসের ফলে অনেক স্ত্রীর (যেমন— রটিফারে) সৃষ্টি হয়। শরৎকালে স্ত্রী হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু উৎপাদন করে। এরকম ডিম্বাণু স্ত্রী (n) সৃষ্টি করে। পুরুষ থেকে উৎপন্ন শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে জাইগোট সৃষ্টি করে। এই জাইগোট বসন্তকালে অঙ্কুরিত হয়ে ডিপ্লয়েড স্ত্রীর সৃষ্টি হয়, যার থেকে অপুংজনির ফলে অনেক স্ত্রীর (2n) সৃষ্টি হয়। (iv) মিশ্রবদ্ধ ধরনের অপুংজনি— কোনও কোনও পতঙ্গে (gall fly) নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ডিপ্লয়েড স্ত্রীর সৃষ্টি হয়। এর থেকে মায়োসিসের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে পুরুষের (n) সৃষ্টি হয়। এরকম পুরুষ মায়োসিস বিভাজন ছাড়াই শুক্রাণু (n) উৎপাদন করে। ডিম্বাণু (n) ও শুক্রাণু (n) মিলিত হয়ে জাইগোট (2n) গঠন করে।

অপুংজনির মাধ্যমে লার্ভার সংখ্যা বৃদ্ধিকে **পেডোজেনেসিস** (paedogenesis) বলে, যথা— কোনও কোনও পতঙ্গে যেমন— gall fly ও gall midget

কৃত্রিম অপুংজনি— কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাপমাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, ঘন বসতি ইত্যাদির প্রভাবে অপুংজনি দেখা দেয়। এরকম বহিস্থ কারণের প্রভাবে সৃষ্ট অপুংজনিকে **কৃত্রিম** বা আবিষ্ট (induced) **অপুংজনি** বলে।

কৃত্রিম অপুংজনির বিভিন্ন উদ্দীপক রয়েছে—

(a) **ভৌত উদ্দীপক**— ডিম্বাণুকে সূচ দিয়ে সামান্য ফুটিয়ে উদ্দীপিত করা হয়।

(b) উচ্চ বা নিম্ন তাপমাত্রায় ডিম্বাণু রাখলে অপুংজনি দেখা দিতে পারে।

(c) **রাসায়নিক উদ্দীপক**— যেমন, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, বিউটারিক অ্যাসিড, ইথার, টলুইন, অ্যাসিটোন ইত্যাদির প্রভাবে অপুংজনি দেখা দিতে পারে।

(d) **বিকিরণ**— যেমন, অতি বেগুনী রশ্মি, রেডিয়ামের বিকিরণ ইত্যাদির প্রভাবে অপুংজনি দেখা দেয়।

(e) অন্য কোনও জীবের শুক্রাণু প্রবেশ করার ফলে উদ্দীপনার সৃষ্টি হতে পারে এবং অপুংজনি দেখা দেয়।

পারথেনোজেনেসিসকে আবার দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা— হ্যাপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস ও ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস।

হ্যাপ্লয়েড বা arrhenotokus পারথেনোজেনেসিসে মায়োসিস স্বাভাবিকভাবে হয়। হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু ফার্টিলাইজেশন ছাড়াই নতুন জীবের (n) সৃষ্টি করে। মৌমাছি ও অন্যান্য কোনও কোনও পতঙ্গে নিয়মিতভাবে হ্যাপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস হয় এবং এই রকমের জননের ফলে পুরুষ পতঙ্গের সৃষ্টি হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে স্ত্রী পতঙ্গ গঠিত হয়।

ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিসে (বা thelytoky) মায়োটিক বিভাজন অস্বাভাবিক হয়, কিম্বা হয় না। এর ফলে ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু তৈরি হয়। এই ডিম্বাণু থেকে পারথেনোজেনেসিসের মাধ্যমে ডিপ্লয়েড জীবের সৃষ্টি হয়। কোনও কোনও নিম্নশ্রেণীর প্রাণী কেবল এই উপায়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিসের ফলে স্ত্রী পতঙ্গের সৃষ্টি হয়। কিছু উদ্ভিদে নিয়মিতভাবে ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস হয়। অনেক সময় এই রকম জননকে অ্যাপোমিকটিক পারথেনোজেনেসিসও (apomictic parthenogenesis) বলে। *Antenneria, Crepis, Hieracium, Malus, Poa, Potentilla, Ranunculus* ইত্যাদিতে ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস দেখা গেছে। কিছু পলিপ্লয়েড প্রাণীতেও এরকমের জনন দেখা গিয়েছে।

অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে (যেমন পিঁপড়া, মৌমাছি ইত্যাদি) অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে হ্যাপ্লয়েড পুরুষ এবং নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ডিপ্লয়েড স্ত্রীর সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতিকে হ্যাপ্লোডিপ্লয়ডি (haplodiploidy) বলে।

কোনও কোনও প্রাণীতে পুরুষরা জেনেটিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে অথবা অনুপস্থিত থাকে। এই সব ক্ষেত্রে স্ত্রীতে মায়োসিস স্বাভাবিক হয় ও ডিম্বাণু সরাসরি নতুন জীবের সৃষ্টি করে। ডিম্বাণু হ্যাপ্লয়েড হলেও পরবর্তী কোনও পর্যায়ে ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায় ও এর ফলে সৃষ্ট জীব ডিপ্লয়েড হয়। ক্রোমোসোম সংখ্যা সাধারণত দু'ভাবে দ্বিগুণ হতে পারে। (a) এই প্রক্রিয়ায় প্রথম মায়োসিসের মেটাফেজের পর অ্যানাফেজ হয় না। ক্রোমাটিড গঠিত হয়। এই কোষটিতে দ্বিতীয় বিভাজনের পর দু'টি ডিপ্লয়েড কোষের সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়াকে restitution বা পূর্বাবস্থা পুনঃস্থাপন বলে। (b) হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু একটি পোলার বডির সাথে মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। এই পদ্ধতিকে স্বনিষেক বা autofertilization বলে। এই জননকে **অটোমিকটিক** (automictic) পারথেনোজেনেসিস বলে। এই রকমের জনন উদ্ভিদে বিরল।

অনেক সময় পুংজনন কোষ ডিম্বাণুতে প্রবেশ করেই বিনষ্ট হয়ে যায় এবং মাতৃ নিউক্লিয়াসযুক্ত ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ তৈরি হয়। এই রকমের জননকে **গাইনোজেনেসিস** (gynogenesis) বলে।

কখনও কখনও মাতৃ নিউক্লিয়াস বিনষ্ট হবার ফলে হ্যাপ্লয়েড পিতৃ নিউক্লিয়াস

থেকে ভ্রূণ তৈরি হয়। এই ধরনের জননকে অ্যান্ড্রোজেনেসিস (androgenesis) বলে।

অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ফল উৎপন্ন হলে ঐ প্রক্রিয়াকে পারথেনোকার্পি (perthenocarpy) বলে। কলা, লেবু, আঙুর ইত্যাদিতে পারথেনোকার্পি দেখা যায়। টমেটো, তামাক, মরিচ প্রভৃতিতে কৃত্রিম উপায়ে পারথেনোকার্পিয় ফলের সৃষ্টি করা হয়েছে।

(b) রেণু গঠন ছাড়াই ডিম্বকের (ovule) যে কোনও দেহ কোষ থেকে উদ্ভিদের সৃষ্টি হলে ঐ প্রক্রিয়াকে অ্যাপোস্পোরি (apospory) (চিত্র 69A) বলে। *Dryopteris, Pteris, Pellaea* ইত্যাদি ফার্ণে এবং *Crepis, Poa, Potentilla, Mallus* প্রভৃতি গুপ্তবীজী উদ্ভিদে এই রকমের জনন দেখা যায়। যদি ডিপ্লয়েড রেণুধারণ কোষ থেকে উদ্ভিদ গঠিত হয়, তবে ঐ পদ্ধতিকে ডিপ্লোস্পোরি (diplospory) বলে। এখানে মায়োসিস ও নিষেক হয় না। *Chondrilla, Erigeron, Taraxacum* ইত্যাদিতে ডিপ্লোস্পোরি দেখা যায়।

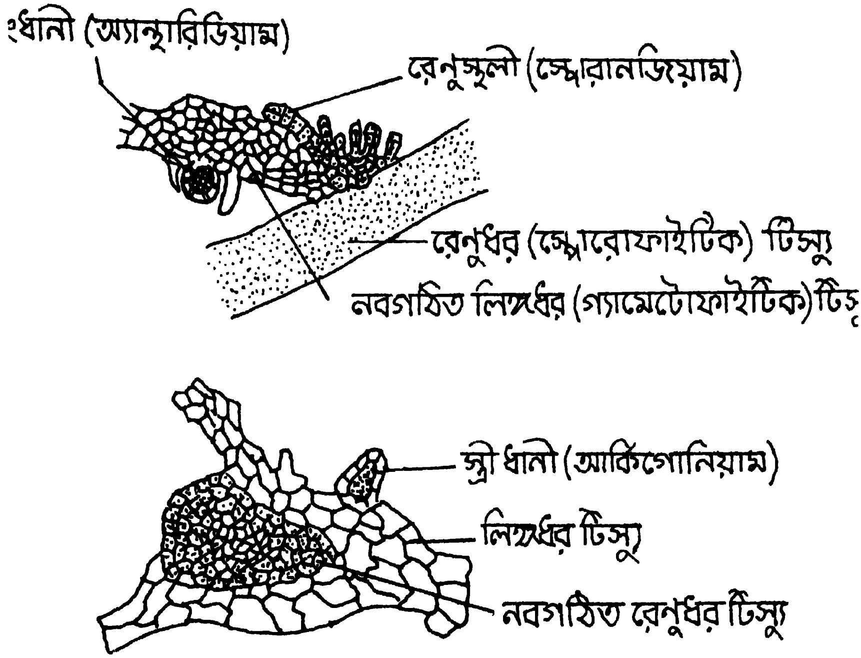
(c) ডিম্বাণু ছাড়া অন্য যে কোনও লিঙ্গধর কোষ থেকে সরাসরি রেণুধর উদ্ভিদ তৈরি হলে ঐ জননকে অ্যাপোগ্যামি (apogamy) বলে। ফার্ণে অ্যাপোগ্যামি (চিত্র 69B) দেখা যায়। কোনও কোনও ফার্ণে অ্যাপোগ্যামির পর অ্যাপোস্পোরি হয়।

অ্যাপোমিক্সিসের মাধ্যমে যেসব উদ্ভিদে জনন হয়, তাদের কোনও কোনওটাতে পরাগযোগ না হলে ভ্রূণ পরিণত হয় না। এইসব উদ্ভিদকে সিউডোগ্যামাস (pseudogamous) উদ্ভিদ এবং জনন প্রক্রিয়াকে সিউডোগ্যামি (pseudogamy) বলে।

Fagerlind (1940), Gustafson (1946-48), Stebbins (1941, 1950), Nygren (1954) প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ উদ্ভিদের এবং White (1945) প্রাণীর অ্যাপোমিক্সিস নিয়ে গবেষণা করেছেন। পলিপ্লয়েড ফার্ণ ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদে অ্যাপোমিক্সিসের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। অনেকগুলি প্রচ্ছন্ন (recessive) জিন অ্যাপোমিক্সিসকে প্রভাবিত করে। এইসব জিনের মিলিত প্রভাবে অ্যাপোমিক্সিস পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হয়। Gustafson-এর মতে, পলিপ্লয়েড স্তরে এই জিনগুলির কার্যকারিতা আরও বেশি হয়। কিছু অ্যাপোমিক্ট উদ্ভিদ সংকরণের (hybridization) মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। যেসব প্রজাতিতে অ্যাপোমিক্সিস হয় তাদের মায়োসিসে জটিলতা দেখা যায়। এই উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে অ্যাগ্যামিয় গোষ্ঠী (agametic complex) বলে। *Crepis, Hieracium, Antennaria, Taraxacum, Rubus, Poa, Potentilla, Parthenium* ইত্যাদিতে অ্যাগ্যামিয় গোষ্ঠী দেখা যায়।

বিভিন্ন প্রজনন পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মনে করা হয় যে, তিন জোড়া জিন অ্যাপোমিক্সিসকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধরা যাক, জিন a হোমোজাইগাস অবস্থায় ডিপ্লয়েড (ক্রোমোসোম সংখ্যা যেখানে হ্রাস পায়নি) ডিম্বাণু গঠনে সাহায্য করে (অ্যাপোস্পোরি ও ডিপ্লোস্পোরি)। জিন b হোমোজাইগাস অবস্থায় নিষেকে বাধা দেয়। জিন c

হোমোজাইগাস অবস্থায় ডিম্বাণুকে পারথেনোজেনেসিস বা অপুংজনি প্রক্রিয়ায় পরিণত হতে সহায়তা করে। যেসব উদ্ভিদে aa BB CC জিন থাকে, সেখানে ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু গঠিত হয়, কিন্তু এগুলি অ্যাপোমিক্সিস প্রক্রিয়ায় পরিণত হয় না।



চিত্র—69

A-ফার্নে অ্যাপোস্পোরি, রেণু টিস্যু থেকে সরাসরি লিঙ্গধর টিস্যু ও পুংধানীর উৎপত্তি,
B-ফার্নে অ্যাপোগ্যামি, লিঙ্গধর টিস্যু থেকে সরাসরি রেণুধর টিস্যুর উৎপত্তি

তবে এই ডিম্বাণু যদি নিষিক্ত হয়, তাহলে ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। AA bb CC উদ্ভিদে হ্যাপ্লয়েড (অর্থাৎ যেখানে মায়োসিস হয়েছে) ডিম্বাণু তৈরি হয়, কিন্তু নিষেক না হওয়ায় ভ্রূণ গঠিত হয় না। যেসব উদ্ভিদের জেনোটাইপ AA BB cc, সেখানে স্বাভাবিকভাবে যৌন জনন হয়। কারণ A ও B-র উপস্থিতিতে cc-র কোনও প্রভাব নেই। কেবল যেসব উদ্ভিদে aa bb cc জিন থাকে, সেখানে অ্যাপোমিক্সিস দেখা যায়। মিশ্র জেনোটাইপযুক্ত গোষ্ঠীতে যৌন জননশীল উদ্ভিদ থেকে অ্যাপোমিক্সিসের সাহায্যে জনন সম্পাদনকারী উদ্ভিদের সৃষ্টি হতে পারে।

সংকরণ দুইভাবে অ্যাপোমিক্সিসকে সহায়তা করে। প্রথমত, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভিন্ন ধরনের জিনোমের সমন্বয় সাধিত হতে পারে। এর ফলে আকস্মিকভাবে কখনও কখনও যথাযথ ফ্যাক্টর বা জিনের সংযোগ (combination) হওয়ায় অ্যাপোমিক্সিস দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, সংকর উদ্ভিদ বিভিন্ন রকম পরিবেশে (ecological conditions) বিস্তার লাভ করতে পারে। এই ক্ষমতা সংকর উদ্ভিদে মাতা পিতার তুলনায় বেশি থাকে। সেজন্য সংকর উদ্ভিদে অ্যাপেমিক্সিস স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

অ্যাপোমিক্সিসের সুবিধা ও অসুবিধা— যৌন জননকারী উদ্ভিদের (sexually reproducing plant) সাথে অ্যাপোমিক্ট উদ্ভিদের তুলনা করলে অ্যাপোমিক্সিসের তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়। অ্যাপোমিক্ট উদ্ভিদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিচে দেওয়া হল।

(1) অ্যাপোমিক্সিস যৌন জননের চেয়ে অনেক সহজ ও সরল হওয়ায় এই প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি সংখ্যক জীবের সৃষ্টি হয়। কোনও সবল উদ্ভিদ অ্যাপোমিক্সিসের সাহায্যে খুব দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে এবং এর ফলে ঐ একই জেনেটিক গঠনযুক্ত অনেক সবল উচ্চ প্রাণশক্তিযুক্ত উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। এই উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে আইসোজীনীয় ক্লোন (isogenic clone) বলে। Babcock ও Stebbins-এর গবেষণা থেকে জানা যায় যে, উত্তর আমেরিকার *Crepis*-এর ডিপ্লয়েড যৌন জননকারী প্রজাতির তুলনায় পলিপ্লয়েড অ্যাপোমিক্টদের বিস্তার অনেক বেশি। *Taraxacum*-এর যৌন জননকারী প্রজাতি সবল অ্যাপোমিক্ট প্রজাতির সাথে প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য হয়।

(2) যেখানে প্রজাতিগুলির মধ্যে সংকরণ (hybridization) বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, সেখানে অ্যাপোমিক্সিস হেটারোজাইগাস অবস্থাকে স্থায়ী করতে সাহায্য করে। Darlington-এর (1939) মতে, অ্যাপোমিক্সিসের মাধ্যমে অনুর্বর উদ্ভিদ বা প্রাণীর জনন সম্ভবপর হয়। হিমালয়ের বেশিরভাগ অ্যাপোমিক্ট ফার্ণই (*Pellaea sagittata, P. atropurpurea, Adiantum lummlatum, Drypteris atrata, D. remota, D. borreri* ইত্যাদি) ট্রিপ্লয়েড (Mehra 1961)। এর থেকে বোঝা যায় যে, সংকরণের ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদকে স্থায়ী করার ক্ষেত্রে অ্যাপোমিক্সিসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

(3) পলিপ্লয়েড যেমন, ট্রিপ্লয়েড (3n) ও পেন্টাপ্লয়েড (5n) ইত্যাদিতে মায়োসিস অনিয়মিত হয়। এজন্য এরকম উদ্ভিদ অনুর্বর হয়। অপুংজনির দ্বারা এরকম উদ্ভিদ সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে।

(4) অ্যাপোমিক্ট উদ্ভিদে প্রাকৃতিক নির্বাচনের (natural selection) ফলে অসফল জিন গোষ্ঠী বাতিল হয়ে যায়।

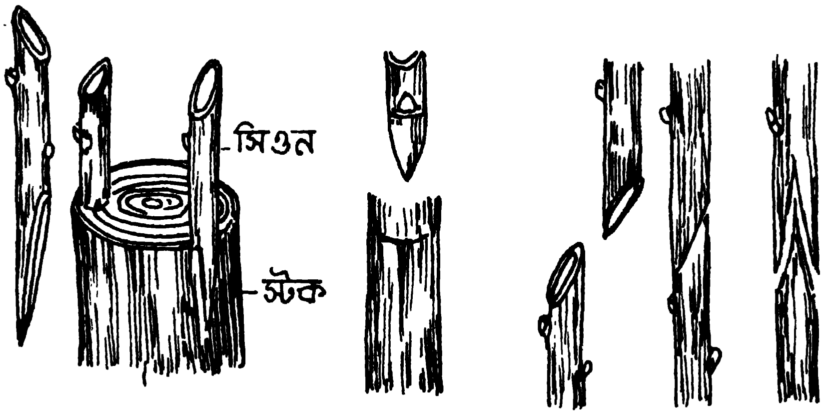
(5) অপুংজনির মাধ্যমে মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট সুবিধাজনক প্রকারণবিশিষ্ট জীব সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এভাবে মিউটেশনটি সংরক্ষিত হয়।

(6) কোনও কোনও জীবে পারথেনোজেনেসিস সেক্স নির্ধারণ করে। মৌমাছি, পিঁপড়া, প্রভৃতিতে ডিম্বাণু নিষিক্ত হলে স্ত্রী পতঙ্গের ও পারথেনোজেনেসিস হলে পুরুষ পতঙ্গের সৃষ্টি হয়।

(7) অ্যাগামোস্পার্মির (agamospermy) মাধ্যমে সৃষ্ট জীবের প্রাণশক্তি সাধারণত বেশি হয়।

(8) অপুংজনির দ্বারা একই রকম জেনোটাইপযুক্ত অনেক জীবের সৃষ্টি হয়।

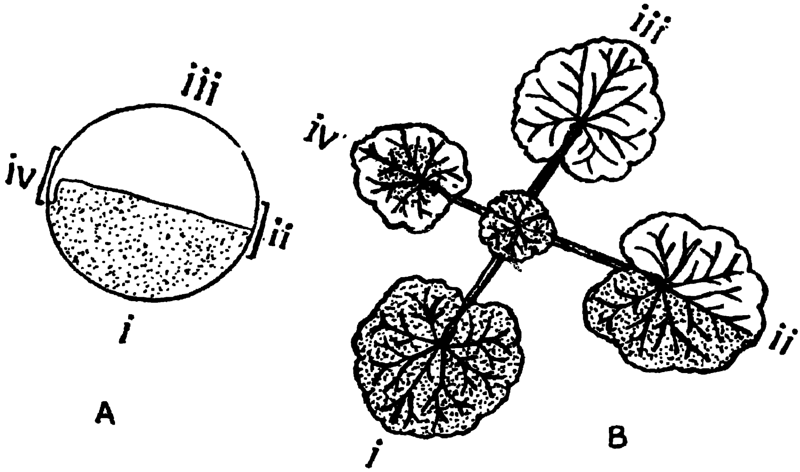
(9) অ্যাপোমিক্ট জীবের অনেক সুবিধা থাকলেও এখানে বিভিন্ন জিনের নতুন সংযোগ অর্থাৎ জেনেটিক রিকমবিনেশন (genetic recombination) হতে পারে না বলে এরা পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে না। অ্যাপোমিক্টদের জেনেটিক গঠন কোনও একটি বিশেষ পরিবেশের পক্ষে উপযোগী থাকে এবং ঐ পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে এইসব জীব সাধারণত বিলুপ্ত হয়।



চিত্র—70

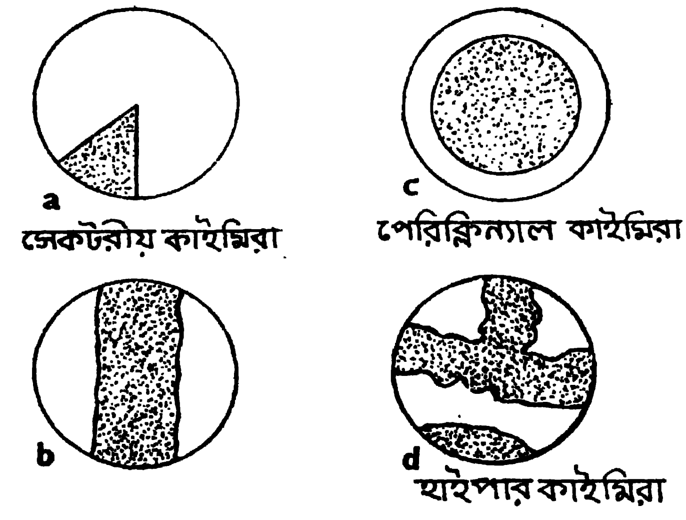
গ্রাফটিং বা কলম করার বিভিন্ন পদ্ধতি

কোনও কোনও উদ্ভিদে যেমন *Rubus, Poa, Potentila* ইত্যাদিতে অ্যাপোমিক্সিস ও যৌন জনন পর্যায়ক্রমে হয়। এখানে যৌন জননের ফলে রিকমবিনেশন হয় ও অ্যাপোমিক্সিসের মাধ্যমে এরা সহজেই সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এইসব উদ্ভিদ যৌন জনন এবং অ্যাপোমিক্সিসের সব সুবিধা পায়। Clausen-এর (1945) মতে, সম্পূর্ণ অ্যাপোমিক্সিস সচরাচর দেখা যায় না। অধিকাংশ উদ্ভিদেই অ্যাপোমিক্সিস আংশিক হয় এবং পরিবেশের ওপর নির্ভর করে কোনও উদ্ভিদ এক সময় যৌন উপায়ে এবং অন্য সময় অ্যাপোমিক্সিসের মাধ্যমে জনন সম্পন্ন করে।



চিত্র—71

Pelargonium zonale-এ সেকটরীয় কাইমিরার ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন রকমের পাতা
A-র i, ii, iii ও iv অংশ থেকে যথাক্রমে B-র i, ii, iii ও iv পাতার সৃষ্টি হয়েছে।



চিত্র—72

বিভিন্ন ধরনের কাইমিরা

গ্রাফটিং (grafting) ও কাইমিরা (chimaera)

মিশ্র জেনেটিক গঠনযুক্ত উদ্ভিদকে কাইমিরা বলে। এই রকম উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। গ্রাফটিং বা কলম করে chimaera-র সৃষ্টি করা যায়। কোনও একটি গাছকে অন্য আরেকটি গাছের উপর কলম করলে প্রথমোক্ত গাছকে সীওন (scion) ও শেষোক্ত গাছকে স্টক (stock) বলে (চিত্র 70)। এই দু'টি উদ্ভিদের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমীয় সংযোগ স্থাপিত হয়। যেসব শাখা stock ও scion উভয় কোষ থেকে তৈরি হয়, তাদের জেনেটিক গঠন মিশ্র ধরনের হয় অর্থাৎ ঐ শাখাগুলি কাইমিরীয় ধরনের। এই সব শাখা অঙ্গজ জননের মাধ্যমে কাইমিরীয় উদ্ভিদের (চিত্র 71) সৃষ্টি করে। মিশ্র জেনেটিক গঠনের প্রাণীকে মোজাইক (mosaic) বলে। পতঙ্গের গাইন্যানড্রমর্ফে (gynandromorph) দেহের এক অংশ স্ত্রী, বাকি অংশ পুরুষের মত হয়। কলম ছাড়াও অনেক সময় মিউটেশনের জন্য যেসব কাইমিরার সৃষ্টি হয়, তাদের ক্রোমোসোমীয় কাইমিরা বলে। যেসব কাইমিরায় দু'টির চেয়ে বেশি জেনেটিক গঠনের কোষ থাকে, তাদের **পলিক্লিন্যাল কাইমিরা** (polyclinal chimaera) বলে। স্টক ও সীওনের কোষের বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে কাইমিরাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—

1. **সেকটরীয় কাইমিরা** (sectorial chimaera)— এখানে দুই রকমের জেনেটিক গঠনের টিস্যু দু'টি নির্দিষ্ট অঞ্চলে থাকে। টিস্যু দু'টি চিত্র 71A এবং 71a, b অনুসারে বিভিন্নভাবে সাজান থাকতে পারে।

2. **পেরিক্লিন্যাল কাইমিরা** (periclinal chimaera)— এক রকমের জেনেটিক গঠনের টিস্যুকে অন্য রকমের জেনেটিক গঠনের টিস্যু সম্পূর্ণভাবে আবৃত রাখলে, ঐ কাইমিরাকে periclinal chimaera বলে (চিত্র 72c)।

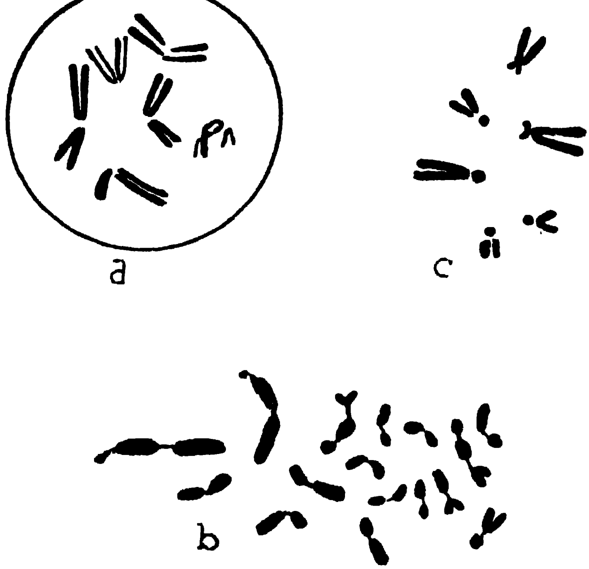
3. **হাইপার-কাইমিরা** (hyper-chimaera)— এখানে স্টক ও সীওনের কোষগুলি এলোমেলোভাবে মিশে থাকে (চিত্র 72d)।

কাইমিরায় স্টক ও সীওনের কোষগুলি পাশাপাশি থাকলেও, তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন থাকে। স্টক সীওনকে খাদ্য ও জল সরবরাহ করে এবং ফুলের আকার, পুষ্পোৎপাদনের সময় ও উর্বরতাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু উদ্ভিদ দু'টি পরস্পরকে জেনেটিকভাবে প্রভাবিত করে না।

অষ্টম অধ্যায়

ক্রোমোসোম (Chromosome)

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের (Strasburger (1875) Bütschli, Balbiani, Pfitzner, von Benedén, Bovari প্রভৃতি) গবেষণার ফলে ক্রোমোসোম আবিষ্কৃত হয়েছিল। Waldeyer 1888 খ্রিস্টাব্দে ক্রোমোসোম শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। ক্রোমোসোম শব্দের অর্থ হল, বর্ণযুক্ত বস্তু (Gr., chrom— বর্ণ ও soma— দেহ)। বিশেষ প্রক্রিয়ায় এদের রঞ্জিত করা যায় বলেই এই নাম। ক্রোমোসোম বেসিক রঙ (dye) দিয়ে রঞ্জিত করা যায়। কোষ বিভাজনের



চিত্র—73

a– *Tradescantia paludosa*-এ প্রথম মেটাফেজ n = 6টি ক্রোমোসোম,

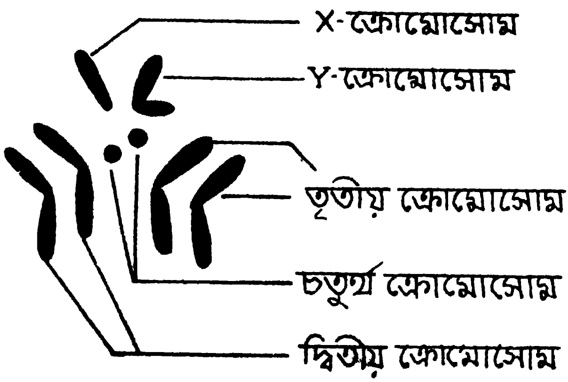
b–*Punica granatum*-এ মেটাফেজ 2n = 16টি ক্রোমোসোম (Guha),

c– *Pterotheca falconeri*-তে মেটাফেজ 2n = 6টি ক্রোমোসোম

সময় ক্রোমোসোমগুলি যথাযথভাবে বিভাজিত হয়। অনেকবার বিভাজনের পরেও ক্রোমোসোমের সব ধর্মই অপরিবর্তিত থাকে। *Drosophila*-র ওপর Morgan-র

গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে, ক্রোমোসোমই হল বংশধারার বাহক।

যে কোনও জীবের প্রত্যেক দেহ কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা একই থাকে। তবে কখনও কখনও এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। দেহ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যাকে সোমাটিক (somatic, soma = দেহ) সংখ্যা বলা হয়। সাধারণত দেহ কোষে বিভিন্ন ধরনের প্রত্যেক ক্রোমোসোমের একটি জোড়া থাকে। এই রকমের কোষকে ডিপ্লয়েড (2n) কোষ বলে। জনন কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা দেহ কোষের সংখ্যার অর্ধেক হয় অর্থাৎ জনন কোষ হল হ্যাপ্লয়েড (n)। পেঁয়াজের (*Allium cepa*) পরাগরেণু (pollen) ও ডিম্বাণুর (egg) ক্রোমোসোম সংখ্যা হল আট ও এর দেহ কোষে ষোলটি ক্রোমোসোম দেখা যায়, যেমন— ভুট্টার (*Zea mays*) ক্রোমোসোম সংখ্যা 2n=20, গম (*Triticum aestivum*)-এ 2n=42, *Trillium*-এ 2n=10, *Tradescantia*-এ 2n=12,6 (চিত্র 73a), *Punica granatum*-এ 2n=16 (চিত্র 73b), *Pterotheca falconeri*-তে 2n=6 (চিত্র 73c), *Datura*-এ 2n=12. *Drosophila melanogaster*-এ 2n=8 (চিত্র 74a) এবং মানুষে 2n=46 ইত্যাদি। সবচেয়ে কম ক্রোমোসোম সংখ্যা পাওয়া যায় *Ascaris megalocephala* (= *Parascaris equorum*) নামের প্রাণীতে। এদের ক্রোমোসোম সংখ্যা হল n=1। Compositae গোত্রের উদ্ভিদ *Haplopappus gracilis*-এর হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোম সংখ্যা হল n = 2। আবার কোনও কোনও জীবের একটি কোষে হাজারের চেয়ে বেশি ক্রোমোসোম দেখা যায়। *Ophioglossum petiolatum*-এর হ্যাপ্লয়েড সংখ্যা 510। এছাড়া অন্য অনেক ফার্ণেও খুব বেশি ক্রোমোসোম সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে।



চিত্র—74

Drosophila melanogaster-এ 2n = 8টি ক্রোমোসোম

কোনও উদ্ভিদ বা প্রাণীর একটি নিউক্লিয়াসে যেসব বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোসোম থাকে, তাদের এক সাথে ক্রোমোসোম কমপ্লিমেন্ট (chromosome complement)

বা ক্রোমোসোম সমষ্টি বলে। সবচেয়ে সাধারণ ক্রোমোসোম কমপ্লিমেন্টে বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোসোম প্রত্যেকটি একটি করে থাকে। অর্থাৎ, এখানে ওই জীবের ভিন্ন ভিন্ন জিনের কেবল একটি সম্পূর্ণ সেট (set) থাকে। এই রকমের ক্রোমোসোম কমপ্লিমেন্টকে জিনোম (genome) বলে। উদ্ভিদে প্রাচীন (primitive) ধরনের জিনোমে সাতটি ক্রোমোসোম থাকে।

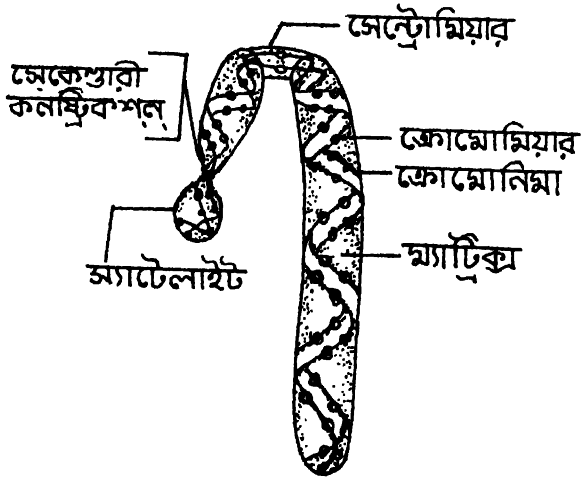
যে প্রাথমিক ক্রোমোসোম সংখ্যা থেকে কোনও একটা পলিপ্লয়েড প্রাণী বা উদ্ভিদ তৈরি হয়েছে, সেই সংখ্যাকে basic number বা মূল সংখ্যা (x) বলে। গমের বিভিন্ন প্রজাতির ক্রোমোসোম সংখ্যা হল $n = 7, 14, 21$ ইত্যাদি। অতএব, গমের মূল বা বেসিক সংখ্যা হল 7। $2n = 28, 42$ ক্রোমোসোমযুক্ত গমের প্রজাতি দু'টি যথাক্রমে টেট্রাপ্লয়েড (4n) ও হেক্সাপ্লয়েড (6n)।

ক্রোমোসোমের গঠন

ক্রোমোসোমে সর্পিলভাবে পেঁচান লম্বা সূক্ষ্ম সূত্র অর্থাৎ ক্রোমোনিমা (chromonema, Pl, chromonemata) থাকে। Vejdovsky 1912 খ্রিস্টাব্দে ক্রোমোনিমা নামকরণ করেন। ক্রোমোনিমা অঞ্চলে জিনগুলি থাকে। প্রত্যেক ক্রোমোসোমে দুইটি ক্রোমোনিমা থাকে। ক্রোমোনিমাদ্বয় দৃঢ়ভাবে পেঁচান থাকায় একটি সূত্র বলে মনে হয়। এর প্রস্থ 800Å। প্রত্যেক ক্রোমোনিমায় আটটি মাইক্রোফাইব্রিল থাকে। একটি মাইক্রোফাইব্রিল 60–100Å চওড়া। এগুলি DNA-র ডাবল হেলিক্স দিয়ে তৈরি। প্রোটিন সমেত DNA সূত্র 30-60Å চওড়া। কিন্তু প্রোটিন ছাড়া DNA অণু 20Å স্থূল। পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি DNA সূত্রের মধ্যে 25Å ব্যবধান থাকে।

ক্রোমোনিমার চারিদিকে ম্যাট্রিক্স থাকে (চিত্র 75)। Darlington ও Ris ও অন্যান্য কিছু বিজ্ঞানীগণ ম্যাট্রিক্সের উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ম্যাট্রিক্সের উপস্থিতিকে সমর্থন করে। ইন্টারফেজে ম্যাট্রিক্স সুগঠিত থাকে না। প্রফেজের প্রথম দিকে এটা খুব হালকা রঙ নেয়। কিন্তু প্রফেজের শেষ দিকে কিংবা মেটাফেজে ম্যাট্রিক্স ঘনীভূত (condensed) অবস্থায় থাকে ও গাঢ় রঙ নেয়। ম্যাট্রিক্সের বাইরের দিকে একটা আবরণ থাকে। এই আবরণকে সীদ (sheath) বলে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন গবেষণা কিন্তু সীদের উপস্থিতি সমর্থন করে না। কোষ বিভাজনের সময় ম্যাট্রিক্স ক্রোমোনিমাকে সীমানার মধ্যে রাখে ও কোষ বিভাজন যথাযথভাবে হতে সাহায্য করে। ম্যাট্রিক্সে কোনও জিন থাকে না, জিনগুলি ক্রোমোনিমায় থাকে। ম্যাট্রিক্স জিনগুলির চারিদিকে একটা আবরণ সৃষ্টি করে ও জিনগুলিকে রক্ষা করে। ফালগেন বর্ণ (Feulgen stain) দিয়ে ম্যাট্রিক্স রঙ করা যায়। Mc Clintock-এর (1934) মতে, নিউক্লিওলাস ম্যাট্রিক্স গঠনকারী পদার্থ সরবরাহ করে। নিউক্লিওলাস যত ছোট হয়, ম্যাট্রিক্স ততই পূর্ণতা লাভ করে। টেলোফেজে নিউক্লিওলাস ম্যাট্রিক্সীয় পদার্থ থেকেই সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশনের প্রভাবে পুনর্গঠিত

হয়। প্রফেজে ক্রোমোসোমগুলি লম্বালম্বিভাবে বিভাজিত হয়। ক্রোমোসোমের এই লম্বালম্বি অর্ধাংশকে ক্রোমাটিড (chromatid) বলে। একটি



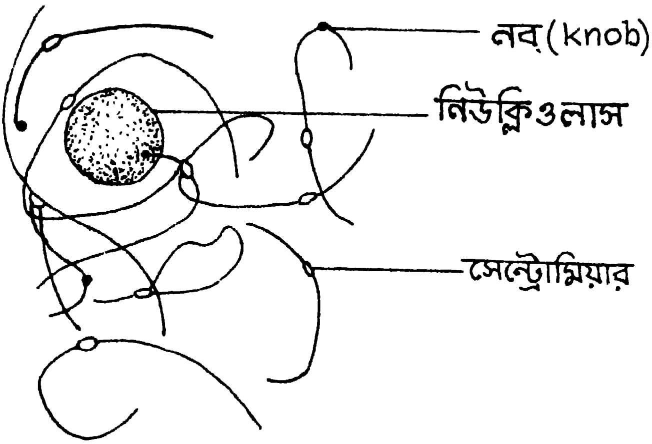
চিত্র—75

ক্রোমোসোমের গঠন

ক্রোমোসোমে এক বা একাধিক ক্রোমোনিমাটা থাকে। প্রতি ক্রোমোসোমে ক্রোমোনিমাটার সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে অ্যানাফেজে প্রত্যেক ক্রোমোসোমে অন্তত 2টি ক্রোমোনিমা থাকে। Trosko ও Wolff (1964) মনে করেন যে, প্রত্যেক ক্রোমোসোমে চারটি ক্রোমানিমাটা থাকে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে একটা ক্রোমোসোমে অনেকগুলি সূত্র (128 বা 256) দেখা গিয়েছে। *Tradescantia*-র লেপ্টোটিন অবস্থায় প্রত্যেক ক্রোমোসোমে কতকগুলি সূত্র দেখা গিয়েছে। এই সূত্রগুলিকে মাইক্রোফাইব্রিল (microfibril) বলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাইক্রোফাইব্রিল আবার বিভাজিত হয়ে দু'টি সাব-ফাইব্রিল (sub-fibril) গঠন করে। এদের ব্যাস 24-40Å। Swanson (1946), La Cour ও Rautishauser (1954), Crouse (1954), Sax ও King (1955) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা ক্রোমোসোমের বহুসূত্র প্রকৃতি সমর্থন করেছেন। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়েছে যে, প্রত্যেক ক্রোমোনিমায় অনেকগুলি মাইক্রোফাইব্রিল থাকে ও এদের ব্যাস মোটামুটি 60Å। মাইক্রোফাইব্রিলের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। ইন্টারফেজে প্রত্যেক ক্রোমোসোমে অন্তত দুই গোছা (bundle) মাইক্রোফাইব্রিল থাকে। পরাগ

রেণুতে (pollen grain) ইন্টারফেজ অবস্থায় রঞ্জনরশ্মি (X-ray) প্রয়োগ করলে ক্রোমোসোমগুলিকে অখণ্ডিত মনে হয়, কিন্তু প্রফেজে ক্রোমোসোমগুলিকে দ্বিখণ্ডিত দেখায় (Sax 1941)। Huskin-এর (1947) মতে, বহুসূত্রযুক্ত ক্রোমোসোম দ্বি-সূত্রযুক্ত ক্রোমোসোমের মত আচরণ করে কারণ, কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমাটিডই হল ক্রোমোসোমের কার্যকরী একক।

1875 খ্রিস্টাব্দে Balbiani দেখেছিলেন যে, ক্রোমোনিমাটা পুঁতির মালার মত। এই পুঁতির মালার মত অংশকে **ক্রোমোমিয়ার** বলে। স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসোমে ও ল্যাম্পব্রাস (lampbrush) ক্রোমোসোমে ক্রোমোমিয়ারগুলিকে ভালভাবে দেখা যায়। Ris-এর (1945) মতে, ক্রোমোনিমার পেঁচগুলি যেখানে খুব পাশাপাশি থাকে, সেখানে ক্রোমোমিয়ার দেখা যায়। কারণ, যদি একটি ক্রোমোনিমাকে টানা যায়, তাহলে ক্রোমোমিয়ারগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। Kaufmann-এর (1948) মতে, ক্রোমোমিয়ার অংশে নিউক্লিক অ্যাসিড বা নিউক্লিওপ্রোটিন প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়। Belling (1928) বলেছিলেন যে, এই ক্রোমোমিয়ার অংশেই জিনগুলি অবস্থিত। কিন্তু পরে দেখা গিয়েছে যে, কোনও কোনও জিন ক্রোমোমিয়ার অংশে থাকে। আবার অন্যান্য জিন অক্রোমোমিয়ারীর অংশে পাওয়া যায়।



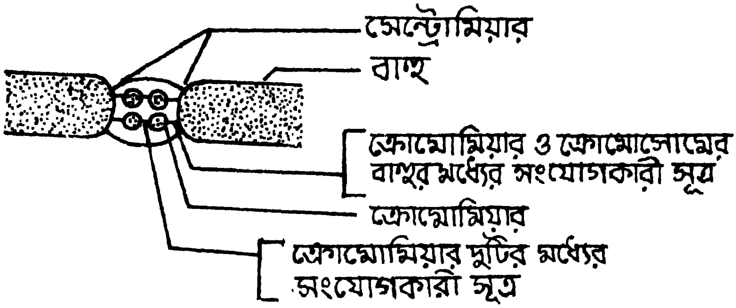
চিত্র—76

ভুট্টার প্যাকিটিন অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি ও নিউক্লিওলাস দেখা যাচ্ছে

প্রত্যেক ক্রোমোসোমের একটা বিশেষ স্থান সঙ্কুচিত (প্রাথমিক সঙ্কুচিত স্থান বা primary constriction) ও বর্ণহীন থাকে। এই স্থানকে **সেন্ট্রোমিয়ার** (centromere) বা মুখ্য খাঁজ বা কাইনোমিয়ার (kinomere) বলা হয়। সেন্ট্রোমিয়ারের দুই দিকে ক্রোমোসোমের অংশকে বাহু বা arm বলে। সেন্ট্রোমিয়ারই কোষ বিভাজনের সময় স্পিন্ডিলে ক্রোমোসোমের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ, স্পিন্ডিল তন্তুর সাথে

ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলটাই যুক্ত থাকে। ক্রোমোসোমীয় স্পিন্ডিল তন্তুর মাইক্রোটিউবিউল সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলের সাথে যুক্ত থাকে। ভুট্টার প্যাকিটিন অবস্থায় সেন্ট্রোমিয়ার বর্ণহীন ও ডিম্বাকৃতি দেখায় (Mc Clintock 1939) (চিত্র 76)। Darlington-এর (1965) মতে, সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে কতকগুলি একই রকম জিন থাকে।

সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে মাইক্রোটিউবিউল গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন টিউবিউলিনের (tubulin) পলিমার গঠিত হয়। এটা প্রোমেটাফেজ ও মেটাফেজে সম্ভবত স্পিন্ডিল তন্তু গঠনে সাহায্য করে।



চিত্র—77

সেন্ট্রোমিয়ারের গঠন (ক্রোমাটিড দেখান হয়নি)

Tradescantia-এ মায়োসিস বিভাজনের মেটাফেজ ও অ্যানাফেজে ও অ্যানাফেজের প্রারম্ভে সেন্ট্রোমিয়ারে কতকগুলি ক্রোমাটিন দানা (chromatin granules) ও সংযোগকারী সূত্র দেখা যায়। Tjio ও Levan (1950) উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর সেন্ট্রোমিয়ারের গঠন বর্ণনা করেছেন। মেটাফেজে সেন্ট্রোমিয়ারের গঠন (চিত্র 77) হল— (a) চারটি অনুরূপ অর্থাৎ একই রকম ক্রোমোমিয়ার, (b) প্রত্যেক ক্রোমাটিডের দু'টির মধ্যের সংযোগকারী সূত্র, (c) ক্রোমোমিয়ার ও ক্রোমোসোমের বাহুর মধ্যে সংযোগকারী সূত্র। Lima-de-Faria (1958) বলেন যে, দু'টি ক্রোমোমিয়ারের মধ্যের সংযোগকারী সূত্রে ও ক্রোমোমিয়ার ও ক্রোমোসোমের বাহুর মধ্যে সংযোগকারী সূত্রে ছোট ছোট ক্রোমোমিয়ার থাকে। 1966 খ্রিস্টাব্দে Gall বলেন যে, বড় ক্রোমোমিয়ারগুলি দুই বা ততোধিক ক্রোমোমিয়ারের সংযোগে তৈরি। ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়েছে যে, সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল থেকে এক গুচ্ছ (bundle) মাইক্রোটিউবিউল (microtubule) উৎপন্ন হয় ও ক্রোমোসোমকে স্পিন্ডিলের সাথে যুক্ত করে। সুতরাং, সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে প্রত্যেক ক্রোমাটিডে কতকগুলি ছোট ছোট ক্রোমোমিয়ার এক বা একাধিক সূত্র দিয়ে যুক্ত থাকে। এই সূত্রগুলি থেকে মাইক্রোটিউবিউলগুলি বের হয় ও লুপ (loop) বা ফাঁস গঠন করে।

ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সেন্ট্রোমিয়ারের গঠন পরীক্ষা করা হয়েছে। সেন্ট্রোমিয়ারকে প্রাথমিক সঙ্কুচিত স্থানের উপর চাকতির মত দেখায়। এর ব্যাস হল 0.20–0.25μ। সেন্ট্রোমিয়ারে তিনটি অঞ্চল দেখা যায়। এগুলি হল—

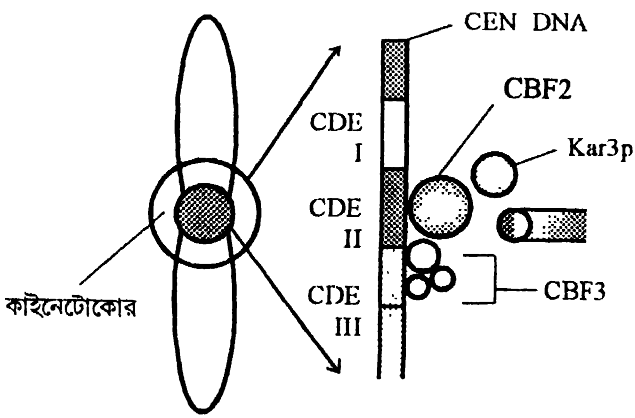
a) ইলেকট্রন ঘন (dense) স্তর — এটি 30–40nm চওড়া উত্তল বাইরের অংশ। স্পিন্ডিলের মাইক্রোটিউবিউলগুলি এই অঞ্চলের সাথে যুক্ত থাকে।

b) অপেক্ষাকৃত কম ঘন ভিতরের স্তর— এটি 15-30nm চওড়া। এই স্তর বাইরের ইলেকট্রন ঘন স্তর ও ক্রোমাটিন সূত্রের মাঝে থাকে।

c) ইলেকট্রন ঘন করনা (corona) — এই অঞ্চলে ক্রোমাটিন সূত্র থাকে। সেন্ট্রোমিয়ারের বাইরের যে প্লেটের মত অঞ্চলের সাথে স্পিন্ডিল তন্তু যুক্ত থাকে, সেই অঞ্চলকে কাইনেটোকোর (kinetochore) বলা হয়।

কাইনেটোকোরের গঠন জটিল। এখানে তিন স্তর চাকতির আকারের প্রোটিনযুক্ত প্লেট থাকে। ভিতরের চাকতিটি 40-60nm চওড়া। এখানে ঘনীভূত ক্রোমাটিন থাকে। বাইরের চাকতিটি তন্তুযুক্ত ও 40-60nm চওড়া। 25-30nm ব্যাসযুক্ত মধ্যবর্তী স্তরটি বাইরের ও ভিতরের স্তরকে যুক্ত রাখে।

কাইনেটোকোরের অবস্থান ক্রোমোসোমের একটি বিশেষ DNA দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই DNA-কে সেন্ট্রোমিয়ারীয় DNA (CEN DNA) বলে। ইস্টে সেন্ট্রোমিয়ারীয় DNA-এর তিনটি অঞ্চল রয়েছে— সেন্ট্রোমিয়ারীয় DNA-র উপাদান (element) বা CDE I, II এবং III। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে CDE II ও III মাইক্রোটিউবিউলের সাথে মিথষ্ক্রিয়াকে সহায়তা করে। এজন্য সেন্ট্রোমিয়ার বন্ধনকারী ফ্যাক্টর CDF 2 এবং CDF 3 এবং কাইনেসিন সম্পর্কিত প্রোটিন Kar^3p প্রয়োজন। CDE I এজন্য প্রয়োজন হয় না।



চিত্র—78

ইস্টের সেন্ট্রোমিয়ার ও কাইনেটোকোরের গঠন

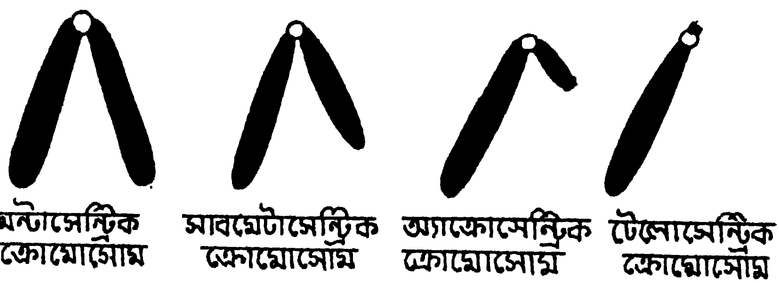
মেটাফেজ ও অ্যানাফেজের ক্রোমোসোমের আকৃতি সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে ক্রোমোসোমের শ্রেণী বিভাগ করা হয়।

1) সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোসোমের মাঝামাঝি থাকলে ওই ক্রোমোসোমকে মেটাসেন্ট্রিক (metacentric) বা মধ্যবর্তী সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম বলে। এদের বাহু দু'টি সমান বা মোটামুটি সমান হয়। অ্যানাফেজে এই রকমের ক্রোমোসোম 'V' আকৃতির দেখায় (চিত্র 79)।

2) সেন্ট্রোমিয়ার ঠিক মাঝামাঝি না থেকে একটু পাশের দিকে থাকলে, ওই ক্রোমোসোমকে সাবমেটাসেন্ট্রিক (submetacentric) ক্রোমোসোম বলে (চিত্র 79)। অ্যানাফেজে এই ধরনের ক্রোমোসোম 'L' আকৃতির দেখায়।

3) সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোসোমের প্রান্তের দিকে থাকলে, ওই ক্রোমোসোমকে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক (acrocentric) বা উপপ্রান্তীয় সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম বলে। অ্যানাফেজে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম 'J' আকৃতির দেখায় (চিত্র 79)।

4) ক্রোমোসোমের প্রান্তে যদি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে, তবে ওই ক্রোমোসোমকে টেলোসেন্ট্রিক (telocentric) বা প্রান্তীয় সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম বলে। অ্যানাফেজে এই ক্রোমোসোম I-আকৃতির বা দণ্ডাকৃতির (rod) হয় (চিত্র 79)। সত্যিকারের টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম সচরাচর দেখা যায় না। প্রায় সব ক্ষেত্রেই সেন্ট্রোমিয়ারের অপর প্রান্তে একটা খুব ছোট বাহু থাকে।



চিত্র—79

বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোসোম

যেসব ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে না, তাদের সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন বা অ্যাসেন্ট্রিক (acentric) ক্রোমোসোম বলে। এইসব ক্রোমোসোম সহজেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

সেন্ট্রোমিয়ারের ইনডেক্স থেকে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান বোঝা যায়। এই সূচক (index) নিচের সূত্র থেকে নির্ণয় করা যায়।

$$\text{সেন্ট্রোমিয়ারের সূচক বা F\%} = \frac{\text{ছোট বাহুর দৈর্ঘ্য} \times 100}{\text{ক্রোমোসোমের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য}}$$

সেন্ট্রোমিয়ারের সূচক বা F%

সেন্ট্রোমিয়ারের সূচক	ক্রোমোসোমের সঙ্কোচনের প্রকৃতি
50	মিডিয়ান বা মধ্যবর্তী
49. 99 – 37.51	প্রায় মধ্যবর্তী বা মিডিয়ান
37.5 – 25.01	প্রায় সাবমিডিয়ান (বা উপমধ্যবর্তী)
25	সাবমিডিয়ান বা উপমধ্যবর্তী
24.99 – 18.75	প্রায় সাবমিডিয়ান
18.74 – 12.51	প্রায় সাবটারমিন্যাল
12.5	সাবটারমিন্যাল বা উপপ্রান্তীয়
12.49 – 6.25	প্রায় সাবটারমিন্যাল (বা উপপ্রান্তীয়)
6.24 – 1.1	প্রায় প্রান্তীয়
1	প্রান্তীয় বা টারমিন্যাল

বাহুর অনুপাত

বাহুর অনুপাত থেকে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান জানা যায়।

দীর্ঘ (q) ও খর্ব (p) বাহুর অনুপাত	সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান
1.0	যথার্থ মধ্যবর্তী বা মিডিয়ান
1.7	মিডিয়ান
3.0	সাবমিডিয়ান বা উপমধ্যবর্তী
7.0	সাবটারমিন্যাল বা উপপ্রান্তীয়
0	প্রান্তীয় বা টারমিন্যাল

সাধারণত প্রত্যেক ক্রোমোসোমে কেবল একটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে (মোনোসেন্ট্রিক বা monocentric)। কিন্তু কিছু উদ্ভিদে (যেমন গম) দু'টি সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম দেখা গিয়েছে। এইসব ক্রোমোসোমকে ডাইসেন্ট্রিক (dicentric) বা দ্বিসেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম বলে। কোষ বিভাজনের সময় ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম যে কোনও একটা মেরুতে যেতে পারে কিংবা, 'ক্রোমোসোম সেতু' (bridge) গঠন করে। ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম সচরাচর দেখা যায় না। যেসব

ক্রোমোসোমে দু'টির চেয়ে বেশি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে, তাদের পলিসেন্ট্রিক (polycentric) বা বহু সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম বলে। প্রাণীতে *Ascaris megalocephala*-এ (*Parascaris equorum*) পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম পাওয়া গিয়েছে।

সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা যাই হোক না কেন, একটি ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান সাধারণত নির্দিষ্ট থাকে। ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট স্থানে সেন্ট্রোমিয়ার থাকলে তাদের লোকালাইজড (localized) বা স্থানিক সেন্ট্রোমিয়ার বলে। বেশিরভাগ উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে লোকালাইজড সেন্ট্রোমিয়ার দেখা যায়। কিন্তু কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীতে সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোসোমের সব অংশে ছড়ান থাকে। এই ধরনের সেন্ট্রোমিয়ারকে ডিফিউসড (diffused) বা পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার বলা হয়। এই রকম ক্রোমোসোমকে হলোসেন্ট্রিক (holocentric, holos-সম্পূর্ণ) ক্রোমোসোম বলে। Juncaceae গোত্রের উদ্ভিদ *Luzula perpurea*-তে বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ (Ostergren 1949, Brown 1954 এবং Malheiros, de Castro ও Camara 1974) ডিফিউসড সেন্ট্রোমিয়ার দেখেছিলেন। কিছু ছত্রাকে (Vaarama 1954), শৈবালে ও মসে ডিফিউসড সেন্ট্রোমিয়ার দেখা গিয়েছে। Ris (1970) Philanthus-এর পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোমে মাইক্রোটিউবিউল দেখতে পেয়েছিলেন।

Luzula-র সেন্ট্রোমিয়ার যে ডিফিউসড (diffused) বা পরিব্যাপ্ত ধরনের, তার প্রমাণ বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে পাওয়া যায়।

(1) রঞ্জন রশ্মি (X-ray) প্রয়োগ করলে *Luzula*-র ক্রোমোসোম কয়েকটি অংশে ভেঙে যায়। প্রত্যেকটি অংশ একটি স্বাধীন ক্রোমোসোমের মত আচরণ করে। সেন্ট্রোমিয়ারটি পরিব্যাপ্ত ধরনের হলেই কেবল এটা সম্ভব কারণ, সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অর্থাৎ অ্যাসেন্ট্রিক (acentric) ক্রোমোসোম স্থায়ী হয় না।

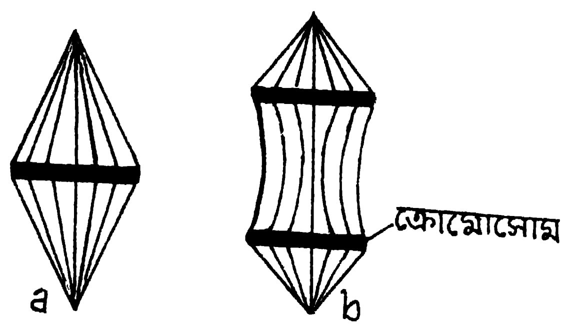
(2) ক্রোমোসোমের খণ্ডিত হওয়া অর্থাৎ ফ্র্যাগমেন্টেশনের (fragmentation) সাথে *Luzula*-র প্রজাতির বিবর্তন জড়িত। *L. perpurea*-র ক্রোমোসোম সংখ্যা 2n=6। কিন্তু উন্নত প্রজাতিগুলির ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 2n=12, 24, 48 ও 96 ইত্যাদি। দেখা গিয়েছে যে, *L. perpurea*-র ও বেশি ক্রোমোসোমযুক্ত উন্নত প্রজাতিগুলির ক্রোমাটিনের পরিমাণ সমান। কিন্তু যদি এইসব প্রজাতিগুলি পলিপ্লয়েড হতো তা হলে এদের ক্রোমাটিনের পরিমাণ *L. perpurea* তুলনায় বেশি হত। সব প্রজাতিগুলির ক্রোমাটিনের পরিমাণ সমান হওয়া থেকে বোঝা যায় যে, ফ্র্যাগমেন্টের মাধ্যমেই *Luzula*-র ক্রোমোসোমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(3) 2n=6টি ক্রোমোসোমযুক্ত *L. perpurea*-র সঙ্গে 2n=12টি ক্রোমোসোমযুক্ত উন্নত প্রজাতির *Luzula*-র সংকরণ করলে *L. perpurea*-র প্রত্যেকটা ক্রোমোসোমের সাথে অন্য প্রজাতির দু'টি ক্রোমোসোমের যুগ্মতা হয় এবং এর ফলে ট্রাইভ্যালেন্ট (trivalent) গঠিত হয়। উন্নত প্রজাতিটি ফ্র্যাগমেন্টেশনের মাধ্যমে সৃষ্টি

হলেই কেবল এটা সম্ভব।

(4) কোষ বিভাজনের সময় ডিফিউসড বা পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম স্পিন্ডিল তন্তুর সাথে তাদের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ধরে আটকে থাকে। এই ক্রোমোসোমগুলি সোজা থাকে ও মেরুর দিকে সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয় (চিত্র 80a, b)। সেন্ট্রোমিয়ারটি ক্রোমোসোমের সব অংশে ছড়ান থাকায় বাহু দু'টি আলাদাভাবে বোঝা যায় না। *Luzula*-এ ক্রোমোসোমের এরকম আচরণ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

Vaarama-র মতে, ডিফিউসড বা পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার হল প্রাচীন এবং এর থেকেই পরে লোকালাইজড (localized) বা স্থানিক সেন্ট্রোমিয়ারের সৃষ্টি হয়েছে।



চিত্র—80

স্পিন্ডিলে পরিব্যাপ্ত বা ডিফিউসড ক্রোমোসোমের আচরণ

a-মাইটোটিক বিভাজনের মেটাফেজ, b-মাইটোটিক বিভাজনের অ্যানাফেজে পরিব্যাপ্ত ক্রোমোসোমের সমান্তরাল পৃথকীকরণ

ক্রোমোসোমের বিবর্তনে ডিফিউসড বা পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার একটা ধাপ নির্দেশ করে। ক্রোমোসোমের বিবর্তনে প্রধান ধাপগুলি হল—

(a) মিক্সোফাইসী (Myxophyceae) বা নীলাভ সবুজ শৈবালে (blue-green algae) কোনও সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না। নিউক্লিয়াসের জায়গায় সেন্ট্রাল বডি (central body) থাকে। জেনেটিক পদার্থ সেন্ট্রাল বডিতে ছড়ান থাকে। সুতরাং, বিবর্তনের প্রথম দিকে জিনগুলি পরিব্যাপ্ত ছিল।

(b) কোনও কোনও শৈবালে (Conjugales) ও প্রাচীন ধরনের উচ্চশ্রেণীর

উদ্ভিদে ডিফিউসড সেন্ট্রোমিয়ার পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে যদিও জিনগুলি ক্রোমোসোমে অবস্থিত, কিন্তু এখানে সেন্ট্রোমিয়ার নির্দিষ্ট স্থানে থাকে না।

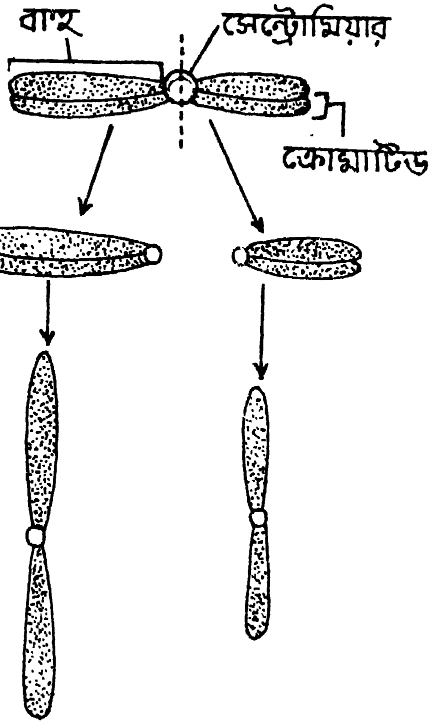
c) বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে দেখা যায়, কিছু উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান নির্দিষ্ট হলেও একাধিক সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। *Fritillaria* ও *Trillium*-এ একাধিক সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন (secondary constriction) ও হেটারোক্রোমাটিন (heterochromatin) দেখা যায়।

d) পরবর্তী ধাপে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্রোমোসোমে একটা সেন্ট্রোমিয়ার ও একটা সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন অঞ্চল থাকে।

Darlington 1940 খ্রিস্টাব্দে সেন্ট্রোমিয়ারের ভ্রান্ত বিভাজন (misdivision) বর্ণনা করেন। তিনি দেখেন যে, কখনও কখনও সেন্ট্রোমিয়ারটি লম্বালম্বিভাবে বিভাজিত না হয়ে পাশাপাশি বিভাজিত হয় (চিত্র 81)। সেন্ট্রোমিয়ারের এই রকমের বিভাজনকে misdivision বা ভ্রান্ত বিভাজন বা অপবিভাজন বলে। এই ধরনের বিভাজনের ফলে ক্রোমোসোমের একটা বাহুর দু'টি ক্রোমাটিড ও সেন্ট্রোমিয়ারের অর্ধেকটা নিয়ে একটা ক্রোমোসোম ও অন্য বাহুর দু'টি ক্রোমাটিড ও সেন্ট্রোমিয়ারের বাকি অর্ধেকটা নিয়ে আরেকটা ক্রোমোসোম গঠিত হয়। এই টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম স্থায়ী হয় কিংবা আইসো-ক্রোমোসোম (iso-chromosome) গঠন করে (চিত্র 81)। আইসো-ক্রোমোসোমের দুইটি বাহুর আকৃতি ও প্রকৃতি একই হয়। রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করলে কখনও কখনও সেন্ট্রোমিয়ারের ভ্রান্ত বিভাজন হয়।

কোনও কোনও ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার ছাড়া আরও একটি বর্ণহীন সঙ্কুচিত স্থান দেখা যায়। এই স্থানকে **সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন** (secondary constriction) বা গৌণ খাজ বলে (Heitz 1931)। সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন অঞ্চল ক্রোমোসোমের অন্য স্থানের সমান স্থূল, কিন্তু এই স্থানটি দুর্বল হয়। ইন্টারফেজ ও প্রফেজে সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন নিউক্লিওলাসের সাথে যুক্ত থাকে। এই স্থানকে নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চলও (nucleolar organizer) বলে। প্রফেজের শেষ দিকে নিউক্লিওলাস ক্রমশ অদৃশ্য হ'লে ক্রোমোসোমের যে স্থানে নিউক্লিওলাসটি যুক্ত ছিল, সে স্থানটি সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন হিসাবে দেখা দেয়। টেলোফেজে নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের ওই জায়গাতেই নিউক্লিওলাস পুনর্গঠিত হয়। যখন ক্রোমোসোমের প্রায় এক প্রান্তে সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন থাকে, তখন ক্রোমোসোমের প্রান্তের যে ছোট অংশ মূল ক্রোমোসোমের সাথে ক্রোমাটিন সূত্র দিয়ে যুক্ত থাকে, সেই অংশকে স্যাটেলাইট (satellite বা trabant) বলে। যেসব ক্রোমোসোমে স্যাটেলাইট থাকে, তাদের SAT ক্রোমোসোম বা স্যাটেলাইটযুক্ত ক্রোমোসোম বলে। ভুট্টার ষষ্ঠ ক্রোমোসোমে প্যাকিটিন অবস্থায় SAT ক্রোমোসোম ভালভাবে দেখা যায়। এছাড়া *Crinum*, *Aralia*, *Lagerstroenmia* ও অন্যান্য অনেক উদ্ভিদে স্যাটেলাইটযুক্ত ক্রোমোসোমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। যেসব ক্রোমোসোমে সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন একেবারে প্রান্তে থাকে (যেমন,

Microtus agrestis-এ), সেখানে এর উপস্থিতি সাধারণত বোঝা যায় না। তবে বিশেষ সিলভার স্টেইনিং পদ্ধতিতে রঞ্জিত করলে এরকম সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশনের উপস্থিতি বোঝা যায়।



চিত্র—81

সেন্ট্রোমিয়ারের ভ্রান্ত বিভাজন (misdivision), সেন্ট্রোমিয়ারের পাশাপাশি বিভাজনের ফলে আইসোক্রোমোসোম গঠিত হয়েছে

সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলের সাথে নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চলের পার্থক্য বোঝা যায়, কারণ কেবল সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলেই ক্রোমোসোমগুলি কোষ বিভাজনের সময় বেঁকে যায়। Kaufmann 1948 খ্রিস্টাব্দে বলেন যে, নিউক্লিওলাস গঠনের সাথে জড়িত নয় এমন সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন বিভিন্ন জীবে দেখা যায়। এইসব অঞ্চল ক্রোমোসোমের কুণ্ডলীকরণের (coiling) তারতম্য, নিউক্লিক অ্যাসিডের পরিমাণের পার্থক্য কিংবা দুর্বলতার জন্য হয়ে থাকে।

Darlington ও La Cour-এর (1938, 1940) মতে, খুব কম তাপমাত্রায় ক্রোমোসোমে সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন দেখা দিতে পারে। তাঁদের মতে, ক্রোমোসোমের এই সব অংশ হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরি। কম তাপমাত্রায় এরা যথাযথভাবে নিউক্লিক অ্যাসিড সৃষ্টি করতে পারে না ও হালকা রঙ নেয়।

নিউক্লিওলাস অঞ্চলে পুর্নবৃত্তিসম্পন্ন (repetitive) DNA থাকে। নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চল রাইবোসোমীয় RNA-র বড় বড় অণু (18s, 28s) গঠন করে, যা পরে রাইবোসোমে যুক্ত হয়।

মানুষের পাঁচটি ক্রোমোসোমে (13, 14, 15, 21 ও 22) সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন থাকে। সুতরাং, একটি ডিপ্লয়েড কোষে দশটি নিউক্লিওলাস দেখা যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক কোষে এর চেয়ে অনেক কম সংখ্যক নিউক্লিওলাস দেখা যায়। এর কারণ হল, নিউক্লিওলাসগুলির পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে।

সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন অঞ্চলের নিউক্লিওলাস গঠনের ক্ষমতা জিনের নিয়ন্ত্রণাধীন। Compositae গোত্রের *Crepis*-এর প্রত্যেক প্রজাতিতে ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট অঞ্চলে নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চল রয়েছে। প্রজাতির মধ্যে সংকরণ করলে কেবল একটি প্রজাতির নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চল কার্যকর থাকে, অন্যটি নিষ্ক্রিয় থাকে। এই অবস্থায় শেষোক্ত সেকেন্ডারী কনষ্ট্রিকশনটিও দেখা দেয় না। *Crepis*-এর বিভিন্ন প্রজাতিগুলি ডমিন্যান্সের ক্রমশ হ্রাস প্রাপ্তি অনুসারে সাজালে দেখা যায়— *C. parviflora* → *C. capillaris* → *C. tectorum* → *C. leontodonotoides*। সুতরাং, *C parviflora*-র নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চল অন্য সব প্রজাতির নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চলকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, যখন উভয়েই একই নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে।

প্রাথমিক সঙ্কুচিত স্থান (primary constriction) এবং গৌণ সঙ্কুচিত স্থানের (secondary constriction) মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়েছে। এগুলি হল—

i) সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন অঞ্চলে কাইনেটোকোর অনুপস্থিত।

ii) সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন অঞ্চল কোষ বিভাজনের মেটাফেজ এবং অ্যানাফেজে স্পিন্ডিল তন্তুর সাথে যুক্ত থাকে না।

iii) অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমগুলি প্রাইমারী কনস্ট্রিকশন অঞ্চলে বেঁকে যায়, কিন্তু সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন অঞ্চলে এরকম দেখা যায় না।

কোনও কোনও সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন অঞ্চলে 18s এবং 28s রাইবোসোমীয় RNA-র কোড বহনকারী জিন থাকে।

প্রত্যেক ক্রোমোসোমের প্রান্তে **টেলোমিয়ার** (telomere) থাকে। H. J. Muller 1938 খ্রিস্টাব্দে টেলোমিয়ার শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। টেলোমিয়ারের কতকগুলি বিশেষ চরিত্র আছে। কোনও ক্রোমোসোম ভেঙে গেলে ভগ্ন প্রান্তটি আরেকটি ভগ্ন প্রান্তের সাথে জোড়া লাগতে পারে, কিন্তু কখনও টেলোমিয়ারযুক্ত প্রান্তের সাথে জোড়া লাগে না। একটা টেলোমিয়ার কখনও আরেকটা টেলোমিয়ারের সাথে যুক্ত হয় না। ক্রোমোসোমের প্রান্তের টেলোমিয়ার অংশ বিনষ্ট হয়ে গেলে, ওই ক্রোমোসোমটি অস্থায়ী হয়।

কখনও কখনও ক্রোমোসোমের ভগ্ন অংশ পুনর্গঠিত হয়ে টেলোমিয়ার হিসাবে

কাজ করে। ভুট্টায় রেণুধর টিস্যুর কোষে ভগ্ন ক্রোমোসোমের এরকম আচরণ লক্ষ্য করা হয়েছে, কিন্তু সস্যের কোষে কিংবা লিঙ্গধর কোষে এরকম আচরণ দেখা যায়নি।

কোনও কোনও প্রজাতিতে টেলোমিয়ারের কিছু বিশেষ ধরনের আচরণ দেখা গেছে। *Drosophila melanogaster*-এর স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের কোষের পলিটেনি ক্রোমোসোমের টেলোমিয়ারের সাথে টেলোমিয়ারের আকর্ষণ দেখা যায়। এই আকর্ষণ অসমসংস্থ (non-homologous) প্রকৃতির।

হেটারোপ্টেরা ধরনের পতঙ্গের মায়োটিক বিভাজনের প্রফেজে X ও Y ক্রোমোসোমের মধ্যে সাইন্যাপসিস হয় না। কেবল টেলোমিয়ার অঞ্চলে অত্যন্ত স্বল্প সময় যুগ্মতা ('touch and go' pairing) হয়। এর ফলে অ্যানাফেজে X ও Y ক্রোমোসোম সহজেই আলাদা হতে পারে।

সব টেলোমিয়ারে 30-70 বেস জোড়ার পুনরাবৃত্তি (multiple repeats) থাকে। এই পুনরাবৃত্তি প্রজাতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট। যেমন, মানুষে এই ক্রম হল TTAGGG এবং উদ্ভিদ *Arabidopsis thaliana*-এ TTAGGG ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রজাতিতে এই ক্রমের পার্থক্য থাকলেও, সব প্রজাতিতে মূল পুনরাবৃত্তির প্যাটার্ন একই রকমের অর্থাৎ 5' $T_{1\text{-}4}A_{0\text{-}1}G_{1\text{-}8}$3'।

টেলোমিয়ারে DNA-র দু'টি সূত্র কোভ্যালেন্ট বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকতে পারে এবং একটি উপপ্রান্তীয় খাঁজ থাকে অথবা টেলোমিয়ার এক সূত্রযুক্ত 3' প্রান্ত বিশিষ্ট হতে পারে (3' overhang)। এখানে G-প্রাচুর্যযুক্ত (G.rich) সূত্রটি 12-16টি নিউক্লিওটাইড পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এটি C-প্রাধান্যযুক্ত অঞ্চলের পরে থাকে। DNA-র এই উদ্গত একক সূত্রকে DNA প্রাইমার বলে।

টেলোমিয়ারের ক্রমগুলি উৎসেচক টেলোমা: জ বা টেলোমিয়ার টারমিন্যাল ট্রান্সফারেজ প্রভাবে যুক্ত হয়। টেলোমারেজ একটি রাইবোনিউক্লিও প্রোটিন। এতে একটি ছোট RNA থাকে, যা G-প্রাচুর্য্যযুক্ত পুনরাবৃত্তি সম্পন্ন ক্রমের ছাঁচ হিসাবে কাজ করে। এই ছাঁচের নির্দেশ অনুসারে DNA-র 3' প্রান্তে নিউক্লিওটাইডগুলি যুক্ত হতে থাকে। সুতরাং, টেলোমারেজ হল রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ, যা RNA-র ছাঁচ থেকে DNA-র ক্রম গঠন করে। DNA-র G-প্রাচুর্য্যযুক্ত সূত্রটি ভাঁজ হয়ে চুলের কাটার মত গঠন (hair pin) সৃষ্টি করে, অথবা চার সূত্র যুক্ত DNA লুপ গঠন করে।

টেলোমিয়ারের প্রধান তিনটি কাজ হল—

i) সূত্রাকার DNA অণুর প্রান্তকে এক্সোনিউক্লিয়েজেস দ্বারা বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে।

ii) টেলোমিয়ার অন্য DNA-র প্রান্তের সাথে সংযুক্তি রোধ করে।

iii) এটি DNA অণুর প্রান্তের রেপ্লিকেশনে সহায়তা করে।

ক্রোমোসোমের সূক্ষ্ম গঠন (Ultra-structure)

উচ্চশ্রেণীর জীবের ক্রোমোসোমের সূক্ষ্ম গঠন ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন মত রয়েছে।

(a) **বহুসূত্রযুক্ত** (multistranded) **মডেল**— কোনও কোনও বিজ্ঞানীর মতে, প্রত্যেক ক্রোমোসোমে অন্তত 4টি সূত্র থাকে। *Tradescantia*-র লেপ্টোটিনে প্রত্যেক ক্রোমাটিডে 8টি (অর্থাৎ ক্রোমোসোমে 16টি) সূত্র দেখা গেছে। এদের প্রত্যেকের ব্যাস 200Å। এরা জোড়ায় জোড়ায় পেঁচান থাকে। তবে অনেক উদ্ভিদের শুক্রাণু নিউক্লিয়াসের মায়োসিস বিভাজনের প্রফেজে 100-120Å ব্যাসযুক্ত মাইক্রোফাইব্রিল দেখা গেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সবচেয়ে সূক্ষ্ম সূত্রের ব্যাস 20-40Å পর্যন্ত হয়। এই রকম একটি সূত্র সম্ভবত DNA-র ডাবল হেলিক্সের সমকক্ষ। এই রকম সূত্রকে sub-fibril বলে (Steffensen'59)। কোনও কোনও বিজ্ঞানীর মতে, প্রত্যেক ক্রোমোসোমের দু'টি ক্রোমাটিড পুনরায় বিভাজিত হয়ে অর্ধ ক্রোমাটিড গঠন করে। অর্ধ ক্রোমাটিড বিভাজিত হয়ে এক চতুর্থাংশ (quarter) ক্রোমাটিড গঠন করে। প্রত্যেক এক চতুর্থাংশ ক্রোমাটিডে চারটি ক্রোমাটিন সূত্র থাকে। প্রত্যেক ক্রোমাটিন সূত্রে দু'টি DNA অণু হিস্টোন বা অহিস্টোন প্রোটিনের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে। DNA ও প্রোটিনকে ডাইভ্যালেন্ট ক্যাটায়ন যেমন Ca^{++} ও Mg^{++} যুক্ত রাখতে সহায়তা করে। তাহলে প্রত্যেক ক্রোমাটিডে DNA অণুর সংখ্যা হল $2\times2\times4\times2=32$। সুতরাং, একটি ক্রোমোসোমে DNA অণুর সংখ্যা হল 32×2 অর্থাৎ 64। এই DNA অণুগুলি সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এবং পরস্পর পেঁচিয়ে রজ্জুর ন্যায় দেখায়।

Ris-এর মতে, প্রত্যেক ক্রোমাটিডে চারটি ক্রোমোনিমা থাকে। একটি ক্রোমোনিমায় দু'টি ফাইব্রিল (fibril) থাকে। এরকম প্রত্যেক ফাইব্রিল দু'টি প্রাথমিক ফাইব্রিল দ্বারা গঠিত। প্রাথমিক ফাইব্রিল আবার দু'টি নিউক্লিও প্রোটিন (DNA-হিস্টোন) সূত্র দ্বারা গঠিত। সুতরাং, একটি ক্রোমাটিডে $2\times2\times4\times2=32$টি নিউক্লিও প্রোটিন সূত্র থাকে বা 16টি প্রাথমিক ফাইব্রিল থাকে।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা এই মডেলকে সমর্থন করে না।

(b) **ভাঁজযুক্ত তন্তুর** (folded fibre) **মডেল**— E. J. Dupraw ('65) ও H.Ris ('67) এর মতে প্রত্যেক ইউক্যারিওট ক্রোমোসোমে অন্তত একটি দীর্ঘ DNA অণু অনেকবার ভাঁজ অবস্থায় প্রোটিন ও সামান্য RNA-র সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে। এই নিউক্লিও প্রোটিন সূত্র 100Å চওড়া। এই মতকে কখনও কখনও unistranded concept বলে। দেহ কোষের ক্রোমাটিন সূত্রের ব্যাস হল 200Å (অর্থাৎ 20mm)। এখানে DNA ও বেসিক প্রোটিন হিস্টোন থাকে। DNA ডাবল হেলিক্সের গহ্বরের (groove) মধ্যে হিস্টোন থাকে। হিস্টোনের পজিটিভ চার্জ DNA-র ফসফেট গ্রুপের নেগেটিভ চার্জের সাথে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক সংযোগ স্থাপন করে। এর ফলে DNA সূত্রের স্থায়িত্ব ও নমনীয়তা বাড়ে। DNA ডাবল হেলিক্স ও হিস্টোনযুক্ত সূত্রটি সুপার কয়েল (super-coil) গঠন করে এবং বারবার ভাঁজ হয়ে নিউক্লিও প্রোটিন সত্র

বা ক্রোমাটিন সূত্র গঠন করে। DNA-র এই সুপার কয়েল গঠনে হিস্টোন অংশ নেয়। আধুনিক জৈব রাসায়নিক এবং কোষতত্ত্ব সংক্রান্ত পরীক্ষা DNA-প্রোটিন সূত্রের বহু বার ভাঁজ অবস্থায় থাকাকে সমর্থন করে (Dupraw '68, Goodenough ও Levine '74 এবং De Robertis '75)। ইন্টারফেজ নিউক্লিয়াসে অত্যন্ত দীর্ঘ DNA সূত্রের উপস্থিতি এই মতের সপক্ষে একটি প্রমাণ। সী আর্চিনের শুক্রাণুতে 50-90μm দীর্ঘ সূত্র দেখা গেছে। *Drosophila*-র দীর্ঘতম ক্রোমোসোমের DNA সূত্রের দৈর্ঘ্য 40cm। অটোরেডিওগ্রাফী পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ডিম্বাণুতে 1-22mm দীর্ঘ সূত্র রয়েছে (Sasaki ও Norman '66)।

(c) নিউক্লিওসোম মডেল (nucleosome model) ও সলিনয়েড— R. D. Kornberg ও J. O. Thomas ('74) DNA হিস্টোনের অবস্থান ব্যাখ্যা করে নিউক্লিওসোম মডেল গঠন করেন (চিত্র 82c)। এই মত অনুসারে, DNA-র দু'শ জোড়া নিউক্লিওটাইড কেন্দ্রের প্রোটিনের (octamer) চারিদিকে দুই বার পেঁচান থাকে। কেন্দ্রের প্রোটিন অংশ চার জোড়া হিস্টোন দিয়ে তৈরি। এই হিস্টোনগুলি হল দুই অণু H3, দুই অণু H4, দুই অণু H2A এবং দুই অণু H2B। এই রকম অক্টোমার অঞ্চল পুঁতির মত এবং এগুলিকে নিউক্লিওসোম বলে। P. Outdet ('75) এই পুঁতির মত অংশগুলিকে নিউক্লিওসোম নাম দেন। নিউক্লিওসোমের আকৃতি ইলিপ্সের মত। এর ব্যাস 110Å এবং উচ্চতা 55-57Å। দু'টি করে H3 এবং H4-এর টেট্রামার এই এককের মধ্যাঞ্চল (core) গঠন করে। H2A এবং H2B-র অলিগোমার সঠিক ব্যবধান বজায় রাখে। এর ফলে ক্রোমোসোমটি নমনীয় হয়। এই নিউক্লিওসোম এককের পুনরাবৃত্তি হয়। এরকম প্রত্যেক এককের সাথে এক অণু H1 হিস্টোন যুক্ত থাকে। নিউক্লিওহিস্টোনের এই সূত্রটিকে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পুঁতির মালার মত দেখায়।

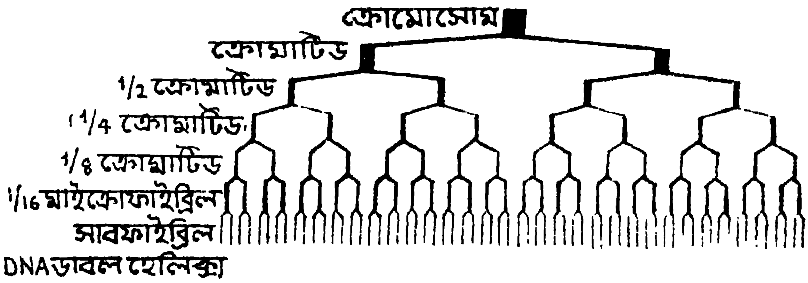
দু'টি নিউক্লিওসোমের মাঝে নিউক্লিওসোম মধ্যবর্তী (internucleosomal বা interbead) দীর্ঘ অঞ্চল থাকে। এখানে সংযোগকারী DNA সূত্রের সাথে (linker DNA) H1 হিস্টোন যুক্ত থাকে। ইন্টারনিউক্লিওসোম অঞ্চলের দৈর্ঘ্য H1 হিস্টোনের আয়তনের ওপর নির্ভরশীল। H1 হিস্টোন নিউক্লিওসোমের অংশ নয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গবেষণা ও জৈব রাসায়নিক পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য এই মডেলকে সমর্থন করে।

Bradbury ('81) বলেন যে, নিউক্লিওসোমের অক্টোমারের চারিদিকে সুপার হেলিক্সযুক্ত DNA 1.75 পেঁচ (প্রত্যেক পেঁচে 84টি বেস থাকে) গঠন করে এবং এর মোট দৈর্ঘ্য 476Å। এই অঞ্চলে 146 জোড়া বেস থাকে। কোষের ওপর নির্ভর করে লিঙ্কার DNA-র দৈর্ঘ্য 50-340Å হয়। DNA-র দু'টি পেঁচের পর H1 অণু যুক্ত থাকে। হিস্টোন অক্টোমারকে বেষ্টনকারী DNA-র দু'টি পেঁচকে H1 অণু আবদ্ধ করে। এই দু'টি পেঁচে 168টি বেস জোড়া থাকে।

নিউক্লিওসোম অঞ্চলের DNA-র ট্রান্সক্রিপশন হয় না। তবে হিস্টোন বিনষ্ট হয়ে

গেলে বা বিচ্ছিন্ন হলে নিউক্লিওসোম অঞ্চল উন্মুক্ত হয় এবং তখন ঐ অংশের DNA-র ট্র্যান্সক্রিপশন হতে পারে।

নিউক্লিওসোম অবস্থায় DNA-র দুই রকম পেঁচ থাকে। (a) DNA-র ডাবল হেলিক্সের পেঁচ এবং (b) হিস্টোনের অক্টোমারের চারিদিকে DNA-র ডাবল হেলিক্সের পেঁচ। নিউক্লিওসোম গঠনের ফলে DNA সূত্রের দৈর্ঘ্য ছয়গুণ হ্রাস পায়। নিউক্লিওসোমগুলির শৃঙ্খল (chain), নিউক্লিওসোম মধ্যবর্তী লিঙ্কার (linker) DNA এবং পার্শ্ববর্তী H1 হিস্টোন 100Å ব্যাসযুক্ত একটি সূত্র গঠন করে। এই সূত্রকে unit fibre বলে। Mays ('81) বলেন যে, মাইটোসিস এবং মায়োসিসের ঠিক আগে H1 অণু ফসফেটযুক্ত হয় এবং এর ফলে আরো পেঁচ সম্ভব হয়। সুতরাং, এই নিউক্লিওহিস্টোন সূত্রটি আরো পেঁচ গঠন করতে পারে, যা আবার পেঁচ গঠনে সক্ষম। এইভাবে মোটামুটি সাতটি স্তর পর্যন্ত পেঁচ গঠিত হতে পারে। এর ফলে 500 গুণ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হ্রাস পেতে পারে। নিউক্লিওসোম হল এইসব গঠনের ভিত্তিস্বরূপ এবং এগুলি বিকৃত হয় না বা ভেঙে যায় না। নিউক্লিওসোমগুলি পেঁচিয়ে সলিনয়েড (solenoid) কয়েল গঠন করে। সলিনয়েড কয়েলের একটি পেঁচে ছয়টি নিউক্লিওসোম থাকে।



চিত্র—82a

ক্রোমোসোমের বহু সূত্রযুক্ত মডেল

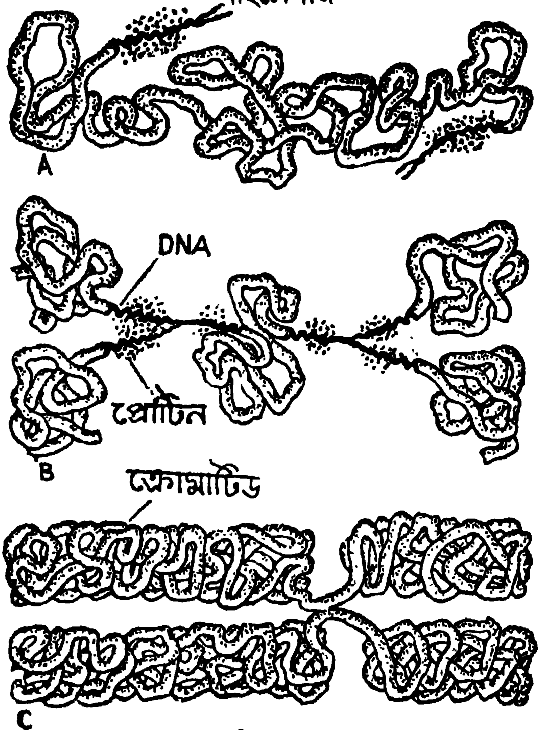
নিউক্লিওসোম মডেলের সপক্ষে প্রমাণ—

নিউক্লিওসোম মডেলের সপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়েছে।

(i) X-রশ্মি বিচ্ছুরণের (diffraction) প্যাটার্ন সংক্রান্ত পরীক্ষা—

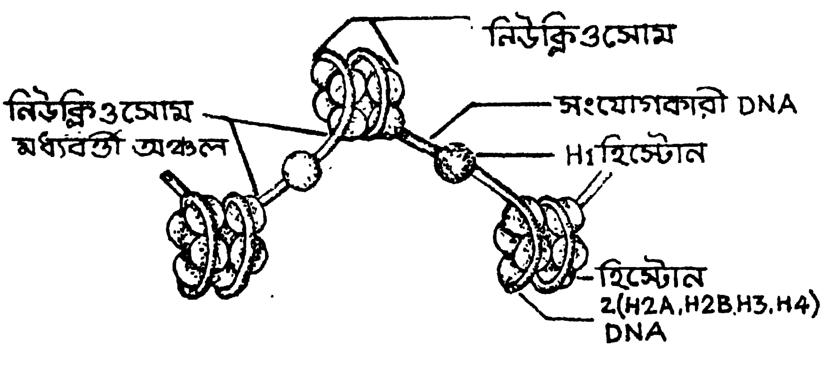
এই পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, ক্রোমাটিন সূত্রের প্রতি 10μm-এ একটি পুনরাবৃত্তিসম্পন্ন গঠন থাকে।

(ii) **ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা—** বিদীর্ণ নিউক্লিয়াসের ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে কতকগুলি গোলাকার গঠন দেখা যায়, যেগুলি একটি সূত্র দ্বারা যুক্ত থাকে। এই গোলাকার পুঁতির মত গঠনের ব্যাস 7-10μm। সূত্রটির দৈর্ঘ্য বিভিন্ন রকম হতে পারে।



চিত্র—82b

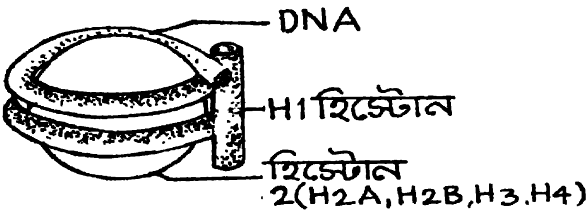
Dupraw বর্ণিত ক্রোমাটিনের ভাঁজযুক্ত সূত্রের (folded fibre model) মডেল



চিত্র—82c

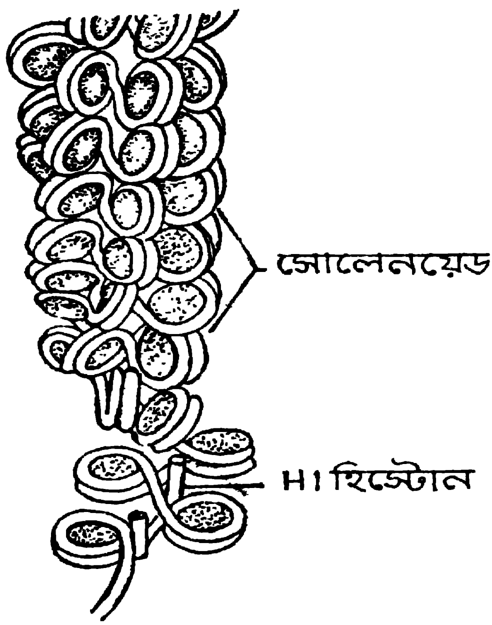
ক্রোমাটিন সূত্রের একাংশের গঠন

নিউক্লিওসোমের কেন্দ্রে আটটি হিস্টোন অণু (H2A, H2B, H3, H4 প্রত্যেকটি দু'টি) থাকে। এর চারিদিকে DNA সূত্র দু'বার পেঁচান থাকে।



চিত্র—42d

নিউক্লিওসোম মডেলে H1 হিস্টোনের অবস্থান দেখান হয়েছে



চিত্র—42e

সলিনয়েড কয়েলের একটি পেঁচে ছয়টি নিউক্লিওসোম থাকে

(iii) SV_{40}-র (সিমিয়ান ভাইরাস 40) DNA বলয়াকার দ্বিসূত্রযুক্ত অণু। সাধারণত ভাইরাসের DNA-তে নিউক্লিওসোম থাকে না। SV_{40} যখন স্বাভাবিক কালচারে দেওয়া হয়, তখন SV_{40}-র DNA পোষকের DNA-র সাথে যুক্ত হতে পারে। এরকম যুক্ত অবস্থায় ভাইরাসের DNA-তে নিউক্লিওসোমীয় গঠন দেখা দিতে পারে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ভাইরাসের DNA-তে নিউক্লিওসোমীয় গঠনের উপস্থিতি সমর্থন করে। ভাইরাসের ক্রোমোসোমের এই অবস্থাকে মিনি ক্রোমোসোম (mini chromosome) বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় SV_{40}-র DNA-র দৈর্ঘ্য 1590μm। কিন্তু মিনি ক্রোমোসোম অবস্থায় এই দৈর্ঘ্য 250μm। সুতরাং, মিনি ক্রোমোসোমে DNA ছয় থেকে সাত বার ভাঁজ হয়ে পেঁচান অবস্থায় (packing) থাকে।

এইসব তথ্য নিউক্লিওসোম মডেলকে সমর্থন করে।

প্রত্যেক ক্রোমোসোমে একটি মাত্র DNA অণু থাকে

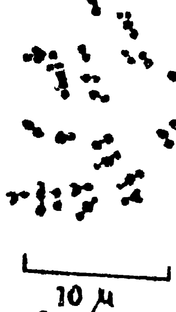
সব DNA ভাইরাস এবং ব্যাকটিরিয়ার কোষে একটি DNA অণু থাকে। ইউক্যারিওটের কোষের প্রত্যেক ক্রোমোসোমে একটি করে DNA অণু থাকে। ইউক্যারিওট কোষ থেকে দীর্ঘ DNA নিষ্কাশিত করে পরীক্ষা এই ধারণাকে সমর্থন করে।

Drosophila-র বিভিন্ন প্রজাতির দীর্ঘ DNA-র দৈর্ঘ্য 6×10^7 থেকে 1×10^8 বেস জোড়া। *Drosophila*-র DNA-এর নির্দিষ্ট রঞ্জক শোষণের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এই তথ্য প্রতি ক্রোমোসোমে একটি DNA-র উপস্থিতি সমর্থন করে। ইস্ট কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা এবং DNA অণুর সংখ্যা একই। ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোমের পরীক্ষা থেকে এই মতের সমর্থনে প্রমাণ পাওয়া যায়। ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোমের লুপে একটি ক্রোমাটিড থাকে। RNAএজ ও প্রোটিয়েজ দ্বারা বিক্রিয়ার পর ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোমের লুপের ব্যাস 20Å হয়। এই ব্যাস DNA অণুর ব্যাসের সমান।

ক্রোমোসোমের আয়তন

ক্রোমোসোমের আয়তন সাধারণত মাইটোসিস বিভাজনের মেটাফেজ অবস্থায় নির্ণয় করা হয়। একবীজপত্রী (monocot) উদ্ভিদের ক্রোমোসোমগুলি সাধারণত দীর্ঘ (চিত্র 150, 151) এবং দ্বিবীজপত্রী (dicot) উদ্ভিদের ক্রোমোসোমগুলি তুলনামূলকভাবে ছোট হয়। *Polyscias*-এর (Araliaceae) ক্রোমোসোমগুলির দৈর্ঘ্য 1.2-2.95μ (চিত্র 83a) (Guha)। ভুট্টার ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য 8-12μ। *Trillium*-এ 30μ পর্যন্ত দীর্ঘ ক্রোমোসোম পাওয়া গিয়েছে। *Allium, Lillium, Tradescantia*-র ক্রোমোসোম 10-20μ পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। Liliaceae ও Amaryllidaceae গোত্রের অধিকাংশ উদ্ভিদের ক্রোমোসোমগুলি বেশ লম্বা। বেশিরভাগ ছত্রাকের ক্রোমোসোম খুব

ছোট (যেমন 0.25μ)। প্রাণীতে ফড়িং, ঝিঁঝিঁপোকা ইত্যাদিতে দীর্ঘ ক্রোমোসোম দেখা গিয়েছে। কোনও কোনও পাখীর ক্রোমোসোম বেশ ছোট। ড্রসোফিলার



চিত্র—83a

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ *Polyscias*-এর দেহ কোষে 2n =24 ক্রোমোসোম (Guha)

ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য মোটামুটি 3μ। মানুষের ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য 4-6μ। বিভিন্ন জীবের ক্রোমোসোমের মোটামুটি দৈর্ঘ্য 0.2-50μ ও স্থূলতা 0.2-2μ হয়। সাধারণত



চিত্র—83b

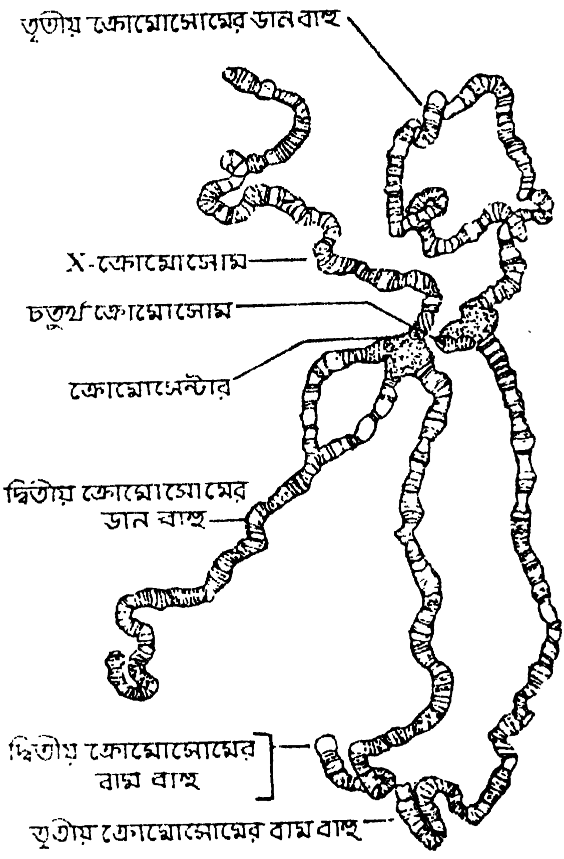
Agavaceae গোত্রের উদ্ভিদ *Furcraea watsoniana*-এ (2n = 60) ক্রোমোসোমের আয়তনের পার্থক্য (Guha)

একটা কোষের বিভিন্ন ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্যের মধ্যে বেশি পার্থক্য দেখা যায় না। সবচেয়ে ছোট ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড় ক্রোমোসোমের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ হয়। কিন্তু Agavaceae-তে বিভিন্ন ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্যের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। এখানে ডিপ্লয়েড কোষে 50টি খুব ছোট ও 10টি বেশ বড় ক্রোমোসোম (চিত্র 83b) থাকে।

বিশেষ ধরনের ক্রোমোসোম

স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের (salivary gland) ক্রোমোসোম

E. G. Balbiani 1881 খ্রিস্টাব্দে দ্বিপক্ষযুক্ত (diptera) পতঙ্গের লালা গ্রন্থির বা স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের কোষে খুব বড় ক্রোমোসোম দেখতে পান। তবে এই সব ক্রোমোসোমের তাৎপর্য তখন ভাল করে বোঝা যায়নি। অনেক পরে, ত্রিশের দশকে Kostoff (1930), Painter (1933, 1934), Heitz ও Bauer (1933) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা এই ক্রোমোসোমের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসোম (চিত্র 84) সাধারণ কোষের ক্রোমোসোমের চেয়ে 50-200 গুণ বড় হয়।

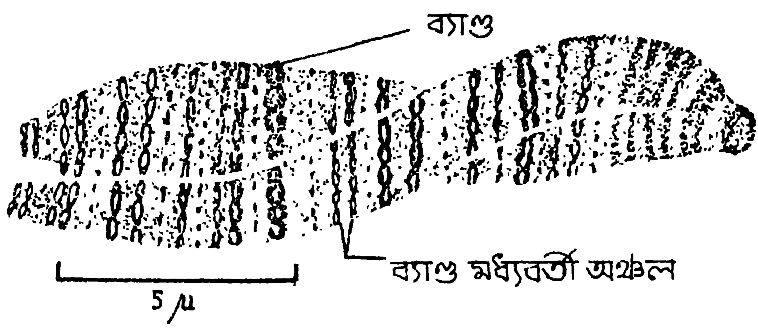


চিত্র—84

Drosophila-র স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসোম

ড্রসোফিলার দেহ কোষে মেটাফেজ অবস্থায় সব ক্রোমোসোমগুলির মোট দৈর্ঘ্য 7.5μ হয়, কিন্তু স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসোমগুলির মোট দৈর্ঘ্য 1,180-2,000μ। স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ছাড়া চর্বি কোষে, মালপিঘীয় নলে (malpighian tube), গর্ভাশয়ের ধাত্রী কোষে (nurse cell), অন্ত্রের (rectal) এপিথিলিয়াল কোষে (epithelial cell) বড় ক্রোমোসোম দেখা যায়। তবে এসব জায়গার ক্রোমোসোম স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসোমের মত অত বড় হয় না।

স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের প্রতি ক্রোমোসোম যুগ্ম অবস্থানকারী দু'টি হোমোলোগাস (সমসংস্থ) ক্রোমোসোমের সমন্বয়ে তৈরি। স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের প্রত্যেক ক্রোমোসোমে পর্যায়ক্রমে গাঢ় বর্ণযুক্ত ও বর্ণহীন বা হালকা বর্ণের অংশ থাকে। এই গাঢ় বর্ণযুক্ত অংশগুলিকে ব্যান্ড (band) ও বর্ণহীন অংশগুলিকে ইন্টারব্যান্ড (interband) বা ব্যান্ড মধ্যবর্তী অঞ্চল বলে। ব্যান্ড অঞ্চলগুলি অতি বেগুনী রশ্মি (ultra violet ray) শোষণ করে ও ফালগেন (feulgen) বর্ণ দিয়ে রঙ করা যায়। এই অঞ্চলে যথেষ্ট DNA থাকে। কিন্তু ইন্টারব্যান্ড অঞ্চল অতি বেগুনী রশ্মি শোষণ করে না ও ফালগেন রঙ নেয় না। বিভিন্ন ব্যান্ডের আকার ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয় (চিত্র 85)। কোনও কোনও ব্যান্ড চওড়া আবার কোনওটা বা সরু। চওড়া ব্যান্ডগুলির গঠন জটিল ও এগুলি কয়েকটা সরু ব্যান্ড দিয়ে তৈরি। এইসব ব্যান্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চল খুব ছোট থাকে।



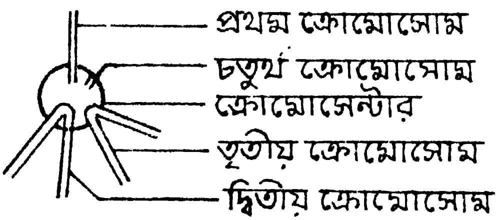
চিত্র—85

Drosophila melanogaster-এর স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের চতুর্থ ক্রোমোসোমের গঠন

অনেক সময় একই ব্যান্ড পরপর দু'বার থাকে, এদের ডাবলেট (doublet) বা ক্যাপসিউল (capsule) বলে। একটা ব্যান্ডের ক্রোমোমিয়ার পরের ব্যান্ডের ক্রোমোমিয়ারের সাথে সূক্ষ্ম ক্রোমোনিমা সূত্র দিয়ে যুক্ত থাকে। ব্যান্ড অংশের চেয়ে ইন্টারব্যান্ড অঞ্চল অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক (elastic)। *Drosophila*-র সবচেয়ে

লম্বা ক্রোমোসোমে 2000-এর চেয়ে বেশি ব্যান্ড দেখা যায়। কোনও ক্রোমোসোমে ব্যান্ডের বিন্যাস অপরিবর্তিত থাকে। ব্যান্ডের আকৃতি, দু'টি ব্যান্ডের মধ্যে ব্যবধান ও অন্যান্য চরিত্র থেকে ক্রোমোসোমের কোনও নির্দিষ্ট অংশকে সহজেই চেনা যায় এবং এর থেকে ক্রোমোসোমের মানচিত্র (chromosome map) গঠন করা সম্ভব হয়েছে। ক্রোমোসোমের মানচিত্রের সাহায্যে ক্রোমোসোমের কোনও অস্বাভাবিকতা সহজেই নির্ণয় করা যায়। কোন দু'টি প্রজাতির স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসোমের তুলনা করে তাদের ব্যান্ডের গঠন ও বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়েছে। নির্দিষ্ট জিনের অবস্থান কোন ব্যান্ডে তা নির্ণয় করা গিয়েছে। ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন স্বাভাবিক ও পরিবর্তিত স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমের তুলনা করে সহজেই বোঝা যায়।

স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের কোষে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি তাদের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ধরে পাশাপাশি থাকে। এরপর কোষ বিভাজন আর অগ্রসর হয় না ও কোষটি স্থায়ীভাবে প্রফেজের প্যাকিটিন অবস্থায় থাকে। ড্রসোফিলায় চার জোড়া ক্রোমোসোমের (2n = 8) সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের হেটোরোক্রোমাটিন অঞ্চল পরস্পর যুক্ত হয়ে ক্রোমোসেন্টারের (chromocentre) (চিত্র 86) সৃষ্টি করে। ক্রোমোসোমের বাহুগুলি ক্রোমোসেন্টার থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে। 'Y' ক্রোমোসোমটা সম্পূর্ণভাবে হেটোরোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরি হওয়ায় এটা ক্রোমোসেন্টারে পুরোপুরি

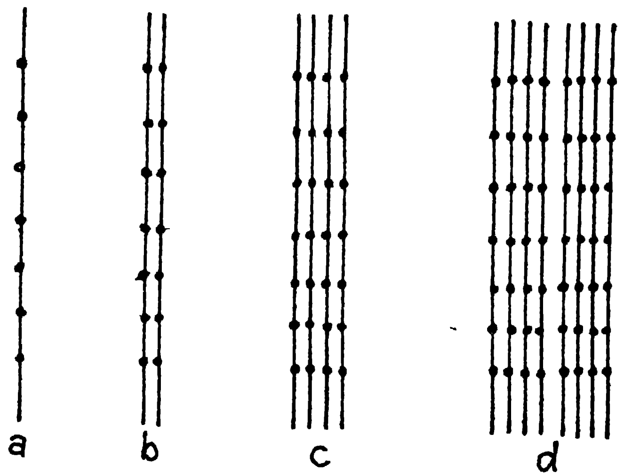


চিত্র—86

Drosophila-র স্যালিভারী গ্ল্যান্ডে ক্রোমোসোমগুলি ক্রোমোসেন্টার অঞ্চলে যুক্ত থাকে

যুক্ত থাকে। ক্রোমোসেন্টারের সাথে একটা বড় নিউক্লিওলাস সংযুক্ত থাকে। ড্রসোফিলার সব প্রজাতিতেই ক্রোমোসেন্টার দেখা যায়। বিভিন্ন প্রজাতিতে সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের হেটোরোক্রোমাটিনের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে ক্রোমোসেন্টারের আয়তন ছোট বা বড় হয়। অন্যান্য দ্বিপক্ষযুক্ত পতঙ্গের স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের কোষে ক্রোমোসেন্টার দেখা যায় না।

বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসোমের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক বিজ্ঞানীদের মতে, স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসাম বহুসূত্রযুক্ত অর্থাৎ, পলিটেনি (polyteny) প্রকৃতির। Hertwig (1935), Cooper (1938), Painter (1939, Beermann (1952) প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের মতে এই ক্রোমোসোমের ক্রোমোনিমাটা বারবার লম্বালম্বিভাবে বিভাজিত হয়ে অনেক ক্রোমোনিমাটার (চিত্র 87) সৃষ্টি করে (এন্ডোমাইটোসিস)। স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের প্রত্যেক ক্রোমোসোমে কখনও কখনও এক হাজারের চেয়ে বেশি ক্রোমোনিমাটা থাকে। ক্রোমোসোমের এই



চিত্র—৪7

স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসোমের উৎপত্তি

বহুসূত্রযুক্ত অবস্থাকে পলিটেনি বলে। Painter (1941), Swift ও Rasch-এর (1954) মতে, প্রত্যেক ক্রোমোসোমে 1024টি ক্রোমোনিমাটা থাকে। Kurnick ও Herskowitz-এর (1952) মতে, একটা ক্রোমোসোমে ক্রোমোনিমাটার সংখ্যা হল 500 এবং Beermann-এর (1952) মতে ক্রোমোনিমাটার সংখ্যা 16,000 পর্যন্ত হয়।

স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে যুগ্মতা হয়। ট্রিপ্লয়েড ড্রসোফিলায় তিনটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোম তাদের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ধরে যুগ্ম অবস্থান করে। স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমের ব্যান্ডগুলি ক্রোমোমিয়ারেরই প্রতিনিধি। Painter-এর মতে, এই বহু ক্রোমোনিমাটাযুক্ত ক্রোমোসোমের প্রত্যেক ক্রোমোনিমাই একই ধরনের অর্থাৎ একটা অন্যটার যথার্থ প্রতিলিপি। প্রতিটি ক্রোমোনিমার কোনও নির্দিষ্ট ক্রোমোমিয়ার একই জায়গায় থাকে ও পাশাপাশি যুক্ত হয়ে একটা ব্যান্ডের সৃষ্টি করে। D'Angelo (1946, 1950) পলিটেনি মতকে সমর্থন করেন। তিনি দেখান যে, একটি

ব্যান্ডকে যদি পাশাপাশি টানা হয়, তাহলে ঐ ব্যান্ডটি কতকগুলি পুঁতির মত অংশে অর্থাৎ ক্রোমোমিয়ারে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমের DNA-র পরিমাণও পলিটেনি মতবাদের সমর্থন করে। Kurnick ও Harskowitz দেখেন যে, ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের খুব বড় নিউক্লিয়াসে স্বাভাবিক নিউক্লিয়াসের চেয়ে প্রায় 420 গুণ বেশি DNA থাকে। Swift ও Rasch-ও (1955) স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমে বেশি DNA-র উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন। Dobzhansky (1936), Schultz (1941), White (1946) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমের বিভিন্ন পরিমাণের পলিটেনির উল্লেখ করেছেন। একই কোষের বিভিন্ন ক্রোমোসোমে কিম্বা একই ক্রোমোসোমের ভিন্ন ভিন্ন অংশে পলিটেনির পরিমাণের তারতম্য হয়। Metz-ও (1941) স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমের পলিটেনি প্রকৃতির সমর্থন করেছেন। তিনি ব্যান্ডের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে alveolar hypothesis গঠন করেন। Metz-এর মতে, ব্যান্ড অঞ্চলগুলি দু'টি অ্যালভিওলাইয়ের (alveoli বা ছোট ছিদ্র) সংযোগস্থলে ক্রোমাটিনের সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

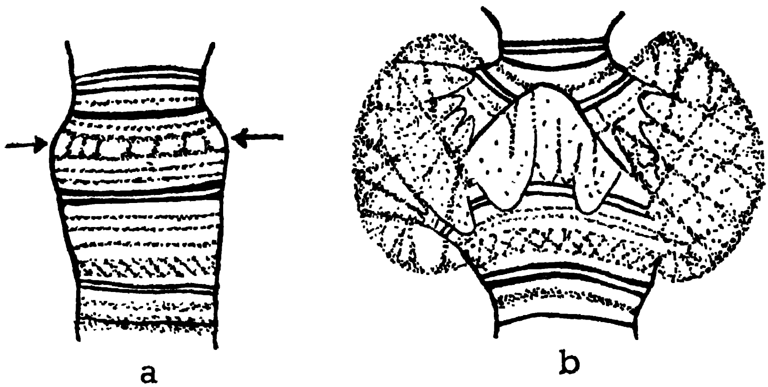
তবে সব বিজ্ঞানীরা পলিটেনি মতবাদ সমর্থন করেননি। তাঁদের মতে, স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমে কেবল চারটি সূত্র থাকে এবং এই ক্রোমোসোমের ব্যান্ড মধ্যবর্তী অঞ্চল স্ফীত হওয়ার ফলে স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের অতিকায় ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়।

Ris ও Crouse-এর (1954) মত অনুসারে, সাধারণ মাইটোসিস বা মায়োসিসের সময় ক্রোমোসোমে যতগুলি ক্রোমোনিমাটা থাকে, স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসোমেও একই সংখ্যক ক্রোমোনিমাটা থাকে। কিন্তু স্যালিভারী গ্ল্যান্ডে এইসব ক্রোমোনিমাটা অতিরিক্ত বস্তু সঞ্চিত করে বড় হয়। Kodani (1942) ও Darlington-এর (1949) মতে, স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোম সাধারণ ক্রোমোসোমের চেয়ে বেশি পদার্থ গ্রহণ করে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে অতিরিক্ত বড় হয়।

পাফ (Puff) ও বালবিয়ানি রিঙ (Balbiani ring)

Beermann (1952), Breuer, Pavan (1955) ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা দেখেন যে, লার্ভার বৃদ্ধির কোনও পর্যায়ে স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমের কিছু ব্যান্ড ফুলে ওঠে (চিত্র 88a, b)। এই স্ফীত অংশকে পাফ (puff) বলে। পাফ অঞ্চলে জিনটি কর্মব্যস্ত থাকে ও এই অঞ্চলে প্রচুর RNA তৈরি হয় (Pavan ও Breuer 1955, Beermann 1962, Pelling 1964 ও Pavan 1965)। একটি ব্যান্ডের বা পাশাপাশি কয়েকটি ব্যান্ডের কর্মব্যস্ততার ফলে পাফের সৃষ্টি হয়ে থাকে। *Rhynchosciara angelae*-তে Breuer ও Pavan (1955) একাধিক ব্যান্ড থেকে পাফের উৎপত্তি লক্ষ্য করেছিলেন। পাফ অল্পক্ষণ বা বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। *Rhynchosciara*-এ পাফ মাত্র কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয় (Guaraciaba ও Teledo

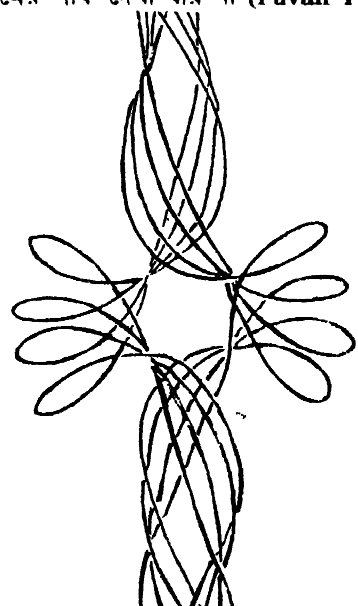
1967)। *Chironomus*-এ প্রায় সম্পূর্ণ লার্ভা অবস্থায় পাফটি স্থায়ী হয় (Beermann 1957)। *Chironomus*-এর বিভিন্ন স্থানের কোষে একই



চিত্র—88

বালবিয়ানি রিঙ, a–*Drosophila*-র স্বাভাবিক স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমের একাংশ, তীর চিহ্নিত স্থানে পরে বালবিয়ানি রিঙ গঠিত হয়েছে, b–বালবিয়ানি রিঙ

রকমের পাফ দেখা যায় (Beermann 1957)। কিন্তু *Rhynchosciara*-র বিভিন্ন টিস্যুতে কখনও এক রকমের পাফ দেখা যায় না (Pavan 1965)। কোনও কোনও



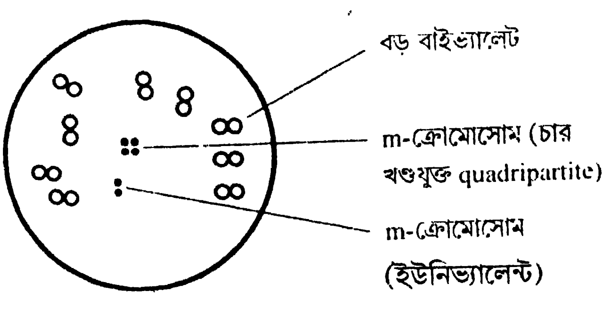
চিত্র—89

বালবিয়ানি রিঙে ক্রোমোসোমের গঠন

পাফ প্রাণীর পরিণতির সময় কেবল একবার দেখা যায়, আবার অন্যান্য পাফ জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বারবার দেখা দেয়। সুতরাং, কিছু পাফ কোষের বিশেষ কাজের সাথে ও অন্যান্য পাফ কোষের স্বাভাবিক কাজের সাথে জড়িত। দেখা গিয়েছে যে, ভিন্ন ভিন্ন হরমোন (hormone) প্রয়োগ করলে পাফ আবির্ভূত হয় বা অদৃশ্য হয় কিংবা পাফ অঞ্চলে কর্মব্যস্ততা হ্রাস পায়। হরমোন একডিসিনের প্রভাবে পাফ দেখা দেয়। *Rhynchosciara angelae* ও অন্য কিছু দ্বিপক্ষবিশিষ্ট পতঙ্গে (diptera) দেখা যায় যে, কিছু পাফ কেবল RNA উৎপাদন করে ও অন্যান্য পাফ RNA ও মেটাবলিক (metabolic) DNA উৎপাদন করতে পারে। নির্দিষ্ট জিন পাফের উৎপত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। Breuer ও Pavan (1955). Swift (1962), Gebrusewycz-Gracia (1964) Sciaridae-তে DNA পাফ দেখেছিলেন। পাফ অঞ্চলে ক্রোমোসোমের সূত্রগুলি আলাদা হয়ে যায়। ক্রোমোনিমা সূত্রগুলি ক্রোমোসোম থেকে বেরিয়ে আসে। এদের পেঁচ (coil) খুলে যায় ও এরা ফাঁস বা 'লুপ' (loop) গঠন করে। ক্রোমোসোমের চারিদিকের এই লুপ বা ফাঁসের মত গঠনকে বালবিয়ানি রিঙ (চিত্র 89) বলে। Balbiani 1881 খ্রিস্টাব্দে প্রথম এই লুপ দেখতে পেয়েছিলেন।

মাইক্রোক্রোমোসোম (microchromosome)

অত্যন্ত ক্ষুদ্র (মোটামুটি 0.5 μm) বিন্দুর মত কিছু ক্রোমোসোমকে minute বা m ক্রোমোসোম বা মাইক্রোক্রোমোসোম বলে। কোনও কোনও উদ্ভিদ, যেমন— ব্রায়োফাইটায় এরকম ক্রোমোসোম দেখা গেছে। কিছু প্রাণী যেমন— পাখী, কোনও কোনও পতঙ্গে (Heteroptera) এই ক্রোমোসোম থাকে। প্রধানত মায়োসিসে এবং কখনও কখনও মাইটোসিসে এই ক্রোমোসোম দেখা যায়। বড় ক্রোমোসোমের সাথে এই ছোট ক্রোমোসোম লক্ষ্য করা হয়েছে।



চিত্র—90

এই ক্রোমোসোম DNA দ্বারা গঠিত এবং বাইভ্যালেন্ট গঠনে সক্ষম। *Sphagnam*-এ উনিশটি বড় বাইভ্যালেন্ট এবং দু'টি m ক্রোমোসোম ইউনিভ্যালেন্ট

হিসাবে এবং চারটি n। ক্রোমোসোম একসাথে (quadripartite) থাকে।

কোনও কোনও বিরল ক্ষেত্রে স্যাটেলাইটযুক্ত ক্রোমোসোম দেখা যায় না। এসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট m ক্রোমোসোম নিউক্লিওলাস গঠনে সহায়তা করে, যেমন— পাখীতে।

মেগাক্রোমোসোম (megachromosome)

এই ক্রোমোসোম স্বাভাবিক ক্রোমোসোমের তুলনায় অনেক গুণ দীর্ঘ। তবে এই ক্রোমোসোম পলিটিনিক নয়। মেগাক্রোমোসোম অল্প কিছু সোমাটিক কোষে (somatic cell) দেখা যায়। এটি সব কোষে থাকে না। সাধারণত প্রতি কোষে একটি মাত্র মেগাক্রোমোসোম থাকে। তবে কোনও কোনও কোষে একাধিক মেগাক্রোমোসোম থাকতে পারে। পরপর প্রজন্মে এই ক্রোমোসোম দেখা গেলেও, এগুলি গ্যামেট দিয়ে সঞ্চারিত হয় না। সুতরাং, মেগাক্রোমোসোম বংশগত হলেও, কোষ এই ক্রোমোসোম উৎপাদন করতে পারে। মেগাক্রোমোসোম একটি বা দু'টি সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত হতে পারে অথবা, অ্যাসেন্ট্রিক হতে পারে। সংকর *Nicotiarna*-র কিছু প্রজাতিতে মেগাক্রোমোসোম দেখা যায়।

লিমিটেড বা সীমিত ক্রোমোসোম (limited chromosome)

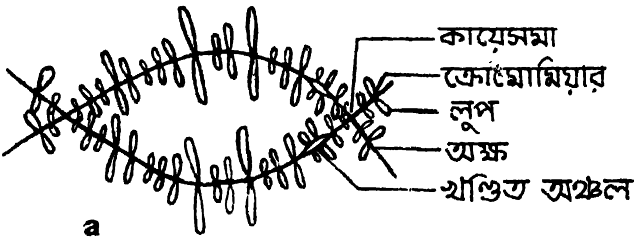
এই ক্রোমোসোমগুলি বড় এবং এর বিস্তার সীমিত। কেবল মাত্র জনন কোষে লিমিটেড L-ক্রোমোসোম থাকে। এই ক্রোমোসোম দেহ কোষ (সোমাটিক কোষ) থেকে বাদ যায়। এরকম ক্রোমোসোম Sciaridae (Diptera) গোত্রের পতঙ্গে দেখা গেছে। ভ্রূণের বিকাশের সময় এই ক্রোমোসোম দেহকোষ থেকে বাদ যায়। এ সম্বন্ধে ক্রোমোসোমের বর্জনে (elemination) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম (lampbrush chromosome)

অনেক মেরুদণ্ডী (vertebrate) প্রাণীর ও কতকগুলি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ডিম্বাণু মাতৃকোষের পরিণতির সময় ডিপ্লোটিন অবস্থায় কোনও কোনও ক্রোমোসোম খুব লম্বা হয়। এইসব ক্রোমোসামের পাশ থেকে অসংখ্য ফাঁসের (loop) বা রোমের (hair) মত অংশ চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে। এই ধরনের ক্রোমোসোমকে ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম (চিত্র 89a) বলে। ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম কেবল জনন কোষে দেখা যায়। 1882 খ্রিস্টাব্দে Flemming এই ক্রোমোসোম প্রথম দেখেন। 1892 খ্রিস্টাব্দে Rückert এই ক্রোমোসোমের সাথে বাতি পরিষ্কার করবার ব্রাশের আকৃতিগত সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে এর ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম নামকরণ করেন। ড্রসোফিলার শুক্রাণু মাতৃকোষের প্রথম মায়োসিস বিভাজনের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থায় এরকম ক্রোমোসোম দেখা গেছে।

যেসব ডিম্বাণু মাতৃকোষ অনেকক্ষণ প্রফেজ অবস্থায় থাকে, সেখানে দীর্ঘ ল্যাম্প-ব্রাশ ক্রোমোসোম দেখা যায়। ব্যাঙে এই প্রফেজ অবস্থা এক বৎসরের বেশি সময় স্থায়ী

হতে পারে ও এখানে ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য 800 থেকে 1000µ পর্যন্ত হয়। ডিপ্লোটিন অবস্থায় লুপ বা ফাঁসগুলির সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হয়। ডিম্বাণু

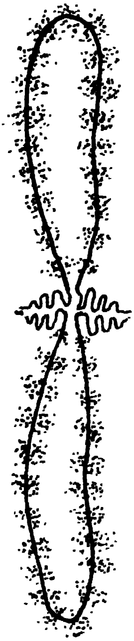


চিত্র—91a

ডিপ্লোটিনে ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম

মাতৃকোষটি যতই মেটাফেজ অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়, ততই লুপগুলি ছোট হতে থাকে ও শেষে অদৃশ্য হয়ে যায়। ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোমে ক্রোমোনিমার সংখ্যা সাধারণ মাইটোসিস বা মায়োসিস ক্রোমোসোমের ক্রোমোনিমার সংখ্যার সমান হয় (Ris ও Crouse 1945)। ডিম্বাণু মাতৃকোষে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি পাশাপাশি থাকে ও কেবল কায়েসমা অঞ্চলে এরা পরস্পর যুক্ত থাকে। এই অবস্থায় ক্রোমোমিয়ার অঞ্চল থেকে লুপ (loop) বা ফাঁসগুলি গঠিত হয় ও পাশের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেক ক্রোমোমিয়ারে সাধারণত এক জোড়া লুপ থাকে (চিত্র 91b)। তবে লুপের সংখ্যা এক থেকে নয় পর্যন্ত হতে পারে। যে ক্রোমোমিয়ারে দু'টির চেয়ে বেশি সংখ্যক লুপ থাকে, সেই ক্রোমোমিয়ার সম্ভবত কয়েকটি ক্রোমোমিয়ারের মিলনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে কোনও লুপ থাকে না। একটা ক্রোমোসোমে লুপের সংখ্যা ও একটা লুপ থেকে অন্য লুপের দূরত্ব নির্দিষ্ট হয়। বিভিন্ন লুপের দৈর্ঘ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোমে লুপের দৈর্ঘ্য 9.5µ (ব্যাঙে) থেকে 200µ পর্যন্ত হয়। লুপগুলির নির্দিষ্ট আকার ও বিন্যাস থাকায় ল্যাম্প-ব্রাশ ক্রোমোসোমের মানচিত্র গঠন সম্ভব হয়েছে। ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম স্থিতিস্থাপক। এই ক্রোমোসোমকে টানলে ক্রোমোমিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল বড় হয় ও লুপগুলি দূরে দূরে সরে যায় ও ছেড়ে দিলে আগের অবস্থায় ফিরে আসে। ক্যালসিয়াম ও অন্য কিছু রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম সঙ্কুচিত হয়। লুপগুলির অক্ষ DNA দিয়ে তৈরি। এই অক্ষ থেকে যে সূক্ষ্ম সূত্রগুলি চারিদিকে ছড়ান থাকে সেগুলি RNA এবং প্রোটিন দিয়ে তৈরি। Duryee মনে করেন যে, লুপগুলি

ক্রোমোমিয়ার থেকে সৃষ্ট ক্রোমাটিন পদার্থ দিয়ে গঠিত। তাঁর মতে, লুপগুলি ক্রোমোনিমার অংশ নয়। কারণ যদি ক্রোমোসোমকে কৃত্রিম উপায়ে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করা যায়, তাহলেও লুপগুলি যথাস্থানে থাকে। কিন্তু Ris-এর (1945) মতে, এগুলি ক্রোমোনিমারই অংশ। Gall (1965) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে নানা গবেষণা করে H. Ris-এর মতকেই সমর্থন করেছেন। Ris (1957) ও Gall-এর (1958) মতে, লুপগুলির অক্ষ ক্রোমোসোমের অক্ষের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে এবং এর থেকে বোঝা যায় যে, লুপগুলি ক্রোমোসোমীয় অক্ষের (axis) অংশ। এই অক্ষের ব্যাস 30-50Å।



b

চিত্র—91b

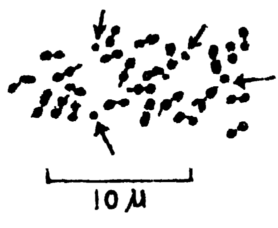
ক্রোমোমিয়ার ও একটি লুপকে বড় করে দেখান হয়েছে

নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চলযুক্ত ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম থেকে অসংখ্য নিউক্লিওলাই গঠিত হতে পারে। কখনও কখনও প্রায় এক হাজারটা নিউক্লিওলাই নিউক্লিওপ্লাজমে ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। এঁর তাৎপর্য সঠিক বোঝা যায়নি। Duryee-র মতে, এই নিউক্লিওলাসগুলি সাইটোপ্লাজমে যায়। নিউক্লিওলাসগুলিতে প্রচুর পরিমাণে RNA এবং প্রোটিন থাকায় এরা ডিম্বাণুর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

সক্রিয় জিন অঞ্চলে ক্রোমোসোমের গঠনগত পরিবর্তনের জন্য লুপগুলি দেখা দেয় বলে মনে করা হয়। অ্যাকটিনোমাইসিটিস D প্রয়োগ করে যদি এরকম জিনের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে লুপগুলি সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

B ক্রোমোসোম বা অতিরিক্ত ক্রোমোসোম

কোনও কোনও উদ্ভিদ বা প্রাণীর কোষে স্বাভাবিক ক্রোমোসোম ছাড়াও এক বা একাধিক অতিরিক্ত ক্রোমোসোম দেখা যায়। স্বাভাবিক ক্রোমোসোমগুলি জীবের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য এবং জীবের বৃদ্ধি, উর্বরতা ও অন্যান্য চরিত্রকে এরা প্রভাবিত করে। কিন্তু বংশধারার ওপর অতিরিক্ত ক্রোমোসোমের কোনও প্রভাব থাকে না। এজন্য এদের দ্বিতীয় বিভাগীয় ক্রোমোসোম বা ভৌতিক ক্রোমোসোম বা B ক্রোমোসোম বলে। *Metapodius* নামের একরকম পতঙ্গে Wilson (1905) প্রথম এই রকম ক্রোমোসোম দেখেন। এরপর B-ক্রোমোসোম অন্য অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীতে পাওয়া গিয়েছে। Lutz (1908) *Diabrotica punctata*-য় এবং Kuwada (1905) *Zea mays*-এ এই ক্রোমোসোম দেখতে পেয়েছিলেন। এছাড়া *Allium, Centauria, Poa, Secale, Sorghum, Trillium, Polyscias* (চিত্র 92) ইত্যাদি অনেক উদ্ভিদে B-ক্রোমোসোম পাওয়া যায়। শতাধিক পতঙ্গে ও অন্যান্য প্রাণীতে B-ক্রোমোসোম পাওয়া গিয়েছে (White 1973)। দেড়শর বেশি সপুষ্পক উদ্ভিদে B-ক্রোমোসোমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা হয়েছে (Muntzing 1967)। Longley 1927 খ্রিস্টাব্দে এই ক্রোমোসোমকে B-ক্রোমোসোম বা অতিরিক্ত ক্রোমোসোম নামে অভিহিত করেন।



চিত্র—92

Polyscias-এ (2n = 24) চারটি B-ক্রোমোসোম (তীর চিহ্নিত) দেখা যাচ্ছে (Guha)

B-ক্রোমোসোম স্বাভাবিক ক্রোমোসোমের চেয়ে বেশ ছোট। এদের সেন্ট্রোমিয়ারটি সাধারণত উপপ্রান্তীয় বা প্রান্তীয় হয়। একই জীবের বিভিন্ন কোষে এদের সংখ্যার তারতম্য হয়। কোনও কোনও কোষে এরা অনুপস্থিত থাকে। আবার অন্য কোষে একটি থেকে অনেকগুলি পর্যন্ত B-ক্রোমোসোম দেখা যায়। তবে এদের উপস্থিতির ফলে ফেনোটাইপের কোনও পরিবর্তন হয় না। এই ক্রোমোসোম কখনও স্বাভাবিক ক্রোমোসোমের সাথে যুগ্ম অবস্থান করে না। কখনও কখনও একই প্রজাতির

কোনও অঞ্চলের উদ্ভিদে B-ক্রোমোসোম থাকে, আবার অন্য কোনও অঞ্চলের উদ্ভিদে B-ক্রোমোসোম পাওয়া যায় না। পলিপ্লয়েড স্তরে B-ক্রোমোসোম বেশি দেখা যায়। B-ক্রোমোসোমযুক্ত ডিপ্লয়েড উদ্ভিদকে কৃত্রিম উপায়ে পলিপ্লয়েড করে দেখা গিয়েছে যে, ওই উদ্ভিদ থেকে B-ক্রোমোসোম পর্যায়ক্রমে বাদ যায়।

B-ক্রোমোসোম সাধারণত হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরি। তবে *Tradescantia* ও *Trillium*-এ B-ক্রোমোসোম সম্পূর্ণভাবে ইউক্রোমাটিন (euchromatin) দিয়ে গঠিত। ভুট্টার B-ক্রোমোসোম আংশিকভাবে হেটারোক্রোমাটিন ও আংশিকভাবে ইউক্রোমাটিন দিয়ে তৈরি।

কোনও কোনও প্রাণীতে B-ক্রোমোসোম সেক্স ক্রোমোসোম থেকে তৈরি হয়। *Metapodius terminalis*-এর Y ক্রোমোসোমের কোনও কোনও অংশ ভেঙে গেলে তা স্থায়ী হয় কারণ, এখানে সেন্ট্রোমিয়ারটি diffused বা পরিব্যাপ্ত ধরনের। এই ভগ্ন Y ক্রোমোসোম থেকেই B ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। এছাড়া স্বাভাবিক ক্রোমোসোমের ইউক্রোমাটিন অংশ বিনষ্ট হয়ে কিংবা সেন্ট্রোমিয়ারের ভ্রান্ত বিভাজনের (misdivision) ফলেও B ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হতে পারে। Darlington শেষোক্ত মতের সমর্থক। কোনও কোনও বিজ্ঞানী মনে করেন যে, কখনও কখনও কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা কমে B ক্রোমোসোম উপজাত (by product) হিসাবে উৎপন্ন হয়। এসব ক্ষেত্রে একটি ক্রোমোসোমের জেনেটিকভাবে সক্রিয় অংশ ট্রান্সলোকেশনের ফলে অন্য ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত হয় এবং সেন্ট্রোমিয়ার ও তার কাছের হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল B ক্রোমোসোম গঠন করে।

অল্প সংখ্যায় B ক্রোমোসোমের সাধারণত কোনও প্রভাব থাকে না। Randolph (1941) দেখেন যে, ভুট্টায় অনেকগুলি B ক্রোমোসোমের উপস্থিতি ক্ষতিকর। কোনও কোনও বিজ্ঞানী মনে করেন যে, B ক্রোমোসোম জেনেটিকভাবে নিষ্ক্রিয়। কিন্তু Randolph-এর পরীক্ষা থেকে বলা যায় যে, এরা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় নয়। রাই-এ (*Secale cereale*) অনেকগুলি B ক্রোমোসোমের উপস্থিতি উর্বরতা ও সতেজতার পক্ষে ক্ষতিকর। অটোটেট্রাপ্লয়েড রাই-এ এদের উপস্থিতি বিশেষভাবে ক্ষতিকর। Rutishauser দেখেন যে, *Trillium*-এর এন্ডোস্পার্ম বা সস্যে তিনটি পর্যন্ত B ক্রোমোসোমের উপস্থিতি ক্ষতিকর হয় না। কোনও কোনও গোষ্ঠীতে অতিরিক্ত ক্রোমোসোমের নিয়মিত উপস্থিতি তাদের বিশেষ কাজের ইঙ্গিত করে। Muntzing মনে করেন যে, B ক্রোমোসোমের কিছু নির্বাচনী ক্ষমতা আছে। *Poa* ও *Sorghum*-এ ক্রোমোসোম কোষ বিভাজনের সময় lagging-এর (বা মন্থরগতিশীলতা) জন্য দেহ কোষ থেকে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু যেসব কোষ থেকে জনন কোষ তৈরি হবে, সেখানে এদের দেখা যায়। ভুট্টার যেসব শুক্রাণুতে B ক্রোমোসোম থাকে, তারা ডিম্বাণুর সাথে ফার্টিলাইজেশনের (বা নিষেকের) ক্ষেত্রে যোগ্যতর বিবেচিত হয়। *Polycelis tenuis*-এ Melander (1950) দেখেন যে, B ক্রোমোসোম দেহ কোষ থেকে বিলুপ্ত

হয় কিন্তু ডিম্বকের কোষে এরা উপস্থিত থাকে। কোনও কোনও পরিবেশে এই ক্রোমোসোম যৌন পরিণতি বিলম্বিত করে। এর ফলে B ক্রোমোসোমযুক্ত *Polycelis* -এর এবং B ক্রোমোসোমবিহীন *Polycelis*-এর মধ্যে যৌন জনন সম্ভব হয় না। B ক্রোমোসোমযুক্ত *Polycelis* নিজেদের মধ্যে যৌন জনন কৃতকার্যতার সাথে সম্পন্ন করে। নিকট সম্পর্কীয় প্রজাতি থেকে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদে B ক্রোমোসোম ক্রোমোসোমের যুগ্মতাকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে।

অতিরিক্ত বা B ক্রোমোসোম তুলনামূলকভাবে অস্থায়ী। কোষ বিভাজনের সময় এদের পৃথকীকরণ (seggregation) অস্বাভাবিকভাবে হয়। হেটারোক্রোমাটিক প্রকৃতির জন্য B ক্রোমোসোম চটপটে হওয়ায় এদের নন-ডিসজাংশন (non-disjunction) হয়। এইভাবে কোনও কোষ থেকে অতিরিক্ত ক্রোমোসোম বাতিল হয়ে যায়। ফ্র্যাগমেন্টেশনের (fragmentation) ফলে প্রায়ই B ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন হয়। Muntzing (1945, 1946, 1950) *Secale*-এ এবং Randolph (1941) (1941) *Zea*-এ বিভিন্ন ধরনের B ক্রোমোসোমের বর্ণনা দিয়েছেন।

নবম অধ্যায়

ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন

ক্রোমোসোমের প্রধান রাসায়নিক বস্তু হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন। ক্রোমোসোমে দুই রকমের নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায়, এগুলি হল— ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (deoxyribonucleic acid) বা DNA এবং রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (ribonucleic acid) বা RNA। RNA-র তুলনায় ক্রোমোসোমে DNA-এর পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। ক্রোমোসোমের প্রোটিন প্রধানত দুই রকমের— বেসিক প্রোটিন (basic protein) এবং অবেসিক প্রোটিন (non-basic protein)। হিস্টোন (histone) ও প্রোটামাইন (protamine) হল বেসিক প্রোটিন। অবেসিক বা অ্যাসিডিক প্রোটিন অম্লধর্মী। ট্রিপ্টোফেন (tryptophane) ও টাইরোসিন (tyrosine) প্রভৃতি অ্যামিনো অ্যাসিড অবেসিক প্রোটিনে পাওয়া যায়। এই প্রোটিনকে অবশিষ্ট প্রোটিনও (residual protein) বলা হয়ে থাকে। এছাড়া ক্রোমোসোমে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও লোহার আয়ন পাওয়া যায়। এগুলি ক্রোমোসোমকে অটুট রাখতে সাহায্য করে এবং DNA-র সাথে যুক্ত থাকে (Burton '51. Mazia '54)। ক্যালসিয়ামের অভাবে ক্রোমোসোমগুলি সহজেই ভেঙে যায় (Steffensen 1955)। কোনও কোনও ক্রোমোসোমে লিপিড পাওয়া যায়। এই লিপিড সাধারণত ফসফোলিপিড হিসাবে থাকে (Chayen 1959)। ক্রোমোসোমে কিছু উৎসেচক, যেমন, DNA পলিমারেজ থাকে। DNA প্রধানত হিস্টোনের সাথে যুক্ত থাকে। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্রোমাটিনে DNA ও হিস্টোনের অনুপাত মোটামুটি 1 . 1। DNA ও প্রোটিনের মধ্যের বন্ধনকে salt linkage বলে। অ্যাসিডিক প্রোটিন উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত থাকে (Mirsky ও Ris 1947)।

অহিস্টোন প্রোটিন এবং DNA-র অনুপাত 0.6 : 1 এবং RNA ও DNA-র অনুপাত হল 0.1 : 1। Mazia-র (1952) মতে, ক্রোমোসোমের দু'টি প্রধান অংশ হল— (1) DNA— হিস্টোন অংশ এবং (2) RNA— অবশিষ্ট প্রোটিন অংশ।

1947 খ্রিস্টাব্দে Mirsky ও Ris ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠনের যে বর্ণনা দেন তা হল—

(1) DNA— হিস্টোন	90-92%—	DNA 45%
(লবণ দিয়ে নিষ্কাষিত)		হিস্টোন 55%

(2) অবশিষ্ট ক্রোমোসোম 8-10%— RNA (12-14%)
DNA (2%)
হিস্টোন ছাড়া অন্যান্য প্রোটিন
(82-84%)

Mirsky ও Ris-এর মতে, এই অবশিষ্ট প্রোটিন অংশ ক্রোমোসোমের কাঠামো গঠন করে ও ক্রোমোসোমকে অটুট রাখে। কিন্তু Kaufmann এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ক্রোমোসোমের অখণ্ডতা কোনও একটি বিশেষ পদার্থের ওপর নির্ভর করে না।

নিউক্লিক অ্যাসিড (nucleic acid)

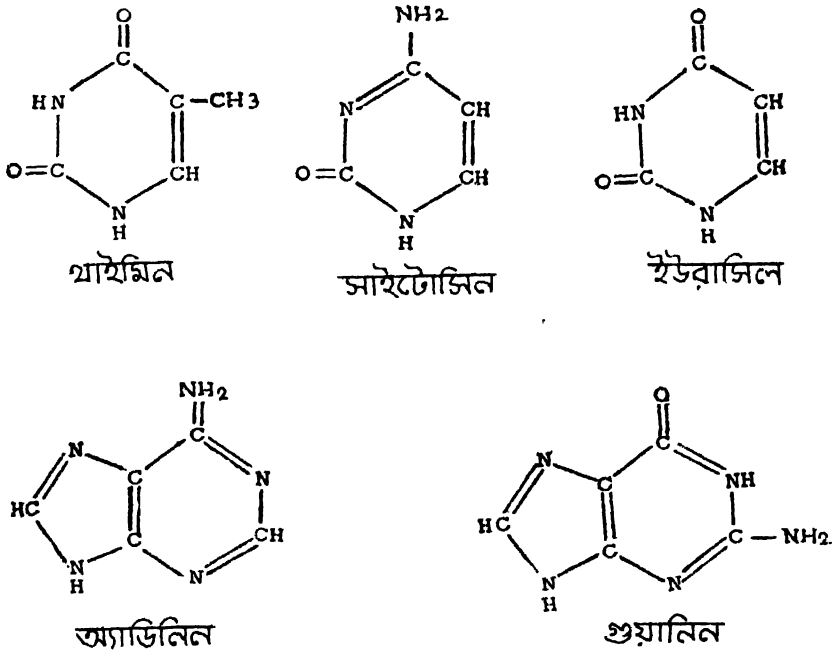
ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে Meischer 'নিউক্লিন' (nuclein) আবিষ্কার করেছিলেন। এই নিউক্লিনকেই এখন নিউক্লিওপ্রোটিন (nucleoprotein) বলা হয়। নিউক্লিওপ্রোটিনে নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন থাকে।

সব কোষের নিউক্লিয়াসে নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। সাইটোপ্লাজমের রাইবোসোমেও নিউক্লিক অ্যাসিড (RNA) থাকে। নিউক্লিক অ্যাসিডের অণুগুলি খুব দীর্ঘ এবং এদের আণবিক ওজন কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ পর্যন্ত হয়।

নিউক্লিক অ্যাসিড দুই রকমের— DNA ও RNA। অধিকাংশ জীবেই DNA ও RNA থাকে। তবে কিছু ভাইরাস যেমন, তামাকের মোজেইক (tobacco mosaic) ও পোলিওমাইলিটিস (poliomyelitis) রোগের ভাইরাসে কেবল RNA থাকে। আবার ব্যাকটিরিয়োফাজে (bacteriophage) এবং অ্যাডিনোভাইরাসে (adenovirus) কেবল DNA পাওয়া যায়। সব নিউক্লিক অ্যাসিডই কতকগুলি ছোট ছোট অংশ দিয়ে তৈরি, এদের নিউক্লিওটাইড (nucleotide) বলে। প্রত্যেক নিউক্লিওটাইডে তিনটি পদার্থ থাকে। এই পদার্থগুলি হল— নাইট্রোজেন যুক্ত বেস (nitrogenous base), পাঁচ কার্বনযুক্ত পেন্টোজ শর্করা (pentose sugar) এবং ফসফরিক অ্যাসিড। শর্করা ডিঅক্সিরাইবোজ (deoxyribose) ধরনের হলে ঐ নিউক্লিক অ্যাসিডকে ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড বলে। রাইবোজ (ribose) শর্করা থেকে রাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড গঠিত হয়। নাইট্রোজেনযুক্ত বেসগুলি প্রধানত দুই রকমের— পিউরিন (purine) ও পিরিমিডিন (pyrimidine)। পিরিমিডিনে কার্বন ও নাইট্রোজেনের পরমাণু দিয়ে তৈরি একটি ছয় সদস্যযুক্ত রিঙ (ring) থাকে। পিউরিন পাঁচ ও ছয় সদস্যযুক্ত দু'টি রিঙ দিয়ে তৈরি। এই রিঙগুলিও কার্বন ও নাইট্রোজেনের পরমাণু দিয়ে গঠিত।

প্রধান দু'টি পিউরিন বেস হল অ্যাডিনিন (adenine), গুয়ানিন (guanine) এবং পিরিমিডিন বেসগুলি হল থাইমিন (thymine), সাইটোসিন (cytosine) ও ইউরাসিল (uracil) (চিত্র 93)। DNA-তে সাধারণত অ্যাডিনিন (A), গুয়ানিন (G), থাইমিন (T) ও সাইটোসিন (C) থাকে। কখনও কখনও সাইটোসিনের পরিবর্তে 5-মিথাইল সাইটোসিন (5-methyl cytosine) পাওয়া যায় (যেমন, গমে)। RNA-তে

অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, ইউরাসিল (U) ও সাইটোসিন থাকে। শর্করা ও বেস একসাথে নিউক্লিওসাইড (nucleoside) গঠন করে। DNA অণুতে চার রকম নিউক্লিওসাইড থাকে। এগুলি হল ডিঅক্সিঅ্যাডিনোসিন (অ্যাডিনিন + ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা), ডিঅক্সিগুয়ানোসিন (গুয়ানিন + ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা), ডিঅক্সিসাইটিডিন (সাইটোসিন + ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা) এবং ডিঅক্সিথাইমিডিন (থাইমিন + ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা)। RNA-র নিউক্লিওসাইডগুলি যথাক্রমে হল অ্যাডিনোসিন, গুয়ানোসিন, সাইটিডিন এবং ইউরিডিন (ইউরাসিল + রাইবোজ শর্করা)। বেস + ডিঅক্সিরাইবোজ সিন্থেটেজ → নিউক্লিওসাইড + জল।



চিত্র—93

পিরিমিডিন বেস— থাইমিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিল এবং

পিউরিন বেস—অ্যাডিনিন ও গুয়ানিনের রাসায়নিক গঠন

নিউক্লিওসাইডের সাথে ফসফরিক অ্যাসিড যুক্ত হলে **নিউক্লিওটাইড** তৈরি হয়। DNA-তে চার রকমের নিউক্লিওটাইড পাওয়া যায়। এই নিউক্লিওটাইডগুলি হল— (a) ডিঅক্সিঅ্যাডিনিলিক (adenylic) অ্যাসিড (অ্যাডিনিন + ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা + ফসফরিক অ্যাসিড), (b) ডিঅক্সিগুয়ানিলিক (guanylic) অ্যাসিড (গুয়ানিন +

ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা + ফসফরিক অ্যাসিড), (c) ডিঅক্সিসাইটিডিলিক (cytidylic) অ্যাসিড (সাইটোসিন + ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা + ফসফরিক অ্যাসিড) (d) ডিঅক্সিথাইমিডিলিক (thymidylic) অ্যাসিড (থাইমিন + ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা + ফসফরিক অ্যাসিড)। RNA-র নিউক্লিওটাইডগুলি যথাক্রমে হল অ্যাডিনিলিক অ্যাসিড বা অ্যাডিনিলেট, গুয়ানিলিক অ্যাসিড বা গুয়ানিলেট, সাইটিডিলিক অ্যাসিড বা সাইটিডিলেট এবং ইউরিডিলিক অ্যাসিড বা ইউরিডিলেট (ইউরাসিল + রাইবোজ শর্করা + ফসফরিক অ্যাসিড)। অনেকগুলি নিউক্লিওটাইড পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি বহু নিউক্লিওটাইডযুক্ত সূত্র বা পলিনিউক্লিওটাইড চেন (polynucleotide chain) গঠন করে। DNA নির্ভরশীল DNA পলিমারেজ এনজাইম একটি নিউক্লিওটাইডের সাথে আরেকটি নিউক্লিওটাইডের সংযুক্তিকরণে সাহায্য করে (Kornberg 1968)। একটি নিউক্লিওটাইডে ফসফরিক অ্যাসিড শর্করার পঞ্চম কার্বনের সাথে এস্টার বন্ডের (ester bond অর্থাৎ C-O) মাধ্যমে যুক্ত হয়। শর্করার প্রথম কার্বনের সাথে বেসগুলি গ্লুকোসাইড বন্ড (অর্থাৎ N-C) দিয়ে যুক্ত থাকে।

বেসগুলি শর্করা অণুর সাথে মোটামুটি 52^0 কোণে যুক্ত থাকে। একটা নিউক্লিওটাইডের সাথে পাশের নিউক্লিওটাইড 3'-5' ইন্টারনিউক্লিওটাইড ফসফোডাইএস্টার (phosphodiester) বন্ড (একটি ডাইএস্টার বন্ডে দু'টি এস্টার বন্ড থাকে) দিয়ে যুক্ত থাকে। একটি নিউক্লিওটাইডের ফসফেট অণু পাশের নিউক্লিওটাইডের ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করার তৃতীয় কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে।

পলিনিউক্লিওটাইড চেনের এক প্রান্তে C-3 কার্বন অণুযুক্ত শর্করার অবশিষ্টাংশ (residue) থাকে, যা অন্য কোনও নিউক্লিওটাইডের সাথে যুক্ত থাকে না। পলিনিউক্লিওটাইড চেনের অপর প্রান্তে C-5 কার্বন অণুযুক্ত শর্করার অবশিষ্টাংশ, যা কিছুর সাথে যুক্ত থাকে না। এই প্রান্ত দু'টিকে যথাক্রমে 3' এবং 5' প্রান্ত বলে।

DNA-র চারটি নাইট্রোজেনযুক্ত বেস, নিউক্লিওসাইড এবং নিউক্লিওটাইডের তালিকা।

নাইট্রোজেন যুক্ত 'বেস' (base)	বেস + ডিঅক্সিরাইবোজ = ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিওসাইড	ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিওসাইড + ফসফরিক অ্যাসিড = ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিওটাইড	নিউক্লিওটাইডের সংক্ষিপ্ত নাম
1. অ্যাডিনিন (A)	ডিঅক্সিঅ্যাডিনোসিন	ডিঅক্সিঅ্যাডিনিলিক অ্যাসিড (ডিঅক্সি অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট)	dAMP

নাইট্রোজেন যুক্ত 'বেস' (base)	বেস + ডিঅক্সিরাইবোজ = ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিওসাইড	ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিওসাইড + ফসফরিক অ্যাসিড = ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিওটাইড	নিউক্লিওটাইডের সংক্ষিপ্ত নাম
2. গুয়ানিন (G)	ডিঅক্সিগুয়ানোসিন	ডিঅক্সিগুয়ানিলিক অ্যাসিড (ডিঅক্সি গুয়ানোসিন মনোফসফেট)	dGMP
3. সাইটো-সিন (C)	ডিঅক্সিসাইটিডিন	ডিঅক্সিসাইটিডিনিলিক অ্যাসিড (ডিঅক্সি সাইটিডিন মনো-ফসফেট)	dCMP
4. থাইমিন (T)	থাইমিডিন	ডিঅক্সিথাইমিডিলিক অ্যাসিড (থাইমিডিন মনোফসফেট)	dTMP

বেসের (base) ধর্ম ঃ

(i) পিউরিন এবং পিরিমিডিন বেসগুলি জলে অদ্রবণীয়।

(ii) পিউরিন এবং পিরিমিডিন বেসগুলি সামান্য ক্ষার প্রকৃতির।

(iii) এই বেসগুলি 250-260μm অঞ্চলে অতি বেগুনী রশ্মি (ultra violet ray বা UV ray) খুব বেশি শোষণ করে। তবে এই শোষণ প্রধানত 260μm অঞ্চলেই হয়।

(iv) নাইট্রোজেনযুক্ত বেসের কার্বন অণুগুলির মধ্যে পর্যায়ক্রমে একক বন্ধন (single bond) এবং দ্বি-বন্ধন (double bond) থাকে। এই বন্ধনগুলি অবিরাম পরস্পর পরিবর্তিত হয় বা বিনিময় করে (interchange)।

(v) বেশিরভাগ কোষে মুক্ত পিউরিন এবং পিরিমিডিন খুব সামান্য পরিমাণ থাকে।

vi) মুক্ত পিউরিন এবং পিরিমিডিন সহজেই ক্রোমাটোগ্রাফী বা ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে পৃথক করা যায়।

নিউক্লিওসাইডের ধর্ম ঃ

(i) মুক্ত বেসের তুলনায় নিউক্লিওসাইডগুলি অপেক্ষাকৃত বেশি জলে দ্রবণীয়।

(ii) এগুলি ক্ষার মাধ্যমেও (alkali) অপেক্ষাকৃত বেশি দ্রবণীয়।

(iii) পিউরিন এবং পিরিমিডিন নিউক্লিওসাইডগুলি নির্দিষ্ট উৎসেচক

নিউক্লিওসাইডেজেস দ্বারা আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়।

(iv) পিউরিন নিউক্লিওসাইডেসগুলি সহজেই অ্যাসিড দ্বারা আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় এবং এর ফলে মুক্ত বেস এবং পেন্টোজ শর্করা উৎপন্ন হয়।

(v) পিরিমিডিন নিউক্লিওসাইডগুলি অ্যাসিড দ্বারা আর্দ্র বিশ্লেষ (hydrolysis) প্রতিরোধ করে।

vi) অধিকাংশ কোষে মুক্ত নিউক্লিওসাইড খুব কম থাকে।

(vi) নিউক্লিওসাইডগুলি ক্রোমোটোগ্রাফী পদ্ধতিতে সহজে পৃথক করা যায় এবং সনাক্ত করা যায়।

ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইডের ধর্ম ঃ

(i) পিউরিন এবং পিরিমিডিনের উপস্থিতির জন্য ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইডগুলি অতি বেগুনী রশ্মি (UV ray) যথেষ্ট পরিমাণে শোষণ করে।

(ii) ফসফেট গ্রুপগুলি যথেষ্ট অম্ল প্রকৃতির (acidic)।

(iii) নিউক্লিওটাইডগুলি আয়ন-বিনিময় ক্রোমাটোগ্রাফী (ion-exchange chromatography) পদ্ধতিতে সহজেই পৃথক করা যায়।

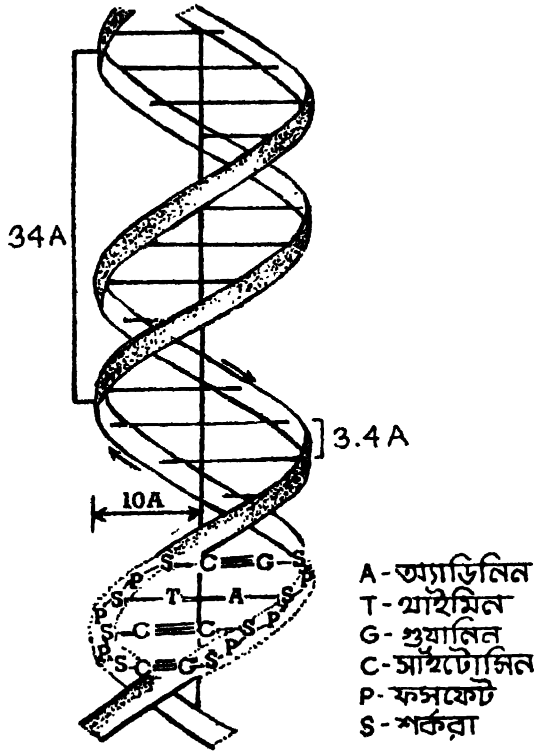
ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (DNA)

সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রোমোসোমে DNA পাওয়া যায়। তবে কিছু ভাইরাসে DNA-র বদলে RNA থাকে। ক্রোমোসোম ছাড়াও কোষের অন্য কোনও কোনও স্থানে DNA থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়ায়, প্লাস্টিডে এবং *Paramecium*-এর সেন্ট্রিওলে (centriole) DNA পাওয়া গিয়েছে। *Drosophila* এবং উভচর প্রাণীর ডিম্বাণুর নিউক্লিওলাসে DNA-র উপস্থিতি লক্ষ্য করা হয়েছে। বিভিন্ন জীবে DNA-র পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে। H. Ris ও R. N. Jones ('72) এর বিবরণ দিয়েছেন। DNA-র পরিমাণ পিকোগ্রামে (1 পিকোগ্রাম = 10^{-12} গ্রাম) প্রকাশ করা হয়। 31 সেমি. দীর্ঘ DNA-র ডাবল হেলিক্সের পরিমাণ এক পিকোগ্রাম হয়। বিভিন্ন জীবে DNA-র পরিমাণের তারতম্য হয়। ইউক্যারিওটে ব্যাকটিরিয়ার তুলনায় 10-100 গুণ বেশি DNA থাকে। *Trillium*-এ DNA-র পরিমাণ 120 পিকোগ্রাম, ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের DNA-র পরিমাণ 293 পিকোগ্রাম এবং মানুষের ডিপ্লয়েড কোষে DNA-র পরিমাণ 5-6 পিকোগ্রাম।

DNA অণু বেশ বড় (macromolecule)। এর আণবিক ওজন $10^6 - 10^7$ ডালটন। T_2 ব্যাকটিরিয়ফাজের DNA-র আণবিক ওজন 1.2×10^8 এবং *E. coli*-র DNA-র আণবিক ওজন মোটামুটি 2×10^9 ডালটন।

1938 খ্রিস্টাব্দে W. T. Astbury DNA-র ত্রিমাত্রিক গঠন সম্বন্ধে প্রথম বলেন। তিনি X রশ্মির ক্রিস্ট্যালোগ্রাফীর পরীক্ষা করেছিলেন। 1953 খ্রিস্টাব্দে J. D. Watson

ও F. H. C. Crick DNA-র গঠন সঠিকভাবে বর্ণনা করেন। তাঁরা Franklin ও M. H. F. Wilkins-এর এক্স রশ্মির সাহায্যে ক্রিস্ট্যালোগ্রাফী পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে DNA-র গঠনের বর্ণনা দেন। সব জীবের DNA-র গঠন মূলগতভাবে একই। DNA অণুতে দু'টি দীর্ঘ পলিনিউক্লিওটাইড সূত্র থাকে। DNA অণুর সূত্র দু'টি বিপরীত দিকে (anti-parallel) সাজান থাকে। অর্থাৎ, একটি সূত্রের 3' প্রান্ত অন্য সূত্রের 5' প্রান্তের দিকে থাকে। একটি প্রান্তে ফসফেট গ্রুপ ও অপর প্রান্তে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ (OH) থাকে। এই সূত্র দুইটি একটি মধ্য রেখার (central axis) চারিদিকে পরস্পর পেঁচিয়ে থাকে ও একটি ডবল হেলিক্স (double helix) তৈরি করে (চিত্র 94, 97)



চিত্র—94

DNA অণুর গঠন

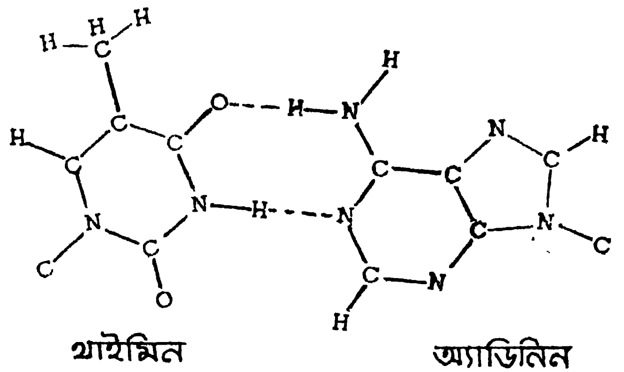
অর্থাৎ, DNA অণুর আকৃতি একটি ঘুরানো সিঁড়ির মতো। নিউক্লিওটাইড সূত্রের একটি পেঁচ (34Å দীর্ঘ) সম্পূর্ণ করবার জন্য দশটি নিউক্লিওটাইডের প্রয়োজন এবং একটি বেস থেকে পরের বেসের দূরত্ব 3.4Å। একটি DNA-তে 3000–4000টি নিউক্লিওটাইড থাকে। তবে কখনও কখনও একটি DNA অণুতে 30,000টি পর্যন্ত

নিউক্লিওটাইড থাকতে পারে। DNA অণুর প্রস্থ 20Å এবং এর দৈর্ঘ্য প্রস্থের হাজার গুণ হয়ে থাকে। DNA-র আণবিক ওজন 10^6–10^7 ডালটন।

DNA অণুর সূত্র দু'টির কাঠামো ফসফরিক অ্যাসিড ও শর্করা দিয়ে তৈরি এবং এই সূত্র দু'টি নাইট্রোজেন বেস দিয়ে হাইড্রোজেন বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত থাকে অর্থাৎ, একটি সূত্রের একটি বেস অন্য সূত্রের আরেকটি বেসের সাথে যুক্ত থাকে।

বেস দুইটির অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণুর মধ্যে হাইড্রোজেন বণ্ড গঠিত হয়। DNA অণুর দীর্ঘ অক্ষের সমকোণে বেসগুলি সাজান থাকে। একটা সূত্রের নিউক্লিওটাইডের শর্করা অংশ বিপরীত নিউক্লিওটাইডের (অপর সূত্রের) শর্করা থেকে সব সময় 11Å দূরে থাকে। এই নির্দিষ্ট দূরত্বের জন্য কোনও জোড়ার একটা বেস যদি পিউরিন হয়, তবে অন্য বেসটা পিরিমিডিন হবে।

অ্যাডিনিন (A) সব সময় থাইমিনের (T) সাথে (চিত্র 95) দু'টি হাইড্রোজেন বন্ডের সাহায্যে এবং গুয়ানিন (G) সাইটোসিনের (C) সাথে তিনটি হাইড্রোজেন



চিত্র—95

DNA অণুতে পিরিমিডিন বেস (যেমন, থাইমিন) পিউরিন বেসের (যেমন, অ্যাডিনিন) সাথে হাইড্রোজেন বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত থাকে

বন্ডের সাহায্যে যুক্ত থাকে। এজন্য কোনও প্রজাতির অ্যাডিনিনের পরিমাণ ও থাইমিনের পরিমাণ সমান হয়। একই ভাবে গুয়ানিন ও সাইটোসিনের অনুপাত 1:1 হয় (E Chargaff 1953)। কিন্তু অ্যাডিনিন ও গুয়ানিনের অনুপাত বা থাইমিন ও সাইটোসিনের অনুপাতের তারতম্য হয়ে থাকে। এই অনুপাত সাধারণত 0.7 থেকে 1.7 পর্যন্ত হয়।

একটি DNA অণুতে বেস জোড়াগুলি (A-T, T-A, G-C, C-G) বিভিন্নভাবে সাজান থাকতে পারে। DNA অণুর সূত্র দু'টির একটি অন্যটির পরিপূরক। একটি সূত্রের কোনও অংশের বেসের ক্রম যদি CTGC ইত্যাদি হয়, তবে অন্য সূত্রের ঐ অংশের বেসের ক্রম হবে GACG ইত্যাদি (চিত্র 94)

DNA অণুর দ্বিসূত্রযুক্ত গঠনের ফলে এর মধ্যে বিভিন্ন জেনেটিক তথ্য (coded information) সংরক্ষণে সুবিধা হয়। যেহেতু DNA অণুর পলিনিউক্লিওটাইড সূত্র দু'টির একটি অন্যটির পরিপূরক, সেজন্য কোনও কোডের তথ্য DNA অণুতে দ্বিগুণ অবস্থায় সংরক্ষিত হয়। যদি একটি সূত্রের বেসের বিন্যাসে কোনও কারণে গোলযোগ দেখা দেয়, তাহলে অন্য সূত্রের বেসের যথাযথ ক্রম পরিপূরক সূত্রের ভুল সংশোধনে সাহায্য করে। এর ফলে DNA অণু যথাযথ বার্তা পাঠাতে সক্ষম হয়।

DNA অণুর দ্বিসূত্রযুক্ত প্রকৃতি M. H. F. Wilkins-এর এক্স রশ্মির ক্রিস্ট্যালোগ্রাফী (crystalography) পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত হয়। Kornberg দেখেন যে, DNA উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সব পদার্থের উপস্থিতিতে (অর্থাৎ নিউক্লিওটাইড, DNA পলিমারেজ ও কোফ্যাক্টর ইত্যাদি) DNA মুক্ত মাধ্যমে DNA উৎপন্ন হয় না। কিন্তু ঐ মাধ্যমে DNA দিলে DNA উৎপাদন শুরু হয়। এই পরীক্ষা DNA ছাঁচ থেকে DNA উৎপাদন সমর্থন করে।

Chargaff-এর বেসের তুল্যতার সূত্র (base equivalence rule) :

1949 থেকে 1953-র মধ্যে E. Chargaff ও তাঁর সহকর্মীরা পরিমাণগত ক্রোমোটোগ্রাফী পদ্ধতিতে (quantitative chromatography) বিভিন্ন বেস পৃথক করেন। তাঁরা বিভিন্ন জীবের DNA নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। দেখা গেছে, কোনও জীবের DNA-তে অ্যাডিনিন ও থায়ামিন সমপরিমাণ (A=T) এবং গুয়ানিন ও সাইটোসিন সমপরিমাণ (G=C) থাকে। পিউরিনের মোট পরিমাণ আবার পিরিমিডিনের মোট পরিমাণের সমান হয় অর্থাৎ, A+G=T+C। Chargaff-এর এই তুল্যতার সূত্র সব জীবেই প্রযোজ্য অর্থাৎ ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া, উদ্ভিদ, প্রাণী সব ক্ষেত্রেই একই নিয়ম লক্ষ্য করা হয়েছে। তবে উচ্চশ্রেণীর জীবে অ্যাডিনিন এবং থায়ামিনের পরিমাণ গুয়ানিন ও সাইটোসিনের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি থাকে। মানুষে A+T/G+C-র অনুপাত 1.4 : 1। অপর দিকে নিম্নশ্রেণীর জীবে অ্যাডিনিন ও থায়ামিন অপেক্ষাকৃত কম থাকে এবং গুয়ানিন ও সাইটোসিন যথেষ্ট বেশি থাকে। যেমন, *Mycobacterium tuberculosis*-এ A+T/G+C-র অনুপাত 0.6 : 1। সুতরাং, DNA দুই রকমের (i) নিম্নশ্রেণীর জীবে যথেষ্ট G+C বিশিষ্ট (ii) উচ্চ শ্রেণীর জীবে যথেষ্ট A+T বিশিষ্ট। এসব তথ্য থেকে Chargaff কিছু সিদ্ধান্ত করেন।

(i) অ্যাডিনিনের সংখ্যা ও থায়ামিনের সংখ্যা সমান হয় (A=T)। গুয়ানিনের সংখ্যা সাইটোসিনের সংখ্যার সমান (G=C) হয়। পিউরিনের পরিমাণ ও পিরিমিডিনের পরিমাণ সমান হয় (A+G=C+T)।

(ii) DNA-র বিভিন্ন বেসের বিন্যাস এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে আলাদা হয়।

(iii) একই প্রজাতির বিভিন্ন কলায় DNA-র বেসের বিন্যাস ও উপাদান একই থাকে।

(iv) নিকট সম্পর্কীয় প্রজাতির DNA-র বেসের উপাদান ও বিন্যাস মোটামুটি একই থাকে। দূর সম্পর্কীয় প্রজাতির DNA-র বেসের গঠনে পার্থক্য দেখা যায়।

(v) নিম্নশ্রেণীর জীবের DNA-তে GC-র প্রাধান্য দেখা যায়। উচ্চশ্রেণীর জীবের DNA-তে AT-র প্রাচুর্য দেখা যায়।

বিভিন্ন জীবের DNA :

ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাসের DNA অত্যন্ত সরল। এই DNA-তে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক জিন থাকে এবং এর আণবিক ওজনও খুব কম। এই DNA-র সাথে প্রোটিন যুক্ত থাকে না। এরকম DNA-কে জিনোফোর (genophore) বলে।

ইউক্যারিওট জীবের DNA জটিল। এই DNA-তে অনেক জিন থাকে এবং এর আণবিক ওজন অপেক্ষাকৃত বেশি। এরকম DNA বেসিক প্রোটিন হিস্টোনের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে।

ভাইরাসের DNA বা RNA

ভাইরাসে একটি DNA বা RNA অণু থাকে। এই DNA এক সূত্রযুক্ত অথবা দ্বিসূত্রযুক্ত।

কয়েকটি ভাইরাসের জিনোমের গঠন, আণবিক ওজন ও জিনের সংখ্যার তালিকা—

জীব	জিনোম	আণবিক ওজন $\times 10^{-6}$ ডালটন	জিনের সংখ্যা
RNA ভাইরাস			
a) আলুর স্পিন্ডিল 'টিউবার' ভাইরাস	রেখাকার, একসূত্রযুক্ত RNA	0.025-0.11	একের বেশি
b) পোলিও ভাইরাস	রেখাকার, একসূত্রযুক্ত RNA	2.6	4 (3)
DNA ভাইরাস			
a) পলিওমা ভাইরাস	বলয়াকার দ্বিসূত্রযুক্ত DNA	3	5
b) SV40 ভাইরাস	,,	3.2	6
c) φx 174 কোলিফাজ	বলয়াকার একসূত্রযুক্ত DNA	4.7	9

জীব	জিনোম	আণবিক ওজন ×10^{-6} ডালটন	জিনের সংখ্যা
d) অ্যাডিনো ভাইরাস টাইপ 12	রেখাকার দ্বিসূত্রযুক্ত DNA	21-22	38
e) হার্পিস সিমপ্লেক্স	,,	96	160
f) পারভোভাইরাস	রেখাকার একসূত্রযুক্ত DNA		

1. **DNA যুক্ত ভাইরাসের** DNA 20Å চওড়া হয়। এই DNA বলয়াকার অবস্থায় কিম্বা রেখাকার অবস্থায় থাকতে পারে। এর প্রান্ত বদ্ধ বা মুক্ত হয়।

(a) রেখাকার (linear) DNA— বেশিরভাগ ভাইরাসের DNA রেখাকার ডুপ্লেক্স হিসাবে থাকে (যেমন, T_2, T_4 ভাইরাসে)। তবে এগুলি প্রথমত বলয়াকার অবস্থায় তৈরি হয়েছে কিম্বা দ্বিগুণ হওয়ার আগে বলয়াকার অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। ল্যামডা ব্যাকটিরিয়ফাজের রেখাকার ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য 17.2μm ও আণবিক ওজন 32 মিলিয়ন। এই ক্রোমোসোমের প্রান্ত দু'টির মধ্যে সংসক্তি (cohesive) দেখা যায়। এর 5' প্রান্তটা একক সূত্র হিসাবে বেরিয়ে থাকে। 5' প্রান্ত ও 3' প্রান্তে বারোটি পরিপূরক বেস থাকে। এই পরিপূরক বেসগুলি পরস্পর যুক্ত হলে বলয়াকার ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। কোনও কোনও রেখাকার DNA-র প্রান্তের বেসের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। ভ্যাক্সিনিয়া ভাইরাসের রেখাকার দ্বিসূত্রযুক্ত DNA-র প্রান্ত দু'টি বদ্ধ থাকে।

(b) বলয়াকার DNA— কোনও কোনও ভাইরাসের DNA এক সূত্রযুক্ত (single strand) ও বলয়াকার হয়। এই ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য 1.77μm ও এর আণবিক ওজন 1.7 মিলিয়ন।

ভাইরাসের বলয়াকার DNA অনেক সময় পেঁচান অবস্থায় (super coil) থাকে। এরকম পেঁচকে সুপার কয়েল বলে। সুপার কয়েল গঠনের ফলে কিছু লুপ (loop) দেখা দিতে পারে।

φx 174 ব্যাকটিরিয়ফাজ যা *E. coli* ও *Shigella* ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে, সেই ভাইরাসে DNA একসূত্রযুক্ত ও বলয়াকার অবস্থায় থাকে। DNA বলয়াকার অবস্থায় থাকলেই কেবল এটা আক্রমণক্ষম অবস্থায় থাকে। এই DNA-তে 5375টি নিউক্লিওটাইড থাকে। এখানে বেসের অনুপাত A=T এবং G=C হয় না। এখানে বেসের অনুপাত হল 0.77A : 1.02T এবং 0.70G : 0.58C। এখানে নয়টি জিনের কোনও কোনওটি উপরিপন্নভাবে থাকে।

2. **RNA যুক্ত ভাইরাসের RNA**— ভাইরাসের RNA রেখাকার ও সাধারণত একসূত্রযুক্ত। এদের আণবিক ওজনের তারতম্য হয়। R17 ব্যাকটিরিয়ফাজের

আণবিক ওজন 1.05-1.2×10^6 ডালটন (একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন এক ডালটন) হয়, আবার রিয়ো ভাইরাসের (reovirus) আণবিক ওজন হল 17.0×10^6 ডালটন। R 17 এর এক সূত্রযুক্ত RNA সূত্রে 3482টি নিউক্লিওটাইড থাকে।

ব্যাকটিরিয়ার DNA

ব্যাকটিরিয়ার DNA ভাইরাসের DNA-র তুলনায় অনেক বড়। ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমোসোম হল একটি বড়, বলয়াকার বন্ধ ও দ্বিসূত্রযুক্ত DNA অণু। এই DNA-র চারিদিকে প্রোটিনের আবরণ থাকে না ও এটি সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায় থাকে। তবে ব্যাকটিরিয়ার DNA-র সাথে কিছু RNA যুক্ত থাকতে পারে ও এটি DNA অণুর ভাঁজ গঠনে (folded) সাহায্য করে। ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমোসোম কোষের মেসোসোম অঞ্চলের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে।

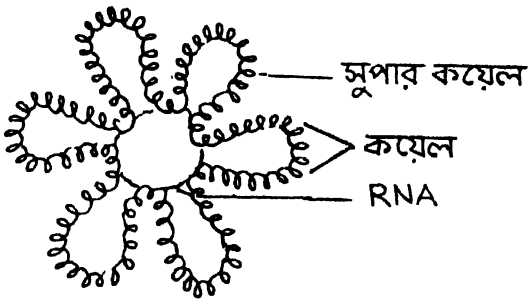
E. coli-র বলয়াকার ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য হল 1100μm এবং এটি 20Å চওড়া। এর আণবিক ওজন 2.5×10^9 ডালটন এবং এখানে 3.235×10^6-এর চেয়ে বেশি সংখ্যক নিউক্লিওটাইড জোড়া থাকতে পারে। এই ক্রোমোসোমে পঞ্চাশটি বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক সুপার কয়েল থাকতে পারে।

ভাঁজযুক্ত ক্রোমোসোমে মোটামুটি 50টি কয়েল বা লুপ গঠিত হয়। এই সংখ্যা 12-80 পর্যন্ত হতে পারে। প্রত্যেক লুপের নিচের দিকে (base) RNA অণুর ক্রস লিঙ্কেজ থাকে। এই ক্রস লিঙ্কেজ লুপ গঠনে সহায়তা করে। প্রত্যেক লুপের আয়তন সীমিত এবং এর সংখ্যা জিনোম প্রতি একশ হতে পারে। প্রত্যেক লুপে কতকগুলি সুপার কয়েল (super coil) থাকে। একটি সুপার কয়েলে প্রায় 400 জোড়া নিউক্লিওটাইড থাকে। নিউক্লিয়েড প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হলে অথবা RNAase-এর প্রভাবে সুপার কয়েল আর দেখা যায় না। RNA-র আং বিশ্লেষ সম্পূর্ণ হলে লুপগুলিও অদৃশ্য হয় এবং DNA ভাঁজহীন অবস্থায় থাকে। সুতরাং বলা যায় যে, নিউক্লিয়েড প্রোটিন এবং RNA সুপার কয়েল অবস্থা স্থায়ী করে।

E. coli ও অন্যান্য ব্যাকটিরিয়ায় প্রতি কোষে নিউক্লিও অঞ্চলে একটিমাত্র ক্রোমোসোম থাকে (চিত্র 96)। কিন্তু এই বলয়াকার ক্রোমোসোম ছাড়াও ব্যাকটিরিয়ার সাইটোপ্লাজম অঞ্চলে কিছু ছোট বলয়াকার দ্বিসূত্রযুক্ত DNA অণু থাকে। এদের প্লাসমিড (plasmid) বা এপিসোম বলে। সাধারণত প্রত্যেক কোষে এদের সংখ্যা 1-20 পর্যন্ত হয়। এপিসোম ও প্লাসমিডের মধ্যে পার্থক্য হল যে, এপিসোম হোস্ট বা পোষক (host) কোষের ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত হতে পারে এবং পোষক কোষের ক্রোমোসোমের বিভাজনের সাথে সাথে দ্বিগুণ হতে পারে, যেমন F^+ ফ্যাক্টর। কিন্তু প্লাসমিড পোষক ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত হয় না এবং স্বাধীনভাবে বিভাজিত হতে পারে, যেমন col ও R ফ্যাক্টর।

ব্যাকটিরিয়ায় সংশ্লেষের (conjugation) সময় এপিসোম দাতা কোষ (F^+) থেকে

গ্রহীতা কোষে (F^-) সঞ্চারিত হতে পারে। এই সময় এপিসোম দাতা কোষের ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে।



চিত্র—96

E. coli-র ক্রোমোসোমের কয়েল ও সুপার কয়েল গঠনের একটি নক্সাচিত্র

প্লাসমিডগুলি সাইটোপ্লাজমে স্বাধীনভাবে বিভাজিত হয়ে এক কোষ থেকে অন্য কোষে সরু পিলির (pili বা fimbriae) মাধ্যমে সঞ্চারিত হতে পারে। এরকম সঞ্চারণ কোষ বিভাজনের সাথে জড়িত নয়। কোষে অনেকগুলি প্লাসমিড উপস্থিত থাকলেও কিন্তু তা কোষের কোনও ক্ষতি করে না। বেশি তাপমাত্রা (যেমন, 42^0C), থাইমিনের অনুপস্থিতি, কিম্বা অ্যাক্রিডিন রঙের উপস্থিতিতে কোষের প্লাসমিডের সংখ্যা হ্রাস পায়।

Jacob এপিসোম শব্দটি 1960 খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্যবহার করেন।

এপিসোমের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) এপিসোম হল বলয়াকার, ছোট DNA অণু যা প্রয়োজনীয় নয়। সেজন্য এটি কোষে থাকতে অথবা না থাকতে পারে।

(ii) অনুপস্থিত থাকলে এপিসোম অন্য এপিসোমযুক্ত কোষ থেকে সংশ্লেষ বা সংক্রমণের মাধ্যমে আসতে পারে।

(iii) এপিসোম পৃথকভাবে বা ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে।

(v) এপিসোম উপস্থিত থাকলেও, পরে হারিয়ে যেতে পারে।

প্লাসমিড শব্দটি Lederbeig 1952 খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্যবহার করেন।

প্লাসমিডের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) প্লাসমিড DNA দিয়ে গঠিত।

(ii) প্লাসমিড ক্রোমোসোমের চেয়ে ছোট এবং ক্রোমোসোম থেকে পৃথকভাবে অবস্থান করে।

(iii) প্লাসমিড স্বজননে (replication) এবং রিকমবিনেশন সক্ষম।

Burno ও Bottino (1989) সব ধরনের অক্রোমোসোমীয় জেনেটিক পদার্থকে

প্লাসমিডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের মতে, এই জেনেটিক পদার্থ ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত অথবা বিযুক্ত অবস্থায় থাকে।

প্লাসমিড তিন রকমের—

(i) **F ফ্যাক্টর** বা উর্বরতার ফ্যাক্টর (fertility)— এটি F^+ ব্যাকটিরিয়ায় থাকে এবং সংশ্লেষের সময় F–ব্যাকটিরিয়ায় সঞ্চারিত হতে পারে।

(ii) **R প্লাসমিড বা R ফ্যাক্টর**— এই ফ্যাক্টর উপস্থিত থাকলে ব্যাকটিরিয়াটি বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক (যেমন— পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন, সালফোনিলঅ্যামাইড, ক্লোরামফেনিকল এবং স্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদি) প্রতিরোধ করতে পারে। R ফ্যাক্টর একটি ব্যাকটিরিয়ার অংশ অন্য ব্যাকটিরিয়ায় সঞ্চারিত করতে পারে। R ফ্যাক্টর ছোট বলয়াকার DNA, যা নানারকম ওষুধকে প্রতিরোধ করতে পারে। এটি এক ব্যাকটিরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটিরিয়ায় সঞ্চারিত হতে পারে।

(iii) **Col ফ্যাক্টর**— Col ফ্যাক্টর কলিসিন (colicin) তৈরি করতে পারে। কলিসিন হল বিষাক্ত অ্যান্টিবায়োটিক লাইপোকার্বোহাইড্রেট প্রোটিন। কলিসিন যে ব্যাকটিরিয়ায় উৎপন্ন হয়েছে, সেটি ছাড়া অন্যান্য ব্যাকটিরিয়াকে বিনষ্ট করে। এটি এক ব্যাকটিরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটিরিয়ায় সঞ্চারিত হয় এবং এক ব্যাকটিরিয়ার জিন অন্য ব্যাকটিরিয়ায় সঞ্চারিত করতে পারে।

প্লাসমিডের স্বজনন ও রিকমবিনেশন :

প্লাসমিড আংশিক রক্ষণশীল প্রক্রিয়ায় দ্বিগুণ হয়। প্লাসমিডের DNA অন্য প্লাসমিডের DNA-র সাথে অথবা ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমোসোমের DNA-র সাথে অংশ বিনিময় অর্থাৎ 'রিকমবিনেশন' করতে পারে। ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমোসোমের IS অঞ্চল অর্থাৎ 'সন্নিবিষ্ট ক্রম' (insertion sequence) প্লাসমিডের DNA-র সাথে সমসংস্থ (homologous)। এই অঞ্চল রিকমবিনেশনে সহায়তা করে।

প্লাসমিডের ব্যবহার :

জিনের ক্লোনিং এর সাম্প্রতিক অগ্রগতির ফলে বাহক অণু বা vector হিসাবে প্লাসমিডের যথেষ্ট গুরুত্ব বেড়েছে। সজীব জীব থেকে জিন পৃথক করা হয় অথবা mRNA বা নিউক্লিওটাইড থেকে জিন কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষ করা হয়। এই জিন ভেক্টর বা বাহকের সাহায্যে কোনও ব্যাকটিরিয়ার কোষে প্রবেশ করালে ঐ জিন ব্যাকটিরিয়ার কোষে স্বজনন (replicate) করতে পারে এবং কার্যকর থাকে। সুতরাং, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বায়োটেকনোলজিতে প্লাসমিডের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রোক্যারিওট ও ইউক্যারিওট DNA-র পার্থক্য

(i) সাধারণত প্রোক্যারিওটের DNA বলয়াকার এবং ইউক্যারিওটের DNA সূত্রাকার।

(ii) প্রোক্যারিওটের DNA প্রোটিন হিস্টোনের সাথে যুক্ত থাকে না, কিন্তু ইউক্যারিওটের DNA হিস্টোনের সাথে যুক্ত থাকে।

(iii) প্রোক্যারিওটের DNA সাধারণত একটি, কিন্তু ইউক্যারিওটের DNA কতকগুলি ক্রোমোসোমে থাকে।

(iv) প্রোক্যারিওট DNA-র প্রোটিনের সঙ্কেত বহনকারী জিনগুলি পৃথক থাকে (split) না। কিন্তু ইউক্যারিওটের প্রোটিনের সঙ্কেত বহনকারী জিনগুলি পৃথক থাকে ও এক্সন (exon) গঠন করে। দু'টি এক্সনের মাঝে ইন্ট্রন (intron) থাকে, এগুলি প্রোটিনের সঙ্কেত বহন করে না।

(v) অধিকাংশ প্রোক্যারিওটে ট্রান্সলেশন স্তরেই সব নিয়ন্ত্রণ হয়। কিন্তু ইউক্যারিওটে এরকম হয় না।

(vi) ইউক্যারিওটে তিন রকম RNA পলিমারেজ থাকে। প্রত্যেক পলিমারেজ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জিনের ট্রান্সক্রিপশন নিয়ন্ত্রণ করে।

ইউক্যারিওটের নিউক্লিও DNA

ইউক্যারিওটের নিউক্লিও DNA দ্বিসূত্রযুক্ত এবং সূত্রাকার। এই DNA হিস্টোনের সাথে যুক্ত হয়ে নিউক্লিওপ্রোটিন বা ক্রোমাটিন গঠন করে। ক্রোমাটিনের ঘনীভূত অবস্থা হল ক্রোমোসোম। ইউক্যারিওট কোষে কয়েকটি বা অনেকগুলি ক্রোমোসোম থাকে।

ইউক্যারিওট কোষের DNA অনেকবার ভাঁজ হয় এবং সুপারকয়েল অবস্থায় থাকে। যেমন মানুষের তের নম্বর ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য হল 32,000μm। এই DNA পেঁচিয়ে এবং সুপারকয়েল অবস্থায় মাত্র 6μm দৈর্ঘ্য এবং 0.8μm ব্যাস বিশিষ্ট ক্রোমাটিনের সৃষ্টি করে।

ইউক্যারিওটের অক্রোমোসোমীয় DNA

নিউক্লিয়াস ছাড়া সাইটোপ্লাজমের মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, প্লাস্টিড, সেন্ট্রিওলে DNA থাকে। ওই রকম DNA-কে সাইটোপ্লাজমীয় বা অক্রোমোসোমীয় DNA বলে।

মাইটোকন্ড্রিয় DNA (mtDNA)

ইউক্যারিওট কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্স অঞ্চলে দ্বিসূত্রযুক্ত বলয়াকার মাইটোকন্ড্রিয় DNA (mtDNA) থাকে। এই DNA-কে কন্ড্রিওন (chondrione) বলা হয়। এর সাথে হিস্টোন যুক্ত থাকে না। এই DNA-র দৈর্ঘ্য বিভিন্ন জীবে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। বহুকোষী প্রাণীতে mtDNA-র দৈর্ঘ্য 4.4μm থেকে 5.6μm হয়। এদের আণবিক ওজন 11×10^6 ডালটন। *Euglena*-র mtDNA-র দৈর্ঘ্য মাত্র 1.0μm। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের mtDNA-র দৈর্ঘ্য 19μm হতে পারে। তবে 62μm দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট্য ও 10^8 ডালটন আণবিক ওজনযুক্ত mtDNA উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ কোষে পাওয়া গেছে।

সবুজ শৈবাল *Chlamydomonas*-এর mtDNA সূত্রাকার (বা রেখাকার) এবং এখানে মাত্র 16000 নিউক্লিওটাইড থাকে। ইস্টের mtDNA-র কেবল এক তৃতীয়াংশ

প্রোটিনের জন্য কোড বহন করে।

নিউক্লিয় DNA-র সাথে mtDNA-র কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়েছে (a) মাইটোকন্ড্রিয় DNA-র GC-র পরিমাণ নিউক্লিয় DNA-র চেয়ে বেশি এবং mt DNA-র ঘনত্বও বেশি। (b) mtDNA বলয়াকার। (c) mtDNA নিউক্লিও DNA-র তুলনায় বেশি তাপমাত্রায় বিনষ্ট হয়। (d) mtDNA-র গুণে পরিবর্তনের (denaturation) হার বেশি।

mtDNA-তে যেসব গঠনগত জিন থাকে তা প্রধানত রাইবোসোম উৎপাদন, মাইটোকন্ড্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট tRNA-র ট্র্যান্সক্রিপশন, মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন ও সবাত শ্বসনের সাথে জড়িত। তবে বিভিন্ন জীবে নিউক্লিও জিনও মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন ও কাজকে প্রভাবিত করে। কোনও কোনও মাইটোকন্ড্রিয় এনজাইমের উৎপাদনের জন্য 'কোড' নিউক্লিয় জিনে থাকে।

প্রতি মাইটোকন্ড্রিয়ায় 4-6 টি একই রকম DNA অণু থাকে। মাইটোকন্ড্রিয় DNA বিভাজিত (স্বজনন) হয়। mt DNA-র বিভাজন নিউক্লিও DNA-র সাথে হয় না। মাইটোকন্ড্রিয় DNA-র বিভাজনের জন্য প্রয়োজনীয় DNA পলিমারেজের গঠন নিউক্লিও DNA পলিমারেজের থেকে আলাদা। মাইটোকন্ড্রিয় RNA-র গঠন নিউক্লিও RNA থেকে আলাদা। এই RNA mtDNA থেকে গঠিত হয়। তবে মাইটোকন্ড্রিয় DNA-র স্বজনন এবং প্রকাশের জন্য নিউক্লিও DNA-র সহযোগীতা একান্ত প্রয়োজন।

ক্লোরোপ্লাস্ট DNA (ctDNA)

এই DNA-র গঠন মাইটোকন্ড্রিয় DNA-র মত। ctDNA বলয়াকার ও এর দৈর্ঘ্য হল 37μ-44μm এবং আনবিক ওজন হল 1×10^7 ডালটন। তবে সামুদ্রিক শৈবাল *Acetabularia mediterranea*-এ ctDNAর দৈর্ঘ্য 200μm পর্যন্ত হয় ও আণবিক ওজন 1×10^9 ডালটন। ctDNA থেকে প্লাস্টিডের নিজস্ব RNA তৈরি হয়। একটি ক্লোরোপ্লাস্টে ctDNA-র 20-60 টি প্রতিলিপি থাকে।

মাইটোকন্ড্রিয়ার মত ক্লোরোপ্লাস্টও নিউক্লিও জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। নিউক্লিয়াস ও ক্লোরোপ্লাস্টের জিনের মধ্যে সহযোগীতা দেখা যায়। সালোকসংশ্লেষে প্রয়োজনীয় একটি এনজাইম— রাইবোলোজ 1,5 ডাইফসফেট কার্বোক্সিলেজের প্রোটিনের দু'টি অংশ (subunit) আছে। এর ছোট অংশটি নিউক্লিও জিনের প্রভাবে ও বড় অংশটি প্লাস্টিডের জিনের প্রভাবে তৈরি হয়। মুক্ত ক্লোরোপ্লাস্ট DNA বিভিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে। কোনও কোনও ctDNA একটি বলয়যুক্ত, আবার অন্য কোনওটি 'ইন্টারলকড্ ডাইমার' হিসাবে থাকতে পারে। ডাইমার (dimer) আবার দুই রকমের।

(i) **বলয়াকার ডাইমার :** দু'টি মনোমারের মধ্যে রিকমবিনেশনের ফলে এরকম বলয়াকার ডাইমার গঠিত হয়। ctDNA-র 10% এই ধরনের।

(ii) **ক্যাটিনেটেড** (catenated) **ডাইমার** : মনোমারগুলি শৃঙ্খলের আংটার মত পরস্পর যুক্ত থাকে। ctDNA-র 2.5% এই ধরনের।

ctDNA-তে অদ্বিতীয় (unique) এবং পুনরাবৃত্তি সম্পন্ন (repetitive) উভয় ক্রমই দেখা যায়। পুনরাবৃত্তিসম্পন্ন ক্রমে দীর্ঘ পুনরাবৃত্তিযুক্ত অঞ্চল এবং খর্ব উল্টানো (inverted) অঞ্চল দেখা যায়।

সেন্ট্রিওলের (centriole) DNA

প্রাণী কোষের সেন্ট্রিওলে DNA থাকতে পারে। Randal এবং Disbrey *Paramecium*-এ এরকম DNA দেখেছিলেন। সেন্ট্রিওল প্রতি DNA-র পরিমাণ মোটামুটি 2×10^6 গ্রাম।

DNA-র স্বজনন (replication)— DNA অণু দ্বিগুণ হলে দু'টি একই আকৃতির ও প্রকৃতির DNA অণু গঠিত হয়। DNA উৎপাদন ইন্টারফেজের একটা বিশেষ পর্যায়ে হয় এবং এই পর্যায়কে S-অবস্থা (S = synthesis) বলে। ইন্টারফেজের S-অবস্থার আগের পর্যায়কে G_1 (G = gap) অবস্থা ও পরের পর্যায়কে G_2 অবস্থা বলে। DNA কী করে দ্বিগুণ হয় তা সঠিকভাবে Watson ও Crick প্রথম বর্ণনা করেন (চিত্র 98a-d)। পরে Kornberg, Stahl, Taylor প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ এ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। DNA সম্ভাব্য তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বিগুণ (replication) হতে পারে। এই পদ্ধতিগুলি হল—

(a) আংশিক রক্ষণশীল (semi-conservative)

(b) রক্ষণশীল (conservative)

(c) বিক্ষিপ্ত (dispersive)

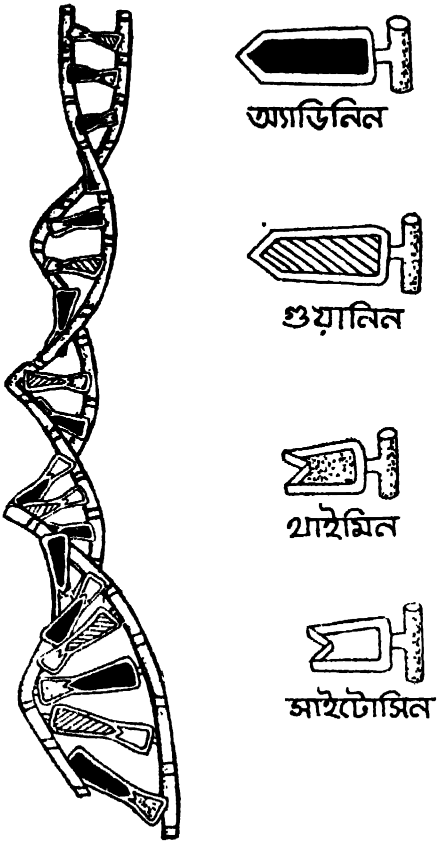
(a) আংশিক রক্ষণশীল (semi-conservative) (চিত্র 98, 99a)— DNA অণুর সূত্র দু'টির পেঁচ খুলে যায় ও এরা আলাদা হয়। সূত্র দু'টি আলাদা হওয়ার সময় হাইড্রোজেন বন্ডগুলি (hydrogen bond) ভেঙে যায়।

প্রত্যেকটি সূত্র একটা ছাঁচ হিসাবে কাজ করে। ওই ছাঁচের উপর একটি পরিপূরক সূত্র (complementary strand) তৈরি হয় ও বেসগুলির বিন্যাস অপরিবর্তিত থাকে। ফলে নতুন DNA অণু পুরনো DNA-র অনুরূপ হয়। নতুন DNA অণুর একটি সূত্র পুরানো ও অন্য সূত্রটি নতুন থাকে।

একটি DNA অণু দ্বিগুণ হওয়ার সময় এর এক প্রান্ত থেকে সূত্র দু'টির পেঁচ ক্রমশ খুলতে থাকে। দেখা যায় যে, একই DNA অণুর এক প্রান্তে যখন সূত্র দু'টি বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, তখন ওই অণুরই অপর প্রান্তে নতুন সূত্র গঠিত হতে শুরু করেছে (Leewinthel ও Crane 1965)। এর ফলে DNA অণুকে এই অবস্থায় Y আকৃতির দেখায় (চিত্র 98b, c)।

(b) **রক্ষণশীল** (conservative) (চিত্র 99b)— এখানে DNA অণুর সূত্র দু'টি

আলাদা হয় না, কিন্তু এই DNA-র বেস জোড়াগুলি নতুন সূত্রের বেসের বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করে। অপত্য DNA অণু দু'টির একটি সম্পূর্ণভাবে পুরনো ও অন্যটি সম্পূর্ণভাবে নতুন হয়।



চিত্র—97

DNA অণুর একাংশের গঠন

(c) বিক্ষিপ্ত (dispersive) (চিত্র 99C)— DNA অণুর সূত্র দু'টির মধ্যে পেঁচ খুলে যায়। প্রত্যেকটি সূত্র কতকগুলি অংশে ভেঙে যায়। দু'টি নবগঠিত DNA অণুর প্রত্যেক সূত্রের কিছু অংশ পুরনো ও কিছু অংশ নতুন থাকে।

DNA অণুর আংশিক রক্ষণশীল পদ্ধতিতে দ্বিগুণ হওয়ার সপক্ষে প্রমাণ— বিভিন্ন পরীক্ষা DNA-র আংশিক রক্ষণশীল পদ্ধতিতে দ্বিগুণ হওয়াকে সমর্থন করে। ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাসের ওপর গবেষণা থেকে জানা যায় যে, DNA অণু আংশিক রক্ষণশীল পদ্ধতিতেও দ্বিগুণ হয়।

(1) J. Cairns-এর অটোরেডিওগ্রাফি পরীক্ষা— J. Cairns (1963) ব্যাকটিরিয়া

Escherichia coli-তে তেজস্ক্রিয় থাইমিডিন প্রয়োগ করে অটোরেডিওগ্রাফি পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি হাইড্রোজেনের আইসোটোপ— H^3 যুক্ত ট্রিটিয়েটেড থাইমিডিন বা তেজস্ক্রিয় থাইমিডিনের মাধ্যমে *E.coli* কালচার করলে অপত্য DNA অণুতে তেজস্ক্রিয়তা দেখা দেয়। অটোরেডিওগ্রাফি পদ্ধতিতে দেখা গেছে যে, প্রথম বিভাজনের (replication) পর DNA অণুর দু'টি সূত্রের একটিতে কেবল তেজস্ক্রিয়তা দেখা যায়।



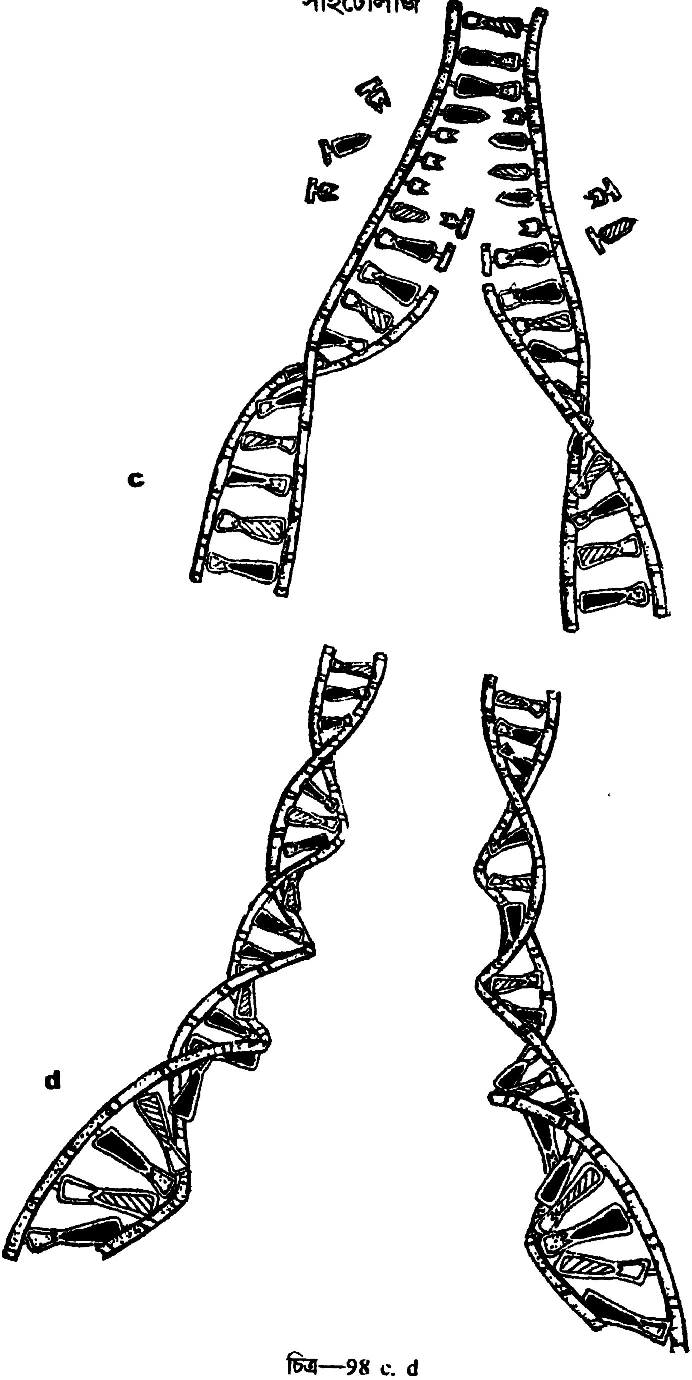
a b

চিত্র—98 a, b

DNA অণু দ্বিগুণ হচ্ছে, a–DNA অণুর সূত্র দু'টি আলাদা হতে শুরু করেছে, বেসগুলির মধ্যের হাইড্রোজেন বণ্ড ভেঙে যাচ্ছে,

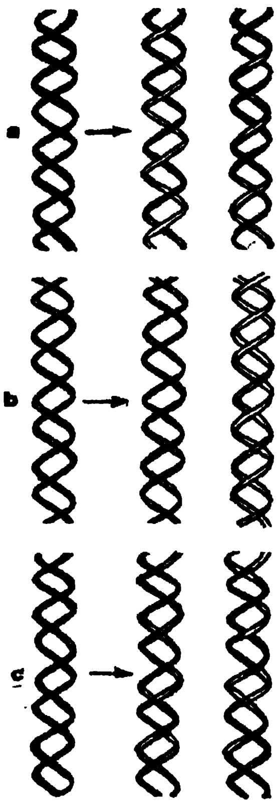
b–নির্দিষ্ট বিন্যাস অনুযায়ী পরিপূরক বেসগুলি DNA সূত্রের বেসের সাথে যুক্ত হচ্ছে ও এর ফলে দু'টি DNA অণু গঠিত হচ্ছে

(2) তেজস্ক্রিয় থাইমিডিন (thymidine) প্রয়োগ করে J. H. Taylor-এর (1957) পরীক্ষা DNA অণুর আংশিক রক্ষণশীল অর্থাৎ semiconservative পদ্ধতিতেই দ্বিগুণ হওয়াকে সমর্থন করে। ইন্টারফেজ অবস্থায় *Vicia faba*-র মূলের



চিত্র—৯৪ c. d

DNA অণু দ্বিগুণ হচ্ছে, c- একটি DNA অণু থেকে দু'টি DNA অণু তৈরি হচ্ছে, D-দু'টি DNA অণু গঠিত হয়েছে



চিত্র—99

DNA তিনটি সম্ভাব্য পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বিগুণ হতে পারে,
a-আংশিক রক্ষণশীল, b-রক্ষণশীল এবং c-বিক্ষিপ্ত

কোষগুলিকে অল্পক্ষণ তেজস্ক্রিয় থাইমিডিন দেওয়ার পর দেখা যায় যে, মেটাফেজ অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলির দু'টি অপত্য ক্রোমাটিডেই তেজস্ক্রিয় থাইমিডিন থাকে। তেজস্ক্রিয় থাইমিডিনের অনুপস্থিতিতে এসব কোষের দ্বিতীয় বিভাজন হলে দেখা যায় যে, কোষগুলি যখন মেটাফেজ অবস্থায় আসে, তখন প্রত্যেক ক্রোমোসোমের একটি করে ক্রোমাটিডে তেজস্ক্রিয় থাইমিডিন পাওয়া যায়। তৃতীয় বিভাজন হলে কেবল অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোসোমের একটি করে ক্রোমাটিডে তেজস্ক্রিয় থাইমিডিন থাকে (Hughes 1958)।

(3) M Messelson ও F. W. Stahl-এর (1958) পরীক্ষাও আংশিক রক্ষণশীল পদ্ধতিতে DNA-র দ্বিগুণ হওয়াকে সমর্থন করে। 1958 খ্রিস্টাব্দে M. Meselson

ও F. W. Stahl N^{15} আইসোটোপযুক্ত মাধ্যমে 14 প্রজন্ম (generation) ধরে *E. coli*-র কালচার করেন। এরকম কালচারে উৎপন্ন *E. coli*-র উভয় সূত্রেই N^{15} থাকে। যখন এরকম ব্যাকটিরিয়া N^{14} যুক্ত মাধ্যমে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন দেখা যায় যে, এই মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যাকটিরিয়ার DNA অণুর একটি সূত্রে N^{15} এবং অন্য সূত্রটায় N^{14} রয়েছে। N^{15} যুক্ত ভারী (heavier) সূত্রটি পুরনো ও অন্যটি নবগঠিত। সুতরাং, এসব সূত্রের ঘনত্ব (density) N^{15} ও N^{14} DNA-র মাঝামাঝি। পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে DNA দ্বিগুণ হওয়ার ফলে ক্রমশ DNA-র ঘনত্ব কমে যায় ও N^{14} DNA-র কাছাকাছি ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়।

তাছাড়া এসব পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক ক্রোমাটিডে কেবল একটি দ্বিসূত্রযুক্ত DNA অণু থাকে।

DNA উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম—DNA দ্বিগুণ হওয়ার সময় মোটামুটি 20টি বা ততোধিক প্রোটিন এবং উৎসেচকের প্রয়োজন।

DNA উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলি হল — A) DNA পলিমারেজ ও B) পলিনিউক্লিওটাইড লাইগেস (ligase)।

DNA পলিমারেজের সংযুক্তিকরণের জন্য তিনটি অঞ্চল রয়েছে। একটি অঞ্চল DNA ছাঁচের সাথে যুক্ত হয়। দ্বিতীয় অঞ্চলটি ট্রাইফসফেট নিউক্লিওটাইডের সাথে এবং তৃতীয় অঞ্চলটি DNA প্রাইমার 3'–OH প্রান্তে যুক্ত হয়। সুতরাং, DNA পলিমারেজ DNA প্রাইমার 5' প্রান্ত থেকে 3' প্রান্তের দিকে ট্রাইফসফেট নিউক্লিওটাইড যুক্ত করে। নতুন সূত্রের অংশগুলি এনজাইম পলিনিউক্লিওটাইড লাইগেসের প্রভাবে যুক্ত হয়।

DNA বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক :

বিভিন্ন প্রোক্যারিওট ও ইউক্যারিওট কোষে DNA-র ওপর কার্যকর উৎসেচকগুলি হল— নিউক্লিয়েজ (nuclease), পলিমারেজ (polymerase) এবং লাইগেস (ligase)।

i) **নিউক্লিয়েজ উৎসেচক** : এই উৎসেচকের প্রভাবে পলিনিউক্লিওটাইড সূত্রের নিউক্লিওটাইডগুলি পৃথক হতে পারে। নিউক্লিওটাইডগুলি 3' 5' ফসফোডাইএস্টার বন্ধন দিয়ে পরস্পর যুক্ত থাকে। এই বন্ধনের 3' অথবা 5' প্রান্তে নিউক্লিয়েজ আক্রমণ করে।

নিউক্লিয়েজ দুই রকমের— এক্সোনিউক্লিয়েজ এবং এন্ডোনিউক্লিয়েজ।

a) **এক্সোনিউক্লিয়েজ** (exonuclease)– এই উৎসেচক পলিনিউক্লিওটাইড সূত্রের মুক্ত প্রান্তকে (3' বা 5' প্রান্ত) আক্রমণ করে ও ধাপে ধাপে অপরদিকে চালিত হয়। এই উৎসেচক 3'–OH প্রান্ত বা 5'–P প্রান্তে প্রথম কাজ আরম্ভ করে।

b) **এন্ডোনিউক্লিয়েজ** (endonuclease) — এই উৎসেচক পলিনিউক্লিওটাইড সূত্রের মধ্যবর্তী কোনও অঞ্চলে কাজ আরম্ভ করে। পলিনিউক্লিওটাইড সূত্রটি এক

সূত্রযুক্ত হলে (যেমন— ভাইরাসের DNA) এন্ডোনিউক্লিয়েজের প্রভাবে একটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত হয়। যদি পলিনিউক্লিওটাইড সূত্রটি দ্বিসূত্রযুক্ত হয় (যেমন— প্রোক্যারিওট এবং ইউক্যারিওটের DNA), তাহলে এন্ডোনিউক্লিয়েজের প্রভাবে দু'টি সূত্রের একটি খণ্ডিত হয়। এর ফলে DNAটি খণ্ডিত হবে না, তবে এর একটি সূত্রে একটি ফাঁকের সৃষ্টি হবে, যেখানে দু'টি মুক্ত প্রান্ত দেখা যায়। এই প্রান্ত দু'টি বেঁকে যেতে পারে বা অটুট সূত্রকে সর্পিলভাবে বেষ্টন করতে পারে। এই মুক্ত প্রান্ত আবার এক্সোনিউক্লিয়েজ দিয়ে আক্রান্ত হতে পারে।

ii) **পলিমারেজ (polymerase) বা রেপ্লিকেজ (replicase) উৎসেচক** : এই উৎসেচক পলিমার গঠনে সহায়তা করে। পলিমারেজ উৎসেচকের প্রভাবে পলিনিউক্লিওটাইড সূত্রের প্রতিলিপি (copy) গঠিত হয়। সুতরাং, এর প্রভাবে ক্রোমোসোম দ্বিগুণ হয় (replication)।

In vitro DNA উৎপাদনের জন্য পলিমারেজ ছাড়া ডিঅক্সিনিউক্লিওসাইড ট্রাইফসফেটগুলি [(অর্থাৎ dAMP, dCMP, dGMP ও dTMP) বা দু'টি ফসফেট গ্রুপ যুক্ত হওয়ার পর (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)], 3'–OH প্রান্তের **প্রাইমার** সূত্র এবং DNA-র টেম্পলেটের (বা প্রতিলিপি) উপস্থিতি প্রয়োজন। সব DNA পলিমারেজ টেম্পলেট (ছাঁচ) সূত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রাইমার সূত্রে নিউক্লিওটাইড যুক্ত করে।

a) প্রোক্যারিওটের DNA পলিমারেজ (যেমন *E coli*-র) তিন রকমের, যেমন— DNA পলিমারেজ I ও II এবং DNA পলিমারেজ III। প্রথম দু'টি পলিমারেজ DNA-র মেরামত বা সংস্কারের জন্য (repair) প্রয়োজন। তৃতীয় পলিমারেজটি DNA দ্বিগুণ হওয়ার (replication) জন্য দরকার।

a_1) **DNA পলিমারেজ I** (Pol I) উৎসেচকটি Arthur Kornberg (1960) প্রথম পৃথক করেন। DNA পলিমারেজ I Okazaki খণ্ড থেকে RNA প্রাইমারকে সাধারণত পৃথক করে। এর ফলে উৎপন্ন ফাঁকটিকে পলিমারাইজকারী ধর্ম দ্বারা পূর্ণ করে। DNA পলিমারেজ I-এর পলিমারাইজকারী ক্ষমতা (সূত্রের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বা chain elongation) এবং এক্সোনিউক্লিয়েজ কার্যকারিতা দেখা যায়। এটিকে এই উৎসেচকের প্রুফ দেখা বা সম্পাদনার কাজ (editing) বলা হয়।

এই উৎসেচকের গঠন *E. coli* থেকে বিশদভাবে জানা গেছে। DNA পলিমারেজ I মোটামুটি গোলাকার এবং 6.5nm ব্যাসযুক্ত। এর আণবিক ওজন 1,90,000। মোটামুটি 1000টি অ্যামিনো অ্যাসিড রেসিডিউ যুক্ত হয়ে এর একটি মাত্র পলিনিউক্লিওটাইড চেন গঠন করেছে। DNA পলিমারেজ I-এর গঠন জটিল। এখানে 3'–5' এক্সোনিউক্লিয়েজ এবং 5'–3' এক্সোনিউক্লিয়েজ থাকে।

গোলাকার DNA পলিমারেজ I-এ পাঁচটি সক্রিয় বন্ধনকারী অঞ্চল (binding site) রয়েছে। এগুলি হল—

i) ছাঁচ অঞ্চল (template site), যা DNA ছাঁচের সাথে যুক্ত হয়।

ii) প্রাইমার অঞ্চল, যা DNA-র প্রাইমার (primer) সূত্রের সাথে যুক্ত হয়।

iii) প্রাইমারের শেষ নির্দেশক অঞ্চল, যা প্রাইমারের 3' হাইড্রক্সিল প্রান্তের সাথে যুক্ত হতে পারে।

iv) 5' ট্রাইফসফেট অঞ্চল, যা ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইডের 5' ট্রাইফসফেট গ্রুপের সাথে যুক্ত হতে পারে।

v) 5'-3' এক্সোনিউক্লিয়েজ অঞ্চল— এই অঞ্চলে 5'-3' এক্সোনিউক্লিয়েজ সক্রিয়তা দেখা যায়। এই অঞ্চলটি বৃদ্ধিশীল চেনের সাথে থাকে।

DNA পলিমারেজ I-এর বিভিন্ন কাজগুলি হল—

i) এটি DNA-র ক্ষতিগ্রস্থ অংশ সংস্কার বা মেরামত করে। এই সময়ে DNA-র 3' হাইড্রক্সিল প্রান্তে পলিমারেজ I-এর প্রভাবে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইডের রেসিডিউগুলি যুক্ত হয়।

ii) এটি 3'-5' এক্সোনিউক্লিয়েজের কাজ প্রভাবিত (catalyse) করে। প্রাইমার RNA-র প্রান্ত থেকে নিউক্লিওটাইডের অবশিষ্টাংশ (residue) বাদ দেয়।

iii) এটি 5'-3' এক্সেনিউক্লিয়েজের কাজ প্রভাবিত করে।

iv) রিকমবিনেশনের সময় DNA খণ্ডগুলিকে যুক্ত করে। মায়োসিসের প্রথম প্রফেজে বা ট্রান্সডাকশন বা জেনেটিক ট্রান্সফর্মেশনের সময় রিকমবিনেশন হতে পারে।

a_2) **DNA পলিমারেজ-II** (Pol II)— এর কাজ DNA পলিমারেজ I এর মত। এই উৎসেচকের প্রভাবে সূত্রটি 5'→3' দিকে বৃদ্ধি পায়।

a_3) **DNA পলিমারেজ III** বা Pol III উৎসেচক DNA দ্বিগুণ হওয়ার (replication) জন্য অত্যাবশ্যক। এই উৎসেচকের দশটি উপএকক রয়েছে। এগুলি হল আলফা (α), বিটা (β), এপসিলন (ε), থিটা (θ), টাউ (ι), গামা (γ), ডেল্টা (δ), ডেল্টা ড্যাস্ (δ'), কাই (χ), সি বা psi (Ψ)। in vitro DNA দ্বিগুণ হওয়ার জন্য এই সব উপএককগুলির প্রয়োজন। এসব উপএককগুলির কাজ বিভিন্ন। যেমন— α উপএককটির 3-5' এক্সোনিউক্লিয়েজ প্রুফ পড়া বা সম্পাদনার কাজ করে। উৎসেচকের কেন্দ্রস্থ অঞ্চলে (core) α, β ও θ থাকে। বাকি সাতটি উপএকক DNA পলিমারেজ সূত্রের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে হতে (processirity) সহায়তা করে।

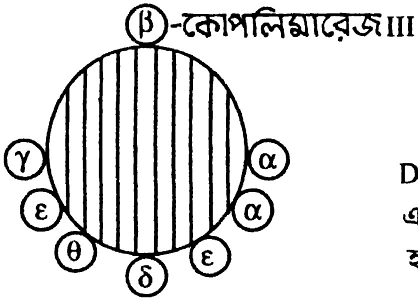
DNA পলিমারেজ তিনটির মধ্যে এই উৎসেচকই সবচেয়ে সক্রিয়। 1972 খ্রিস্টাব্দে J. Kornberg ও M. L. Gefter DNA পলিমারেজ III আবিষ্কার করেন। DNA পলিমারেজ III বড়, জটিল অণু ও কতকগুলি উপএকক বা subunit দিয়ে তৈরি। এর আণবিক ওজন মোটামুটি 550,000। DNA পলিমারেজ III DNA সূত্রের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই উৎসেচকের সাবইউনিট β বা কো-

পলিমারেজ III DNA-র প্রাইমার সূত্রের নির্দিষ্ট প্রারম্ভকারী অঞ্চল চিনতে পারে ও ঐ অঞ্চলের সাথে যুক্ত হয়।

b) ইউক্যারিওটের DNA পলিমারেজ— ইউক্যারিওটে (যেমন ইস্ট, ইঁদুর, মানুষ) পাঁচ রকমের DNA পলিমারেজ দেখা যায়। এগুলি হল DNA পলিমারেজ $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ এবং ε। এদের মধ্যে বড় DNA পলিমারেজ α গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া DNA পলিমারেজ δ ইউক্যারিওট DNA-র দ্বিগুণ হওয়ার জন্য প্রয়োজন।

পলিমারেজ III DNA সূত্রের নির্দিষ্ট প্রারম্ভিক অঞ্চলে যুক্ত হলে কো-পলিমারেজ III বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পলিমারেজ DNA সূত্রের 3' প্রান্তে পরপর নিউক্লিওটাইড যুক্ত করে সূত্রটিকে 5' প্রান্ত থেকে 3' প্রান্তের দিকে দ্বিগুণ হতে সহায়তা করে।

পলিমারেজ III DNA-র যে কোনও প্রান্তের প্রান্তীয় নিউক্লিওটাইডের আর্দ্রবিশ্লেষ (hydrolyse) করতে পারে।



DNA পলিমারেজ III হল এনজাইম। এর বিভিন্ন উপএককগুলি (subunit) হল : $\alpha, \beta, \gamma, \varepsilon, \theta, \delta, \varepsilon$ ইত্যাদি।

এই উৎসেচক 3'-5' এক্সোনিউক্লিয়েজ এবং 5'-3' এক্সোনিউক্লিয়েজ হিসাবে কাজ করতে পারে। DNA পলিমারেজ α হল বড় পলিমারেজ। এটি নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমে থাকে। DNA পলিমারেজ β-কে ছোট পলিমারেজ বা নিউক্লিও পলিমারেজ বলে। এটি কেবল মেরুদণ্ডী প্রাণীতে থাকে। DNA পলিমারেজ হল— মাইটোকন্ড্রিয় পলিমারেজ। DNA পলিমারেজ δ স্তন্যপায়ী প্রাণীর কোষে পাওয়া যায়। DNA পলিমারেজ ε বা DNA পলিমারেজ δ II স্তন্যপায়ী প্রাণীর Hela কোষে ও মুকুলোদগমকারী ইস্ট কোষে দেখা গেছে।

c) পলিনিউক্লিওটাইড লাইগেস বা DNA-লাইগেস— কোনও দ্বিসূত্রযুক্ত DNA-র একটি সূত্র এন্ডোনিউক্লিয়েজের প্রভাবে ভগ্ন অবস্থায় থাকতে পারে। DNA-র দু'টি খণ্ডের (fragment) প্রান্ত যুক্ত হতে পলিনিউক্লিওটাইড লাইগেস সহায়তা করে। এই উৎসেচক একটি DNA খণ্ডের 3' হাইড্রক্সিল গ্রুপের প্রান্তের সাথে অপর DNA-র খণ্ডের 5' ফসফেট গ্রুপের প্রান্তকে ফসফোডাইএস্টার বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত করে। নানা রকম লাইগেস রয়েছে। *E.coli*-র লাইগেসের কার্যকারিতার জন্য জারিত DNA-র উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। T_4 ব্যাকটিরিয়ফাজ লাইগেসের সংযুক্তির বিক্রিয়াকে

প্রভাবিত করার জন্য ATP-র উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

E. coli-র DNA লাইগেস একসূত্রযুক্ত এবং এর আণবিক ওজন মোটামুটি 77000। একটি *E. coli*-র কোষে এই উৎসেচকের 200-400টি প্রতিলিপি থাকে।

DNA লাইগেসের বিভিন্ন কাজগুলি হল—

i) DNA দ্বিগুণ হওয়ার সময় DNA খণ্ডগুলিকে যুক্ত করে।

ii) DNA সূত্রের কোনও একটি সূত্রের সংস্কার (repair) করে।

iii) সূত্রাকার DNA-র দু'টি প্রান্ত যুক্ত করে ও এভাবে বলয়াকার DNA-র সৃষ্টি হয়।

DNA-র দ্বিগুণ হওয়ায় RNA প্রাইমারের ভূমিকা ঃ

DNA উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় DNA পলিমারেজ কেবল RNA প্রাইমারের উপস্থিতিতেই কার্যক্ষম হয়। সেজন্য DNA উৎপাদনের আগে DNA-র একটি সূত্রের একটি বিশেষ অঞ্চলে DNA প্রাইমেজ উৎসেচকের উপস্থিতিতে RNA প্রাইমার উৎপন্ন হয়। Freifelder (1985) মতে, উৎপন্ন হওয়ার পর RNA প্রাইমার DNA ছাঁচের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। ইউক্যারিওটে RNA-এ প্রাইমার দশটি নিউক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত। এগুলি DNA-র ল্যাগিং (lagging বা বিলম্বিত) সূত্রে গঠিত হয়। পরে এগুলি বিচ্ছিন্ন হয় ও DNA সংস্কারকারী উৎসেচকের (যেমন- *E.coli*-র DNA পলিমারেজ I) প্রভাবে ঐ অঞ্চলে DNA সূত্রটি গঠিত হয়।

ব্যাকটিরিয়ায় দু'টি বিভিন্ন উৎসেচক RNA প্রাইমার গঠন করে। এগুলি হল RNA পলিমারেজ (প্রধান leading সূত্রে) এবং DNA প্রাইমেজ (বিলম্বিত সূত্রে)।

রেপ্লিকন (replicon) DNA ছোট ছোট এ কে অর্থাৎ রেপ্লিকনে দ্বিগুণ হয়, রেপ্লিকনের সংখ্যা বিভিন্ন জীবে ভিন্ন রকমের। *E.coli*-তে কেবল একটি রেপ্লিকন, ইস্টে 500টি রেপ্লিকন এবং প্রাণী ও উদ্ভিদে কয়েক সহস্র রেপ্লিকন থাকে। *E.coli*-র রেপ্লিকনে একটি প্রারম্ভিক অঞ্চল (ORI C) এবং একটি শেষ নির্দেশক অঞ্চল (ter A.F) থাকে। প্রারম্ভিক অঞ্চলে প্রচুর A-T থাকে।

DNA হেলিক্স উন্মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন

T_4 ফাজে B. Alberts পাক খোলার প্রোটিন বা unwinding protein আবিষ্কার করেন। এর আণবিক ওজন মোটামুটি 10000 থেকে 75000। প্রোক্যারিওট এবং ইউক্যারিওট কোষে এই প্রোটিন পাওয়া যায়। DNA-র নির্দিষ্ট অঞ্চলে এই প্রোটিন যুক্ত হয় ও DNA অণুর সূত্র দু'টির পাক খুলতে সহায়তা করে।

পেঁচ খোলার প্রোটিন (unwinding protein) বা survelase সুপার কয়েলযুক্ত DNA অণুর একটি সূত্রে একটি খাঁজ (nick) সৃষ্টি করে। এর ফলে DNA অণুর কিছু পেঁচ খুলে যায় এবং এজন্য পাকজনিত চাপ (torsional stress) হ্রাস পায়।

তিন রকমের প্রোটিন DNA হেলিক্সকে উন্মুক্ত করতে সহায়তা করে। এই উন্মুক্ত DNA ছাঁচ থেকে পলিমারেজের প্রভাবে নতুন DNA গঠিত হতে পারে। এগুলি হল— DNA হেলিকেজ, DNA সূত্র অস্থায়ীকারী (destabilizing) উৎসেচক এবং টোপোআইসোমারেজ বা DNA গাইরেজেস।

i) **DNA হেলিকেজ** হল ATP নির্ভরশীল উৎসেচক, যা DNA অণুর সূত্র দু'টি পৃথক করে রেপ্লিকেশন fork এর সৃষ্টি করে। এই উৎসেচক ATP-কে আর্দ্র বিশ্লেষ করে। এটি DNA-র একটি সূত্রে যুক্ত হয় ও ঐ সূত্রের দৈর্ঘ্য বরাবর চালিত হয়। কোনও DNA অণু উন্মুক্ত হয়ে এর পেঁচ খুলে যাবার জন্য ঐ অণুর দু'টি সূত্রের জন্য দু'টি DNA হেলিকেজের প্রয়োজন হয়।

ii) **হেলিক্স অস্থায়ীকারী সূত্র বা SSBP** (একক সূত্র DNA বন্ধনকারী প্রোটিন বা single strand DNA binding protein)— এই উৎসেচক DNA অণুর একটি উন্মুক্ত সূত্রের পুনরায় পেঁচিয়ে যাওয়া রোধ করে। এই প্রোটিন উন্মুক্ত DNA সূত্রের সাথে যুক্ত হয়, কিন্তু বেসগুলিকে আবৃত করে না। সেজন্য ঐ বেসগুলি ছাঁচ হিসাবে কাজ করতে পারে।

iii) **টোপোআইসোমারেজ বা DNA গাইরেজেস (gyrases)**— DNA হেলিকেজের প্রভাবে DNA সূত্রদ্বয়ে পজেটিভ সুপার কয়েলের সৃষ্টি হয়। টোপোআইসোমারেজ এই সুপার কয়েলকে শিথিল করে।

রেপ্লিসোম **(replisome)** ও প্রাইমোসোম **(primosome)**— DNA পলিমারেজ, RNA প্রাইমেজ, হেলিকেজ ইত্যাদি একসাথে একটি বহুউৎসেচক যৌগ (multienzyme complex) বা রেপ্লিসোম গঠন করে (N. K. Sinha ও A. Kornberg)। এই উৎসেচক সমষ্টি DNA-র দু'টি সূত্রের (প্রধান সূত্র ও বিলম্বিত সূত্র বা leading and lagging strand) সংশ্লেষ সমন্বয়মূলকভাবে ও দ্রুত হতে সাহায্য করে।

প্রোটিন DNA হেলিকেজ প্রাইমেজ অণুর সাথে যুক্ত হয়ে lagging সূত্রে প্রাইমোসোম গঠন করে, যা DNA অণুর উন্মুক্ত দ্বিধা বিভাজিত (fork) অঞ্চল থেকে চালিত হয় এবং এই সময় RNA প্রাইমার সংশ্লেষ করে।

DNA-র দ্বিগুণ হওয়া (replication)

প্রোক্যারিওটে DNA-র দ্বিগুণ হওয়া (replication) :

E. coli-তে 'in vitro' DNA-র দ্বিগুণ হওয়া বিশদভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে। DNA কতকগুলি ধাপে দ্বিগুণ হয়।

1. **DNA দ্বিগুণ হওয়ার প্রারম্ভ** (initiation)— এই প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ হল— a) DNA দ্বিগুণ হওয়ার প্রারম্ভিক অঞ্চলের (O) সনাক্তকরণ, b) দ্বিসূত্রযুক্ত DNA-র (duplex) কোনও অংশ (O) উন্মুক্ত হয় ও একক সূত্রের (single strand)

সৃষ্টি হয়। c) উন্মুক্ত সূত্রের প্রত্যেকটির সাথে একটি হেলিকেসের (DNA β প্রোটিন) সংযুক্তি।

DNA-A (বা প্রারম্ভিক প্রোটিন) ও ATP যৌগ *E.coli*-র ori C অঞ্চলে যুক্ত হয়। এই যৌগ DNA অণুর সূত্র দু'টি উন্মুক্ত হতে সহায়তা করে। এই অঞ্চলে 13টি বেস জোড়া (13 base) তিন বার পুনরাবৃত্তি সম্পন্নভাবে (repeats) থাকে। DNA-র দ্বিগুণ হওয়ার প্রারম্ভিক অঞ্চলে HU বা IHF প্রারম্ভিক প্রোটিন থাকে। ATP, SSB প্রোটিন ও DNA গাইরেজেসের উপস্থিতিতে DNA অণুর উন্মুক্ত সূত্র দু'টির পেঁচ খুলতে থাকে।

প্রারম্ভিক অঞ্চল (ori C) থেকে দুই দিকে (bidirectional) পেঁচ খুলতে থাকে।

2. **DNA শৃঙ্খলের দীর্ঘ হওয়া** (elongation)— এই পর্যায়ে যে সব উৎসেচক এবং ফ্যাক্টরগুলির প্রয়োজন হয়, সেগুলি হল— i) হেলিকেজ বা DNA β ii) প্রাইমেজ বা DNA G, iii) DNA পলিমারেজ হল এনজাইম বা DNA pol III HE, iv) SSB প্রোটিন, v) RNA প্রাইমার অপসারণকারী RNAase H, vi) DNA পলিমারেজ I, যা RNA প্রাইমার দ্বারা সৃষ্ট ফাঁক পূরণ করে। vii) DNA লাইগেজ যা প্রাইমারবিহীন 'okazaki' সূত্রকে বিচ্ছিন্ন করে।

DNA সূত্র দীর্ঘ হওয়ার সময় নিচের পরিবর্তনগুলি পরপর হয়।

i) DNA β বা হেলিকেজ 5'-3' দিকে চালিত হয় ও 'replication fork' এর সৃষ্টি হয়।

ii) হেলিকেজযুক্ত DNA সূত্রটি হল বিলম্বিত সূত্র (বা lagging strand)। DNA প্রাইমেজ DNA β বা হেলিকেজের সাথে যুক্ত হয় ও প্রাইমোসোম গঠন করে। এটি lagging সূত্রের সাথে যুক্ত কতকগুলি প্রাইমার এবং প্রধান বা leading সূত্রের জন্য একটি RNA প্রাইমার গঠন করে।

iii) lagging সূত্রে DNA Pol III HE যুক্ত হয়। কিন্তু এটি DNA β হেলিকেজের বিপরীত দিকে চালিত হয়।

iv) DNA β হেলিকেজ, DNA G প্রাইমেজ এবং DNA Poll III HE ইত্যাদি DNA অণুর দীর্ঘায়ণে সমন্বয়মূলকভাবে কাজ করে। এই দীর্ঘায়ণ প্রধান সূত্রের তুলনায় বিলম্বিত সূত্রে (lagging strand) অধিক জটিলভাবে হয়।

ইউক্যারিওটের DNA-এর দ্বিগুণ হওয়া (replication) :

ইউক্যারিওটে DNA দ্বিগুণ হওয়ার জন্য বিভিন্ন DNA পলিমারেজ উৎসেচকের প্রয়োজন। যেমন— DNA পলিমারেজ α, DNA পলিমারেজ δ। DNA পলিমারেজ δ প্রধান DNA সূত্রের DNA সংশ্লেষ করে। কিন্তু DNA পলিমারেজ α lagging (বা বিলম্বিত) সূত্রে DNA সংশ্লেষ করে। এই দু'টি উৎসেচক ছাড়া DNA দ্বিগুণ হওয়ার জন্য ইউক্যারিওটে আর যে সব ফ্যাক্টরের প্রয়োজন, সেগুলি হল i) T অ্যান্টিজেন, ii) রেপ্লিকেশন ফ্যাক্টর A বা RF-A (বা RP-A বা ইউক্যারিওটিক SSB), iii)

টোপোআইসোমারেজ I, iv) টোপোআইসোমারেজ II, v) সাইক্লিন বা PCNA (prolifering cell nuclear antigen), vi) রেপ্লিকেশন ফ্যাক্টর C বা RF-C।

যেসব ধাপে ইউক্যারিওটের DNA দ্বিগুণ হয় সেগুলি হল :

i) DNA সংশ্লেষের আগে পেঁচবিহীন (unwound) DNA যৌগ উৎপাদনের জন্য যে সব প্রোটিনের প্রয়োজন হয়, সেগুলি হল— T অ্যান্টিজেন, RF-A টোপোআইসোমারেজ I ও II।

ii) ATP-র উপস্থিতিতে T অ্যান্টিজেন DNA-র I ও II অঞ্চলের সাথে multi-subunit complex (বহু উপএকক যৌগ) গঠন করে। এর ফলে স্থানীয়ভাবে পেঁচ খুলে (unwinding) যায়।

iii) DNA হেলিকেজের (T-ag) সহায়তায় এবং RF-A ও টোপোআইসোমারেজের উপস্থিতিতে DNA-র অণুর পেঁচ আরো বেশি খুলে যায়। DNA-র 'রেপ্লিকেশন fork' (প্রতিলিপি গঠনের দ্বিবিভাজনস্থল) অঞ্চলে টোপোআইসোমারেজ পেঁচ খুলতে সহায়তা করে।

iv) একসূত্রযুক্ত DNA-র পাঁক খুলতে RF-A বা SSB প্রোটিন সহায়তা করে।

v) DNA পলিমারেজ α–র সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত প্রাইমেজ প্রাইমার RNA সংশ্লেষে সাহায্য করে।

vi) DNA পলিমারেজ α 5'-3' দিকে okazaki fragment-এর সংশ্লেষে সাহায্য করে।

vii) রেপ্লিকেশন ফ্যাক্টর C (RF-C) এবং PCNA বা সাইক্লিনের প্রভাবে DNA পলিমারেজ α–র বদলে δ কার্যকর হয়। এর ফলে প্রধান সূত্রে (leading strand) DNA সংশ্লেষ অবিরামভাবে (continuously) হয়।

viii) পল α-প্রাইমেজ যৌগ বিলম্বিত সূত্রের (lagging strand) replication fork অঞ্চল থেকে okazaki খণ্ড সংশ্লেষে সহায়তা করে। এই ধাপটির বারবার পুনরাবৃত্তি হয়, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ DNA অণুটি দ্বিগুণ হচ্ছে।

ix) RNA প্রাইমারগুলি বাদ যায় এবং ঐসব অঞ্চলে প্রোক্যারিওটের মত DNA দ্বিগুণ হয়।

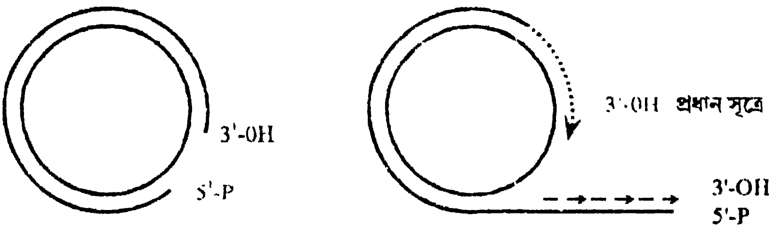
সম্প্রতি DNA-র দ্বিগুণ হওয়ায় DNA পলিমারেজ ε–এর ভূমিকা লক্ষ্য করা হয়েছে। সুতরাং, DNA দ্বিগুণ হওয়ার (replication) জন্য তিনটি DNA পলিমারেজ (α δ ও ε) গুরুত্বপূর্ণ। A. Sugino-র মতে, DNA পলিমারেজ α প্রধান ও বিলম্বিত উভয় সূত্রের (leading and lagging strand) দ্বিগুণ হতে সহায়তা করে। পলিমারেজ δ বিলম্বিত সূত্রের এবং পলিমারেজ ε প্রধান সূত্রের দীর্ঘ হতে সহায়তা করে।

DNA রেপ্লিকেশনের মডেল :

বিভিন্ন জীবে DNA দ্বিগুণ হওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মডেল পেশ করা হয়েছে।

1. **Replication fork model**— এটি সূত্রাকার ও বলয়াকার উভয় DNA-র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। Replication fork থেকে একদিকে (unidirectional) বা দুই দিকেই (bidirectional) DNA দ্বিগুণ হতে থাকে।

2. **Rolling circle model**— এটি ভাইরাসের DNA-র দ্বিগুণ হওয়ার ক্ষেত্রে এবং *E.coli*-র সংশ্লেষের সময়ে DNA দ্বিগুণ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই মডেল অনুসারে বলয়াকার DNA অণুর একটি সূত্রের কোনও স্থানে ফেটে যায় ও একটি 3'-OH প্রান্ত এবং একটি 5'-P প্রান্তের সৃষ্টি হয়। হেলিকেজ এবং SSB প্রোটিনের উপস্থিতিতে একটি 'replication fork'-এর সৃষ্টি হয়। প্রাইমারের সংশ্লেষের প্রয়োজন হয় না 3'-OH গ্রুপের উপস্থিতির জন্য। প্রধান সূত্রে ঐ ফাটল অঞ্চল দ্বিগুণ হতে থাকে। একই সময় বিলম্বিত সূত্রে (lagging strand) ছাঁচটি সরে যায়। এই সংশ্লেষের জন্য পলিমারেজ III-র প্রয়োজন। বিলম্বিত সূত্রটি যথাযথ প্রক্রিয়ায় দ্বিগুণ হয়। এরকম দ্বিগুণ হওয়ার সময় একটি বলয় ও একটি সোজা শাখা (linear branch) দেখা যায়। অর্থাৎ, এই সময় DNA অণুটি গ্রীক অক্ষর সিগমার মত দেখায়। সেজন্য এরকম দ্বিগুণ হওয়াকে rolling circle replication বলে।



চিত্র—100

Rolling circle replication (আবর্তনকারী বৃত্তের দ্বিগুণ হওয়ার পদ্ধতি)

DNA-র উৎপাদন— কৃত্রিম মাধ্যমে DNA সূত্র দ্বিগুণ হতে পারে। DNA-র একটি ছাঁচের উপস্থিতিতে DNA পলিমারেজ, চারটি বেসের ট্রাইফসফেটগুলি (ATP, GTP, CTP, TTP), কিছু কোফ্যাক্টর (যেমন, ম্যাগনেসিয়াম আয়ন) ইত্যাদি মিশালে ঐ ছাঁচের পরিপূরক DNA সূত্র গঠিত হয়। A. Kornberg ও তাঁর সহকর্মীরা এই পদ্ধতিতে DNA-র উৎপাদন করেছিলেন। তবে মাধ্যমে DNA-র অনুপস্থিতিতে অন্য সব উপাদানগুলি থাকলেও DNA উৎপাদন হতে পারে না।

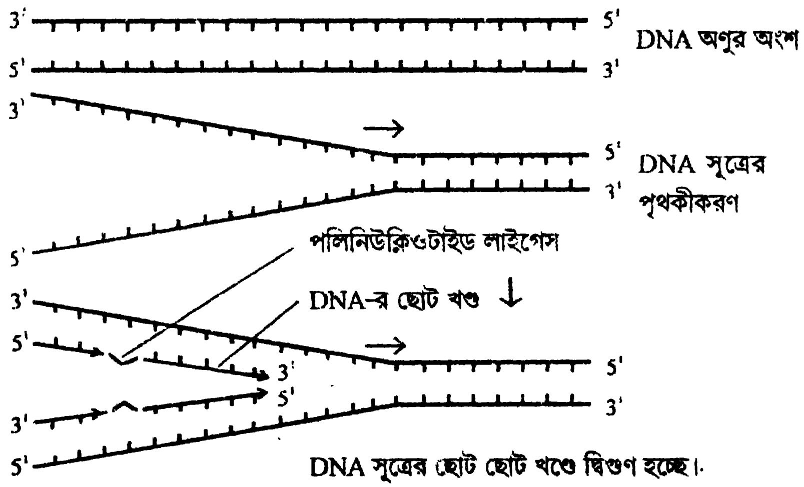
DNA এক দিকে বা দুই দিকে দ্বিগুণ হয় (unidirectional, bidirectional replication)। J. Cairns বলেন যে, DNA-র উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে শুরু

হয় ও একটি দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু আধুনিক বিভিন্ন পরীক্ষা DNA-র দ্বিগুণতা দুই দিকে (bidirectional replication) হওয়াকে সমর্থন করে। অটোরেডিওগ্রাফী, ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা এবং জেনেটিক পরীক্ষা এই ধারণাকে সমর্থন করে।

Levinthal ও Cairns বলেন যে, DNA দ্বিগুণ হওয়ার সময় সূত্র দু'টি সম্পূর্ণ খুলে যায় না। এক দিকে DNA সূত্র দু'টি পরস্পর থেকে পৃথক হয় (unzipping) এবং একই সাথে এই উন্মুক্ত সূত্রে যথাযথ নিউক্লিওটাইড যুক্ত হতে থাকে এবং নতুন DNA সূত্র গঠিত হতে থাকে। এজন্য একটি স্বজননশীল DNA অণুতে একটি Y-আকারের বৃদ্ধিশীল অঞ্চল দেখা যায়। Cairns ভাইরাসের স্বজননশীল বলয়াকার DNA-তে দু'টি Y-আকারের অঞ্চল লক্ষ্য করেন। এর একটিকে বৃদ্ধিশীল অঞ্চল (growing point) এবং অপরটিকে প্রারম্ভিক অঞ্চল (initiation point) বলা হয়।

DNA ছোট ছোট খণ্ডে দ্বিগুণ হয় :

DNA বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ ছোট ছোট খণ্ডে দ্বিগুণ হয় (discontinuous replication)। DNA পলিমারেজ 5'-3' প্রান্তের দিকে DNA-র দ্বিগুণ হওয়াকে সহায়তা করে।

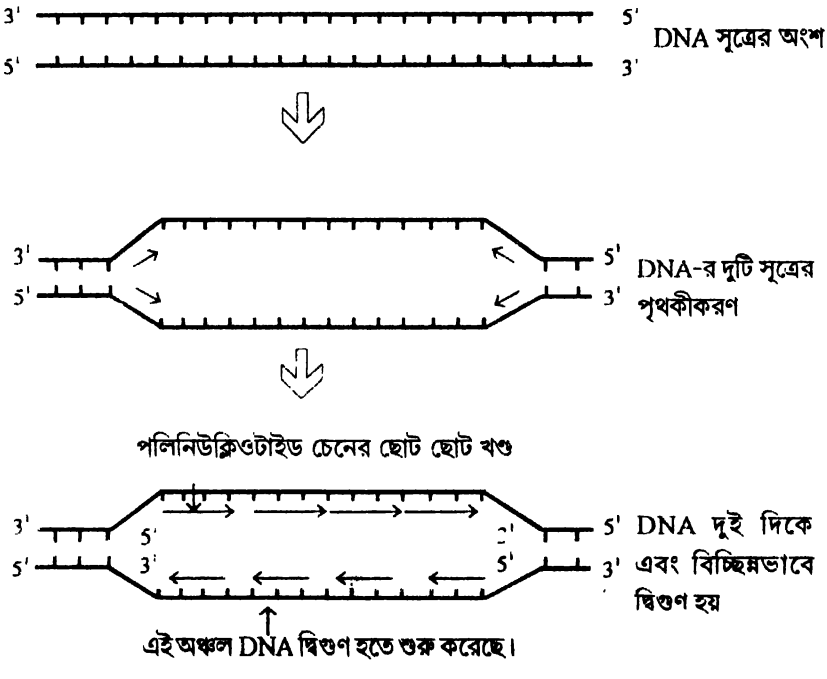


চিত্র—101

DNA ছোট ছোট খণ্ডে (বিচ্ছিন্নভাবে) দ্বিগুণ হচ্ছে।

বিজ্ঞানী Okazaki বলেন যে, DNA উৎপাদন একই সাথে দু'টি সূত্রে হয়। একই উৎসেচক অর্থাৎ DNA পলিমারেজের প্রভাবে DNA উৎপাদন ছোট ছোট অংশে

হয়। এই অংশগুলিকে Okazaki অংশ বলে। এসব অংশে 1000-2000টি নিউক্লিওটাইড থাকে। এসব অংশগুলি পলিনিউক্লিওটাইড লাইগেজের প্রভাবে যুক্ত হয়। অটোরেডিওগ্রাফী পরীক্ষা DNA-র এরকম দ্বিগুণ হওয়া সমর্থন করে।



চিত্র—102

DNA অণুর দুই দিকে দ্বিগুণ হওয়ার পদ্ধতি (bidirectional replication)

DNA-র পরিমাণ— ডিপ্লয়েড কোষের তুলনায় গ্যামেটে DNA-র পরিমাণ অর্ধেক থাকে। নিষেকে দুইটি গ্যামেটের মিলনের ফলে DNA-র পরিমাণ বেড়ে দেহ কোষের সমান হয়। ইন্টারফেজে DNA-র পরিমাণ বেড়ে দ্বিগুণ হয়। টেলোফেজের নিউক্লিয়াসে DNA-র পরিমাণ ইন্টারফেজের শেষের বা প্রফেজের প্রারম্ভের সময়ের DNA-র পরিমাণের অর্ধেক হয়। পলিপ্লয়েড কোষে DNA-র পরিমাণ পলিপ্লয়েডের মাত্রার ওপর নির্ভর করে। যেমন, টেট্রাপ্লয়েড কোষে হ্যাপ্লয়েড কোষের চার গুণ DNA থাকে।

DNA-র গঠনগত পার্থক্য— সাধারণত DNA অণু দ্বিসূত্রযুক্ত ও পেঁচান থাকে। কিন্তু কিছু ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাসের DNA একটা সূত্র দিয়ে তৈরি। এই সূত্রের রাসায়নিক গঠন দ্বিসূত্রযুক্ত DNA-র মতন।

1959 খ্রিস্টাব্দে Sinsheimer φx 174 ব্যাকটিরিয়ফাজ থেকে এক সূত্রযুক্ত DNA পৃথক করেছিলেন। এই সূত্রে 5,500 নিউক্লিওটাইড থাকে। এখানে A = T বা G = C হয় না। এই DNA বলয়াকার। এই ব্যাকটিরিয়ফাজ *E. coli*-র কোষে আক্রমণ করে ওই ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে। *E. coli*-র কোষে প্রবেশ করার পর DNA পলিমারেজের প্রভাবে φx 174 DNA-র একটা মাইনাস (-) সূত্র তৈরি হয়। এই সূত্র φx 174 এর মূল প্লাস (+) সূত্রের পরিপূরক। এই সূত্র দুইটি একটি 'প্লাস মাইনাস' DNA হেলিক্স গঠন করে। এরকম DNA-কে রেপ্লিকেটিভ ফর্ম বা RF বলে।

Escherichia coli ও কোনও কোনও ভাইরাসে বলয়াকার DNA অণু পাওয়া গিয়াছে।

DNA-র দ্বিগুণ হওয়ার (replication) প্রক্রিয়া

E. coli-তে DNA-র দ্বিগুণ হওয়া লক্ষ্য করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া কতকগুলি ধাপে হয়। এগুলি হল—

i) প্রারম্ভিক অঞ্চলের (initiation point) সনাক্তকরণ :

DNA-র দ্বিগুণ হওয়া একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে আরম্ভ হয়। এই অঞ্চল থেকে DNA অণুর সূত্র দু'টি পৃথক হতে (replication fork) আরম্ভ করে। প্রারম্ভিক অঞ্চলে 100 থেকে 200টি বেস জোড়া থাকে। প্রোক্যারিওট ক্রোমোসোমে কেবল একটি প্রারম্ভিক অঞ্চল থাকে। কিন্তু ইউক্যারিওটের প্রত্যেক DNA অণুতে অনেকগুলি (সম্ভবত এক হাজার পর্যন্ত) প্রারম্ভিক অঞ্চল দেখা যায়।

নির্দিষ্ট প্রারম্ভকারী (initiation) প্রোটিন DNA-র প্রারম্ভিক অঞ্চল সনাক্ত করতে পারে। এই প্রারম্ভকারী প্রোটিন DNA-সহ RNA পলিমারেজকে RNA প্রাইমার উৎপাদন করার জন্য নির্দেশ দেয়। DNA উৎপাদনের জন্য RNA প্রাইমারের প্রয়োজন।

ii) DNA অণুর পাক খুলে যাওয়া (unwinding) :

পাক খোলার প্রোটিন DNA অণুর খাঁজ অঞ্চলে যুক্ত হয়ে একটি লুপ (loop) বা ফাঁস খুলে দেয়। এভাবে DNA অণুর সূত্র দু'টি আলাদা হতে শুরু করে।

iii) RNA প্রাইমারের উৎপাদন :

DNA থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত RNA পলিমারেজ RNA প্রাইমার উৎপাদন করে। এগুলি 50 থেকে 100টি নিউক্লিওটাইডযুক্ত। RNA প্রাইমার DNA সূত্র দু'টির পরিপূরক।

কোনও রাসায়নিক পদার্থ, যেমন, রিফামপিসিন (refampicin) প্রয়োগ করে RNA উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে DNA দ্বিগুণ হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং, DNA উৎপাদনের জন্য RNA প্রাইমারের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। অন্য কয়েকটি পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যও এই ধারণাকে সমর্থন করে।

iv) RNA প্রাইমারের উপস্থিতিতে DNA উৎপাদন :

RNA প্রাইমারের 3' প্রান্তে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড যুক্ত হয়। DNA ছাঁচের 3'-5' প্রান্তের থেকে নতুন DNA সূত্র 5'-3' প্রান্তের দিকে গঠিত হয়। ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইডের সংযুক্তি ATP-র উপস্থিতিতে DNA পলিমারেজ III অর্থাৎ copol III দিয়ে প্রভাবিত হয়। DNA সূত্রের দ্বিগুণ হওয়া একবার আরম্ভ হলে copol III DNA সূত্রের দ্বিগুণ হওয়া চালিত করে। পাক খুলে দেওয়ার (unwinding) প্রোটিন DNA সূত্র যেখানে দ্বিগুণ হচ্ছে তার অগ্রবর্তী অঞ্চলে DNA অণুর সূত্র দু'টিকে পৃথক করে দিতে থাকে।

প্রধান DNA সূত্রটি 5'-3' প্রান্তের দিকে অখণ্ড অবস্থায় উৎপন্ন হয়। কিন্তু পরবর্তী অর্থাৎ lagging DNA সূত্র বিপরীত দিকে এবং ছোট ছোট খণ্ডে (যেমন, 1000 থেকে 2000টি নিউক্লিওটাইডযুক্ত) গঠিত হয়। এরকম খণ্ডগুলিকে Okazaki খণ্ড বলে।

v) RNA প্রাইমারের বিযুক্তি :

একটি 'Okazaki খণ্ড' গঠিত হলে RNA প্রাইমারের নিউক্লিওটাইডগুলি 5' থেকে একটির পর আরেকটি বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। DNA পলিমারেজের 5'3' এক্সোনিউ-ক্লিয়েজের কার্যকারিতার ফলে RNA প্রাইমারের নিউক্লিওটাইডগুলি বিচ্ছিন্ন হয়।

vi) Okazaki খণ্ডগুলির সংযুক্তি :

Okazaki খণ্ডগুলির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে DNA পলিমারেজ I-এর প্রভাবে পরিপূরক ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইডের অবশিষ্টাংশ যুক্ত হয়।

প্রোক্যারিওটের তুলনায় ইউক্যারিওটের DNA দ্বিগুণ হওয়া অপেক্ষাকৃত জটিল। ইউক্যারিওটে DNA একাধিক অঞ্চলে দ্বিগুণ হতে শুরু করে। এদের RNA প্রাইমার মোটামুটি দশটি নিউক্লিওটাইডযুক্ত এবং Okazaki খণ্ডগুলিও অপেক্ষাকৃত ছোট (মোটামুটি 100 থেকে 150টি নিউক্লিওটাইডযুক্ত)।

DNA-র সুপারকয়েলিং (supercoiling)

বদ্ধ বলয়াকার DNA (closed-circular DNA) : ভাইরাসের DNA, ব্যাকটিরিয়া এবং প্লাসমিডের DNA সাধারণত বদ্ধ বলয়াকার অবস্থায় থাকে। এই DNA-র দু'টি সূত্রের প্রত্যেকটি বলয়াকার এবং পরস্পর পেঁচান থাকে। সংযুক্তি (links) সংখ্যাকে লিঙ্কিং (linking) সংখ্যা (LK) বলে। এরকম DNA অণুর কোনও মুক্ত প্রান্ত থাকে না।

সুপারকয়েলিং (supercoiling) : DNA অণুর নিজ অক্ষের ওপর পেঁচানকে সুপারকয়েলিং বলে। লিঙ্কিং সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। সুপারকয়েলিং না হলে লিঙ্কিং সংখ্যা হয় LK^0। বেশিরভাগ স্বাভাবিক DNA নেগেটিভ সুপারকয়েলিংযুক্ত হয়। DNA অণুর সুপারকয়েলিং যদি DNA অণুর সূত্র দু'টি যেদিকে পেঁচান থাকে সেদিকে পেঁচিয়ে যায়, তাহলে এটিকে পজিটিভ সুপারকয়েলিং বলে। এর বিপরীত পেঁচকে

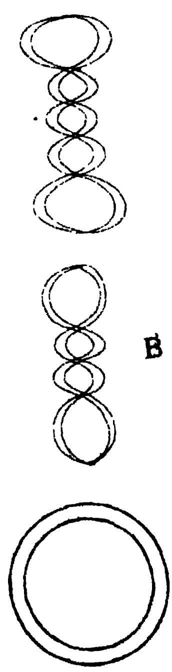
নেগেটিভ সুপারকয়েলিং বলে। কোষের প্রায় সব DNA অণু নেগেটিভ সুপারকয়েলিংযুক্ত হয়।

সুপারকয়েলিং-এর মাত্রা লিঙ্কিং সংখ্যার পরিবর্তন থেকে বোঝা যায়। শ্লথ (relaxed) অবস্থায় বদ্ধ বলয়াকার অণুর লিঙ্কিং সংখ্যা LK^0। এক্ষেত্রে বলয়টি বদ্ধ হওয়ার আগে 360^0 পেঁচিয়ে যায়। কোষ থেকে পৃথকীকৃত DNA নেগেটিভ সুপারকয়েলবিশিষ্ট হয়। এখানে হেলিক্সের 100টি পেঁচে (এক হাজার বেস জোড়া) ছয়টি সুপারকয়েলের পেঁচ থাকে অর্থাৎ, $LK/LK^0 = -0.06$।

টোপোআইসোমার (topoisomer) : নির্দিষ্ট লিঙ্কিং সংখ্যাবিশিষ্ট বলয়াকার DNA অণুকে টোপোআইসোমার বলে। DNA অণুর একটি সূত্র বা উভয় সূত্র ভেঙে না গেলে লিঙ্কিং সংখ্যা পরিবর্তিত হয় না। বিভিন্ন টোপোআইসোমারগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্কিং সংখ্যা থাকে।

টুইস্ট (Twist) এবং রিথ্ (writhe) : লিঙ্কিং সংখ্যার পরিবর্তন ছাড়াও DNA-র জ্যামিতিক গঠনে পরিবর্তন হতে পারে। বলয়াকার DNA মুচড়ানো অবস্থায় 'রিথ' (Wr) গঠন করে। যেমন চিত্র 103A-তে কেবল 'রিথ' রয়েছে কিন্তু 'টুইস্ট' (Tw) নেই (এখানে Δ Tw = 0 এবং Δ Wr = -4)। চিত্র 103C-তে কোনও 'রিথ্' নেই, কিন্তু বলয়াকার DNA সূত্রটি পাঁকানো (twisted) রয়েছে। (এখানে Δ Wr = 0 এবং Δ Tw = -4)। এই দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থা দেখা যায় চিত্র 103B-তে। এখানে Δ Tw + ΔWr এর Δ Tw = -1 এবং Δ Wr = -3।

সুতরাং, Δ LK = Tw + Δ Wr। রিথ হল বলয়াকার DNA অণুর নিজ অক্ষের ওপর মোচড়ান অবস্থা। DNA অণুর স্থানীয় পাককে twist বলে।



চিত্র—103 a-c

নিবেশক বা intercalator : যে সব কারণ DNA-র পাককে প্রভাবিত করে তা সুপারকয়েলিং-এর জ্যামিতিক গঠন পরিবর্তিত করতে পারে। যেমন, তাপমাত্রার বৃদ্ধি হলে পাক বা twist এর সংখ্যা কমে। আবার আয়নের ঘনত্ব বাড়লে twist বা পাকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ইন্টারক্যালেটর (intercalator) বা নিবেশক যেমন, ইথিডিয়াম ব্রোমাইড DNA অণুর দু'টি বেস জোড়ার মাঝে যুক্ত হতে পারে, এর ফলে DNA অণুর স্থানীয় পাক খুলে যায় (untwisting)। DNA অণু বলয়াকার হলে, এর ফলে রিথের সংখ্যা বাড়ে।

সুপারকয়েলিং-এর শক্তি : শ্লথ DNA-র তুলনায় নেগেটিভ সুপারকয়েলড

DNA-র অনেক বেশি পাকানোর শক্তি (torsional energy) থাকে। এই শক্তি DNA-র পাক খুলতে (untwist বা unwind) সহায়তা করে।

টোপোআইসোমারেজ (topoisomerase) : DNA-র একটি বা দু'টি সূত্রে ভেঙে উৎসেচক টেপোআইসোমারেজ সুপারকয়েলের মাত্রার পরিবর্তন করে। টাইপ I উৎসেচক লিঙ্কিং মাত্রা ± 1 দ্বারা পরিবর্তিত করে। টাইপ II উৎসেচক লিঙ্কিং-এর মাত্রা ± 2 দ্বারা পরিবর্তিত করে। DNA গাইরেজ উৎসেচক ATP-র আর্দ্রবিশ্লেষের ফলে উৎপন্ন শক্তি ব্যবহার করে নেগেটিভ সুপারকয়েলিং-এ সহায়তা করে। টোপোআইসোমারেজ IV লিঙ্ক ভেঙে দিতে পারে।

জীবের একান্ত প্রয়োজনীয় উৎসেচক হল টোপোআইসোমারেজ। এসব উৎসেচক রেপ্লিকেশন, রিকমবিনেশন এবং ট্র্যান্সক্রিপশনের জন্য প্রয়োজন।

সংকর DNA— DNA 100^0C তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে DNA অণুর সূত্র দু'টি আলাদা হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে denaturation বা melting বলে। এরপর আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করলে DNA অণু পুনর্গঠিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে renaturation বা anhealing বলে। দু'টি প্রজাতির DNA উত্তপ্ত করার পর একসাথে মিশিয়ে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করলে সংকর (hybrid) DNA গঠিত হয়। এই পদ্ধতিকে আণবিক সংকরণ (molecular hybridization) বলে। DNA-তে G-C-র পরিমাণ যত বেশি হয়, ততই DNA অণুর সূত্র দু'টির মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হয় এবং denaturation-র জন্য বেশি তাপমাত্রার দরকার হয়। দু'টি বিভিন্ন DNA অণুর সাদৃশ্যের মাত্রার ওপর যুগ্মতার হার নির্ভর করে। মানুষ ও ইঁদুরের DNA-র মধ্যে যুগ্মতার হার 25%। DNA ও RNA সূত্রের মধ্যেও সংকর গঠন সম্ভব হয়েছে (Pardue ও Gall, 1970)।

Z-DNA এবং B-DNA— সাধারণত যে DNA দেখা যায় তাদের পেঁচ ডানদিকে থাকে। এরকম DNA-কে B-DNA বলে। 1979 খ্রিস্টাব্দে বাঁদিকে *পেঁচযুক্ত DNA পাওয়া গেছে। এই DNA কে Z-DNA বলে।* এই DNA কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করা হয়েছে। এই DNA আঁকা বাঁকা (zig-zag) হয়। এই Z-DNA-র সাথে B-DNA-র অনেক সামঞ্জস্য ও কিছু পার্থক্য রয়েছে।

সাদৃশ্য : i) উভয় ধরনের DNA-ই ডাবল হেলিক্সবিশিষ্ট এবং ii) এদের G-C-র মধ্যে যুগ্মতা হয়। iii) উভয় DNA অণুর সূত্র দু'টি পরস্পর বিপরীত দিকে (5'-3' এবং 3'-5') অবস্থান করে।

এই দুই রকম DNA-র মধ্যে পার্থক্যগুলি হল— (a) Z-DNA বাঁদিকে এবং B-DNA ডানদিকে পেঁচান থাকে। (b) Z-DNA-র ফসফেটের কাঠামো আঁকাবাঁকা, *কিন্তু B-DNA-র ফসফেটের কাঠামো স্বাভাবিক। (c) Z-DNA-এ সূত্রের একটি* পেঁচ সম্পূর্ণ করার জন্য 12টি বেস জোড়ার প্রয়োজন, কিন্তু B-DNA-র একটি সম্পূর্ণ পেঁচের জন্য 10টি বেস জোড়ার দরকার। (d) Z-DNA-র শর্করা অণুর

বিন্যাস পর্যায়ক্রমিক অর্থাৎ, একটি শর্করার O অঞ্চল উপরের দিকে হলে, তার পরের শর্করার O অঞ্চল নিচের দিকে হবে। সুতরাং, Z-DNA-তে ডাইনিউক্লিওটাইড একক দেখা যায়। কিন্তু B-DNA-র শর্করা অণুর বিন্যাস পর্যায়ক্রমিক নয়। সেজন্য B-DNA-তে মনোনিউক্লিওটাইড একক দেখা যায়। (e) Z-DNA-র একটি সম্পূর্ণ পেঁচের দৈর্ঘ্য 45Å, কিন্তু B-DNA-র একটি সম্পূর্ণ পেঁচের দৈর্ঘ্য হল 34Å। (f) Z-DNA-র একটি পেঁচে 12টি বেস জোড়া থাকার জন্য ডাইনিউক্লিওটাইড ইউনিটগুলি 60^0 কোণে থাকে। কিন্তু B-DNA-র একটি পেঁচ সম্পূর্ণ করার জন্য 10 জোড়া বেস থাকায় ইউনিটগুলি 36^0 কোণে অবস্থান করে। (g) Z-DNA অণুর ব্যাস 18Å, কিন্তু B-DNA-র অণুর ব্যাস হল 20Å। (h) Z-DNA-র বেসগুলি B-DNA-র তুলনায় অক্ষের অপেক্ষাকৃত কাছে থাকে। B-DNA-র বেস জোড়াগুলি বাঁকানো (tilt) থাকে। কিন্তু Z-DNA-র বেস জোড়াগুলি 7^0 বাঁকানো থাকে।

A-DNA : 70-75% ইথাইল অ্যালকোহলের প্রভাবে DNA-র এই ধরনের গঠন দেখা যায়।

A-DNA-র সাথে B-DNA-র কতগুলি পার্থক্য রয়েছে।

i) A-DNA-র প্রতি পেঁচে এগার থেকে বারোটি বেস জোড়া থাকে। কিন্তু B-DNA-র প্রতি পেঁচে মোটামুটি সাড়ে দশটি বেস জোড়া থাকে।

ii) B-DNA-র বেস জোড়াগুলি হেলিক্সের অক্ষের (axis) কাছে থাকে। কিন্তু A-DNA-র বেস জোড়াগুলি অক্ষ থেকে প্রায় 5Å দূরে থাকে। এর ফলে হেলিক্সটি ফিতাকার দেখায় ও এর কেন্দ্রীয় অঞ্চল (core) বেলনাকার ও মুক্ত। এখানে সরু গভীর মুখ্য গহ্বর (major groove) দেখা যায়।

iii) B-DNA-র একটি সম্পূর্ণ পেঁচের উচ্চতা 34Å। কিন্তু A-DNA-র একটি সম্পূর্ণ পেঁচের পরিমাপ হল 28.15Å।

iv) এক জোড়া বেস থেকে অন্য জোড়া বেসের দূরত্ব B-DNA-র ক্ষেত্রে 34Å, কিন্তু A-DNA-র ক্ষেত্রে এই দূরত্ব হল 2.34Å।

v) বেস জোড়াগুলির অক্ষীয় উচ্চতা বৃদ্ধির পরিমাপ A-DNA-র ক্ষেত্রে 2.56Å এবং B-DNA-তে 3.37।

C-DNA : *লিথিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে 66% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় C-DNA* দেখা যায়। C-DNA-র হেলিক্সের আয়তন A-DNA-র চেয়ে বড়, কিন্তু B-DNA-র তুলনায় ছোট। এই আয়তন 31Å। হেলিক্সের প্রতি পেঁচে 9.33 বেস জোড়া থাকে। বেস জোড়াগুলির অক্ষীয় উচ্চতা বৃদ্ধির (axial rise) পরিমাপ হল 7.8। β-DNA-র এই পরিমাপ 3.37।

D-DNA এবং E-DNA — এরকম DNA দু'টি খুব কম দেখা যায়। D-DNA হেলিক্সের প্রতি পেঁচে আটটি বেস জোড়া থাকে। E DNA-এর ক্ষেত্রে হেলিক্সের প্রতি

পেঁচে 7.5টি বেস জোড়া থাকে। D-DNA-তে বেস জোড়ার অক্ষীয় উচ্চতা বৃদ্ধির পরিমাপ হ'ল 3.03Å।

অদ্বিতীয় এবং পুর্নবৃত্তিসম্পন্ন DNA (unique and repetitive DNA)— যেসব DNA-র কেবল একটি প্রতিলিপি (copy) থাকে এবং যেগুলি প্রোটিন গঠনের সংকেত বহন করে, তাদের অদ্বিতীয় বা unique DNA বলে। এর মধ্যে স্ট্রাকচারাল (structural) জিন অন্তর্ভুক্ত।

যেসব DNA-র নিউক্লিওটাইড চরিত্রে বারবার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়, তাদের পুনর্বৃত্তিসম্পন্ন বা repetitive DNA বলে। এরকম DNA-র নিয়ন্ত্রক (regulatory) বা নিরপেক্ষ (neutral) ধরনের কাজ লক্ষ্য করা হয়েছে। প্রোক্যারিওটে এরকম DNA খুব কম দেখা যায়। কেবল যেসব জিন রাইবোসোমীয় RNA-র কোড বহন করে, সেগুলি এই ধরনের। কিন্তু ইউক্যারিওটে সম্পূর্ণ জিনোমের 1–75% হল পুনর্বৃত্তিসম্পন্ন। হিস্টোনের জিন পুনর্বৃত্তিসম্পন্ন।

সুতরাং, DNA নানা রকম হয়। যেমন, কোনও কোনও DNA-র কেবল একটি প্রতিলিপি থাকে, কোনও কোনও DNA-র 1000টি পর্যন্ত প্রতিলিপি থাকে (মাঝারি পুনর্বৃত্তিসম্পন্ন DNA), কোনও কোনও DNA-র লক্ষ লক্ষ প্রতিলিপি থাকে (উচ্চ পুনর্বৃত্তিসম্পন্ন DNA)।

কোনও কোনও পুনর্বৃত্তিসম্পন্ন DNA-র দৈর্ঘ্য খুব কম হয়। এরকম DNA প্রধান জিনোমীয় DNA-র থেকে density gradient centrifugation পদ্ধতির সাহায্যে আলাদা করা যায়। এরকম DNA-কে স্যাটেলাইট (satellite) DNA বলে। স্যাটেলাইট DNA-র দৈর্ঘ্য এত কম যে এগুলি কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিনের কোড বহন করে না, কিংবা কোনও জেনেটিক চরিত্রের প্রকাশ যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

Density gradient centrifugation পদ্ধতির মাধ্যমে পৃথকীকৃত DNA-র প্লবমান ঘনত্বের (buoyant density) তারতম্য দেখা যায়। নিউক্লিওটাইডের উপাদানের ওপর নির্ভর করে DNA-র বিভিন্ন অংশ (fraction) ভিন্ন ভিন্ন স্তরে (level) পৃথক হয়। A–T জোড়ার তুলনায় G–C জোড়া ভারী, সেজন্য সেন্ট্রিফিউজ করে A–T-র প্রাধান্যযুক্ত DNA থেকে G–C-র প্রাধান্যবিশিষ্ট DNA-কে সহজেই আলাদা করা যায়। unique বা জিনোমীয় DNA একটি স্তরে এবং স্যাটেলাইট DNA কতগুলি স্তরে পৃথক হয়। বিভিন্ন স্যাটেলাইট DNA বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এগুলি হল সরল ক্রমের (simple sequence) DNA বা উচ্চ পুনর্বৃত্তিসম্পন্ন (highly repetitive) DNA। *Drosophila melanogaster*-এ সম্পূর্ণ জিনোমের *20–25 হল সরল ক্রমের DNA। এই DNA-তে A–T-র প্রাধান্য দেখা গেছে। Drosophila melanogaster*-এ অন্তত ছয় রকম স্যাটেলাইট DNA লক্ষ্য করা হয়েছে।

একসূত্রযুক্ত DNA (Single Stranded DNA)

E. coli-কে আক্রমণকারী একটি ছোট ব্যাকটিরিয়ফাজ হল φ174। 1959 খ্রিস্টাব্দে Sinsheimer এই ব্যাকটিরিয়ফাজ থেকে একটি অসাধারণ DNA পৃথক করেছিলেন। এই DNA এক সূত্রযুক্ত এবং 5,500 নিউক্লিওটাইড দিয়ে গঠিত। এর গঠন হেলিক্সের মত নয়। এই DNA-র A এবং T-র অথবা G এবং C-র অনুপাত এক হয় না। পরবর্তী প্রমাণ থেকে জানা গেছে যে, φ174 ব্যাকটিরিয়ফাজের DNA বলয়াকার এবং একসূত্রযুক্ত।

E.coli-র কোষে প্রবেশ করার পর এই ফাজের একসূত্রযুক্ত DNA দ্বিগুণ হতে পারে। *E.coli*-তে প্রবেশ করার পর এই ফাজের DNA পলিমারেজ একটি 'মাইনাস (minus) সূত্র' গঠন করে। এটি আগের সূত্রের (parental strand) পরিপূরক। এই দুটি সূত্র একসাথে 'প্লাস-মাইনাস' DNA হেলিক্স গঠন করে। এটিকে replicative form (RF) বলে।

মাইটোকন্ড্রিয় DNA এবং নিউক্লিও DNA-র পার্থক্য

মাইটোকন্ড্রিয় DNA	নিউক্লিও DNA
1. হিস্টোনের সাথে যুক্ত থাকে না।	1. হিস্টোনের সাথে যুক্ত থাকে।
2. নিউক্লিওজোম থাকে না।	2. নিউক্লিওজোম থাকে।
3. mtDNA-র পুনঃসংযোগ দ্রুত হয়।	3. nDNA-র পুনঃসংযোগ অত দ্রুত হয় না।
4. জিনোমের আয়তন ছোট	4. জিনোমের আয়তন বড়
5. জিনোমের সংখ্যা কম	5. জিনোমের সংখ্যা বেশি
6. মাইটোকন্ড্রিয় DNA সাধারণত বলয়াকার। তবে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন, *Phaseolus*, *Paramoecium* ও *Tetrahymena*-এ	6. নিউক্লিও DNA সূত্রাকার (linear)
7. মাইটোকন্ড্রিয় DNA-তে মুক্ত বলয় এবং মোচড়ান বা সুপার কয়েলড বলয় থাকে	7. এরকম গঠন দেখা যায় না
8. এই DNA-তে কিছু অলিগোমার থাকে। এই অলিগোমারগুলি (oligomers) বলয়াকার ডাইমার (dimer) হিসাবে থাকে।	8. এরকম কোনও বলয়াকার ডাইমার দেখা যায় না।
9. এরকম DNA-তে পুনরাবৃত্তি সম্পন্ন ক্রম অত্যন্ত বিরল।	9. নিউক্লিও DNA-তে পুনরাবৃত্তি সম্পন্ন ক্রম প্রায়ই দেখা যায়।

রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (RNA)

রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা RNA নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমে পাওয়া যায়। নিউক্লিয়াসের তুলনায় সাইটোপ্লাজমে RNA-র পরিমাণ বেশি থাকে। সাইটোপ্লাজমে RNA মুক্ত অবস্থায় এবং রাইবোসোমে থাকে। এছাড়া মাইটোকন্ড্রিয়া ও প্লাস্টিডেও RNA পাওয়া যায়। ক্রোমোসোমে RNA থাকে। অধিকাংশ উদ্ভিদ ভাইরাসে RNA জেনেটিক পদার্থ হিসাবে কাজ করে। নিউক্লিওলাসে কখনও কখনও খুব বেশি পরিমাণে RNA থাকে। বিভিন্ন ধরনের কোষের নিউক্লিওলাসে DNA ও RNA-র অনুপাতের তারতম্য হয়। যকৃতের (liver) কোষে DNA ও RNA-র অনুপাত 10 : 1, আবার পেঁয়াজের ত্বকের কোষে এই অনুপাত 3:1 হয়। দ্রুত বিভাজনশীল টিউমার (tumour) কোষে সাধারণ কোষের চেয়ে অনেক বেশি RNA থাকে।

Caspersson প্রোটিন উৎপাদনে RNA-র গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। প্রোটিন উৎপাদনে RNA-র ভূমিকা এখন বিশদভাবে জানা গিয়েছে। RNA ক্রসিং ওভারেও (crossing over) সহায়তা করে। *Tradescantia*-র মায়োসিসে যুগ্মতা বা সাইন্যাপসিসের সময় প্রচুর RNA পাওয়া গিয়েছে। কোনও কোনও বিজ্ঞানীর মতে RNA স্পিন্ডিল গঠনে সহায়তা করে। RNA অণুর আণবিক ওজন 20,000 থেকে 10,000,000 পর্যন্ত হয়। অনেকগুলি নিউক্লিওটাইড যুক্ত হয়ে একটি RNA অণু গঠন করে। DNA-র সাথে RNA-র রাসায়নিক গঠনের কতকগুলি পার্থক্য আছে।

a) DNA-র শর্করা হল ডিঅক্সিরাইবোজ (deoxyribose) ধরনের ও RNA র শর্করা হল রাইবোজ (ribose) ধরনের। (b) DNA-র থাইমিন বেসের পরিবর্তে RNA-তে ইউরাসিল থাকে। (c) DNA অণু দ্বিসূত্রযুক্ত হয় এবং RNA অণুতে সাধারণত একটা সূত্র থাকে। (d) DNA অণুর সূত্র দুইটি পরস্পর সর্পিলভাবে পেঁচিয়ে ডাবল হেলিক্স গঠন করে। RNA-র একটি সূত্র কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভাঁজ হয়ে দ্বিসূত্রযুক্ত দেখায়। (e) DNA-তে পিউরিন ও পিরিমিডিন বেস সম পরিমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু RNA-তে এরকম হয় না। (f) DNA-তে বেস $A/T = G/C = 1$ হয়, কিন্তু RNAতে এরকম দেখা যায় না।

এছাড়া DNA ও RNA-র আরও কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

(i) DNA প্রধানত নিউক্লিয়াসের ক্রোমোসোমেই বেশি থাকে। কিন্তু RNA সাইটোপ্লাজমেই বেশি থাকে। তবে কিছু RNA নিউক্লিওলাসে, নিউক্লিওপ্লাজমে এবং ক্রোমোসোমে থাকে।

(ii) DNA বংশধারার বাহক জেনেটিক পদার্থ এবং এটা কোষের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। RNA মূলত প্রোটিন উৎপাদনে অংশ নেয়।

রাইবোজ শর্করা ফসফেটের সাথে যুক্ত হয়ে RNA-র নিউক্লিওটাইডের কাঠামো তৈরি করে। শর্করার সাথে নাইট্রোজেন বেসগুলি যুক্ত থাকে। RNA সূত্রে

রাইবোনিউক্লিওটাইডগুলি পরস্পরের সাথে 3'–5' ফসফোডাইএস্টার (phosphodiester) বন্ডের সাহায্যে যুক্ত থাকে।

RNA অণু একটা সূত্র দিয়ে তৈরি হলেও কখনও কখনও এই দীর্ঘ সূত্রটি কোনও কোনও জায়গায় ভাঁজ হওয়ার ফলে দ্বিসূত্রযুক্ত দেখায় (চিত্র 104, 105)। এইসব অংশে বেসগুলি জোড়ায় অবস্থান করতে পারে অর্থাৎ, সাইটোসিন গুয়ানিনের সাথে ও অ্যাডিনিন ইউরাসিলের সাথে যুগ্ম অবস্থান করতে পারে। বেসগুলি হাইড্রোজেন বণ্ডের মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত থাকে। RNA অণুর সব জায়গায় ভাঁজ হয় না বলে সম্পূর্ণ RNAটি কখনই দ্বিসূত্রযুক্ত অবস্থায় থাকে না।

RNA-র যে অংশটি ভাঁজ হয় না, সেই অংশটি প্রসারিত অবস্থায় থেকে ভাঁজ অংশগুলিকে পৃথক করে রাখে (চিত্র 104A) কিম্বা ভাঁজহীন অংশটি ভাঁজযুক্ত অংশের বাইরের দিকে অসংখ্য ছোট ছোট লুপ (loop) বা ফাঁস গঠন করে (চিত্র 105)। বিভিন্ন ধরনের RNA-কে আণবিক ওজন, থিতানর (sedimentation) হার ও কাজের ওপর ভিত্তি করে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

1. ট্রান্সফার RNA (transfer RNA বা tRNA) বা পরিবহক RNA
2. মেসেঞ্জার RNA (messenger RNA বা mRNA) বা বার্তাবহ RNA
3. রাইবোসোমীয় RNA (ribosomal RNA বা rRNA)

1. পরিবহক RNA বা ট্রান্সফার RNA (tRNA)—

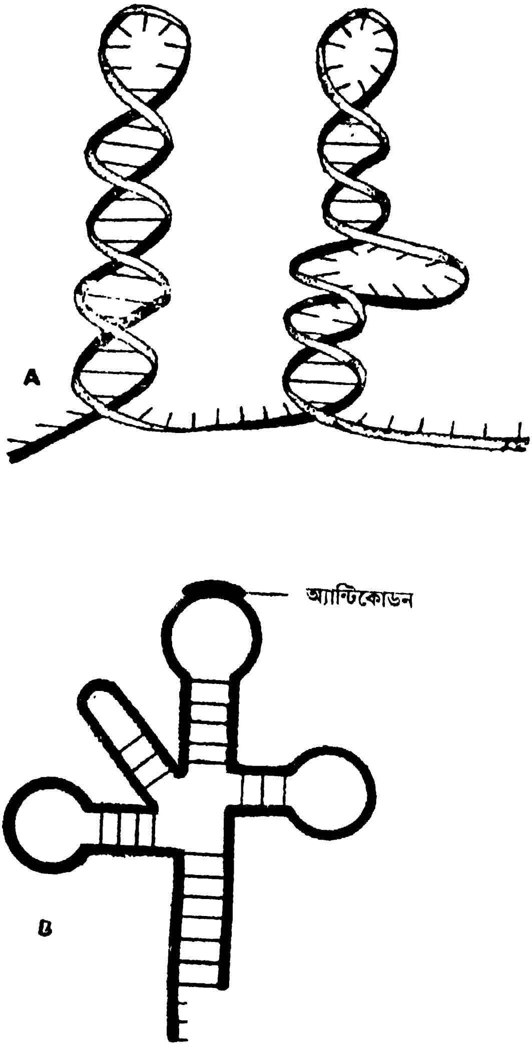
এই RNA-কে দ্রবণীয় RNA ও (soluble RNA বা sRNA বা supernatant RNA বা adaptor RNA) বলা হয়ে থাকে। মোট RNA-র 10-15 শতাংশ হল পরিবহক RNA। এর আণবিক ওজন 23,000-28,000 ডালটন এবং দৈর্ঘ্য প্রায় 250A। একটি ট্রান্সফার RNA অণুতে 70-80 টি নিউক্লিওটাইড থাকে। এর থিতানর হার (sedimentation constant) হল 4S।

tRNA-র 3' প্রান্তে সব সময় সাইটোসিন-সাইটোসিন-অ্যাডিনিন (-C-C-A) বেস থাকে (চিত্র 105, 106)। প্রান্তের অ্যাডিনিন বেস অংশেই অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয়। কোনও কোনও tRNA-তে প্রান্তের -C-C-A আংশিক বা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। এইসব tRNA অ্যামিনো অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হতে পারে না। এদের অকার্যকর tRNA বলে। বিভিন্ন এনজাইমের প্রয়োগ করে অকার্যকর tRNA-কে স্বাভাবিক কার্যকর tRNA-তে রূপান্তরিত করা যায়। সাইটিডিন ট্রাইফসফেট (CTA) ও ATP এই প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। tRNA-র 5' প্রান্তে গুয়ানিন বেস থাকে।

ট্রান্সফার RNA-র সূত্রটা কোনও কোনও জায়গায় ভাঁজ অবস্থায় থাকে (clover leaf model)। এই সব স্থানে পরিপূরক বেসগুলি যুগ্ম অবস্থান করে (intramolecular base pairing) ও ঐ স্থান দ্বিসূত্রযুক্ত দেখায় (চিত্র 104, 105)।

tRNA-র গঠন—

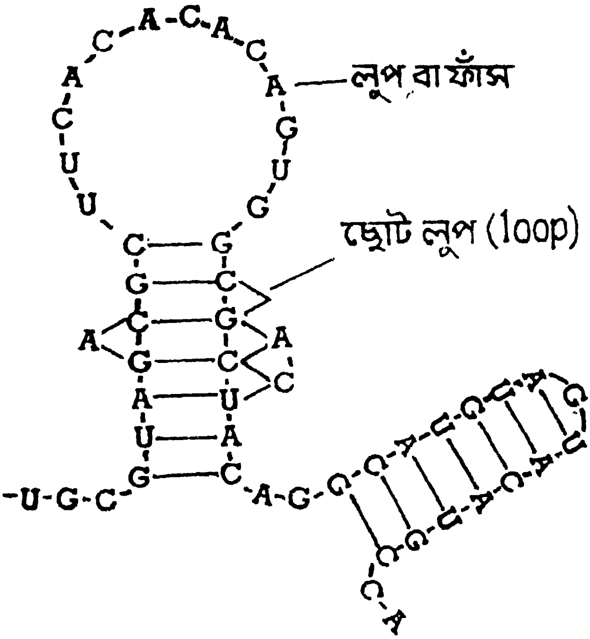
সব tRNA-র গৌণ গঠনে (clover leaf) চারটি বাহু থাকে। তবে কখনও



চিত্র—104

A–tRNA-র কোনও কোনও জায়গায় ভাঁজ হওয়ার ফলে বেসগুলি যুগ্ম অবস্থায় রয়েছে, ভাঁজহীন অংশ প্রসারিত অবস্থায় রয়েছে;
B–tRNA অণুর একদিকে অ্যান্টিকোডন থাকে। এই অ্যান্টিকোডনের সাহায্যে tRNA mRNA-র নির্দিষ্ট স্থানে যুক্ত হয়

কখনও পাঁচটি বাহু দেখা যায়। X-রশ্মির বিচ্ছুরণের (difraction) বিশ্লেষণ থেকে Holley (1968) প্রথম ক্লোভার লিফ মডেল গঠন করেন। গৌণ গঠনটি ভাঁজ হয়ে দৃঢ় L-আকারের টারসিয়ারী গঠন সৃষ্টি করে। H. L. Kim (1972, 1973) ফিনাইল অ্যালানিনের L-আকারের ত্রিমাত্রিক গঠনের বিবরণ দেন।



চিত্র—105

t-RNA-র একাংশের গঠন, এই অণুর কোনও কোনও জায়গায় ভাঁজ হয়েছে এবং ভাঁজহীন অংশগুলি লুপ বা ফাঁস গঠন করেছে

ক্লোভার লিফের চারটি প্রধান বাহুর নাম গঠন ও কাজ অনুসারে হয়েছে।

i) অযুগ্ম বাহুর 5' প্রান্তে CCA বেস থাকে। অন্য বাহুটি H-বন্ধনযুক্ত বেস জোড়ার stem গঠন করে (অ্যামিনো অ্যাসিড স্টেম)।

ii) এর বিপরীতে অ্যান্টিকোডন বাহুতে হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা যুক্ত বেস জোড়া স্টেম গঠন করে। এর অগ্রভাগে অযুগ্ম লুপ (loop) থাকে। এই লুপে অ্যান্টিকোডন ক্রম থাকে।

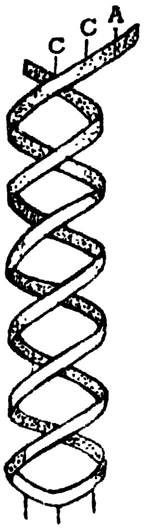
iii) TψC বাহুতে থায়ামিন-সিউডোইউরিডিন (ψ)—সাইটোসিন ট্রিপ্লেট ক্রম থাকে। যুগ্ম বেস জোড়া দ্বারা গঠিত স্টেম এবং অগ্রস্থ অযুগ্ম লুপ থাকে।

iv) D লুপে একটি বিশেষ বেস ডাইহাইড্রোইউরিডিন থাকে। এখানে যুগ্ম বেস জোড়া স্টেম গঠন করে এবং অগ্রস্থ অযুগ্ম লুপ থাকে।

v) tRNAতে TψC বাহু ও অ্যান্টিকোডন বাহুর মাঝে একটি অতিরিক্ত বাহু থাকে। এই বাহু আবার দু'রকম হতে পারে।

i) **শ্রেণী 1 tRNA**– অতিরিক্ত বাহুটি ছোট, কেবল 3-5টি বেস যুক্ত। 75% tRNA-তে এরকম বাহু দেখা যায়।

ii) **শ্রেণী 2 tRNA**– অতিরিক্ত বাহুটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং 13-21টি বেস যুক্ত।



চিত্র—106

t-RNA-র গঠন

এই অণুর এক প্রান্তে সব সময় C-C-A-বেস থাকে,
এই প্রান্তের সাথেই নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয়

ট্রান্সফার RNA বিভিন্ন রকমের হয়। প্রত্যেক অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য অন্তত একটি নির্দিষ্ট tRNA থাকে। কোষের কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য 61টি নির্দিষ্ট ট্রান্সফার RNA আছে। তবে Jukes-এর মতে, কোষে 54 রকম tRNA থাকে।

কাজ : নির্দিষ্ট tRNA নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয়ে ওই অ্যামিনো অ্যাসিডকে প্রোটিন উৎপাদনের স্থানে নিয়ে আসে। tRNA-র একদিকে তিনটি বেস নিয়ে গঠিত অ্যান্টিকোডন থাকে (চিত্র 104B) এবং এই অংশটি mRNA-র নির্দিষ্ট স্থানে tRNA-কে যুক্ত করে। tRNA-ই নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডকে পলিপেপটাইড শৃঙ্খলে স্থানান্তরিত করে ও নিজে মুক্ত হয়ে যায়।

সুতরাং, tRNA-তে **চারটি বিশেষ অঞ্চল** রয়েছে। (a) অ্যামিনো অ্যাসিডের সাথে

সংযুক্তিকরণ অঞ্চল (amino acid attachment site)– tRNA-র 3′ প্রান্তে (C-C-A) রাইবোজ শর্করার মুক্ত হাইড্রক্সিল গ্রুপের (–OH) সাথে ATP-র উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপ যুক্ত হয় ও amino-acyl tRNA গঠিত হয়। এই অঞ্চল সব tRNA-তে একই রকম।

এই বিক্রিয়াকে নির্দিষ্ট সক্রিয়ক উৎসেচক বা অ্যামিনো অ্যাসাইল tRNA সিন্থেটেজ সহায়তা করে।

(b) সনাক্তকরণ অঞ্চল বা recognition site — এই অঞ্চল নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডের সাথে tRNA-র সংযুক্তিকরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(c) অ্যান্টিকোডন অঞ্চল— এখানে তিনটি বেস একটি ট্রিপ্লেট গঠন করে। এই অ্যান্টিকোডন অঞ্চল mRNA-র কোডন অঞ্চলকে চিনতে পারে ও tRNA-র সাথে mRNA-র নির্দিষ্ট অঞ্চলের সংযুক্তিকরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(d) রাইবোসোম সনাক্তকরণ অঞ্চল (recognition site) — এই অঞ্চল সব tRNA-তে একই রকমের। এই অঞ্চলের সাথে রাইবোসোম যুক্ত হয়।

tRNA-তে স্বাভাবিক বেস ছাড়াও কিছু অস্বাভাবিক বেস পাওয়া গেছে। এর কতকগুলি হল — ইনোসিনিক অ্যাসিড, মিথাইল গুয়ানিন, মিথাইল অ্যামিনোপিউরিন, সিউডো-ইউরিডিন ইত্যাদি।

tRNA-র সংশ্লেষ : এই RNA DNA-র ছাঁচ থেকে তৈরি হয়। DNA-তে যে রকমের বেসগুলি থাকে, tRNA-তে তার পরিপূরক বেসগুলি থাকে। ট্র্যান্সফার RNA তৈরি হওয়ার পর সম্ভবত এনজাইমের প্রভাবে C-C-A প্রান্ত গঠিত হয়। ব্যাকটিরিয়ায় tRNA উৎপাদনের 40-80টি সিস্ট্রোন অংশ নেয়। ড্রসোফিলায় 50টি সিস্ট্রোন tRNA-র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।

DNA থেকে tRNA উৎপন্ন হওয়ার পর এনজাইমের প্রভাবে এর কোনও কোনও নাইট্রোজেনাস বেস পরিবর্তিত হতে পারে।

(2) মেসেঞ্জার (messenger) RNA (mRNA) বা বার্তাবহ RNA — মোট RNA-র 5–10 শতাংশ হল মেসেঞ্জার RNA। এই RNA-র আণবিক ওজন 500,000 – 2000,000 পর্যন্ত হয় এবং এর প্রস্থ 10–15Å। এর দৈর্ঘ্য এক থেকে বহু সহস্র অ্যাংস্ট্রম পর্যন্ত হতে পারে।

mRNA বিভিন্ন রকম হয় অর্থাৎ, mRNA-র দৈর্ঘ্য ও আণবিক ওজনে পার্থক্য দেখা যায়। নিউক্লিয়াসের এরকম বিভিন্ন প্রকার mRNA-কে heterogenous nuclear RNA (Hn-RNA) বলে।

দুই রকমের mRNA দেখা যায়। যেসব mRNA-তে একটি সিস্ট্রোনের কোডনগুলি থাকে, তাদের মনোসিস্ট্রোনিক (monocistronic) mRNA বলে। এখানে একটি সম্পূর্ণ প্রোটিন অণু গঠনের সঙ্কেত বা কোড থাকে। যেসব mRNA-তে একাধিক পাশাপাশি অবস্থিত সিস্ট্রোনের কোডন থাকে, তাদের বহুসিস্ট্রোনযুক্ত বা

পলিসিস্ট্রোনিক (polycistronic) mRNA বলে। এরকম mRNA একাধিক প্রোটিন গঠনের কোড বহন করে।

mRNA সহজেই বিনষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত mRNA ভাঁজ হয়ে দ্বিসূত্রযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করে না। বার্তাবহ RNA নিউক্লিয়াসে ও সাইটোপ্লাজমে পাওয়া যায়। mRNA প্রোটিনের সাথে একটি যৌগ (complex) গঠন করে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করতে পারে। এই যৌগকে Spirin ইনফর্মোসোম (informosome) নাম দিয়েছেন। এগুলি রাইবোসোমের সাথে যুক্ত না হয়ে সাইটোপ্লাজমে থাকতে পারে।

ইনফর্মোসোমে mRNA-র চারিদিকে প্রোটিনের আবরণ থাকায় এটি mRNA-র তুলনায় বেশি স্থায়ী। ইনফর্মোসোমে প্রোটিন ও mRNA-র অনুপাত হল 4 : 1। ইনফর্মোসোমের থিতানর হার 80S বা কম। যখন ট্র্যান্সলেশন প্রক্রিয়ায় দেরী হয়, তখন ইনফর্মোসোম প্রোটিন উৎপাদনে অংশ নেয়। ভ্রূণের কোষে যখন প্রাথমিক পর্যায়ে rRNA থাকে না, তখন ইনফর্মোসোম প্রোটিন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

একই জীবের কিংবা নিকট সম্পর্কীয় জীবের DNA এবং মেসেঞ্জার RNA-র (mRNA) মধ্যে সংকর গঠনের প্রবণতা আছে। উত্তাপ প্রয়োগ করলে DNA-র সূত্র দুইটির মধ্যের হাইড্রোজেন বণ্ড ভেঙে যায়। এই DNA-কে দ্রুত ঠাণ্ডা করলে কতকগুলি হাইড্রোজেন বণ্ড তৈরি হয়, কিন্তু কিছু বেস আলাদা থাকে। এই বেসগুলি মেসেঞ্জার RNA-র সাথে যুক্ত হয়ে DNA–RNA সংকর গঠন করতে পারে।

মেসেঞ্জার RNA DNA-র ছাঁচের থেকে তৈরি হয়। DNA-র ছাঁচের বেসগুলির পরিপূরক বেস এই RNA-তে থাকে। যদি একটি DNA ছাঁচের বেসের বিন্যাস A-T-T-G-A-C- ইত্যাদি হয়, তবে ওই ছাঁচ থেকে তৈরি RNA-র বেসগুলি হবে U-A-A-C-U-G- ইত্যাদি। RNA তৈরির সময় DNA অণুর সূত্র দুইটির মাঝের হাইড্রোজেন বণ্ড ভেঙে যায়। মুক্ত নিউক্লিওটাইডগুলি DNA সূত্রের যথাযথ স্থানে যুক্ত হয়ে mRNA গঠন করে।

RNA-র উৎপাদন 5' প্রান্ত থেকে শুরু করে 3' প্রান্তের দিকে হয়। প্রারম্ভিক অঞ্চলে বা স্ট্রাকচার‍্যাল জিনের প্রোমোটার অঞ্চলে বা DNA সিস্ট্রোনের সাথে RNA পলিমারেজ যুক্ত হয় ও RNA উৎপাদনকে সাহায্য করে। DNA থেকে RNA-র উৎপাদনকে ট্র্যান্সক্রিপশন বলে। mRNA-র 3' প্রান্তে পলি-A এবং 5' প্রান্তে 7-মিথাইল গুয়ানোসিন থাকে।

ইউক্যারিওটে mRNA নিউক্লিয়াসের ভিতরে Hn-RNA হিসাবে উৎপন্ন হয়। এই অণুগুলি mRNA অণুর চেয়ে বড়। এই Hn-RNAর 3' প্রান্তে পলিঅ্যাডিলিক অ্যাসিডের (পলিA) দুইশ'টি নিউক্লিওটাইড যুক্ত হয়। এর সাথে সাথে Hn-RNA-র 5' প্রান্তের কিছু অংশ বিনষ্ট হয়।

এরপর পলিA এবং mRNA যুক্ত অবস্থায় সাইটোপ্লাজমে চলে আসে।

mRNA-র কাজ : m-RNA সাইটোপ্লাজমে এসে প্রোটিন উৎপাদনে সাহায্য

করে। প্রোটিনে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাস মেসেঞ্জার RNA-র মাধ্যমে DNA নিয়ন্ত্রণ করে। এই RNA DNA-র প্রোটিন উৎপাদনের সঙ্কেত বহন করে সাইটোপ্লাজমে নিয়ে আসে বলে 1967 খ্রিস্টাব্দে Jacob ও Monod এদের বার্তাবহ বা মেসেঞ্জার RNA নামকরণ করেন।

(3) রাইবোসোমীয় (ribosomal) RNA বা rRNA — রাইবোসোমের RNA-কে রাইবোসোমীয় RNA বলে। rRNA নিউক্লিয়াসে তৈরি হয় ও পরে সাইটোপ্লাজমে আসে। rRNA ও tRNA মাইটোকন্ড্রিয়াতেও পাওয়া গিয়েছে। মোট RNA-র প্রায় 80 শতাংশ হল rRNA। এই RNA সব RNA-র মধ্যে সবচেয়ে স্থায়ী। এব আণবিক ওজন 60,000–1100000। আণবিক ওজন ও থিতানর (sedimentation) হারের ওপর নির্ভর করে rRNA-কে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। *Escherichia coli*-র 23S rRNA-র আণবিক ওজন 1100000 এবং 16S rRNA-র আণবিক ওজন 600000।

ইউক্যারিওট কোষের রাইবোসোমে তিন রকম আয়তনের rRNA থাকে। এগুলি হল 28S, 18S ও 5s rRNA। 28S ও 5S rRNA যুক্ত অবস্থায় রাইবোসোমেব বড় উপএককে (60S) থাকে। 18S rRNA রাইবোসোমের ছোট উপএককে (50S) থাকে। 28S rRNA-র আণবিক ওজন $1.5–1.8 \times 10^6$ ডালটন। 18S rRNA-র আণবিক ওজন $0.8–1 \times 10^6$ ডালটন। প্রোক্যাবিওট কোষে কেবল 23S ও 16S rRNA পাওয়া যায়। এদের আণবিক ওজন যথাক্রমে হল $1\ 2 \times 10^6$ এবং 0.6×10^6 ডালটন। 28S ও 18S rRNA নিউক্লিওলার DNA থেকে একটি দীর্ঘ একক (45S) হিসাবে তৈরি হয়। এই 45S rRNA নিউক্লিয়াসের মধ্যেই মিথাইলযুক্ত হয় এবং প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয়। পরে 45S rRNA নিউক্লিয়াসের মধ্যেই মিথাইলযুক্ত হয় এবং প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয়। পরে 45S rRNA ভেঙে গিয়ে 18S ও 32S rRNA গঠিত হয়। 32S rRNA পরিশেষে 28S rRNA-তে পরিবর্তিত হয়। 5S rRNA DNA-র অনিউক্লিওলিয় অঞ্চল অর্থাৎ নিউক্লিওলাস সংগঠনকারী অঞ্চল ছাড়া অন্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়।

DNA-র নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চলে (nucleolar organizer) প্রধানত RNA উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কোডনগুলি থাকে। উচ্চশ্রেণীর জীবে 200–2000টি ঘনসন্নিবিষ্ট DNA সিস্ট্রোন rRNA-এ উৎপাদনে অংশ নেয়। প্রোক্যারিওট ব্যাকটিরিয়ায় 10–200টি সিস্ট্রোন rRNA উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে। rRNA-র কোনও কোনও স্থানে ভাঁজ হয়ে দ্বিসূত্র অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। DNA ও rRNA-র মধ্যে সংকর গঠিত হতে পারে। এই RNA-তে প্রচুর পরিমাণে গুয়ানিন ও সাইটোসিন থাকে।

E. coli-র rRNA বিভিন্ন বেসের অনুপাত (molar ratio) হল— অ্যাডিনিন 21 : ইউরাসিল 19 : গুয়ানিন 36 : সাইটোসিন 23।

rRNA ম্যাগনেসিয়াম বন্ডের মাধ্যমে mRNA ও tRNA-কে রাইবোসোমের সাথে যুক্ত রাখে।

Grunberg-Manago ও Ochoa দেখেন যে, RNA উৎপাদনের জন্য এনজাইম RNA পলিমারেজের দরকার হয়। এই এনজাইম রাইবোনিউক্লিওটাইডগুলি যুক্ত করে RNA সূত্র গঠন করে। 1960 খ্রিস্টাব্দে Weiss, Hurwitz ও Stevens একটি RNA পলিমারেজ পৃথক করেছিলেন, যা DNA প্রাইমারের উপস্থিতিতে RNA উৎপাদনে সহায়তা করে।

অ্যান্টিসেন্স RNA (antisense RNA)

আশির ও নব্বইয়ের দশকে লক্ষ্য করা হয়েছে যে, প্রোটিন সংশ্লেষে ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যদি ওই mRNA-র পরিপূরক ক্রমযুক্ত RNA মাধ্যমে দেওয়া হয়। এই RNA mRNA-র সাথে সংকর গঠন করে। এর ফলে mRNA-র ট্রান্সলেশন বা অনুবাদ হতে পারে না। এই রকম RNA যা mRNA-র সাথে সংকর গঠন করে অনুবাদে বাধা দেয়, সেগুলিকে অ্যান্টিসেন্স RNA বা mic RNA (mic = mRNA interfering complimentary RNA অর্থাৎ mRNA-কে বাধাদায়ক পরিপূরক RNA) বলে। এই RNA ব্যবহার করে ইচ্ছানুসারে ট্রান্সলেশনরোধ করা যায়। এর ফলে মিউটেশন দেখা দেয়। এছাড়া এই প্রক্রিয়ায় জিনের প্রকাশ (expression) নিয়ন্ত্রিতভাবে হতে পারে।

জেনেটিক RNA-র দ্বিগুণ হওয়া (replication)

যেসব জীবে কেবল RNA থাকে (অর্থাৎ DNA নেই), সে সব RNA-কে **জেনেটিক RNA** বলে। অন্য যে সব জীবে DNA এবং RNA থাকে এবং RNA DNA-র নির্দেশ অনুসারে কাজ করে, সেসব RNA-কে অজিনীয় RNA বা non-genetic RNA বলে। এরকম RNA DNA নির্ভরশীলভাবে দ্বিগুণ (DNA dependent replication) হয়।

ভাইরাসের জেনেটিক RNA স্বজননশীল (self-replicating)। সুতরাং, এই RNA-র সংশ্লেষ RNA নির্ভরশীল। এই সংশ্লেষের প্রধান পর্যায়গুলি হল :

i) ভাইরাসের RNA সরাসরি বার্তাবহ RNA (mRNA) হিসাবে কাজ করে।

ii) পোষকের (host) রাইবোসোমের সহায়তায় এই RNA পলিমারেজ উৎসেচক ও ভাইরাসের প্রোটিনের আবরণ সংশ্লেষের নির্দেশ দেয়। RNA পলিমারেজ উৎসেচক RNA সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় হয়।

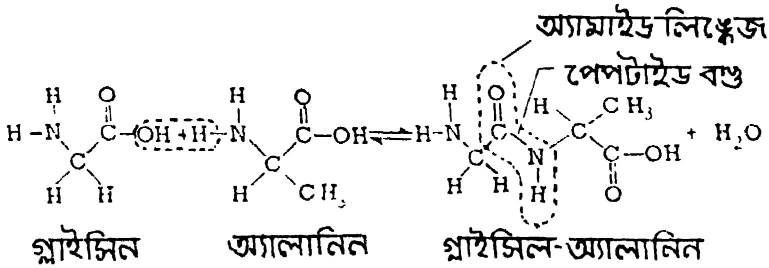
iii) RNA পলিমারেজের উপস্থিতিতে এবং বেসের (base) যুগ্মতার সূত্র অনুসারে ভাইরাসের RNA ছাঁচ (template) হিসাবে কাজ করে এবং এর ওপর পরিপূরক RNA সূত্র গঠিত হয়। এইভাবে দ্বিসূত্রযুক্ত RNA-র সৃষ্টি হয়।

mRNA, tRNA এবং rRNAর তুলনা

বৈশিষ্ট্য	mRNA	tRNA	rRNA
1. উৎপাদনের স্থান	নিউক্লিয় DNA	নিউক্লিও DNA	নিউক্লিও DNA
2. আণবিক ওজন	5×10^5	25×10^3	1.1×10^6
3. শতকরা হার	5%	15%	80%
4. অধঃক্ষেপের গুণাঙ্ক	8S	4S	28S,18S 5-7S
5. গঠন	সূত্রাকার	চুলের কাটার মত লুপ (hair pin loop) যুক্ত এবং L-আকারের গৌণ ও টারসিয়ারী গঠনবিশিষ্ট	গৌণ গঠন 70% ক্ষেত্রে
6. নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা	*E.coli*-তে 900-1500টি নিউক্লিওটাইড থাকে। তবে সাধারণত সর্বাধিক নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা 1200।	70-85টি নিউক্লিওটাইড	28Sএ 5500টি নিউক্লিওটাইড থাকে। 18Sএ 2500টি নিউক্লিওটাইড থাকে। 5S-7Sএ 120টি নিউক্লিওটাইড থাকে।
7. কাজ	ক্রোমোসোমের DNA থেকে প্রোটিন উৎপাদনের সঙ্কেত সাইটো-প্লাজমে নিয়ে আসে। এই RNA প্রোটিন সংশ্লেষের সময় ছাঁচ হিসাবে কাজ করে।	সাইটোপ্লাজম থেকে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিন উৎপাদনের স্থানে নিয়ে আসে।	রাইবোসোমের উপএকক বা subunit সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়।

প্রোটিন (protein)

প্রোটিনের আণবিক ওজন 10^3–10^6। প্রত্যেক প্রোটিন অনেকগুলি আমিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি (চিত্র 107)। সব অ্যামিনো অ্যাসিডের একটা প্রান্তে অ্যামিনো গ্রুপ (amino group) অর্থাৎ NH_2, অন্য প্রান্তে একটা কার্বোক্সিল গ্রুপ (carboxyl group) অর্থাৎ COOH থাকে। একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের NH_2 গ্রুপ অন্য অ্যামিনো অ্যাসিডের COOH গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়। এই বিক্রিয়ার (reaction) সময় একটি জলের অণু বের হয়ে যায় ও পেপটাইড বণ্ড (চিত্র 108) গঠিত হয়।



চিত্র—107

দু'টি আমিনো অ্যাসিড— গ্লাইসিন ও অ্যালানিন পেপটাইড বণ্ডের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে

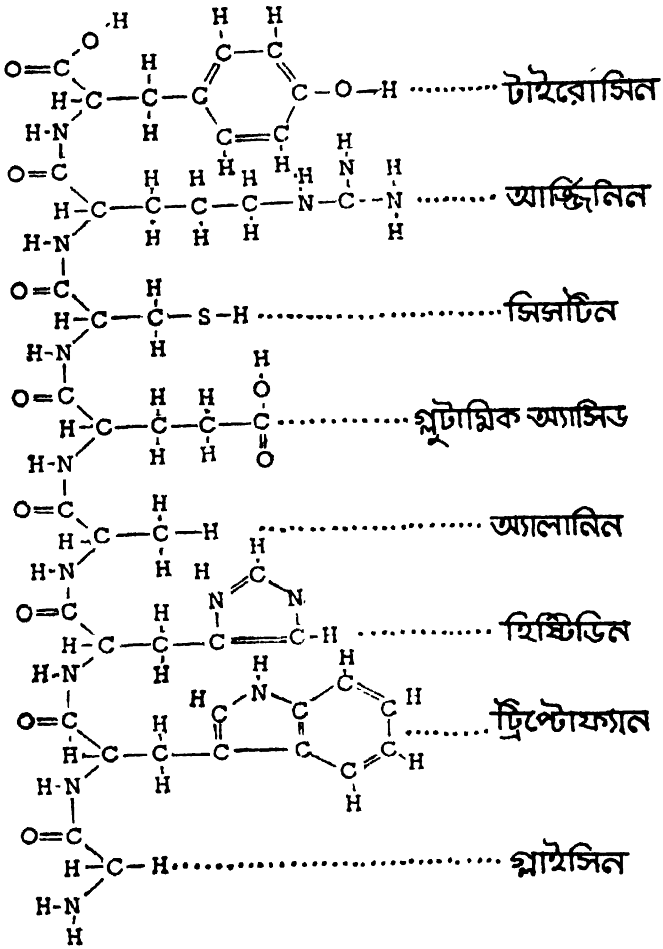
কুড়িটি বিভিন্ন রকমের অ্যামিনো অ্যাসিডের নানা রকমের জোটের (combination) ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রোটিন গঠিত হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, ক্রোমোসোমে বেসিক ও অবেসিক প্রোটিন থাকে। হিস্টোন (histone) সব জীবেই পাওয়া যায়। প্রোটামাইন (protamine) কোনও কোনও পাখী ও মাছে থাকে। এই দুই রকমের বেসিক প্রোটিনের মধ্যে হিস্টোনের গঠন বেশি জটিল। হিস্টোনে প্রধানত আর্জিনিন (arginine), লাইসিন (lysine) ও হিস্টিডিন (histidin) প্রভৃতি অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

হিস্টোনে পাঁচটি অংশ থাকে। Jones-এর (1975) মতে, এই অংশগুলি হল (a) প্রচুর লাইসিনযুক্ত H1, (b) সামান্য লাইসিনযুক্ত H2A এবং H2B, (c) প্রচুর আর্জিনিনযুক্ত H3 এবং H4।

হিস্টোন H1 সহজেই আলাদা করা যায়। সেজন্য মনে করা হয় যে, এই হিস্টোন

ক্রোমোসোম তন্তুগুলিকে একসাথে রাখতে সাহায্য করে। হিস্টোন H3 এবং H4-এর গঠন বিভিন্ন জীবে একই রকম। সেজন্য মনে করা হয় যে, এরকম হিস্টোনের গঠনগত



চিত্র—108

প্রোটিন অণুর একাংশ। প্রোটিন অণুর এক প্রান্তে সব সময় কার্বোক্সিল গ্রুপ (COOH) ও অপর প্রান্তে অ্যামিনো গ্রুপ (NH_2) থাকে

কাজ রয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, হিস্টোনের নিয়ন্ত্রক কাজও রয়েছে। হিস্টোন জিনের কাজকে কখনও কখনও কমিয়ে দেয়।

হিস্টোনের আণবিক ওজন প্রোটামাইনের তুলনায় বেশি। উচ্চতর জীবে DNA ও হিস্টোনের অনুপাত মোটামুটি 1:1 হয়। প্রোটামাইন সরল ধরনের বেসিক প্রোটিন এবং এর আণবিক ওজন খুব কম। প্রোটামাইনে 90 শতাংশ আর্জিনিন থাকে। বেসিক প্রোটিনের আণবিক ওজন অবেসিক প্রোটিনের তুলনায় কম। ক্রোমোসোমের অখণ্ডতা রক্ষায় এবং ক্রোমোসোমের স্বজননে বেসিক প্রোটিন সহায়তা করে।

অবেসিক প্রোটিন নানা রকম হয়। বিভিন্ন জীবে এরকম প্রোটিন মোটামুটি 12 থেকে 20 রকমের হয়। একই জীবের বিভিন্ন কোষে অবেসিক প্রোটিনের পরিমাণে তারতম্য হয়।

অবেসিক প্রোটিনে ট্রিপ্টোফেন (tryptophane) বেশি থাকে ও আর্জিনিন কম থাকে। এই প্রোটিন ক্রোমাটিনে ও ইন্টারফেজ নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের কোষে এই প্রোটিনের পরিমাণের তারতম্য হয়। ব্যস্ত (metabolically active) কোষে প্রচুর পরিমাণে অবেসিক প্রোটিন পাওয়া যায়। কিছু অবেসিক প্রোটিন DNA-র সাথে যুক্ত থাকে। এছাড়া অন্যান্য প্রোটিন লবণ দিয়ে নিষ্কাষণ করার পর কিছু অবেসিক প্রোটিন অবশিষ্ট (অবশিষ্ট প্রোটিন) থাকে।

নিউক্লিয়াসের বিশেষ বিপাকীয় কাজে অবেসিক বা অম্লধর্মী প্রোটিন সাহায্য করে। 1973 খ্রিস্টাব্দে R. S. Gilmour এবং J. Paul বলেন যে, নির্দিষ্ট ধরনের অবেসিক প্রোটিন নির্দিষ্ট জিনে কাজ শুরু করতে সাহায্য করে। পরে Barrett ('74) এবং Groner ('75) এই মতের সমর্থন করেন।

হেটারোক্রোমাটিন (heterochromatin) ও ইউক্রোমাটিন (euchromatin)

ক্রোমোসোমের একটি প্রধান উপাদান হল নিউক্লিক অ্যাসিড। নিউক্লিক অ্যাসিড ক্রোমোসোমকে রঙ নিতে সাহায্য করে। একটি ক্রোমোসোমের বিভিন্ন অংশের রঙ নেবার ক্ষমতার মধ্যে তারতম্য দেখা যায় অর্থাৎ, ক্রোমোসোমের বিভিন্ন অংশের রাসায়নিক গঠন এক হয় না। ক্রোমোসোমের কোনও অংশ স্বাভাবিক অংশের তুলনায় গাঢ় বা হালকাভাবে রঙ নিলে, ঐ অবস্থাকে **হেটারোপিকনোসিস** (heteropycnosis) বলে। গাঢ় রঙ নিলে পজেটিভ (positive) বা ধনাত্মক হেটারোপিকনোসিস ও হালকা রঙ নিলে নেগেটিভ (negative) বা ঋণাত্মক হেটারোপিকনোসিস বলা হয়। একই ক্রোমোসোম কোষ বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করতে পারে অর্থাৎ, একই ক্রোমোসোমে কখনও পজেটিভ আবার কখনও বা নেগেটিভ হেটারোপিকনোসিস দেখা যায়। ক্রোমোসোমের যে অংশে কোনও অবস্থাতে হেটারোপিকনোসিস দেখা যায়, সে অঞ্চলকে **হেটারোক্রোমাটিন** বলে। ক্রোমোসোমের যে অংশে হেটারোপিকনোসিস দেখা যায় না, সে স্থানকে **ইউক্রোমাটিন** বলে। ক্রোমোসোমের যেসব অংশ কোষ বিভাজনের সব অবস্থাতেই

গাঢ় রঙ নেয় ও ঘনীভূত অবস্থায় থাকে, তাদের বর্ণনা করার জন্য Emil Heitz (1924-28) হেটারোক্রোমাটিন শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ক্রোমোসোমের এই অংশে টেলোফেজ অবস্থায় পেঁচ খুলে যায় না। কিন্তু ক্রোমোসোমের ইউক্রোমাটিন অঞ্চলে টেলোফেজে স্বাভাবিকভাবে পেঁচ খুলে যায়। হেটারোক্রোমোসোম (hetero-chromosome) বা সেক্স ক্রোমোসোম থেকে হেটারোক্রোমাটিন শব্দটি নেওয়া হয়েছে কারণ, সেক্স ক্রোমোসোম অন্য ক্রোমোসোমের চেয়ে বেশি রঙ নেয়। Darlington ও La Cour দেখেন যে, হেটারোক্রোমাটিন অংশ মেটাফেজে নেগেটিভ হেটারোপিকনোসিস ও ইন্টারফেজ অবস্থায় পজেটিভ হেটারোপিকনোসিস দেখায়। এই রকমের আচরণকে অ্যালোসাইক্লিক (allocyclic) আচরণ বলে। কোনও কোনও হেটারোক্রোমাটিন অংশ কোনও অবস্থাতেই রঙ নেয় না, যেমন— সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন অঞ্চল। অতএব, হেটারোক্রোমাটিনের আচরণের তারতম্য হয়, যেমন— (a) সব অবস্থায় গাঢ় বর্ণ নেয় (Heitz যেমন দেখেছিলেন) বা (b) সব অবস্থায় বর্ণহীন দেখায় (যেমন, সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন অঞ্চল) কিম্বা (c) অ্যালোসাইক্লিক প্রকৃতির হয় (Darlington ও La Cour যেমন দেখেছিলেন)।

সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের জায়গায় হেটারোক্রোমাটিন থাকে। এছাড়া অন্যান্য স্থানে যেমন, সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন, সেক্স (Y) ক্রোমোসোম ইত্যাদিতে এবং কোনও কোনও জীবে ক্রোমোসোমের প্রান্ত ভাগে হেটারোক্রোমাটিন থাকে। কোনও কোনও ক্রোমোসোমে যে গোলাকার নব (knob) দেখা যায়, তা হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরি। *D. melanogaster*-এর স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসেন্টার অঞ্চল হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরি। উদ্ভিদের অতিরিক্ত (accessory) ক্রোমোসোম হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরি।

হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় (Brown '66), যেমন, গঠনকর বা অপরিহার্য (constitutive) হেটারোক্রোমাটিন এবং আনুষঙ্গিক বা ফ্যাকালটেটিভ (facultative) হেটারোক্রোমাটিন। দু'টি হোমোলোগাস (সমসংস্থ) ক্রোমোসোমের একই জায়গায় **কনস্টিটিউটিভ** বা অপরিহার্য হেটারোক্রোমাটিন উপস্থিত থাকে এবং এই হেটারোক্রোমাটিন উত্তরাধিকার সূত্রে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে যায়। আনুষঙ্গিক বা **ফ্যাকালটেটিভ** হেটারোক্রোমাটিন দু'টি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের কেবল একটিতে দেখা যায়। এই ধরনের হেটারোক্রোমাটিন জীবের বৃদ্ধির কোনও পর্যায়ে গঠিত হয় এবং স্বাভাবিক জিনের কাজকে কম বা বেশি সময়ের জন্য বন্ধ করে দেয়।

Goodenough ও Levine ('74) আরেক ধরনের হেটারোক্রোমাটিনের বিবরণ দিয়েছেন। এই হেটারোক্রোমাটিন দৃঢ়ভাবে পেঁচান থাকে ও গাঢ় রঙ নেয় এবং এদের ঘনীভূত বা **কনডেনসড হেটারোক্রোমাটিন** বলা হয়। অনেক ইন্টারফেজ নিউক্লিয়াসে ঘনীভূত হেটারোক্রোমাটিন দেখা গেছে। বিভিন্ন টিস্যুতে এই হেটারোক্রোমাটিনের

পরিমাণের তারতম্য হয়। এদের কিছু নিয়ন্ত্রক (regulatory) কাজ রয়েছে। এরা কোষের পরিণতির (বা বিভেদ) সময় দেখা দেয় এবং বিশেষ কোনও কোষের নির্দিষ্ট কোনও জেনেটিক তথ্যের প্রকাশ বন্ধ করে দেয়।

কনস্টিটিউটিভ বা অপরিহার্য হেটারোক্রোমাটিন ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে। যেমন, সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল, নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চল ইত্যাদি। সেন্ট্রোমিয়ারের দুই পাশে এই হেটারোক্রোমাটিন থাকে। এই অঞ্চল মেটাফেজে রঙ নেয় না। টেলোফেজের পর থেকে এই অঞ্চল রঙ নেয় এবং ইন্টারফেজ অবস্থায় গাঢ় বর্ণযুক্ত প্রোক্রোমোসোম হিসাবে দেখা দেয়। স্পিন্ডিলে ক্রোমোসোমের সঞ্চালনকে সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলের হেটারোক্রোমাটিন প্রভাবিত করতে পারে। *Drosophila melanogaster*-এর স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসেন্টার অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরি। কোনও কোনও উদ্ভিদে ক্রোমোসোমের প্রান্তের টেলোমিয়ার অঞ্চলের রঙ নেবার ক্ষমতা ক্রোমোসোমের অন্যান্য অংশের মত হয় না অর্থাৎ এই অঞ্চল হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরি। টেলোমিয়ার অঞ্চল অভ্যন্তরীণ কার্যকরী জিনকে রক্ষা করে। নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চল বা সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন অঞ্চল কোষ বিভাজনের কোনও অবস্থাতেই রঙ নেয় না ও বর্ণহীন থাকে। এই অঞ্চলও কনস্টিটিউটিভ হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরি।

কনস্টিটিউটিভ হেটারোক্রোমাটিন কখনই জেনেটিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে ইউক্রোমাটিন গঠন করে না, কিম্বা ইউক্রোমাটিন কখনো জেনেটিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে এই হেটারোক্রোমাটিন গঠন করে না।

কনস্টিটিউটিভ হেটারোক্রোমাটিন কোনও কোনও প্রতিপ্রভ (fluorescent) রঞ্জক পদার্থের সাথে নির্বাচিত বিক্রিয়া করে। যেমন, কুইনোক্রিন মাস্টার্ডের সাহায্যে রঞ্জিত করলে মানুষের Y ক্রোমোসোমের দীর্ঘ বাহুর প্রান্তে উজ্জ্বল প্রতিপ্রভা দেখা যায়। তৃতীয় ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের খর্ব অঞ্চল এবং 13, 14, 15 ক্রোমোসোমের ছোট বাহুতেও এরকম আচরণ দেখা যায়।

ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের তুলনায় কনস্টিটিউটিভ হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলে ক্রসিং ওভার অনেক কম হয়।

কনস্টিটিউটিভ হেটারোক্রোমাটিন নানা রকম হয়। এদের বিস্তারের (distribution) অঞ্চল ও পরিমাণেও তারতম্য দেখা যায়। ইউক্রোমাটিন অংশের মাঝে মাঝে ব্যান্ডের (band) আকারে হেটারোক্রোমাটিন থাকতে পারে। এদের মধ্যবর্তী বা intercalary হেটারোক্রোমাটিন বলা হয়। *Drosophila melanogaster*-এর ব্যান্ডগুলিতে এই রকম হেটারোক্রোমাটিন থাকে। এছাড়া, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমগ্র ক্রোমোসোম হেটারোক্রোমাটিন প্রকৃতির হয়। যেমন, কোনও কোনও উদ্ভিদের সেক্স ক্রোমোসোম এবং অতিরিক্ত বা B-ক্রোমোসোম (যেমন, রাইয়ে)।

আনুষঙ্গিক বা ফ্যাকালটেটিভ হেটারোক্রোমাটিন জীবের বৃদ্ধির সময় তৈরি হয়।

ফ্যাকালটেটিভ হেটারোক্রোমাটিন ইউক্রোমাটিন অঞ্চল হেটারোপিকনোটিক হওয়ার ফলে গঠিত হয়। এরকম হেটারোক্রোমাটিন জিনোমের স্থায়ী অংশ নয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের (mammal) স্ত্রীতে একটি X ক্রোমোসোম বৃদ্ধির সময় সম্পূর্ণভাবে হেটারোক্রোমাটিক হয়ে যায়। মানুষে, পুরুষদের XY সেক্স ক্রোমোসোম ও স্ত্রীদের XX সেক্স ক্রোমোসোম থাকে। পুরুষের X ক্রোমোসোম এবং স্ত্রীর একটি X ক্রোমোসোম ইউক্রোমাটিন প্রকৃতির থাকে। কিন্তু স্ত্রীতে জাইগোট থেকে ভ্রূণের পরিণতির সময় অন্য X ক্রোমোসোমটি পরিবর্তিত হয়ে হেটারোক্রোমাটিক (heterochromatic) প্রকৃতির হয়ে যায়। এই X ক্রোমোসোমকে হেটারোক্রোমাটিক X বা হট (hot) X বলা হয়। এই X ক্রোমোসোম সম্ভবত কার্যকরী X ক্রোমোসোমের সাথে একটা ভারসাম্য বজায় রাখে, কারণ যে সব অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে কয়েকটি X ক্রোমোসোম দেখা যায়, সেখানেও কেবল একটি X ক্রোমোসোম কার্যকরী থাকে ও অন্যান্য X ক্রোমোসোমগুলি হেটাবোক্রোমাটিক প্রকৃতির হয়। এছাড়া কোনও কোনও পোকার (যেমন, *Pseudococcus obscurus*) পুরুষে পিতার সব ক্রোমোসোমগুলি বৃদ্ধির সময় হেটারোক্রোমাটিন প্রকৃতির হয়ে যায়। উদ্ভিদ *Melandrium* ও *Rumex*-এ একটি বা উভয় সেক্স ক্রোমোসোম আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে হেটারোক্রোমাটিন প্রকৃতির হয়।

কনস্টিটিউটিভ ও ফ্যাকালটেটিভ হেটারোক্রোমাটিন উভয়ই S অবস্থায় দ্বিগুণ হয়। হেটারোক্রোমাটিন বিভিন্ন রকমের হয় এবং এজন্য এদের ধর্মেরও পার্থক্য দেখা যায়। হেটারোক্রোমাটিক অঞ্চল জেনেটিকভাবে নিষ্ক্রিয় বলে আগেকার বিজ্ঞানীরা মনে করতেন। কারণ, এই অঞ্চলে কায়েসমা গঠিত হয় না এবং এই অঞ্চলের অবলুপ্তির ফলে জীবের বিশেষ কোনও পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু পরে Muller-এর *Drosophila*-র ওপর গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে, সম্পূর্ণভাবে হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরি Y ক্রোমোসোমেও 'ববড্' চোখের জিন থাকে। এছাড়া পুরুষ পতঙ্গের উর্বরতার জন্য প্রয়োজনীয় জিনও Y ক্রোমোসোমে থাকে। মানুষের হেটারোক্রোমাটিক Y ক্রোমোসোমে রোমশ (hairy) কানের জিন অবস্থিত (Gates)। টমেটোতেও হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলে কার্যকরী জিন পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং, হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলেও কিছু কিছু কার্যকর জিন থাকে। তবে ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের তুলনায় হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলে কার্যকরী জিনের সংখ্যা অনেক কম।

হেটারোক্রোমাটিনের গঠন—

কোনও কোনও হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল, যেমন, সেকেন্ডারী কনস্ট্রিকশন অঞ্চলে rRNA-র পলিজিন থাকে। অন্যান্য হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলে 5S RNA, এবং t-RNA-র পলিজিন দেখা যায়। এসব অঞ্চলের DNA-র সাথে ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের DNA-র পার্থক্য রয়েছে। এরকম DNA-কে স্যাটেলাইট DNA বা পুনরাবৃত্তিসম্পন্ন (repetitive) DNA অথবা redundate DNA বলে। এই অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত খর্ব,

পুনরাবৃত্তি সম্পন্ন পলি নিউক্লিওটাইডের ক্রম থাকে। এই ক্রমে মোটামুটি 300টি নিউক্লিওটাইডযুক্ত সমষ্টি বা ব্লক থাকে। এই নিউক্লিওটাইডের সমষ্টি বা ব্লকে একশ থেকে দশ কোটি বার পুনরাবৃত্তি থাকে।

হেটারোক্রোমাটিনের কাজ—

i) সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলের হেটারোক্রোমাটিন কোষ বিভাজনের সময় অপত্য ক্রোমোসোমের পৃথকীকরণে সাহায্য করে।

ii) মায়োসিস বিভাজনের সময় সমসংস্থ ক্রোমোসোমের যুগ্মতায় (pairing) সহায়তা করে।

ক্রোমোসোমের হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলে ক্রোমাটিন খুব ঘনীভূত অবস্থায় থাকে (Ris ও Kubai, 1970) এবং এই অঞ্চলে ক্রোমাটিন সূত্রের পেঁচগুলি খুব কাছে কাছে থাকে। Coleman (1943) ও Ris (1945) মনে করেন যে, যখন ইউক্রোমাটিন অংশে ক্রোমোনিমার পেঁচগুলি আলগা থাকে, তখনও হেটারোক্রোমাটিন অংশের পেঁচগুলি খুব পাশাপাশি থাকে।

হেটারোক্রোমাটিন ও ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের গঠনে পার্থক্য ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা থেকে বোঝা গেছে। হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের সূত্রটি 250Å এবং ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের সূত্রটি 30-80Å হয়। সুতরাং, হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলে ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের তুলনায় দুই বা তিনগুণ বেশি DNA থাকে। তবে হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল RNA উৎপাদনে অংশ নেয় না। এইসব অঞ্চল DNA-র অন্য অঞ্চল থেকে সাধারণত ভিন্ন সময় দ্বিগুণ হয়। ড্রসোফিলায় সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের বড় অপরিহার্য হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল দেরিতে দ্বিগুণ হয়। এরকম অঞ্চলে স্যাটেলাইট DNA থাকে। সেজন্য এই সব অঞ্চল S অবস্থার আগে দ্বিগুণ হতে পারে না এবং G_2 অবস্থার ঠিক আগে স্বল্প সময়ে দ্বিগুণ হয়। উদ্ভিদ কোষে প্রধানত কনস্টিটিউটিভ DNA দেখা যায়।

অপ্রয়োজনীয় জিনগুলি কিছু সময়ের জন্য হেটারোক্রোমাটিন প্রকৃতির হয়ে যেতে পারে। কোনও কোনও পতঙ্গে দেখা গিয়েছে যে, ভ্রূণের পরিণতির সময় একটি ক্রোমোসোম হেটারোক্রোমাটিন প্রকৃতির হয়ে যায় এবং ঐ ক্রোমোসোমটি পরে আবার ইউক্রোমাটিন প্রকৃতির হয়। সুতরাং, জিনের সাময়িক কর্মবিরতির সময় ঐ অঞ্চল ফ্যাকালটেটিভ হেটারোক্রোমাটিন প্রকৃতির হতে পারে।

তেজস্ক্রিয় থায়ামিডিন প্রয়োগ করে পরীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে যে, ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের চেয়ে দেরিতে হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের DNA দ্বিগুণ হয়। তবে ক্রোমোসোমের যেসব অঞ্চল কোনও সময় ইউক্রোমাটিন প্রকৃতির এবং কখনও হেটারোক্রোমাটিন প্রকৃতির হয়, সেখানের DNA অন্যান্য ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের DNA-র সাথে একই সময় দ্বিগুণ হয়।

ট্রান্সলোকেশনের ফলে বা অন্য কোনওভাবে যদি ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের কাছে

হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল যুক্ত হয়, তবে ঐ হেটারোক্রোমাটিন নিকটবর্তী ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের জিনের প্রকাশকে প্রভাবিত করতে পারে। ভুট্টার Ac-Ds অঞ্চলে এই রকম অবস্থানের প্রভাব (position effect) দেখা গিয়েছে। কখনও কখনও আবার ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের জিন পাশের হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলকে প্রভাবিত করে। ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানকারী বিভিন্ন জিনের মধ্যে যে ভারসাম্য থাকে, তা ব্যাহত হওয়ার জন্যই সম্ভবত এই রকমের পরিবর্তন দেখা যায়।

যুগ্মতার ক্ষেত্রেও হেটারোক্রোমাটিনের সাথে ইউক্রোমাটিনের পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়েছে। হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলগুলির যুগ্ম অবস্থান করার প্রবণতা আছে। ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের বিভিন্ন ক্রোমোসোমের হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল পরস্পর যুক্ত হয়ে ক্রোমোসেন্টার গঠন করে। সুতরাং, এখানে ইউক্রোমাটিনের মত সুনির্দিষ্ট যুগ্মতা হয় না। ইউক্রোমাটিনের মাঝে অবস্থিত হেটারোক্রোমাটিনের এবকম যুগ্মতাকে ectopic pairing বলে। রঞ্জনরশ্মি (X-ray) এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন, ম্যালিক হাইড্রাজাইড (malic hydrazide) প্রয়োগ করলে হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল সহজেই ভেঙে যায়।

McClintock-এর মতে, ক্রোমোসোমের কোনও স্থানের মিউটেশন প্রবণতা ঐ স্থানে কী ধরনের ক্রোমাটিন আছে তার ওপর নির্ভর করে।

হেটারোক্রোমাটিনের কাজ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। Darlington-এর মতে, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হেটারোক্রোমাটিনের কিছু নির্বাচনী ক্ষমতা আছে, যদিও এই অঞ্চল অপরিহার্য নয়।

Mather-এর মতে, প্রধান জিনগুলি (oligogene), যেগুলি ম্যান্ডেলীয় অনুপাত অনুযায়ী এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে যায় ও প্রধান প্রধান চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলি ইউক্রোমাটিন অঞ্চলে থাকে। Mather (1943) ও Goldsmith-এর (1949) মতে, হেটারোক্রোমাটিন অংশে অনেকগুলি জিন থাকে যাদের অল্প, একই ধরনের ও পরিপূরক প্রভাব আছে। একই উদ্ভিদের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়, তা এই জিনের জন্যই হয়। Mather এই সব জিন সমষ্টিকে পলিজিন (polygene) নাম দিয়েছেন।

Vanderlyn-এর (1949) মতে, হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বা নিউক্লিওলার মেমব্রেনের কাছে থাকে এবং নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে RNA-র সঞ্চালনকে সাহায্য করে। আখের B-ক্রোমোসোমের বিভাজন থেকে মনে করা হয় যে, অতিরিক্ত পরিমাণ হেটারোক্রোমাটিন কখনও কখনও কোষ বিভাজনকে উদ্দীপিত করে।

Harlequin ক্রোমোসোম :

যে সব ক্রোমোসোম ব্রোমোডিঅক্সিইউরিডিন মাধ্যমে দু'বার দ্বিগুণ হয়েছে (replication), সেগুলি প্রতিপ্রভ রঞ্জক এবং গিগমা বর্ণ দিয়ে রঞ্জিত করা হয়। এসব

ক্রোমোসোমকে harlequin ক্রোমোসোম বলে। এই ক্রোমোসোমে নবগঠিত DNA সূত্র পুরনো DNA সূত্রের থেকে আলাদাভাবে রঞ্জিত হয়। এজন্য এই ক্রোমোসোম কিছু পরীক্ষায় ব্যবহার করা যায়। যেমন—

i) DNA-র আংশিক রক্ষণশীল পদ্ধতিতে দ্বিগুণ হওয়া (semiconservative replication) এরকম ক্রোমোসোম পরীক্ষা করে বোঝা যায়।

ii) ক্রসিংওভার এবং iii) সিস্টার ক্রোমাটিডের বিনিময়ও (sister chromatid exchange) এরকম ক্রোমোসোম পরীক্ষা করে বোঝা যায়।

ক্রোমোসোমের ব্যান্ডিং (chromosome banding)

ক্রোমোসোমের বিভিন্ন অঞ্চল পার্থক্যমূলকভাবে রঞ্জিতকরণের (differential stainting) জন্য 1969 খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে নানা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব পদ্ধতিতে রঞ্জিত ক্রোমাটিনের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে সুস্পষ্ট বর্ণযুক্ত ব্যান্ড (band) এবং এর মাঝে মাঝে বর্ণহীন ইন্টারব্যান্ড (interband) বা ব্যান্ড মধ্যবর্তী অঞ্চল দেখা যায়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষ করে ছোট ক্রোমোসোমযুক্ত জীবের ক্রোমোসোমের গঠন এবং কাজ সম্বন্ধে আরো ভালোভাবে জানা সম্ভব হয়েছে।

প্রধানত দুই রকমের ক্রোমোসোমের ব্যান্ডিং পদ্ধতি রয়েছে।

(a) ক্রোমোসোমের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত হেটারোক্রোমাটিন প্রতিপ্রভ বা ফ্লুরেসেন্ট রঞ্জক পদার্থের সাহায্যে রঞ্জিত হয় ও ব্যান্ড গঠন করে। এরকম একটি রঞ্জক হল কুইনাক্রিন মাস্টার্ড (quinacrine mustard), যা Q ব্যান্ড গঠন করে। গিমসা (giemsa) রঞ্জক পদার্থ ও অন্য প্রতিপ্রভ নয় এমন রঞ্জক পদার্থের G ব্যান্ড গঠিত হয়। এই পদ্ধতির সামান্য পরিবর্তন করে রিভার্স বা R ব্যান্ডের সৃষ্টি হয়। এই ব্যান্ড Q ব্যান্ড এবং G ব্যান্ডের বিপরীত।

DNA-র যেসব অঞ্চলে প্রচুর অ্যাডিনিন ও থাইমিন থাকে, সে সব অঞ্চল কুইনাক্রিন মাস্টার্ড রঞ্জকের সাথে বিক্রিয়া করে Q ব্যান্ড গঠন করে। যে সব অঞ্চলে প্রচুর গুয়ানিন ও সাইটোসিন থাকে, সে সব অঞ্চলে ফ্লুরেসেন্স বা প্রতিপ্রভা দেখা যায় না। এই অঞ্চলগুলি সেজন্য বর্ণহীন ইন্টারব্যান্ড হিসাবে দেখা দেয়।

(b) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ইত্যাদির সাহায্যে বিশেষভাবে প্রিট্রিটমেন্ট করার পর গিমসা বর্ণ দিয়ে ক্রোমাটিন রঞ্জিত করা হয়। এর ফলে কনস্টিটিউটিভ বা অপরিহার্য হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল আলাদাভাবে বোঝা যায় ও C ব্যান্ড গঠন করে। প্রিট্রিটমেন্টের পর ঐসব অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় DNA-র অধিক ঘনত্বের জন্য C ব্যান্ড দেখা যায়।

কোনও ক্রোমোসোমের ব্যান্ডিং প্যাটার্ন (pattern) নির্দিষ্ট থাকে। সেজন্য ক্রোমোসোম ব্যান্ডিং-এর সাহায্যে অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় অনেক ভালোভাবে ক্রোমোসোমের গঠন বোঝা যায়।

DNA-র ক্ষতি ও সংস্কার

DNA-র ক্ষতি (damage)

DNA-র ক্ষত বা lesions : বহিঃস্থ কোনও রাসায়নিক অথবা বিকিরণের প্রভাবে DNA-র ভৌত বা রাসায়নিক গঠনে পরিবর্তন হতে পারে। এরকম পরিবর্তনকে lesion বলে। এর ফলে ট্রান্সক্রিপশন বা রেপ্লিকেশন পদ্ধতি বাধা প্রাপ্ত হয়ে প্রাণনাশ (lethal) পর্যন্ত হতে পারে। কখনও কখনও এরকম উদ্দীপকের প্রভাবে মিউটেশন হয়। রাসায়নিকের প্রভাবে DNA-তে স্বতোজাত বিকৃতি যেমন, ডিঅ্যামিনেশন এবং ডিপিউরিনেশন হতে পারে।

রাসায়নিকের প্রভাবে বেসের কার্বন ও নাইট্রোজেন অণু (হেটারোসাইক্লিক বলয়ের) বা অ্যামিনো ও কিটো গ্রুপ (এক্সোসাইক্লিক বলয়ের) সহজেই পরিবর্তিত হতে পারে।

এর ফলে বেসের যুগ্মতা হয় না বা পরিবর্তিতভাবে হয়। এরকম পরিবর্তন DNA-তে থেকে গেলে মিউটেশন দেখা দেয়। রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে DNA-র গঠনে বিকৃতি দেখা দিতে পারে। এজন্য রেপ্লিকেশন এবং/বা ট্রান্সক্রিপশন প্রভাবিত হতে পারে ও কোষের মৃত্যু ঘটতে পারে (lethal)। এরকম কোনও কোনও বিকৃতি স্বতোজাত। যেমন, সাইটোসিন বেসে স্বতোজাত আর্দ্রবিশ্লেষের দ্বারা ডিঅ্যামিনেশন (deamination) হয়। এর ফলে ইউরাসিল উৎপন্ন হয়। যদি এই পরিবর্তন থেকে যায় তাহলে রেপ্লিকেশনের সময়ে ইউরাসিলের সাথে অ্যাডিনিন যুক্ত হয়। এর ফলে পয়েন্ট মিউটেশন (point mutation বা বিন্দু পরিব্যাক্তি) হয়।

DNA-র ইউরাসিল উৎসেচক ইউরাসিল DNA গ্লাইকোজাইলেস দ্বারা সাইটোসিনে পরিবর্তিত হতে পারে। DNA-তে সামান্য পরিমাণ মিথাইল সাইটোসিন পাওয়া যায়। এই বেসে ডিঅ্যামিনেশনের (অ্যামোনিয়া গ্রুপ বাদ যায়) ফলে থাইমিন উৎপন্ন হয়। ডিপিউরিনেশনের (depurination) সময় আর্দ্রবিশ্লেষ হয় এবং পিউরিন বেস A ও G-র N-9 এর গ্লাইসাইডিক বন্ধন এবং ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করার C-1 বন্ধন ভেঙে যায়। এর ফলে DNA থেকে পিউরিন বেস আলাদা হয়ে যায়। DNA-র শর্করা-ফসফেট কাঠামো অবিকৃত থাকে। যে অঞ্চল থেকে পিউরিন বাদ গেছে, সেখানে কোডিং (coding) হয় না। এরকম বিকৃতির ফলে 37^{0}C তাপমাত্রায় মানুষের প্রতি কোষ থেকে 10,000 পিউরিন বেস প্রতি ঘণ্টায় বাদ যেতে পারে।

ডিপিরিমিডেশনও (depyrimidation) হয়, তবে এর হার অপেক্ষাকৃত কম।

জারণ সংক্রান্ত ক্ষতি (oxidative damage) :

স্বাভাবিক অবস্থায় সব সবাত কোষে সক্রিয় অক্সিজেনের বা ROS-এর (reactive oxygen species) উপস্থিতিতে এরকম ক্ষতি হয়। হাইড্রোজেন প্যারাক্সাইড, সুপারঅক্সাইড, হাইড্রক্সিল মূলক (বা radical) (OH) হল এরকম সক্রিয় অক্সিজেনের উৎস। এরকম মূলক DNA-র ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল আক্রমণ করে এবং বিভিন্ন রকম

জারিত উপাদানের (যেমন, 2-অক্সোঅ্যাডিনিন, 8-অক্সোগুয়ানিন, 5-হাইড্রক্সিমিথাইল ইউরাসিল ইত্যাদি) সৃষ্টি হয়। এর ফলে DNA-র ধর্মের পরিবর্তন হয়। আয়নিত বিকিরণের প্রভাবে জলের বিশ্লেষ হওয়ায় হাইড্রক্সিল মূলকের পরিমাণ বাড়ে এবং DNA ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

অ্যালকাইলীকরণ (alkylation) :

অ্যালকাইলকারী রসায়নগুলি তড়িতাকর্ষী (electrophilic)। এগুলি DNA-র বিভিন্ন স্থানে অ্যালকাইল গ্রুপ (যেমন, মিথাইল) সংযুক্ত করতে পারে। তবে স্বাভাবিক মিথাইল সংযোগকারী (methylating) উৎসেচক দ্বারা মিথাইলীকরণ এর মধ্যে ধরা হয় না। অ্যালকাইলকারী কয়েকটি রসায়ন হল মিথাইল মিথেল সালফোনেট (MMS) এবং ইথাইল নাইট্রোসোইরিয়া (ENU)। এসব পদার্থের প্রভাবে সৃষ্ট মিথাইলযুক্ত বেসগুলি হল 3 মিথাইল অ্যাডিনিন, 3 মিথাইল গুয়ানিন, 7 মিথাইল গুয়ানিন এবং 0^6 মিথাইল গুয়ানিন। এসব পরিবর্তিত বেসের কোনও কোনওটি প্রাণনাশক (lethal), কারণ এগুলি DNA-র রেপ্লিকেশন ও ট্র্যান্সক্রিপশনের সময় DNA অণুর পেঁচ খুলতে (unwinding) বাধা দেয়।

এসব পরিবর্তিত বেসের বেশিরভাগগুলি অপ্রত্যক্ষভাবে মিউটেশন সৃষ্টি করে। তবে 0^6 মিথাইল গুয়ানিন সরাসরি মিউটেশন সৃষ্টি করতে পারে, কারণ এই বেস রেপ্লিকেশনের সময়ে থাইমিনের সাথে যুগ্ম অবস্থান করে।

বিশাল ক্ষত (bulky lesions) :

পিরিমিডিন ডাইমার (dimer) এবং অ্যারিলেটিং উপাদান সমান্ত কেন্দ্রাভিকর্ষী (adduct)। এর প্রভাবে DNA-র ডাবল হেলিক্সে বিকৃতি হয় এবং স্থানীয় অপ্রাকৃত অবস্থার (denaturation) সৃষ্টি হয়। এর ফলে DNA স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না। অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে একটি সূত্রে পার্শ্ববর্তী পিরিমিডিন থেকে সাইক্লোবিউটেন পিরিমিডিন ডাইমার উৎপন্ন হয়। এর ফলে বিপরীত সূত্রের সাথে বেসের যুগ্মতা হয় না এবং DNA-র স্থানীয় অপ্রাকৃত অবস্থার সৃষ্টি হয় (denaturation)। এজন্য রেপ্লিকেশন এবং ট্র্যান্সক্রিপশন বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনেক সুগন্ধ অ্যারিলেটিং পদার্থ যেমন, বেনজো-a-পাইরিন DNA-র সাথে কোভ্যালেন্ট বন্ধন গঠন করে।

DNA-র সংস্কার (repair)

আলোক সক্রিয়তা (photoreactivation) :

দৃশ্যমান আলোর উপস্থিতিতে DNA ফটোলেজেস উৎসেচকের প্রভাবে সাইক্লোবিউটেন পিরিমিডিন ডাইমার থেকে মনোমার গঠিত হতে পারে। এই উৎসেচকের প্রসথেটিক গ্রুপ নীল আলো শোষণ করে এবং ঐ শক্তি সাইক্লোবিউটেন বলয় ভেঙে দেয়।

আলোক সক্রিয়তা পিরিমিডিন ডাইমারের জন্য নির্দিষ্ট। এই পদ্ধতিতে কোনও

ক্ষতি (lession) সরাসরি সংস্কার হয়।

অ্যালকাইল ট্র্যান্সফারেজ (alkytransferase) :

একটি ইন্ডিউসেবল (inducible) প্রোটিন গুয়ানিনের 0^6 স্থান থেকে নির্দিষ্টভাবে অ্যালকাইল গ্রুপ বাদ দেয়। অ্যালকাইল গ্রুপ ঐ প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে প্রোটিনকে নিষ্ক্রিয় করে।

অ্যালকাইলকারী ঘটকের প্রভাবে যে অভিযোজ্য প্রতিক্রিয়া (adaptive response) দেখা যায়, তার ফলে DNA-র ক্ষত ভ্রান্তিবিহীনভাবে সরাসরি সংস্কার করা যায়। *E.coli*-তে কম মাত্রার অ্যালকাইলকারী পদার্থের প্রভাবে যে আবিষ্ট (induce) প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তার ফলে এটি বেশি মাত্রার ঐরকম পদার্থের মিউটেশন সৃষ্টিকারী বা প্রাণনাশক প্রভাব রোধ করতে পারে। একটি অ্যালকাইল ট্র্যান্সফারেজ মিউটেশন সৃষ্টিকারী 0^6 অ্যালকাইল গুয়ানিন থেকে অ্যালকাইল গ্রুপ বাদ দেয়। এর ফলে মিউটেশন প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। অ্যালকাইল গ্রুপটি ঐ প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে এটিকে নিষ্ক্রিয় করে। এজন্য প্রত্যেক অ্যালকাইল ট্র্যান্সফারেজ কেবল একবার ব্যবহৃত হতে পারে। DNA গ্লাইকোসাইলেজ বেস কর্তন বা ছেদন সংস্কার (base excision repair) পদ্ধতিতে অন্যান্য অ্যালকাইলযুক্ত বেসগুলি বাদ দেয়। এর ফলে প্রাণনাশক ক্ষতি হতে পারে না।

কর্তন বা ছেদন সংস্কার (excision repair) :

এরকম সংস্কার মোটামুটি ভ্রান্তিবিহীন। এর দু'টি পদ্ধতি রয়েছে— নিউক্লিওটাইড কর্তন বা ছেদন সংস্কার (NER) এবং বেস কর্তন (বা ছেদন) সংস্কার (BER)। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে DNA-র ক্ষত অঞ্চলের দুই পাশে নির্দিষ্ট সংখ্যক বেস (base) এন্ডোনিউক্লিয়েজের প্রভাবে পৃথক হয়। এর ফলে ক্ষতযুক্ত অলিগোনিউক্লিওটাইড পৃথক হয়ে যায়। যেমন, *E.coli*-তে UVrABC এন্ডোনিউক্লিয়েজ পিরিমিডিন ডাইমার এবং বড় ক্ষত অঞ্চল পৃথক করতে পারে। BER পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট DNA গ্লাইকোসাইলেজেস পরিবর্তিত বেসকে সনাক্ত করতে পারে। এই উৎসেচক পরিবর্তিত বেস ও শর্করার মধ্যের N-গ্লাইকোসিলিক বন্ধন ভেঙে দেয়। এর ফলে পিউরিন বা পিরিমিডিন অঞ্চল বাদ যায়, অর্থাৎ এই অঞ্চলগুলি (AP) অ্যাপিউরিনিক (apurinic) বা পিউরিনবিহীন অথবা অ্যাপিরিমিডিনিক (apyrimidinic) বা পিরিমিডিনবিহীন। স্বতোজাতভাবে বেস বাদ গিয়েও AP অঞ্চলের সৃষ্টি হতে পারে। AP এন্ডোনিউক্লিয়েজ এই অঞ্চলে DNA ভেঙে দেয় এবং এক্সোনিউক্লিয়েজ এই অঞ্চলে DNA ভেঙে দেয় এবং এক্সোনিউক্লিয়েজের কার্যকারিতার ফলে ফাঁক (gap) অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। NER-এর ক্ষেত্রে BER-এর তুলনায় ফাঁক অঞ্চল অপেক্ষাকৃত বড়। এসব ফাঁক অঞ্চলের সংস্কার দু'টি ক্ষেত্রেই মোটামুটি এক। *E.coli*-তে DNA পলিমারেজ I এই ফাঁক ভরাট করে এবং DNA লাইগেস শেষ ফসফোডায়েস্টার বন্ধনটি গঠন করে।

ইউক্যারিওটে ছেদন অঞ্চলের সংস্কার ট্র্যান্সক্রিপশনের সাথে জড়িত। ট্র্যান্সক্রিপশনকারী (অর্থাৎ জেনেটিকভাবে সক্রিয়) অঞ্চলের DNA-র সংস্কার অপেক্ষাকৃত দ্রুত হয়। এর ফলে অস্বাভাবিক জিনের প্রভাবে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ সীমিত থাকে।

ভ্রান্ত সংস্কার (mismatch repair) :

রেপ্লিকেশনের সময় প্রুফ রিডিং (proof reading) যথাযথভাবে না হওয়ায় বেসের ভ্রান্ত জোড়া গঠিত হয়। এসব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে ছেদন ও সংস্কার হয়। রেপ্লিকেশনের সময় ভ্রান্ত জোড় (mispair) গঠিত হলে, ভ্রান্ত বেসটি অপত্য সূত্রে থাকে। সুতরাং, এই পদ্ধতিতে প্রথমে মাতৃ ও পিতৃ সূত্র এবং অপত্য সূত্র সনাক্ত করা দরকার এবং এরপর অপত্য সূত্র থেকে ভ্রান্ত বেসটি বাদ দেওয়া হয়। ভ্রান্ত জোড় সংস্কারকারী উৎসেচক মিউটেশনের ফলে বাদ যাওয়ায় বংশগত ননপলিপোসিস কারসিনোমা রোগ দেখা দেয়।

প্রোক্যারিওটে কোনও কোনও অ্যাডিনিন অবশেষ (residue) স্বাভাবিকভাবে দু'টি সূত্রেই মিথাইলযুক্ত হয়। এই ক্রমগুলি হল GATC। অপত্য সূত্র অপেক্ষাকৃত ধীরে অর্থাৎ কয়েক মিনিটে মিথাইলযুক্ত হয়। সুতরাং, সদ্য দ্বিগুণ (replicated) DNA সূত্রের মাতৃপিতৃ সূত্রটি মিথাইলযুক্ত এবং অপত্য সূত্রটি মিথাইলবিহীন অবস্থায় থাকে (hemimethylated অবস্থা)। এর ফলে সূত্র দু'টি সহজেই পৃথক করা যায়।

ইউক্যারিওটে কিন্তু এরকম পার্থক্য দেখা যায় না। তবে এখানেও ভ্রান্তজোড়ার সংস্কার হয়।

সংস্কার পদ্ধতিতে বংশগত ত্রুটি (hereditary repair defects) :

ছেদন সংস্কারকারী জিনে মিউটেশন হওয়ায় জেরোডার্মা পিগমেন্টোসাম (XP বা xeroderma pigmentosum) রোগ দেখা দেয়। এরকম রোগী সূর্যালোকে অত্যন্ত সুবেদী (sensitive)। সূর্যালোকের প্রভাবে এদের ত্বকে অনেক টিউমার গঠিত হয়।

ছেদন সংস্কারকারী (excision repair) জিনে মিউটেশনের ফলে কোকেইন সিনড্রোম (cockayne syndrome) রোগও দেখা যায়। এক্ষেত্রেও রোগীরা সূর্যালোক সুবেদী। কিন্তু এই রোগে ক্যানসার দেখা দেয় না।

***E.coli*-তে SOS সংস্কার (repair) পদ্ধতি :**

E.coli-তে বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রভাবে DNA-তে ক্ষত দেখা দেয় বা DNA-র রেপ্লিকেশনে বাধা সৃষ্টি হয়। এর ফলে ফেনোটাইপ পরিবর্তিত হয়। SOS প্রতিক্রিয়ায় (response) ক্ষতিগ্রস্থ DNA-র সংস্কার আরো ভালোভাবে হতে পারে। Rec A প্রোটিন এবং Lex A রিপ্রেসারের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার (interact) ফলে SOS প্রতিক্রিয়ার প্রারম্ভ হয়। এই প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপগুলি হল— a) DNA ক্ষতিগ্রস্থ হলে সাধারণ মধ্যবর্তী পদার্থ যেমন, ছোট DNA অণু বা একসূত্রযুক্ত DNA Rec প্রোটিনকে সক্রিয় করে। Rec প্রোটিন হল এক ধরনের প্রোটিয়েজ।

b) Rec A প্রোটিয়েজ Lex A রিপ্রেসার বা বাধাদায়ক পদার্থের (Lex A জিন দ্বারা কোডবিশিষ্ট) সাথে মিথষ্ক্রিয়া করে। Rec A ও Lex A-র প্রোটিওলাইটিক কার্যকারিতার ফলে যেসব অপেরনের (operon) সাথে Lex A যুক্ত থাকে, সেগুলি আবিষ্ট (induced) হয়। এর সাথে অনেক জিন বা অপেরন অন্তর্ভুক্ত, যেমন ডীন (din) জিনগুলি (যথা— urv A, uru B, uru C, hin A ইত্যাদি)। এরকম প্রত্যেক জিনে একটি 'SOS বাক্স' থাকে। এরকম SOS অঞ্চলে 20টি বেস জোড়া থাকে। এর মধ্যে আটটি বেস জোড়া একই ধরনের ক্রমযুক্ত। Lex A স্বউৎপাদন এবং Rec A-র উৎপাদনে বাধা দেয়। এজন্য Lex A-র প্রোটিওলাইটিক বিনষ্টির ফলে Lex A এবং Rec A প্রোটিন বৃদ্ধি পায়। তবে DNA-র ক্ষতের সঙ্কেত না থাকলে, Rec A আবিষ্ট হয় না এবং Lex A সঞ্চিত হয়। এই Lex A SOS প্রক্রিয়ার সব জিনগুলিকে বাধা দেয়।

মানুষের অনেক জেনেটিক রোগ DNA-র ক্ষত সংক্রান্ত কোষের অতি সংবেদনার (hypersensitivity) জন্য হয়। যেমন, জেরোডার্মা পিগমেন্টোসা, ব্লুমের সিনড্রোম ইত্যাদি।

জেনেটিক পদার্থ হিসাবে DNA

আগে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে জেনেটিক পদার্থ বা জিন হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

(A) Mazia, Mirsky প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণের মতে, নিউক্লিক অ্যাসিডই হল জেনেটিক পদার্থ। অনেকে এই মতের প্রতিবাদ করেছিলেন কারণ, তাঁরা মনে করতেন যে—

a) নিউক্লিক অ্যাসিড কোষের সব অবস্থায় বর্তমান থাকে না। কোষ বিভাজনের কোনও কোনও পর্যায়ে কেবল এদের দেখা যায়।

b) নিউক্লিক অ্যাসিডের রাসায়নিক গঠনে বিভিন্নতা (variability) দেখা যায় না।

(B) Frey-Wyssling ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন যে, প্রোটিনই হচ্ছে জিনীয় বস্তু এবং পলিপেপটাইড চেনে (শৃঙ্খল) বিভিন্ন রকমের অ্যামিনো অ্যাসিডের উপস্থিতির জন্য জিনে বিভিন্নতা দেখা যায়।

(C) Schultz, Serra প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের মতে, নিউক্লিওপ্রোটিনের অণু সামগ্রিকভাবে জিনের চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে এবং জিনের ও নিউক্লিওপ্রোটিনের স্বজননের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে।

আধুনিক কালের নানা গবেষণা বিশেষ করে Avery-র নিউমোকক্কাসের রূপান্তরের (pneumococcal transformation) আবিষ্কার থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, DNA-ই হচ্ছে জেনেটিক পদার্থ।

কোনও বস্তুকে বংশধারার বাহক হতে হলে তার কতকগুলি বিশেষ ধর্ম থাকা

দরকার। এই ধর্মগুলি হচ্ছে— a) কোষের সব অবস্থায় উপস্থিত থাকা প্রয়োজন, b) স্ব-দ্বিগুণতায় (self-duplication) সক্ষম হওয়া দরকার, c) রাসায়নিক বিভিন্নতা (chemical variability) থাকা দরকার, d) জেনেটিক তথ্যের বাহক হওয়া প্রয়োজন।

আধুনিক কালের বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এই সব ধর্মই DNA-র আছে। Mazia, Mirsky ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, DNA-ই হচ্ছে জেনেটিক বস্তু। এই বস্তুই বিভিন্ন জিনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। মর্স কোডের (Morse code) বিভিন্ন বার্তা যেমন কেবল 'ডট' (dot) ও 'ড্যাসে'র (dash) ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে DNA-র বার্তা চারটি প্রধান বেস জোড়ার (A-T, G-C, T-A, C-G) ওপর নির্ভরশীল।

যে সব বিভিন্ন প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে DNA-ই জেনেটিক বস্তু, তার কতকগুলির বিবরণ দেওয়া হল।

1. (a) **নিউমোকক্কাসের রূপান্তর** (pneumococcal transformation)— নিউমোনিয়া সৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়া *Diplococcus pneumoniae*-র [সাধারণত নিউমোকক্কাস (pneumococcus) বলা হয়ে থাকে।] বিভিন্ন রকমের স্ট্রেইন্ (strain) হয়। F. Griffith 1928 খ্রিস্টাব্দে দেখেন যে, রোগ সৃষ্টিকারী নিউমোকক্কাসের কোষের চারিদিকে একটা আবরণ বা ক্যাপসিউল (capsule) থাকে। কোনও কোনও বিশেষ ধরনের *D. pneumoniae*-তে কোনও আবরণ বা ক্যাপসিউল থাকে না কারণ এরা একটি বিশেষ ধরনের পলিস্যাকারাইড (polysaccharide) তৈরি করতে পারে না। এই রকমের নিউমোকক্কাস রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। যখন এই রকমের ব্যাকটিরিয়াকে অ্যাগার (agar) মাধ্যমে রাখা হয়, তখন এরা অমসৃণ কলোনি তৈরি করে। ক্যাপসিউলযুক্ত ও ক্যাপসিউলবিহীন স্ট্রেইনের মধ্যে সংকরণ (hybridize) করলে সংকর ব্যাকটিরিয়া (F_1) ক্যাপসিউলযুক্ত হয় অর্থাৎ, ক্যাপসিউলযুক্ত চরিত্র ক্যাপসিউলবিহীন চরিত্রের ওপর ডমিন্যান্ট (প্রবল)। দ্বিতীয় অপত্য প্রজন্ম (F_2) ক্যাপসিউলযুক্ত ও ক্যাপসিউলবিহীন ব্যাকটিরিয়া 3 : 1 অনুপাতে দেখা যায়। ক্যাপসিউলযুক্ত নিউমোকক্কাস উত্তাপ প্রয়োগ করলে বিনষ্ট হয়ে যায় ও তখন এদের রোগ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা থাকে না। যদি ক্যাপসিউলবিহীন নিউমোকক্কাসের মাধ্যমে (medium) উত্তাপ প্রয়োগ করলে বিনষ্ট ক্যাপসিউলযুক্ত ব্যাকটিরিয়া দেওয়া হয়, তবে ক্যাপসিউলযুক্ত ব্যাকটিরিয়ার সৃষ্টি হয়। এসব ব্যাকটিরিয়া নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং, উত্তাপ প্রয়োগে বিনষ্ট ক্যাপসিউলযুক্ত নিউমোকক্কাসের নির্যাসও (extract) এই পরিবর্তন আনতে পারে। 1944 খ্রিস্টাব্দে C. M. MacLeod, O. T. Avery ও M. McCarthy দেখেন যে, এই নির্যাসের 98 শতাংশ হল DNA। এখানে মাত্র 1-2 শতাংশ প্রোটিন থাকে। সুতরাং, DNA-ই ক্যাপসিউলবিহীন ডিপ্লোকক্কাসকে ক্যাপসিউলযুক্ত ডিপ্লোকক্কাসে রূপান্তরিত করেছে।

সুতরাং, বিভিন্ন জিনের নির্দিষ্ট চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য DNA-ই নিয়ন্ত্রণ করে। প্রোটিন মতবাদের সমর্থকরা মনে করেন যে, 1-2% প্রোটিনের জন্যই এই বংশগত পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ এই নির্যাসে এনজাইম ডি এন এজ (DNAse) দিলে এর ডিপ্লোকক্কাসকে রূপান্তর করার ক্ষমতা লোপ পায়। কিন্তু যদি এই নির্যাসে প্রোটিয়েজ (protease) দেওয়া হয়, তাহলে এর রূপান্তর (transformation) করার ক্ষমতা অব্যাহত থাকে।

1. (b) কোনও কোনও নিউমোকক্কাস স্ট্রেপটোমাইসিন প্রয়োগ করলে বিনষ্ট হয়ে যায়। আবার অন্যান্য নিউমোকক্কাসের ওপর স্ট্রেপটোমাইসিনের কোনও প্রভাব নেই। এই স্ট্রেপটোমাইসিন সংবেদনা (sensitivity) একটি বংশগত চরিত্র। যদি প্রতিরোধক ধরনের (resistant) নিউমোকক্কাসের নির্যাস স্ট্রেপটোমাইসিন সংবেদন নিউমোকক্কাসে দেওয়া যায়, তবে ঐ নিউমোকক্কাস পরিবর্তিত হয়ে প্রতিরোধক ধরনের হয়। এই পরিবর্তন স্থায়ী এবং বংশগত। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই নির্যাসে প্রধানত DNA থাকে অর্থাৎ, DNA-ই বংশগত পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

1. (c) কোনও কোনও *Bacillus subtilis* (ব্যাকটিরিয়া) অ্যামিনো অ্যাসিড ট্রিপ্টোফ্যানের (tryptophane) সরবরাহ ছাড়া বাড়তে পারে না। আবার অন্যান্য *B. subtilis* ট্রিপ্টোফ্যানের সরবরাহ ছাড়াই বাড়তে পারে। শেষোক্ত ধরনের ব্যাকটিরিয়ার বিশুদ্ধ DNA যদি প্রথমোক্ত ধরনের ব্যাকটিরিয়ার মাধ্যমে দেওয়া হয়, তবে ঐ ব্যাকটিরিয়ার বেশিরভাগই ট্রিপ্টোফ্যানের সরবরাহ ছাড়াই বাড়তে পারে।

2. **ব্যাকটিরিয়ফাজের সংক্রমণ (ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে ভাইরাসের (virus) সংখ্যা বৃদ্ধি)** — যেসব ভাইরাস ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে, তাদের ব্যাকটিরিয়ফাজ (bacteriophage) বলে। এদের দেহে DNA-র চারিদিকে প্রোটিনের আবরণ থাকে। A. D. Hershey দেখেন যে, ব্যাকটিরিয়া *Escherichia coli*-কে ব্যাকটিরিয়ফাজ আক্রমণ করলে ব্যাকটিরিয়ফাজের কেবল DNA অংশটিই ব্যাকটিরিয়ার কোষে প্রবেশ করে এবং প্রোটিন অংশটি বাইরে থাকে। তিনি DNA-র ফসফরাসকে এবং প্রোটিনের সালফারকে তেজস্ক্রিয় করে এই পরীক্ষা করেছিলেন। পরে এই DNA থেকেই ব্যাকটিরিয়ার কোষের ভিতর অনেক নতুন ব্যাকটিরিয়ফাজের সৃষ্টি হয়। সুতরাং, DNA-ই নতুন ফাজ তৈরি করতে পারে।

A. D. Hershey ও M. J. Chase-এর (1952) পরীক্ষার বিবরণ এখানে দেওয়া হল। এই পরীক্ষায় আক্রান্ত ব্যাকটিরিয়াকে $P^{32}O_4$ যুক্ত মাধ্যমে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য রাখা হয়। এর ফলে ফাজের DNA-তে তেজস্ক্রিয়তা (P^{32}) দেখা যাবে, কারণ ফাজের প্রোটিনে ফসফরাস থাকে না। আরেকটি পরীক্ষায় একইভাবে ফাজের প্রোটিনকে $S^{35}O_4$ এর সাহয্যে তেজস্ক্রিয় (S^{35}) করা হয়। যেহেতু DNA তে সালফার থাকে না, সেজন্য কেবল প্রোটিনে তেজস্ক্রিয়তা দেখা যায়। Hershey এবং Chase এই রকম তেজস্ক্রিয় DNA বিশিষ্ট ব্যাকটিরিয়ফাজ নিয়ে পরীক্ষা করেন। এই ফাজ

ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করার পর আক্রান্ত ব্যাকটিরিয়ায় কেবল P^{32}-র তেজস্ক্রিয়তা দেখা যায়। এই ব্যাকটিরিয়ার অভ্যন্তরে উৎপন্ন সব ফাজে P^{32}-র তেজস্ক্রিয়তা দেখা যায়। আরেকটি পরীক্ষায় তেজস্ক্রিয় S^{35} ফাজ ব্যবহার করে আক্রান্ত ব্যাকটিরিয়ায় তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যায়নি। এই ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে উৎপন্ন ফাজে তেজস্ক্রিয়তা দেখা যায় না। এসব পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় যে, ফাজের কেবল DNA অংশ ব্যাকটিরিয়ায় প্রবেশ করে, প্রোটিনের আবরণ বাইরে থেকে যায়। ফাজের এই DNA-র মধ্যেই নতুন ফাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে অর্থাৎ, DNA-ই হল জেনেটিক পদার্থ।

3. **ট্রান্সডাকশন (transduction)** – Lederberg দেখেন যে, কোনও কোনও ফাজ (phage) যখন একটা ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করার পর দ্বিতীয় ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে, তখন কখনও কখনও এই ফাজ প্রথম ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমোসোমের কোনও অংশ দ্বিতীয় ব্যাকটিরিয়ায় সঞ্চারিত করে। এর ফলে ব্যাকটিরিয়ায় জেনেটিক পরিবর্তন হয়ে থাকে ও এই প্রক্রিয়াকে ট্রান্সডাকশন বলে। আক্রান্ত ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমোসোমের সাথে ফাজের DNA সংযুক্ত অবস্থায় থাকে ও এই রকমের ফাজকে প্রোফাজ (prophage) বলে। প্রোফাজের আক্রমণের ফলে ব্যাকটিরিয়া বিনষ্ট হয় না। অনুকূল পরিবেশে ব্যাকটিরিয়া নিজের দেহের মধ্যে প্রোফাজকে থাকতে দেয়। ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট স্থানে প্রোফাজ থাকে ও এদের ওই ক্রোমোসোম থেকে আলাদাভাবে চেনা যায় না। প্রোফাজের DNA-র বিভাজন ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমোসোমের বিভাজনের সাথে সাথেই হয়। প্রোফাজের DNA ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমোসোমে নতুন জিনের মত আচরণ করে। এই পরীক্ষা DNA এবং জিনের নিকট সম্বন্ধ প্রমাণ করে।

নির্দিষ্ট পরিবেশে প্রোফাজ ব্যাকটিরিয়ার কোনও ক্ষতি করে না। কিন্তু পরিবেশের পরিবর্তন হ'লে প্রোফাজ দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও ব্যাকটিরিয়ার কোষকে ধ্বংস করে দেয়। যেসব ব্যাকটিরিয়ায় এই রকমের প্রোফাজ থাকে, তাদের লাইসোজেনিক (lysogenic) ব্যাকটিরিয়া এবং ওই প্রোফাজকে টেম্পারেট (temperate) ফাজ বলে। এই টেম্পারেট ফাজ প্রথম ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমোসোমের DNA-র একটি অংশ আক্রমণের দ্বারা দ্বিতীয় ব্যাকটিরিয়ায় সঞ্চারিত করতে পারে। এইভাবে দু'টি ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমোসোমের মধ্যে রিকমবিনেশন (recombination) হতে পারে। প্রোফাজের DNA-র আচরণ এবং ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমোসোমের সাথে অবস্থান এর (প্রোফাজের DNA-র) জিন প্রকৃতি নির্দেশ করে।

4. **ব্যাকটিরিয়ার সংশ্লেষ ও রিকমবিনেশন**— Laderberg ও Tatum ('46) *E. coli*-র দুইটি স্ট্রেইনের মধ্যে সংশ্লেষের ফলে রিকমবিনেশন লক্ষ্য করেন। স্বাভাবিক *E. coli* শর্করা ও খনিজ পদার্থযুক্ত সর্বাল্প মাধ্যমে বা minimal medium-এ বাড়তে পারে। মিউটেশনযুক্ত *E. coli*-র স্ট্রেইন A মাধ্যমে মেথিওনিন ও বায়োটিনের

সরবরাহ ছাড়া বাঁচতে পারে না। এই স্ট্রেইনের জেনেটিক গঠন হ'ল met⁻ bio⁻ thr⁺ leu⁺ thi⁺। *E. coli*-র স্ট্রেইন B আবার থ্রিওনিন (threonine), লিউসিন এবং থায়োনিনের সরবরাহ ছাড়া বাঁচে না এবং এর জেনেটিক গঠন হ'ল met⁺bio⁺thr⁻ leu⁻ thi⁻। সুতরাং, এই দুইটি স্ট্রেইন সর্বাল্প মাধ্যমে বাড়ে না। কিন্তু যদি এই দুইটি স্ট্রেইন একই সাথে সর্বাল্প মার্ধ্যমে দেওয়া হয়, তাহলে কিছু কলোনি তৈরি হয়। সংশ্লেষের ফলে একটি ব্যাকটিরিয়ার DNA অপর ব্যাকটিরিয়ায় প্রবেশ করে ও রিকমবিনেশন হয়। দুইটি স্ট্রেইনের মধ্যে রিকমবিনেশনের ফলে স্বাভাবিক met⁺ bio⁺ thr⁺ leu⁺ thi⁺ ব্যাকটিরিয়া উৎপন্ন হয়, যা সর্বাল্প মাধ্যমে বাড়তে পারে। এই পরীক্ষা জেনেটিক পদার্থ হিসাবে DNA-র দাবী সমর্থন করে। সংশ্লেষের সময়ের ওপর কতটা DNA দাতা কোষ থেকে গ্রহীতা কোষে প্রবেশ করবে তা নির্ভর করে। এছাড়া সঞ্চারিত DNA-র দৈর্ঘ্যের সাথে জেনেটিক তথ্য সঞ্চারন প্রত্যক্ষভাবে আনুপাতিক।

5. **আলট্রা-ভায়োলেট আলো ও মিউটেশন**— নিউক্লিক অ্যাসিড আলট্রা-ভায়োলেট আলো শোষণ করে। সবচেয়ে বেশি শোষণ দেখা যায় 260mμ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলট্রা-ভায়োলেট আলোর ক্ষেত্রে। বিভিন্ন জীবে 260mμ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি সবচেয়ে বেশি মিউটেশন উৎপাদন করে। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি শোষণ এবং মিউটেশনের উৎপাদনের (action spectrum) মধ্যে একটি নিকট সম্পর্ক লক্ষ্য করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, জিনগুলি নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি। নিউক্লিক অ্যাসিড আলট্রা-ভায়োলেট আলো শোষণ করার ফলে পরিবর্তিত হয় ও মিউটেশনযুক্ত জিনের সৃষ্টি হয়।

6. **জিনের উৎপাদন**— ড: হরগোবিন্দ খোরানা 77টি নিউক্লিওটাইডযুক্ত ইস্টের একটি জিন উৎপাদন করতে পেরেছিলেন। আমেরিকান বিজ্ঞানীরা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে খরগোসের একটি জিন, যা হিমোগ্লোবিন উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা উৎপাদন করতে পেরেছিলেন। এই সব উৎপাদন থেকে নিঃসন্দেহে হওয়া গিয়েছে যে, DNA-ই হচ্ছে জেনেটিক পদার্থ।

7. **DNA ও ক্রোমোসোমের অখণ্ডতা**— ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোমে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ দিলে ওই ক্রোমোসোমটা ভেঙে যায়। কিন্তু প্রোটিয়েজ বা রাইবোনিউক্লিয়েজ প্রয়োগ করলে ওই সূত্রটি ভেঙে যায় না। এর থেকে বোঝা যায় যে, ল্যাম্প-ব্রাশ ক্রোমোসোমের সূত্রগুলি DNA দিয়েই তৈরি। এই ক্রোমোসোমের দীর্ঘ লুপ (loop) বা ফাঁসগুলির কাছে RNA তৈরি হতে দেখা গিয়েছে এবং এই RNA সাইটোপ্লাজমে যায়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, DNA থেকেই RNA তৈরি হয়।

8. **DNA-র পরিমাণ**—Mirsky ও Allfrey দেখেন যে, কোনও একটা প্রজাতির প্রত্যেক ডিপ্লয়েড কোষে একই পরিমাণ DNA থাকে। ওই উদ্ভিদের হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে এর অর্ধেক পরিমাণ এবং টেট্রাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে এর দ্বিগুণ পরিমাণ

DNA পাওযা যায। সুতবাং, প্রত্যেক ক্রোমোসোম সেটেব (set) জন্য নির্দিষ্ট পবিমাণ DNA থাকে। হ্যাপ্লযেড নিউক্লিযাসেব মোট জিন সংখ্যা ডিপ্লযেড নিউক্লিযাসেব জিন সংখ্যাব অর্ধেক। সুতবাং, DNA ও জিনেব মধ্যে একটা নিকট সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেক নিউক্লিযাসে DNA-ব নির্দিষ্ট পবিমাণ থেকে বোঝা যায যে, এই অণুগুলি বাসাযনিকভাবে অত্যন্ত স্থাযী।

9 DNA-ব বেসেব গঠন— E Chargaff (1943-53) DNA-ব বেস সম্বন্ধে গবেষণা কবেন। তিনি দেখেন যে, এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে DNA ব বেসেব উপাদানেব পার্থক্য থাকে। একই প্রজাতিব বিভিন্ন টিস্যুব DNA-ব বেসেব উপাদান একই বকম হয। DNA-তে অ্যাডিনিনেব পবিমাণ থাইমিনেব সমান এবং গুযানিনেব পবিমাণ সাইটোসিনেব সমান। সুতবাং, A + G = C + T এবং পিউবিন বেসেব ও পিবিমিডিন বেসেব পবিমাণ সমান হয। নিকট সম্পর্কীয প্রজাতিব DNA-ব বেসেব উপাদানে সামঞ্জস্য লক্ষ্য কবা হযেছে। দূব সম্পর্কীয প্রজাতিব মধ্যে বেসেব উপাদানেব যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। এইসব বিভিন্ন তথ্য থেকে বোঝা যায যে, DNA-ই হ'ল জেনেটিব পদার্থ।

10 1953 খ্রিস্টাব্দে J D Watson F H C Crick ও M H F Wilkins এব বর্ণিত DNA ব গঠন থেকে জিনেব স্বজনন, মিউটেশন ইত্যাদি সহজে ব্যাখ্যা কবা যায। DNA অণুব পলিনিউক্লিওটাইড সূত্রে পিউবিন বা পিবিমিডিন বেসেব ক্রম যে কোনওভাবে থাকতে পাবে। যেমন, থাইমিনেব পব অ্যাডিনিন কিংবা গুযানিন অথবা সাইটোসিন কিংবা থাইমিন থাকতে পাবে। একটা পলিনিউক্লিওটাইড সূত্রে অসংখ্য নিউক্লিওটাইড থাকে বলে বেসেব বিভিন্ন বকমেব বিন্যাস সম্ভব। বেসেব এই অসংখ্য বকমেব বিন্যাসেব জন্য DNA-এ অণুতে বিভিন্নতা (variation) দেখা যায।

DNA স্বজনন কবতে পাবে অর্থাৎ, একটা DNA থেকে একই গঠনেব DNA তৈবি হযে থাকে।

কখনও কখনও DNA-ব ছাঁচ থেকে পবিপূবক নিউক্লিওটাইড গঠনেব সময ভ্রান্ত প্রতিলিপি (mis-copy) হয। যেমন— অ্যাডিনিন থাইমিনেব সাথে যুক্ত না হযে অন্য পিবিমিডিন বেস সাইটোসিনেব সাথে যুক্ত হতে পাবে। বেসেব এই পবিবর্তনেব ফলে মিউটেশন হয। কোনও বেস জোডা দ্বিগুণ হ'লে বা বাতিল হযে গেলেও মিউটেশন দেখা দেয।

Crick-এব মতে বেসেব সঠিক বিন্যাস একটা জিনীয সঙ্কেত বা জেনেটিক কোড (genetic code) গঠন কবে। এই সঙ্কেতেব মাধ্যমে জিনীয বার্তা সাইটোপ্লাজমে আসে ও কোষস্থ বিভিন্ন প্রক্রিযাকে নিযন্ত্রণ কবে।

প্রোটিন উৎপাদন একটি জিন নিযন্ত্রিত প্রক্রিযা। বিভিন্ন পবীক্ষা থেকে জানা গিযেছে যে, DNA প্রোটিনেব বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডেব ক্রম নিযন্ত্রণ কবে। RNA DNA-ব থেকে তৈবি হয। DNA ব প্রোটিন উৎপাদনেব সঙ্কেত mRNA

সাইটোপ্লাজমে নিয়ে আসে ও প্রোটিন উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

এই সব বিভিন্ন তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, DNA-ই হ'ল জেনেটিক পদার্থ এবং এটাই কোষের সব কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

জেনেটিক পদার্থ হিসাবে RNA

কোনও কোনও ভাইরাসের জেনেটিক পদার্থ হল RNA। F. Fraenkel-Conrat ও Stanley ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তামাকের মোজাইক ভাইরাস (TMV) নিয়ে গবেষণা করেন। এই ভাইরাসে এবং অধিকাংশ উদ্ভিদ ভাইরাসে কেবল RNA ও প্রোটিন থাকে। TMV ভাইরাসে 6% RNA থাকে।

তামাক পাতা থেকে TMV ভাইরাস সংগ্রহ করা হয়। এদের প্রোটিন ও RNA আলাদা করা হয়। কেবল এই RNA রোগ সৃষ্টি করতে পারে। প্রোটিনের রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং, RNA-ই এখানে জেনেটিক পদার্থ হিসাবে থাকে। যদি এই RNA ও প্রোটিন মেশানো হয়, তাহলেও TMV ভাইরাস উৎপন্ন হয়, যা তামাক পাতায় রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

একটি ভাইরাসেব RNA-র সাথে অন্য ভাইরাসের প্রোটিনের সংযোগ ঘটান সম্ভব হয়েছে।

তামাকের মোজাইক ভাইরাস (TMV) ও Holmes ribgrass ভাইরাস (HRV) থেকে সংকর ভাইরাস গঠন করা হয়েছে। TMV-র প্রভাবে পাতায় বর্ণ বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং HRV ভাইরাসের প্রভাবে পাতায় সুস্পষ্ট বলয় (ring) দেখা যায়। HRV ভাইরাস উদ্ভিদ *Plantago lanceolata* থেকে আলাদা করে হয়েছে। সেজন্য এই ভাইরাসকে *Plantago* স্ট্রেইন বলা হয়।

সংকর ভাইরাস যখন পাতায় রোগ সৃষ্টি করে, তখন ওই সংকর ভাইরাসের RNA-র প্রকৃতির (TMV অথবা HRV) ওপর পাতায় কীরকম দাগ দেখা যাবে তা নির্ভর করে। সংকর ভাইরাস থেকে উৎপন্ন ভাইরাস সংকর ভাইরাসের RNA যে ভাইরাস থেকে এসেছে তার মত হয়।

Fraenkel-Conrat-এর এসব পরীক্ষা প্রমাণ করে যে, এসব ভাইরাসে RNA-ই হল জেনেটিক পদার্থ।

কেন্দ্রীয় মতবাদ (central dogma)

DNA, RNA এবং প্রোটিনের কার্যকরী সম্পর্ক এই মতবাদের অন্তর্ভুক্ত। আণবিক জিনতত্ত্বের কেন্দ্রীয় মতবাদ বা Central dogma থেকে জেনেটিক তথ্য কীভাবে স্থানান্তরিত হচ্ছে তা জানা যায়। এর বিভিন্ন পর্যায়গুলি হল—

A) DNA থেকে DNA-র উৎপাদন বা রেপ্লিকেশন,

b) DNA-র ছাঁচ থেকে বিভিন্ন রকম RNA-র ট্র্যান্সক্রিপশন হয়।

c) RNA দ্বারা বাহিত DNA-র জেনেটিক তথ্য প্রোটিন উৎপাদনের মাধ্যমে অনুদিত

(translation) হয়। প্রোটিন কোনও বৈশিষ্ট্যের ফেনোটাইপে প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে।

সুতরাং, DNA থেকে RNA-তে এবং RNA থেকে প্রোটিনে জেনেটিক তথ্যের স্থানান্তরণের দু'টি প্রক্রিয়া হল ট্র্যান্সক্রিপসন (transcription) এবং ট্র্যান্সলেশন (translation)।

$$\text{DNA} \xrightarrow{\text{ট্র্যান্সক্রিপশন}} \text{mRNA} \xrightarrow{\text{ট্র্যান্সলেশন}} \text{প্রোটিন}$$

a) **রেপ্লিকেশন (replication)** — DNA-র স্বজননের ফলে জিনের স্থায়িত্ব (perpetuation) বজায় থাকে। এই প্রক্রিয়ায় DNA নির্ভরশীল DNA পলিমারেজ উৎসেচকের প্রয়োজন।

DNA-র যে অংশটি দ্বিগুণ হয় (replication), সেই অংশকে রেপ্লিকন (replicon) বলে। DNA-র রেপ্লিকনের একটি উৎপত্তি স্থল (origin) ও একটি শেষ নির্দেশক অঞ্চল (terminus) থাকে। DNA দ্বিগুণ হওয়ার আগে এর পেঁচ খুলে যায়। যে অঞ্চল থেকে DNA দ্বিগুণ হতে আরম্ভ করে, সেটিকে 'replication fork' (পুনঃকরণ সন্ধিস্থল) বলে। উৎপত্তি স্থলে একটি বা দু'টি পুনঃকরণ সন্ধিস্থল থাকতে পারে।

যদি একটি রেপ্লিকেশন ফর্ক থাকে, তবে DNA এক দিকে দ্বিগুণ হয়। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া একদিশ বা unidirectional। যদি দু'টি replication fork থাকে, তবে DNA দু'টি বিপরীত দিকে দ্বিগুণ হতে পারে। অর্থাৎ, এই প্রক্রিয়া দুই দিকে হয় (দ্বিদিশ বা bidirectional)।

DNA দ্বিগুণ হতে আরম্ভ হ'লে এটি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে DNA-র বিশেষ বিশেষ অঞ্চল দ্বিগুণ হয়।

DNA এবং জেনেটিক RNA স্বজননে সক্ষম। DNA আংশিক রক্ষণশীল (semi-conservative) প্রক্রিয়ায় দ্বিগুণ হয়।

b) **ট্র্যান্সক্রিপশন (transcription)**

ইউক্যারিওটে DNA নিউক্লিয়াসে থাকে এবং প্রোটিন সাইটোপ্লাজমে উৎপন্ন হয়। সেজন্য DNA সরাসরি প্রোটিন উৎপাদনে অংশ নেয় না। DNA থেকে প্রথমে বিভিন্ন রকম RNA উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াকে ট্র্যান্সক্রিপশন বলে।

DNA-র যে সূত্রটি RNA উৎপাদনের সময় ছাঁচ হিসাবে কাজ করে, সেটিকে 'sense strand' বলে। কোনও একটি সময়ে একটি সূত্রের কেবল একটি জিনের ট্র্যান্সক্রিপশন হয় ও mRNA উৎপন্ন হয়। এই DNA-র ছাঁচ থেকে উৎপন্ন mRNA জেনেটিক তথ্য নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে নিয়ে আসে।

ট্র্যান্সক্রিপশনের জন্য DNA নির্ভরশীল RNA পলিমারেজের উপস্থিতির প্রয়োজন। ব্যাকটিরিয়ায় কেবল এক রকমের পলিমারেজ ট্র্যান্সক্রিপশনের জন্য প্রয়োজন। ইউক্যারিওটে তিন রকমের পলিমারেজ রয়েছে। এগুলি হল—পলিমারেজ I, পলিমারেজ II এবং পলিমারেজ III।

পলিমারেজ I rRNA-র উৎপাদনে সহায়তা করে।

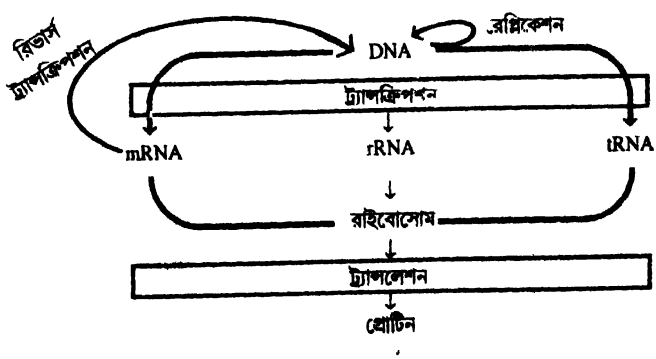
RNA পলিমারেজ II নিউক্লিওজোমে থাকে এবং এটি হেটারোজেনাস নিউক্লিও RNA (HnRNA) গঠনে সহায়তা করে। এর থেকে mRNA উৎপন্ন হয়।

RNA পলিমারেজ III নিউক্লিওজোমে থাকে এবং tRNA ও 5SrRNA-র সংশ্লেষে সহায়তা করে।

প্রোমোটার অঞ্চল বা ট্র্যান্সক্রিপশন প্রারম্ভকারী অঞ্চলে (transcription initiation site) সিগমা ফ্যাক্টরের উপস্থিতিতেই কেবল ট্র্যান্সক্রিপশন আরম্ভ হতে পারে। ট্র্যান্সক্রিপশন শুরু হয়ে গেলে সিগমা ফ্যাক্টর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 'কোর' (core) উৎসেচক সূত্রের দীর্ঘ হওয়ায় সহায়তা করে। মুক্ত সিগমা ফ্যাক্টর 'কোর' উৎসেচকের সাথে যুক্ত হয়ে RNA পলিমারেজ গঠন করে। mRNA শেষ হয় DNA-তে উপস্থিত শেষ নির্দেশক সঙ্কেতের দ্বারা।

c) **ট্র্যান্সলেশন (translation)** :

ট্র্যান্সলেশনে mRNA-র নিউক্লিক অ্যাসিডের ভাষা প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের ভাষায় অনুদিত হয়। এই প্রক্রিয়া রাইবোসোম অঞ্চলে হয় এবং এজন্য তিন রকমের RNA-রই প্রয়োজন হয়। রাইবোসোমে rRNA থাকে। mRNA DNA-র থেকে প্রোটিন উৎপাদনের বার্তা বহন করে রাইবোসোমে নিয়ে আসে। mRNA রাইবোসোমের সাথে যুক্ত হয়। mRNA-র নির্দেশ অনুসারে tRNA নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডকে রাইবোসোম অঞ্চলে নিয়ে আসে। এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পরপর যুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড শৃঙ্খল গঠন করে। এভাবে নির্দিষ্ট প্রোটিন উৎপন্ন হয়। mRNAর 3' প্রান্তে পলি A থাকে। 5' প্রান্তে 7-মিথাইল গুয়ানোসিন থাকে। পলি A প্রান্তকে tail বা পুচ্ছ বলে এবং 5' প্রান্তকে Cap বা 'টুপি' বলে। পলি A প্রান্তটি (tail) mRNA-র স্থায়িত্ব বজায় রাখে। 5' প্রান্তের (m^7g) 7-মিথাইল গুয়ানোসিন বাদ দিলে ট্র্যান্সলেশন বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এই অঞ্চল ট্র্যান্সলেশনের জন্য প্রয়োজনীয়।



কোষে DNA, RNA ও প্রোটিনে জেনেটিক তথ্য পরিবহনের চিত্র

দশম অধ্যায়

মিউটেশন

আকস্মিক বংশগত পরিবর্তনকে মিউটেশন (mutation) বলা হয়। এই রকম পরিবর্তনের ফলে কোনও জীবে নতুন চরিত্র দেখা দিতে পারে এবং এইভাবে মিউটেশনযুক্ত জীবের সৃষ্টি হয়। মিউটেশন বংশগত, সেজন্য মিউটেশনযুক্ত জীব থেকে সৃষ্ট অপত্য জীবেও মিউটেশন থাকে। তবে দেহ কোষের মিউটেশন কেবল অঙ্গজ জননের মাধ্যমে স্থাযী হতে পাবে। প্রকৃতিতে মিউটেশন সব সময়েই হচ্ছে, কিন্তু কেবল অল্প সংখ্যক মিউটেশন যথেষ্ট পবিবর্তন সৃষ্টি করে এবং এরকম মিউটেশন বোঝা যায়। যেহেতু বংশগত চবিত্র জিন দিয়ে নিযন্ত্রিত হয, সেজন্য জিনের আচরণের কোনও পরিবর্তন হলে মিউটেশন দেখা দেয়।

1901 খ্রিস্টাব্দে de Vries *Oenothera lamarckiana*-এ মিউটেশন আবিষ্কার করেন। de Vries আমস্টারডামের একটি পবিত্যক্ত আলুব ক্ষেতে স্বাভাবিক থেকে আলাদা ধরনেব কতকগুলি *Oenothera* উদ্ভিদ দেখতে পান। তিনি এগুলি নিয়ে এসে নিজের বাগানে লাগান এবং এব থেকে সাত রকমেব বিশুদ্ধ (pure) ধবনেব উদ্ভিদ পান। তিনি এইসব উদ্ভিদগুলিকে প্রজাতির মর্যাদা দিযেছিলেন।

তিনি *O lamarckiana*-এ বিভিন্ন বকমেব মিউটেশন পেয়েছিলেন। একটা মিউটেশনের ফলে গাছটা খুব বড় হযেছিল। তিনি এই গাছকে *O gigas* নাম দিযেছিলেন। আরেকটা মিউটেশনের জন্য খর্বাকৃতিব *O nanella*-র সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অন্যান্য ধরনেব মিউটেশনের জন্য *O lamarckiana*-র বিভিন্ন অঙ্গের আকাব, আয়তন কিম্বা বর্ণের তারতম্য হয়। পবে জানা গিযেছে যে, de Vries-এর বর্ণিত *Oenothera*-র মিউটেশনগুলি বিভিন্ন ধবনেব পরিবর্তনের জন্য হয়েছিল। মিউটেশন সম্বন্ধীয় গবেষণা 1910 খ্রিস্টাব্দে Morgan-এব ড্রসোফিলা নিয়ে পরীক্ষার পর থেকে প্রাধান্য পায। Morgan *D. melanogaster*-এ লাল চোখবিশিষ্ট (W) পুরুষ ড্রসোফিলার মধ্যে কতকগুলি সাদা চোখযুক্ত পুরুষ ড্রসোফিলা পান। চোখের রঙের নিয়ন্ত্রক এই জিন X-ক্রোমোসোমে থাকে। সাদা চোখ একটি বিসেসিভ মিউটেশনের (w) জন্য হয়। এজন্য পুরুষে (XY) সহজেই এই মিউটেশন প্রকাশ পায়। সাদা চোখযুক্ত পুরুষ (w) ড্রসোফিলার সাথে ঐ বংশেরই লাল চোখযুক্ত স্ত্রী ড্রসোফিলার (W) ক্রস করলে, কিছু সাদা চোখযুক্ত স্ত্রী ড্রসোফিলার সৃষ্টি হয়। এই ক্রসের ফলে সৃষ্ট স্ত্রী ও পুরুষ ড্রসোফিলায় সাদা বা লাল চোখ থাকে।

Morgan ও তাঁর সহকর্মীদের এই গবেষণার পরে ড্রসোফিল্যার মিউটেশন সংক্রান্ত অনেক গবেষণা হয়েছে। ড্রসোফিলায় প্রায় 500টি বিভিন্ন রকম মিউটেশন পাওয়া গেছে। এছাড়া বিভিন্ন উদ্ভিদ যেমন ভুট্টা, মটর, *Antirrhimum* ইত্যাদি এবং অনেক প্রাণী যেমন মুরগী, ইঁদুর ইত্যাদিতে এবং মানুষেও মিউটেশন লক্ষ্য করা হয়েছে। গত পঁচিশ বছরে প্রধানত নিম্নশ্রেণীর জীবে যেমন, ছত্রাক *Neurospora*, ব্যাকটিরিয়া *Escherichia coli* এবং ভাইরাসের (ব্যাকটিরিয়ফাজ) মিউটেশন সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয়েছে।

মিউটেশন ছোট বা বড় সব রকমেরই হয়। কখনও কখনও বড় মিউটেশনের জন্য মাতা পিতার থেকে অপত্য উদ্ভিদের চরিত্রের অনেক তফাৎ দেখা যায়, আবার কখনও বা মিউটেশনটা এত ছোট হয় যে, তা সহজে চোখেই পড়ে না।

কখনও কখনও মিউটেশনের ফলে অঙ্গসংস্থানিক পরিবর্তন (*morphological*) হয় না, কিন্তু পুষ্টিসংক্রান্ত (nutritional) পরিবর্তন দেখা দেয়, যেমন, *Neurospora*-এ। কোনও কোনও মিউটেশনের জন্য এদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তার পরিবর্তন হয়। আবার কোনও কোনও জীবাণুতে মিউটেশনের ফলে সংক্রমণ ক্ষমতা (virulence) দেখা দেয়, কিম্বা লোপ পায়। মিউটেশনের ফলে যে কোনও চরিত্রের পরিবর্তন হতে পারে। বেশিরভাগ মিউটেশনই ক্ষতিকর, তবে কখনও কখনও মিউটেশনের ফলে অনুকূল চরিত্রেরও সৃষ্টি হয়। ক্ষতিকর মিউটেশনযুক্ত জীব স্বাভাবিক জীবের সাথে প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য হয়ে বাতিল হয়ে যায়। সাধারণত মিউটেশনের ফলে কোনও জীবের প্রাণশক্তি কমে যায়। Gustafson-এর মতে, প্রতি হাজার মিউটেশনের মধ্যে একের চেয়ে কম সংখ্যক মিউটেশন উৎকৃষ্ট ধরনের হয়, যা উদ্ভিদ প্রজন্মে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়।

মিউটেশনকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(1) **জিন মিউটেশন** বা ইনট্রাজেনিক (intragenic) মিউটেশন জিনের প্রকৃতির গঠনগত বা রাসায়নিক পরিবর্তন হলে তাকে জিন মিউটেশন (gene mutation) বলে। জিন মিউটেশনের ফলে ক্রোমোসোমের কেবল একটি নির্দিষ্ট স্থানে পরিবর্তন হয় বলে এই রকম মিউটেশনকে পয়েন্ট (point) মিউটেশনও বলা হয়।

জীবের বৃদ্ধির সময় প্রত্যেক জিন অসংখ্যবার বিভাজিত হয়। সাধারণত এইসব বিভাজন যথাযথভাবে হওয়ার ফলে অপত্য জিন মাতৃ জিনের অনুরূপ হয়। কিন্তু আকস্মিকভাবে কোনও বিভাজনের সময় গোলযোগ দেখা দিলে পরিবর্তিত জিনের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ, জিন মিউটেশন হয়।

(2) **ক্রোমোসোমীয় মিউটেশন** বা ইন্টারজেনিক (intergenic) মিউটেশন — এই রকম মিউটেশনের ফলে জিনের প্রকৃতির কোনও পরিবর্তন হয় না। কেবল জিনের পুনর্বিন্যাস হয় বা কোনও জিনের সংযোজন বা অবলুপ্তি ঘটে।

ক্রোমোসোমীয় মিউটেশন দুই রকমের হয়, যেমন —

(a) ক্রোমোসোমের সংখ্যায় পরিবর্তন।

(b) ক্রোমোসোমের বিভিন্ন অংশের বিন্যাসের পরিবর্তন। ক্রোমোসোমীয় মিউটেশন সম্বন্ধে পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে জিন মিউটেশন আলোচিত হল।

জিন মিউটেশন

ক্রোমোসোমীয় মিউটেশনের ফলে জিনের সংখ্যার কিম্বা অবস্থানের পরিবর্তন হয়, কিন্তু জিনের প্রকৃতির কোনও পরিবর্তন হয় না। সুতরাং, নতুন ধরনের জিন কেবল জিন মিউটেশনের মাধ্যমেই গঠিত হয় এবং ক্রমবিকাশে এই মিউটেশনের গুরুত্ব অপরিসীম।

মিউটেশন বলতে এখন প্রধানত জিন মিউটেশনকেই বোঝায়। এই রকম মিউটেশনের ফলে জিনের রাসায়নিক গঠনে পরিবর্তন দেখা যায়। জিন মিউটেশনের সবচেয়ে প্রথম জানা ঘটনা হল 1791 খ্রিস্টাব্দে Seth Wright-এর ছোট পা বিশিষ্ট ভেড়া। তবে এই সময় জেনেটিক্সের সূচনা হয়নি এবং মিউটেশন সম্বন্ধেও জানা ছিল না। Seth Wright তাঁর খামারে একটি অস্বাভাবিক ছোট পা বিশিষ্ট (Ancon ধরনের) ভেড়া পান এবং পরে এর থেকে প্রজনন ও নির্বাচন করে এমন কতকগুলি ভেড়া পান, যাদের পা ছোট। এই চরিত্র একটি প্রচ্ছন্ন জিনের জন্য হয় এবং ছোট পা বিশিষ্ট ভেড়া হল, হোমোজাইগাস রিসেসিভ।

অনেক সময় জিন মিউটেশনের সাথে ক্রোমোসোমের আকৃতির ছোট পরিবর্তনের (যেমন, ডিফিসিয়েন্সি) পার্থক্য করা যায় না। তবে ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসোমের আকৃতির ছোট পরিবর্তনও সহজে বোঝা যায়। অন্যান্য জীবে ছোট ডিফিসিয়েন্সি বা ঘাটতি এবং জিন মিউটেশনের মধ্যে পার্থক্য বোঝার একমাত্র পদ্ধতি হল যে, ডিফিসিয়েন্সি হলে তা কখনও আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে না, কিন্তু জিন মিউটেশন কোনও কোনও ক্ষেত্রে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারে।

মিউটেশনের হার— মিউটেশনের হার নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। কোনও কোনও মিউটেশনের ফলে এত কম পরিবর্তন হয় যে, তা সহজে চোখে পড়ে না। সম্ভবত এই রকম ছোট মিউটেশন সবচেয়ে বেশি হারে হয়। বিভিন্ন জীবে এবং একই জীবের ভিন্ন ভিন্ন জিনে মিউটেশনের হারের তারতম্য হয়। মিউটেশনের হার নির্দিষ্ট প্রজাতি, জেনেটিক গঠন, জিনের প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। L. J. Stadler 1943 খ্রিস্টাব্দে দেখেন যে, ভুট্টার সস্যের চরিত্রের নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন জিনের মিউটেশনের হারের তারতম্য হয়। কোনও কোনও জিনে অন্য জিনের তুলনায় বেশি হারে মিউটেশন হয়। যেসব জিনে খুব সহজেই মিউটেশন হয়, তাদের মিউটেশনপ্রবণ (mutable) জিন বলে। Emerson (1914) দেখেন যে, ভুট্টায় সাদা বীজত্বকের নিয়ন্ত্রণকারী রিসেসিভ (প্রচ্ছন্ন) জিনে সহজেই মিউটেশন হওয়ায় ঐ জিন ডমিন্যান্ট (প্রবল) জিন লালে পরিবর্তিত হয়। এই রকম মিউটেশনের জন্য সাদা বীজত্বকের মধ্যে লাল দাগের সৃষ্টি হয়।

Delphinium-এ এরকম মিউটেশনপ্রবণ জিনের প্রভাবে গোলাপী ফুলের মধ্যে purple (লালচে বেগুনী) ছিট দেখা দেয়। রিসেসিভ জিন গোলাপী 'a' হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকার জন্য, গোলাপী রঙের ফুলের সৃষ্টি হয়। মিউটেশনের ফলে এটি ডমিন্যান্ট জিনে পরিবর্তিত হলে পারপেল রঙের সৃষ্টি হয়। ফুলের পরিণতির সময় যত আগে এই মিউটেশন হয়, ততই পারপেল (purple) দাগগুলি বড় দেখায়। জনন কোষেও এই গোলাপী 'a' জিনের মিউটেশন দেখা দিয়েছে। *Mirabilis*- এও এই ধরনের মিউটেশনপ্রবণ জিনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা হয়েছে। *Mirabilis*-এ মিউটেশনপ্রবণ জিনের প্রভাবে সাদা ফুলে লাল দাগ দেখা যায়।

মিউটেশনপ্রবণ জিন কখনও কখনও দ্বিতীয় মিউটেশনের ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এই রকমের মিউটেশনকে **পূর্বানুবৃত্তিসম্পন্ন** (reverse) মিউটেশন কিম্বা ফিরতি (back) মিউটেশন বলা হয়। *Drosophila*, ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদিতে রিভার্স মিউটেশন দেখা গিয়েছে। স্বাভাবিক ব্যাকটিরিয়া স্ট্রেপটোমাইসিনের সরবরাহ ছাড়াই বাড়তে পারে। একটা মিউটেশনের ফলে কোনও ব্যাকটিরিয়া স্ট্রেপটোমাইসিনবিহীন মাধ্যমে বাড়তে পারে না। কখনও কখনও ফিরতি মিউটেশনের ফলে স্ট্রেপটোমাইসিন নির্ভরশীল ব্যাকটিরিয়া স্ট্রেপটোমাইসিনবিহীন মাধ্যমে বাড়তে পারে অর্থাৎ তারা স্বাভাবিক ব্যাকটিরিয়ায় পরিবর্তিত হয়।

বিভিন্ন জীবে জিনোম প্রতি মিউটেশনের হারের যথেষ্ট তারতম্য হয়। Dobzhansky-র মতে, *Drosophila*-এ প্রতি বংশে জিন মিউটেশনের হার হল 10^{-5}। ছত্রাক *Neurospora*-এ মিউটেশনের হার হল 3×10^{-8} থেকে 8×10^{-8}। মানুষে হোমোফিলিয়ার জন্য দায়ী মিউটেশনযুক্ত জিন প্রতি প্রজন্মে 10^{-5} থেকে 5×10^{-6} হারে দেখা দেয়। বিভিন্ন জিনের মিউটেশনের হার পরিবেশ দিয়ে প্রভাবিত হয়। বেশি তাপমাত্রায় ক্ষতিকর মিউটেশনের সংখ্যা বাড়ে। রঞ্জনরশ্মি (X-ray), অতি বেগুনী রশ্মি (ultra-violet ray) কিম্বা রেডিয়াম ইত্যাদি বিকিরণের প্রভাবে মিউটেশনের হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় একটা জিনের মিউটেশন প্রবণতা অন্য জিন দিয়ে প্রভাবিত হয়। ভুট্টায় জিন *Dt*-র (*dotted*) প্রভাবে জিন a_1 (সবুজ উদ্ভিদ) সহজেই জিন A_1-এ (পারপেল উদ্ভিদ) পরিবর্তিত হয়। অন্যান্য উদ্ভিদে এবং *Drosphila melanogaster*-এও একটি জিন অন্য জিনের মিউটেশন প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। বেশিরভাগ জিন মিউটেশনই রিসেসিভ বা প্রচ্ছন্ন হয়। এজন্য হোমোজাইগাস অবস্থায় না থাকলে এই রকম মিউটেশন অপ্রকাশিত থেকে যায়। তবে সেক্স ক্রোমোসোমে রিসেসিভ মিউটেশন হলে, তা অসমগ্যামীয় (অর্থাৎ heterogametic) (যেমন XY বা ZW) সদস্যে প্রকাশ পায়। অটোসোমে রিসেসিভ মিউটেশন হলে, তা দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের আগে প্রকাশিত হয় না।

উদ্ভিদ বা প্রাণীর জীবন চক্রের যে কোনও অবস্থায় মিউটেশন হতে পারে। রেণুধর উদ্ভিদে (sporophyte) বা লিঙ্গধর উদ্ভিদে (gametophyte), দেহ কোষে কিম্বা জনন

কোষে মিউটেশন দেখা যায়। মিউটেশন জীবন চক্রের যে কোনও অবস্থায় হতে পারে। (a) যদি মিউটেশন গ্যামেটগুলি পরিণত হওয়ার আগে হয়, তাহলে অনেকগুলি গ্যামেট মিউটেশন যুক্ত হবে। এসব গ্যামেট থেকে উৎপন্ন জীবগুলিতে মিউটেশন দেখা দেবে। (b) যদি কেবল একটি গ্যামেট কিম্বা জাইগোটে মিউটেশন হয় তাহলে কেবল একটি জীবে মিউটেশন দেখা দিতে পারে। (c) যদি মিউটেশন জাইগোটের বিভাজনের পর কোনও কোষে হয়, তাহলে দেহের একটি অংশে কেবল মিউটেশন দেখা দেবে (সোমাটিক মিউটেশন)। দেহ কোষে মিউটেশন হলে তাকে সোমাটিক মিউটেশন (somatic mutation) বলে। সোমাটিক মিউটেশন সাধারণত ঐ জীবের মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। তবে কিছু উদ্ভিদে এই রকম মিউটেশন অঙ্গজ জননের মাধ্যমে স্থায়ী করা সম্ভব হয়েছে। কমলা লেবু, পীচ ইত্যাদিতে এভাবে সোমাটিক মিউটেশন রক্ষা করা হয়েছে। মুকুলের ভাজক কলায় (meristematic tissue) মিউটেশন হলে, ঐ মিউটেশনকে মুকুল মিউটেশন (bud mutation)বলে।

মিউটেশনের উৎপত্তি— মিউটেশন স্বাভাবিক (স্বতোজাত) কিম্বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি হতে পারে। কৃত্রিম বা স্বাভাবিকভাবে ক্ষতিকর কিম্বা অনুকূল দুই রকমের মিউটেশনই তৈরি হয়। তবে কৃত্রিম উপায়ে অনেক বেশি সংখ্যায় মিউটেশন দেখা দেয়।

প্রাকৃতিক গামা (γ) ও কসমিক রশ্মির প্রভাবে কেবল অল্প পরিমাণ (0.1 শতাংশ) মিউটেশন হয়। কৃত্রিম উপায়ে রঞ্জনরশ্মি, অতি বেগুনী রশ্মি প্রয়োগ করে, তাপমাত্রার পরিবর্তন করে, বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক বস্তু যেমন, মাস্টারড গ্যাস, প্যারক্সাইড ইত্যাদি প্রয়োগ করে মিউটেশনের সৃষ্টি করা হয়।

H.J. Muller 1927 খ্রিস্টাব্দে *Drosophila*-এ এক্স-রে বা রঞ্জন রশ্মির প্রয়োগ করে প্রথম কৃত্রিম মিউটেশনের সৃষ্টি করেছিলেন। L.J. Stadler (1928) *Avena* রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করে মিউটেশন পেয়েছিলেন। এর পর বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীতে রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে কৃত্রিম মিউটেশনের সৃষ্টি করা হয়েছে। বিভিন্নভাবে রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করা হয়। উদ্ভিদের বীজে, অঙ্কুরিত বীজে, মুকুলে, পরাগ রেণুতে বিকিরণ দেওয়া হয়। প্রাণীতে শুক্রাণু, ডিম্বাণুতে এবং কখনও কখনও দেহ কোষেও বিকিরণ দেওয়া হয়ে থাকে। রঞ্জন রশ্মির মাত্রার ওপর মিউটেশনের হার নির্ভর করে। রঞ্জন এককের (বা r-একক) মাধ্যমে রঞ্জন রশ্মির পরিমাপ করা হয়। বিকিরণের শক্তি কম বেশি করে বা প্রয়োগের সময়ের তারতম্য ঘটিয়ে r-এককের পরিবর্তন করা যায়। Müller দেখেন যে, রঞ্জন রশ্মির মাত্রা যত বাড়ান যায়, ততই মিউটেশনের হার বাড়ে। বিকিরণের ফলে বিভিন্ন রকমের মিউটেশনের সৃষ্টি হয়। কিছু মিউটেশন প্রাণ- নাশক (lethal) হয় অর্থাৎ, এর প্রভাবে ঐ জীবটা বেঁচে থাকতে পারে না। অন্যান্য মিউটেশনের ফলে কোনও চরিত্রে পরিবর্তন দেখা যায়। প্রাণনাশক মিউটেশনের ফলে কোনও চরিত্রের পরিবর্তন দেখা যায়। প্রাণনাশক মিউটেশনের সাহায্যে মিউটেশনের হার সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। প্রাণনাশক মিউটেশনের হারের ওপর রঞ্জন রশ্মি

মাত্রার প্রভাব সরাসরিভাবে আনুপাতিক। রঞ্জন রশ্মির প্রভাবে বেশ কিছু ক্রোমোসোমীয় মিউটেশনের (ডিফিসিয়েন্সি, ডুপ্লিকেশন, ট্র্যান্সলোকেশন ও ইনভারশন) সৃষ্টি হয়। এই রকমের ক্রোমোসোমীয় অস্বাভাবিকতায় সাধারণত ক্রোমোসোমের দু'টি স্থানে ভেঙে যায়। এজন্য ক্রোমোসোমীয় মিউটেশনের শতকরা হার রঞ্জন রশ্মির মাত্রার বর্গের (square) সাথে আনুপাতিক। জিন মিউটেশনের ফলে কেবল একটি স্থানে পরিবর্তন হয় বলে এরকম মিউটেশনের হার রঞ্জন রশ্মির মাত্রার সাথে সরাসরি আনুপাতিক হয়। রঞ্জন রশ্মি ছাড়া অন্যান্য ধরনের বিকিরণ প্রয়োগ করেও মিউটেশনের সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। রেডিয়াম থেকে আলফা (α), বিটা (β) ও গামা রশ্মি (γ) বিকীর্ণ হয়। আলফা ও বিটা রশ্মিকে রূপার চাদর সম্পূর্ণভাবে বাঁধা দেয়। সেজন্য রেডিয়াম কোনও রৌপ্য পাত্রে রাখলে কেবল গামা রশ্মি ঐ পাত্রের বাইরে আসতে পারে। গামা রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রঞ্জন রশ্মির চেয়ে কিছু কম। Blakeslee ও Gager গামা রশ্মি প্রয়োগ করে জিন মিউটেশন ও ক্রোমোসোমীয় মিউটেশন পেয়েছিলেন।

আলফা রশ্মি ও নিউট্রনের বিকিরণের প্রভাবেও মিউটশনের সৃষ্টি হয়। নিউট্রনের প্রভাবে পুরুষ *Habrobracon*-এ ডমিন্যান্ট প্রাণনাশক (lethal) মিউটেশন পাওয়া গিয়েছে।

এছাড়া অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবেও মিউটেশনের সৃষ্টি হয়। অতি বেগুনী রশ্মির ভেদ্যতা খুব কম হওয়ার এরা বেশিরভাগ জীব দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য খুব ছোট জীবাণুতে এবং পরাগরেণুতে এই রশ্মি সহজেই প্রবেশ করে ও এর প্রভাবে যথেষ্ট সংখ্যক মিউটেশনের সৃষ্টি হয়। অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে সাধারণত জিন মিউটেশনের সৃষ্টি হয়। L.J. Stadlar দেখেন যে, ভুট্টার পরাগরেণুতে 1800Å থেকে 3100Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে মিউটেশনের সৃষ্টি হয়, তবে 2600Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মিই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী।

ব্যাকটিরিয়ায় পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, অনেক সময় অতি বেগুনী রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব আলো রোধ করতে পারে এবং এই প্রক্রিয়াকে আলোক প্রতিক্রিয়া (photoreactivation) বলে। কম মাত্রার অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে মিউটেশনের হার বিকিরণের পরিমাণের আনুপাতিক হারে বাড়ে। অতি বেগুনী রশ্মির পরিমাণ আরো বাড়ালে মিউটেশনের হার ধীরে ধীরে বাড়ে এবং বেশি মাত্রার অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে মিউটেশনের হার কমে যেতে পারে।

বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক বস্তুর প্রভাবেও মিউটেশনের সৃষ্টি হয়। C. Auerbach ও Robson মাস্টারড গ্যাসের [$(ClCH_2CH_2)S$] ব্যবহার করে মিউটেশন পেয়েছিলেন। মাস্টারড গ্যাসের প্রভাবে সব রকমের মিউটেশনই হয়, তবে ক্রোমোসোমের বড় অংশের রদবদল কম দেখা যায়। এই গ্যাসের প্রভাব অনেক সময় দেরীতে প্রকাশ পায়। যদি প্রথম

প্রজন্মে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় প্রজন্মে মিউটেশন দেখা দিতে পারে।

অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ, যেমন— পারক্সাইড, ফরমালডিহাইড, পারমাঙ্গানেট, ক্যাফিন, ইউরেথেন ইত্যাদির প্রভাবেও মিউটেশন হয়। তবে মাস্টারড গ্যাস ও প্যারাক্সাইড হল শক্তিশালী মিউটেশন সৃষ্টিকারী পদার্থ।

সম্প্রতি মিউটেশন সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন জীবে ইথাইল মিথেন সালফোনেটের বহুল ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া মিউটেশন সৃষ্টি কর্ার জন্য আরো অনেক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, যেমন— ইথিলিনঅ্যামিন (EI), ডাইমিথাইল নাইট্রোসোঅ্যামিন (DMN), নাইট্রোসোগুয়ানিডিন (NG), নাইট্রোসোমিথাইল ইউরিয়া (NMU), ইথিলিন অক্সাইড (EO), ডাইইথাইল সালফেট (dES), ইথাইল মিথেন সালফোনেট (EMS), ম্যালিক হাইড্রাজাইড, নাইট্রাস অ্যাসিড, হাইড্রাজিন, হাইড্রোক্সিলঅ্যামিন ইত্যাদি। কোনও কোনও রাসায়নিক পদার্থ জীবের বৃদ্ধি র একটা বিশেষ পর্যায়ে কার্যকরী হয়। কতকগুলি পদার্থ আবার একটা জীবে মিউটেশন সৃষ্টি করে, কিন্তু অন্য জীবে এদের কোনও প্রভাব থাকে না। রাসায়নিক বস্তুর প্রভাবে বিভাজনশীল কোষে অবিভাজনশীল কোষের তুলনায় বেশি হারে মিউটেশন দেখা যায়।

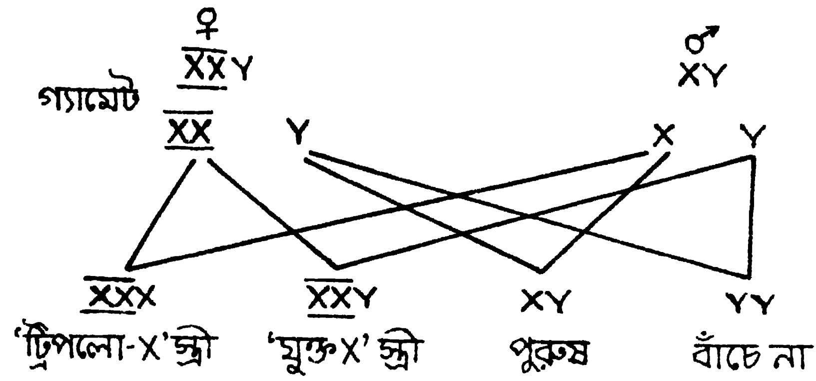
তাপমাত্রার প্রভাবেও মিউটেশনের সৃষ্টি হয়। Müller দেখেন যে, তাপমাত্রা বাড়ালে মিউটেশন হয়। Plough, Child, Ives, তাপমাত্রার পরিবর্তন করে *Drosophila*-এ মিউটেশন পেয়েছিলেন। তাঁরা দেখেন যে, তাপমাত্রা বাড়ালে প্রাণ নাশক (lethal) মিউটেশনের সংখ্যাও বাড়ে। বিভিন্ন অঞ্চলের ড্রসোফিলার ওপর তাপমাত্রার প্রভাবের তারতম্য হয়। তাছাড়া বিভিন্ন ক্রোমোসোমে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় মিউটেশনের হারের পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণত তাপমাত্রা বাড়ালে মিউটেশনের হার বাড়ে, কিন্তু এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। *Portulacca grandiflora*-এ তাপমাত্রা বাড়ালে কোনও কোনও জিনের মিউটেশনের হার কমে যায় (Faberge, Beale)। ভুট্টায়ও কোনও কোনও জিনে তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে মিউটেশনের হার কমে যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, বেশি উত্তাপ বা তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তন হলে মিউটেশনের হার বাড়ে। সেজন্য শীত প্রধান দেশের চেয়ে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অনেক বেশি সংখ্যক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী পাওয়া যায়। প্রায় 80% সরীসৃপের প্রজাতি ও 58% স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রজাতি উষ্ণ অঞ্চলে পাওয়া যায়।

মিউটেশনের উপস্থিতি নির্ণয়— বিভিন্ন উপায়ে মিউটেশনের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। এখানে কতগুলি প্রচলিত পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হল।

1. **যুক্ত-X-পদ্ধতি**— *Drosophila melanogaster*-এর যেসব রিসেসিভ (প্রচ্ছন্ন) মিউটেশনের ফলে ফেনোটাইপ পরিবর্তিত হয়, সেরকম মিউটেশনের উপস্থিতি যুক্ত X পদ্ধতিতে বোঝা যায়। ড্রসোফিলার যুক্ত X-বংশে দু'টি X-ক্রোমোসোম পরস্পর **যুক্ত অবস্থায় থাকে** ও মায়োসিসের সময় একই মেরুতে যায়।

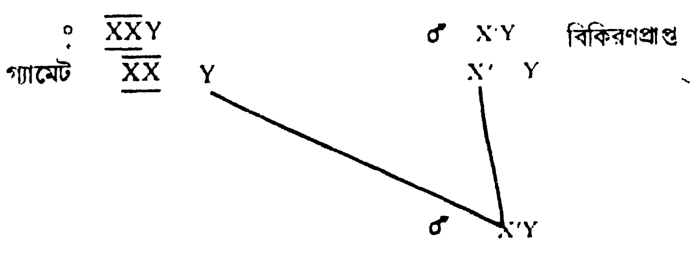
যুক্ত-X স্ত্রী পতঙ্গে XXY ক্রোমোসোম থাকে। এই রকম স্ত্রী পতঙ্গের সাথে স্বাভাবিক পুরুষ পতঙ্গের (XY) মিলনের ফলে চার রকমের পতঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই পতঙ্গগুলি হল— যুক্ত X স্ত্রী (XXY), স্বাভাবিক পুরুষ (XY), ট্রিপলো X স্ত্রী (XXX, super-female) এবং YY। শেষের পতঙ্গটায় কোনও X-ক্রোমোসোম না



চিত্র—109

যুক্ত-X স্ত্রী ড্রসোফিলার সাথে স্বাভাবিক পুরুষ ড্রসোফিলার মিলনের ফলে বিভিন্ন রকম পতঙ্গের সৃষ্টি হয়

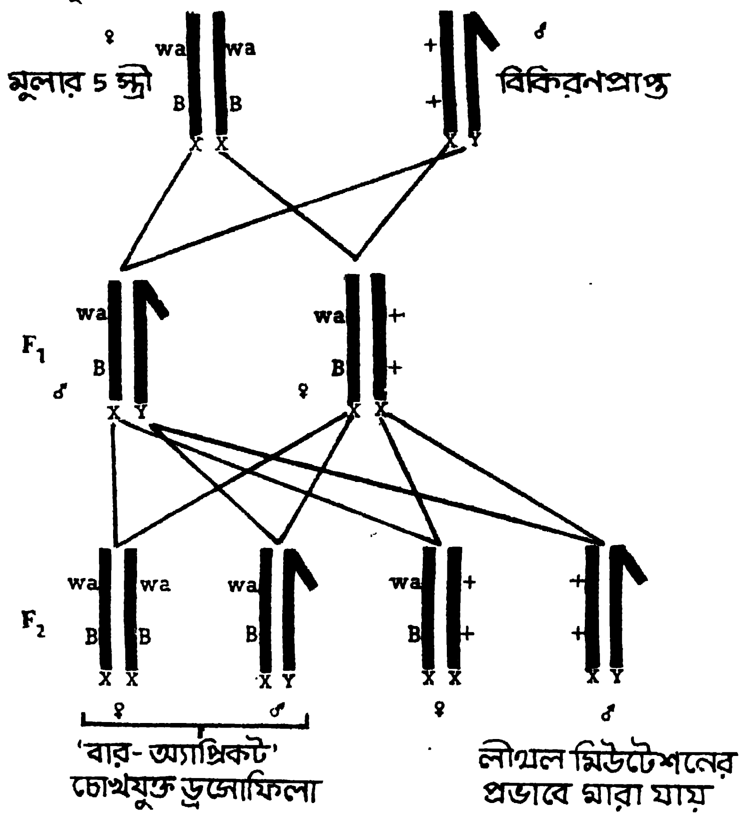
থাকায় এরা বেঁচে থাকতে পারে না। ট্রিপলো-X স্ত্রী (XXX)-পতঙ্গ পরিণত হবার আগেই মারা যায়। এই সংকরণের ফলে সৃষ্ট স্বাভাবিক পুরুষ (XY)-পতঙ্গের X-ক্রোমোসোম পিতা থেকে এবং Y-ক্রোমোসোম মাতা থেকে আসে (চিত্র 109)। যুক্ত X-স্ত্রীর (XXY)-সাথে বিকিরণপ্রাপ্ত পুরুষের (X'Y)-সংকরণ করা হয়। যদি বিকিরণের ফলে (X)-ক্রোমোসোমের কোনও পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাহলে এই সংকরণের ফলে সৃষ্ট পুরুষ পতঙ্গে তা দেখা যাবে, কারণ এখানে পুরুষের X-ক্রোমোসোমটি বিকিরণপ্রাপ্ত পিতা থেকে আসে (চিত্র 110)।



চিত্র—110

যুক্ত X-স্ত্রী ড্রসোফিলার সাথে বিকিরণপ্রাপ্ত পুরুষ ড্রসোফিলার সংকরণের ফলে সৃষ্ট পুরুষ পতঙ্গের X-ক্রোমোসোম পিতা থেকে আসে

2. **মুলার-5-পদ্ধতি (Müller-5-test)**— এখানে এক বিশেষ ধরনের স্ত্রী ড্রসোফিলা (Muller-5)- ব্যবহার করা হয়। এই স্ত্রী ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমে দু'টি ইনভারশেন থাকার দরুন কোনও ক্রসিং ওভার হয় না। ঐ X-ক্রোমোসোমের 'বার' চোখের জিন B ও অ্যাপ্রিকট (apricot)-রঙের চোখের জিন wa থাকে। এই রকমের হোমোজাইগাস স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই বেঁচে থাকতে পারে। মুলার-5-স্ত্রী ড্রসোফিলার সাথে বিকিরণপ্রাপ্ত পুরুষ ড্রসোফিলার ক্রস করা হয় (চিত্র 111)। প্রথম অপত্য বংশের স্ত্রীতে 'বার' চোখ (B)-থাকে এবং পুরুষে 'বার' ও অ্যাপ্রিকট রঙের চোখ দেখা যায়। F_2-এর অর্ধেক স্ত্রী ও পুরুষে 'বার' ও অ্যাপ্রিকট ধরনের চোখ থাকে। বিকিরণের ফলে কোনও প্রাণনাশক মিউটেশন না হলে, F_2-এর স্ত্রী ও পুরুষ ড্রসোফিলার অনুপাত হবে 1:1। কিন্তু কোনও প্রাণনাশক (lethal) মিউটেশনের উপস্থিতিতে স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত 2:1 হয়, কারণ এই রকমের মিউটেশন হলে অর্ধেক পুরুষ প্রাণনাশক জিনের প্রভাবে বাঁচতে পারে না।



চিত্র—111

মুলার -5 ড্রসোফিলার সাথে বিকিরণপ্রাপ্ত পুরুষ ড্রসোফিলার সংকরণের ফলে সৃষ্ট প্রথম ও দ্বিতীয় অপত্য বংশের পতঙ্গগুলি দেখান হয়েছে

উপরের বর্ণিত দুইটি পদ্ধতির (CIB এবং মুলার 5 পদ্ধতি)- সাহায্যে সেক্স লিঙ্কড লীথাল মিউটেশনের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। সেক্স লিঙ্কড দৃশ্যমান (visible) মিউটেশনের উপস্থিতি যুক্ত -X পদ্ধতির সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়। এছাড়া অটোসোমের মিউটেশন নির্ণয় করার জন্য একটি পদ্ধতি হল সমতাযুক্ত (balanced) লীথাল পদ্ধতি। শেষোক্ত দুইটি পদ্ধতির বিবরণ জিন, বংশধারা ও বিবর্তন বইয়ের প্রথম খণ্ডে দেওয়া হয়েছে।

উদ্ভিদে মিউটেশনের উপস্থিতি নির্ণয় করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এরকম দুইটি পদ্ধতি হল (a) Stadler-এর পদ্ধতি এবং (b) Singleton-এর পদ্ধতি। এই দুইটি পদ্ধতির সাহায্যে নির্দিষ্ট অঞ্চলের (locus) মিউটেশন নির্ণয় করা যায়।

(a) Stadler-এর পদ্ধতি — ভুট্টার সস্যের মিউটেশন সম্বন্ধে L. J. Stadler গবেষণা করেন। তিনি স্ত্রী উদ্ভিদ হিসাবে যে গাছকে নির্বাচন করেছিলেন, সেখানে অনেকগুলি ডমিন্যান্ট জিন (যেমন, সস্যের জিন) ছিল এবং এই উদ্ভিদের পুংমঞ্জরী বিন্যাস বাদ দেওয়া হয়। প্রত্যেক পঞ্চম সারিতে পুং উদ্ভিদ হিসাবে নির্বাচিত গাছ লাগান হয়। এই উদ্ভিদে অনেকগুলি রিসেসিভ বা প্রচ্ছন্ন জিন (সস্যের জিন) ছিল। এই উদ্ভিদের পরাগ রেণু নিষেকে অংশ নেয়। স্ত্রী উদ্ভিদের বীজের সস্য পরীক্ষা করা হয়। অধিকাংশ বীজে ডমিন্যান্ট বা প্রবল চরিত্র প্রকাশ পায়। যেসব বীজে রিসেসিভ চরিত্র (যেমন, সঙ্কুচিত বা shrunken) প্রকাশ পায়, সেগুলি স্ত্রী গ্যামেটে মিউটেশনের জন্য হয়েছে।

(b) Singleton এর পদ্ধতি— W. R. Singleton কৃত্রিম মিউটেশন সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তিনি মিউটেশনের উপস্থিতি নির্ণয় করার জন্য রিসেসিভ চরিত্রবিশিষ্ট স্ত্রী উদ্ভিদ এবং অনেকগুলি জিনের ক্ষেত্রে ডমিন্যান্ট চরিত্র বিশিষ্ট পুং উদ্ভিদ ব্যবহার করেছিলেন। পুং উদ্ভিদে বিকিরণ দেওয়া হয়েছিল। যেসব পরাগ রেণুতে মিউটেশন হয়েছে সেগুলি নিষিক্ত হলে রিসেসিভ চরিত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

যেসব উদ্ভিদের জিনোমে দৃশ্যমান (visible) মিউটেশন সমগ্রভাবে নির্ণয় করতে হয়, সেখানে দ্বিতীয় মিউটেশন প্রজন্মের উদ্ভিদগুলি পরীক্ষা করা হয়। এখানে কোনও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মিউটেশন দেখা হয় না। প্রথমে বীজগুলিতে বিকিরণ দেওয়া হয়। এই বীজগুলি বপন করে প্রথম অপত্য প্রজন্মের উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এই উদ্ভিদে স্বপরাগযোগ হয়। এরপর প্রত্যেক উদ্ভিদের উৎপন্ন বীজগুলি আলাদা আলাদা ভাবে সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেক উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত বীজগুলি আলাদা ভাবে (progeny) বপন করে দ্বিতীয় অপত্য বংশের উদ্ভিদ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অপত্য বংশের উদ্ভিদের পৃথকীকরণ (seggregation) লক্ষ্য করা হয়। বিকিরণপ্রাপ্ত বীজে মিউটেশন হয়ে থাকলে, তা দ্বিতীয় অপত্য বংশে প্রকাশ পায়।

মিউটেশনের কারণ — মিউটেশনের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে।

প্রধান দুইটি মতবাদ হল—(1) প্রত্যক্ষ আঘাতের মতবাদ এবং (2) রাসায়নিক মতবাদ।

(b) প্রত্যক্ষ আঘাতের মতবাদ (direct hit theory) বা টারগেট থিওরী (target theory)— রঞ্জন রশ্মি বা অন্যান্য বিকিরণ প্রয়োগ করলে, ঐ রশ্মির ইলেকট্রনগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে জিনকে আঘাত করে ও এর ফলে জিন মিউটেশন হয়। ইলেকট্রনের আঘাতের ফলে জিনে রাসায়নিক পরির্বতন হয় এবং পরিশেষে কোনও চরিত্রে পরির্বতন হয়ে থাকে। Timofeeff-Ressovsky, Zimmer, Delbück (1934), Lea (1936), Catcheside (1948) প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ প্রত্যক্ষ আঘাতের মতবাদ সমর্থন করেন। এই মতবাদ সঠিক হলে ইলেকট্রনের সংখ্যা যত বাড়বে, আঘাতের সংখ্যাও তত বেশি হবে এবং মিউটেশনের হারও বৃদ্ধি পাবে। ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমে রঞ্জন রশ্মির মাত্রা ও মিউটেশনের সংখ্যার মধ্যে এই রকম সম্পর্ক লক্ষ্য করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ আঘাতের ফলেই কেবল মিউটেশনের সৃষ্টি হলে সব ধরনের (স্ট্রেইন) *Drosophila melanogaster*-এ একই মাত্রার রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করলে সম সংখ্যক মিউটেশন দেখা দিত। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের *D. melanogaster*-এ একই মাত্রার বিকিরণ দিলে মিউটেশনের হারের পার্থক্য দেখা যায়। এছাড়া এই মতবাদ অনুসারে, বিকিরণের সময়ের পরিবেশ বা ঐ জীবের দৈহিক অবস্থা মিউটেশনের হারকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু Thoday, Giles, Riley এবং Becker দেখেন যে, অক্সিজেন বা বাতাসের উপস্থিতিতে বিকিরণ দিলে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেনযুক্ত পরিবেশে বিকিরণের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় মিউটেশন তৈরি হয়। সুতরাং, প্রত্যক্ষ আঘাত ছাড়াও অন্য কোনও প্রক্রিয়া মিউটেশন সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে।

(b) পরোক্ষ বা রাসায়নিক মতবাদ (indirect বা chemical theory) —এই মতবাদ অনুসারে, বিকিরণের ফলে কোষে রাসায়নিক পরিবর্তন হওয়ায় মিউটেশনের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বিকিরণ পরোক্ষভাবে মিউটেশন তৈরি করে। এই মতবাদের সাহায্যে ড্রসোফিলার বিভিন্ন স্ট্রেইনে একই মাত্রার রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করে যে মিউটেশনের হারের তারতম্য হয়, তা ব্যাখ্যা করা যায়। একই প্রজাতির বিভিন্ন স্ট্রেইনে (strain) কোষের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ আলাদা হতে পারে, ফলে রঞ্জন রশ্মির প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন রকমের রাসায়নিক পরিবর্তন হওয়ায় মিউটেশনের হারও এক হয় না। Rhoades ভুট্টার ওপর গবেষণা করে রাসায়নিক মতবাদকে সমর্থন করেছেন।

Giles, Koller প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের মতেও বিকিরণের প্রভাব পরোক্ষভাবে হয়। মিউটেশনের সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থ সাইটোপ্লাজমকে পরিবর্তিত করে। এই পরিবর্তিত সাইটোপ্লাজমের প্রভাবে নিউক্লিয়াসে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ও এর ফলে ক্রোমোসোমে মিউটেশন হয়। রঞ্জন রশ্মি ও অন্যান্য ধরনের বিকিরণের প্রভাবে তৈরি মিউটেশন এবং রাসায়নিক বস্তুর প্রভাবে সৃষ্ট মিউটেশনের মধ্যে সামঞ্জস্য উভয়

ক্ষেত্রেই একই পদ্ধতির মাধ্যমে মিউটেশনের সৃষ্টির ইঙ্গিত করে। Duryee *Paramecium*-এর ডিম্বাণুর অবিকিরণপ্রাপ্ত নিউক্লিয়াসকে বিকিরণপ্রাপ্ত সাইটোপ্লাজমে স্থানান্তর করে ক্রোমোসোমের ভগ্নতা অর্থাৎ ফ্র্যাগমেন্ট (fragment) পান। কিন্তু যখন বিকিরণপ্রাপ্ত নিউক্লিয়াস বিকিরণহীন সাইটোপ্লাজমে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন ক্রোমোসোমে পরিবর্তন হয় না। সুতরাং, সাইটোপ্লাজমই ক্রোমোসোমে পরিবর্তন আনে। তাছাড়া *Tradescantia* ও অন্যান্য অনেক উদ্ভিদে বিকিরণের মাত্রা ও মিউটেশনের হার সরাসরি আনুপাতিক হয় না। Giles-এর মতে, বিকিরণের ফলে জলের অণু বিভাজিত হয়ে H ও OH-আয়নের সৃষ্টি হয়। অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ার ফলে এর থেকে হাইড্রোজেন প্যারাক্সাইড তৈরি হয়। রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করার পর কোষ থেকে হাইড্রোজেন প্যারাক্সাইড পাওয়া গিয়েছে। এই হাইড্রোজেন প্যারাক্সাইড মিউটেশন সৃষ্টি করতে পারে। এখন দেখা গিয়েছে, $H_2 O_2$ ছাড়াও OH-এর প্রভাবেও মিউটেশন তৈরি হয়। এইসব বিভিন্ন তথ্য পরোক্ষ বা রাসায়নিক মতবাদকেই সমর্থন করে।

আণবিক স্তরে মিউটেশনের কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, DNA অণুর নিউক্লিওটাইডের বেসের পরিবর্তন হলে মিউটেশন দেখা দেয়। বেসের (base) পরিবর্তন নানা রকম হতে পারে। যেমন, কোনও বেস বাদ যেতে পারে কিম্বা সংযোজিত হতে পারে অথবা বেসের অবস্থানের পরিবর্তন (যেমন, ইনভারশন) হতে পারে বা এক জোড়া (pair) বেসের বদলে নতুন আরেক জোড়া বেস সংযোজিত হয়। DNA অণুর কোনও অংশ ভেঙে গিয়ে পুনরায় সংযুক্ত হওয়ার ফলে কোনও বেস বাদ যেতে পারে বা সংযুক্ত হতে পারে কিম্বা বেসের অবস্থানের পরিবর্তন হয়। কিন্তু কোনও বেস জোড়ার পরিবর্তে অন্য বেস জোড়ার বদল DNA অণু দ্বিগুণ হওয়ার (replication) সময় হতে পারে। বেস জোড়ার বদল দুই রকমের— (a) ট্র্যানসিশন (transition) এবং (transversion) ট্র্যান্সভারশন । ট্র্যান্সভারশনের চেয়ে ট্র্যানসিশন বেশি দেখা যায়:

(a) **ট্র্যানসিশন**— এখানে একটি পিউরিন বেসের বদলে আরেকটি পিউরিন বেস যুক্ত হয় এবং পিরিমিডিন বেসের বদলে পিরিমিডিন বেস যুক্ত হয়। যেমন, GC-র বদলে AT যুক্ত হতে পারে।

(b) **ট্র্যান্সভারশন**— এখানে পিউরিন বেসের বদলে পিরিমিডিন বেস যুক্ত হয়। যেমন TA-র বদলে AT যুক্ত হতে পারে কিম্বা GC-র বদলে CG অথবা TA বদলে GC যুক্ত হয়।

মিউটেশনের প্রয়োগ— বেশিরভাগ মিউটেশন ক্ষতিকর ও গুরুত্বহীন। Gustafson -এর মতে, হাজারে একটি মিউটেশন উপযোগী হতে পারে।

গামা বিকিরণ প্রয়োগ করে ধানে উচ্চফলনশীন 'reimei' ভ্যারাইটি পাওয়া গেছে। এছাড়া মিউটেশনের ফলে অধিক প্রোটিন ও লাইসিনযুক্ত দ্রুত ফলনশীল ধান

উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। মিউটেশনের মাধ্যমে 'জাপোনিকা' ভ্যারাইটির ধান থেকে এদেশের উপযোগী 'ইণ্ডিকা' ভ্যারাইটির ধান সৃষ্টি হয়েছে।

মিউটেশনের ফলে উচ্চ প্রোটিন ও লাইসিনযুক্ত, প্রতিরোধক, শাখাবিশিষ্ট শীষযুক্ত (a) গম উৎপাদন করা গেছে। এছাড়া লালচে রঙের বীজযুক্ত (b) ভ্যারাইটির গম মিউটেশনের ফলে পাওয়া গেছে। এখানে উৎপন্ন উন্নত ধরনের মিউটেশনযুক্ত গমের ভ্যারাইটি হল সরবতী, সোনোরা এবং পুসা লার্মা।

বার্লিতে মিউটেশনের ফলে উচ্চ ফলনশীল DL 253 এবং R BD 1 ভ্যারাইটি পাওয়া গেছে।

মিউটেশনের ফলে রেড়ীতে অত্যন্ত দ্রুত ফলনশীল ভ্যারাইটি পাওয়া গেছে।

Penicillium-এর মিউটেশনযুক্ত ভ্যারাইটি থেকে অনেক বেশি পরিমাণ পেনিসিলিন পাওয়া যায়।

হর্টিকালচারে সোমাটিক মিউটেশনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এরকম মিউটেশনের ফলে নানা রকম ফল, ফুল গাছের উন্নত ভ্যারাইটির সৃষ্টি হয়েছে।

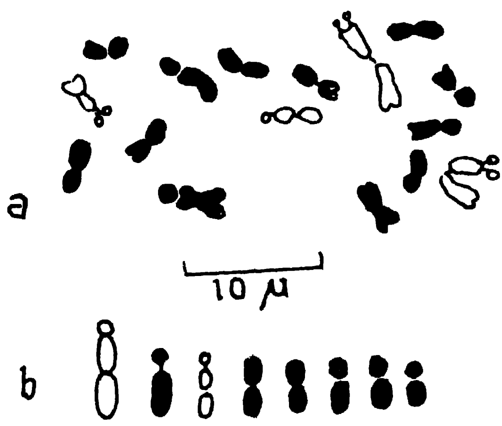
একাদশ অধ্যায়

ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন

(Structural Changes of Chromosomes)

ক্রোমোসোমীয় মিউটেশন দুই রকমের — ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন ও ক্রোমোসোমের সংখ্যার পরিবর্তন।

সব উদ্ভিদ বা প্রাণীর প্রত্যেক দেহ কোষে নির্দিষ্ট আকৃতির নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। নির্দিষ্ট ধরনের যেসব ক্রোমোসোম কোনও একটা জীবের কোষে পাওয়া যায় তাকে ক্যারিওটাইপ (karyotype) বলে। ক্যারিওটাইপকে নক্সাকারে (diagrammatic)

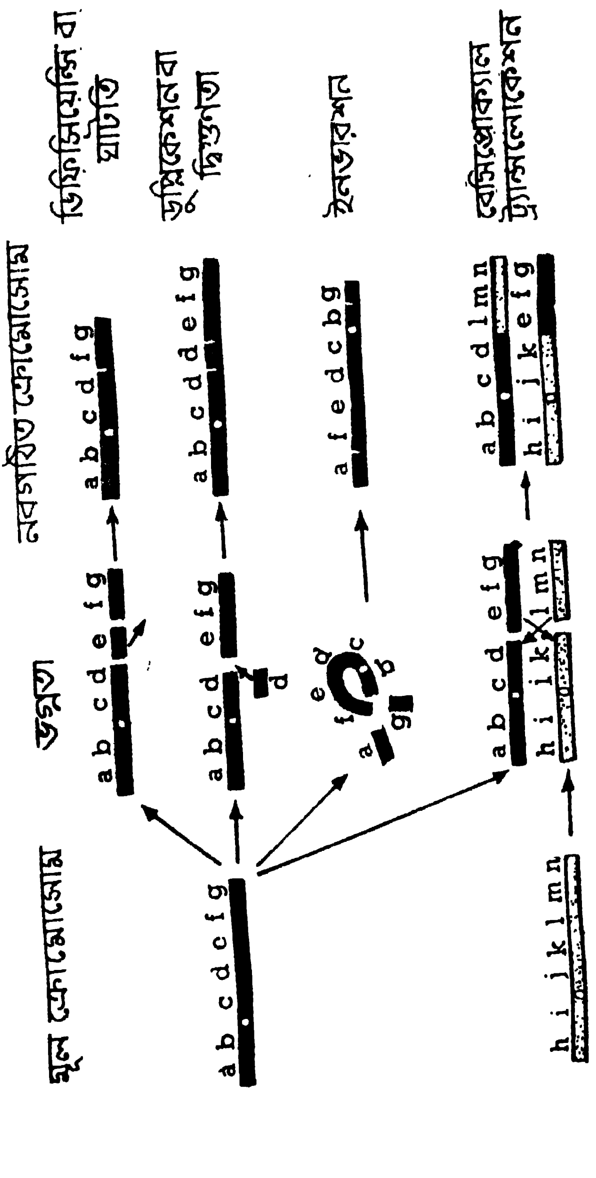


চিত্র—112

Punica granatum-এর দেহ কোষে 2n = 16টি ক্রোমোসোম

a— ক্যারিওটাইপ, b—ইডিওগ্রাম

উপস্থাপিত করাকে ইডিওগ্রাম (idogram) বলা হয় (চিত্র 112)। এক কোষ থেকে অন্য কোষে কিম্বা এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে ক্যারিওটাইপের অপরিবর্তনীয়তা নির্ভর করে কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোসোমের যথাযথ বিভাজনের ওপর। সাধারণত কোষ বিভাজনের ফলে সৃষ্ট দু'টি অপত্য কোষেই মাতৃকোষের অনুরূপ ও



চিত্র—113

ক্রোমোসোমের বিভিন্ন রকমের ভগ্নতা ও সংযোগের ফলে ক্রোমোসোমের চার ধরনের আকৃতির পরিবর্তন অর্থাৎ ডিফিসিয়েন্সি, ডুপ্লিকেশন, ইনভারশন ও ট্র্যান্সলোকেশন কীভাবে হয় তা দেখান হয়েছে

কখনও কখনও একটা কোষে ক্রোমোসোমের হঠাৎ আকৃতির কিম্বা সংখ্যার পরিবর্তন দেখা যায়। এই কোষ থেকে সৃষ্ট সব অপত্য কোষেই নতুন ক্যারিওটাইপ দেখা যায়, কারণ পরিবর্তিত ক্রোমোসোমগুলিও যথাযথভাবে বিভাজিত হয়। এই পরিবর্তন জনন কোষে দেখা দিলে নতুন ভ্যারাইটির (variety) উদ্ভিদের সৃষ্টি হতে পারে।

ক্যারিওটাইপের পরিবর্তনকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(A) আকৃতির পরিবর্তন, (B) সংখ্যার পরিবর্তন।

উভয় ধরনের পরিবর্তনই প্রকৃতিতে দেখা যায়, তবে এদের সংখ্যা খুব কম। রঞ্জন রশ্মি (X-ray) ও অন্যান্য ধরনের বিকিরণের (radiation) সাহায্যে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে ক্রোমোসোমের পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে।

ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তনকে (aberration) চারটি শ্রেণীতে (চিত্র 113) ভাগ করা হয়। এই শ্রেণীগুলি হল ঃ—

(1) ঘাটতি (deficiency) ও ডিলিশন (deletion)

(2) দ্বিগুণতা বা ডুপ্লিকেশন (duplication)

(3) ইনভারশন (inversion) অর্থাৎ উল্টান অবস্থা

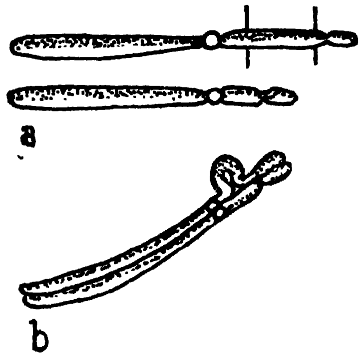
(4) ট্র্যান্সলোকেশন (translocation) অর্থাৎ স্থান বদল।

1. **ঘাটতি (deficiency) ও ডিলিশন (deletion)**— ক্রোমোসোমের কোনও অংশ বাদ গেলে তাকে ডিফিসিয়েন্সি বা ঘাটতি বলে। ক্রোমোসোমের কোনও জায়গায় ভেঙে গেলে সাধারণত একটা সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত অংশ ও একটা সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অংশের সৃষ্টি হয়। সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন বা অ্যাসেন্ট্রিক (acentric) অংশটি স্থায়ী হয় না কারণ, অ্যানাফেজে এই ক্রোমোসোম স্বাভাবিকভাবে মেরুর দিকে যেতে পারে না। সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত অংশ স্থায়ী হয় ও এই ক্রোমোসোমকে ডিফিসিয়েন্ট (deficient) বা ঘাটতি ক্রোমোসোম বলে। তবে যদি অবলুপ্ত অঞ্চল বড় হয় ও ঐখানে অনেকগুলি জিন থাকে, তবে সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত অংশটিও বিনষ্ট হয়ে যায়।

ডিফিসিয়েন্সিকে (deficiency) দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (a) ক্রোমোসোমের প্রান্তের অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে বা বিনষ্ট হয়ে গেলে তাকে টারমিন্যাল ডিফিসিয়েন্সি (terminal deficiency) বা প্রান্তীয় ঘাটতি বলা হয় (চিত্র 114a, b)। কখনও SAT ক্রোমোসোমের প্রান্তের স্যাটেলাইটটা বাদ যায়। এই রকমের ঘাটতিকে অ্যাম্ফিপ্লাষ্টি (amphiplasty) বলে। প্রান্তীয় ডিফিসিয়েন্সিতে ক্রোমোসোমের একটি স্থানে ভেঙে যায়।

(b) ক্রোমোসোমের মাঝের কোনও অংশ বাদ গেলে তাকে ইন্টারক্যালারী ডিফিসিয়েন্সি (*intercalary deficiency*) বা মধ্যবর্তী ঘাটতি বলে (চিত্র 115a b)। কোনও ক্রোমোসোমের দু'টিস্থান ভেঙে গিয়ে দুই পাশের অংশ দুইটির ভগ্ন প্রান্ত জোড়া লাগার ফলে মধ্যবর্তী ঘাটতির সৃষ্টি হয়। মধ্যবর্তী ঘাটতিকে ডিলিশন বলে।

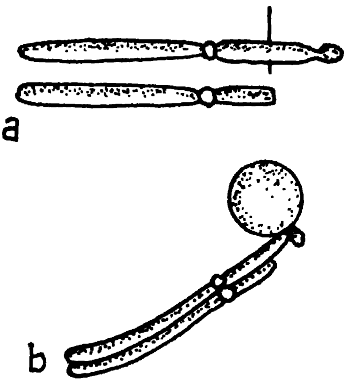
প্রান্তীয় ঘাটতি মধ্যবর্তী ঘাটতির তুলনায় অনেক কম দেখা যায়। ড্রসোফিলায় প্রান্তীয় ঘাটতি বিরল। অনেকে মনে করেন, এখানে সত্যিকারের প্রান্তীয় ঘাটতি হয় না।



চিত্র—114
মধ্যবর্তী ঘাটতি
a— উপরের ক্রোমোসোমের দুই জায়গায় ভেঙে গিয়ে মাঝের অংশ বাদ যাওয়ার ফলে মধ্যবর্তী ঘাটতিযুক্ত নিচের ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে,
b — মায়োসিসে স্বাভাবিক ও মধ্যবর্তী ঘাটতিযুক্ত ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতা

তবে ভুট্টায় বেশ কতকগুলি প্রান্তীয় ঘাটতি দেখা গিয়েছে। প্রান্তীয় ঘাটতি বা টারমিন্যাল ডিফিসিয়েনসিতে ক্রোমোসোমের টেলোমিয়ার (telomere) অংশটা বাদ যায়। সদ্য ভগ্ন প্রান্তটা সহজেই অন্য কোনও ভগ্ন প্রান্তের সাথে জোড়া লাগে। কোনও ক্রোমোসোমের ক্রোমোটিড দু'টি একই স্থানে ভেঙে গেলে, অনেক সময় একটি দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত বা ডাইসেন্ট্রিক (dicentric) ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অংশ দু'টিও যুক্ত হতে পারে ও পরে ঐ অংশ বিনষ্ট হয়ে যায়। ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমাটিড পরের মাইটোসিস বিভাজনের সময় একটি দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত সেতু বা ডাইসেন্ট্রিক ব্রীজের (dicentric bridge) সৃষ্টি করে। অ্যানাফেজে সেন্ট্রোমিয়ার দু'টি বিপরীত মেরুর দিকে যেতে চায়, ফলে সেতুটা ভেঙে যায়। সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত দু'টি ভগ্ন অংশ দু'টি অপত্য নিউক্লিয়াসে যায়। অপত্য ক্রোমোসেমের ভগ্নী ক্রোমাটিডের (আগের অর্ধ-ক্রোমাটিড) দু'টি ভগ্ন প্রান্ত জোড়া লাগে ও পুনরায় সেতু গঠিত হয়। এইভাবে বারবার ভগ্নতা-সংযোগ-সেতু (breakage-fusion-bridge) গঠিত হতে থাকে। কয়েক প্রজন্ম পরে এই ক্রোমোসোমটি বা সম্পূর্ণ কোষটাই বিনষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য এই রকমের ভগ্নতা সাইটোলজিয় পরিবর্তন আনতে পারে না। McClintoc-এর (1941) মতে, উদ্ভিদে প্রান্তীয় ঘাটতির ফলে গঠিত ভগ্ন প্রান্ত আবার যুক্ত হয়ে যায় ও ক্রোমোসোমটি স্থায়ী হয়। বিকিরণ প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, ক্রোমোসোমের ভগ্নতা কীরকম হবে তা নির্ভর করে কী

অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলিকে বিকিরণ দেওয়া হচ্ছে তার ওপর। (*i*) DNA দ্বিগুণ হবার আগে বিকিরণ প্রয়োগ করলে ক্রোমোসোমীয় ভগ্নতা দেখা যায়। (*ii*) DNA দ্বিগুণ হবার পর বিকিরণ পেলে সাধারণত ক্রোমোসোমের দু'টি ক্রোমাটিডই একই জায়গায় ভেঙে যায় (Catcheside ও Lea)। তবে কখনও কখনও কেবল একটি ক্রোমাটিড ভেঙে যায়।



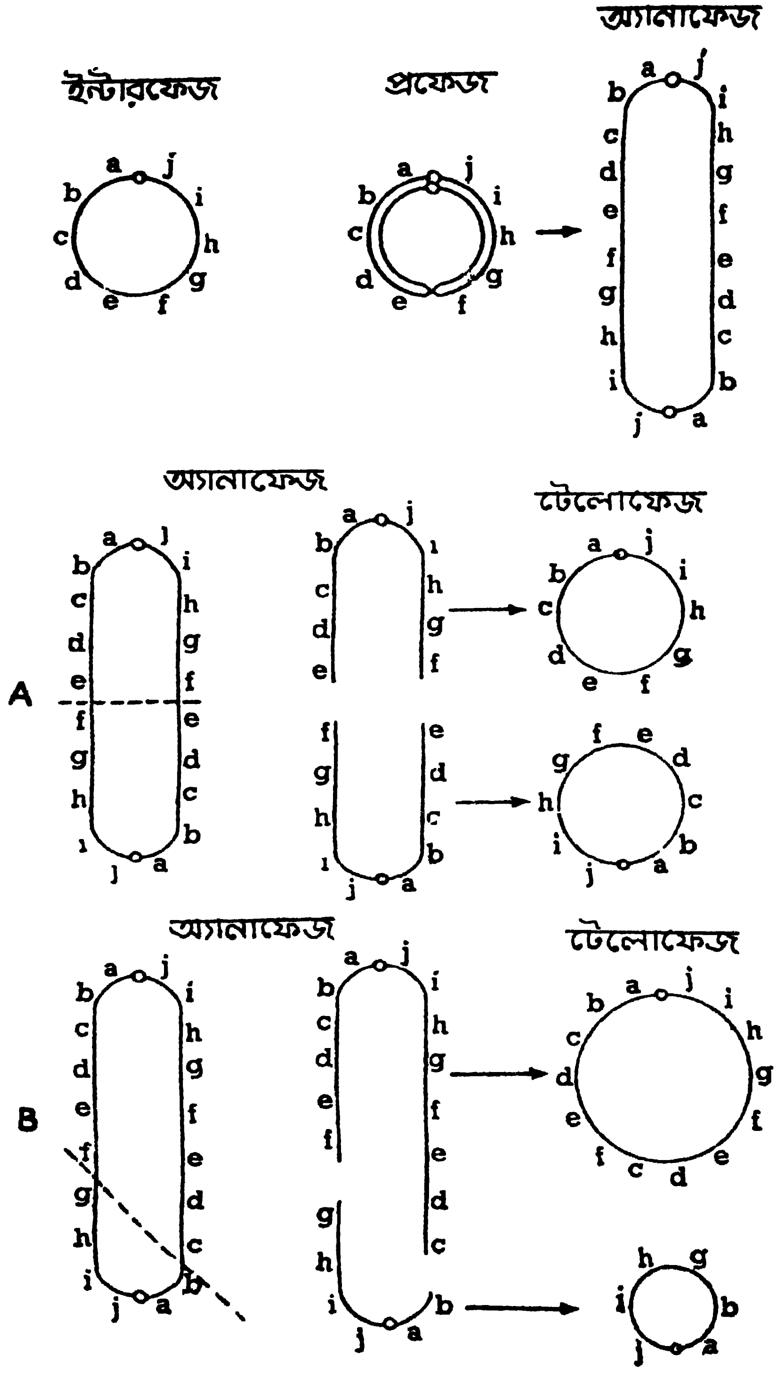
চিত্র—115

প্রান্তীয় ঘাটতি

a –উপরের ক্রোমোসোমের প্রান্তের কিছু অংশ বাদ যাওয়ার ফলে প্রান্তীয় ঘাটতিযুক্ত নিচের ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে

b–হেটোরোজাইগাস প্রান্তীয় ঘাটতিযুক্ত উদ্ভিদে মায়োসিসে স্বাভাবিক ও ঘাটতি ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতা

অনেক সময় একটি ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারের দুই দিকে ভেঙে যায়। সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অংশ দু'টি যুক্ত হতে পারে কিম্বা আলাদা থাকতে পারে। তবে সব ক্ষেত্রেই সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অংশ পরে বিনষ্ট হয়ে যায়। সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত অংশের দু'টি ভগ্ন প্রান্ত জোড়া লেগে বলয়াকার বা রিঙ (ring) ক্রোমোসোম (চিত্র 116) গঠিত হয়। ভুট্টায় এবং ড্রসোফিলায় বলয়াকার ক্রোমোসোম দেখা গিয়েছে। ড্রসোফিলায় রিঙ বা বলয়াকার X ক্রোমোসোম পাওয়া যায়। কিন্তু বলয়াকার অটোসোম (autosome) সচরাচর দেখা যায় না। মাইটোসিস বিভাজনের সময় কখনও কখনও বলয়াকার ক্রোমোসোমের ভগ্নী ক্রোমোটিডের মধ্যে একটি ক্রসিং ওভার (crossing-over) হয়। এর ফলে একটি দ্বিগুণ দৈর্ঘ্যের দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত রিঙ বা বলয়াকার ক্রোমাটিডের সৃষ্টি হয় (চিত্র 116)। বারবার এই রকমের ভগ্নতা-সংযোগ হওয়ার ফলে পরে ঐ কোষগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। এজন্য প্রকৃতিতে রিঙ বা বলয়াকার ক্রোমোসোম সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।



চিত্র—116 (চিত্রের বিবরণ 421 পাতায়)

হোমোজাইগাস (homozygous) ডিফিসিয়েন্সিতে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটির কোনও বিশেষ অংশ বিনষ্ট হয়ে যায়। হোমোজাইগাস ডিফিসিয়েন্সিযুক্ত জীব সাধারণত বেঁচে থাকতে পারে না। 1934 খ্রিস্টাব্দে Creighton ভুট্টায় হোমোজাইগাস ডিফিসিয়েন্সি দেখতে পেয়েছিলেন। McClintock-এর (1938,1941,1944) মতে, ভুট্টায় খুব ছোট হোমোজাইগাস ডিফিসিয়েন্সি হলে ঐ উদ্ভিদটি বেঁচে থাকতে পারে। *Drosophila*-এ X-ক্রোমোসোমের প্রান্তের ছোট ডিফিসিয়েন্সি হলে, ঐ ড্রসোফিলাটি বেঁচে থাকতে পারে।

হেটারোজাইগাস (heterozygous) ডিফিসিয়েন্সিতে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের যে কোনও একটি সদস্যে ডিফিসিয়েন্সি দেখা যায় (চিত্র 114, 115) । কোনও কোনও জীবে হেটারোজাইগাস অবস্থায়ও ডিফিসিয়েন্সি খুব ছোট না হলে, ঐ জীবের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম। হোমোজাইগাস ডিফিসিয়েন্সির তুলনায় হেটারোজাইগাস ডিফিসিয়েন্সি অনেক কম ক্ষতিকর। ভুট্টা, ধুতরা এবং অন্যান্য কিছু উদ্ভিদে কোনও ক্রোমোসোমের বেশিরভাগ অংশ, এমন কি একটি সম্পূর্ণ ক্রোমোসোম বাদ (2n-1) গেলেও, উদ্ভিদটি বেঁচে থাকতে পারে। গ্যামেটোফাইট বা লিঙ্গধর উদ্ভিদে যে কোনও ডিফিসিয়েন্সিই মারাত্মক হয় কারণ, লিঙ্গধর উদ্ভিদ হ্যাপ্লয়েড হওয়ায় ডিফিসিয়েন্সি হলেই ঐ জীবে কোনও না কোনও জিন অনুপস্থিত থাকে। ড্রসোফিলার 'Y' ক্রোমোসোমের বেশ বড় অংশ বাদ গেলেও কোনও ক্ষতি হয় না কারণ, 'Y' ক্রোমোসোমের বেশিরভাগ অংশই জেনেটিকভাবে নিষ্ক্রিয়।

চিত্র—116

বলয়াকার বা রিঙ ক্রোমোসোম।

উপরে—বাদিকে ইন্টারফেজ অবস্থায় বলয়াকার ক্রোমোসোম, মাঝে বলয়াকার ক্রোমোসোমের দুইটি ভগ্নী ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়েছে, ডানদিকে একটি দ্বিগুণ দৈর্ঘ্যের দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত বলয়াকার ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে,

মাঝে — দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোমটি মাঝামাঝি অঞ্চলে ভেঙে যাওয়ার ফলে টেলোফেজে দু'টি সমান আকৃতির বলয়াকার ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে,

নীচে—দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম অসমান অংশে ভেঙে যাওয়ার ফলে টেলোফেজে দু'টি অসমান আকৃতির বলয়াকার ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে

হেটারোজাইগাস ডিফিসিয়েন্সির বংশধারায় প্রভাব আছে। ডিফিসিয়েন্সির উপস্থিতিতে একটি রিসেসিভ অ্যালীল ডমিন্যান্ট অ্যালীলের মত কাজ করে। এই অবস্থাকে সিউডোডমিন্যান্স (pseudodominance) বলে। সিউডোডমিন্যান্সের সাহায্যে ড্রসোফিলা, ভুট্টা ও অন্যান্য জীবে নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমে জিনের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। L. J. Stadler একটি পরীক্ষায় হোমোজাইগাস রিসেসিভ উদ্ভিদকে স্ত্রী উদ্ভিদ হিসাবে ব্যবহার করেন। হোমোজাইগাস ডমিন্যান্ট উদ্ভিদের বিকিরণপ্রাপ্ত পরাগরেণু ঐ উদ্ভিদের নিষেকের জন্য ব্যবহার করা হয়। যদি বিকিরণের জন্য কোনও ডিলিশন হয়ে থাকে, তাহলে সিউডোডমিন্যান্সের জন্য রিসেসিভ অ্যালীল প্রকাশ পাবে।

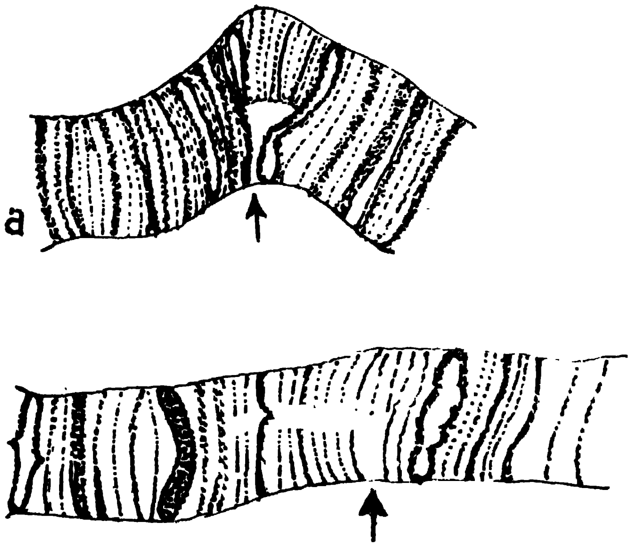
প্রাণীতে ঘাটতি ক্রোমোসোমযুক্ত গ্যামেট ফার্টিলাইজেশনে অংশ নেয় না এবং পরে বিনষ্ট হয়ে যায়। তবে কিছু উদ্ভিদে ঘাটতি স্ত্রী গ্যামেট (ডিম্বাণু) নিষিক্ত হতে পারে। কিন্তু ঘাটতি পুং গ্যামেট স্বাভাবিক গ্যামেটের সাথে প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য হয়। এই জন্য হোমোজাইগাস ডিফিসিয়েন্সি কম দেখা যায়।

মানুষেও ডিফিসিয়েন্সি দেখা গেছে। ক্রোমোসোম '5'-এর একটি অংশের ডিফিসিয়েন্সি বা ঘাটতির জন্য 'Cru-du-chat' অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। এরকম ডিফিসিয়েন্ট লোকেদের মাথা তুলনামূলকভাবে ছোট হয় ও এদের বুদ্ধি কম থাকে। এরকম বাচ্চারা কাঁদলে বিড়ালের মত আওয়াজ হয়।

ঘাটতি বা ডিফিসিয়েন্সি স্বাভাবিকভাবে বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি হয়। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের বিসদৃশ্য অংশের মধ্যে ক্রসিং ওভারের ফলে কিম্বা দুইটি হোমোলোগাস নয় এমন ক্রোমোসোমের মধ্যে ক্রসিং ওভারের ফলে ডিফিসিয়েন্সি দেখা যায়। Rick *Tradescantia*-এ রঞ্জন রশ্মির প্রয়োগ করে ডিফিসিয়েন্সি দেখতে পেয়েছিলেন। ভুট্টায় অতি বেগুনী রশ্মির প্রয়োগ করে প্রান্তীয় ঘাটতি ও রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করে মধ্যবর্তী ঘাটতি দেখা যায় (Stadler 1941, Stadler ও Roman 1948)। রঞ্জন রশ্মি (X-ray) প্রয়োগ করে Stadler ও Roman (1948) ভুট্টার 'A' স্থানে তিনটি হেটারোজাইগাস ডিফিসিয়েন্সি পেয়েছিলেন। এসব ডিফিসিয়েন্সির (ঘাটতির) জন্য উদ্ভিদে অ্যান্থোসায়ানিন (anthocyanin) ও ক্লোরোফিলের পরিমাণ হ্রাস পায় ও কোষের জীবনীশক্তি কমে যায়। রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করে Stadlar ভুট্টার দশম ক্রোমোসোমের প্রায় এক ষষ্ঠমাংশ ছাড়া একটি ঘাটতি ক্রোমোসোম পেয়েছিলেন। এই রকমের ক্রোমোসোমযুক্ত হেটারোজাইগাস ভুট্টার ঘাটতি পরাগরেণু (pollen) পরাগধানী (anther) থেকে বের হওয়ার অল্প পরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

Burton (1954) অতি বেগুনী রশ্মি (ultra violet ray) প্রয়োগ করে মধ্যবর্তী ঘাটতি পেয়েছিলেন। বিভিন্ন ধরনের বিকিরণের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদে আলাদা হয়ে থাকে।

ড্রসোফিলায় স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের স্বাভাবিক ও ঘাটতি ক্রোমোসোমের গঠন তুলনা করে সঠিকভাবে অবলুপ্ত অঞ্চলের অবস্থান নিরূপণ করা সম্ভব। হেটারোজাইগাস ডিফিসিয়েন্সি (চিত্র 117a, 118a,b,c) প্যাকিটিন অবস্থায় খুব সহজেই বোঝা যায় কারণ, অবলুপ্ত অংশ ও হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের স্বাভাবিক অংশের মধ্যে যুগ্মতা হতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদে, যেখানে স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড ক্রোমোসোমের মত বড় ক্রোমোসোম দেখা যায় না, সেখানে খুব ছোট ডিফিসিয়েন্সি সাইটোলজিয় পদ্ধতিতে ধরা যায় না। জেনেটিক উপায়ে কেবল এই সব ডিফিসিয়েন্সির উপস্থিতি বোঝা যায়।



চিত্র - 117

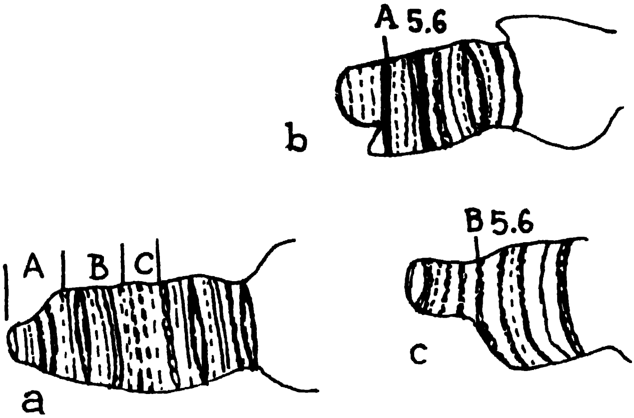
Drosophila melanogaster-এর স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের ক্রোমোসোমে হেটারোজাইগাস মধ্যবর্তী ঘাটতি।

a — তীর চিহ্নিত স্থানে দশ এগারটি ব্যান্ডের মধ্যবর্তী ঘাটতি,

b - তীর চিহ্নিত স্থানে দু'টি ব্যাণ্ডের মধ্যবর্তী ঘাটতি

যেহেতু ডিফিসিয়েন্সি বা ঘাটতির ফলে জিনীয় বস্তুর লোকসান হয়, সেজন্য এর প্রভাব জীবের পক্ষে ক্ষতিকর। বিনষ্ট জিনীয় বস্তুর পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর এই ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে।

ডিফিসিয়েন্সির সাহায্যে ক্রোমোসোমে নির্দিষ্ট জিনের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। এর সাহায্যে ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের ক্রোমোসোমের মানচিত্র গঠন করা যায় (Mackensen'35, Silzynska'38)।



চিত্র—118

Drosophila melanogaster-এর ক্রোমোসোমের প্রান্তীয় ঘাটতি।
a —স্বাভাবিক X-ক্রোমোসোমের প্রান্তভাগ, b ও c– X - ক্রোমোসোমের হেটোরোজাইগাস প্রান্তীয় ঘাটতি,
b – চারটি প্রান্তীয় ব্যাণ্ডের ঘাটতি,
c – দশ, এগারটি প্রান্তীয় ব্যাণ্ডের ঘাটতি।

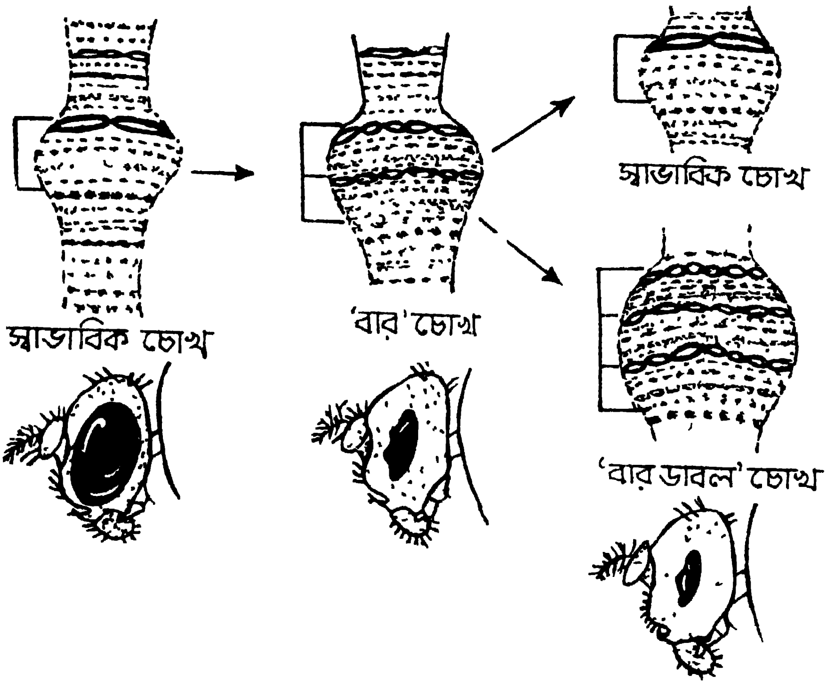
ডুপ্লিকেশন (duplication) বা দ্বিগুণতা

1919 খ্রিস্টাব্দে Bridges দেখেন যে, একটা হোমোজাইগাস রিসেসিভ (recessive বা প্রচ্ছন্ন) জিনযুক্ত *Drosophila melanogaster*-এ ঐ রিসেসিভ চরিত্র প্রকাশিত না হয়ে ফেনোটাইপে ডমিন্যান্ট (প্রবল) চরিত্র প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেন যে, ঐ সব ড্রসোফিলায় দু'টি রিসেসিভ জিন ছাড়াও নির্দিষ্ট চরিত্রের একটি ডমিন্যান্ট জিন রয়েছে। যখন ক্রোমোসোমের কোনও অংশ নিয়মিত অংশের অতিরিক্ত থাকে, তখন তাকে ডুপ্লিকেশন (duplication) বা দ্বিগুণতা বলে অর্থাৎ, ডুপ্লিকেশনের ফলে একটি ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ বা প্রাণীতে কোনও ক্রোমোসোমের একটি অংশ দুই বার থাকবার (দু'টি হোমোলোগে) জায়গায় তিন বার বা তার চেয়ে বেশি বার থাকে। এই অতিরিক্ত অংশ ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত অবস্থায় কিম্বা পৃথক (fragment) অবস্থায় থাকতে পারে।

(*a*) যদি অতিরিক্ত অংশটি যে ক্রোমোসোমের অংশ সেই, ক্রোমোসোমেই অনুরূপ অংশের পাশে থাকে, তবে তাকে ট্যানড্যাম ডুপ্লিকেশন (tandem duplication) বলে। ab cde fg ক্রোমোসোমের cde অংশটা যদি দ্বিগুণ হয় ও ab cde cde fg ভাবে থাকে, তবে এই দ্বিগুণতাকে ট্যানড্যাম ডুপ্লিকেশন বলা হয়। ড্রসোফিলার

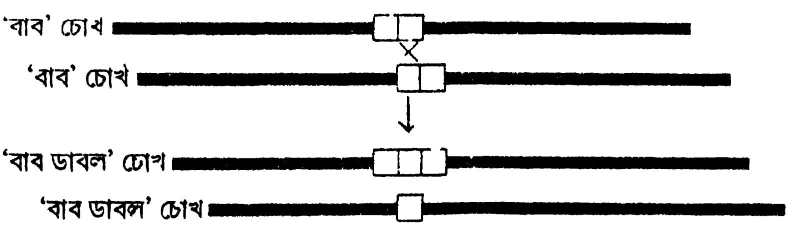
'বার' (*Bar*) চোখ (চিত্র 119) ও রোমশ পাখা এই রকম দ্বিগুণতাব জন্য হয়।

(b) বিপরীত ট্যানড্যাম ডুপ্লিকেশন (reverse tandem duplication) আগেবটাব



চিত্র—119

Drosophila melanogaster-এব X- ক্রামোসোমেব 16Aঅঞ্চল (চিহ্নিত স্থান) এক বাব থাকলে স্বাভাবিক চোখ, পবপব দুই বাব থাকলে 'বাব' চোখ এবং পবপব তিন বাব থাকলে 'বাব ডাবল' চোখের সৃষ্টি হয়। নিচে ড্রসোফিলাব বিভিন্ন বকমেব চোখ (স্বাভাবিক, 'বাব' এবং 'বাব ডাবল') দেখান হয়েছে



চিত্র—120

দু'টি ক্রোমোসোমেব মধ্যে অসমান ক্রসিং ওভাবেব ফলে 'বাব ডাবল' (দ্বিগুণ 'বাব') ও স্বাভাবিক পতঙ্গেব সৃষ্টি হয়

মতই কেবল এখানে দ্বিগুণ অংশটি উল্টোভাবে থাকে। cde যদি অতিরিক্ত অংশ হয়, তবে বিপরীত ট্যানড্যাম ডুপ্লিকেশন হবে ab cde edc fg । বিশেষ ধরনের বিপরীত দ্বিগুণতায় একটি মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোমের দুইটি বাহুই অনুরূপ (iso-chromosome) হয়। এই রকমের আইসো-ক্রোমোসোম সেন্ট্রোমিয়ারের পাশাপাশি বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হতে পারে। ড্রসোফিলার যুক্ত-X ক্রোমোসোম এই ধরনের।

(*c*) **ডিসপ্লেইসড ডুপ্লিকেশন** (displaced duplication) বা স্থানান্তরিত দ্বিগুণতায় অতিরিক্ত অংশটি যে ক্রোমোসোমের অংশ, সেখানে না থেকে অন্য ক্রোমোসোমে থাকে। যদি abcdefg ও klmnop দু'টি ক্রোমোসোম হয় ও cde অংশটি অতিরিক্ত অবস্থায় থাকে, তাহলে স্থানান্তরিত দ্বিগুণতায় cde অংশটা kl cde mnop বা kl edc mnop অবস্থায় থাকতে পারে। অসমান ক্রসিং ওভারের জন্য দ্বিগুণতা দেখা যায় (চিত্র 120)। *Drosophila melanogaster*-এর X-ক্রোমোসোমে বিভিন্ন রকমের কয়েকটা দ্বিগুণতা দেখা যায়। ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমের '16a' (সাত ব্যাণ্ডযুক্ত) অঞ্চল অতিরিক্ত থাকলে, 'বার' চোখের (Bar-eye) সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক পুরুষ ড্রসোফিলার '16A' অঞ্চল এক বার থাকে। এই '16A' অঞ্চল দুই বার থাকলে 'বার'-পুরুষ এবং তিন বার থাকলে 'বার-ডাবল' (Bar-double) পুরুষের সৃষ্টি হয়। 'বার'-স্ত্রী ড্রসোফিলায় অসমান ক্রসিং ওভারের ফলে স্বাভাবিক কিংবা 'বার-ডাবল' ড্রসোফিলার সৃষ্টি হয়ে থাকে (চিত্র 119,120)।

Mc Clintock ভুট্টায় জিন Bm-এর দ্বিগুণতা দেখেছিলেন। ভুট্টায় জিন bm হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকলে, পাতায় বাদামী মধ্যশিরার সৃষ্টি হয়। এই জিনের অ্যালীল (allele) Bm-এর উপস্থিতিতে পাতার মধ্যশিরা সবুজ হয়। Mc Clintock দেখেন যে, একটি হোমোজাইগাস bm জিনযুক্ত ভুট্টায় (bm bm) জিন Bm অতিরিক্ত থাকলে, ঐ উদ্ভিদের পাতার মধ্যশিরা সবুজ হয়। এর কারণ হল যে, একটি Bm জিন দু'টি (bm) জিনের ওপর ডমিন্যান্ট। ভুট্টার এই অতিরিক্ত Bm জিনটি একটি ছোট বলয়াকার (ring) ক্রোমোসোমে থাকে। দেহ কোষের মাইটোসিস বিভাজনের সময় এই ক্রোমোসোমের আচরণ অস্বাভাবিক হয়। কখনও কখনও এই ক্রোমোসোমটি লুপ্ত হয়ে যায়, আবার কখনও বা এদের আয়তন পরিবর্তিত হয়। যেসব স্থানের কোষে ঐ ক্রোমোসোমটি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সেসব স্থানের মধ্যশিরা বাদামী হয়। এই বলয়াকার ক্রোমোসোম যদি উদ্ভিদটা খুব ছোট থাকতে বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে সব পাতায় বাদামী মধ্যশিরা দেখা যায়।

দ্বিগুণতার (duplication) ফলে যেহেতু ক্রোমোসোমের কোনও অংশ অতিরিক্ত থাকে, সেজন্য জেনেটিক অনুপাত ব্যাহত হয়, তবে ডিফিসিয়েন্সির তুলনায় ডুপ্লিকেশন অনেক কম ক্ষতিকর। হোমোজাইগাস অবস্থায় ডুপ্লিকেশন বা দ্বিগুণতা থাকলে, দ্বিগুণ অংশটি খুব ছোট না হলে ঐ জীবের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম। প্রকৃতিতে সাধারণত ডুপ্লিকেশন বা দ্বিগুণতা হেটারোজাইগাস অবস্থায় দেখা যায়।

উদ্ভিদে ঘাটতি বা দ্বিগুণতাযুক্ত গ্যামেট অনুর্বর হয়।

ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড ক্রোমোসোমে ব্যাণ্ডের বিন্যাস থেকে দ্বিগুণতা সহজেই বোঝা যায়। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদে মায়োসিসের যুগ্মতা থেকে দ্বিগুণতার উপস্থিতি বোঝা যায় কারণ, কোনও অংশ দ্বিগুণ অবস্থায় থাকলে, ঐ অংশটি ও অনুরূপ অংশের মধ্যে যুগ্মতা হয়।

ডুপ্লিকেশনের ফলে ক্রোমোসোম কমপ্লিমেন্টে অতিরিক্ত জিন সংযুক্ত হয়। এই জিনে মিউটেশন হতে পারে। কখনও কখনও ডুপ্লিকেশন ডিফিসিয়েন্সির ক্ষতিকর প্রভাব রোধ করতে পারে।

ইনভারশন (inversion)

কোনও ক্রোমোসোমের একটা অংশ ভেঙে গিয়ে ঐ অংশটা উল্টোভাবে জোড়া লাগলে তাকে ইনভারশন (inversion) বলে। সাধারণত, একটি ক্রোমোসোমের দুই জায়গায় ভেঙে যায় ও মধ্যবর্তী অংশে ইনভারশন হয়। ABCDEFGH ক্রোমোসোমের DEF অংশটি ভেঙে গিয়ে আবার জোড়া লেগে ABCFEDGH ক্রোমোসোম গঠন করতে পারে অর্থাৎ ইনভারশন হয়। সাধারণত, ক্রোমোসোমের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ইনভারশন হয়। ক্রোমোসোমের প্রান্তে ইনভারশন সচরাচর দেখা যায় না।

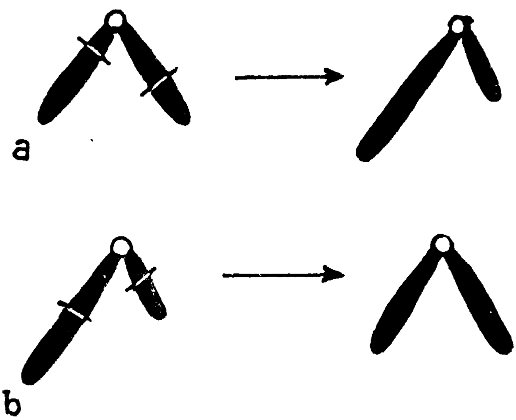
1921 খ্রিস্টাব্দে Strutevant ড্রসোফিলার প্রথম ইনভারশন দেখতে পান। ড্রসোফিলা ছাড়াও অন্যান্য অনেক প্রাণী ও বহু উদ্ভিদ বিশেষত *Tradescantia, Paris, Commelina zebrina, Triticum* ইত্যাদিতে ইনভারশন দেখা গিয়েছে। Sears *Triticum*-এ ইনভারশন ব্রীজ (inversion bridge) লক্ষ্য করেন। কোনও কোনও প্রাণী, যেমন, ফড়িঙের (grass-hopper) কতগুলি প্রজাতি, অ্যানোফিলিস মশা ইত্যাদিতে সাধারণত ইনভারশন দেখা যায় না (White 1951)। ইনভারশনের ফলে কেবল জিনের অবস্থানের পরিবর্তন হয় এবং এর ফলে কোনও কোনও সময় ফেনোটাইপের পরিবর্তন (যেমন, বর্ণবৈচিত্র্য বা variegation) দেখা যায়।

ইনভারশন প্রধানত দুই রকমের হয় — (a) যদি ক্রোমোসোমের একটি বাহুতে ইনভারশনটা সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাকে **প্যারাসেন্ট্রিক** ইনভারশন (paracentric inversion) বলে। এই ইনভারশন বেশি দেখা যায়। Mc Clintock ভুট্টায় এবং Darlington, Stebbins ও অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন জীবে এই ইনভারশন দেখেছিলেন। প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশন থাকলে মায়োসিস বিভাজনের অ্যানাফেজে দ্বিসেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমাটিড ব্রীজ (সেতু) ও সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অংশ দেখা যায় (চিত্র 125)।

যেসব প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশনে ক্রোমোসোমের কেবল একটি বাহুতে ইনভারশন

হয়, তাকে ইন্ট্রারেডিয়েল (intraradial) বা **হোমোব্র্যাকিয়েল** (homobrachial) ইনভারশন বলে। দুইটি প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশন ক্রোমোসোমের দুইটি বাহুতে হলে, ঐ ইনভারশনকে ইন্টাররেডিয়েল (interradial) বা **ব্র্যাকিয়েল** (brachial) ইনভারশন বলে।

(*b*) যেসব ইনভারশনে সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাদের **পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশন** (pericentric inversion) বলে। পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশন প্রতিসম (symmetrical) বা অপ্রতিসম (asymmetrical) হয়। প্রতিসম ইনভারশন ক্ষেত্রে ইনভারশনযুক্ত অঞ্চলের মোটামুটি মাঝে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। কিন্তু অপ্রতিসম ইনভারশনের ক্ষেত্রে সেন্ট্রোমিয়ার মাঝে থাকে না। অপ্রতিসম পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনের জন্যে দেহ কোষের ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন হতে পারে (চিত্র 121)। একটি সমান বাহুযুক্ত V আকৃতির ক্রোমোসোমে যদি সেন্ট্রোমিয়ারের দুই দিকে অসমান দূরত্বে বাহু দু'টি ভেঙে গিয়ে উল্টোভাবে জোড়া লাগে, তবে ঐ ইনভারশনের ফলে J আকৃতির ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার প্রান্তের দিকে থাকবে। আবার একটি J বা I আকৃতির ক্রোমোসোমের থেকে পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনের ফলে V আকৃতির ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হতে পারে।

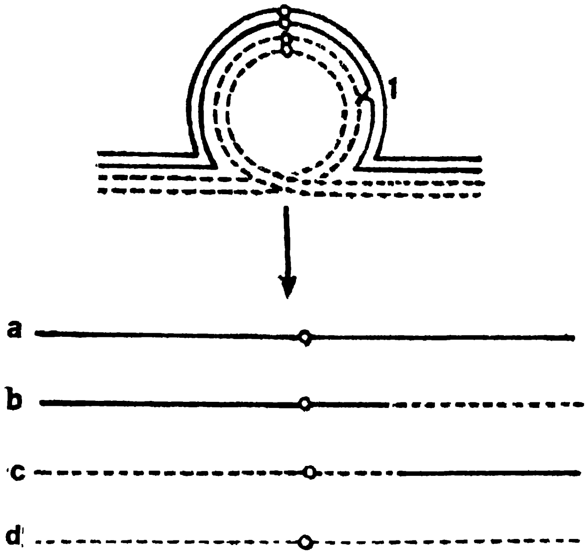


চিত্র—121

পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনের ফলে ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন

পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনে ক্রসিং ওভারের ফলে মায়োসিস বিভাজনের প্রথম মেটাফেজে ব্রীজ ও সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অংশ দেখা যায় না। তবে কোষ বিভাজনের পর দু'টি স্বাভাবিক ও দু'টি পরিবর্তিত ক্রোমোসোম দেখা যায় (চিত্র 122)। শেষোক্ত ক্রোমোসোম দু'টির কোনও অংশের দ্বিগুণতা আবার অন্য অংশের ঘাটতি থাকে। যেসব গ্যামেটে এই রকমের ক্রোমোসোম থাকে, তারা অনুর্বর হয়। পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনে

ডাইসেন্ট্রিক ব্রীজ ও সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন (acentric) ফ্র্যাগমেন্ট দেখা যায় না।



চিত্র—122

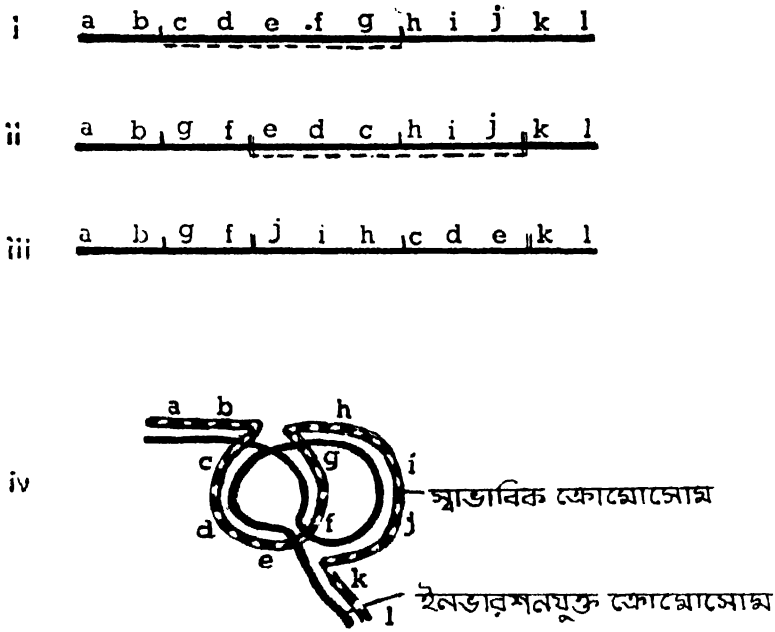
পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনে একটা ক্রসিং ওভারের ফলে দুইটি স্বাভাবিক ও দুইটি পরিবর্তিত ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে

কেবল একটি ক্রোমোসোমে ইনভারশন হলে, তাকে **হোমোসোমাল** (homosomal) ইনভারশন বলে। যদি সমসংস্থ বা হোমোলোগাস ক্রোমোসোম জোড়ার দু'টিতেই ইনভারশন হয়, তাহলে তাকে অ্যাললোসোমাল (allelosomal) ইনভারশন বলে। একটি ক্রোমোসোমের দু'টি বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক ইনভারশন থাকলে, ঐ ইনভারশন স্বাধীনভাবে, অন্তর্ভুক্তভাবে বা উপরিপন্নভাবে থাকতে পারে। Dobzhansky ড্রসোফিলায় বিভিন্ন রকমের ইনভারশনের বর্ণনা দিয়েছেন।

(i) ab cd ef gh ক্রোমোসোমে cd ও fg অংশকে স্বাধীন ইনভারশনের ফলে ab dc e gf h ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। এই ইনভারশনকে কখনও **পাশাপাশি** (adjacent) **ইনভারশনও** বলা হয়।

(ii) ab cd ef gh ক্রোমোসোমে d cd ও ef অঞ্চলে প্রথম ইনভারশনের ফলে a f ed cb gh ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। edc অঞ্চলে দ্বিতীয় ইনভারশন হলে, af cdeb gh ক্রোমোসোম গঠিত হয়। এখানে দ্বিতীয় ইনভারশনটা প্রথম ইনভারশনের মধ্যে থাকে, সেজন্য এই রকমের ইনভারশনকে **অন্তর্ভুক্ত ইনভারশন** (included inversion) বলে।

(iii) ab cd ef gh ক্রোমোসোমের bcd অঞ্চলে একটা ইনভারশনের ফলে a dcb ef gh ক্রোমোসোম গঠিত হয়। bef অঞ্চলে দ্বিতীয় ইনভারশনের ফলে adc feb gh ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। এই ইনভারশন দু'টি ওভারল্যাপিং (overlapping) বা উপরিপন্ন ধরনের। *Drosophila pseudoobscura*-এ এই রকমের ইনভারশন দেখা যায়। কোনও ইনভারশন হেটারজাইগোটে ওভারল্যাপিং ইনভারশন থাকলে ইনভারশন লুপ (loop) জটিল হয় (চিত্র 123)।



চিত্র—123

উপরিপন্ন (overlapping) ইনভারশন। ক্রোমোসোমের গঠন

(i) ইনভারশনের আগে। (ii) প্রথম ইনভারশনের পর, (iii) দ্বিতীয় ইনভারশনের পর,

(iv) উপরিপন্ন ইনভারশন হেটারোজাইগোটের মায়োসিসে জটিল লুপ বা ফাঁস

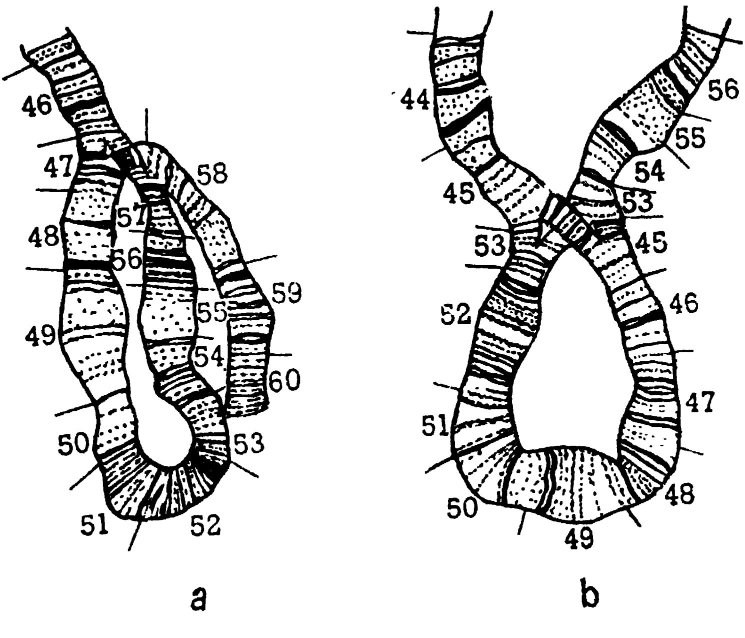
ইনভারশন ছোট বা বড় হয়। Horton 1939 খ্রিস্টাব্দে *Drosophila*-এ একটি বা দু'টি ব্যাণ্ডের খুব ছোট ইনভারশন দেখতে পান। খুব বড় ইনভারশন অনেক সময় ক্রোমোসোমের প্রায় সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ধরে বিস্তৃত থাকে।

হেটারোজাইগাস অবস্থায় ইনভারশন থাকলে, মায়োসিসে এদের আচরণ বিভিন্ন রকমের হয়।

(a) ইনভারশনযুক্ত ক্রোমোসোম এবং এর স্বাভাবিক হোমোলোগ ইউনিভ্যালেন্ট (univalent) হিসাবে থাকে ও এদের মধ্যে যুগ্মতা হয় না। এর ফলে উর্বর গ্যামেটের সৃষ্টি হয়।

(b) ইনভারশনযুক্ত ক্রোমোসোম এবং এর স্বাভাবিক হোমোলোগ যুগ্ম অবস্থান করে, তবে ইনভারশন অঞ্চল ও স্বাভাবিক অঞ্চল যুগ্ম অবস্থান করে না। এই অঞ্চল দু'টি বিপরীত দিকে ফাঁস বা loop গঠন করে। অ্যানাফেজে ক্রোমোসোম দু'টি নিয়মিতভাবে পৃথক হয় ও এর ফলে উর্বর গ্যামেটের সৃষ্টি হয়।

(c) প্যাকিটিনে ইনভারশনযুক্ত ক্রোমোসোম ও এর হোমোলোগাস স্বাভাবিক ক্রোমোসোমের সব অনুরূপ অংশই যুগ্ম অবস্থান করতে চায়। স্বাভাবিক ক্রোমোসোম একটা লুপ (loop) বা ফাঁস গঠন করে ও ইনভারশনযুক্ত ক্রোমোসোম ও এই লুপের ভিতর একটি পেঁচান লুপ বা ফাঁসের সৃষ্টি করে।



চিত্র—124

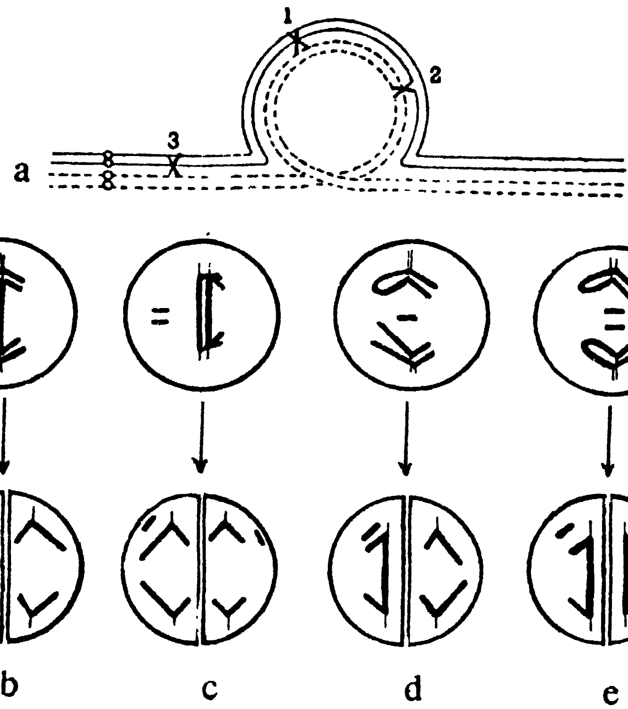
হেটারোজাইগাস ইনভারশনযুক্ত ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের ক্রোমোসোম।

(a) স্বাভাবিক ক্রোমোসোমটা লুপের বাইরের দিকে রয়েছে।

(b) লুপের ভিতরের দিকে স্বাভাবিক ক্রোমোসোমটা রয়েছে

এর ফলে **ইনভারশন লুপ** (inversion loop) (চিত্র 124) গঠিত হয়। প্যারাসেন্ট্রিক এবং পেরিসেন্ট্রিক উভয় রকম ইনভারশনেই ইনভারশন লুপ দেখা যায়। ইনভারশন অঞ্চলের মধ্যে ক্রসিং ওভার সাধারণত হয় না। তবে কখনও কখনও ঐ অংশে একটা বা একাধিক ক্রসিং ওভার হয়। ইনভারশন অংশের দৈর্ঘ্য, অবস্থান এবং ঐ জীবের ক্রসিং ওভার চরিত্রের ওপর ইনভারশন অঞ্চলের ক্রসিং ওভারের হার

নির্ভর করে। ইনভারশন অংশের দৈর্ঘ্য যত বাড়বে, ঐ অঞ্চলে ক্রসিং ওভারের সম্ভাবনা তত বেশি হবে।



চিত্র—125

প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশন হেটারোজাইগোটে ক্রোমোসোমের আচরণ। (a) — ইনভারশন লুপ b, c, d, e, — ইনভারশন লুপের বিভিন্ন স্থানে ক্রসিং ওভার হওয়ার ফলে নানা রকমের ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। উপরের চিত্রগুলিতে প্রথম অ্যানাফেজে এবং নিচের চিত্রগুলিতে দ্বিতীয় অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের আচরণ দেখান হয়েছে।

b — ইনভারশন লুপের 1 অথবা 2 স্থানে ক্রসিং ওভার হয়েছে,

c — ইনভারশন লুপের 1 ও 2 স্থানে ক্রসিং ওভারের ফলে গঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের আচরণ, d–2 ও 3 স্থানে ক্রসিং ওভারের ফলে সৃষ্ট ক্রোমোসোমের আচরণ,

e–1, 2 ও 3 স্থানে ক্রসিং ওভারের ফলে গঠিত ক্রোমোসোমের আচরণ

হেটারোজাইগাস প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশনে (paracentric inversion) ইনভারশন লুপের দু'টি ক্রোমাটিডের মধ্যে কেবল একটি ক্রসিং ওভার হলে একটি দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত বড় ক্রোমাটিড ও একটি সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন ছোট অংশের সৃষ্টি হয়। অন্য দু'টি ক্রোমাটিড যাদের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়নি সেই দু'টি অপরিবর্তিত থাকে (চিত্র 125b)। প্রথম মায়োসিস বিভাজনের অ্যানাফেজে ক্রোমোটিড ব্রীজ (chromatid bridge) বা সেতু গঠিত হয়। সাধারণত, এই সেতু ভেঙে গিয়ে দু'টি ভগ্ন অংশ বিপরীত মেরুতে যায়। কখনও কখনও ইনভারশন ব্রীজ বা সেতু কোনও মেরুতে না গিয়ে দুই মেরুর মাঝখানে থাকে ও পরে বিনষ্ট হয়ে যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে এই সেতু যে কোনও একটি মেরুতে যায় ও এই সব ক্ষেত্রে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে ইনভারশন ব্রীজ স্থায়ী হয়। ক্রসিং ওভারের ফলে সৃষ্ট সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অংশটি পরে বিনষ্ট হয়ে যায়। কোষ বিভাজনের পর চারটি অপত্য কোষের দুইটিতে স্বাভাবিক ও দুইটিতে পরিবর্তিত ক্রোমোসোম থাকে।

ইনভারশন লুপে ক্রস ওভার তিনটি বা চারটি ক্রোমাটিডের মধ্যে হলে, গ্যামেটের উর্বরতা কমে যায়। ইনভারশন লুপের চারটি ক্রোমাটিডের মধ্যে দু'টি ক্রসিং ওভার হলে, অ্যানাফেজে দু'টি ক্রোমাটিড সেতু ও দু'টি ভগ্ন অংশ অর্থাৎ fragment (চিত্র 125c) দেখা যায়। প্রথম অ্যানাফেজে দু'টি সেতুই ভেঙে যায়। দ্বিতীয় অ্যানাফেজ মোটামুটি স্বাভাবিক হয়। কোষ বিভাজনের ফলে সৃষ্ট চারটি অপত্য কোষেই দ্বিগুণতা (duplication) ও ঘাটতি (deficiency) থাকে।

ইনভারশন লুপে তিনটি ক্রোমাটিডের মধ্যে দু'টি ক্রস ওভার হলে, একটি ক্রস ওভারবিহীন (non-crossover) ক্রোমাটিড, একটি ক্রস ওভার ক্রোমাটিড, একটি দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত সেতু (dicentric bridge) ও একটি সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন ভগ্ন অংশের সৃষ্টি হয় (চিত্র 125d)।

চারটি ক্রোমাটিডের মধ্যে তিনটি ক্রসিং ওভার হলে দু'টি দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত সেতু ও দু'টি ফ্র্যাগমেন্টের সৃষ্টি হয় (চিত্র 125d)।

জাইগোটিনে ইনভারশন লুপ ও অ্যানাফেজে ক্রোমাটিড ব্রীজ ও ফ্র্যাগমেন্টের উপস্থিতি থেকে ইনভারশন হেটারোজাইগোট চেনা যায়। তাছাড়া অপ্রতিসম পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনের ফলে ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন হওয়ায় ইনভারশনের উপস্থিতি সহজেই বোঝা যায়। কোনও উদ্ভিদ বা প্রাণীতে হোমোলোগাস ইনভারশন থাকলে দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত সেতু ও ফ্র্যাগমেন্ট দেখতে পাওয়া যায় না এবং এদের মায়োসিসের আচরণও স্বাভাবিক হয়। তবে স্বাভাবিক উদ্ভিদের সাথে ইনভারশন হোমোজাইগোটের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে ইনভারশনের জন্য লিঙ্কেজ মানচিত্র আলাদা হয়। অনেক সময় ফেনোটাইপের পরিবর্তন দেখা যায়। হেটারোজাইগোটে ইনভারশন আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে ক্রসিং ওভার বন্ধ করে দেয়। ক্রস ওভার হলে যেসব গ্যামেটে ক্রস ওভার ক্রোমাটিড

যায়, তারা সাধারণত অনুর্বর হয়। এজন্য ইনভারশন কখনও কখনও সংকরণের পথে বাঁধা হয় ও এভাবে বিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

ইনভারশনের উপস্থিতির জন্য উদ্ভিদে যথেষ্ট পরাগ রেণুর অনুর্বরতা দেখা যায়। ইনভারশনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে। কখনও কখনও একই রকম উদ্ভিদ (বা প্রাণী) বহু দিন ধরে পৃথক অবস্থান করায় এবং বিভিন্ন ধরনের ইনভারশন হওয়ার ফলে, ঐ দুই অঞ্চলের উদ্ভিদকে একই প্রজাতিভুক্ত করা যায় না। ড্রসোফিলার বিভিন্ন প্রজাতির ক্রোমোসোম এই ধারণাকে সমর্থন করে।

কোনও একটি স্থানে যে বাইভ্যালেন্টের চারটি ক্রোমোটিডের কেবল দুইটি ক্রোমোটিডের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়, তার প্রমাণও ইনভারশন থেকে পাওয়া যায়।

ট্র্যান্সলোকেশন (translocation)

ক্রোমোসোমের কোনও অংশের স্থান বদল বা দুইটি ক্রোমোসোমের মধ্যে অংশ বিনিময়কে ট্র্যান্সলোকেশন বলা হয়। Bridges 1903 খ্রিস্টাব্দে *Drosophila melanogaster*-এ ট্র্যান্সলোকেশন প্রথম দেখতে পান। ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে নানা রকমের অস্বাভাবিকতা, অনুর্বরতা ইত্যাদি দেখা যায়।

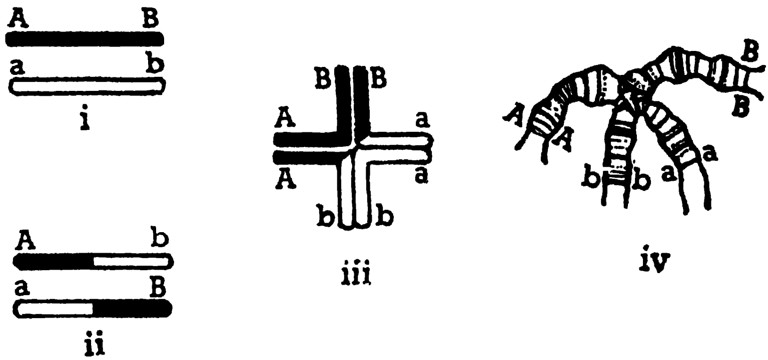
ট্র্যান্সলোকেশন বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন— (a) সরল (simple) ট্র্যান্সলোকেশন, (b) রেসিপ্রোক্যাল (reciprocal) বা পরস্পর বিনিময় ট্র্যান্সলোকেশন (c) শিফট (shift) বা একই ক্রোমোসোমের কোনও অংশের স্থান বদল, (d) সন্নিবিষ্ট ট্র্যান্সলোকেশন (insertion) অর্থাৎ ক্রোমোসোমের মধ্যবর্তী কোনও অংশ ভগ্ন হয়ে ঐ অংশের অন্য ক্রোমোসোমের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে সংযুক্তি এবং (e) রবার্টসোনীয় (robertsonian) ট্র্যান্সলোশেন বা কেন্দ্রীয় সংযোগ (centric fusion)।

(a) **সরল ট্র্যান্সলোকেশন**— এই রকমের ট্র্যান্সলোকেশনে ক্রোমোসোমের প্রান্তের অংশ ভেঙে গিয়ে হোমোলোগাস নয় এমন কোনও ক্রোমোসোমের প্রান্তে যুক্ত হয়। একবীজপত্রী উদ্ভিদে এই ধরনের ট্র্যান্সলোকেশন দেখা যায়। সম্ভবত প্রান্তীয় হেটারোক্রোমাটিনের উপস্থিতি এই প্রক্রিয়াকে সুগম করে। ক্রোমোসোমের কেবল একটি জায়গায় ভেঙে গিয়ে সরল ট্র্যান্সলোকেশন হয়।

(b) রেসিপ্রোক্যাল (reciprocal) বা পরস্পর বিনিময় ট্র্যান্সলোকেশন— হোমোলোগাস নয় এমন দু'টি ক্রোমোসোমের মধ্যে অংশ বিনিময়ের ফলে এই রকম ট্র্যান্সলোকেশন হয়। এই অংশ দু'টি সমান বা অসমান হতে পারে। অসমান হলে নতুন সৃষ্ট ক্রোমোসোমকে সহজেই চেনা যায়। abcde ও fghij দুইটি ক্রোমোসোমের de এবং ij অংশ ভেঙে গিয়ে অংশ বিনিময় করলে, নতুন ক্রোমোসোম দুইটি হবে abcij এবং fghde। এই রকমের ট্র্যান্সলোকেশনকে রেসিপ্রোক্যাল বা পরস্পর বিনিময় ট্র্যান্সলোকেশন (reciprocal translocation) বলে (চিত্র 126)।

(c) শিফট (shift) বা স্থান বদল— কোনও ক্রোমোসোমের একটি বাহুর

মধ্যবর্তী কোনও অংশ ভেঙে গিয়ে ঐ ক্রোমোসোমের ঐ বাহুর অন্য স্থানে বা অন্য বাহুতে যুক্ত হলে, তাকে শিফট (shift) বা স্থান বদল বলা হয়। শিফটের সময়ে ক্রোমোসোমের তিনটি জায়গায় ভেঙে যায়। ভগ্ন অংশ ছোট হলে মায়োসিসে ট্র্যান্সলোকেশনযুক্ত ক্রোমোসোম এবং এর হোমোলোগাস স্বাভাবিক ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতা হয়। তবে হোমোলোগাস নয় এমন অংশগুলি যুগ্ম অবস্থান করে না ও এই অঞ্চলগুলি বাইরের দিকে ফাঁস বা লুপ গঠন করে।



চিত্র—126

রেসিপ্রোক্যাল ট্র্যান্সলোকেশন ;

i—স্বাভাবিক ক্রোমোসোম, ii — ট্র্যান্সলোকেশনের পরের ক্রোমোসোম,

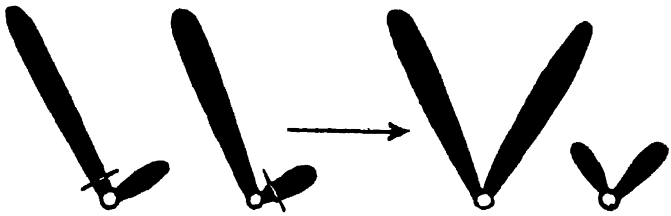
iii —ট্র্যান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটে মায়োসিসে যুগ্মতার ফলে সৃষ্ট ক্রুসাকার ক্রোমোসোম জোট নক্সাকারে দেখান হয়েছে,

iv — ট্র্যান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটে মায়োসিসে স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড ক্রোমোসোমের যুগ্মতা

(d) সন্নিবিষ্ট ট্র্যান্সলোকেশন (insertion)— এই রকমের ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে একটি ক্রোমোসোমের মধ্যবর্তী কোনও অংশ ভেঙে গিয়ে অন্য ক্রোমোসোমের মধ্যবর্তী কোনও অঞ্চলে যুক্ত হয়। ভগ্ন অংশটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত হলে, যে ক্রোমোসোমের মধ্যবর্তী অঞ্চলটা ভেঙে গিয়েছে, সেখানে ঘাটতি এবং এর হোমোলোগে (যার সাথে অংশটি যুক্ত হয়েছে) দ্বিগুণতা দেখা যায়। ভগ্ন অংশটি হোমোলোগাস নয় এমন ক্রোমোসোমের সাথেও যুক্ত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ভগ্ন অংশের পরিমাণের ওপর ক্রোমোসোমের আচরণ নির্ভর করে।

(e) রবার্টসোনীয় (robertsonian) ট্র্যান্সলোকেশন বা কেন্দ্রীয় সংযোগ (centric fusion)— এটা একটি বিশেষ ধরনের রেসিপ্রোক্যাল ট্র্যান্সলোকেশন। দু'টি প্রান্তীয় সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত (telocentric) ক্রোমোসোমের মধ্যে সংযোগ কিম্বা উপপ্রান্তীয় সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত (acrocentric) ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে মধ্যবর্তী সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত (metacentric) ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। মানুষে এই রকমের ট্র্যান্সলোকেশন দেখা যায়। J আকৃতির দু'টি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের একটির দীর্ঘ বাহুতে ও অন্যটির ক্ষুদ্র বাহুতে

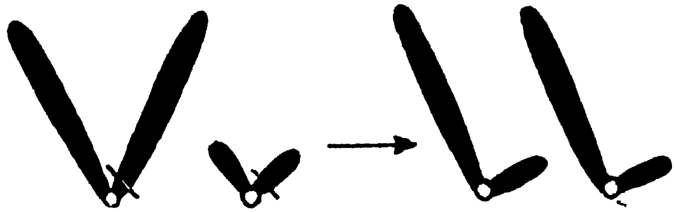
সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের অঞ্চলে ভেঙে গিয়ে অসমান অংশ বিনিময়ের ফলে একটি দীর্ঘ V-আকৃতির ক্রোমোসোমে ও একটি খুব ছোট ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হতে পারে (চিত্র 127)।



চিত্র—127

দু'টি অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোমের মধ্যে রবার্টসোনীয় ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে একটি V-আকৃতির ও একটি খুব ছোট ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে

এই ছোট ক্রোমোসোম যদি প্রধানত হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে গঠিত থাকে, তবে তা সহজেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া দু'টি J-আকৃতির ক্রোমোসোমের ক্ষুদ্র বাহুতে সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের জায়গায় ভেঙে গিয়ে ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে একটি দ্বিসেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোমের এবং একটি সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অংশের সৃষ্টি হতে পারে। দ্বিসেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোমটির সেন্ট্রোমিয়ার দু'টি খুব কাছে থাকলে এরা একটি সেন্ট্রোমিয়ারের মতন আচরণ করতে পারে।



চিত্র—128

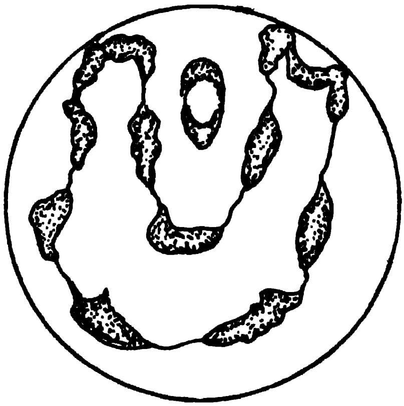
একটি V-আকৃতির ক্রোমোসোমের সাথে একটি ছোট ক্রোমোসোমের অসমান অংশের ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে দু'টি অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে

কেন্দ্রীয় সংযোগের বিপরীত প্রক্রিয়া হল, কেন্দ্রীয় ফিশন (fission) বা বিযুক্ততা (dissociation)। একটি দীর্ঘ মেটাসেন্ট্রিক বা V-আকৃতির ক্রোমোসোমের সাথে একটি ছোট ক্রোমোসোমের অসমান অংশের ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে দু'টি অ্যাক্রোসেন্ট্রিক (acrocentric) বা J-আকৃতির ক্রোমোসোমের (চিত্র 128) সৃষ্টি হতে

পারে। এই রকমের ট্র্যান্সলোকেশনকে বিযুক্ততা (dissociation) বা কেন্দ্রীয় ফিশন (centric fission) বলে। কোনও কোনও উদ্ভিদে ও অনেক প্রাণীর বিবর্তনে কেন্দ্রীয় সংযোগ বা কেন্দ্রীয় ফিশনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় সংযোগ এবং কেন্দ্রীয় ফিশনের ফলে ক্রোমোসোমের আকৃতির এবং কখনও কখনও ক্রোমোসোমের সংখ্যার পরিবর্তন হয়।

ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে নতুন ক্রোমোসোমের একটি সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন ও অন্যটি দ্বিসেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত হ'লে, কোষ বিভাজনের সময় এদের আচরণ অস্বাভাবিক হয় ও এরা সহজেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

হোমোলোগাস (সমসংস্থ) নয় এমন দু'টি ক্রোমোসোমের মধ্যে অংশ বিনিময়ের ফলে ট্র্যান্সলোকেশনের সৃষ্টি হতে পারে।



চিত্র—129

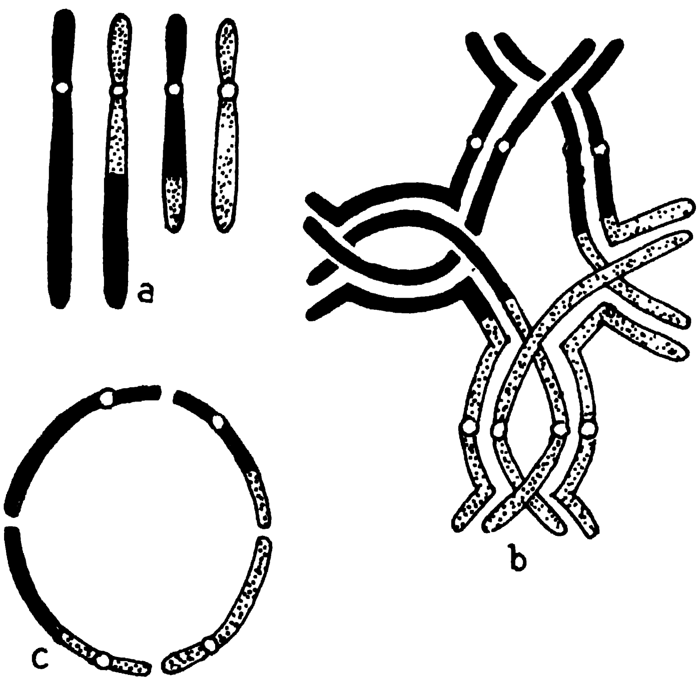
Oenothera lamarckiana - এ ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে সৃষ্ট বলয়াকার ক্রোমোসোম জোট

স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও প্রাণী গোষ্ঠীতে ট্র্যান্সলোকেশন পাওয়া যায়, তবে এদের সংখ্যা খুব কম। কৃত্রিম উপায়ে রঞ্জন রশ্মি ও বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগ করে অনেক উদ্ভিদে ট্র্যান্সলোকেশন পাওয়া গিয়েছে। Belling ও Blakeslee (1924) ধুতরার বিভিন্ন ধরনের ট্র্যান্সলোকেশন নিয়ে গবেষণা করেছেন। ট্র্যান্সলোকেশন হোমোজাইগোটে মায়োসিসের আচরণ স্বাভাবিক হয়, সেজন্য ট্র্যান্সলোকেশনের উপস্থিতি সহজে বোঝা যায় না। তবে ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে লিঙ্কেজ গ্রুপের (linkage group) পরিবর্তন হয় বলে, এই রকমের অস্বাভাবিকতা জেনেটিক পরীক্ষা থেকে বোঝা যায়। ট্র্যান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটের মায়োসিসের আচরণ অস্বাভাবিক হয় ও এই সময় ক্রুসাকার (চিত্র 126), বলয়াকার ও শৃঙ্খলাকার (cross, ring, chain) ক্রোমোসোম জোট দেখা যায়। কোনও উদ্ভিদে এই রকমের বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোসোম জোটের উপস্থিতি থেকে বলা যায় যে, ঐ উদ্ভিদটি হল ট্র্যান্সলোকেশন

হেটারোজাইগোট। *Rhoeo discolor, Oenothera lamerckiana, Datura stramonium* ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্ভিদে মায়োসিস বিভাজনের সময় রিঙ (ring) বা বলয়াকার ক্রোমোসোম জোট (চিত্র 129) দেখা গিয়েছে।

ট্র্যান্সলোকেশন খুব ছোট না হলে, ঐ অংশে এক বা একাধিক কায়েসমার সৃষ্টি হয়। কায়েসমার সংখ্যা ও অবস্থানের ওপর মেটাফেজ ক্রোমোসোমের আকৃতি নির্ভর করে। প্রত্যেক বাহুতে অন্তত একটি কায়েসমা গঠিত হলে ও কায়েসমার প্রান্তিকরণ (terminalization) সম্পূর্ণ হলে মেটাফেজে রিঙ বা বলয় দেখা যায় (চিত্র 130c)। কায়েসমার প্রান্তিকরণ অসম্পূর্ণ হলে ক্রুসাকৃতির (চিত্র 130b) ক্রোমোসোমের জোট দেখা যায়। কোনও একটি বাহুতে যদি কায়েসমা গঠিত না হয়, তবে চারটি ক্রোমোসোমের একটি শৃঙ্খল (chain) পাওয়া যায়।

সাধারণত অ্যানাফেজে বলয়াকার বা শৃঙ্খলাকার ক্রোমোসোম জোটের একটি ক্রোমোসোম এক মেরুতে ও তার পাশের ক্রোমোসোম বিপরীত মেরুতে



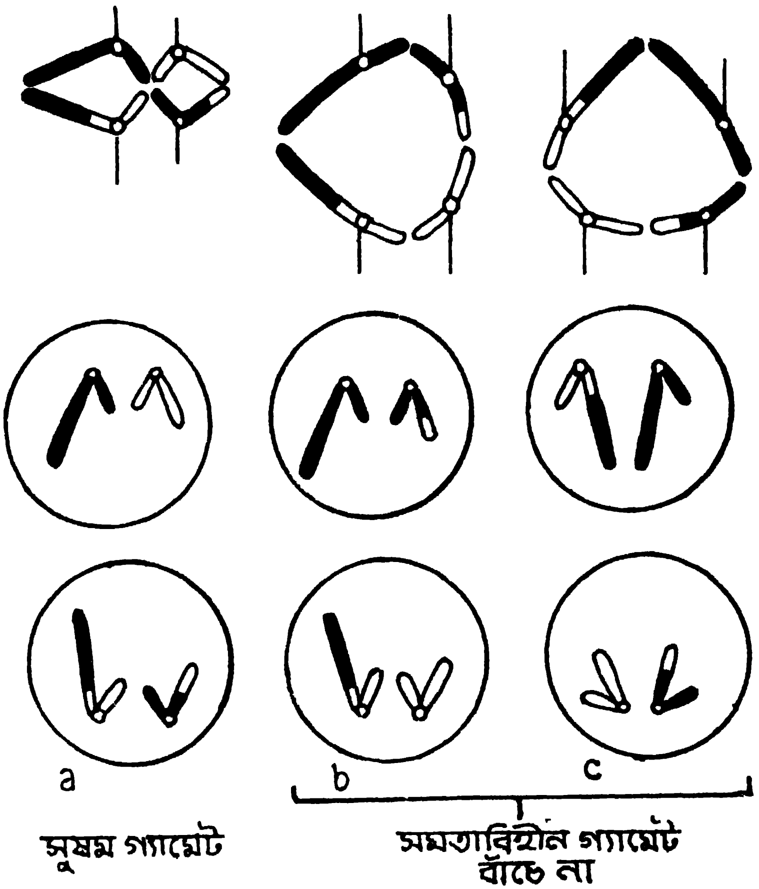
চিত্র—130

a— ট্র্যান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটে দু'টি স্বাভাবিক ও দু'টি পরিবর্তিত ক্রোমোসোম,

b— ডিপ্লোটিন অবস্থায় প্রত্যেক ক্রোমোসোমে দু'টি ক্রোমোটিড থাকে। এখানে বিভিন্ন ক্রোমাটিডের মধ্যে কয়েকটি কায়েসমা গঠিত হয়েছে

c— মেটাফেজ অবস্থায় কায়েসমার প্রান্তিকরণ সম্পূর্ণ হলে একটি বলয় বা রিঙ দেখা যায়

যায়। এর ফলে একটি মেরুতে দু'টি স্বাভাবিক ক্রোমোসোম ও অন্য মেরুতে দু'টি ট্র্যান্সলোকেশনযুক্ত ক্রোমোসোম থাকে (চিত্র 131a)। এখানে অপত্য কোষ দু'টির কোনওটাতে ক্রোমোসোমের কোনও অংশের ঘাটতি বা দ্বিগুণতা না থাকায়, গ্যামেটগুলি উর্বর হয় এবং এদের সমতাপূর্ণ বা সুষম (balanced) গ্যামেট বলা হয়।



চিত্র—131

অ্যানাফেজে বলয়াকার ক্রোমোসোম জোড়ের বিভিন্ন রকমের পৃথকীকরণের ফলে নানা রকমের গ্যামেটের সৃষ্টি হয়েছে

এছাড়া কোনও কোনও সময় পাশাপাশি ক্রোমোসোম একটি মেরুতে যেতে পারে। a, b, c, d চারটি ক্রোমোসোমের a, c স্বাভাবিক ও b, d ট্র্যান্সলোকেশনযুক্ত ক্রোমোসোম হলে অ্যান্যাফেজে ক্রোমোসোমগুলির বন্টন বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

(i) a,c এক মেরুতে এবং b, d অন্য মেরুতে গেলে সুষম গ্যামেট তৈরি হয় (চিত্র 131a)।

(ii) পাশাপাশি দু'টি ক্রোমোসোম অর্থাৎ a,b একটি মেরুতে এবং c, d অন্য মেরুতে যেতে পারে (চিত্র 131b)।

(iii) b, c একটি মেরুতে এবং a,d অন্য মেরুতে যেতে পারে (চিত্র 131c)।

শোষোক্ত দু'টি উপায়ে সৃষ্ট গ্যামেটগুলি অনুর্বর হয় এবং এদের সমতাবিহীন (বা unbalanced) গ্যামেট বলা হয়। এভাবে সৃষ্ট প্রত্যেক গ্যামেটেই ক্রোমোসোমের কোনও অংশের ঘাটতি আবার অন্য কোনও অংশের দ্বিগুণতা থাকে।

অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের বন্টন যদৃচ্ছভাবে হলে কেবল এক তৃতীয়াংশ গ্যামেট (i ধরনের) উর্বর হয়। তবে ভুট্টা এবং ড্রসোফিলার গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, অ্যানাফেজের বন্টন এমন ভাবে হয় যাতে বেশি সংখ্যায় উর্বর গ্যামেট তৈরি হতে পারে। ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে সৃষ্ট বলয়টা (ring) যত নমনীয় হবে, ততই পর্যায় ক্রমিক পৃথকীকরণের সম্ভাবনা বাড়বে। অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের বন্টন ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য, ট্র্যান্সলোকেশনের স্থান, কায়েসমার সংখ্যা ও অবস্থান, কায়েসমার প্রান্তিকরণ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

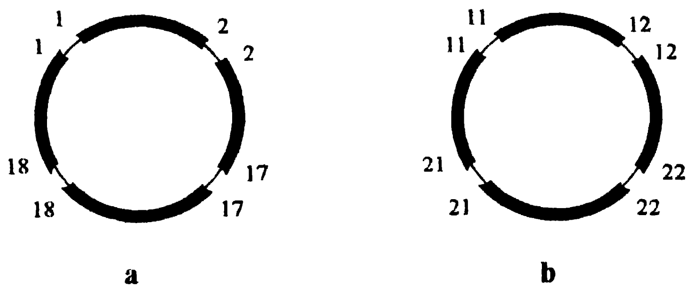
ট্র্যান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটে স্বপরাগযোগ হলে তিন রকমের উদ্ভিদ 1.2:1 অনুপাতে পাওয়া যায়। এই উদ্ভিদগুলি হল যথাক্রমে, ট্র্যান্সলোকেশনবিহীন স্বাভাবিক হোমোজাইগোট, ট্র্যান্সলোকেশন হেটারোজাইগোট এবং ট্র্যান্সলোকেশন হোমোজাইগোট। প্রথম ও তৃতীয় ধরনের উদ্ভিদের মায়োসিসের আচরণ স্বাভাবিক হয় ও এর ফলে উদ্ভিদটি উর্বর হয়। দ্বিতীয় ধরনের উদ্ভিদের মায়োসিসে বলযাকার, শৃঙ্খলাকার বা ক্রুসাকৃতির ক্রোমোসোম জোট দেখা যায় ও এরা আংশিকভাবে উর্বব ও এরকম উদ্ভিদে কম বীজ উৎপন্ন হয়।

Datura, Oenothera, Pisum, Paeonia, Tradescantia, Triticum, Zea প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদে এবং ফড়িং ও অন্যান্য প্রাণীতে ট্র্যান্সলোকেশন দেখা গিয়েছে। Blakeslee ধুতরায় বিভিন্ন ধরনের ট্র্যান্সলোকেশন দেখতে পান। ধুতরার ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল 2n = 12। এই বারো জোড়া ক্রোমোসোমকে দু'টি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয় (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24)। *Datura stramonium*-এর (ধুতরা) যেসব বিভিন্ন রকমের গাছ দেখতে পাওয়া যায় তাদের 'প্রাইম টাইপ' (prime type) বলে। প্রাইম টাইপ থেকে একটা ট্র্যান্সলোকেশনের মাধ্যমে সৃষ্ট উদ্ভিদকে 'উদ্ভুত প্রাইম টাইপ' (derived prime type) বলে। দুই বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদকে সেকেণ্ডারী টাইপ (secondary type) বলা হয়।

'প্রাইম টাইপ একে'র মায়োসিসে বারো জোড়া স্বাভাবিক ক্রোমোসোম থাকে। প্রাইম টাইপ এক এবং দুইয়ের মধ্যে সংকরণ করলে সংকর উদ্ভিদের প্রথম মায়োসিস

বিভাজনের সময় দশ জোড়া ক্রোমোসোম বাইভ্যালেন্ট গঠন করে ও বাকী চারটি ক্রোমোসোম একটা বলয় (ring) গঠন করে। 'প্রাইম টাইপ দুইয়ের' দুইটি ক্রোমোসোমের মধ্যে ট্র্যান্সলোকেশন হওয়ার ফলে এরা প্রাইম টাইপ একের ক্রোমোসোম থেকে আলাদা হয়। 1–2 ও 17–18 ক্রোমোসোমের 2 ও 18 প্রান্ত দুইটির মধ্যে ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে 1–18 এবং 17–2 ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাইম টাইপ এক ও দুইয়ের থেকে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদের বলয়াকার ক্রোমোসোম জোট চিত্র 132a-তে দেখান হয়েছে। প্রাইম টাইপ দুইয়ের মায়োসিস বিভাজনের সময় কোনও রিঙ পাওয়া যায় না অর্থাৎ, এই উদ্ভিদটি হল ট্র্যান্সলোকেশন হোমোজাইগোট (translocation homozygote)।

প্রাইম টাইপ তিনের মায়োসিসেও ক্রোমোসোমগুলি যুগ্ম অবস্থান করে। এই উদ্ভিদের সাথে প্রাইম টাইপ একের সংকবণ করলে দশটি বাইভ্যালেন্ট ও চারটি ক্রোমোসোমের একটি রিঙ পাওয়া যায়। সুতরাং, প্রাইম টাইপ তিন হল ট্র্যান্সলোকেশন হোমোজাইগোট। প্রাইম টাইপ দুই ও তিনের ট্র্যান্সলোকেশনটি এক কিনা দেখবার জন্য এই দু'টি উদ্ভিদের মধ্যে সংকরণ করা হয়। এই সংকর উদ্ভিদের মায়োসিসে আটটি বাইভ্যালেন্ট ও চারটি ক্রোমোসোম দিয়ে তৈরি দু'টি রিঙ দেখা যায়। সুতরাং, প্রাইম টাইপ দুই ও তিনের ট্র্যান্সলোকেশন দু'টি আলাদা। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, প্রাইম টাইপ তিনের পরিবর্তিত ক্রোমোসোম দু'টি হল 11–21 এবং 12–22। প্রাইম টাইপ তিনের সাথে প্রাইম টাইপ একের সংকরণের ফলে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদের মায়োসিসের বলয়টা চিত্র 132b অনুযায়ী হয়।

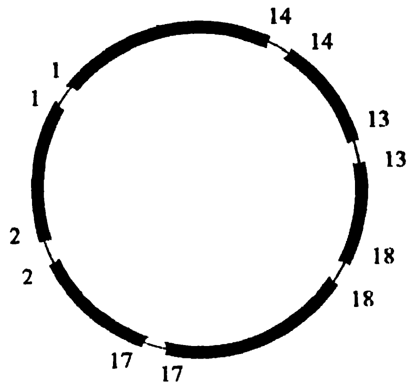


চিত্র– 132

ধুতরায় বিভিন্ন ক্রোমোসোমের মধ্যে ট্র্যান্সলোশেনের ফলে গঠিত বলয় (ring):
a – 1–2 এবং 17–18 ক্রোমোসোম দু'টির মধ্যে ট্র্যান্সলোকেশন হয়েছে, b – 11–12 ও 21–22 ক্রোমোসোমের মধ্যে ট্র্যান্সলোকেশন হয়েছে

প্রাইম টাইপ এক এবং সেকেন্ডারী টাইপ চুরানববইয়ের মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদের মায়োসিসে নয়টি বাইভ্যালেন্ট ও ছয়টি ক্রোমোসোমের একটি

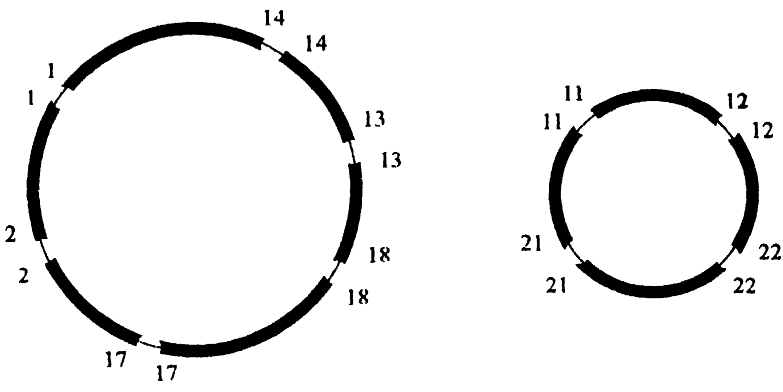
রিঙ পাওয়া যায়। সেকেণ্ডারী টাইপ 94-এ ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে সৃষ্ট ক্রোমোসোমগুলি হল 1–14, 13–18 ও 17–2 অর্থাৎ, এখানে দুই বার ট্র্যান্সলোকেশন হয়েছে। এই উদ্ভিদের সাথে প্রাইম টাইপ (prime type) একের সংকরণের ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদের মায়োসিসে ছয়টি ক্রোমোসোমের রিঙ (চিত্র 133) পাওয়া যায়।



চিত্র—133

ধুতরায় বিভিন্ন ক্রোমোসোমের (1-2, 13-14, 17 18) মধ্যে ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে গঠিত বলয়

প্রাইম টাইপ দুই ও চুরানব্বইয়ের মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদের মায়োসিসে দশটি বাইভ্যালেন্ট ও চারটি ক্রোমোসোম দিয়ে গঠিত একটা রিঙ পাওয়া যায়।



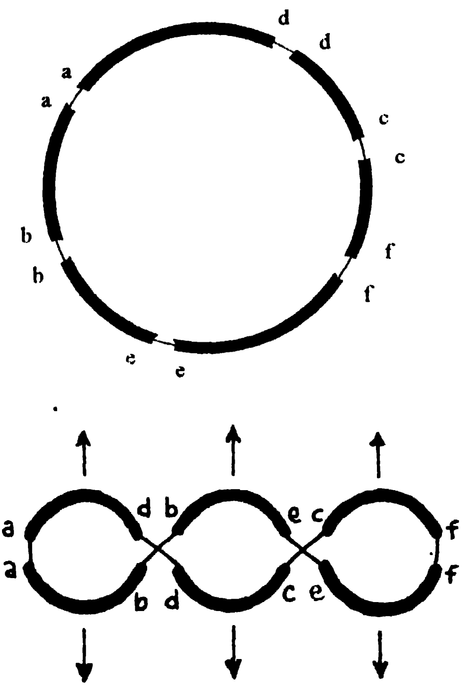
চিত্র—134

ধুতরায় বিভিন্ন ক্রোমোসোমের মধ্যে ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে সৃষ্ট একটি ছয়টি ক্রোমোসোন ও আরেকটি চারটি ক্রোমোসোম দিয়ে গঠিত বলয়

প্রাইম টাইপ তিন ও চুরানব্বই থেকে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদের মায়োসিসে সাতটি বাইভ্যালেন্ট, একটি চার ক্রোমোসোমের রিঙ ও একটি ছয় ক্রোমোসোমের রিঙ

(চিত্র 134) পাওয়া যায়। ধুতরায় কায়েসমার প্রান্তিকরণ (terminalization) প্রায় সম্পূর্ণ হয় বলে অ্যানাফেজে বলয়াকার ক্রোমোসোম জোটের একটি ক্রোমোসোম এক মেরুতে, তার পাশের ক্রোমোসোম বিপরীত মেরুতে পর্যায়ক্রমে যায়। এজন্য গ্যামেটগুলি উর্বর হয়।

সুতরাং, সংকরণ করে কোনও উদ্ভিদের ট্র্যান্সলোকেশন চেনা সম্ভব। হোমোলোগাস নয় এমন দু'টি ক্রোমোসোমের মধ্যে একটি ট্র্যান্সলোকেশনযুক্ত ক্রোমোসোমের সাথে অন্য আরেকটি ক্রোমোসোমের ট্র্যান্সলোকেশন (দ্বিতীয়) হলে একটি ছয় ক্রোমোসোমের (চিত্র 135) রিঙের সৃষ্টি হয়। এই ট্র্যান্সলোকেশনযুক্ত ক্রোমোসোমের কোনওটির সাথে আরেকটি ক্রোমোসোমের তৃতীয় ট্র্যান্সলোকেশন হলে আট ক্রোমোসোমের রিঙ বা বলয়ের সৃষ্টি হয়। এভাবে অনেকগুলি ট্র্যান্সলোকেশন হলে কোষের সব ক্রোমোসোম



চিত্র—135

দু'বার ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে একটি ছয়টি ক্রোমোসোম দিয়ে গঠিত বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই বলয়টা পরে পেঁচিয়ে যাওয়ার ফলে পর্যায়ক্রমিক পৃথকীকরণের সুবিধা হয়েছে

দিয়ে তৈরি একটা বড় রিঙ পাওয়া যায় ও এটিকে ট্র্যান্সলোকেশন কমপ্লেক্স (translocation complex) বলে। *Rhoeo discolor*-এ (2n=12) 12 টি ক্রোমোসোম দিয়ে তৈরি একটি রিঙ বা বলয় পাওয়া গিয়েছে।

Oenothera-এ de Vries বিভিন্ন ধরনের ট্র্যান্সলোকেশন পেয়েছিলেন। *O.hookeri*-র ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 2n=14। এখানে মায়োসিসে সাতটি বাইভ্যালেন্ট দেখা যায়। *Oenothera*-র অন্যান্য প্রজাতিতে চারটি ক্রোমোসোমের রিঙ থেকে আরম্ভ করে চোদ্দটি ক্রোমোসোমের রিঙও দেখতে পাওয়া যায় (চিত্র 129)।

বিভিন্ন রকম ট্র্যান্সলোকেশনের উপস্থিতির ভিত্তিতে *Oenothera*-র বিভিন্ন প্রজাতিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। (a) যেসব প্রজাতিতে বাইভ্যালেন্ট বা ছোট রিঙ দেখা যায়, তাদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, (*O. argillicola, O. grandiflora* এবং *O. hookeri*)। (b) দ্বিতীয় শ্রেণীর *Oenothera*-এ বিভিন্ন আয়তনের রিঙ দেখা যায়। এই রিঙগুলি স্থায়ী নয়। কিন্তু এরকম রিঙযুক্ত উদ্ভিদের অভিযোজন ক্ষমতা বেশি হয় বলে, এগুলি রয়ে গেছে. যেমন, *O.irrigua*-এ। (c) তৃতীয় শ্রেণীর *Oenothera* হল স্থায়ীভাবে ট্র্যান্সলোকেশন হেটারোজাইগোট। এখানে 14টি ক্রোমোসোমের রিঙ দেখা যায়, যেমন *O. biennis, O. parviflora* এবং *O. strigosa* ইত্যাদি। সমতাযুক্ত (balanced) লীথ্যাল প্রক্রিয়ার ফলে স্থায়ী সংকর অবস্থা সংরক্ষিত হয়। সম্পূর্ণ রিঙ গঠিত হয় এবং পর্যায়ক্রমিক পৃথকীকরণেব (seggregation) ফলে কেবল দুই রকমের গ্যামেট উৎপন্ন হয়। গ্যামেট এবং জাইগোটে লীথ্যাল অবস্থার জন্য কেবল ট্র্যান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটগুলি বেঁচে থাকে।

ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে কখনও কখনও নতুন ভ্যারাইটি বা নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে। ড্রসোফিলার বিভিন্ন প্রজাতির ক্রোমোসোম লক্ষ্য করলে বিবর্তনে ট্র্যান্সলোকেশনের গুরুত্ব বোঝা যায়। *Drosophila virilis*-এর ক্যারিওটাইপে পাঁচ জোড়া সোজা rod আকৃতির ক্রোমোসোম এবং এক জোড়া ছোট্ট গোলাকার (dot) ক্রোমোসোম দেখা যায়। ড্রসোফিলার এই প্রজাতি প্রাচীন বলে মনে করা হয়। X-ক্রোমোসোম ও একটি অটোসোমের মধ্যে ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে এক জোড়া V-আকৃতির X-ক্রোমোসোম, তিন জোড়া rod আকৃতির ও এক জোড়া ছোট্ট গোলাকার (dot) অটোসোমবিশিষ্ট *D. persimilis* ও *D. pseudo-obscura*-র সৃষ্টি হয়েছে। আরো দু'টি ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে *D. willistonoi*-র সৃষ্টি হয়েছে। এখানে দু'টি সোজা রড আকৃতির অটোসোমীয় ক্রোমোসোমে ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে V-আকৃতির অটোসোমের সৃষ্টি হয়েছে। *D. melanogaster*-এর উদ্ভব হয়েছে *D. virils* থেকে দু'টি ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে। এই ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে চারটি রড (rod) আকৃতির ক্রোমোসোম থেকে দুইটি V-আকৃতিব অটোসোমের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, *D. melanogaster*-এ দুই জোড়া V-আকৃতির, এক জোড়া ছোট্ট ডট আকৃতির অটোসোম ও দুইটি রড আকৃতির সেক্স ক্রোমোসোম দেখা যায়।

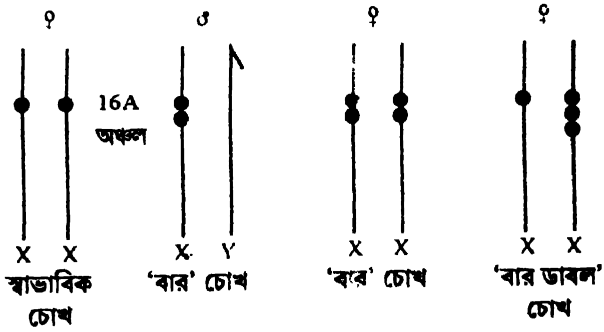
অবস্থানের প্রভাব (position effect)

1925 খ্রিস্টাব্দে *Drosophila*-র "বার" (Bar) চরিত্রের ওপর গবেষণা করে

Sturtevant অবস্থানের প্রভাব বা position effect প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন। এর পর বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ *Drosophila* (:ewos '50. '51,'52,'55; Green'49,' 54, '55) এবং ভুট্টায় (Mc Clintock '51,'53) অবস্থানের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।

ট্র্যান্সলোকেশন কিম্বা ইনভারশনের ফলে ক্রোমোসোমীয় পদার্থের কোনও লাভ বা লোকসান হয় না। এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে কেবল কোনও কোনও জিনের পুনর্বিন্যাস হয় এবং এজন্য কখনও কখনও ফেনোটাইপের (phenotype) পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনকে অবস্থানের প্রভাব বা পোজিশন এফেক্ট বলে। প্রত্যেক জিন প্রতিবেশী জিনের সাথে একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। জিনের বিন্যাসের কোনও পরিবর্তন হলে এই ভারসাম্য ব্যহত হয়। সুতরাং, ফেনোটাইপ কেবল জিনের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে তাই নয়, জিনের অবস্থানও ফেনোটাইপকে প্রভাবিত করে।

যদি কোনও স্ত্রী ড্রসোফিলার দু'টি X-ক্রোমোসোমের প্রতিটিতে একটি 16A অংশ থাকে, তবে ঐ ড্রসোফিলার চোখ সাধারণ হয়। পুরুষ ড্রসোফিলার একটি ক্রোমোসোম থাকে ও ঐ ক্রোমোসোমে যদি দু'টি 16A অংশ থাকে, তবে 'বার-চোখের' (Bar-eye) সৃষ্টি হয়। সুতরাং, যদিও দু'টি ক্ষেত্রেই 16A অঞ্চল দু'বার আছে, কিন্তু এদের বিন্যাসের বিভিন্নতার জন্য ফেনোটাইপের পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। কোনও ড্রসোফিলায় একটি ক্রোমোসোমে পরপর তিন বার 16A অংশ থাকলে, 'বার ডবল' (bar-double) চোখের সৃষ্টি হয়। অন্য X-ক্রোমোসোমে যদি একটি 16A অংশ থাকে তাহলেও 'বার-ডাবল' চোখের সৃষ্টি হয়। এই সংখ্যক অর্থাৎ চারটি 16A অঞ্চল হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকলে, বার-ডাবল চোখের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং, ড্রসোফিলায় 16A অঞ্চলের অবস্থান ফেনোটাইপকে প্রভাবিত করে (চিত্র 136)।



চিত্র—136

ড্রসোফিলায় X- ক্রোমোসোমে 16A অঞ্চল একবার থাকলে স্বাভাবিক চোখ, পরপর দুই বার থাকলে 'বার' চোখ এবং পরপর তিনবার থাকলে 'বার-ডাবল' চোখের সৃষ্টি হয়

স্বাভাবিক ও রোমশ পাখাযুক্ত (hairy wing) ড্রসোফিলার ওপর পরীক্ষা থেকেও

অবস্থানের প্রভাব বোঝা যায়। X-ক্রোমোসোমের একটা ব্যাণ্ডের দ্বিগুণতার জন্য রোমযুক্ত পাখার সৃষ্টি হয়। X-ক্রোমোসোমে নিদিষ্ট ব্যাণ্ডটা একবার থাকলে পতঙ্গটার পাখায় রোম থাকে না। স্ত্রী পতঙ্গের দুইটি X-ক্রোমোসোমের প্রত্যেকটাতে ঐ ব্যাণ্ডটা একটি করে (অর্থাৎ মোট দুইটি) থাকলে ঐ ড্রসোফিলার পাখা স্বাভাবিক হয়। কিন্তু হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাসে কোনও অবস্থায় একটা X-ক্রোমোসোমে নির্দিষ্ট ব্যাণ্ড পরপর দুই বার থাকলে পাখায় রোমের সৃষ্টি হয়। এর থেকে কোনও চরিত্রের ওপর জিনের অবস্থানের প্রভাব প্রমাণিত হয়।

ভুট্টায়ও অবস্থানের প্রভাব লক্ষ্য করা হয়েছে। কোনও কোনও ভুট্টার নবম ক্রোমোসোমের দু'টি স্থান জিনের কাজকে প্রভাবিত করে। এই দু'টি স্থান হল activator (Ac) বা সক্রিয়কারী ও dissociation (Ds) বা বিযুক্ত। Ac ও Ds স্থান দু'টি হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরি। একটা নিউক্লিয়াসে Ac ও Ds দু'টি স্থানই উপস্থিত থাকলে ক্রোমোসোমগুলি সহজেই ভেঙে যায় অর্থাৎ অস্থায়ী হয় এবং ক্রোমোসোমের মিউটেশনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। Ds স্থান Ac-র অনুপস্থিতিতে কাজ করতে পাবে না। Ac-ব উপস্থিতিতে Ds-র দু'টি ধর্ম লক্ষ্য করা যায়, এগুলি হল—

(a) Ds অংশে ক্রোমোসোম সহজেই ভেঙে যায় এবং প্রান্তের ভগ্ন অংশ বিনষ্ট হযে যায়।

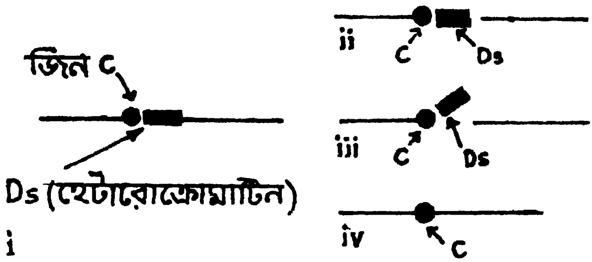
(b) Ds পাশেব জিনগুলিকে প্রভাবিত করে।

Ac স্থানটি অস্থাযী এবং বিভিন্ন ধরনের হয়। Ds স্থানটি নানা রকমের হয়। Ac ও Ds একই ক্রোমোসোমের বিভিন্ন স্থানে কিম্বা অন্য ক্রোমোসোমে স্থানান্তরিত হতে পাবে। Ac ও Ds-এব প্রভাবে ফেনোটাইপের পরিবর্তন হয়ে থাকে। নবম ক্রোমোসোমের মোমযুক্ত চরিত্রের নিয়ন্ত্রক জিন Wx (waxy) Ds স্থানেব পাশে থাকলে, ঐ চরিত্র প্রকাশ না পেয়ে প্রচ্ছন্ন বা বিসেসিভ চরিত্র দেখা যায়। Wx জিন Ds-ব কাছ থেকে সরে গেলে আবার ডমিন্যান্ট বা প্রবল চবিত্র (মোমযুক্ত) প্রকাশ পায়। ভুট্টার জিন C-র উপস্থিতিতে বর্ণযুক্ত অ্যালিউরোন (coloured aleourone) এবং জিন c-র উপস্থিতিতে বর্ণহীন অ্যালিউরোন তৈরি হয়। বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে যে, Ds স্থান জিন C-র পাশে থাকলে বর্ণহীন অ্যালিউরোন গঠিত হয়। জিন C Ds-এর পাশে না থাকলে বর্ণযুক্ত অ্যালিউরোন তৈরি হয় (চিত্র 137)। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, (i) Ds কোনও জিনের পাশে না থাকলে ঐ জিন যথাযথভাবে কাজ কবতে পারে। ভুট্টার ট্রিপ্লয়েড সস্যে (এণ্ডোস্পার্মে) 0–5 টা Ac দেখা গিয়েছে। যত বেশি সংখ্যক Ac থাকে, এণ্ডোস্পার্মে (endosperm) বা সস্যের পরিণত হতে তত বেশি সময লাগে এবং এই প্রভাব Ds-এর মাধ্যমে হয়।

যদি ক্রোমোসোমের ইউক্রোমাটিন অংশ হেটারোক্রোমাটিন অংশের কাছে এসে পড়ে কিম্বা হেটারোক্রোমাটিন অংশ ইউক্রোমাটিন অংশের কাছে আসে, তাহলেও অবস্থানের প্রভাব (position effect) দেখা যায়। হেটারোক্রোমাটিন যখন স্থান পরিবর্তন

করে নতুন স্থানে অবস্থান করে, তখন এটি পাশের জিনের প্রকাশ রোধ করে।

ড্রসোফিলায় দেখা গিয়েছে যে, একই চরিত্রের নিয়ন্ত্রক দু'টি জিনের বিভিন্ন অ্যালীল



চিত্র—137

ভুট্টায় অবস্থানের প্রভাব i–Ds- এর উপস্থিতিতে জিন C (বর্ণযুক্ত অ্যালিউরোন) নিজেকে প্রকাশ করতেপারে না, ফলে বর্ণহীন অ্যালিউরোনের সৃষ্টি হয়; ii ওiii Ds- এর দুইদিকে ক্রোমোসোমটি ভেঙে গিয়ে Ds- অঞ্চলটা বাদ যাচ্ছে; iv- Ds- এর অনুপস্থিতিতে জিন Dc- যথাযথভাবে কাজ করতে পারে এবং বর্ণযুক্ত অ্যালিউরোনের সৃষ্টি হয়।

(allele) কীভাবে অবস্থান করছে তার ওপর ফেনোটাইপ নির্ভর করে। কোনও একটি চরিত্রের নিয়ন্ত্রক দু'টি রিসেসিভ জিন হল m_1-ও m_2-এবং এর ডমিন্যান্ট অ্যালীল হল M_1 ও M_2 (বা +, +)। একটি হেটারোজাইগাস ড্রসোফিলায় এই অ্যালীলগুলির বিন্যাস $\frac{m_1\ M_2}{M_1\ m_2}$ হলে, ঐ পতঙ্গটায় রিসেসিভ চরিত্র দেখা দেবে। কিন্তু এই অ্যালীলগুলির বিন্যাস $\frac{m_1\ m_2}{M_1\ M_2}$ হলে, ডমিন্যান্ট চরিত্র প্রকাশিত হয়। প্রথম ধরনের জিনের বিন্যাসকে "ট্র্যান্স" (trans) বিন্যাস ও দ্বিতীয় ধরনের বিন্যাসকে "সিস" (cis) বিন্যাস বলে। সুতরাং, একটা ক্রোমোসোমে একই চরিত্রের নিয়ন্ত্রক দু'টি ডমিন্যান্ট জিন ($M_1\ M_2$) থাকলে, ডমিন্যান্ট চরিত্র প্রকাশিত হয়। যখন হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দু'টির প্রত্যেকটিতে একটি ডমিন্যান্ট ও আরেকটি রিসেসিভ জিন ($M_1\ m_2$) থাকে তখন রিসেসিভ চরিত্র দেখা যায়। ফেনোটাইপ ট্র্যান্স (trans) কিম্বা সিস (cis) বিন্যাসের ওপর নির্ভর করলে, তাকে পোজিশন সিউডোঅ্যালীল (pseudoallele) বলে।

ট্র্যান্স ও সিস পোজিশন এফেক্টের কারণ হল যে, প্রত্যেক জিন কোনও পদার্থ তৈরি করার ক্ষেত্রে এক একটি ধাপের নির্দেশ করে। একটি ক্রোমোসোমে সব ডমিন্যান্ট অ্যালীলগুলি ($M_1\ M_2$) থাকলে নির্দিষ্ট পদার্থের উৎপাদন স্বাভাবিকভাবে হয়। কিন্তু কোনও একটি জিন যদি রিসেসিভ অবস্থায় থাকে ($M_1\ m_2$), তবে ঐ পদার্থের উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং এর ফলে রিসেসিভ চরিত্র প্রকাশিত হয়।

অবস্থানের প্রভাব বা পোজিশন এফেক্টের কারণ সম্বন্ধে দু'টি মতবাদ আছে।

(1) Ephrussi ও Sutton -এব (1944) structural hypothesis অনুসারে, জিনের অবস্থানের পবিবর্তনের ফলে তাদের কাজের পরিবর্তন হয় ও শেষে ফেনোটাইপেব পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন প্রত্যাবর্তনীয় (reversible)।

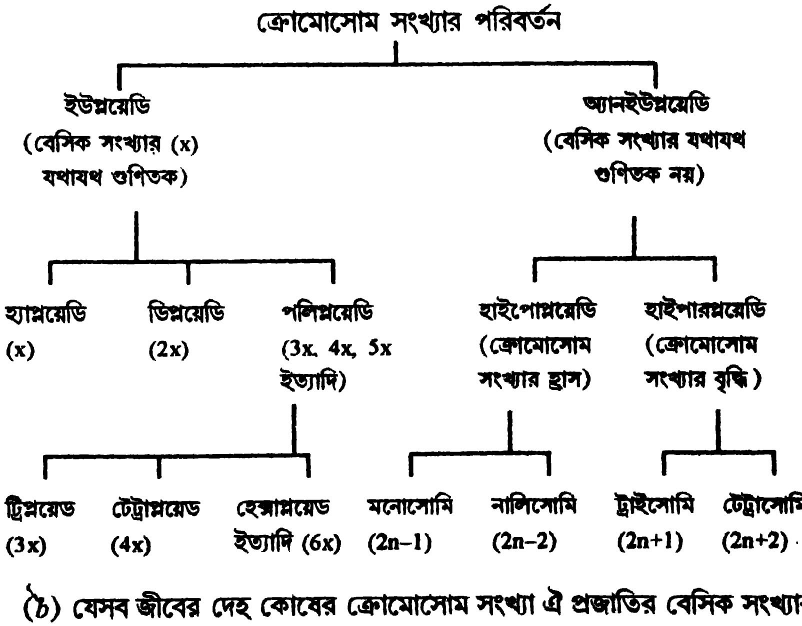
(2) দ্বিতীয় মতবাদ হল, Sturtevant-এর (1925) গতিশক্তির (kinetic) মত। Sturtevant-এর মত অনুসারে, দু'টি প্রতিবেশী জিনের প্রভাবে সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। কিন্তু জিনের অবস্থানের পরিবর্তন হলে এই বিক্রিয়া যথাযথ ভাবে হতে পাবে না এবং ফেনোটাইপে এর প্রভাব পড়ে। Lewis-ও (1951, 1955) এই মতেব সমর্থন করেছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

ক্রোমোসোমের সংখ্যার পরিবর্তন ও পলিপ্লয়েডি (Polyploidy)

ক্রোমোসোম সংখ্যার পরিবর্তন হ'ল এক ধরনের ক্রোমোসোমীয় মিউটেশন। ক্রোমোসোমের সংখ্যার পরিবর্তনকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণী দু'টি হল— ইউপ্লয়েড ও অ্যানইউপ্লয়েড।

(*a*) যেসব জীবের দেহ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা ঐ প্রজাতির মূল সংখ্যার (basic number) যথাযথ গুণফল হয়, তাদের **ইউপ্লয়েড** (euploid) বলে। যেমন, কোনও প্রজাতির বেসিক সংখ্যা 6 হলে, ইউপ্লয়েড ক্রোমোসোম সংখ্যা 18 (ট্রিপ্লয়েড), 24 (টেট্রাপ্লয়েড), 30 (পেন্টাপ্লয়েড) ইত্যাদি হয়ে থাকে। ইউপ্লয়েড জীবকে পলিপ্লয়েড বলা হয়। প্রাণীর তুলনায় উদ্ভিদে অনেক বেশি পলিপ্লয়েড দেখা যায়।



(*b*) যেসব জীবের দেহ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা ঐ প্রজাতির বেসিক সংখ্যার যথাযথ গুণফল হয় না, তাদের **অ্যানইউপ্লয়েড** (aneuploid) বলে, অর্থাৎ বেসিক সংখ্যা 6 হলে অ্যানইউপ্লয়েডের ক্রোমোসোম সংখ্যা 10-11, 13-17, 19-23, 25-29 ইত্যাদি

হয়। অ্যানইউপ্লয়েড জীবকে হেটারোপ্লয়েড (heteroploid) বা অনিয়মিত পলিপ্লয়েড (polyploid) বলা হয়। কোনও জীবের ক্রোমোসোম সংখ্যা ডিপ্লয়েড, ট্রিপ্লয়েড, টেট্রাপ্লয়েড ইত্যাদির চেয়ে কিছু বেশি হলে তাদের হাইপারপ্লয়েড (hyperploid) এবং ঐ সংখ্যার চেয়ে কিছু কম হলে তাদের হাইপো প্লয়েড (hypoploid) বলে। যদি ডিপ্লয়েড সংখ্যা 8 ও ট্রিপ্লয়েড সংখ্যা 12 হয়, তবে 9-11 ক্রোমোসোম সংখ্যাযুক্ত উদ্ভিদকে হাইপারডিপ্লয়েড কিম্বা হাইপোট্রিপ্লয়েড বলা হয়।

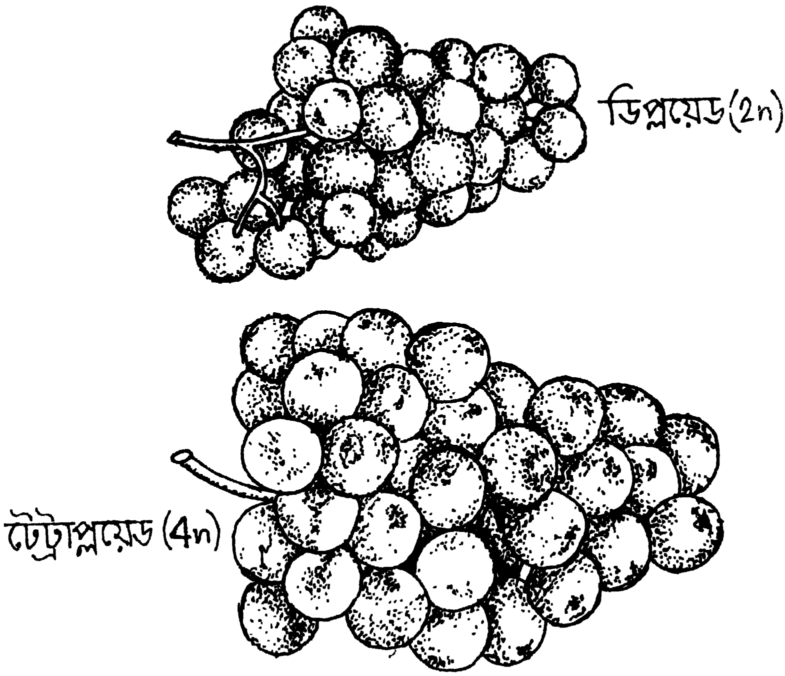
পলিপ্লয়েডকে কখনও প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী এই দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেসব পলিপ্লয়েড কোনও জীবের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার ফলে সরাসরি গঠিত হয়, তাদের প্রাথমিক বা প্রাইমারী (primary) পলিপ্লয়েড বলে এবং এইসব জীবে জোড় সংখ্যক জিনোম থাকে। যেসব পলিপ্লয়েড দু'টি জীবের মধ্যে সংকরণের ফলে গঠিত হয়, তাদের সেকেন্ডারী পলিপ্লয়েড বলে, যেমন একটি ডিপ্লয়েড জীবের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে প্রাইমারী পলিপ্লয়েড (এক্ষেত্রে 4n) জীবের সৃষ্টি হ'ল। এর সাথে আরেকটি ডিপ্লয়েড জীবের সংকরণের ফলে সেকেণ্ডারী পলিপ্লয়েড (এক্ষেত্রে 3n) জীব গঠিত হতে পারে।

ইউপ্লয়েড (euploid)

কোনও জীবে বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোসোম কেবল একটি করে থাকলে (অর্থাৎ একটি জিনোম বা ক্রোমোসোম সেট) ঐ জীবকে হ্যাপ্লয়েড জীব বলে। হ্যাপ্লয়েড জীব হেমিজাইগাস (hemigygous)। যেসব জীবের কোষে বিভিন্ন রকমের ক্রোমোসোম প্রত্যেকটি দুইটি করে থাকে তাদের ডিপ্লয়েড (2n) বলে। ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ বা প্রাণীর দু'টি জিনোম একই রকম বা আলাদা হয়। দু'টি জিনোমের মধ্যে পার্থক্য থাকলে ঐ উদ্ভিদকে ডিপ্লয়েড সংকর (hybrid) উদ্ভিদ বলে। দুইয়ের চেয়ে বেশি সংখ্যক জিনোমযুক্ত জীবকে সাধারণত পলিপ্লয়েড বলে। কোনও জীবের কোষে তিনটি জিনোম থাকলে, তাদের ট্রিপ্লয়েড (3n) বলে। একইভাবে চার, পাঁচ, ছয়, আটটি জিনোমযুক্ত প্রাণী বা উদ্ভিদকে যথাক্রমে টেট্রাপ্লয়েড (4n), পেন্টাপ্লয়েড (5n), হেক্সাপ্লয়েড (6n) এবং অক্টোপ্লয়েড (8n) বলে।

ইউপ্লয়েড প্রধানত দুই রকমের হয় — অটোপলিপ্লয়েড এবং অ্যালোপলিপ্লয়েড। (a) যেসব ইউপ্লয়েড জিনোমগুলি একই রকম হয়, তাদের **অটোপলিপ্লয়েড** (autopolyploid) বলে। 'A' একটা জিনোম হলে অটোট্রিপ্লয়েড (autotriploid) AAA, অটোটেট্রাপ্লয়েড (autotetraploid) AAAA হবে। (b) কোনও ইউপ্লয়েডে বিভিন্ন ধরনের জিনোম থাকলে তাদের **অ্যালোপলিপ্লয়েড** (allopolyploid) বলে। যদি একটি জিনোম 'A' ও অন্য আরেকটি জিনোম 'B' হয়, তবে AABB জিনোমযুক্ত উদ্ভিদকে **অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড** (allotetraploid) বলা হয়। সংকরণের (hybridization) ফলে অ্যালোপলিপ্লয়েড জীবের সৃষ্টি হয়। (c) এছাড়া **অটোঅ্যালোপলিপ্লয়েড**

অ্যালোপলিপ্লয়েডের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়, যেমন AAAABBBB হল অটোঅ্যালোপলিপ্লয়েড। (d) যেসব অ্যালোপলিপ্লয়েডে অ্যালোসিনডেসিস (allosyndesis) দেখা যায়, তাদের segmental অ্যালোপলিপ্লয়েড বলে। পলিপ্লয়েডির ফলে উদ্ভিদে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। পলিপ্লয়েড ডিপ্লয়েডের তুলনায় বড় ও সবল হয়; এরা ক্রোমোসোমের ঘাটতি অনেক বেশি সহ্য করতে পারে এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সহজেই মানিয়ে নেয়। পলিপ্লয়েডির ফলে অনেক সময় অতিকায় (giant) উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। খুব বড় টেট্রাপ্লয়েড *Anterrhinum, Amaryllis, Tajatus, Vitis* ইত্যাদি (চিত্র 138) দেখা গিয়েছে।



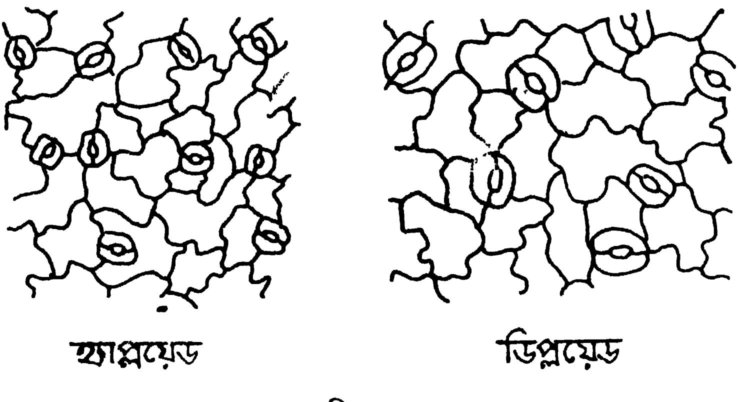
চিত্র—138

ডিপ্লয়েড (2n=38) এবং টেট্রাপ্লয়েড (2n=76) আঙ্গুর

হ্যাপ্লয়েড (haploid) বা মনোপ্লয়েড — মনোপ্লয়েডে কেবল একটি বেসিক সেট থাকে, যেমন— ভুট্টায় x = 10, বার্লিতে x = 7। একটি বেসিক সেটযুক্ত জীবকে হ্যাপ্লয়েড বলে। তবে কখনও কখনও হ্যাপ্লয়েড বলতে স্বাভাবিক জীবে যে ক্রোমোসোম সংখ্যা থাকে, তার অর্ধেকও নির্দেশ করে। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের দেহ সাধারণত হ্যাপ্লয়েড হয় অর্থাৎ, এই উদ্ভিদগুলি হল গ্যামেটোফাইট বা লিঙ্গধর উদ্ভিদ। কোনও কোনও পতঙ্গের

পুরুষ হ্যাপ্লয়েড হয়, যেমন— মৌমাছি। এসব জীবে হ্যাপ্লয়েড অবস্থার জন্য কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। এখানে প্রথম মায়োসিস বিভাজন হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় বিভাজন নিয়মিত ভাবে হয় ও গ্যামেট তৈরি হয়। স্বাভাবিক ডিপ্লয়েড জীব কোনও কারণে হ্যাপ্লয়েড হলে, ঐ অবস্থায় তারা মানিয়ে নিতে পারে না। এদের মায়োসিস খুব অনিয়মিত হয়। জাইগোটিনে ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে যুগ্মতা না হওয়ায় অ্যানাফেজে যে কোনও ক্রোমোসোম যে কোনও মেরুতে যায়। এর ফলে গ্যামেটে সাধারণত ক্রোমোসোমের ঘাটতি থাকে ও এসব জীব অনুর্বর হয়। তবে কোনও সময় অ্যানাফেজে সব ক্রোমোসোমগুলিই একটি মেরুতে গেলে হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটের সৃষ্টি হয়। এই রকম দু'টি গ্যামেটের মিলন হলে স্বাভাবিক ডিপ্লয়েড উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কখনও কখনও হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদের কোনও কোনও ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতা দেখা যায়। *Sorghum*-এর হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদের মায়োসিসে 1–3টি বাইভ্যালেন্ট পাওয়া গিয়েছে। *Triticum monococcum*-এর হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদের ডায়াকাইনেসিসে সব কিম্বা কতকগুলি ক্রোমোসোম পরস্পর যুক্ত হয়ে শৃঙ্খল (chain) গঠন করে। কিন্তু এখানে ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে যুগ্মতা কেবল দুই শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে।

হ্যাপ্লয়েড জীব ডিপ্লয়েডের তুলনায় ছোট, দুর্বল, অপরিণত হয় ও বেশি দিন বাঁচে না। D. Kastoff হ্যাপ্লয়েড তামাকে ফুল, পাতা এবং উদ্ভিদের আয়তন হ্রাস লক্ষ্য করেন।



চিত্র—139

হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড গোলমরিচের পত্ররন্ধ্রের আয়তন ও সংখ্যার পার্থক্য

বিভিন্ন উপায়ে হ্যাপ্লয়েড জীবের সৃষ্টি হয়। (*a*) অনিষিক্ত অর্থাৎ ফার্টিলাইজেশন হয়নি এমন ডিম্বাণু থেকে (অপুংজনি) (*b*) কিম্বা কখনও কখনও অনিষিক্ত শুক্রাণু (স্পার্ম) থেকে হ্যাপ্লয়েড জীবের সৃষ্টি হতে পারে। এরকম হ্যাপ্লয়েডকে অ্যান্ড্রোজেনিক (hemigygous) হ্যাপ্লয়েড বলে। (*c*) হঠাৎ পরিবেশের পরিবর্তন হলে হ্যাপ্লয়েড প্রাণী গঠিত হয়ে থাকে।

বিভিন্নভাবে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। যেমন (*a*) X-রশ্মি প্রয়োগ করে,

(*b*) পরাগযোগ বিলম্বিত করে, (*c*) তাপমাত্রার আকস্মিক পরিবর্তন করে, (*d*) ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে, (*e*) পরাগধানী বা পরাগরেণুর কালচার করে, (*f*) আন্তঃপ্রজাতি (interspecific) বা আন্তঃগণীয় (intergeneric) সংকরণ করে। হ্যাপ্লয়েড উৎপাদনের এসব কৃত্রিম পদ্ধতির মধ্যে পরাগধানীর কালচার এবং আন্তঃপ্রজাতি বা আন্তঃগনীয় সংকরণ উল্লেখযোগ্য। *Solanum* ও *Nicotiana*-এ আন্তঃপ্রজাতি সংকরণ করে হ্যাপ্লয়েডের সৃষ্টি করা হয়েছে। আলুতেও এভাবে হ্যাপ্লয়েড পাওয়া গেছে। বার্লিতে আন্তঃপ্রজাতি সংকরণের (*Horedeum vulgare* × *H. bulbosum*) মাধ্যমে কানাডায় K. J. Kasha ও Kao (1970) বহু হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন করতে পেরেছিলেন। এই সংকরণের ফলে উৎপন্ন জাইগোটের প্রথম দিকের বিভাজনের সময় *H. bulbosum*-এর ক্রোমোসোমগুলি বাদ যায়। এর ফলে পরাগযোগের কিছুদিন বাদে ভ্রূণের কালচার করে হ্যাপ্লয়েড পাওয়া যায়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে Guha ও S.C. Maheswari ('67) পরাগধানী ও পরাগরেণু কালচার করে হ্যাপ্লয়েড পেয়েছিলেন। এই পদ্ধতিতে ধান এবং তামাকে হ্যাপ্লয়েড সৃষ্টি করা হয়েছে।

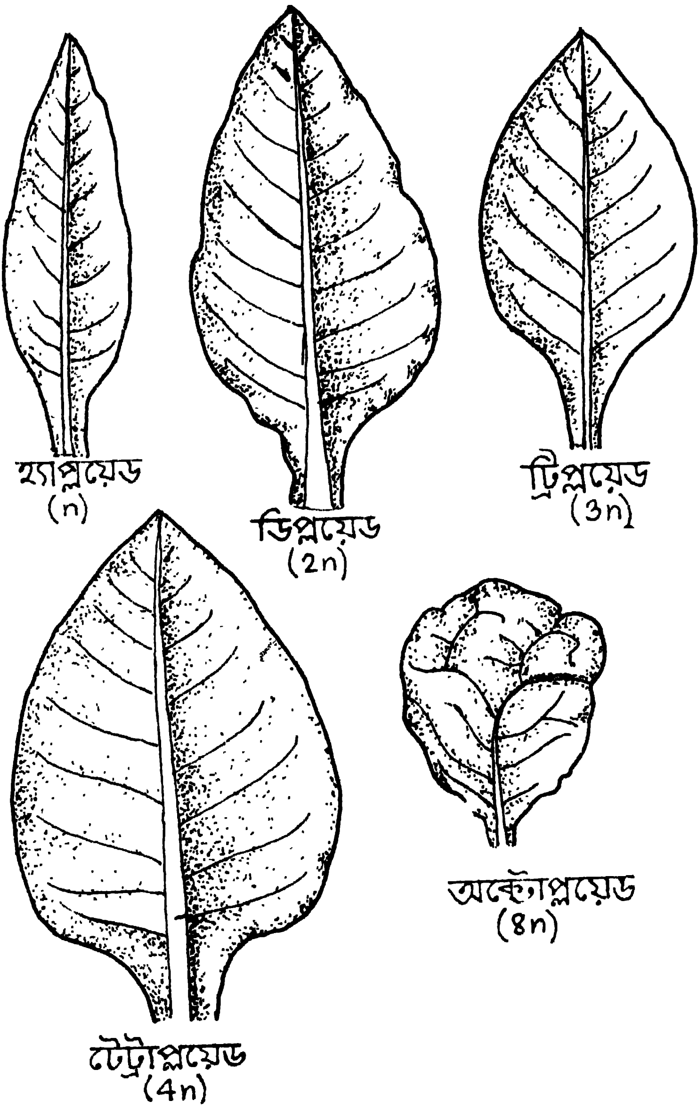
Dactylis glomerata, Hordeum vulgare, Phleum pratense, Poa sp, Triticum vulgare প্রভৃতি অনেক উদ্ভিদের হ্যাপ্লয়েড সদস্য পাওয়া গিয়েছে। কোনও হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদের ওপর গবেষণা করে ঐ উদ্ভিদের বেসিক বা মূল ক্রোমোসোম সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। হ্যাপ্লয়েডের মায়োসিসে যুগ্মতা দেখা গেলে বোঝা যাবে যে, এর ক্রোমোসোম সংখ্যা বেসিক সংখ্যা নয় কিম্বা ক্রোমোসোমে দ্বিগুণতা (duplication) আছে। হ্যাপ্লয়েড গোলমরিচের ক্রোমোসোম সংখ্যা n = 12, কিন্তু মায়োসিসে ছয় জোড়া ক্রোমোসোম অর্থাৎ ছয়টি বাইভ্যালেন্ট দেখা যায়। এর থেকে Christensen ও Bamford, (1943) সিদ্ধান্ত করেন যে, 24টি ক্রোমোসোমযুক্ত ডিপ্লয়েড গোলমরিচের মধ্যে পাতা, ফুল বা গাছের আয়তনের পার্থক্য হয় না; যদিও হ্যাপ্লয়েড গোলমরিচে তুলনামূলকভাবে ছোট পত্ররন্ধ্র (চিত্র 139), কম পরাগরেণু ও ছোট ফল দেখতে পাওয়া যায়। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদকে কলচিসিন (colchicine) প্রয়োগ করে খুব সহজেই সম্পূর্ণ হোমোজাইগাস ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ পাওয়া যায়। উদ্ভিদ প্রজননে এজন্য হ্যাপ্লয়েডের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

এইভাবে হ্যাপ্লয়েডে ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ করে 'marglobe' ভ্যারাইটির টমেটোর সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে কানাডায় 'মিঙ্গো' ভ্যারাইটির বার্লি এবং ইংল্যাণ্ডে আরো দু'টি ভ্যারাইটির বার্লির সৃষ্টি করা হয়েছে। চীন দেশে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে দু'টি নতুন ভ্যারাইটির গম, সাতটি নতুন ভারাইটির ধান এবং তিনটি নতুন ধরনের তামাক পাওয়া গেছে।

অটোপলিপ্লয়েড (autopolyploid)

ডিপ্লয়েডের তুলনায় অটোপলিপ্লয়েড বড় হয়। এদের কোষের এবং পত্ররন্ধ্রের আয়তন বেশি হয়, পাতার রঙ গাঢ় সবুজ হয়। ফুল দেরীতে ফোটে এবং গাছটি ধীরে

ধীরে বাড়ে। অটোপলিপ্লয়েডের প্রথম মায়োটিক বিভাজনের মেটাফেজ অবস্থায় মালটিভ্যালেন্ট (multivalent) দেখা যায়।



চিত্র—140

Nicotiana langsdorfii-তে বিভিন্ন মাত্রার পলিপ্লয়েডির ফলে পাতার আকৃতি ও আয়তনের পার্থক্য হয়

টেট্রাপ্লয়েডের চেয়ে উচ্চতর পলিপ্লয়েডে নানা রকম অস্বাভাবিকতা, যেমন, খর্বাকৃতির দুর্বল গাছ, কোঁকড়ান পাতা ইত্যাদি দেখা যায় (Stebbins 1950)।

পলিপ্লয়েডির কোনও ধাপে এসব ক্ষতিকর অস্বাভাবিকতা দেখা দেবে, তা প্রজাতির ওপর কিম্বা ঐ নির্দিষ্ট গাছের ওপর নির্ভর করে।

Nicotiana langsdorfii-র হ্যাপ্লয়েড, ডিপ্লয়েড, ট্রিপ্লয়েড, টেট্রাপ্লয়েড ও অক্টোপ্লয়েড উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করে Smith দেখেন যে, হ্যাপ্লয়েড থেকে টেট্রাপ্লয়েড পর্যন্ত ক্রোমোসোম সেট (set) বা জিনোমের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে দলমণ্ডল (corolla) চওড়া হয়, পাতার প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের অনুপাত বাড়ে, কোষের আয়তন (যেমন রক্ষী কোষ (guard cell), পরাগরেণুর কোষ, পাতা ও মূলাগ্রের কোষ ইত্যাদি) বাড়ে, গাছের বিভিন্ন অংশ স্থূল হয় ও গাছটি বড় ও সবল হয়। কিন্তু অক্টোপ্লয়েডে অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। এই উদ্ভিদ ছোট ও অনুর্বর হয়, পাতাগুলি মোটা ও কোঁচকানো থাকে (চিত্র 140) ও অনেক দেরীতে ফুল ফোটে।

Sax-এর মতে, পত্ররন্ধ্র বা stomata-র হার এবং পলিপ্লয়েডির মধ্যে যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। *Triticum*-এ ক্রোমোসোমের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে স্টোমাটার আয়তন বাড়ে, কিন্তু সংখ্যা কমে যায়। অবশ্য কোনও কোনও উদ্ভিদে স্টোমাটার হার ও পলিপ্লয়েডির মাত্রার মধ্যে এরকম সম্বন্ধ না থাকতেও পারে।

অটোট্রিপ্লয়েড (autotriploid-3n)— অনেক অটোট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদ পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু অটোট্রিপ্লয়েড প্রাণী সচরাচর দেখা যায় না। ড্রসোফিলার ট্রিপ্লয়েড স্ত্রী পতঙ্গ স্বাভাবিক ডিপ্লয়েডের তুলনায় সবল হয় ও এদের পাখার কোষগুলি বড় হয়।

ডিপ্লয়েডের তুলনায় অটোট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদ বড় ও সবল হয়, তাড়াতাড়ি বাড়ে ও পরিবেশের সাথে সহজেই মানিয়ে নেয়। ট্রিপ্লয়েডে মায়োসিস অনিয়মিত হওয়ার জন্য উর্বরতা কমে যায়। কিন্তু ট্রিপ্লয়েড *Iris* ও *Zea* বেশ উর্বর।

অটোট্রিপ্লয়েডে তিনটি করে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম পাশাপাশি এসে ট্রাইভ্যালেন্ট (trivalent) গঠন করে। আবার কোনও কোনও ক্রোমোসোম বাইভ্যালেন্ট (bivalent) ও ইউনিভ্যালেন্ট (univalent) হিসাবে থাকে। অটোট্রিপ্লয়েড *Tradescantia bracteata*-র মায়োসিসে 90% ট্রাইভ্যালেন্ট ও 10% বাইভ্যালেন্ট ও ইউনিভ্যালেন্ট পাওয়া যায়। প্রত্যেক ট্রাইভ্যালেন্টের তিনটি ক্রোমোসোম যে কোনও মেরুতে যায়। যেসব গ্যামেট সম্পূর্ণ হ্যাপ্লয়েড কিম্বা ডিপ্লয়েড সেট পায় তারাই শুধু বেঁচে থাকে ও অন্য কোষগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। কোনও কোনও ট্রিপ্লয়েডে দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত সেতু (dicentric bridge), ভগ্ন অংশ (fragment), ল্যাগিং (lagging) অর্থাৎ মন্থর গতিশীলতা দেখা যায়।

মায়োসিস অনিয়মিত হওয়ার জন্য ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদে যৌন জনন ভালভাবে হতে পারে না। তবে অঙ্গজ জননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করলে ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদ স্থায়ী ক্লোন (clone) গঠন করতে পারে। ডিপ্লয়েডের চেয়ে উৎকৃষ্ট ধরনের ট্রিপ্লয়েড আপেল, কলা, টিউলিপ, *Iris* ইত্যাদি অঙ্গজ জননের মাধ্যমে স্থায়ী করা সম্ভব হয়েছে। উত্তর প্রদেশে ও বিহারের দুর্বা ঘাস (*Cynadon dactylon*) হল অটোট্রিপ্লয়েড (Guha ও

Srivastava '70)। উৎকৃষ্ট ধরনের অটোট্রিপ্লয়েড তরমুজ, বীট, আঙ্গুর, টমেটো ইত্যাদিও সৃষ্টি করা হয়েছে। H. Kihara জাপানে টেট্রাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েডের মধ্যে ক্রস করে বীজহীন ট্রিপ্লয়েড তরমুজ পেয়েছিলেন। তিনি ডিপ্লয়েড উদ্ভিদে কলচিসিন প্রয়োগ করে টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন।

টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদ থেকে তৈরি ডিপ্লয়েড গ্যামেট (2n) ও ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ থেকে সৃষ্ট হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটের (n) মিলনের ফলে ট্রিপ্লয়েড (3n) জীবের সৃষ্টি হয়। এছাড়া একটা ডিপ্লয়েড উদ্ভিদের স্বাভাবিক গ্যামেট (n) ও সংখ্যা হ্রাস পায়নি এমন গ্যামেটের (2n) মিলনের ফলেও অট্রোট্রিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদের উত্তরাধিকার অপেক্ষাকৃত জটিল। এখানে একটি ডমিন্যান্ট জিন ট্রিপ্লেক্স (RRR), ডিউপ্লেক্স (RRr), সিমপ্লেক্স (Rrr) অথবা নালিপ্লেক্স (rrr) অবস্থায় থাকতে পারে। ট্রিপ্লেক্স উদ্ভিদে স্বপবাগযোগ বা টেস্ট ক্রস করলে কেবল ডমিন্যান্ট উদ্ভিদ (সব ডমিন্যান্ট;রিসেসিভ 0) পাওয়া যায়। ডিউপ্লেক্স উদ্ভিদে স্বপরাগযোগ হলে 17·1 অনুপাত এবং টেস্ট ক্রস করলে 5·1 অনুপাত দেখা যায়। সিমপ্লেক্স উদ্ভিদে স্বপরাগযোগ হলে 1:1 অনুপাত এবং টেস্ট ক্রস করলে কেবল বিসেসিভ উদ্ভিদের (ডমিন্যান্ট 0, রিসেসিভ সব) সৃষ্টি হয়।

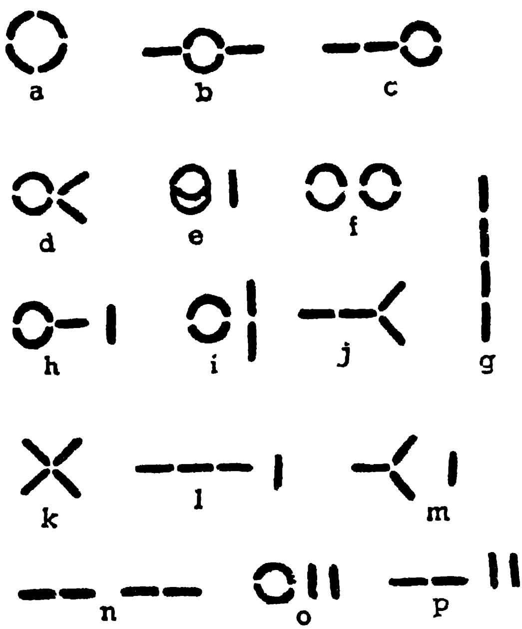
অটোটেট্রাপ্লয়েড (autotetraploid-4n) — প্রকৃতিতে অটোপলিপ্লযেড সচবাচর দেখা যায় না (Clausen, Heisey 1946, Stebbins 1950)। তবে উত্তব আমেরিকার *Gakax aphylla* হচ্ছে একটা স্বাভাবিক অটোটেট্রাপ্লযেড (Baldwin 1941)। প্রাণী ও ভিন্নবাসী উদ্ভিদে টেট্রাপ্লয়েড সাধারণত অনুপস্থিত থাকে। অটোটেট্রাপ্লয়েড *Cuthbertia graminea* ডিপ্লয়েড পূর্ব পুরুষের তুলনায় অনেক বড় ও সবল হয় (Giles 1942)

ডিপ্লয়েডের তুলনায় অটোটেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদ বড় ও সবল হয। এদেব পরাগরেণু, ফুল, ফল, বীজ, কোষ, নিউক্লিয়াস, পত্ররন্ধ্র ইত্যাদি বড় হয়; পাতা চওড়া, মোটা ও গাঢ় সবুজ হয, ভিটামিনের পরিমাণ বেশি থাকে ও এরা বিভিন্ন পরিবেশে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। তবে অটোটেট্রাপ্লয়েডে ডিপ্লয়েডের তুলনায় শীত প্রতিরোধের ক্ষমতা কম থাকে।

টেট্রাপ্লয়েডের বংশধারা ডিপ্লয়েডের তুলনায় জটিল। এখানে কোনও ডমিন্যান্ট (প্রবল) জিন (R) ও এর রিসেসিভ (প্রচ্ছন্ন) অ্যালীল (r) বিভিন্ন রকমের অবস্থায় থাকতে পারে। যদি একটি টেট্রাপ্লয়েডে একটি ডমিন্যান্ট জিন (Rrrr) থাকে, তবে ঐ উদ্ভিদকে সিমপ্লেক্স (simplex) বলে। দুইটি ডমিন্যান্ট জিন (RRrr) থাকলে ডিউপ্লেক্স (duplex), তিনটি ডমিন্যান্ট জিন থাকলে (RRRr) ট্রিপ্লেক্স (triplex), চারটি ডমিন্যান্ট জিন (RRRR) থাকলে কোয়াড্রুপ্লেক্স (quadruplex) এবং কোনও ডমিন্যান্ট জিন না থাকলে (rrrr) নালিপ্লেক্স (nulliplex) বলা হয়।

চারটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের যে কোনও দু'টি এক মেরুতে ও অন্য দু'টি অন্য মেরুতে যায়। সুতরাং, একটি ডিউপ্লেক্স (RRrr) উদ্ভিদ থেকে তিন রকমের

অর্থাৎ, RR. Rr. rr গ্যামেট 1 : 4 : 1 অনুপাতে তৈরি হয়। সিমপ্লেক্স উদ্ভিদ (Rrrr) RR ও Rr গ্যামেট সমান অনুপাতে 1 : 1 তৈরি করে। ট্রিপ্লেক্স উদ্ভিদ (RRRr) RR ও Rr গ্যামেট 1 : 1 অনুপাতে তৈরি হয়। ডিউপ্লেক্স (RRrr) উদ্ভিদের সাথে নালিপ্লেক্স (rrrr) উদ্ভিদের মিলন হলে ডমিন্যান্ট ও রিসেসিভ উদ্ভিদ 5 : 1 (R : r) অনুপাতে তৈরি হয়। যদি একটি ডিউপ্লেক্স উদ্ভিদে (RRrr) স্বপরাগযোগ হয়, তাহলে বিভিন্ন উদ্ভিদের অনুপাত হবে 35R : 1r। ডিপ্লয়েড ও অ্যালোটেট্রাপ্লয়েডে এই রকমের অনুপাতে দেখা যায় না।

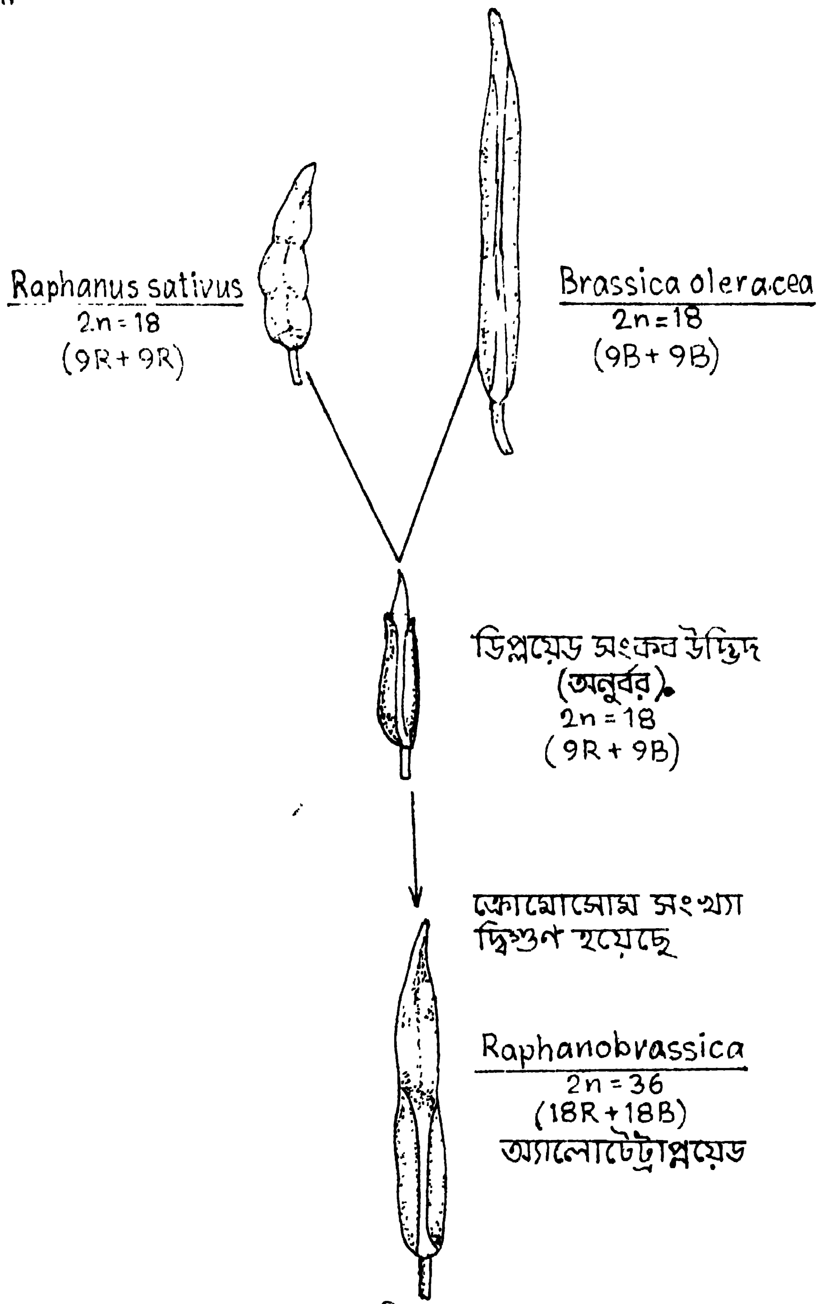


চিত্র—141

টেট্রাপ্লয়েডে কায়েসমার অবস্থান ও সংখ্যার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন রকমের ক্যোয়াড্রিভ্যালেন্ট, বাইভ্যালেন্ট, ট্রাইভ্যালেন্ট ও ইউনিভ্যালেন্ট গঠিত হয়। a-d, g, j-k – ক্যোয়াড্রিভ্যালেন্ট ; e, h, l, m ট্রাইভ্যালেন্ট ও ইউনিভ্যালেন্ট ; f, i, n – বাইভ্যালেন্ট ; এবং o, p – বাইভ্যালেন্ট ও ইউনিভ্যালেন্ট

ক্যোয়াড্রুপ্লেক্স বা ট্রিপ্লেক্স উদ্ভিদে স্বপরাগযোগ হলে, টেস্ট ক্রস করলে কেবল ডমিন্যান্ট উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ, ডমিন্যান্ট ও রিসেসিভের অনুপাত হল সব : 0। সিমপ্লেক্স উদ্ভিদে স্বপরাগযোগ হলে 3:1 অনুপাতে ও টেস্ট ক্রস হলে 1:1 অনুপাত দেখা যায়। নালিপ্লেক্স উদ্ভিদে স্বপরাগযোগ হলে কিম্বা টেস্ট হলে ডমিন্যান্ট ও রিসেসিভের অনুপাত হল 0 : সব।

অটোটেট্রাপ্লয়েড *Tradescantia virginiana, Setcreasia brevifolia* ইত্যাদি



চিত্র—142

Karpechhenko *Raphanus sativus* ও *Brassica oleracea*-র মধ্যে সংকরণ করে একটি অনুর্বর সংকর উদ্ভিদ পান। ওই উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড *Raphanobrassica*-র সৃষ্টি হয়েছে। এখানে *Raphanus*-এর ক্রোমোসোমগুলিকে R এবং *Brassica*-র ক্রোমোসোমগুলিকে B রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন উদ্ভিদের মায়োসিসে ক্যোয়াড্রিভ্যালেন্ট (quadrivalent) পাওয়া যায়। অটোটেট্রাপ্লয়েড টমেটোতে প্রফেজে ক্যোয়াড্রিভ্যালেন্ট পাওয়া যায়। কিন্তু মেটাফেজে 24টি বাইভ্যালেন্ট থাকে। অনেক অটোটেট্রাপ্লয়েডে অনেক রকমের যুগ্মতার জন্য একই কোষে বিভিন্ন ধরনের ক্যোয়াড্রিভ্যালেন্ট, বাইভ্যালেন্ট এবং কখনও কখনও ট্রাইভ্যালেন্ট দেখা যায়। তবে প্রকৃত অটোটেট্রাপ্লয়েডে ট্রাইভ্যালেন্ট প্রায় অনুপস্থিত থাকে।

ডিপ্লয়েডের তুলনায় টেট্রাপ্লয়েডে কায়েসমার সংখ্যা কম হয়। এখানে প্রায় সব কায়েসমার সংখ্যা ও অবস্থানের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন রকমের ক্যোয়াড্রিভ্যালেন্ট, বাইভ্যালেন্ট ও ট্রাইভ্যালেন্ট (চিত্র 141a–p) দেখা যায়।

অটোটেট্রাপ্লয়েডে কোষ বিভাজন মোটামুটি নিয়মিত হলেও কিছু পরিমাণ পরাগরেণু অনুর্বর হয়, কারণ কোনও কোনও সময় ক্যোয়াড্রিভ্যালেন্টের অনিয়মিত পৃথকীকরণের জন্য গ্যামেট স্বাভাবিক হয় না। অটোটেট্রাপ্লয়েড *Antirrhinum*-এ মায়োসিসের শেষের দিকে বিশৃঙ্খলার জন্য আংশিক অনুর্বরতা দেখা যায়। তবে অটোট্রিপ্লয়েডের তুলনায় অটোটেট্রাপ্লয়েড অনেক বেশি উর্বর।

ডিপ্লয়েডের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে অটোটেট্রাপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়। কোষ বিভাজন ছাড়া ক্রোমোসোমের বিভাজন হলে ঐ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। এই অস্বাভাবিক বিভাজন খুব ছোট অবস্থায় হলে সম্পূর্ণ জীব টেট্রাপ্লয়েড হয়। কিন্তু এই রকমের বিভাজন উদ্ভিদের বৃদ্ধির পরবর্তী পর্যায়ে হলে কেবল আংশিক টেট্রাপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এছাড়া গ্যামেটের মাতৃকোষে কোনও কারণে মায়োসিস না হলে (ameiosis) ডিপ্লয়েড গ্যামেট তৈরি হয়। এই রকমের দু'টি ডিপ্লয়েড গ্যামেটের মিলনের ফলে টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

টেট্রাপ্লয়েডের বড় ফল, ফুল ও পাতার জন্য কৃত্রিম উপায়ে টেট্রাপ্লয়েডের সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এভাবে অনেক টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদ, যেমন, রাই, ভুট্টা, টমেটো, আঙ্গুর, স্ট্রবেরী, আপেল, প্লাম, বিভিন্ন রকমের লিলি, গাঁদা, *Phlox, Antirrhinum* ইত্যাদির সৃষ্টি করা হয়েছে।

উচ্চতর অটোপলিপ্লয়েড (higher autopolyploids)— অটোটেট্রাপ্লয়েডের চেয়ে উচ্চতর অটোপলিপ্লয়েড সচরাচর দেখা যায় না। এই ধরনের উদ্ভিদে মায়োসিস খুব অনিয়মিত হয় ও এরা দুর্বল এবং অস্বাভাবিক হয়।

Navaschin (1925) একটি পেন্টাপ্লয়েড (5n) *Crepis* পেয়েছিলেন। পেন্টাপ্লয়েডের মায়োসিসে ইউনিভ্যালেন্ট থেকে আরম্ভ করে ক্যুইনক্যোইভ্যালেন্ট (quinquivalent) পর্যন্ত সব রকমের সংযোগ পাওয়া যায়।

অ্যালোপলিপ্লয়েড

অ্যালো ট্রিপ্লয়েড (*allotriploid*)— অ্যালোট্রিপ্লয়েডে সাধারণত একটি উদ্ভিদের দুটি জিনোম (AA) ও অন্য উদ্ভিদের একটি জিনোম (B) থাকে। এক রকম দু'টি জিনোমের

(AA) ক্রোমোসোমগুলি বাইভ্যালেন্ট গঠন করে, অন্য জিনোমের (B) ক্রোমোসোমগুলি ইউনিভ্যালেন্ট অবস্থায় থাকে। কখনও কখনও B জিনোমের বিভিন্ন ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতার ফলে বাইভ্যালেন্টের সৃষ্টি হয়। আবার কখনও বা A জিনোম ও B জিনোমের কোনও কোনও ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতার ফলে ট্রাইভ্যালেন্ট গঠিত হয়ে থাকে। তিন রকমের জিনোমযুক্ত অ্যালোট্রিপ্লয়েড (ABC) একটি সংকর উদ্ভিদের (AABB) সাথে অন্য জিনোমযুক্ত আরেকটা উদ্ভিদের (CC) সংকরণের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

Crepis capillaris (n=3) ও *C.tectorum* (n=4)-এর মধ্যে মিলনের ফলে অ্যালোট্রিপ্লয়েড সংকর উদ্ভিদ পাওয়া গিয়েছে। এখানে *C. capillaris*-এর দু'টি জিনোম ও *C.tectorum*-এর একটি জিনোম থাকে। এই অ্যালোট্রিপ্লয়েডের মায়োসিসে তিনটি বাইভ্যালেন্ট ও চারটি ইউনিভ্যালেন্ট পাওয়া যায়।

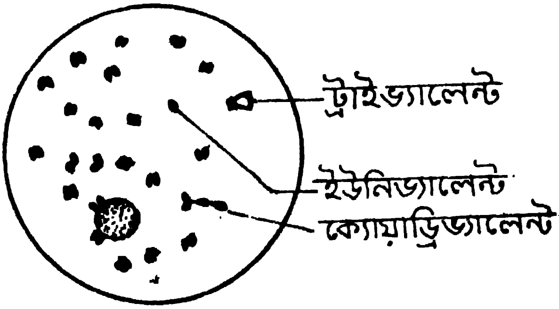
অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড (allotetraploid)— দু'টি ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ AA ও BB-র মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদটি (AB) অনুর্বর হয়। এই উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা কোনও ভাবে দ্বিগুণ হলে, উদ্ভিদটি (AABB) উর্বর হয়। এই রকমের উদ্ভিদকে অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড (allotetraploid) বলে। উদ্ভিদটি টেট্রাপ্লয়েড হলেও এর আচরণ ডিপ্লয়েডের মত কারণ, এখানে প্রত্যেক ধরনের ক্রোমোসোম দু'টি করে থাকে। ডিপ্লয়েডের মত আচরণের জন্য অ্যালোটেট্রাপ্লয়েডকে অনেক সময় অ্যামফিডিপ্লয়েড (amphidiploid) বলা হয়। অ্যালোটেট্রাপ্লয়েডে একই উদ্ভিদ থেকে যেসব ক্রোমোসোম এসেছে তাদের মধ্যে (A জিনোমের সাথে A জিনোমের) যুগ্মতা দেখা যায়। এই রকমের যুগ্মতাকে অটোসিনডেসিস (autosyndesis) বলে। তবে ভিন্ন উদ্ভিদ থেকে যে ক্রোমোসোমগুলি এসেছে তাদের কোনও কোনওটা যুগ্ম অবস্থান করতে পারে। এই যুগ্মতাকে অ্যালোসিনডেসিস (allosyndesis) বলে। অ্যালোসিনডেসিসের ফলে ক্যোয়াড্রিভ্যালেন্ট বা ট্রাইভ্যালেন্টের সৃষ্টি হয় ও মায়োসিসে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। প্রকৃত অ্যালোটেট্রাপ্লয়েডে কেবল বাইভ্যালেন্ট পাওয়া যায়।

কৃত্রিম উপায়ে কিম্বা স্বাভাবিকভাবে অ্যামফিডিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়। Karpechenko কৃত্রিম উপায়ে *Raphanus sativus* ও *Brassica oleracea*-র মধ্যে সংকরণ (hybridize) করে অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড *Raphanobrassica*-র (চিত্র 142) সৃষ্টি করেছিলেন। *Raphanus*-র এর নয়টি ক্রোমোসোম *Brassica*-র নয়টি (n=9) ক্রোমোসোম থেকে একেবারে আলাদা। সেজন্য ডিপ্লয়েড সংকর উদ্ভিদে কোনও যুগ্মতা দেখা যায় না ও উদ্ভিদটি অনুর্বর হয়। কিন্তু অ্যালোটেট্রাপ্লয়েডে সব ক্রোমোসোমগুলি দু'টি করে থাকার ফলে মায়োসিস নিয়মিত হয়। প্রত্যেক গ্যামেটে 9-টি *Raphanus*-এর এবং 9-টি *Brassica*-র ক্রোমোসোম থাকে। এইজন্য *Raphanobrassica* উর্বর হয়।

কতকগুলি অ্যামফিডিপ্লয়েড একই গণের (genus) বিভিন্ন প্রজাতির (species) মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে, আবার অন্যরা ভিন্ন জেনাসের (গণ) দু'টি প্রজাতির মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। একটি স্বাভাবিক অ্যামফিডিপ্লয়েড হল *Spartina*

townsendii, যা 1871 খ্রিস্টাব্দে প্রথম পাওয়া গিয়েছিল। *S. alterniflora* ও *S. stricta*-র মধ্যে বেশ মিল আছে। Huskin দেখেন, *S. townsendii*-র ক্রোমোসোম সংখ্যা 2n = 126, *S. alterniflora*-র 2n = 70 এবং *S. stricta*-র 2n = 56। *S. alterniflora* ও *S. stricta* মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 2n = 63 এবং এটি অনুর্বর। এই উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে উর্বর *S. townsendii*-র সৃষ্টি হয়েছে।

একইভাবে *Digitalis purpurea* ও *D. ambigua* থেকে *D. mertonesis* এবং *Galeopsis pubescens* (2n =16) ও *G. speciosa* (2n = 16) থেকে *G. tetrahit*-এর (2n = 32) সৃষ্টি হয়েছে। 2n = 52 ক্রোমোসোমযুক্ত তুলা *Gossypium hirsutum* অ্যামফিডিপ্লয়েড (amphidiploid)। এই উদ্ভিদটি *Gossypium herbaceum* ও *G. raimondii*-র মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রজাতি দু'টির ক্রোমোসোম সংখ্যা 2n = 26। J. O. Beasley এই দু'টি প্রজাতির মধ্যে সংকরণ করে এবং F_1 উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ করে অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড চাষের তুলা পেয়েছিলেন। *Gossypium herbaceum*-এ 13 জোড়া দীর্ঘ এবং *G. raimondii*-তে 13 জোড়া ছোট ক্রোমোসোম পাওয়া যায়।



চিত্র—143

Elatostema lanceolatum-এর ডায়াকাইনেসিসে ক্যোয়াড্রিভ্যালেন্ট, ট্রাইভ্যালেন্ট এবং ইউনিভ্যালেন্টের উপস্থিতি এই উদ্ভিদের পলিপ্লয়েড প্রকৃতি নির্দেশ করে (Guha)

Primula floribunda (2n = 18) এবং *P. verticillata* (2n = 18) থেকে অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড *P. kewensis*-এর (2n = 36) সৃষ্টি হয়েছে।

2n = 48 টি ক্রোমোসোমযুক্ত চাষের তামাক 24টি ক্রোমোসোমযুক্ত দু'টি প্রজাতির মধ্যে সংকরণ ও ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। গম *(Triticum)* ও রাইয়ের *(Secale)* মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্ট অ্যামফিডিপ্লয়েড উদ্ভিদ হল *Triticale*। A. Muntzing সুইডেনে বিভিন্ন রকমের গম ও রাই থেকে সৃষ্ট ছয় ধরনের *Triticale* পেয়েছিলেন।

টেট্রাপ্লয়েড *Triticum durum* (2n = 28) এবং ডিপ্লয়েড *Secale cereale* (2n = 14) থেকে হেক্সাপ্লয়েড *Triticale* (2n = 42) উৎপাদন করা হয়েছে। আবার হেক্সাপ্লয়েড *T. aestivum* (2n = 42) এবং *Secale cereale* (2n = 14) থেকে অক্টোপ্লয়েড *Triticale* (2n = 56) উৎপাদন করা গেছে। হেক্সাপ্লয়েড *Triticale*-এর সাথে গমের পুনরায় ক্রস করে ট্রিটিকেলের উৎকর্ষ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এরকম ট্রিটিকেলকে ‘সেকেণ্ডারী ট্রিটিকেল’ বলা হয়।

Triticum ও *Haynaldia* বা *Aegilops*-এর সংকরণের ফলেও আমফিডিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়েছে। অ্যামফিডিপ্লয়েডের মায়োসিসে ইউনিভ্যালেন্ট, বাইভ্যালেন্ট, ট্রাইভ্যালেন্ট এবং ক্যোয়াড্রিভ্যালেন্ট (চিত্র 143) দেখতে পাওয়া যায়। ডিপ্লয়েডের তুলনায় এরা বেশি সবল হয়।

অ্যালোহেক্সাপ্লয়েড (allohexaploid) — অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড (AABB) ও ডিপ্লয়েড (CC) উদ্ভিদের মধ্যে সংকরণের (hybridization) ফলে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদটি (ABC) অনুর্বর হয়। সংকর উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে অ্যালোহেক্সাপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়। এই উদ্ভিদটি (AABBCC) উর্বর। *Triticum aestivum* হল অ্যালোহেক্সাপ্লয়েডের একটি প্রধান উদাহরণ। অ্যালোহেক্সাপ্লয়েডের বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে যেসব ক্রোমোসোম আসে, তাদেব কোনও কোনওটা যুগ্ম অবস্থান করতে পাবে। এরকমেব অ্যালোসিনডেসিসের (allosyndesis) ফলে অ্যালোহেক্সাপ্লয়েডের উর্বরতা কমে যায়।

উচ্চতর অ্যালোপলিপ্লয়েড — বিভিন্ন উদ্ভিদে হেক্সাপ্লয়েডেব চেয়ে উচ্চতর অ্যালোপলিপ্লয়েড দেখা গিয়েছে। *Pentstemon neotericus* হল একটি স্বাভাবিক অ্যালোঅক্টোপ্লয়েড (allo-octoploid)। হেক্সাপ্লয়েড *P. azureus* subsp. *angustissimus* (2n = 48) ও ডিপ্লয়েড *P. laetus* (2n = 16) এর মধ্যে ক্যালিফোর্ণিয়ার কোনও জায়গায় সংকরণ ও ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার ফলে *P. neotericus*-এর (2n = 64) সৃষ্টি হয়েছে। *P neotericus*-এর সাথে অন্য দু'টি প্রজাতির যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। একই জায়গায় এই তিনটি প্রজাতিকে পাওয়া গিয়েছে।

Bromus-এর মূল ক্রোমোসোম সংখ্যা (basic number) হল 7। *Bromus*-এ উচ্চতর পলিপ্লয়েড পাওয়া যায় (Stebbins)। অক্টোপ্লয়েড-এর *B carinatus*-এর ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 2n = 56। এখানে মায়োসিসে 28টি বাইভ্যালেন্ট গঠিত হয়। *B arizonicus*-এর ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 84 ও মায়োসিসে 42টি বাইভ্যালেন্ট দেখা যায়। এই উদ্ভিদটি হল ডুয়োডেকাপ্লয়েড (duodecaploid) অর্থাৎ 12n। অক্টোপ্লয়েড *B. carinatus*-এর জিনোমগুলি হল $AABBC_1C_1L_1L_1$ ও ডুয়োডেকাপ্লয়েড (duodecaploid) *B. arizonicus*-এর জিনোমগুলি হল $AABBC_1C_1C_2C_2DDEE$। এই দুই প্রজাতির মধ্যে সংকরণের ফলে 2n = 70টি ক্রোমোসোমযুক্ত ($ABC_1L_1ABC_1C_2DE$) একটি সংকর (hybrid) উদ্ভিদের (10n)

সৃষ্টি হয়েছে। এখানে *B.carinatus*-এর L_1 জিনোম ও *B. arizonicus*-এর D, E জিনোম ইউনিভ্যালেন্ট (মোট 21টা) গঠন করে। 14টি বাইভ্যালেন্ট উভয় প্রজাতির A, B সেটের (set) ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে যুগ্মতার জন্য তৈরি হয়। দুই সেট C_1 এবং এক সেট C_2-র মধ্যে যুগ্মতার জন্য সাতটি ট্রাইভ্যালেন্ট তৈরি হয়। সুতরাং, এই ডেকাপ্লয়েড (decaploid 10n) সংকর উদ্ভিদের মায়োসিসে ইউনিভ্যালেন্ট, বাইভ্যালেন্ট ও ট্রাইভ্যালেন্ট দেখতে পাওয়া যায়।

গোলাপেও ডিপ্লয়েড থেকে অক্টোপ্লয়েড পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের পলিপ্লয়েডি দেখা গিয়েছে।

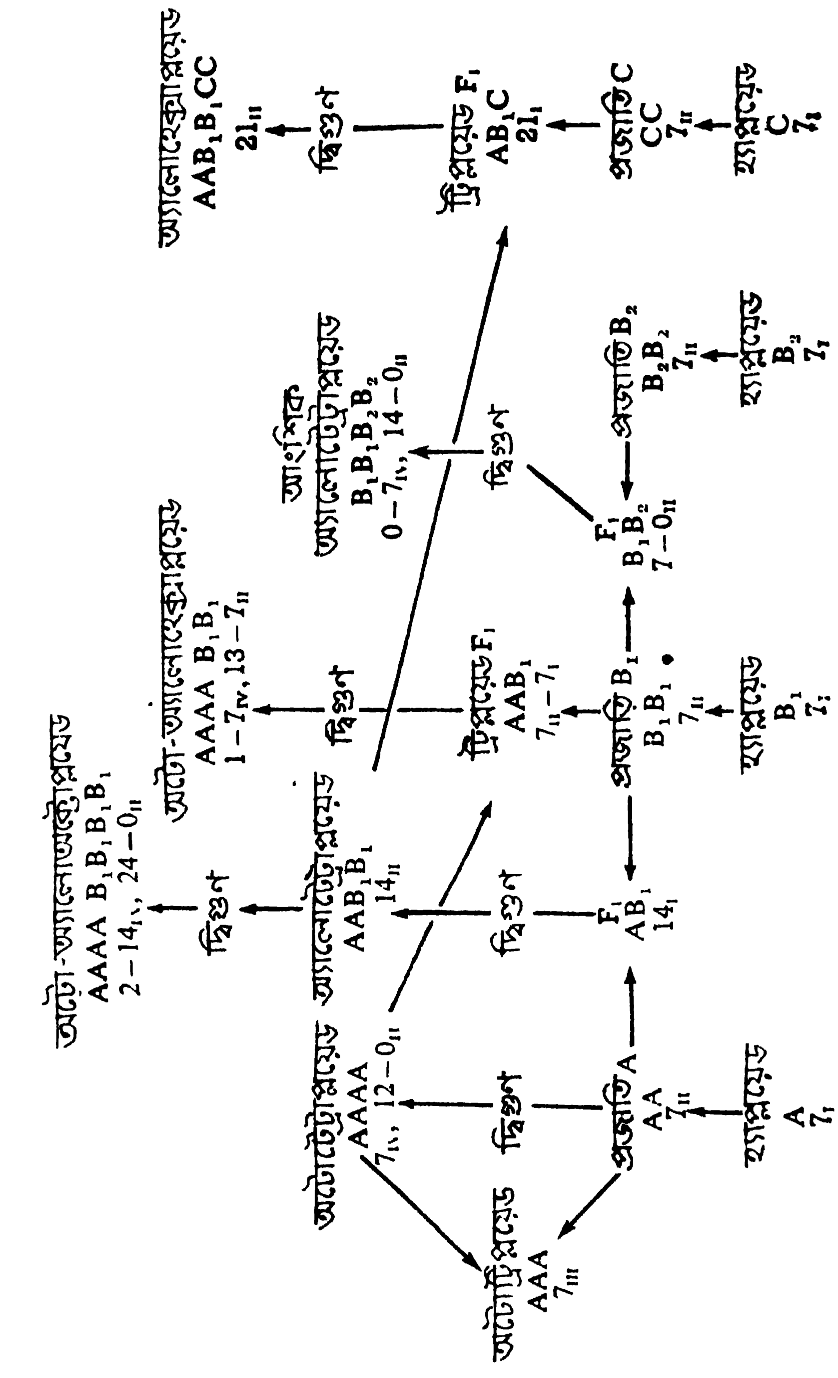
আংশিক অ্যালোপলিপ্লয়েড (segmental allopolyploid) — অ্যালোপলিপ্লয়েডে বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে যেসব ক্রোমোসোম আসে, তাদের মধ্যে যুগ্মতা হয় না। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে অ্যালোসিনডেসিসের (allosyndesis) ফলে কোয়াড্রিভ্যালেন্ট দেখতে পাওয়া যায়। এই রকমের উদ্ভিদকে আংশিক অ্যালোপলিপ্লয়েড (segmental allopolyploid) বলে (Stebbins '43, '50)। অ্যালোপলিপ্লয়েডের তুলনায় আংশিক অ্যালোপলিপ্লয়েড প্রকৃতিতে বেশি দেখা যায়। শেষোক্ত উদ্ভিদে মায়োসিস অনিয়মিত হওয়ার ফলে কিছু অনুর্বরতা দেখা যায়।

Delphinium gypsophilum হল একটি আংশিক অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড। এটা *D. hesperium* ও *D. recurvatum*-এর মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। *Tradescantia canaliculata-humilis* এবং *Primula kewensis* ও (2n = 36) আংশিক অ্যালোপলিপ্লয়েড। *P. floribunda* (2n = 18) ও *P. verticillata*-র (2n = 18) থেকে *Primula kewensis* গঠিত হয়েছে।

অটোপলিপ্লয়েডের জিনোম দু'টির মধ্যে মায়োসিসে সম্পূর্ণ যুগ্মতা দেখা যায়। কিন্তু অ্যালোপলিপ্লয়েডের বিভিন্ন জিনোমের মধ্যে যুগ্মতা হয় না। আংশিক অ্যালোপলিপ্লয়েডের দু'টি জিনোমের কোনও কোনও ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতা হয়। অতএব, অটোপলিপ্লয়েড ও অ্যালোপলিপ্লয়েডের মাঝামাঝি ধরনের উদ্ভিদ হল আংশিক (segmental) অ্যালোপলিপ্লয়েড।

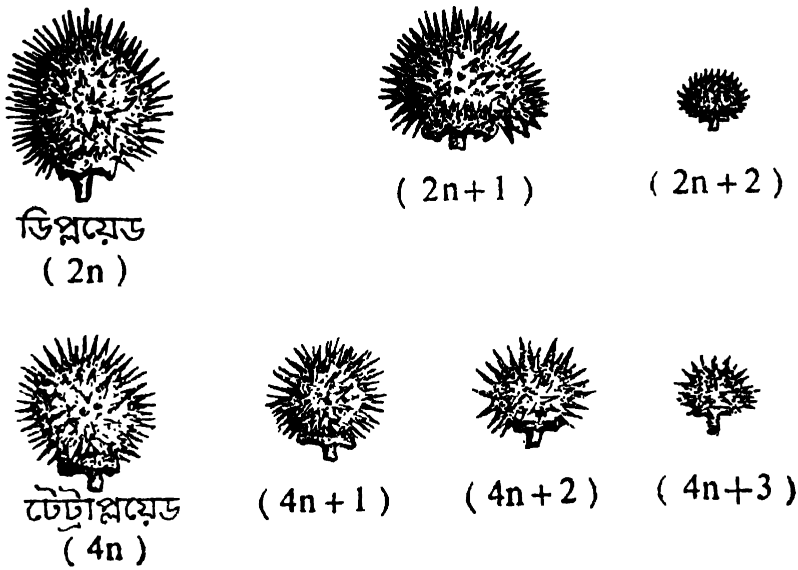
অটো-অ্যালোপলিপ্লয়েড (auto-allopolyploid)— অ্যালোপলিপ্লয়েডের (AABB) ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হলে অটো-অ্যালোপলিপ্লয়েড (AAAA BBBB) পাওয়া যায়। এই রকমের উদ্ভিদে অটোপলিপ্লয়েড এবং অ্যালোপলিপ্লয়েডের চরিত্র দেখা যায়। দু'টি অটোপলিপ্লয়েডের মধ্যে সংকরণ করেও অটো-অ্যালোপলিপ্লয়েড পাওয়া যায়।

Phleum pratense এবং *Solanum negrine* উদ্ভিদ দু'টি অটোঅ্যালো-হেক্সাপ্লয়েড। *P. pratense*-এ AAAABB জিনোম এবং *S. negrine*-এ $A_1A_1A_1A_1B_1B_1$ জিনোম থাকে। এছাড়া *Helianthus tuberosum*-ও অটো-অ্যালোহেক্সাপ্লয়েড।


অটোট্রিপ্লয়েড
AAA
7III
অটোটেট্রাপ্লয়েড
AAAA
7IV, 12−0II
দ্বিগুণ
প্রজাতি A
AA
7II
হ্যাপ্লয়েড
A
7I
F1
AB1
14I
অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড
AAB1B1
14II
অটো-অ্যালোঅক্টোপ্লয়েড
AAAA B1B1B1B1
2−14IV, 24−0II
অটো-অ্যালোহেক্সাপ্লয়েড
AAAA B1B1
1−7IV, 13−7II
ট্রিপ্লয়েড F1
AAB1
7II−7I
প্রজাতি B1
B1B1
7II
হ্যাপ্লয়েড
B1
7I
F1
B1B2
7−0II
আংশিক
অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড
B1B1B2B2
0−7IV, 14−0II
প্রজাতি B2
B2B2
7II
হ্যাপ্লয়েড
B2
7I
ট্রিপ্লয়েড F1
AB1C
21I
অ্যালোহেক্সাপ্লয়েড
AAB1B1CC
21II
প্রজাতি C
CC
7II
হ্যাপ্লয়েড
C
7I

চিত্র—144

অটোপলিপ্লয়েড, অ্যালোপলিপ্লয়েড, আংশিক অ্যালোপলিপ্লয়েড এবং অটো-অ্যালোপলিপ্লয়েডের উৎপত্তি, জিনোমের গঠন ও পারস্পরিক সম্বন্ধ চিত্র 144-এ দেখান হয়েছে।



চিত্র—145

ধুতরার ডিপ্লয়েড, টেট্রাপ্লয়েড এবং বিভিন্ন অ্যানইউপ্লয়েড উদ্ভিদের ফলগুলি দেখান হয়েছে

অ্যানইউপ্লয়েড (aneuploid)

অ্যানইউপ্লয়েড জীবে একটা বা একাধিক ক্রোমোসোম অতিরিক্ত থাকে কিম্বা অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ অ্যানইউপ্লয়েড জীবে এক বা একাধিক অসম্পূর্ণ ক্রোমোসোম সেট (জিনোম) থাকে। কোনও ডিপ্লয়েড জীবে মায়োসিসের ফলে গ্যামেট দু'টি সাধারণত সম্পূর্ণ হ্যাপ্লয়েড সেট পায়। কিন্তু কোনও কোনও সময় দু'টি হোমোলোগাস ক্রোমোসোম বিপরীত মেরুতে না গিয়ে একই মেরুতে যায়। ফলে একটি গ্যামেটে ঐ নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের ঘাটতি ও অন্যটায় দ্বিগুণতা দেখা যায়। Bridges (1916) এই রকমের অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি ড্রসোফিলার ওপর গবেষণা করে ক্রোমোসোমের এই আচরণকে 'নন-ডিসজাংশন' (non-disjunction) নাম দেন। নন-ডিসজাংশনের ফলে সৃষ্ট অস্বাভাবিক গ্যামেট দু'টি (n+1 বা n-1) যদি স্বাভাবিক গ্যামেটের (n) সাথে মিলিত হয়, তাহলে যথাক্রমে (2n + 1) ও (2n - 1) উদ্ভিদের সৃষ্টি হবে। প্রথম উদ্ভিদকে ট্রাইসোমিক (tri-somic) ও দ্বিতীয় উদ্ভিদকে মনোসোমিক (monosomic) বলে। ডিপ্লয়েড স্তরের চেয়ে পলিপ্লয়েড স্তরে অ্যানইউপ্লয়েডি কম ক্ষতিকর। পলিপ্লয়েডে ক্রোমোসোম সংখ্যা বেশি থাকায় একটি অতিরিক্ত (কিম্বা অনুপস্থিত) ক্রোমোসোম ডিপ্লয়েডের তুলনায় ঐ উদ্ভিদকে

কম প্রভাবিত করে। ধুতরায় ডিপ্লয়েড ও পলিপ্লয়েডে স্তরে বিভিন্ন রকম অ্যানইউপ্লয়েডি দেখা গিয়েছে (চিত্র 145)। উদ্ভিদের তুলনায় প্রাণীতে অ্যানইউপ্লয়েডি অনেক বেশি ক্ষতিকর এবং এই রকম জীব সাধারণত বাঁচে না।

ট্রাইসোমিক (trisomic) (2n + 1) —ট্রাইসোমিকে কোনও একটা ক্রোমোসোমের তিনটি হোমোলোগ থাকে। উপরের বর্ণনা অনুযায়ী নন ডিসজাংশনের (non-disjunction) ফলে ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ থেকে ট্রাইসোমিকের সৃষ্টি হয়। এছাড়া ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদ থেকে কিম্বা ট্রিপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড উদ্ভিদের মধ্যে সংকরণের ফলে ট্রাইসোমিকের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

উদ্ভিদে মনোসোমিকের তুলনায় ট্রাইসোমিক অনেক বেশি দেখতে পাওয়া যায়। পরাগরেণুতে একটা ক্রোমোসোম বেশি (n + 1) থাকলে, ঐ পরাগরেণু ফার্টিলাইজেশনে অংশ নেয় না, কিম্বা নানা বাধা বিপত্তির পর স্ত্রী গ্যামেটের সাথে মিলিত হয়। কিন্তু ডিম্বাণুতে একটা ক্রোমোসোম অতিরিক্ত (n + 1) থাকলে ঐ গ্যামেট n + 1 পরাগরেণুর চেয়ে অনেক সহজভাবে নিষেক বা ফার্টিলাইজেশনে অংশ নেয়। ধুতরায় n + 1 পরাগরেণু ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় না। ভুট্টায় n + 1 পরাগরেণু 1–2 শতাংশ ক্ষেত্রে ও n + 1 ডিম্বাণু 25 – 50 শতাংশ ক্ষেত্রে ফার্টিলাইজেশনে (fertilization) অংশ নেয়।

ট্রাইসোমিকে অতিরিক্ত হোমোলোগাস ক্রোমোসোমটি অন্য দু'টি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের সাথে একসাথে অবস্থান করে ও ট্রাইভ্যালেন্ট গঠন করে। কায়েসমার অবস্থান ও terminalization-এর (প্রান্তিকরণ) ওপর নির্ভর করে চিত্র 146 অনুযায়ী বিভিন্ন আকৃতির ট্রাইভ্যালেন্ট গঠিত হয়ে থাকে। তবে কোনও কোনও সময় একটি বাইভ্যালেন্ট ও একটি ইউনিভ্যালেন্ট দেখা যায়। ইউনিভ্যালেন্টটি বেশিরভাগ সময় কোনও মেরুতে যেতে পারে না ও বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ট্রাইভ্যালেন্ট গঠিত হলে দু'টি ক্রোমোসোম একটি মেরুতে ও অন্যটি বিপরীত মেরুতে যায়। এর ফলে n + 1 ও n গ্যামেটের সৃষ্টি হয়। প্রথম গ্যামেটটি স্বাভাবিক গ্যামেটের (n) সাথে মিলিত হলে আবার ট্রাইসোমিক উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

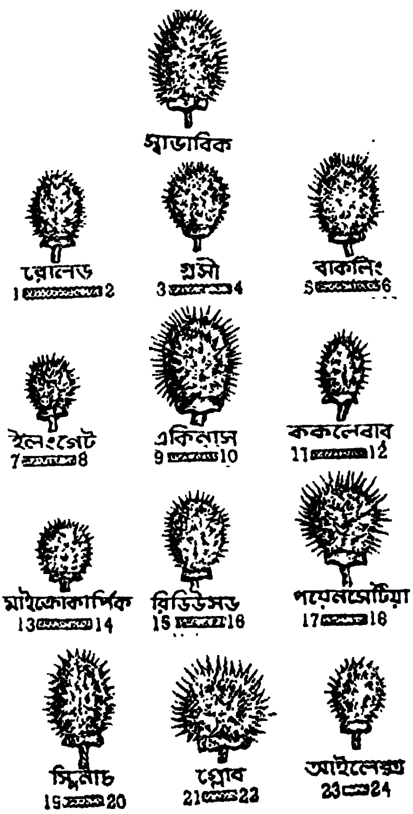


চিত্র—146

ট্রাইসোমিকের বিভিন্ন রকমের ট্রাইভ্যালেন্ট দেখানো হয়েছে

ধুতরা, ভুট্টা, টমেটো, তামাক, গম ইত্যাদি অনেক উদ্ভিদে এবং *Drosophila*-এ ট্রাইসোমিক পাওয়া গিয়েছে। চতুর্থ ক্রোমোসোমের ট্রাইসোমিক (triplo-IV) ড্রসোফিলা উর্বর হয়। গমে পলিপ্লয়েড স্তরে ট্রাইসোমিক (6n + 1) পাওয়া গিয়েছে। মানুষেও ট্রাইসোমিক দেখা যায়। একটি ক্রোমোসোম অতিরিক্ত (ক্রোমোসোম সংখ্যা 47) থাকার জন্য মঙ্গোলিজিম (Down's syndrome) দেখা দেয়।

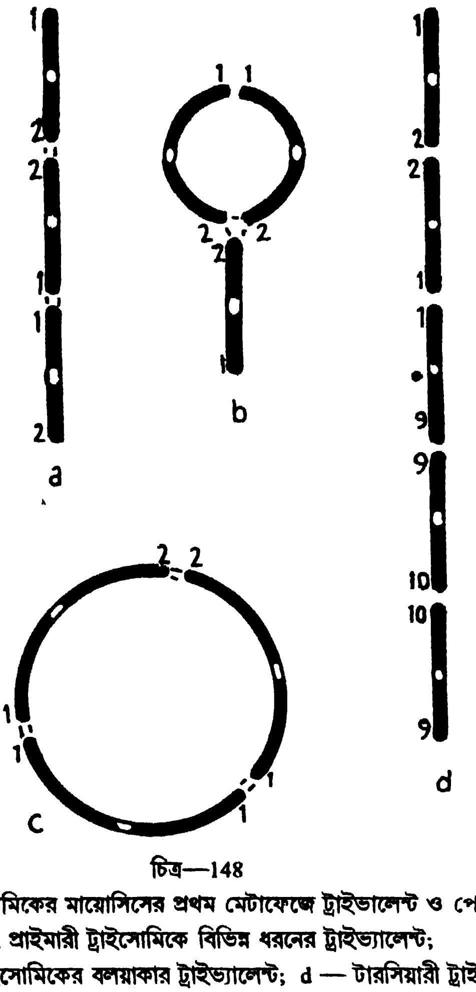
কোনও জীবে সম্ভাব্য বিভিন্ন রকম ট্রাইসোমিকের সংখ্যা ঐ জীবের হ্যাপ্লয়েড সংখ্যার সমান হয়। ধুতরার (*Datura stramonium*) হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোম সংখ্যা হল n = 12। A.F. Blakeslee (1930) ধুতরায় বারো রকমের ট্রাইসোমিক পেয়েছিলেন। এদের প্রত্যেকের একটা নিজস্ব ফেনোটাইপ (বাইরের চেহারা) আছে। প্রত্যেকটির ফল অর্থাৎ ক্যাপসিউলগুলি (capsule) পরস্পর ও স্বাভাবিক ডিপ্লয়েড থেকে আলাদা (চিত্র 147)। 'রোলড' (rolled) ধরনের ট্রাইসোমিকে (চিত্র 148) প্রথম ক্রোমোসোম (1–2) তিনটি থাকে ও মায়োসিসে এরা ট্রাইভ্যালেন্ট গঠন করে। যেসব ট্রাইসোমিকে অতিরিক্ত ক্রোমোসোমটি অপরিবর্তিত অর্থাৎ তিনটি ক্রোমোসোমই একই রকম (চিত্র 148a-b) থাকে, তাদের (a) প্রাইমারী ট্রাইসোমিক (primary trisomic) বলে।



চিত্র—147

ধুতরায় ডিপ্লয়েড এবং বারো রকমের ট্রাইসোমিক উদ্ভিদের ফলগুলি (capsule) দেখান হয়েছে

সেকেন্ডারী ট্রাইসোমিক (secondary trisomic) — এই রকম উদ্ভিদে অতিরিক্ত ক্রোমোসোমে কিছু পরিবর্তনের ফলে এর দু'টি প্রান্তই এক রকম থাকে। ধুতরায় প্রথম ক্রোমোসোমের (1–2) সেকেণ্ডারী ট্রাইসোমিকে 1–2 ক্রোমোসোম দুইটি ও 1–1 কিম্বা 2–2 ক্রোমোসোম একটি থাকে। ধুতরার 1–1 ক্রোমোসোমযুক্ত সেকেণ্ডারী ট্রাইসোমিককে 'পলিকার্পিক' (polycarpic) এবং 2–2 ক্রোমোসোমযুক্ত সেকেণ্ডারী ট্রাইসোমিককে (চিত্র 148c) 'সুগার লোফ' (sugar loaf) বলে। ভুট্টাতেও সেকেণ্ডারী ট্রাইসোমিক পাওয়া যায় (Rhoades 1938)।



চিত্র—148

বিভিন্ন রকমের ট্রাইসোমিকের মায়োসিসের প্রথম মেটাফেজে ট্রাইভালেন্ট ও পেন্টাভ্যালেন্ট। a-b, প্রাইমারী ট্রাইসোমিকে বিভিন্ন ধরনের ট্রাইভ্যালেন্ট; c - সেকেণ্ডারী ট্রাইসোমিকের বলয়াকার ট্রাইভ্যালেন্ট; d — টারসিয়ারী ট্রাইসোমিকের পাঁচটি ক্রোমোসোম দিয়ে গঠিত পেন্টাভ্যালেন্ট।

সেকেণ্ডারী ট্রাইসোমিকের মায়োসিসে তিনটি ক্রোমোসোম পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি বলয়াকার (ring) ট্রাইভ্যালেন্ট গঠন করে।

প্রাইমারী ট্রাইসোমিক থেকে সেকেণ্ডারী ট্রাইসোমিকের সৃষ্টি হয়। বেশিরভাগ সেকেণ্ডারী ট্রাইসোমিকের অতিরিক্ত ক্রোমোসোমটি আইসোক্রোমোসোম (isochromosome)। প্রাইমারী ট্রাইসোমিকের অতিরিক্ত ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারের ভ্রান্ত বিভাজনের (mis-division) ফলে এদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এছাড়া পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনের (pericentric inversion) মধ্যে ক্রসিং ওভারের ফলেও সেকেণ্ডারী ট্রাইসোমিকের সৃষ্টি হয়।

(c) **টারসিয়ারী ট্রাইসোমিক** (tartiary trisomic) অতিরিক্ত ক্রোমোসোমটি হোমোলোগাস নয় এমন দুইটি ক্রোমোসোমের অংশ দিয়ে তৈরি হয়। যেমন, ধুতরার (1-2) এবং (9–10) ক্রোমোসোমের মধ্যে ট্র্যান্সলোকেশন হলে (1–9) ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয় ও এই ক্রোমোসোমটি অতিরিক্ত থাকলে ঐ উদ্ভিদকে টারসিয়ারী ট্রাইসোমিক বলে। এদের মায়োসিসে পাঁচটি ক্রোমোসোম (দুইটি 1–2, একটি 1–9, দুইটি 9–10) একসাথে অবস্থান (148d) করতে পারে।

ট্রাইসোমিক বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমে জিনের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। যে ক্রোমোসোমের ট্রাইসোমিক সেই ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনের পৃথকীকরণ (seggregation) স্বাভাবিক মেণ্ডেলীয় সূত্রানুসারে হয় না।

দ্বিগুণ বা ডাবল ট্রাইসোমিক (double trisomic) (2n + 1 + 1) কোনও উদ্ভিদে দুইটি ক্রোমোসোমের তিনটি করে সদস্য উপস্থিত থাকলে এদের ডাবল ট্রাইসোমিক বলে। ধুতরায় ডাবল ট্রাইসোমিক পাওয়া গিয়েছে। সাধারণ উদ্ভিদের তুলনায় এদের প্রাণশক্তি কম হয়।

টেট্রাসোমিক (tetrasomic) (2n + 2)— টেট্রাসোমিকে কোনও নির্দিষ্ট ক্রোমোসোম দু'টি বেশি থাকে অর্থাৎ, ডিপ্লয়েড স্তরের টেট্রাসোমিকে (2n + 2) একটা ছাড়া সব ক্রোমোসোম দু'টি করে থাকে এবং ঐ নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমটি চারটি থাকে। টেট্রাসোমিক উদ্ভিদে ট্রাইসোমিকের তুলনায় জেনেটিক ভারসাম্য অনেক বেশি ব্যাহত হয় এবং এরা দুর্বল হয়। টেট্রাসোমিকে স্বপরাগযোগ (self-pollination) হলে ডিপ্লয়েড (2n) উদ্ভিদ, টেট্রাসোমিক (2n + 2) উদ্ভিদ কিম্বা প্রাইমারী বা সেকেণ্ডারী ট্রাইসোমিক (2n + 1) উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। ডিপ্লয়েডের সাথে টেট্রাসোমিকের সংকরণের ফলে ডিপ্লয়েড ও ট্রাইসোমিক উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়, কিন্তু কোনও টেট্রাসোমিক উদ্ভিদ তৈরি হয় না। n + 2 গ্যামেট নিষেক বা ফার্টিলাইজেশনে অংশ নেয় না। গমে পলিপ্লয়েড স্তরে টেট্রাসোমিক (6n + 2) পাওয়া গিয়েছে। গমে একুশ রকমের সম্ভাব্য সব টেট্রাসোমিকই পাওয়া গেছে। গমে দ্বিতীয় ক্রোমোসোমের টেট্রাসোমিক বিংশ ক্রোমোসোমের নালিসোমিকের (nullisomic) প্রভাব পূরণ করতে পারে। সুতরাং, দ্বিতীয় ও বিংশ ক্রোমোসোমের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু এই সামঞ্জস্য বা অনুরূপতা এত বেশি নয় যার ফলে ঐ দু'টি ক্রোমোসোম যুগ্ম অবস্থান করতে পারে।

এরকম অসমসংস্থ বা ননহোমোলোগাস ক্রোমোসোম যারা একে অন্যের প্রভাব

পূরণ করতে পারে, তাদের homoeologous ক্রোমোসোম বলে। E. R Sears এরকম পরিপূরক (compensating) নালিসোমিক টেট্রাসোমিকের (2n-2+2) সম্পূর্ণ সেট পেয়েছিলেন।

মনোসোমিক (monosomic) (2n–1) — কোনও জীবে স্বাভাবিকের তুলনায় একটি ক্রোমোসোম কম থাকলে তাকে মনোসোমিক বলে। ট্রাইসোমিকেব তুলনায় মনোসোমিক অনেক বেশি ক্ষতিকর। মনোসোমিকে ছোট ক্রোমোসোমের ঘাটতি থাকলে ঐ জীবটি বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু বড় ক্রোমোসোমের ঘাটতির ফলে ঐ মনোসোমিক জীবটি বেঁচে থাকতে পারে না। চতুর্থ ক্রোমোসোমেব মনোসোমিক (haplo-IV) ড্রসোফিলা বেঁচে থাকতে পারে, যদিও এরা দুর্বল হয় ও ধীরে ধীবে বাড়ে। কোনও কোনও পতঙ্গের পুরুষেবা স্বাভাবিক অবস্থায় মনোসোমিক হয়। কোনও জীবের সম্ভাব্য বিভিন্ন রকম মনোসোমিকের সংখ্যা এর হ্যাপ্লয়েড সংখ্যার সমান হয়।

উদ্ভিদে ডিপ্লয়েড স্তরের (2n–1) চেয়ে পলিপ্লয়েড স্তরে (3n–1, 4n–1 ইত্যাদি) মনোসোমিক বেশি দেখা যায়। McClıntock ভুট্টায ডিপ্লযেড স্তরে (2n–1) একটি মনোসোমিক পেয়েছিলেন। এখানে মায়োসিসে একটি ইউনিভ্যালেন্ট দেখা যায়। যেসব গ্যামেটে (n–1) ক্রোমোসোমের ঘাটতি থাকে সেগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। মনোসোমিকে সম্ভবত কোষ বিভাজনের বিশৃঙ্খলাব জন্য ইউনিভ্যালেন্ট থেকে টেলোসেন্ট্রিক (telocentric) বা আইসোক্রোমোসোমের (ısochromosome) সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোনও কোনও সময় ইউনিভ্যালেন্টটি অন্য ক্রোমোসোমেব চেয়ে আস্তে আস্তে মেরুব দিকে যায় ও কোনও অপত্য নিউক্লিয়াসেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এর ফলে অনেক বেশি সংখ্যক (n–1) গ্যামেট তৈরি হয়। McClıntock একটা ভুট্টা গাছের পরাগরেণু মাতৃকোষে নয়টি বাইভ্যালেন্ট ও একটি ইউনিভ্যালেন্ট দেখতে পান, কিন্তু এর মূলাগ্রের কোষেব (root tıp cell) ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 2n = 20। এর কারণ হল, খুব ছোট অবস্থায ঐ উদ্ভিদেব কোনও দেহ কোষে মাইটোসিসে বিশৃঙ্খলার ফলে উপরের অংশ মনোসোমিক হয়েছে। টমেটোতে (2n = 24) ডিপ্লযেড স্তরে মনোসোমিক পাওয়া গেছে।

পলিপ্লয়েড স্তরে *Nicotıana tabacum*-এ (4n – 1) এবং *Trıtıcum vulgare*-এ মনোসোমিক পাওয়া গিয়েছে। S. R. Sears গমেব (*Trıtıcum vulgare*) চাইনিজ স্প্রিং ভ্যারাইটিতে একুশ ধরনের মনোসোমিক পেয়েছিলেন। E R Clausen ও D. R. Cameron তামাকেও (n = 24) কুড়িটির বেশি মনোসোমিক পেয়েছিলেন। সাধারণত গমের মনোসোমিকের ফেনোটাইপের ওপর তেমন কোনও প্রভাব নেই। এর কারণ, এই সব মনোসোমিক পলিপ্লয়েড স্তরে হয়েছে। তবে গমের একটা নির্দিষ্ট মনোসোমিকে ফেনোটাইপ পরিবর্তিত হয় ও এই রকম উদ্ভিদকে 'স্পেলটয়েড' (speltoid) বলে। J. E. Endrizzi ও তাঁর সহকর্মীরা তুলায় (2n = 52) মনোসোমিক পেয়েছিলেন।

ডাবল মনোসোমিকে (2n–1–1) দু'টি আলাদা ক্রোমোসোমের কেবল একটি করে হোমোলোগ থাকে, অন্য হোমোলোগ দু'টি অনুপস্থিত থাকে, যেমন, গমে।

গমে ট্রিপিল (triple) মনোসোমিকও (2n–1–1–1) পাওয়া গেছে। এখানে তিনটি বিভিন্ন ক্রোমোসোমের একটি করে হোমোলোগ অনুপস্থিত থাকে।

মনোসোমিক থেকে মনোসোমিক (2n–1), স্বাভাবিক ডাইসোমিক (2n) এবং নালিসোমিক (2n–2) জীবের সৃষ্টি হয়। মনোসোমিকের এবং এর থেকে সৃষ্ট জীবের অঙ্গসংস্থানিক চরিত্র লক্ষ্য করে নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমে বিশেষ জিনের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। এই পদ্ধতিকে (monosomic analysis) বা মনোসোমিকের বিশ্লেষণ বলে।

নালিসোমিক (nullisomic) (2n – 2) — নালিসোমিক উদ্ভিদে কোনও একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের দু'টি হোমোলোগই অনুপস্থিত থাকে। এদের ফেনোটাইপ স্বাভাবিক উদ্ভিদের মত হয় না এবং এরা অনুর্বর ও দুর্বল হয়। নালিসোমিক উদ্ভিদ সাধারণত বেঁচে থাকতে পারে না। Sears গমে একুশ রকমের নালিসোমিক পেয়েছিলেন। ডিপ্লয়েড স্তরের চেয়ে পলিপ্লয়েড স্তরে নালিসোমিকের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি। সেজন্য গমে (n = 21) নানা রকম নালিসোমিক পাওয়া গেছে, কিন্তু বার্লিতে (n = 7) নালিসোমিক দেখা যায় না।

মনোসোমিক উদ্ভিদে স্বপরাগযোগের ফলে নালিসোমিকের সৃষ্টি হয়ে থাকে। নালিসোমিক উদ্ভিদ বেঁচে থাকলে তাদের কতকগুলি কাজে ব্যবহার করা হয়। এই উদ্ভিদকে পরীক্ষা করে অনুপস্থিত ক্রোমোসোমে কোন কোন চরিত্রের নিয়ন্ত্রক জিনগুলি অবস্থিত ছিল তা নির্ণয় করা যায়। নালিসোমিকের সাথে স্বাভাবিক উদ্ভিদের সংকরণ (hybridize) করে স্বাভাবিক গোষ্ঠীতে মনোসোমিকের হার নির্ধারণ করা হয়।

পলিপ্লয়েডের উৎপত্তি

অনেক উদ্ভিদ ও কিছু প্রাণী স্বাভাবিক অবস্থায় পলিপ্লয়েড। ডিপ্লয়েড অবস্থা পলিপ্লয়েডের চেয়ে প্রাচীন। মনে করা হয় যে, ডিপ্লয়েড থেকে পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়েছে। এই রকম উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবে বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি হয়ে থাকে। দেহ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়। যদি একটি বিভাজনশীল কোষের ক্রোমোসোমগুলি পৃথক হতে না পারে, কিম্বা ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ হওয়ার পর কোষ বিভাজন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে দ্বিগুণ সংখ্যক ক্রোমোসোমযুক্ত কোষের সৃষ্টি হয়। এই টেট্রাপ্লয়েড কোষে পরে বিভাজন হলে কতকগুলি টেট্রাপ্লয়েড কোষের সৃষ্টি হয়। যদি এরকম টেট্রাপ্লয়েড কোষ পুষ্প উৎপাদনে অংশ নেয়, তাহলে ডিপ্লয়েড গ্যামেট সৃষ্টি হবে। এর থেকে টেট্রাপ্লয়েড বীজ ও টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদের সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া জনন কোষে বেশি সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকলে ও ঐ গ্যামেট নিষিক্ত (fertilized) হলে পলিপ্লয়েড জীবের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

স্ত্রী বা পুং গ্যামেট তৈরির সময় মায়োসিসে বিশৃঙ্খলা হলে ডিপ্লয়েড গ্যামেট (2n) তৈরি হতে পারে। মায়োসিস বিভাজনে ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে যুগ্মতা হল এবং ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ হওয়ার পর কোনও কারণে সমসংস্থ বা হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি পরস্পর থেকে পৃথক হতে পারল না, এর ফলে একটি অপত্য কোষে সব ক্রোমোসোমগুলি যায় ও অন্য অপত্য কোষে কোনও ক্রোমোসোম থাকে না। ক্রোমোসোমযুক্ত কোষটিতে দ্বিতীয় বিভাজনের ফলে দুইটি ডিপ্লয়েড অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়, যা পরে ডিপ্লয়েড গ্যামেট গঠন করে। ক্রোমোসোমবিহীন কোষটি সঙ্কুচিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। এই ডিপ্লয়েড গ্যামেট হ্যাপ্লয়েড কিম্বা ডিপ্লয়েড গ্যামেটের সাথে মিলিত হলে যথাক্রমে ট্রিপ্লয়েড অথবা টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদ তৈরি হয়। পলিপ্লয়েড উদ্ভিদে স্বপরাগযোগ হলে, কিম্বা এই উদ্ভিদের সাথে অন্য ডিপ্লয়েড বা পলিপ্লয়েড উদ্ভিদের সংকরণের (hybridization) ফলে বিভিন্ন ধরনের পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়।

কৃত্রিম উপায়ে পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি

বিভিন্ন উদ্ভিদের পলিপ্লয়েড প্রকৃতির অবিষ্কার এবং পলিপ্লয়েডির ফলে উদ্ভিদের আয়তন ও সবলতা বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম পলিপ্লয়েড সৃষ্টির জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হন। পলিপ্লয়েড উদ্ভিদের সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, তবে সব পদ্ধতি সন্তোষজনক নয়। এখানে কৃত্রিম পলিপ্লয়েড তৈরি করার কয়েকটি পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হল।

(1) পলিপ্লয়েড সৃষ্টির একটি প্রাচীন উপায় হল 'যমজ পদ্ধতি' (twin method)। অঙ্কুরিত বীজে কখনও কখনও যমজ ভ্রূণ (embryo) পাওয়া যায়, যার থেকে হেটারোপ্লয়েড উদ্ভিদ তৈরি হয়। Muntzing (1937) পলিপ্লয়েড সৃষ্টির জন্য প্রথম এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন।

এছাড়া তাপমাত্রার পরিবর্তন করে, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে, অসমোটিক চাপের (osmotic pressure) তারতম্য ঘটিয়ে, আঘাত করে, ব্যাকটিরিয়া, পতঙ্গ প্রভৃতি জীবের সাহায্যে, কিম্বা বিকিরণ প্রয়োগ করে পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি করা হয়েছে।

(2) জনন কোষকে অল্প সময় বেশি তাপমাত্রায় রেখে Randolph (1932) পলিপ্লয়েড উদ্ভিদের সৃষ্টি করেছিলেন। তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তনে করে *Rhoeo*, *Tradescantia* এবং অন্যান্য উদ্ভিদে পলিপ্লয়েডি পাওয়া গিয়েছে। Sax *Tradescantia paludosa*-কে দুই সপ্তাহ 8°C তাপমাত্রায় ও তারপর 38°C-এ রেখে পরাগরেণুর অনেক অস্বাভাবিকতা দেখেছিলেন। স্পিণ্ডিল যথাযথভবে কাজ না করার জন্য কোনও কোনও পরাগরেণু ডিপ্লয়েড হয়। বেশি তাপমাত্রায় চার পাঁচ দিন রাখলে স্পিণ্ডিলই তৈরি হয় না ও পরাগরেণুগুলি ডিপ্লয়েড হয়। প্রাণীতেও দ্রুত তাপমাত্রার পরিবতর্নের ফলে পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়। *Triturhus*-এ কম তাপমাত্রায় ট্রিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়।

ডিম্বাণুকে 0–3°C তাপমাত্রায় কয়েক ঘন্টা রাখলে ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু তৈরি হয়। ঐ ডিম্বাণু পুং গ্যামেটের সাথে মিলিত হয়ে ট্রিপ্লয়েডের সৃষ্টি করে। একইভাবে 33.5 — 45°C তাপমাত্রায় 5–50 মিনিট রাখলে ট্রিপ্লয়েড জীবের সৃষ্টি হয়, কারণ কম বা বেশি তাপমাত্রায় মায়োসিস স্বাভাবিকভাবে হয় না।

(3) Greenleaf ও তার সহকর্মীরা (1938) দেখেন যে, বৃদ্ধিশীল তামাক গাছের (*Nicotiana tabacum*) আগাটা কেটে ফেলে ঐ কাটা অংশে ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (indole acetic acid) লাগালে ক্যালাস টিস্যু (callus tissue) তাড়াতাড়ি তৈরি হয়। ঐ ক্যালাস টিস্যুতে কোনও কোনও সময় দ্বিগুণ সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে ও এই সব কোষ থেকে সৃষ্ট শাখাটি পলিপ্লয়েড হয়। এভাবে টমেটোতেও টেট্রাপ্লয়েডের সৃষ্টি করা হয়েছে। টমেটো গাছের শীর্ষ মুকুল কেটে নিয়ে তার থেকে গাছ তৈবি করে দেখা গেছে যে, 30 শতাংশ উদ্ভিদে দ্বিগুণ সংখ্যক ক্রোমোসোম রয়েছে। Green leaf ইণ্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (IAA) ব্যবহার করে ডিপ্লয়েড তামাক গাছ থেকে 13.7% শতাংশ টেট্রাপ্লয়েড ও এক শতাংশ অক্টোপ্লয়েড গাছ পেয়েছিলেন।

(4) **কলচিসিন** (colchicine) **প্রয়োগ করে** — আগে যেসব পদ্ধতির বর্ণনা করা হল সেগুলির কোনওটাই তেমন সন্তোষজনক নয়। কলচিসিন ব্যবহার করে অনেক বেশি সংখ্যায় পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

কলচিসিন একটি উপক্ষার (alkaloid) যা *Colchicum autumnale* থেকে পাওয়া যায়। Honde (1887) *Colchicum autumnale* উদ্ভিদ থেকে কলচিসিন উৎপাদন করেন। পলিপ্লয়েডি সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে কলচিসিনের প্রভাব Dustin ('33, '34), Blakeslee ও Avery ('37) এবং Blakeslee ('39) লক্ষ্য করেন। তবে কলচিসিনে ক্রোমোসোম দ্বিগুণ করার ক্ষমতার প্রথম বিবরণ Levan ('38) এবং Eigsti ('38,'40) দেন। তবে *C. autumnale*-এ কলিচিসিনের কোনও প্রভাব নেই কারণ, ঐ উদ্ভিদে anticolchicine থাকে (Blakeslee '39)। বিভিন্ন উপায়ে কলচিসিন প্রয়োগ করা হয়, যেমন জলীয় দ্রবণে, ল্যানোলিন (lanoline) সহযোগে, স্টিয়ারিক অ্যাসিড বা মরফিন সহযোগে, অ্যাগার (agar) মাধ্যমে কিংবা গ্লিসারিনের সাথে। কোষ বিভাজনের সময় কলচিসিন স্পিণ্ডিল গঠন রোধ করে, কিন্তু ক্রোমোসোমগুলি বিভাজিত হয়। মেটাফেজ অবস্থা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। ক্রোমোসোমগুলি সঙ্কুচিত ও স্থূল হয়। ক্রোমাটিডগুলি কেবল সেন্ট্রোমিয়ার অংশ ছাড়া অন্যান্য অংশে আলাদা হয়ে যায়। কলচিসিন বেশিক্ষণ ধরে প্রয়োগ করলে ক্রোমাটিডগুলি সেন্ট্রোমিয়ার অংশেও আলাদা হয়ে যায়। মেটাফেজ থেকে কোষটি সরাসরি ইন্টারফেজ অবস্থায় চলে যায়। এর ফলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। তবে কখনও কখনও ক্রোমোসোমগুলি আবার বিভাজিত হয়ে অক্টোপ্লয়েড বা আরো উচ্চতর পলিপ্লয়েড কোষ গঠন করে। Levan কলচিসিন প্রয়োগ করে **পেঁয়াজের মূলের** কোষে 500 থেকে 1000টি পর্যন্ত ক্রোমোসোম

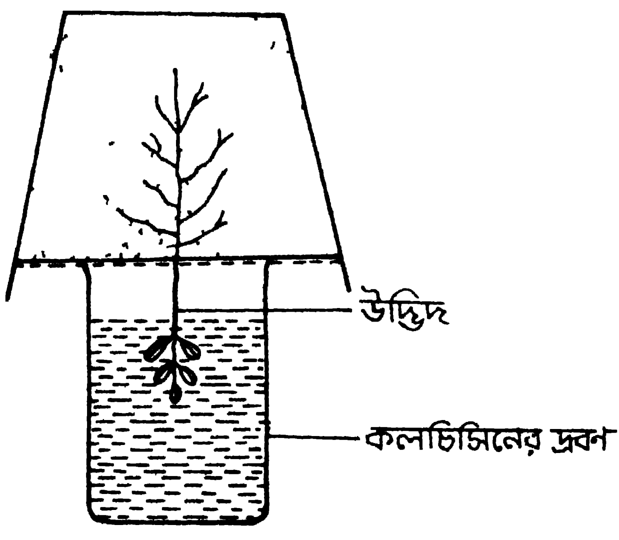
পেযেছিলেন। কলচিসিন প্রযোগ কবলে যে পবিবর্তিত মেটাফেজ দেখা যায, তাকে কলচিসিন মেটাফেজ বা C-মেটাফেজ বলে ও ঐ মাইটোসিসকে C-মাইটোসিস বলা হয। কলচিসিন প্রযোগ কবলে কোনও কোনও সময অ্যানইউপ্লযেডেবও (aneuploid) সৃষ্টি হয। Derman (1940), Derman, Smith ও Emsweller-এব (1953) মতে, কলচিসিন পদ্ধতি কার্যকবী কবতে হলে বৃদ্ধিশীল অঞ্চলেই কলচিসিন প্রযোগ কবা দবকাব।

উদ্ভিদেব বিভিন্ন অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাব কলচিসিন (colchicine) প্রযোগ কবা হয। সাধাবণত চাবা গাছেব ক্ষেত্রে এই মাত্রা 0 1–0 4 শতাংশ, বীজে 0 1–0 5 শতাংশ ও পবিণত উদ্ভিদে 0 2–0 4 শতাংশ হয। বিভিন্ন পবিবেশে কলচিসিন প্রযোগেব পদ্ধতিব তাবতম্য হয। কলচিসিন প্রযোগেব কযেকটি পদ্ধতিব বর্ণনা দেওযা হল।

(i) বীজে — (a) বীজগুলিকে 0 5 শতাংশ কলচিসিন ও 0 2 শতাংশ অ্যাগাব জেলীতে অঙ্কুবিত কবা হয। বীজ অঙ্কুবিত হবাব পব ভাল কবে ধুযে মাটিতে লাগান হয।

(b) Ramanujam ও Joshi (1941) 0 25 শতাংশ কলচিসিনেব জলীয দ্রবণে বীজগুলিকে 30 মিনিট বেখে তাবপব ঐ বীজ বপন কবেন।

(ii) চাবা গাছে — (a) Svalöf পদ্ধতি (Svalöf method) চাবাগাছগুলিকে উল্টোভাবে অর্থাৎ কাণ্ড নিচেব দিকে ও মূল ওপব দিকে কবে (চিত্র 149) 0 25



চিত্র—149

চাবাগাছে কলচিসিন প্রয়োগ কবাব পদ্ধতি

শতাংশ কলচিসিনের জলীয় দ্রবণে কাণ্ডটিকে ডুবিয়ে রাখা হয়। মূলের ওপর ভেজা ফিলটার কাগজ (filter paper) দেওয়া হয়, যাতে মূল শুকিয়ে না যায়। মূল কলচিসিন দ্রবণে ডুবান হয় না কারণ, ঐ দ্রবণ মূলের পক্ষে ক্ষতিকর। এইভাবে 30 মিনিট কলচিসিনের দ্রবণে ডুবিয়ে রাখার পরে ঐ চারাটি তুলে মাটিতে লাগান হয়।

(b) একবীজপত্রী উদ্ভিদে যেখানে শীর্ষের ভাজক কলা (meristematic tissue) অনেক নিচে থাকে, সেখানে বীজগুলি অঙ্কুরিত হওয়ার পর ঐ অঙ্কুরিত বীজের কাণ্ডের উপরিভাগ ব্লেড দিয়ে লম্বালম্বি ভাগ করা হয়। 0.05–0.1 শতাংশ কলচিসিনে ভেজান তুলা বা ব্লটিং ঐ কাটা অংশে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। চারাটিকে বেশি আর্দ্রতায় রাখা হয় ও দ্বিতীয়বার এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর একদিন বাদে চারাটি জলে ধুয়ে লাগান হয়। এই পদ্ধতি ধানের ক্ষেত্রে সফল হয়েছে (Loung 1951)।

(c) 0.5–0.2 শতাংশ কলচিসিনের জলীয় দ্রবণ ড্রপার দিয়ে 2 ফোঁটা চারা গাছের শীর্ষ মুকুলে বা পরিণত গাছের কাক্ষিক মুকুলে দিনে তিন বার ছয় দিন ধরে প্রয়োগ করা হয় (Evans 1955)।

(d) 0.5–1 শতাংশ কলচিসিনের জলীয় দ্রবণ তুলির সাহায্যে বৃদ্ধিশীল অঞ্চলে লাগান হয়। এই পদ্ধতি দৈনিক একবার করে দশ দিন প্রয়োগ করা হয় (Svalof)।

(e) কোনও কোনও সময় শীর্ষ মুকুলে কলচিসিনের ভেজা তুলা রেখে দেওয়া হয়।

(f) কখনও কখনও কলচিসিনের দ্রবণ সিরিঞ্জের সাহায্যে চারা গাছের কর্টেক্সে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

(iii) **পরিণত উদ্ভিদে** (a) শীর্ষ বা পার্শ্বীয় মুকুল থেকে কতকগুলি পাতা বাদ দেওয়া হয়। তারপর কলচিসিনে ভেজা তুলা বা জেলাটিনের (gelatine) টুকরো ঐ মুকুলের ওপর রেখে দেওয়া হয় যতক্ষণ না তুলা বা জেলাটিনের টুকরোটি শুকিয়ে যাচ্ছে (Hunter 1954)।

(b) গাছের ওপর কলচিসিন স্প্রে করা হয়।

(c) কখনও কখনও মুকুল একটি দড়ি দিয়ে আলগা করে পেঁচিয়ে ঐ দড়ির অন্য প্রান্ত কলচিসিনে ডুবিয়ে রাখা হয়।

প্রাণীতে কলচিসিন প্রয়োগ করলে C-মাইটোসিসযুক্ত কোষ তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়ে যায়। তবে কলচিসিন প্রয়োগ করে মুরগীতে পলিপ্লয়েডিব সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই পলিপ্লয়েড মোরগের ঝুঁটিগুলি স্বাভাবিকের দ্বিগুণ এবং লেজের পালকও অনেক বড়।

(5) 1955 খ্রিস্টাব্দে Nygren সংকর *Melandrium*-এর নিষিক্ত fertilized ডিম্বাণুতে নাইট্রাস অক্সাইড প্রয়োগ করে পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি করেছিলেন। পাঁচ অ্যাটমসফিয়্যার (atmosphere) চাপে ষোল ঘন্টার কম সময় নাইট্রাস অক্সাইড প্রয়োগ করলে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয।

(6) এছাড়া বেনজিন, অ্যাসিন্যাপথিন, ভেরাট্রিন, সালফানিলঅ্যামাইড, ক্লোরাল

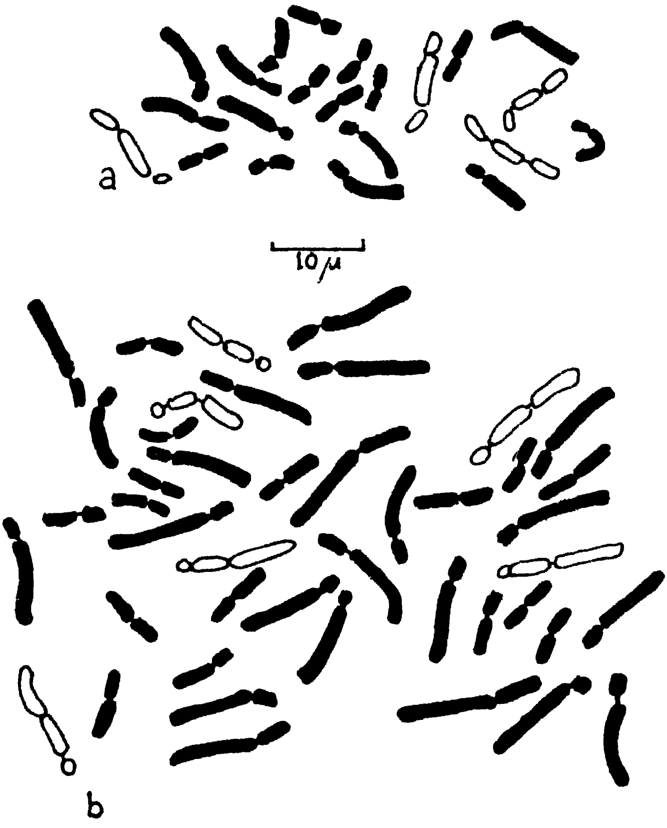
হাইড্রেট, হেটারো-অক্সিন, স্যানগুইনারিন হাইড্রোক্লোরাইড, গ্যামাক্সিন প্রয়োগ করে কিম্বা অক্সিজেনের অভাবের ফলেও পলিপ্লয়েড উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

পলিপ্লয়েডের বিস্তার (distribution of polyploids)

বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদে পলিপ্লয়েডি দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাকে পলিপ্লয়েডি সাধারণত দেখা যায় না, তবে *Saccharomyces cerviseae*-তে (ছত্রাক) টেট্রাপ্লয়েডি দেখা গিয়েছে। Tischler (1950) কিছু শৈবালে বিভিন্ন ধরনের পলিপ্লয়েডির বর্ণনা দিয়েছেন। ব্রায়োফাইটায়ও পলিপ্লয়েডি দেখা যায়। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে কেবল ব্যক্তবীজী (gymnosperm) উদ্ভিদের বিবর্তনে পলিপ্লয়েডির প্রভাব উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু টেরিডোফাইটা ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদে (angiosperm) এদের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। আধুনিক কালের Psilotales, Lycopodiales, এবং Equisetales-এর ক্রোমোসোম সংখ্যা এদের বহুল বিস্তৃত পূর্বপুরুষে পলিপ্লয়েডির উপস্থিতির ইঙ্গিত করে (Manton 1952)। *Psilotum*-এর দু'টি প্রজাতির ক্রোমোসোম সংখ্যা যথাক্রমে 2n=200 ও 400, *Tmesipteris*-এর ক্রোমোসোম সংখ্যা 2n = 400-র বেশি। *Equisetum*-এর ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 2n=216। *Lycopodium*-এর বিভিন্ন প্রজাতির ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 2n=48-68। এই সংখ্যা 260 পর্যন্ত হয়। *Isoetes* এর ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 2n=20 থেকে 100-র বেশি এবং *Selaginella*-এ 2n=18। ফার্ণের মধ্যে Ophioglossaceae সবচেয়ে প্রাচীন। *Ophioglossum vulgatum*-এর ক্রোমোসোম সংখ্যা 100-র বেশি, *O. lusitanicum*-এর 2n=250-260 এবং *Botrychium*-2n=26,36,144। প্রাচীন ও আধুনিক ফার্ণের যোগসূত্র Osmundaceae-র ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 2n=44। আধুনিক ফার্ণে পলিপ্লয়েডির বিস্তার খুব বেশি। Polypodiaceae-র অধিকাংশ ফার্ণই টেট্রাপ্লয়েড (4n)। তবে হেক্সাপ্লয়েড (6n), অক্টোপ্লয়েড (8n) ও ডেকাপ্লয়েড (10n) ফার্ণও দেখা যায়। পশ্চিম হিমালয়ের 23.8 শতাংশ এবং পূর্ব হিমালয়ের 36.20 শতাংশ ফার্ণ পলিপ্লয়েড (Mehra 1961)। বৃটেনের ফার্ণের 42% পলিপ্লয়েড এবং এদের বেশিরভাগই টেট্রাপ্লয়েড। ফার্ণের মধ্যে অটোপলিপ্লয়েড দেখা যায় না। ফার্ণের বিবর্তনে সংকরণ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন টেরিডোফাইটায় (Pteridophyte) পলিপ্লয়েডির উপস্থিতি এদের প্রাচীনতার নির্দেশ করে।

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে পলিপ্লয়েডি বিরল। Gnetales, *Podocarpus*-এর কয়েকটি প্রজাতি, *Juniperus chinensis* var, *pfitzeriana*, *Sequoia semiperivens* ইত্যাদি টেট্রাপ্লয়েড। এছাড়া Pseudolarix amabilis পলিপ্লয়েড। এখানে ক্রোমোসোম ভেঙে গিয়ে অর্থাৎ ফ্র্যাগমেন্টেশনের (fragmentation) মাধ্যমে পলিপ্লয়েডির সৃষ্টি হয়েছে। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের অর্ধেকের বেশি সদস্যই হল পলিপ্লয়েড (Stebbins'38, '40,'47,'50; Darlington ও Janaki Ammal'45; Tischler'50। Rosaceae, Polygonaceae, Malvaceae, Crassulaceae, Nymphaeaceae, Arabaceae-

তে পলিপ্লয়েডি খুব বেশি দেখা যায়। একবীজপত্রী উদ্ভিদ গোত্র Cyperaceae, Iridaceae-তে ইউপ্লয়েডি ও অ্যানইউপ্লয়েডি দেখা যায়। Gramineae-র প্রায় 75 শতাংশ উদ্ভিদই পলিপ্লয়েড। কোনও কোনও গোত্রে কয়েকটি গণ (genus) পলিপ্লয়েড



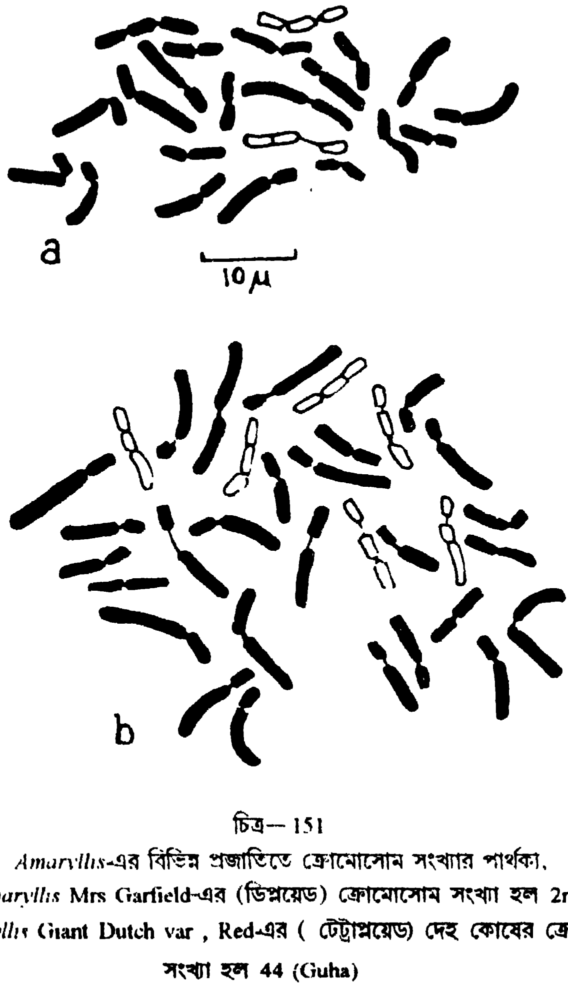
চিত্র—150

Crinum-এর বিভিন্ন প্রজাতিতে ক্রোমোসোম সংখ্যার পার্থক্য, a–*C. augustum*-এর (ডিপ্লয়েড) ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 2n=22,

b–*C. defixum*-এর (ট্রিপ্লয়েড) দেহ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 33 (Guha)

এবং অন্যরা ডিপ্লয়েড। Salicaceae-তে *Salix*-এ পলিপ্লয়েডি পাওয়া যায় না। কিন্তু *Populus* -এ পলিপ্লয়েডি দেখা যায় না। *Crepis* ও *Solanum*-এর কোনও কোনও প্রজাতি ডিপ্লয়েড কিন্তু অন্যান্য প্রজাতি পলিপ্লয়েড। কিছু গোত্রে, যেমন Rosaceae-তে পলিপ্লয়েডি ও সংকরণ একই সাথে হয়েছে এবং এইজন্য উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। Amaryllidaceae-তেও বিভিন্ন মাত্রার পলিপ্লয়েডি দেখা যায় (চিত্র 150-b, 151-a-b)।

উদ্ভিদের গঠনের সাথে পলিপ্লয়েডির সম্বন্ধ আছে (Stebbins 1938)। বহুবর্ষজীবী বীরুতে (herb) পলিপ্লয়েডি বেশি দেখা যায়। একবর্ষজীবী উদ্ভিদে পলিপ্লয়েডি বিরল।



চিত্র— 151

Amaryllis-এর বিভিন্ন প্রজাতিতে ক্রোমোসোম সংখ্যার পার্থক্য,

a *Amaryllis* Mrs Garfield-এর (ডিপ্লয়েড) ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 2n=22.

b *Amaryllis* Giant Dutch var , Red-এর (টেট্রাপ্লয়েড) দেহ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 44 (Guha)

এর কারণ হল, একবর্ষজীবী উদ্ভিদের জীবনকাল এত ছোট যে, ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যে এদের পলিপ্লয়েড হওয়ার সম্ভবনা খুব কম। বিশেষত একবর্ষজীবী অনুর্বর সংকর উদ্ভিদের পলিপ্লয়েড হওয়ার সম্ভবনা নেই বললেই চলে। কিন্তু বহুবর্ষজীবী অনুর্বর সংকর উদ্ভিদ যদি সবল হয় ও অঙ্গজ জননের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করে, তাহলে কোনও সময় আকস্মিকভাবে এদের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে উর্বর অ্যালোটেট্রাপ্লয়েডের সৃষ্টি হতে পারে।

কাষ্ঠল প্রজাতিতে (woody species) পলিপ্লয়েডি বেশি দেখা যায়। Stebbins-

এর (1938) মতে, বীরুতের তুলনায় বৃক্ষের মূল সংখ্যা (basic number) বেশি। কাষ্ঠল প্রজাতির মূল বা বেসিক সংখ্যা হল 11–16 এবং বীরুতে এই সংখ্যা সাধারণত 7, 8, 9 হয়। কাষ্ঠল প্রজাতির মূল সংখ্যা পলিপ্লয়েডির ফলেই সৃষ্টি হয়েছে কারণ, Annonaceae গোত্রের অন্তর্গত গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের বৃক্ষের মূল সংখা হল 7, 8, 9 ও Caesalpinoideae-র অন্তর্গত *Crepis*-এর মূল বেসিক সংখ্যা হল 6 ও 7। এর নিকট সম্বন্ধীয় গণ (genus) *Bauhinia*-র মূল ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 14 এবং এই সংখ্যা পলিপ্লয়েডির ফলেই হয়েছে। Avdulov-এর (1931) মতে, গ্র্যামিনীর মূল সংখ্যা 12 কারণ, তিনি ব্যাম্বুসী (Bambuceae) ও ফ্র্যাগমিটিফর্মিসে (Fragmitiformis) এই সংখ্যা পেয়েছিলেন। কিন্তু পরে ফ্যাগমিটিফর্মিস ট্রাইবের (tribe) একটা প্রাচীন গণ (genus) *Danthonia*-এ 6 ও 9 ক্রোমোসোম সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে বলা যায় যে, ফ্যাগমিটিফর্মিসের সংখ্যা অনেক দিন আগে পলিপ্লয়েডির ফলে হয়েছে। এছাড়া Oryzeae, Eragrastae, Panicaceae, Andropogoneae, Maydeae ইত্যাদি ট্রাইব (tribe) বহুদিন আগে পলিপ্লয়েডির ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। *Rumex, Dianthus, Mentha, Salix, Thalictrum* ইত্যাদির অধিকাংশ প্রজাতিই পলিপ্লয়েড।

বিবর্তনে পলিপ্লয়েডি

উদ্ভিদে স্বাভাবিক পলিপ্লয়েডির প্রাচুর্য বিবর্তনে এদের গুরুত্বের ইঙ্গিত করে। স্বাভাবিক পলিপ্লয়েডের সাথে তাদের ডিপ্লয়েড প্রজাতির তুলনা করে এবং কৃত্রিম পলিপ্লয়েডর সৃষ্টি করে বিবর্তনে পলিপ্লয়েডির ভূমিকা সম্বন্ধে জানা যায়। কোনও কোনও স্বাভাবিক পলিপ্লয়েডের প্রত্যাশিত ডিপ্লয়েড মাতা পিতা থেকে কৃত্রিম পলিপ্লয়েড সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এই পলিপ্লয়েড স্বাভাবিক পলিপ্লয়েডের অনুরূপ হয়। এইভাবে *Galeopsis tetrahit, Nicotiana tabacum, Gossypium hirsutum* ইত্যাদি কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ক্রোমোসোমের সংখ্যা বাড়ার ফলে ক্রমবিকাশের কতখানি সুবিধা হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেগমেন্টাল (segmental) বা আংশিক পলিপ্লয়েডের সাথে আসল অটোপলিপ্লয়েডের সামঞ্জস্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিবর্তনে অটোপলিপ্লয়েডের ভূমিকা সম্বন্ধে আগে যে ধারণা করা হত তা নিযে প্রশ্ন করা যায়। Stebbins-এর মতে, প্রকৃত অটোটেট্রাপ্লয়েড *Galax aphylla*-র ডিপ্লয়েড পূর্বপুরুষ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই অটোটেট্রাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েডের মধ্যে বহিঃগঠন, বিস্তার কিম্বা শারীরতত্ত্বের দিক দিয়ে কোনও পার্থক্য নেই। সুতরাং, এখানে পলিপ্লয়েডির বিশেষ কোনও গুরুত্ব নেই। তবে অটোপলিপ্লয়েড সংকরণকে সহায়তা করে। যেসব উদ্ভিদে ডিপ্লয়েড স্তরে সংকর তৈরি করা যায় না, সেখানে পলিপ্লয়েডি সংকরণকে সফল করে। Gustafson এর মতে, কেবল পলিপ্লয়েডি ক্রমবিকাশে নতুন পথের সৃষ্টি করতে পারে

না। পলিপ্লয়েডি উদ্ভিদের সংকরণ ও বিস্তারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এটাই হ'ল প্রকৃতিতে পলিপ্লয়েডির প্রধান ভূমিকা। সংকরণ ও ক্রোমোসোমের সংখ্যা বৃদ্ধি কেবল আকস্মিকভাবে একসাথে হয়। Clausen, Keck ও Heisey (1945) বলেন যে, সব সংকর উদ্ভিদই সবল, উর্বর পলিপ্লয়েডে পরিবর্তিত হয় না। বরং বেশিরভাগ সংকর উদ্ভিদ প্রতিযোগিতায় অসফল হয়ে বাতিল হয়ে যায়।

পলিপ্লয়েডের মধ্যে টেট্রাপ্লয়েড সবচেয়ে সুবিধাজনক। টেট্রাপ্লয়েড স্তরের চেয়ে উচ্চতর পলিপ্লয়েডির ফলে জটিলতা বাড়ে। জিনের নতুন সংযোগ বা রিকমবিনেশন (recombination) কম হয় ও ক্রমবিকাশের ধারা স্তব্ধ হয়ে যায়। *Psilotum, Tmesipteris, Ophioglossum* ইত্যাদি এর উদাহরণ।

পলিপ্লয়েডির ফলে ডিপ্লয়েড অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয় না, কেবল এর পুনর্বিন্যাস হয়। পলিপ্লয়েডি ও সংকরণের সাথে উর্বরতা ও গঠনগত পার্থক্য জড়িত থাকলে তবেই নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হতে পারে। নবগঠিত পলিপ্লয়েডের সাফল্য নির্ভর করে এর জনন ক্ষমতার উপর।

উদ্ভিদে ক্রমবিকাশের ধারা জটিল, কারণ এখানে পলিপ্লয়েডি ও সংকরণ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের কোনও গণ (genus) বা গোত্রের (family) কিছু জিন অন্য কোনও গণ বা গোত্রের কোনও কোনও জিনের মত হতে পারে, যদিও এই উদ্ভিদগুলির মধ্যে আর কোনও সামঞ্জস্য দেখা যায় না। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে মতভেদ আছে। বহু স্বনামধন্য বিজ্ঞানী যেমন, Benthum ও Hooker, Engler, Wettstein, Bessy, Hutchinson প্রত্যেকে উদ্ভিদের পৃথক পৃথক শ্রেণী বিভাগ করেছেন। এই পার্থক্যের কারণ হল যে, প্রত্যেক বিজ্ঞানী শ্রেণী বিভাগের জন্য আলাদা চরিত্র নির্বাচন করেছেন। সুতরাং, প্রত্যেক শ্রেণী বিভাগই ঠিক। বিবর্তনের জালিকাকার ধারাই এই বৈষম্যের কারণ।

জিন মিউটেশন, ক্রোমোসোমের অস্বাভাবিকতা, জিনের নতুন সংযোগ বা রিকমবিনেশন (recombination), অ্যানইউপ্লয়েডি ও নির্বাচন (selection) ডিপ্লয়েড স্তরে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে। ডিপ্লয়েড ও কিছু পরিমাণে টেট্রাপ্লয়েড হল নতুন গণ (genus) ও গোত্রের (family) উৎস। উচ্চতর পলিপ্লয়েডির ফলে কেবল নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং, পলিপ্লয়েডি হল একটি রক্ষণশীল শক্তি। উচ্চতর উদ্ভিদের প্রধান প্রধান চরিত্র যেমন, বিযুক্তদল (polypetaly) থেকে যুক্তদল (gamopetaly), অধিগর্ভ (superior ovary) থেকে অধোগর্ভ (inferior ovary), সমাঙ্গ (actinomorphy) থেকে অসমাঙ্গ (zygomorplhy) ইত্যাদি মূলত মিউটেশন ও রিকমবিনেশনের মাধ্যমে হয়। সুবিধাজনক রিকমবিনেশন নির্বাচিত হয়। সুতরাং, সপুষ্পক উদ্ভিদে মিউটেশন, রিকমবিনেশন, নির্বাচন ও অন্তরণ বা আইসোলেশন (isolation) বিবর্তনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে এবং পলিপ্লয়েডি রিকমবিনেশনকে স্থায়ী করতে সাহায্য করে।

Brassica ও অন্যান্য উদ্ভিদের ওপর বিভিন্ন গবেষণা থেকে শস্যের বিবর্তনে

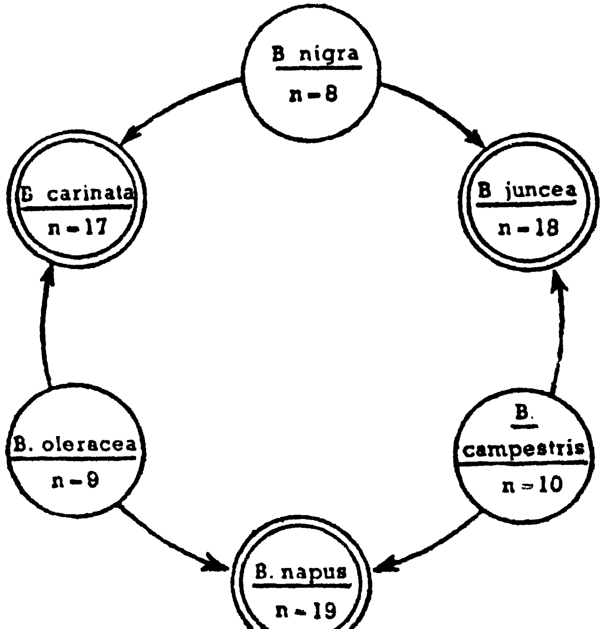
পলিপ্লয়েডির ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। *Brassica*-র বিভিন্ন প্রজাতি চাষ করা হয়, যেমন, *B. nigra* (কাল শর্ষে) (n=8), *B. oleracea* (বাঁধাকপি, ফুলকপি) (n=10), *B. campestris* (শালগম) (n=10), *B. juncea* (রাই) (n=18) এবং *B. napus* (শর্ষে) (n=19) ইত্যাদি। 1934 খ্রিস্টাব্দে Morinaga ও 1935 খ্রিস্টাব্দে U. *B. juncea, B. napus* এবং *B. carinata*-র অ্যামফিডিপ্লয়েড (amphidiploid) উৎপত্তির ছক তৈরি করেন। U (1935) *B. oleracea* ও *B. campestris* এর মধ্যে সংকরণ করে কতগুলি সংকর উদ্ভিদ পান। এদের বীজ উৎপাদনের ক্ষমতা খুব কম। তবে তিনি একটি অ্যামফিডিপ্লয়েড সংকর উদ্ভিদ (2n=38) পান, যার বাইরের গঠন *B. napus*-এর মত। Howard (1942) *B. chinensis* (*B. campestris*-এর একটি ভ্যারাইটি) ও *B. oleracea*-র সংকরণ করে *B. napus*-এর মতন একটি উদ্ভিদ পেয়েছিলেন। Frandsen এই রকম সংকরণ করে *B. pseudonapus* পেয়েছিলেন। এই উদ্ভিদে মায়োসিস নিয়মিত হয় ও এর সাথে সহজেই *B. napus*-এর ক্রস (cross) করা যায়। Rudorf এবং Olson কৃত্রিম উপায়ে *B. napus* উৎপাদনে করতে সক্ষম হন। Frandsen (1943) টেট্রাপ্লয়েড *B. nigra*-র সাথে *B. campestris*-এর সংকরণ করে *B. juncea* সৃষ্টি করেছিলেন। এই বকমের সংকরণ থেকে Howard (1942), Ramanujam, Srinivaschar, *B. juncea*-র মত অ্যামফিডিপ্লয়েড পেয়েছিলেন। Frandsen (1947) কৃত্রিন উপায়ে *B. carinata*-র সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট এই উদ্ভিদের সাথে সহজেই স্বাভাবিক *B.carinata*-র পরাগযোগ সম্ভব হয়। *Brassica*-র বিভিন্ন প্রজাতির সম্ভাব্য উৎপত্তির চিত্র 152-এ দেখান হয়েছে। *Gossypium* (তুলা) ও *Triticum*-এ (গম) এই রকম সংকরণ ও অ্যামফিডিপ্লয়েডির মাধ্যমে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। Goodspeed ও Clausen (1925) ডিপ্লয়েড *Nicotiana glutinosa*-র সাথে টেট্রাপ্লয়েড *N. tabacum*-এর সংকরণ করেছিলেন। এই সংকর উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে হেক্সাপ্লয়েড *N. digitalis*-এর সৃষ্টি হয়েছিল। Goodspeed ও Clausen-এর মতে, *N. sylvestris*-এর (2n=24) সাথে *N.tomentosiformis*-এর (2n=24) সংকরণ এবং ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে সাধারণ তামাক *N. tabacum*-এর (2n=48) সৃষ্টি হয়েছে। গম, ধান ইত্যাদি বিভিন্ন শস্যের বিবর্তনেও পলিপ্লয়েডির ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

ক্রোমোসোমের সংখ্যা অনুসারে গমের (*Triticum*) বিভিন্ন প্রজাতিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(1) আইনকর্ণ (Einkorn) শ্রেণীর গম ডিপ্লয়েড (2n=14)। *T. monococcum* এই শ্রেণীর গম। এদের AA জিনোম থাকে। আইনকর্ণ গমের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হয়।

(2) এমার (Emmer) শ্রেণীর গম টেট্রাপ্লয়েড (2n=28)। *T. dicoccoides, T. dicoccum, T. durum, T. persicum, T. polonicum* ও *T. turgidum* এই

শ্রেণীর অন্তর্গত। এমার শ্রেণীর গমে AABB জিনোম থাকে ও এদের রোগ প্রতিবোধ ক্ষমতা থাকে।



চিত্র—152

Brassica-র বিভিন্ন প্রজাতির সম্ভাব্য উৎপত্তির চিত্র

(3) ভালগার (Vulgare) বা ডিঙ্কেল (Dinkel) শ্রেণীর গম অ্যালোহেক্সাপ্লয়েড (2n=42)। *T. aestivum* (=*T. vulgare*) *T. compactum*, *T.spelta* ডিঙ্কেল শ্রেণীর গম। ডিঙ্কেল গম খুব ভাল জাতের, কিন্তু এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত কম। এই গমে AABBDD জিনোম থাকে। AA জিনোমযুক্ত einkorn গম সবচেয়ে প্রাচীন। AABB জিনোমযুক্ত emmer গম আইনকর্ণ গম থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের ঘাস *Aegilops*-এর সাথে emmer গমের সংকরণ এবং সংকর উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ডিঙ্কেল গমের উৎপত্তি হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে গমের প্রজাতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা যায়।

(1)	*T. monococcum*	×	*T .turgidum*
	AA (2n=14)	↓	AABB(2n=28)
	আইনকর্ণ		এমার
	F_1	AAB (2n=21)	
		মায়োসিস $7_{II} + 7_{I}$	

সুতরাং, *T. turgidum*-এর একটি জিনোম (A) *T. monococcum*-এর মতো এবং সেজন্য এরা যুগ্ম অবস্থান করে ও 7টা বাইভ্যালেন্ট তৈরি হয়। *T. turgidum*-এর অন্য জিনোমটি ইউনিভ্যালেন্ট হিসাবে থাকে।

(2) *T. turgidum* × *T.aestivum* (= *T. vulgare*)

AA BB (2n=28) — AABBDD (2n=42)

এমার — ডিঙ্কেল

↓

F_1 AABBD (2n=35)

মায়োসিস $14_{II} + 7_I$

ডিঙ্কেল গমের দু'টি জিনোম (AB) এমারের দু'টি জিনোমের সাথে যুগ্ম অবস্থান করায় 14 টা বাইভ্যালেন্ট তৈরি হয়। ডিঙ্কেল গমের অন্য জিনোমটি (D) ইউনিভ্যালেন্ট হিসাবে থাকে। সুতরাং, ডিঙ্কেল গমের AB জিনোম এমার গম থেকে এসেছে।

(3) *T. monococcum* × *Aegilops speltoides*

AA (2n=14) — BB (2n=14)

আইনকর্ণ

↓

AB

F_1 অনুর্বর (2n = 14)

↓ ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে

AABB

উর্বর (2n = 28)

এমার

এমার গমের B জিনোম *Aegilops* থেকে এসেছে এবং আইনকর্ণ গমের সাথে *A. speltoides* সংকরণের ফলে এমার গমের সৃষ্টি হয়েছে। এমার গমের (AABB, 2n = 28) সাথে *A. speltoides* (BB, 2n = 14) ব্যাক ক্রস করলে 7টি বাইভ্যালেন্ট BB ও 7টি ইউনিভ্যালেন্ট (A) গঠিত হয়।

(4) *T. dicoccum* × *A.squarrosa* (=*T. vulgare*)
AABB (2n = 28) DD (2n = 14)
এমার

F_1 ABD (2n = 21)

ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে

AABBDD (2n = 42)

এই উদ্ভিদটি *T. spelta*-র (ডিঙ্কেল গম) মতো।

(5) *T. spelta* × *A. squarrosa*
(2n = 42) AABBDD DD (2n = 14)
ডিঙ্কেল

F_1 ABDD (2n = 28)
মায়োসিস $7_{II} + 14_I$

এই গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে, ডিঙ্কেল গ[illegible] এমার গম ও *A. squarrosa*-র মিলনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে।

চিত্র 153-এ আইনকর্ণ, এমার, ডিঙ্কেল গম ও -এর বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সম্পর্ক দেখান হয়েছে।

ধানেও পলিপ্লয়েডি দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন জিনোমের ভিত্তিতে ধানেব বিভিন্ন প্রজাতিগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন —

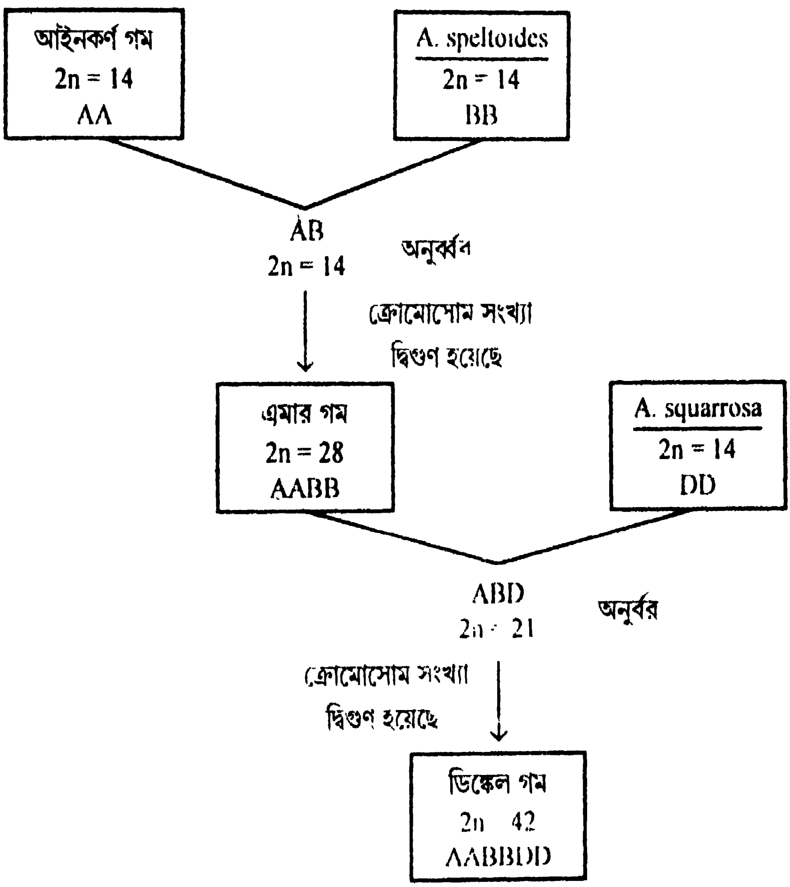
(1) Sativa শ্রেণী — জিনোম AA (2n=24) *O. perennis*, *O. glaberrima*, *O. cubensis* ইত্যাদি।

(2) Granulata শ্রেণী — জিনোম BB (2n=24), *O. granulata*।

(3) Officinalis শ্রেণী — জিনোম CC (2n=24), *O. officinalis*।

CCDD জিনোমযুক্ত আমেরিকার টেট্রাপ্লয়েড প্রজাতি হল *O. latifolia* এবং *O. alata* (2n=48)। টেট্রাপ্লয়েড *O. minuta* ধান *O. eichingeri*-তে BBCC জিনোম থাকে।

ডিপ্লয়েড ধানের সাথে টেট্রাপ্লয়েড ধানের সংকরণ করে ট্রিপ্লয়েড (3n) ধানের সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকৃতিতেও কখনও কখনও ট্রিপ্লয়েড ধান দেখা যায়। সম্ভবত হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড গ্যামেটের মিলনের ফলে এই ধানের সৃষ্টি হয়। টেট্রাপ্লয়েড



চিত্র—153

আইনকর্ণ, এমার, ডিস্কেল গম এবং *Aegilops*-এর বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সম্পর্ক দেখান হয়েছে।

ধানও প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এই ধান আংশিক অনুর্বর, তবে ডিপ্লয়েডের তুলনায় এই উদ্ভিদ বড় হয়, এদের পাতা, মঞ্জরী, বীজ ইত্যাদিও বড় হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

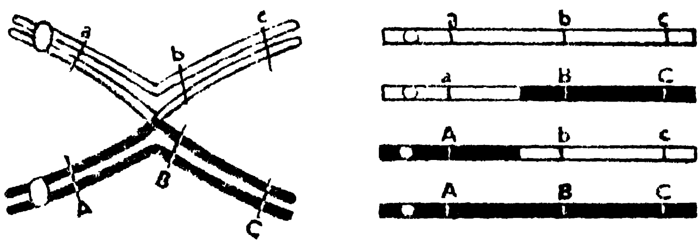
ক্রসিং ওভার
(Crossing Over)

হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের নন সিস্টার ক্রোমাটিডেব মধ্যে অংশ বিনিময়কে Morgan ক্রসিং ওভার আখ্যা দিয়েছেন। একই ক্রোমোসোমে অবস্থিত বিভিন্ন জিনের একসাথে থাকার প্রবণতা আছে। এই অবস্থাকে লিঙ্কেজ (linkage) বা সংযুক্ততা বলে। ক্রসিং ওভার হলে লিঙ্কেজের হার কমে যায় অর্থাৎ, লিঙ্কেজ অসম্পূর্ণ হয়।

1909 খ্রিস্টাব্দে বেলজিয়ান বিজ্ঞানী Jansens কায়েসমা গঠনের প্রক্রিয়া সঠিকভাবে বুঝতে পারেন। তিনি বলেন যে, এই কায়েসমা অঞ্চলেই ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশ বিনিময় হয়। মায়োসিস বিভাজনের জাইগোটিনে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি যুগ্ম অবস্থান করে। প্যাকিটিনে প্রত্যেক ক্রোমোসোম লম্বালম্বিভাবে খণ্ডিত হয়ে দু'টি ক্রোমাটিড গঠন করে। এই সময়ই ক্রোমাটিডগুলি অংশ বিনিময় করে অর্থাৎ, ক্রসিং ওভার হয়। ক্রোমোসোমের কোনও একটি স্থানে ক্রসিং ওভার কেবল দু'টি ক্রোমাটিডের মধ্যে হয়। ক্রসিং ওভারের ফলে ক্রোমাটিড দু'টি সমান অংশ বিনিময় করে। এর ফলে নবগঠিত ক্রোমাটিডগুলি কোনও জিন হারায় না বা এখানে অতিরিক্ত কোনও জিন যুক্ত হয় না। নতুন ক্রোমাটিডের কিছু অংশ মাতৃ ক্রোমোসোম থেকে ও বাকী অংশ পিতৃ ক্রোমোসোম থেকে আসে। সাধারণত অভগ্নী (non-sister) ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়।

বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, ক্রসিং ওভার প্যাকিটিন অবস্থায় ক্রোমোসোম দ্বিগুণ হওয়ার পর অর্থাৎ, চার সূত্রযুক্ত অবস্থায় হয়। যদি বাইভ্যালেন্টের দ্বিসূত্রযুক্ত অবস্থায় রিকমবিনেশন হত, তাহলে একটি ক্রসিং ওভারের ফলে চারটি রিকমবিনেশন টাইপ দেখা দিত। যদি বাইভ্যালেন্টের চার সূত্রযুক্ত অবস্থায় একটি ক্রসিং ওভার হয়, তাহলে দু'টি রিকমবিনেশন টাইপ ও দু'টি ক্রসওভারবিহীন টাইপ দেখা দেয়। *Neurospora, Drosophila* ও অন্যান্য জীবে বিভিন্ন পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ক্রসিং ওভার চার সূত্রযুক্ত অবস্থায় হয়। কোনও ক্রোমোসোমে একটি ক্রসিং ওভার হলে, তাকে single (একক) ক্রসিং ওভার বলে। একটি ক্রোমোসোমে দু'টি ক্রসিং ওভার হলে, তাকে double (দ্বি)-ক্রসিং ওভার এবং তিনটি ক্রসিং ওভার হলে তাকে tripple (ত্রি)-ক্রসিং ওভার বলে। কোনও ক্রোমোসোমে একটি ক্রসিং

ওভারের তুলনায় দু'টি ক্রসিং ওভারের হার কম হয়। একইভাবে তিনটি ক্রসিং ওভারের হার দু'টি কিম্বা একটি ক্রসিং ওভারের তুলনায় অনেক কম হয়। একটি ক্রোমোসোমে দু'টি জিনের মধ্যে দূরত্ব যত বেশি হবে, ততই তাদের মধ্যে একাধিক কায়েসমা (chiasma) গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। কোনও ক্রোমোসোমে কায়েসমার সংখ্যা ঐ ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভরশীল। দুই জোড়া লিঙ্কড (linked বা সংযুক্ত) জিনের (একই ক্রোমোসোমে অবস্থিত বিভিন্ন জিন) মধ্যে কোনও একটি স্থানে ক্রসিং ওভার হলে, চারটি ক্রোমাটিডের মধ্যে কেবল দু'টি পরিবর্তিত হয় (চিত্র 154)। যে দু'টি ক্রোমাটিডে ক্রসিং ওভার হয়নি তারা অপরিবর্তিত থাকে। জিনের রিকমবিনেশন (recombination) দেখে ক্রসিং ওভার দু'টি বা তিনটি কিম্বা চারটি ক্রোমোটিডে হয়েছে তা বোঝা সম্ভব নয়। তবে *Neurospora* ও কোনও কোনও নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে ক্রসিং ওভার কয়টি ক্রোমাটিডে হয়েছে তা বোঝা যায়। *Neurospora*-র অ্যাসাকোরেণুগুলি (ascos-pore) পরীক্ষা করে ক্রোমাটিডের পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা বোঝা সম্ভব।



চিত্র—154

একটি বাইভ্যালেন্টে একটি ক্রসিং ওভারের ফলে দু'টি ক্রোমাটিড পরিবর্তিত হয়েছে

একটি বাইভ্যালেন্টে একাধিক কায়েসমা (chiasma) তৈরি হলে লিঙ্কেজ গ্রুপের (linkage group) পুনর্বিন্যাসের সুযোগ বাড়ে। কোনও নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমে কায়েসমার সংখ্যা বিভিন্ন কোষে সাধারণত একই থাকে। Bridges দেখেন যে, দু'টি লিঙ্কড চরিত্রের মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার সচরাচর পঞ্চাশ শতাংশের বেশি হয় না।

তিনটি ক্রোমাটিডের মধ্যে দু'টি ক্রসিং ওভার হলে, বিভিন্ন প্রকারের ক্রোমাটিডে (অর্থাৎ ক্রসওভার বিহীন, একটি ক্রসওভারযুক্ত ও দু'টি ক্রসওভারযুক্ত ক্রোমাটিড) পাওয়া যেতে পারে (চিত্র 155 iii)। সাধারণত ক্রসওভারবিহীন, একটি ক্রসওভারযুক্ত ও দু'টি ক্রসওভারযুক্ত ক্রোমাটিড 1 : 2 : 1 অনুপাতে পাওয়া যায়। একটি বাইভ্যালেন্টে দু'টি ক্রসিং ওভারের ফলে দু'টি, তিনটি বা চারটি ক্রোমাটিডই পরিবর্তিত হতে পারে (চিত্র 155 i-iv)।

ইন্টারফেয়্যারেন্স (interference) ও কোয়েনসাইডেন্স (coincidence)

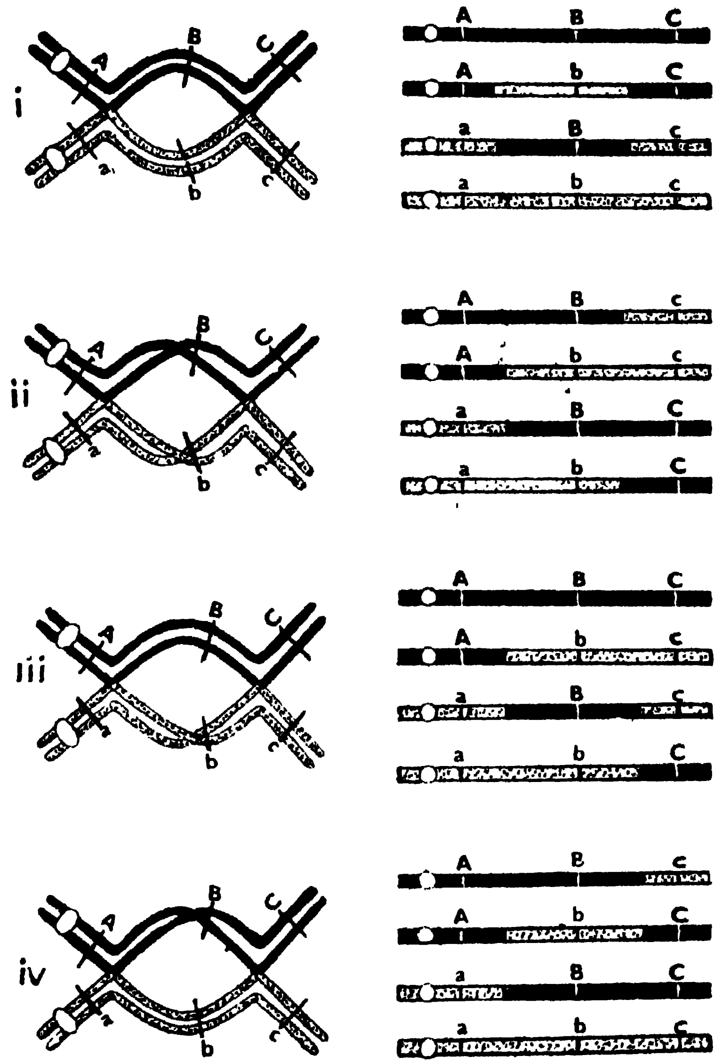
Drosophila-র ওপর গবেষণা থেকে Muller 1911 খ্রিস্টাব্দে ইন্টারফেয়্যারেন্স (interference) বা প্রতিবন্ধক আবিষ্কার করেন। যখন দু'টি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের দু'টি ক্রোমাটিডের মধ্যে কোনও একটি স্থানে ক্রসিং ওভার হয় তখন ঐ ক্রসিং ওভারের স্থান থেকে কিছুটা দূরত্বের মধ্যে দ্বিতীয় ক্রসিং ওভার হতে পারে না অর্থাৎ, কোনও একটি স্থানের ক্রসিং ওভার নিকটবর্তী অঞ্চলের ক্রস ওভারকে বাঁধা দেয়। এই অবস্থাকে ইন্টারফেয়্যারেন্স বা প্রতিবন্ধক বলা হয়। ইন্টারফেয়্যারেন্সের মাত্রা একই কোষের বিভিন্ন ক্রোমোসোমে কিম্বা একই ক্রোমোসোমের বিভিন্ন অংশে আলাদা হয়। ইন্টারফেয়্যারেন্সের জন্য *Drosophila melanogaster*-এর X-ক্রোমোসোমের দশ একক বা তার কম ব্যবধানের মধ্যে দু'টি ক্রসিং ওভার হয় না। দূরত্ব যত বাড়ে, ইন্টারফেয়্যারেন্সের মাত্রা তত কমে। যথেষ্ট ব্যবধানে ইন্টারফেয়্যারেন্স দেখা যায় না অর্থাৎ এর মাত্রা 0 হয়। ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমে 45 একক ব্যবধানে ইন্টারফেয়্যাবেন্স সম্পূর্ণ দূর হয়। এরকম পজিটিভ ইন্টারফেয়্যারেন্স ছাড়া কোনও কোনও ক্ষেত্রে নেগেটিভ ইন্টারফেয়ারেন্স দেখা গিয়েছে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে একটি স্থানের ক্রসিং ওভার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রিকমবিনেশনেব মাত্রা বাড়িযে দেয।

ইন্টাবফেয়্যারেন্সের বিপরীত প্রক্রিয়াকে coincidence বা সমস্থানিকতা বলা হয। ইন্টাবফেয়্যারেন্স সম্ভাবনার মতবাদ দিয়ে ভালভাবে বোঝা যায়। ভুট্টায় bm ও pr জিনের মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার 22.27% (অর্থাৎ 0.2227)। pr ও v-র মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার হল 43.37% (অর্থাৎ 0.4337)। bm ও pr এবং pr ও v-র মধ্যে একই সাথে ক্রসিং ওভারের সম্ভবনা হল 0.2227 × 0.4337 বা 9.66। কোনও প্রতিবন্ধক বা ইন্টারফেয়্যারেন্স না থাকলে 9.66 শতাংশ ক্ষেত্রে দু'টি ক্রসিং ওভাব হয় (double crossing over)। কিন্তু কার্যত 7.75% ডাবল ক্রসিং ওভাব পাওয়া যায়। পর্যবেক্ষিত ও প্রত্যাশিত হারের এই তফাৎ ইন্টারফেয়্যারেন্সের জন্য হয। পর্যবেক্ষিত ক্রস ওভারের শতকরা হার ও প্রত্যাশিত হারের অনুপাতকে সমস্থানিকতা বা কোয়েনসাইডেন্স (coincidence) বলে। কোয়েনসাইডেন্সের

$$\text{কোয়েফিসেন্ট} = \frac{\text{পর্যবেক্ষিত ডাবল ক্রস ওভারের শতকরা হার}}{\text{প্রত্যাশিত ডাবল ক্রস ওভারের শতকরা হার}}$$

। ভুট্টার এই পরীক্ষায় কোয়েনসাইডেন্স হল $\frac{7.75}{9.66}$ বা 0.802। প্রত্যাশিত অনুপাতের সাথে পর্যবেক্ষিত অনুপাতের কোনও পার্থক্য না থাকলে কোয়েনসাইডেন্স 1 ও ইন্টারফেয়্যারেন্স 0 হয়। সুতরাং, কোযেনসাইডেন্স যত বেশি হবে, ইন্টারফেয়্যারেন্স ততই কম হবে।

ক্রসিং ওভার



চিত্র—155

একটি বাইভ্যালেন্টে দু'টি ক্রসিং ওভারের ফলে দু'টি, তিনটি বা চারটি ক্রোমাটিডই পরিবর্তিত হয়।

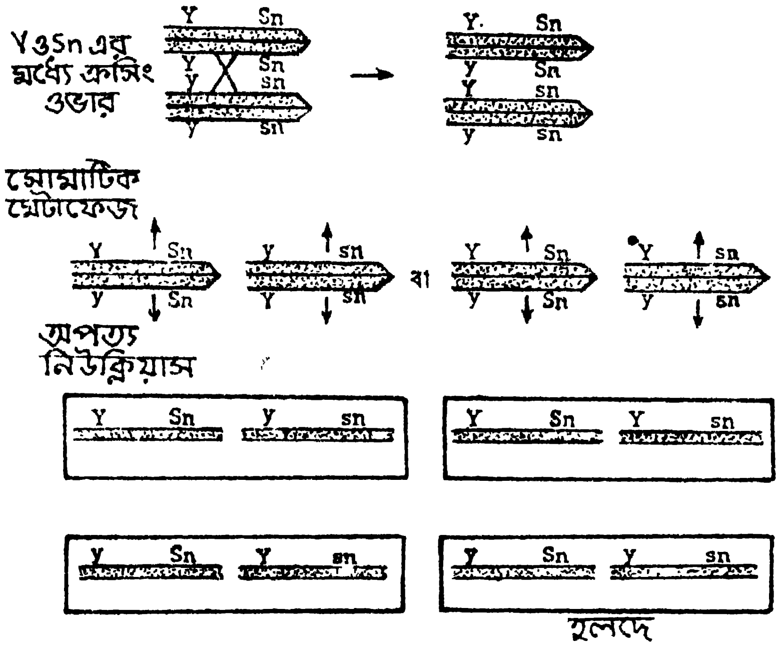
i — দু'টি ক্রোমাটিডের মধ্যে দু'টি ক্রসিং ওভার,

ii— চারটি ক্রোমাটিডের মধ্যে দু'টি ক্রসিং ওভার

iii-iv— তিনটি ক্রোমাটিডের মধ্যে দু'টি ক্রসিং ওভার

সোমাটিক ক্রসিং ওভার (somatic crossing over)

ক্রসিং ওভার মায়োসিসের সময় জনন কোষে হয়। দেহ কোষে ক্রসিং ওভার সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু Stern *Drosophila melanogaster*-এর দেহ কোষে ক্রসিং ওভার দেখতে পেয়েছিলেন, তবে এখানে জনন কোষের তুলনায় কম ক্রসিং ওভার হয়। জনন কোষগুলির ওপর সোমাটিক ক্রসিং ওভারের কোনও প্রভাব নেই। *Aspergillus*-এর কৃত্রিম উপায়ে গঠিত ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে সোমাটিক ক্রসিং ওভার দেখা গিয়েছে। ড্রসোফিলার পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই সোমাটিক ক্রসিং ওভার হয়, যদিও স্ত্রীতে এর হার অপেক্ষকৃত কম। 25°C তাপমাত্রার তুলনায় 30°C তাপমাত্রায় ড্রসোফিলায় সোমাটিক ক্রসিং ওভার কম হয়। কিন্তু জনন কোষে তাপমাত্রা বাড়ার



চিত্র—156

ড্রসোফিলায় y ও sn জিনের মধ্যে ক্রস ওভার

সাথে সাথে ক্রসিং ওভারের হার বাড়ে। ড্রসোফিলায় দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং X ক্রোমোসোমে সোমাটিক ক্রসিং ওভার সাধারণত দেখা যায়। হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের যুগ্ম অবস্থান করবার প্রবণতার জন্য এই ক্রসিং ওভার হয়। সোমাটিক ক্রসিং ওভারের হার ও অবস্থান হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল দিয়ে প্রভাবিত হয়। ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিন y (yellow body বা হলদে দেহ) ও জিন sn-এর (singed bristles বা ছোট কুঞ্চিত লোম) মধ্যে সোমাটিক ক্রসিং ওভার হয়। সেন্ট্রোমিয়ার থেকে 66 মানচিত্র একক ব্যবধানে y জিন থাকে। y জিন থেকে 21

মানচিত্র একক ব্যবধানে সেন্ট্রোমিয়ারের দিকে sn জিন থাকে। এখানে ডমিন্যান্ট জিন minute-এর (ছোট) উপস্থিতিতে ক্রসিং ওভারের হার বাড়ে।

একটি হেটারোজাইগাস ড্রসোফিলায় y ও sn একটি ক্রোমোসোম এবং Y ও Sn -এর হোমোলোগাস (সমসংস্থ) ক্রোমোসোমে থাকে। এই ক্রোমোসোম দু'টির ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিং ওভার হলে ক্রসিং ওভারের পর চারটি ক্রোমাটিড হয় y-sn, y-Sn, Y-sn,Y-Sn (চিত্র 156)। যদি একটি অপত্য কোষে y-sn ও Y-Sn ক্রোমাটিড দুইটি ও অন্য অপত্য কোষে Y-Sn ও Y-sn ক্রোমাটিডদ্বয় যায়, তাহলে উভয় কোষেই ডমিন্যান্ট চরিত্র প্রকাশ পাবে। কিন্তু একটি অপত্য কোষে Y-Sn ও Y-sn অন্যটায় y-Sn ও y-sn ক্রোমাটিড গেলে, দ্বিতীয় কোষে y-র কোনও ডমিন্যান্ট অ্যালীল (dominant allele) থাকে না। এই রকম কোষ বারবার বিভাজিত হলে দেহের ঐ অংশে হলদে দাগ দেখা যাবে। সোমাটিক ক্রসিং ওভারের ফলেই স্বাভাবিক ধূসর দেহের কোনও কোনও জায়গায় হলদে দাগ দেখা যায়। ভুট্টাতেও সোমাটিক ক্রসিং ওভার দেখা গিয়েছে।

সোমাটিক ক্রসিং ওভারও চার সূত্র অবস্থায় দু'টি অভগ্নী (nonsister) ক্রোমাটিডের মধ্যে হয়। এই ক্রসিং ওভারের সময় কায়েসমা গঠিত হলে, তা মেটাফেজের আগেই অদৃশ্য হয়।

অসমান ক্রসিং ওভার

আগেই বলা হয়েছে যে, ক্রসিং ওভারের আগে যুগ্মতা বা সাইন্যাপসিস (synapsis) এত সূক্ষ্মভাবে হয় যে, প্রত্যেক জিন তার হোমোলোগাস জিনের সাথে যুগ্ম অবস্থান করে। ক্রসিং ওভারের ফলে প্রায় সব সময়ই ক্রোমাটিড দু'টি সমান অংশ বিনিময় করে। কিন্তু Sturtevant (1925) দেখেন যে, *Drosophila melanogaster*-এর 'বার' (Bar) জিনের স্থানে অসমান ক্রসিং ওভার হয় এবং এর ফলে সহজেই 'বার' থেকে স্বাভাবিক কিম্বা 'বার ডাবল' (bar-double) পতঙ্গের সৃষ্টি হয়ে থাকে। (চিত্র 120)। একই ভাবে ইনফ্রা-বার (infra-bar) থেকে অসমান ক্রসিং ওভারের ফলে স্বাভাবিক বা ইনফ্রা-বার-ডাবল (infra-bar-double) ড্রসোফিলার সৃষ্টি হয়। ভুট্টার 'A' অঞ্চলেও অসমান ক্রসিং ওভার দেখা গিয়েছে।

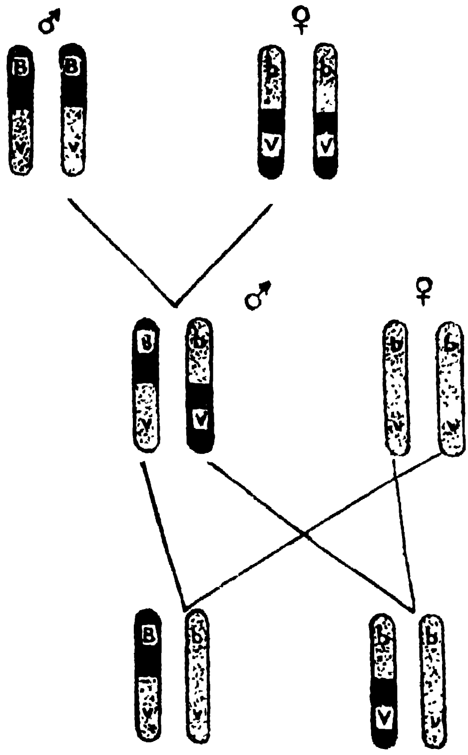
ভগ্নীক্রোমাটিডের (sister chromatid) মধ্যে ক্রসিং ওভার

সাধারণত ক্রসিং ওভার অভগ্নী (non-sister) ক্রোমাটিডের মধ্যে হয়। (Mc - Clintok (1938, 1941) ভুট্টায় রিঙ (ring) বা বলয়াকার ক্রোমোসোমে ভগ্নী ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিং ওভার দেখেছিলেন। ভগ্নী ক্রোমাটিডে ক্রসিং ওভার হলে বলয়াকার ক্রোমাসোমে তা সহজেই ধরা যায়। Schwartz (1953) দেখেন যে, যখন বলয়াকার ক্রোমোসোমটা এর হোমোলোগাস I-আকৃতির (rod) ক্রোমোসোমের সাথে হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকে, তখন মায়োসিসে ভগ্নী সূত্রের মধ্যে কখনও কখনও

ক্রসিং ওভার হয়। তিনি বলেন (1954) যে, ড্রসোফিলার যুক্ত X ক্রোমোসোমেও ভগ্নী ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়। Braver ও Blount-ও (1950) ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমের ওপর গবেষণা করে বলেন যে, কোনও কোনও দেহ কোষে ভগ্নী সূত্রের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়। ভগ্নী ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিং ওভার কায়েসমার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না।

পুরুষ ড্রসোফিলায় ক্রসিং ওভারের অনুপস্থিতি

বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীতে লিঙ্কড (linked বা সংযুক্ত) জিনের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়। কিন্তু পতঙ্গের স্ত্রী ও পুরুষের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন হয়। পুরুষ ড্রসোফিলায় ক্রসিং ওভার হয় না।

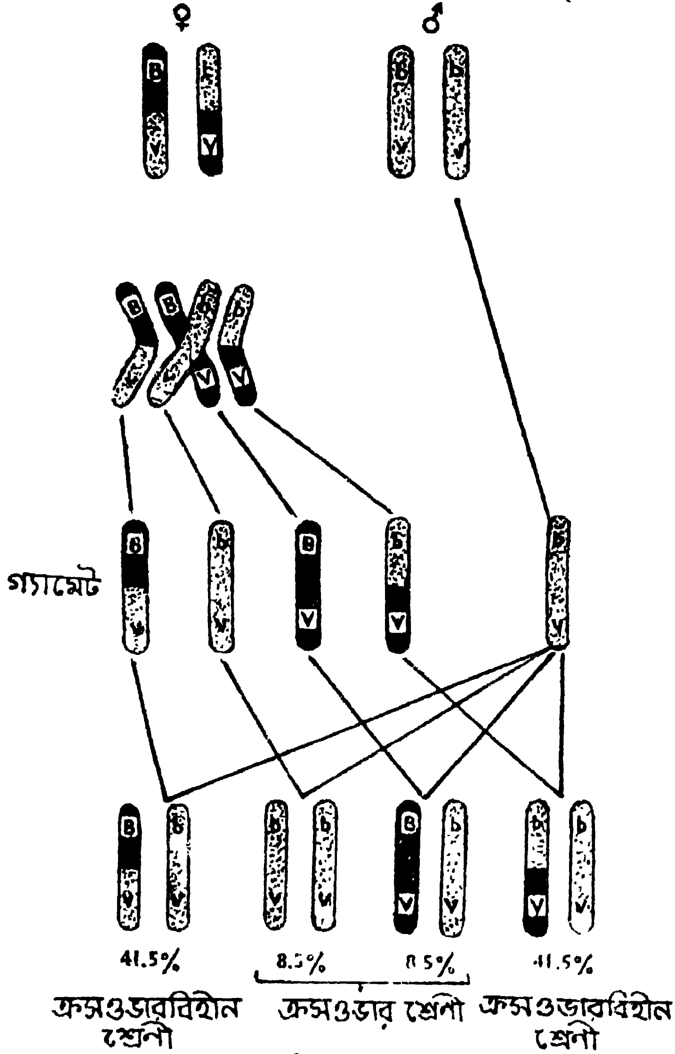


চিত্র—157

ধূসর দেহ (B) ও ভেষ্টিজিয়েল (V) পাখাযুক্ত ড্রসোফিলার সাথে কৃষ্ণ দেহ (b) ও দীর্ঘ পাখাযুক্ত (V) ড্রসোফিলার সংকরণের ফলে সৃষ্ট F_1-এর পুরুষ পতঙ্গের সাথে কৃষ্ণ দেহ (b) ও ভেষ্টিজিয়েল পাখাযুক্ত (V) ড্রসোফিলার মিলনের ফলে কেবল দুই রকমের পতঙ্গ পাওয়া যায়

ড্রসোফিলায় ধূসর দেহ (gray body-জিন B) ও দীর্ঘ পাখা (long wing জিন V), কৃষ্ণ দেহ (black body-জিন b) ও ভেষ্টিজিয়েল বা অদৃশ্য প্রায় পাখার

(vestigial wing-জিন v) উপর ডমিন্যান্ট (প্রবল)। একটি ধূসর দেহ ও ভেস্টিজিয়েল বা অদৃশ্য প্রায় পাখাযুক্ত (vestigial wing) পতঙ্গের সাথে কৃষ্ণ দেহ ও দীর্ঘ



চিত্র—158

F_1-র ধূসর দেহ ও দীর্ঘ পাখাযুক্ত স্ত্রী ড্রসোফিলার সাথে কৃষ্ণ দেহ ও ভেস্টিজিয়েল পাখাযুক্ত পতঙ্গের মিলনের ফলে চার রকমের পতঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে

পাখাযুক্ত পতঙ্গের মিলনের ফলে F_1-এ ধূসর দেহ ও দীর্ঘ পাখাযুক্ত পতঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই রকম পুরুষ পতঙ্গের সাথে কৃষ্ণ দেহ ও ভেস্টিজিয়েল পাখাযুক্ত স্ত্রী পতঙ্গের মিলন হলে, কেবল দুই রকমের অর্থাৎ ধূসর দেহ ও ভেস্টিজিয়েল পাখাযুক্ত এবং কৃষ্ণ দেহ ও দীর্ঘ পাখাযুক্ত পতঙ্গ পাওয়া যায়। প্রত্যাশিত ক্রসিং

ওভার দু'টি ধূসর দেহ দীর্ঘ পাখাযুক্ত ও কৃষ্ণদেহ ভেস্টিজিয়েল পাখাযুক্ত পতঙ্গ একেবারেই পাওয়া যায় না (চিত্র 157)। কিন্তু একটা F_1-এর স্ত্রী পতঙ্গের সাথে কৃষ্ণ দেহ ও ভেস্টিজিয়েল পাখাযুক্ত পুরুষ পতঙ্গের মিলনের ফলে চার ধরনের প্রত্যাশিত পতঙ্গই (চিত্র 158) দেখতে পাওয়া যায় (Morgan 1909)। এখানে 17 শতাংশ ক্ষেত্রে ক্রস ওভার দেখা যায়। সুতরাং, পুরুষ ড্রসোফিলায় ক্রস ওভারের অনুপস্থিতির কারণ B ও V জিন দু'টির বেশি কাছে অবস্থানের জন্য হয় না। ক্রস ওভারের অনুপস্থিতির কারণ হল পুরুষ ড্রসোফিলার সাধারণত কায়েসমা গঠনের অক্ষমতা। Darlington ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা দেখেন যে, পুরুষ ড্রসোফিলায় স্পার্ম গঠনের সময় হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি যুগ্ম অবস্থান করে, কিন্তু কোনও কায়েসমা গঠিত হয় না। Cooper (1949) পুরুষ ড্রসোফিলায় কায়েসমা আবিষ্কার করেন, কিন্তু এখানে কোনও ক্রসিং ওভার হয় না। সুতরাং বলা যায় যে, কায়েসমা গঠিত হলেই ক্রসিং ওভার হবে, এই ধারণা ঠিক নয়। স্ত্রী রেশমের গুটি পোকায়ও (silk worm moth) ক্রসিং ওভার দেখা যায় না।

পলিপ্লয়েডে ক্রসিং ওভার

ডিপ্লয়েডের তুলনায় পলিপ্লয়েডে ক্রসিং ওভার বেশি জটিল। যেসব অ্যালো-পলিপ্লয়েডে কেবল বাইভ্যালেন্ট গঠিত হয়, সেখানে ডিপ্লয়েডের মতই ক্রসিং ওভার হয়, তবে ক্রোমোসোমের কোনও অংশ দ্বিগুণ অবস্থায় থাকলে জটিলতা দেখা দেয়। যদিও একটি মায়োটিক কোষে তিনটি বা তার চেয়ে বেশি হোমোলোগ (homologue) পাশাপাশি থাকতে পারে, কিন্তু কোনও একটি জায়গায় কেবল দু'টি ক্রোমোসোম যুগ্ম অবস্থান করে। কোনও কোষে দু'টির চেয়ে বেশি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের উপস্থিতি ক্রসিং ওভারের হারকে প্রভাবিত করে, কারণ ঐ অবস্থায় হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে যুগ্মতার জন্য প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। অটোপলিপ্লয়েডে মালটিভ্যালেন্ট (multivalent) গঠিত হওয়ার ফলে ক্রসিং ওভারও জটিল হয়।

ট্রিপ্লয়েড স্ত্রী ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমের প্রান্তের দিকে ক্রসিং ওভারের হার বাড়ে, কিন্তু মধ্যবর্তী স্থানে ক্রসিং ওভারের হার ঠিক ততখানিই কমে। ট্রিপ্লয়েডে ডিপ্লয়েডের তুলনায় বেশি হারে ডাবল ক্রসিং ওভার হয়।

ডিপ্লয়েডের তুলনায় ট্রিপ্লয়েড পতঙ্গের অটোসোমেও (autosome) ক্রসিং ওভারের হারের তারতম্য হয়।

XXX ড্রসোফিলায় XX ক্রোমোসোম দু'টি সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে যুক্ত থাকে, অন্য Xটি আলাদা থাকে। ট্রিপ্লয়েডে XX ও X ক্রোমোসোমগুলিতে সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের অঞ্চলে ক্রসিং ওভারের হার যথেষ্ট বেশি হয় এবং দূরের অঞ্চলে সামান্য বাড়ে। যুক্ত XX ক্রোমোসোম দু'টির মধ্যে পৃথক ক্রোমোসোমের তুলনায় বেশি হারে ক্রসিং ওভার হয়।

X–Y ক্রোমোসোমের মধ্যে ক্রসিং ওভার

পুরুষ ড্রসোফিলার জনন কোষে ক্রসিং ওভার দেখা যায় না, কিন্তু এর শুক্রধানীর কোষে (spermatogonial cell) সোমাটিক ক্রসিং ওভার দেখা গিয়েছে। ড্রসোফিলায় XXY স্ত্রী পতঙ্গে ও XY পুরুষ পতঙ্গে X ও Y ক্রোমোসোমের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়। সব ক্ষেত্রেই X ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের হেটারোক্রোমাটিন অংশের সাথে Y ক্রোমোসোমের দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র বাহুর ক্রসিং ওভার হয়। Y ক্রোমোসোমের ক্ষুদ্র বাহুর সাথে X ক্রোমোসোমের ক্রস ওভার হলে, এই ক্রস ওভার X ক্রোমোসোমের জিন ববডের (bobbed-b) ডান কিম্বা বাঁ দিকে হয়। Y ক্রোমোসোমের দীর্ঘ বাহুর সাথে ক্রসিং ওভার হলে, এই ক্রস ওভার জিন ববডের ডান দিকে (অর্থাৎ সেন্ট্রোমিয়ার ও জিন ববডের মাঝে) হয়। সুতরাং, Y ক্রোমোসোমের দু'টি পৃথক অঞ্চল X ক্রোমোসোমের সাথে হোমোলোগাস।

ক্রসিং ওভারের আচরণের ব্যতিক্রম

কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্রসিং ওভারের আচরণে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। আমরা জানি যে, একটি ক্রসিং ওভার নিকটবর্তী অঞ্চলের ক্রসিং ওভারকে বাঁধা দেয়; সাধারণত 10 মানচিত্র একক ব্যবধানের মধ্যে দু'টি ক্রসিং ওভার হয় না। কিন্তু *Neurospora* এবং অন্যান্য কিছু জীবে খুব কাছে অবস্থিত (0.1 এককের চেয়ে কম ব্যবধানে) দু'টি স্থানের মধ্যে কয়েকটি ক্রসিং ওভার হয়। সাধারণত এই অঞ্চলে ক্রস ওভারের সংখ্যা তিনটির চেয়ে বেশি হয় না। এত কাছে অবস্থিত দু'টি স্থানের মধ্যে একাধিক ক্রসিং ওভার হওয়ার কারণ সঠিক জানা যায়নি।

সাধারণত মায়োসিসে চার সূত্র অবস্থায় দু'টি ক্রোমাটিডের সমান অংশ বিনিময়ের ফলে ক্রসিং ওভার হয়। কিন্তু ইস্ট ও *Neurospora* -এ (ছত্রাক) এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা হয়েছে। দু'টি ক্রোমোসোমের $x'y$ এবং $x\ y^+$ অঞ্চলের মধ্যে ক্রসিং ওভারের ফলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে চার রকমের ক্রোমাটিড অর্থাৎ $x'y$ $x'y^+$, $x\ y^+$ এবং $x\ y^+$ দেখা যায়। অর্থাৎ, এইসব ক্ষেত্রে $3y^+$ এবং $1\ y$ থাকে। কিন্তু সচরাচর ক্রসিং ওভারের পর $2\ y^+$ ও $2\ y$ পাওয়ার কথা। y জিনের এরকম অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের সঠিক ব্যাখ্যা এখনো করা যায়নি।

ক্রসিং ওভারের সাইটোলজিয় প্রমাণ

যদিও অনেকদিন আগে 1906 খ্রিস্টাব্দে Bateson ও Punnett লিঙ্কেজের বর্ণনা দেন, তবুও ক্রসিং ওভারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনেকদিন পাওয়া যায়নি। ক্রসিং ওভার সাধারণত দেখা সম্ভব হয় না, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দু'টি একই রকম দেখতে হয়। সেজন্য ক্রসিং ওভারের আগে ও পরে ঐ ক্রোমোসোম

দু'টির আকৃতির কোনও পরিবর্তন হয় না। কিন্তু অসম হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে ক্রসিং ওভার হলে, তা সহজেই দেখা যায়।

1931 খ্রিস্টাব্দে H. S. Creighton ও B. McClintock ভুট্টায় এবং C. Stern ড্রসোফিলায় দেখেন যে, জেনেটিক ক্রসিং ওভারের ফলে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দু'টি পরস্পর অংশ বিনিময় করে। তারা এমন ধরনের উদ্ভিদ বা প্রাণী ব্যবহার করেছিলেন যেখানে এক জোড়া ক্রোমোসোমের দু'টি সদস্যকে আলাদাভাবে চেনা যায় এবং ঐ কোষের অন্যান্য ক্রোমোসোম থেকেও এই অসম হোমোলোগাস ক্রোমোসোমদ্বয়কে সহজেই পৃথক করা যায়। ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে কোনও একটি ক্রোমোসোমের অংশ অন্য আরেকটি ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত হয়ে এই রকম অসম ক্রোমোসোম জোড়ার সৃষ্টি হয়।

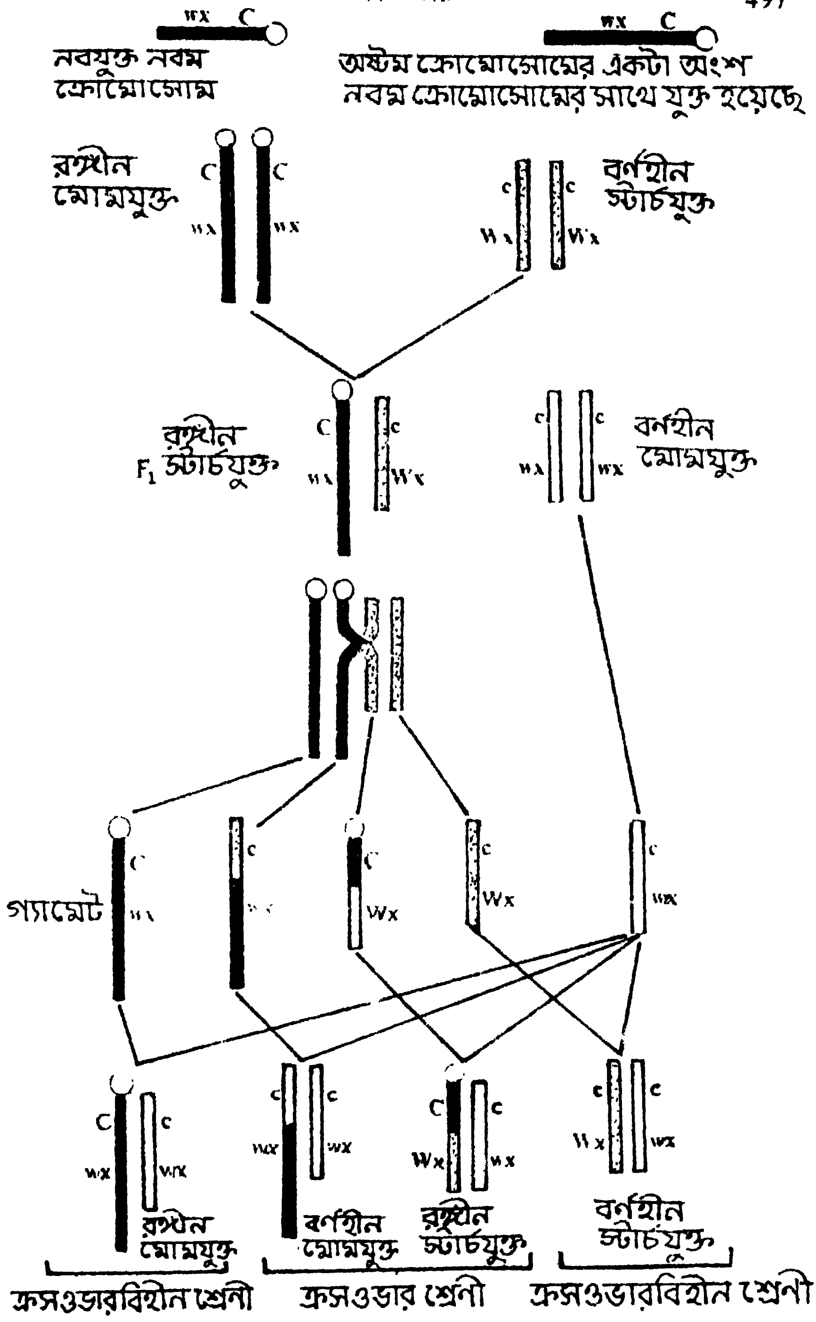
1983 খ্রিস্টাব্দে ভেষজ বিজ্ঞানে (medicine) নোবেল পুরস্কার Barbara McClintock-কে দেওয়া হয়েছে।

McClintock-এর **পরীক্ষা** — ভুট্টায় নবম ক্রোমোসোমে রঙীন বা বর্ণহীন অ্যালিউরোনের (aleurone) জন্য দায়ী জিন C বা c (coloured বা colourness) এবং স্টার্চযুক্ত বা মোমযুক্ত সস্যের (starchy বা waxy endosperm) জন্য দায়ী জিন Wx বা wx থাকে। কোনও কোনও ধরনের (strain) ভুট্টার নবম ক্রোমোসোমে জিন C-র দিকের প্রান্তে জেনেটিকভাবে নিষ্ক্রিয় হেটোরোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরি একটা বড় নব (knob) অর্থাৎ স্ফীত অঞ্চল থাকে। Creighton এমন একটি ভুট্টা পেয়েছিলেন যেখানে অষ্টম ক্রোমোসোমের একটি অংশ নবম ক্রোমোসোমের নব (knob) থেকে দূরবর্তী প্রান্তে যুক্ত হয়েছে। এই নবযুক্ত দীর্ঘ ক্রোমোসোমে C ও wx জিন থাকে। এই দীর্ঘ নবযুক্ত নবম ক্রোমোসোম উপস্থিত আছে এমন ভুট্টার সাথে একটি সাধারণ নবহীন ভুট্টার সংকরণ করা হয় (চিত্র 159)। এই সাধারণ নবম ক্রোমোসোমে c (বর্ণহীন) ও Wx (স্টার্চযুক্ত) জিন থাকে। সংকর উদ্ভিদে নবম ক্রোমোসোমের জোড়াটা অসম হয় অর্থাৎ একটি দীর্ঘ নবযুক্ত ও একটি ক্ষুদ্র নবহীন ক্রোমোসোম থাকে। যখন এই F_1 উদ্ভিদটিকে সাধারণ নবহীন ভুট্টার সাথে সংকরণ করা হয়, তখন চার রকমের উদ্ভিদ পাওয়া যায়। বর্ণহীন ও মোমযুক্ত (colourless-waxy) এবং রঙীন ও স্টার্চযুক্ত (coloured-starchy) উদ্ভিদ দু'টি ক্রোমাটিডের অংশ বিনিময়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছে (চিত্র 159)।

এই দু'টি উদ্ভিদে দু'টি নতুন ধরনের ক্রোমোসোম দেখা যায়, যথা — নবযুক্ত ক্ষুদ্র এবং নবহীন দীর্ঘ।

অতএব, এই পরীক্ষার থেকে জেনেটিক রিকমবিনেশনের (recombination) সাথে সাইটোলজিয় ক্রসিং ওভারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বোঝা যায়।

ড্রসোফিলায় Stern-এর পরীক্ষা — ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমে কারনেশন (carnation) বা লাল রঙের চোখের জন্য দায়ী জিন cr বা Cr এবং 'বার' (Bar বা



চিত্র--159

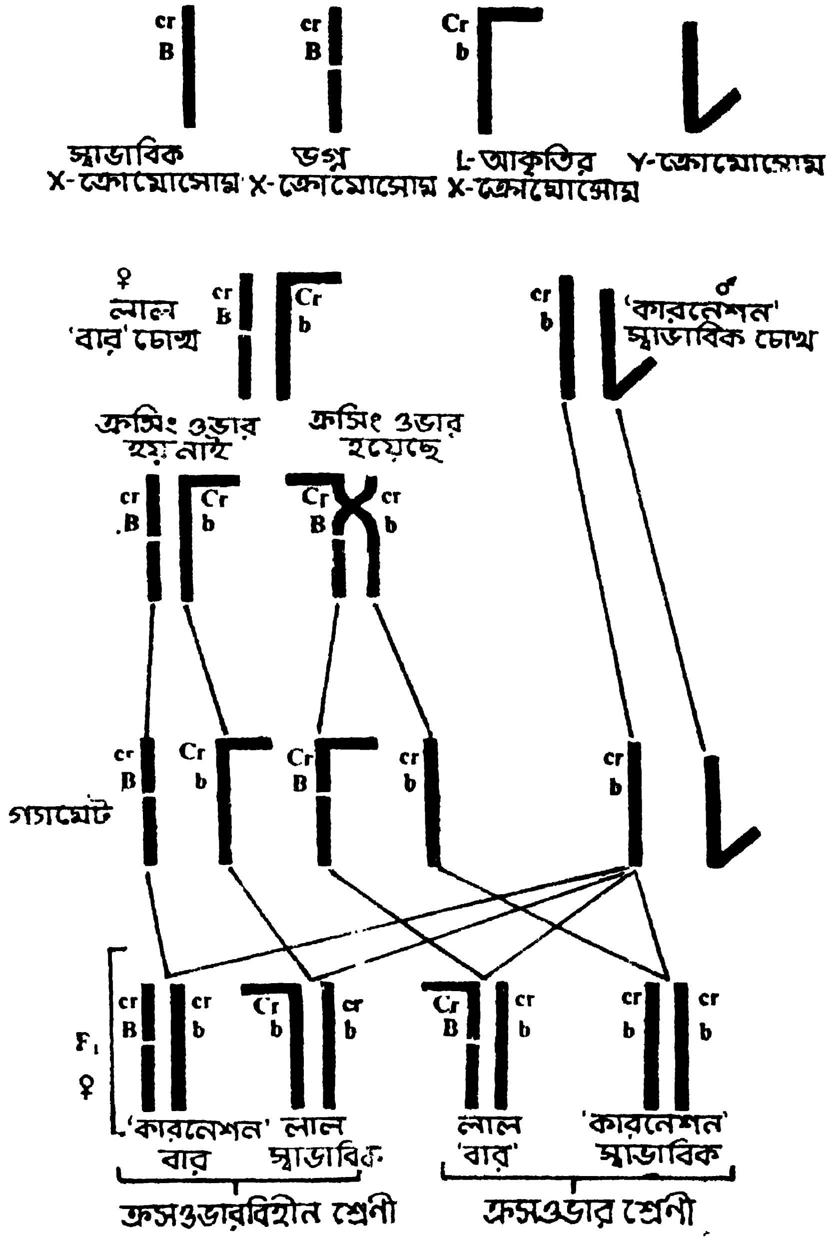
দু'টি অসম নবম ক্রোমোসোমযুক্ত ভুট্টার রঙীন বা বর্ণহীন আলিউরোন এবং স্টার্চযুক্ত বা মোমযুক্ত সস্যের জন্য দায়ী জিনের মধ্যে রিকমবিনেশনের চিত্র

সরু) বা স্বাভাবিক আকৃতির চোখের জন্য দায়ী জিন B বা b থাকে। C. Stern এমন একটি *Drosophila* পান, যেখানে Y ক্রোমোসোমের একটি বড় অংশ ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে X-ক্রোমোসোমের cr প্রান্তে যুক্ত হওয়ার ফলে সোজা X ক্রোমোসোমের পরিবর্তে L আকৃতির X ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে। এই ক্রোমোসোমে লাল ও স্বাভাবিক চোখের জিন Cr ও b থাকে। অন্য আরেকটি ড্রসোফিলায় একটি X ক্রোমোসোম দু'টি অংশে ভেঙে গিয়ে সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন ছোট অংশটি চতুর্থ ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত হয়েছে। সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত X ক্রোমোসোমে cr ও B থাকে এবং এর B প্রান্ত ভগ্ন। লাল রঙের Cr জিন কারনেশন (গোলাপী লাল) রঙের cr জিনের ওপর ডমিন্যান্ট (প্রবল)। বার আকৃতির চোখের জন্য দায়ী B জিন স্বাভাবিক আকৃতির চোখের জিন b-র ওপর ডমিন্যান্ট। উপরের বর্ণিত দুই রকম (L আকৃতির এবং ভগ্ন X ক্রোমোসোমযুক্ত) ড্রসোফিলার মধ্যে সংকরণ করে একটি হেটারোজাইগাস (heterozygous) স্ত্রী পতঙ্গ পাওয়া যায়, যেখানে দু'টি বিশেষ ধরনের X-ক্রোমোসোম (অর্থাৎ একটি L আকৃতির ও আরেকটি স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট X ক্রোমোসোম) থাকে। এই ক্রোমোসোম দু'টিকে কোষের অন্য ক্রোমোসোম থেকে সহজেই আলাদাভাবে চেনা যায়। এই রকম একটি স্ত্রী ড্রসোফিলার সাথে একটি রিসেসিভ (প্রচ্ছন্ন) অর্থাৎ কারনেশন (carnation) ও স্বাভাবিক চোখযুক্ত পুরুষের মিলন হলে চার রকমের পুরুষ ও স্ত্রী পতঙ্গ পাওয়া যায়। কেবল স্ত্রী পতঙ্গগুলিকে পরীক্ষা করা হয়। প্রত্যেক স্ত্রী পতঙ্গে পিতার একটি স্বাভাবিক X ক্রোমোসোম থাকে। মাতার X ক্রোমোসোমটি অস্বাভাবিক হওয়ায় সহজেই চেনা যায় এবং কোনও ক্রসিং ওভার হলে তা এই ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন থেকে বোঝা যায়। দু'টি নতুন ধরনের অর্থাৎ লাল রঙের 'বার' চোখযুক্ত (Bar eyed) এবং কারনেশন রঙের স্বাভাবিক চোখযুক্ত স্ত্রী পতঙ্গগুলিতে দু'টি নতুন রকমের ক্রোমোসোম পাওয়া যায়। প্রথম ধরনের পতঙ্গে Y ক্রোমোসোমের অংশটি ভগ্ন X ক্রোমোসোমের উপরের দিকে যুক্ত থাকে। দ্বিতীয় ধরনের স্ত্রী পতঙ্গে আপেক্ষিকভাবে স্বাভাবিক আকৃতির ক্রোমোসোম থাকে (চিত্র 160)। এই দু'টি ক্রোমোসোমই কেবল ক্রসিং ওভারের ফলেই সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং, এই পরীক্ষা থেকে ক্রসিং ওভারের সাইটোলজিয় প্রমাণ পাওয়া যায়।

ক্রস ওভারের হার

মায়োসিসে একটি রেণু মাতৃকোষে একটি ক্রস ওভারের ফলে দুইটি ক্রস ওভার রেণু এবং দুইটি ক্রস ওভারবিহীন রেণু উৎপন্ন হয়। যদি 100টি রেণু মাতৃকোষে প্রতিটিতে একটি ক্রস ওভার হয়, তবে 400টি রেণুর মধ্যে 200টি ক্রস ওভার রেণু থাকে অর্থাৎ, ক্রস ওভার রেণুর হার শতকরা 50 শতাংশ।

ক্রস ওভারের হার জানবার জন্য F_1 সংকর উদ্ভিদের সাথে একটি রিসেসিভ (প্রচ্ছন্ন) উদ্ভিদের ক্রস (cross) করা হয়। এর ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদগুলির মধ্যে রিকমবিনেশন



চিত্র—160

দু'টি অসম X-ক্রোমোসোমযুক্ত স্ত্রী ড্রসোফিলার 'বার' ও কারনেশন রঙের চোখের জন্য দায়ী জিনের মধ্যে রিকম্বিনেশনের চিত্র

(recombinition) উদ্ভিদের হার থেকে ক্রসিং ওভারের হার পাওয়া যায়।

যখন টেস্ট ক্রস (test cross) করা সম্ভব হয় না, তখন দ্বিতীয় বংশ বা F_2-র উদ্ভিদগুলি থেকে ক্রসিং ওভারের হার পাওয়া যায়। F_2 থেকে ক্রসিং ওভারের হার নির্ণয় করবার সবচেয়ে সুবিধাজনক পদ্ধতি হল Immer পদ্ধতি। ধরা যাক, জিন X ও Y একই ক্রোমোসোমে অবস্থিত এবং p হল ক্রসিং ওভারের হার। XXyy ও xxYY উদ্ভিদের মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্ট দ্বিতীয় অপত্য বংশে চার রকমের উদ্ভিদ দেখা যায়। XY, Xy, xY এবং xy শ্রেণীর উদ্ভিদগুলিকে যথাক্রমে a,b,c,d বলা হয় এবং যদি দুই জোড়া জিনেই (অর্থাৎ X,x এবং Y,y) 3 :1 অনুপাতে পৃথকীকরণ হয় তাহলে—

$$\frac{ad}{bc} = \frac{2p^2 + p^4}{1 - 2p^2 + p^4}$$

repulsion অবস্থায় p ও coupling অবস্থায় 1–p হল ক্রস ওভারের হার

XXYY ও xxyy-র মধ্যে ক্রস করলে তাকে coupling এবং XXyy ও xxYY-র মধ্যে ক্রস করলে তাকে repulsion অবস্থা বলা হয়।

ক্রস ওভারের হার p নিচের সূত্র থেকে পাওয়া যায়।

$$p = \sqrt{\frac{-(bc + ad) + \sqrt{(bc + ad) + ad\,(bc - ad)}}{(bc - ad)}}$$

যদি XxYy উদ্ভিদের সাথে Xxyy উদ্ভিদের সংকরণ করা হয়, তাহলে এক জোড়া জিন 3 : 1 অনুপাতে ও অন্য জোড়া জিন 1 : 1 অনুপাতে পৃথক হবে এবং এখানে সূত্রটা হল ঃ

$$\frac{ad}{bc} = \frac{p + p^2}{2 - 3p + p^2}$$

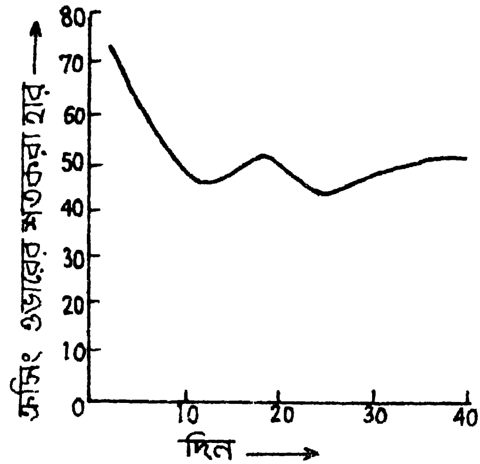
এবং, $$p = \frac{(bc + 3ad) + \sqrt{(bc + 3ad)^2 + 3ad\,(bc - ad)}}{2(bc - ad)}$$

ক্রসিং ওভার (crossing over) যেসব কারণ দিয়ে প্রভাবিত হয়

বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রসিং ওভারকে প্রভাবিত করে।

(1) **বয়সের প্রভাব** — ড্রসোফিলায় বিভিন্ন গবেষণা করে Bridges (1915, 1927), Plough (1917,1921), Stern (1926) দেখেছিলেন যে, সেন্ট্রোমিয়ারের নিকটবর্তী অঞ্চলের উপর বিশেষভাবে বয়সের প্রভাব পড়ে। সাধারণভাবে বয়স

বাড়ার সাথে সাথে আগের মত সহজভাবে ক্রসিং ওভার হতে পারে না। Bridges (1915) দেখেন যে, স্ত্রী *Drosophila*-র বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্রসিং ওভারের হারের বেশ পরিবর্তন হয়। তিনি দেখেন যে, ড্রসোফিলার তৃতীয় ক্রোমোসোমে এগার দিনের সময় প্রথমবার ও পঁচিশ দিনের সময় দ্বিতীয়বার ক্রসিং ওভারের হার কমে যায় (চিত্র 161)।



চিত্র—161

স্ত্রী ড্রসোফিলায় তৃতীয় ক্রোমোসোমের ক্রসিং ওভারের ওপর বয়সের প্রভাব।

(2) **সেক্সের প্রভাব** — ড্রসোফিলার পুরুষে সচরাচর ক্রসিং ওভার দেখা যায় না। কিন্তু স্ত্রী ড্রসোফিলায় উচ্চ হারে ক্রসিং ওভার হয়ে থাকে। একই ভাবে স্ত্রী *Bombax mori*-তে ক্রসিং ওভার হয় না। যেসব জীবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই ক্রসিং ওভার হয়, সেখানে স্ত্রী ও পুরুষে ক্রসিং ওভাবের হার একই রকম বা বিভিন্ন রকমের হয়। ইঁদুরে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীতে বেশি ক্রসিং ওভার হয়। পায়রায় পুরুষে স্ত্রীর চেয়ে বেশি ক্রসিং ওভার দেখা গিয়েছে। Haldane-এর (1922) মতে, যেখানে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্গেজের তারতম্য থাকে, সেখানে অসমগ্যামীয় (hetrogametic) সেক্সে (XY বা ZW) ক্রসিং ওভারের হার কম হয়, কিম্বা ক্রসিং ওভার হয় না।

(3) **তাপমাত্রার প্রভাব** — Plough (1917, 1921) ও Stern-এর (1926) মতে, ক্রসিং ওভারের হারের ওপর তাপমাত্রার যথেষ্ট প্রভাব আছে। সেন্ট্রোমিয়ারের নিকটবর্তী অংশে তাপমাত্রার প্রভাব সবচেয়ে বেশি হয়। Plough-এর পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশি তাপমাত্রায় ড্রসোফিলায় ক্রসিং ওভারের হার বাড়ে। তবে অন্যান্য জীবে সাধারণত বেশি তাপমাত্রায় ক্রসিং ওভারের হার বাড়ে এবং কম তাপমাত্রায় এই হার কমে।

(4) **সেন্ট্রোমিয়ারের প্রভাব**— সেন্ট্রোমিয়ারের নিকটবর্তী অঞ্চলে ক্রসিং ওভারের যথেষ্ট তারতম্য হয়। এর কারণ, এই অঞ্চলই তাপমাত্রা, বয়স ইত্যাদি দিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। Beadle ('32) ও Graubird ('32, '34) ট্র্যান্সলোকেশন ও ইনভারশন ব্যবহার করে বিভিন্ন পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁদের মতে, জিনের অবস্থানই ক্রসিং ওভারের হার নির্ণয় করে। সেন্ট্রোমিয়ারের কাছে কোনও জিনের অবস্থানের ফলে সাধারণত ক্রসিং ওভারের হার কমে যায় এবং ফলে জেনেটিক মানচিত্রের গঠনও প্রভাবিত হয়।

(5) **হেটারোক্রোমাটিনের প্রভাব**— Mather-এর (1939) মতে, সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলের হেটারোক্রোমাটিন ক্রসিং ওভারকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। White-এর ক্রসিং ওভারের মতবাদ অনুসারে, যেখানে ইউক্রোমাটিন (euchromatin) ও হেটারোক্রোমাটিন পাশাপাশি থাকে, সেখানে সবচেয়ে বেশি হারে ক্রসিং ওভার হয়।

(6) **ক্রোমোসোমগুলির পারস্পরিক প্রভাব**— Sturtevant (1919) মনে করেন যে, যদি এক জোড়া ক্রোমোসোমে হেটারোজাইগাস ইনভারশনের উপস্থিতির ফলে ক্রসিং ওভাবের হার কমে যায়, তবে ওই কোষেরই অন্য কোনও ক্রোমোসোম জোড়ায ক্রসিং ওভারের হার বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন যে, প্রতিটি মায়োটিক কোষে ক্রসিং ওভারের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি মজুত থাকে। কোনও জোড়া ক্রোমোসোম যদি কম শক্তি খরচ করে, তবে অন্য কোনও জোড়া ক্রোমোসোম অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার করে ক্রসিং ওভারের হার বাড়াতে পারে। ড্রসোফিলা নিয়ে পরীক্ষা করে Schultz ও Redfield (1932, 1933), Glass (1933) ও Macknight (1937) এই মত সমর্থন করেন।

(7) **ক্রোমোসোমের অস্বাভাবিকতার** (aberration) **প্রভাব**— কোনও ক্রোমোসোমে জিনের বিন্যাসের রদবদল হলে এবং এই পরিবর্তিত ক্রোমোসোম হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকলে ক্রসিং ওভারের পরিবর্তন হয়।

ক্রসিং ওভারের উপর ইনভারশনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে। এই গবেষণা থেকে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। a) স্ত্রী ড্রসোফিলায় হোমোজাইগাস ইনভারশন (inversion) হলে ক্রসিং ওভারের হার হ্রাস পায় না। b) ইনভারশনযুক্ত (inverted অর্থাৎ উল্টান) অংশে কেবল একটি ক্রসিং ওভার হলে, কদাচিৎ পূর্বাবস্থা ফিরে আসে। c) ইনভারশনের ডান ও বাঁদিকে ইনভারশনবিহীন অংশে ক্রসিং ওভারের হার যথেষ্ট হ্রাস পায়। d) ইনভারশনের দৈর্ঘ্য যত কমে, ইনভারশনযুক্ত অংশে ক্রসিং ওভারের হার ততই হ্রাস পায়। ভুট্টায় ইনভারশন অঞ্চলের মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার যথেষ্ট হ্রাস পায়।

ড্রসোফিলা ও ভুট্টায় পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে ক্রসিং ওভারের হার যথেষ্ট কমে যায়। Dobzhansky দেখেন যে, ভগ্ন অংশের কাছের অঞ্চলে ক্রসিং ওভারের হার সবচেয়ে কম হয়। একটি V-আকৃতির ক্রোমোসোমের একটি বাহুর ট্র্যান্সলোকেশন অন্য বাহুর ক্রসিং ওভারের হারকে বিশেষ

প্রভাবিত করে না। কিন্তু সেন্ট্রোমিয়ার অংশে ক্রোমোসোমটি ভেঙে গেলে, ক্রসিং ওভারের হার উভয় বাহুতেই হ্রাস পায়।

বিভিন্ন রকমের দ্বিগুণতা (duplication) প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব উপায়ে ক্রসিং ওভারকে প্রভাবিত করে। ড্রসোফিলায় পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, দ্বিগুণ অংশের (duplicated) দৈর্ঘ্য যত বাড়ে, ক্রসিং ওভারের হার ততই কমে।

Stadler ও Roman (1948) দেখেন যে, খুব ছোট অংশের ঘাটতির (deficiency) ফলে ক্রসিং ওভারের হার কমে যায়। কোনও অংশের ঘাটতির ফলে ঐ অংশে ক্রসিং ওভার একেবারেই হয় না ও এর কাছের অঞ্চলেও ক্রসিং ওভারের হার কমে।

বিভিন্ন রকমের ক্রোমোসোমীয় অস্বাভাবিকতার ফলে ক্রসিং ওভার কমে যাওয়ার কারণ হল যে, এসব অস্বাভাবিকতার ফলে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে ভালভাবে যুগ্মতা (synapsis) হয় না। যেহেতু ক্রসিং ওভার যুগ্মতার উপর নির্ভরশীল, সেজন্য সাইন্যাপসিসের কোনও পরিবর্তন ক্রসিং ওভারকেও প্রভাবিত করে।

ক্রসিং ওভারের বিভিন্ন মতবাদ

ক্রসিং ওভারের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। ক্রসিং ওভারের মূল ঘটনাগুলি এখানে আবার পর্যালোচনা করা হল কারণ, এই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করতে হলে এই সব তথ্যের বিবেচনা করা দরকার।

উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে মায়োসিসে বাইভ্যালেন্ট অবস্থায় চারটি ক্রোমাটিডের মধ্যে দু'টি ক্রোমাটিড কোনও জায়গায় সমান অংশ বিনিময় করে অর্থাৎ, ক্রসিং ওভার হয়। সুতরাং, ক্রসিং ওভার ক্রোমাটিড গঠিত হওয়ার (ক্রোমোসোমের লম্বালম্বি বিভাজন) পরে হয়। DNA দ্বিগুণ হওয়ার সাথে ক্রোমাটিডের দ্বিগুণ হওয়া জড়িত। সুতরাং, ক্রসিং ওভার DNA দ্বিগুণ হওয়ার পরে হয়।

একটি বাইভ্যালেন্টে একাধিক ক্রসিং ওভার হলে এই ক্রস ওভারগুলি দু'টি, তিনটি কিম্বা চারটি সূত্রে যদৃচ্ছভাবে (random) হতে পারে।

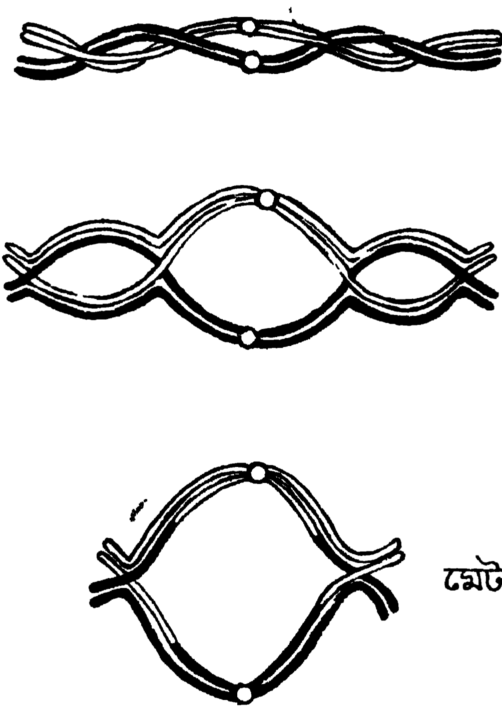
সাধারণত একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে দু'টি ক্রসিং ওভার হয় না।

ক্রসিং ওভার বিভিন্ন কারণ (যেমন বয়স, ক্রোমোসোমের অবস্থান, জেনেটিক গঠন, তাপমাত্রা ইত্যাদি) দিয়ে প্রভাবিত হয়।

ক্রসিং ওভারের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পেশ করেছেন। এখানে কতকগুলি মতবাদের বর্ণনা দেওয়া হল।

(1) Sax-এর (1932) ক্লাসিক্যাল মতবাদ (classical বা two plane theory) Sax-এর মতে, কায়েসমা ভেঙে যাওয়ার পর ক্রসিং ওভার হয়। ডিপ্লোটিন শুরু হলে প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টে পর্যায়ক্রমে একটি লুপে (loop) ভগ্নী ক্রোমাটিডগুলি (sister chromatid) ও পাশের লুপে অভগ্নী (non-sister) ক্রোমাটিডগুলি একসাথে থাকে। সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত লুপে সব সময় ভগ্নী ক্রোমাটিডগুলি একসাথে থাকে (চিত্র 162)।

পাশাপাশি লুপগুলি বিভিন্ন তলে, পরস্পরের সাথে সমকোণে অবস্থান করে বলে এই মতবাদকে two plane বা দু'টি তলের মতবাদও বলে। যখন ক্রোমোসোমগুলি সঙ্কুচিত হয়, তখন কায়েসমা অংশে চাপ পড়ার ফলে ঐ অংশে ক্রোমাটিড দু'টি ভেঙে যায়। ভগ্ন অংশ আবার জোড়া লাগার ফলে কায়েসমা লুপ্ত হয় এবং ক্রসিং ওভার হয। এই মত অনুসারে জেনেটিক ক্রসিং ওভার হওয়ার আগেই কাযেসমা গঠিত হয়। কায়েসমা গঠিত হওয়ার পর ঐ সব অঞ্চলে ক্রসিং ওভার হতে পারে কিম্বা না হতেও পারে।



চিত্র—162

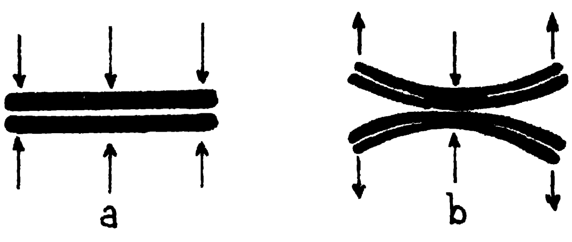
ক্রসিং ওভারের ক্লাসিক্যাল মতবাদের চিত্র।

উপরে— প্যাকিটিনে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দু'টি বিলেশন্যাল কয়েল গঠন করেছে, মাঝে— সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত লুপে ভগ্নী ক্রোমাটিডগুলি এবং পাশের লুপগুলিতে অভগ্নী ক্রোমাটিডগুলি যুগ্ম অবস্থান করছে, নিচে— ক্রসিং ওভার হওয়ার পর মেটাফেজের গঠন

(2) Mastsuura-র (1940) নিও-ক্লাসিক্যাল (neo-classical) মতবাদ— Matsuura-র (1940.1950) মতে, ক্রসিং ওভার প্রথম মায়োটিক বিভাজনের অ্যানাফেজ অবস্থায় হয়। তাঁর মতে, যুগ্ম ক্রোমাটিডের মধ্যে লুপগুলি (loop) হঠাৎ খুলে যাওয়ার ফলে কায়েসমার সৃষ্টি হয়। মায়োসিসের মেটাফেজের প্রথম দিকে প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দু'টি পরস্পর পেঁচান (relational coil) থাকে। মেটাফেজের শেষ দিকে এই পেঁচ খুলে যাওয়ার ফলে ক্রোমাটিড দু'টি সমান্তরালভাবে

থাকে। এই সময় ক্রোমোসোমগুলির নিজস্ব ম্যাট্রিক্স থাকে। যুগ্ম সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে এবং ক্রোমাটিডের প্রান্তে বিকর্ষণের জন্য ম্যাট্রিক্স খণ্ডিত হয়। ম্যাট্রিক্স খণ্ডিত হওয়ার ফলে ক্রোমাটিড দু'টির কোনও কোনও জায়গায় পরিবর্তন দেখা যায় এবং ক্রোমাটিডের অংশ বিনিময় (ক্রসিং ওভার) হয় ও দু'টি নতুন ক্রোমাটিডের সৃষ্টি হয়। নিও-ক্লাসিক্যাল মতবাদ (neo-classical theory) বিশেষ সমর্থন লাভ করেনি।

(3) White-এর (1942) মতবাদ— White-এর মতে, হেটারোক্রোমাটিন (heterochromatin) ও ইউক্রোমাটিন (euchromatin) অঞ্চলে প্রোটিন একই সাথে বিভাজিত না হওয়ার ফলে ক্রসিং ওভার হয়। যতক্ষণ হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি অবিভাজিত থাকে ততক্ষণ তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। যখন ক্রোমোসোমগুলি বিভাজিত হয়, তখন তাদের মধ্যে বিকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু ক্রোমোসোমের সব অঞ্চল একই সাথে বিভাজিত হয় না, সেজন্য যেসব স্থানে বিভাজিত ও অবিভাজিত অংশ পাশাপাশি থাকে সেখানে চাপের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছে যে, হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল দেরীতে বিভাজিত হয়। বিভাজিত ইউক্রোমাটিন অঞ্চলে যথেষ্ট বিকর্ষণ দেখা যায়। একই সময় হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল অবিভাজিত থাকায়, তখনও ঐ অঞ্চলে আকর্ষণ থাকে (চিত্র 163)। এর ফলে ভগ্নতা ও সংযোগ হয়। ফড়িঙে (grasshopper) ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের সংযোগস্থলে কায়েসমা দেখা যায়।



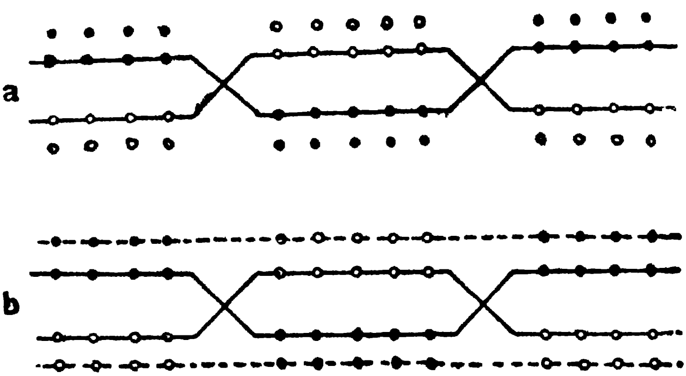
চিত্র—163

ক্রসিং ওভারের উপর হেটারোক্রোমাটিনের প্রভাব। a-অবিভাজিত হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে আকর্ষণ দেখা যায়, b-অবিভাজিত হেটারোক্রোমাটিন অংশে (মাঝে) আকর্ষণ থাকে, কিন্তু ইউক্রোমাটিন অংশ বিভাজিত হওয়ার জন্য ঐ অঞ্চলে বিকর্ষণ দেখা যায়

টেলোমিয়ার বা প্রান্তের হেটারোক্রোমাটিনের দেরীতে বিভাজনের ফলে কখনও কখনও দেহ কোষে ক্রোমাটিড ব্রীজ (chromatid bridge) দেখা যায়। রাসায়নিক

পদার্থ প্রয়োগ করলে অনেক সময় কায়েসমার দুই দিকে অবস্থিত হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল দেরীতে বিভাজিত হওয়ার ফলে ডিপ্লোক্রোমাটিড অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(4) Belling এর (1943) মতবাদ ও Copy choice— J. Belling মনে করেন যে, ভগ্নতা ছাড়াই ক্রসিং ওভার হতে পারে। প্যাকিটিন অবস্থায় যুগ্ম ক্রোমোসোমের ক্রোমোমিয়ারগুলি দ্বিগুণ হয়। পুরনো সূত্রের সমান্তরালভাবে নতুন সূত্র গঠিত হয়। J. Lederberg 1955 খ্রিস্টাব্দে Belling-এর মতবাদের সম্প্রসারণ করেন। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি পরস্পর ভালভাবে পেঁচান থাকে এবং এর ফলে নতুন ক্রোমাটিডে বাইভ্যালেন্টের দু'টি সদস্যের ক্রোমোমিয়ারগুলি থাকতে পারে কারণ, কোনও পেঁচের দুই দিকে বিভিন্ন সদস্যের ক্রোমোমিয়ারগুলি থাকে এবং কাছের ক্রোমোমিয়ারগুলি পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়। এই মতবাদ অনুসারে, ক্রোমোসোমের বিভাজনের সাথে সাথেই ক্রসিং ওভার হয় (চিত্র 164)। Belling-এর মতবাদ অনুসারে, ক্রোমোসোমের বিভাজনের সাথে ক্রসিং ওভার জড়িত। Copy choice মতবাদ অনুসারে, DNA কনজারভেটিভ পদ্ধতিতে দ্বিগুণ হয়। কিন্তু এখন আমরা জানি যে, DNA সেমিকনজারভেটিভ পদ্ধতিতে দ্বিগুণ হয়।



চিত্র—164

Belling-এর মত অনুসারে ক্রসিং ওভারের প্রক্রিয়ার চিত্র

a-ক্রোমোমিয়ারগুলি দ্বিগুণ হয়েছে, কিন্তু ক্রোমোমিয়ারগুলির মধ্যের সংযোগকারী সূত্র গঠিত হয়নি, b-ক্রোমোমিয়ার মধ্যবর্তী যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে

Belling-এর মতবাদ অনুসারে, নবগঠিত ক্রোমাটিড দু'টিতে ক্রসিং ওভার হয় ও পুরনো ক্রোমাটিড দু'টি অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু যেখানে কয়েকটি কায়েসমা হয়, সেখানে তিনটি বা চারটি ক্রোমাটিডেই ক্রসিং ওভার লক্ষ্য করা হয়েছে। এই তথ্য

Belling-এর মতকে সমর্থন করে না। তাছাড়া এই মতবাদ অনুযায়ী, মায়োসিস আরম্ভ হবার পর ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ হয়, কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ইন্টারফেজ অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ হয়।

(5) Darlington-এর (1950) মতবাদ— Darlington Jansen-এর (1909, 1924) কায়েসমা টাইপ মতবাদের সম্প্রসারণ করেন। এই মতবাদ অনুসারে, প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দু'টির নিজস্ব পেঁচ (coil) ও পরস্পরের রিলেশন্যাল কয়েলের (relational coil) মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকে। নির্দিষ্ট দিকে এই পেঁচের ফলে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দু'টি পরস্পর থেকে সরে যেতে পারে না। মায়োসিসের প্রফেজে কতকগুলি দ্রুত পরিবর্তনের ফলে ক্রসিং ওভার হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনগুলি হল—

(a) ক্রোমোসোমগুলি বিভাজিত হয়ে ক্রোমাটিড গঠনের ফলে ভারসাম্য ব্যাহত হয়।

(b) প্রত্যেক ক্রোমোসোমের অপত্য ক্রোমাটিড দু'টির মধ্যে রিলেশন্যাল কয়েল (relational coil) গঠিত হয়। বাইভ্যালেন্টের হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলিতে যে দিকে রিলেশন্যাল কয়েল থাকে, নবগঠিত ক্রোমাটিডগুলিতে তার বিপরীত দিকে পেঁচ দেখা দেয়।

(c) ক্রোমোসোমগুলি বিভাজিত হওয়ার সাথে সাথেই তাদের মধ্যে আর আকর্ষণ থাকে না।

(d) আকর্ষণের অভাবের ফলে চারটি ক্রোমাটিডের মধ্যে চাপের সৃষ্টি হয়।

(e) এর ফলে একটি ক্রোমাটিড ভেঙে যায় ও ভারসাম্য ব্যাহত হয়। আকস্মিকভাবে এই ভগ্নতা দেখা দেয়।

(f) অভগ্ন ভগ্নী ক্রোমাটিডের চারিদিকে ক্রোমাটিডের ভগ্ন প্রান্ত দু'টি পেঁচিয়ে যায়। এর ফলে বিপরীত ক্রোমোসোমে হঠাৎ চাপের সৃষ্টি হয়।

(g) একই জায়গায় একটি অভগ্নী ক্রোমাটিড (non-sister chromatid) ভেঙে যায়।

(h) ভগ্ন প্রান্তগুলি এমনভাবে জোড়া লাগে, যার ফলে দু'টি নতুন ক্রোমাটিডের সৃষ্টি হয়।

এভাবে ক্রসিং ওভার হয় ও তার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে কায়েসমা (chiasma) দেখা দেয়। সুতরাং, এই মতবাদ (chiasma type বা one plane theory) অনুসারে ক্রসিং ওভার আগে হয় এবং পরে কায়েসমা দেখা দেয়। এই মতবাদ এখন আর সমর্থিত হয় না কারণ, এখন জানা গেছে যে DNA উৎপাদন প্রফেজে I এর আগেই হয়, যদিও সামান্য পরিমাণ DNA-র (0.3%) উৎপাদন জাইগোটিন পর্যন্ত বিলম্বিত হতে পারে।

DNA-র গঠন আবিষ্কৃত হওয়ার পর ক্রসিং ওভারের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীগণ

নতুন নতুন ব্যাখ্যা পেশ করলেন। Meselson ও Weigle ভাইরাসের ক্রোমোসোমের উপর পরীক্ষা করে বললেন যে, DNA সূত্রের ভগ্নতা ও সংযোগের ফলে জিনের রিকমবিনেশন (recombination) হয়।

এখানে Uhl ও Whitehouse-এর ব্যাখ্যার বিবরণ দেওয়া হল।

(6) Uhl-এর (1965) মতবাদ— Uhl-এর মতে, কোষ বিভাজনের আগে ইন্টারফেজের S অবস্থায় (DNA উৎপাদনের সময়) ক্রোমোসোমে DNA ডাবল হেলিক্সের (double helix) অংশগুলি কতকগুলি সংযোগকারী আঙটা (link) দিয়ে যুক্ত থাকে। এই অংশগুলি সম্ভবত DNA-র জেনেটিক কোড বা সংকেতের বিভিন্ন অংশগুলিকে আলাদা করে রাখে ও যতি চিহ্ন (stop) হিসাবে কাজ করে। একটি DNA অণুর দু'টি সূত্রের কোনও একটি জায়গায় একটি আঙটা বা link দিয়ে যুক্ত থাকে অর্থাৎ, দু'টি সূত্রের আলাদা link থাকে না। সেজন্য DNA অণুর সূত্র দু'টি যখন আলাদা হয়, তখন link-টি যে কোনও একটি সূত্রের সাথে কেবল যুক্ত থাকে। এর ফলে DNA সূত্রটি কতকগুলি বহু নিউক্লিওটাইডযুক্ত অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এজন্য ক্রোমোসোমটি ভেঙে যায় না কারণ, আঙটা অর্থাৎ linkগুলি কোনও কোনওটা একটা সূত্রের সাথে এবং বাকীগুলি অপর সূত্রের সাথে যুক্ত থাকে। এছাড়া হিস্টোন এবং অবশিষ্ট প্রোটিন ক্রোমোসোমের অখণ্ডতা রক্ষা করে। এই অবস্থায় সাইন্যাপসিস বা যুগ্মতা হয়। এরপর আবার আঙটাগুলি গঠিত হওয়ায় ক্রোমোসোমের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ধরে DNA অণু অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। এই আঙটাগুলি গঠিত হওয়ার সময় ক্রোমাটিডের অংশ বিনিময় হয়।

Uhl-এর ক্রসিং ওভারের কারণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যার সাথে Belling-এর মতের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

(7) Whitehouse-এর (1965) **মতবাদ**— H L K Whitehouse-এর মতে, ক্রসিং ওভারের আগে ক্রোমাটিডগুলি দ্বিগুণ হয়। মায়োসিসে যখন হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি যুগ্ম অবস্থান করে (synapsis), তখন ক্রোমোসোমের একাধিক জায়গায় সাধারণত অভগ্নী (non-sister) ক্রোমাটিডগুলির মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়। ক্রসিং ওভারের সময় কোনও ক্রোমাটিডের ডাবল হেলিক্সের দু'টি পলিনিউক্লিওটাইড সূত্রের মধ্যে একটি সূত্র ভেঙে যায় এবং হোমোলোগাস ক্রোমাটিডের ঠিক ঐ নির্দিষ্ট জায়গায় একইভাবে ভগ্ন আরেকটি পলিনিউক্লিওটাইড সূত্রের পরিপূরক অংশের সাথে যুক্ত হয়। এভাবে সংকর DNA গঠিত হয়। এজন্য এই মতবাদকে hybrid DNA modelও বলে। এই সংযুক্তির সময় সামান্য পরিমাণ DNA উৎপন্ন হয়, কিন্তু এজন্য মোট DNA-র পরিমাণের তেমন কোনও রদবদল হয় না। পলিনিউক্লিওটাইড সূত্রের ভগ্নতা ও সংযোগের সময় সামান্য পরিমাণ DNA উৎপন্ন হতে দেখা গিয়েছে। DNA উৎপাদনে ব্যাঘাত হলে কায়েসমাও গঠিত হতে পারে না। Hotta, Ito এবং Stern-এর (1966) পরীক্ষা এই মতকে সমর্থন করে।

সুতরাং, Whitehouse-এর মতে, DNA উৎপাদনের পরে জাইগোটিনে ক্রসিং ওভার হয়। এই সময় কিছু পরিমাণ সংকর DNA উৎপন্ন হয় এবং ঐ একই পরিমাণ পুরনো DNA বিনষ্ট হয়ে যায়। দেখা গিয়েছে যে, ছত্রাক *Neurospora* এবং *Aspargillus*-এ ক্রসিং ওভারের পদ্ধতি Whitehouse-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী হয়।

R. Holliday'ও (1964) Whitehouse-এর মতো hybrid DNA-র model-এর মতবাদ গঠন করেন। তবে এই দুই মতবাদের মধ্যে পার্থক্য হল যে, Whitehouse-এর মতে, বিপরীত পোলারিটিবিশিষ্ট একক সূত্রে ভগ্নতা হয়। কিন্তু Holliday-র মতে, ভগ্নতা একই পোলারিটিবিশিষ্ট সূত্রের মধ্যে হয়। সংকর DNA-র মডেলের মতবাদ এখন যথেষ্ট সমর্থন লাভ করেছে।

আণবিক স্তরে রিকমবিনেশন
(Recombination at molecular level)

রিকমবিনেশন সাধারণত ক্রসিং ওভারের সমার্থক বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু রিকমবিনেশনে ক্রসিং ওভার ছাড়াও অনেক ঘটনা অন্তর্ভুক্ত। রিকমবিনেশনে অন্তর্ভুক্ত ঘটনাগুলি হল—

(i) মায়োটিক এবং মাইটোটিক ক্রসিং ওভার (খণ্ডের রেসিপ্রোক্যাল বা বিপরীত বিনিময়),

(ii) জিন পরিবর্তন (conversion) (অরেসিপ্রোক্যাল বিনিময়),

(iii) সিস্টার ক্রোমাটিডের বিনিময়, এর ফলে জেনেটিক পরিবর্তন না হতে পারে।

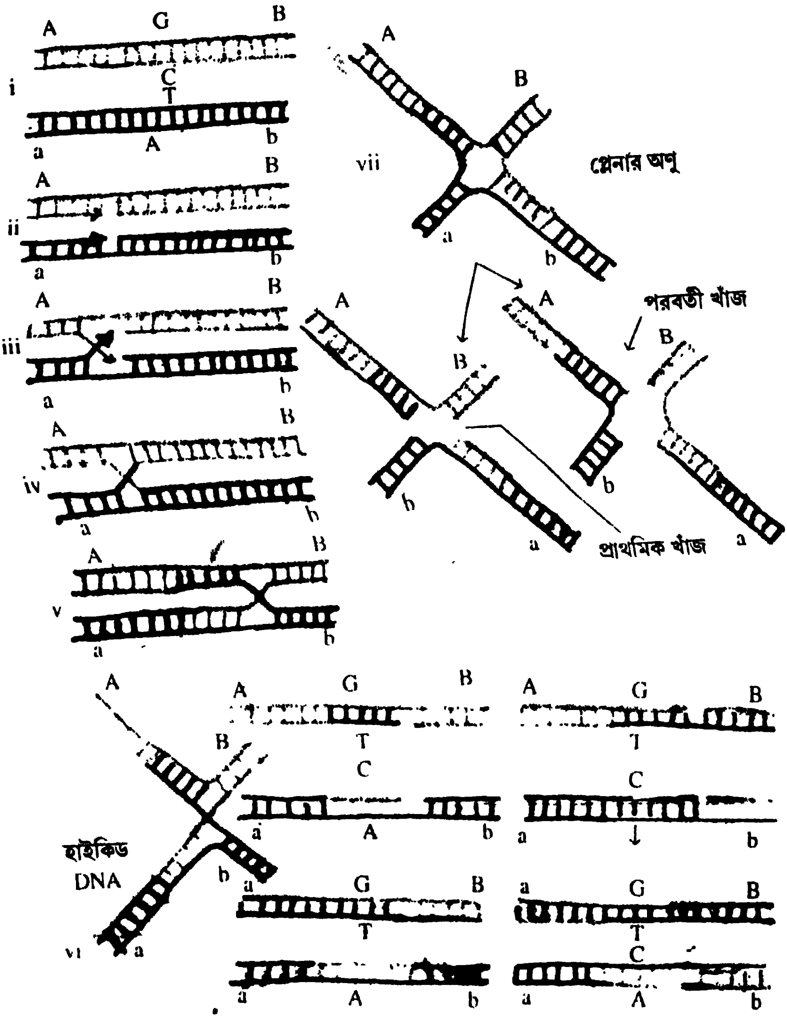
(iv) ক্ষতিগ্রস্ত DNA-র সংস্কার।

ভগ্নতা ও সংযোগের ফলে রিকমবিনেশন (recombination) হয়।

আণবিক স্তরে জেনেটিক রিকমবিনেশন ব্যাখ্যা করে অনেক আধুনিক মডেল রয়েছে। এসব মডেলে সংকর DNA বা হেটারোডুপ্লেক্স DNA উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে।

একটি সূত্রে ভগ্নতার ফলে উৎপন্ন সংকর DNA-র মডেল— যেমন Robin Holliday-র মডেল এবং H. L. K Whitehouse-এর মডেল। Whitehouse-এর মডেলে সূত্র দু'টির বিপরীত মেরু পরস্পরের নিকটে থাকে (5' → 3' এবং 3' → 5'), কিন্তু Holliday-র মডেলে সূত্র দু'টির একই রকম মেরু পরস্পরের দিকে থাকে। Holliday-র মডেল যথেষ্ট সমর্থন পেয়েছে।

মায়োসিসে একটি বাইভ্যালেন্টে চারটি ক্রোমাটিড থাকে। হোমোলোগাস বা সমসংস্থ ক্রোমোসোমের একটি করে ক্রোমাটিডের একই অঞ্চলে ভেঙে যেতে পারে। ভগ্ন প্রান্ত ঘুরে যায় ও এর জোড়া থেকে সরে অন্য নন সিস্টার ক্রোমাটিডের সাথে যুক্ত হয়, এই প্রক্রিয়াকে branch migration বা শাখা পরিযায়ীত্ব বলে। প্রথমে এই



চিত্র—165

আণবিক স্তরে রিকমবিনেশনের সংকর DNA-এর মডেল। একটি সূত্রের ভগ্নতা এবং রেসিপ্রোক্যাল বিনিময়ের ফলে দু'টি ফুম DNA ডুপ্লেক্স গঠিত হয়।

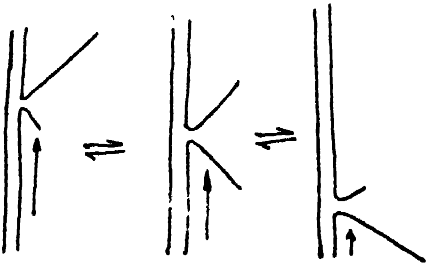
যুগ্মতা হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে হয়। কিন্তু পরে শাখা পরিযায়ীত্বের সময় ঐ অঞ্চলটি উৎসেচক লাইগেস সীল (seal) করে। এভাবে যুক্ত DNA অণু দু'টিকে যুগ্ম অণু বা joint molecule বলে। DNA অণুর একটি সূত্র যে স্থানে ক্রস করে অন্য অণুতে প্রবেশ করে, সে অঞ্চলটিকে রিকমবিন্যান্ট জয়েন্ট (বা জোড়) বলে। রিকমবিনেশন অঞ্চলে প্রত্যেক ডুপ্লেক্সের একটি সূত্র মাতা থেকে ও অন্যটি পিতা থেকে এসেছে। এই অঞ্চলকে সংকর DNA বা হেটারোডুপ্লেক্স (heteroduplex) বলে।

অংশ বিনিময় বা রিকমবিনেশনের ফলে উৎপন্ন যুগ্ম অণুর পরস্পর থেকে পৃথক হওয়া প্রয়োজন। এটি দু'ভাবে হতে পারে, যেমন, (a) যুগ্ম অণুর একটি DNA ঘুরে যায় এবং এভাবে planar molecule গঠিত হয়। (b) এই অণুর চারটি সূত্রের মধ্যে দু'টি সূত্রে খাঁজ (nick) থাকে। এখন কোন সূত্রে খাঁজ গঠিত হচ্ছে, তার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিকল্প রয়েছে।

i) মূল যে দু'টি সূত্রে ভগ্নতা ও সংযোগ হয়েছিল, সে দু'টি সূত্র ছাড়া অন্য দু'টি সূত্রে খাঁজ গঠিত হলে, চারটি সূত্রেই খাঁজ থাকে। এর ফলে রিকমবিন্যান্ট DNA অণু দু'টি মুক্ত হয়ে যায়। মাতা বা পিতার DNA ডুপ্লেক্স অণুটি অন্য ডুপ্লেক্স (পিতা বা মাতার) অণুর সাথে কোভ্যালেন্ট বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে। এর মাঝে DNA-র *হেটারোডুপ্লেক্স অঞ্চল থাকে। সুতরাং, হেটারোডুপ্লেক্স অঞ্চলের দুই পাশের চিহ্নিত অঞ্চলে রিকমবিনেশন হয়েছে।*

ii) মূল যে দু'টি সূত্রে খাঁজ গঠনের ফলে ভগ্নতা ও সংযোগ হয়েছিল, সে দু'টি সূত্রে পুনরায় খাঁজ গঠিত হলে মাতা পিতার মূল ডুপ্লেক্সটিতেই হেটারোডুপ্লেক্স অঞ্চল থাকে, কিন্তু কোনও রিকমবিন্যান্ট DNA অণু মুক্ত হয় না।

Holiday-র সংকর DNA-র মডেলে এরকম রিকমবিনেশন বোঝা যায়।



চিত্র—166

শাখার স্থানান্তরণ (migration)-এটি যে কোনও দিকে হতে পারে। একটি অযুগ্ম একক সূত্র যুগ্ম দ্বিসূত্রকে স্থানান্তরিত করে।

দু'টি সূত্রের ভগ্নতার ফলে উৎপন্ন সংকর DNA-র মডেল

DNA অণুর দু'টি সূত্রেই এন্ডোনিউক্লিয়েজের প্রভাবে ভগ্নতা হয়। এক্সোনিউক্লিয়েজের সক্রিয়তার ফলে ভগ্ন অঞ্চলটি বড় হয়। ভগ্ন দু'টি সূত্রের একটি সূত্র অন্য ডুপ্লেক্সে প্রবেশ করে এবং হেটারোডুপ্লেক্স গঠন করে। এর ফলে একটি D লুপের সৃষ্টি হয়। D লুপটি বড় হয়। সংস্কার সংশ্লেষ (repair synthesis) পদ্ধতিতে ফাঁকের সম্পূর্ণ অঞ্চলটি আবৃত হয়। এই ফাঁকের উভয় দিকে হেটারোডুপ্লেক্স DNA অঞ্চল থাকে। একসূত্রযুক্ত D লুপ সংস্কার সংশ্লেষের ফলে দ্বিসূত্রযুক্ত হয়। শাখা পরিযায়ীত্বের (migration) ফলে দু'টি রিকম্বিন্যান্ট জোড়যুক্ত একটি অণু উৎপন্ন হয়। এর থেকে উৎপন্ন সম্ভাব্য সূত্রগুলি হল :

i) ক্রস ওভারবিহীন হেটারোডুপ্লেক্স এবং

ii) ক্রস ওভারযুক্ত হেটারোডুপ্লেক্স DNA।

একসূত্রযুক্ত ও দ্বিসূত্রযুক্ত ভগ্নতার ফলে উৎপন্ন DNA ডুপ্লেক্সের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

দ্বিসূত্রযুক্ত ভগ্নতায় হেটারোডুপ্লেক্স অঞ্চলগুলির মাঝের অংশে দু'টি অণুতেই দাতা DNA-র মতো ক্রম থাকে। এছাড়া দ্বিসূত্রযুক্ত ভগ্নতায় প্রাথমিকভাবে তথ্য হারিয়ে যায়। DNA পুনরুৎপাদনের সময় এই তথ্য আবার ফিরে আসে। কিন্তু একসূত্রযুক্ত ভগ্নতায় তথ্য এভাবে হারিয়ে যায় না।

এ ধরনের মডেল ইস্টে লক্ষ্য করা হয়েছে।

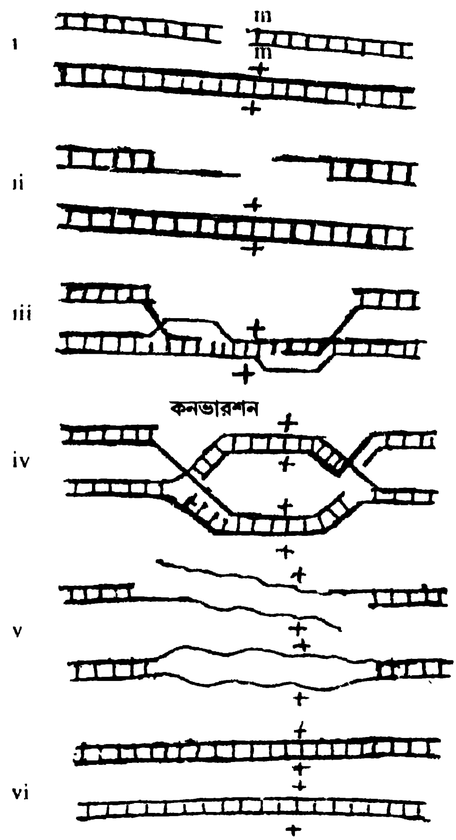
ভ্রান্ত জোড় সংস্কার এবং হেটারোডুপ্লেক্স অঞ্চলে মায়োসিস পরবর্তী পৃথকীকরণ (mismatch repair and post-meiotic segregation (pms) in heteroduplex region)

হেটারোডুপ্লেক্স অংশের সৃষ্টি কোনও একটি অঞ্চলে জিনের পরিবর্তন (conversion) ব্যাখ্যা করতে পারে। জিনের পরিবর্তন ক্রসিং ওভারের সাথে জড়িত থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে।

হেটারোডুপ্লেক্সের নির্দিষ্ট অঞ্চলটি যদি হোমোজাইগাস হয়, তাহলে ওই অঞ্চলে জিন conversion হয় না। কারণ, ডুপ্লেক্সের সূত্র দু'টি নন সিস্টার ক্রোমাটিড থেকে আসলেও এদের গঠন একই রকম। কিন্তু ডুপ্লেক্সের নির্দিষ্ট অঞ্চলটি হেটারোজাইগাস হলে DNA অণুর সূত্র দু'টির মধ্যে ভ্রান্ত জোড় গঠিত হয়। তাহলে জিনের পরিবর্তন দু'ভাবে হতে পারে ($+ / a \rightarrow + / +$ বা a / a)। অর্থাৎ, এই অঞ্চলে অপরিপূরক (non-complementary) বেস জোড়া থাকে ও এজন্য এই অঞ্চল অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী (unstable)। ভ্রান্ত জোড় সংস্কার প্রক্রিয়ায় এরকম ভ্রান্ত জোড় সনাক্ত করা যায়।

ধরা যাক, একটি হেটারোজাইগোট হল + / m। এই দু'টি জিনে কেবল একটি বেস জোড়ার পার্থক্য থাকে। + অ্যালীলে G-C বেস জোড়া থাকে এবং m অ্যালীলে

A-T বেস জোড়া থাকে। DNA ডুপ্লেক্সে ভ্রান্ত জোড়ের ফলে একটি অণুতে G-T বেস জোড়া এবং অন্য অণুতে C-A বেস জোড়া থাকে। এখন এই G-T জোড়ার সংস্কারের ফলে G-C বেস জোড়া অর্থাৎ, + অ্যালীল অথবা A-T বেস জোড়া অর্থাৎ m অ্যালীল গঠিত হতে পারে।

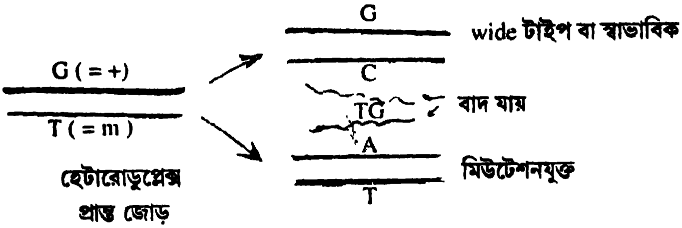


চিত্র—167

সংকর DNA-র সংস্কারের মডেল। DNA-র দু'টি সূত্রে ভগ্নতা রয়েছে। এখানে ধারাবাহিকতা নেই (discontinuity), জিন কনভারশনের মাধ্যমে সংস্কার করা হয়েছে

ভ্রান্ত জোড় যদি সংস্কার না হয়, তাহলে মায়োসিসের পরের প্রথম মাইটোসিস বিভাজনে পৃথকীকরণের (post-meiotic segregation) ফলে ভ্রান্ত জোড় সংশোধিত হতে পারে। হেটারোডুপ্লেক্স থেকে বিভিন্ন রকম সূত্রের সৃষ্টি হতে পারে। i) ভ্রান্ত জোড়

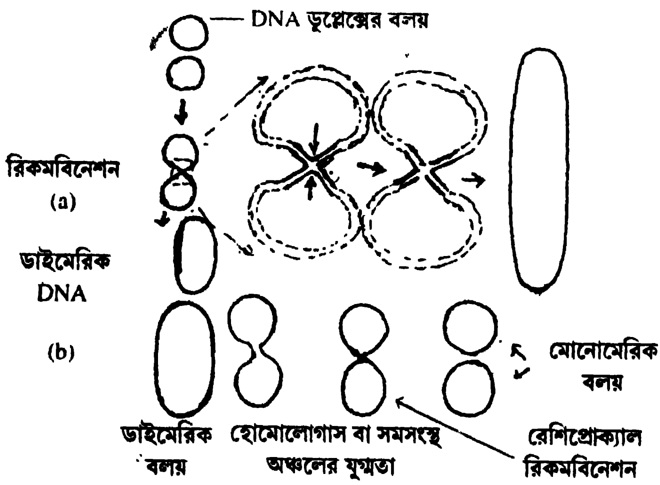
সংস্কার হয় না। এর ফলে mm, m+, +m, + + অর্থাৎ 4 : 4 অনুপাত দেখা যায় মায়োসিস পরবর্তী পৃথকীকরণের পর। ii) হেটারোডুপ্লেক্সের একটি সূত্রে ভ্রান্ত



চিত্র—168

হেটারোডুপ্লেক্সের ভ্রান্ত জোড়ের সংস্কার। এর ফলে স্বাভাবিক বা মিউটেশনযুক্ত সূত্রের সৃষ্টি হয়। ভ্রান্ত জোড়ের ফলে যে বিকৃতি হয়, তা সংস্কার প্রক্রিয়া সনাক্ত করতে পারে।

জোড়ের সংস্কারের ফলে (mm, mm, m+, + +) অর্থাৎ, 3 : 5 বা (mm, m+, + +, + +) অর্থাৎ, 5 : 3 অনুপাত পাওয়া যায়। iii) হেটারোডুপ্লেক্সের দু'টি সূত্রেই সংস্কারের ফলে (mm, mm mm, + +) অর্থাৎ, 6 : 2 বা (mm, + +, + +, + +) অর্থাৎ, 2 : 6 অনুপাত পাওয়া যায়। এছাড়া অন্য অনুপাতও পাওয়া যেতে পারে।

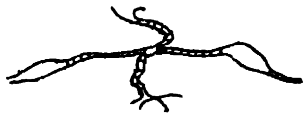


চিত্র—169

(a) দু'টি ডুপ্লেক্স বলয় থেকে রিকমবিনেশনের মাধ্যমে ডাইমেরিক (dimeric) বলয় সৃষ্টির পদ্ধতি। দু'টি বলয়যুক্ত হয়ে আটের মত গঠনের সৃষ্টি করে।

(b) একটি ডাইমেরিক বলয় থেকে সমসংস্থ ক্রমের রিকমবিনেশনের মাধ্যমে দু'টি মনোমার বলয় উৎপন্ন হয়েছে।

ফাজ বা প্লাসমিডের রিকমবিনেশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গেছে। প্লাসমিডে দু'টি ডুপ্লেক্স DNA বলয় দেখা যায়। এই দু'টি বলয়ের মধ্যে রিকমবিনেশনের ফলে আট অক্ষরের মতো (8) একটি গঠনের সৃষ্টি হয়। এই ডাইমার (dimer) বা দুই অণু যৌগ থেকে উৎপন্ন দু'টি মনোমার (monomer) বা এক অণু যৌগের বলয়ে রিকমবিনেশন থাকে। 8 অক্ষরের মত গঠনে প্রত্যেক মনোমারযুক্ত বলয় রেস্ট্রিকশন (restriction বা সীমাবদ্ধকারী) উৎসেচকের প্রভাবে একবার ফেটে যায়। এর ফলে, চারটি বাহুযুক্ত একটি গঠনের (chi বা ×) সৃষ্টি হয়। বাহুগুলি হেটারোডুপ্লেক্স DNA দ্বারা যুক্ত থাকে।



চিত্র—170
Chi গঠন

যেসব প্রোটিন ও উৎসেচক রিকমবিনেশনের জন্য প্রয়োজন

রিকমবিনেশনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু উৎসেচক সনাক্ত করা হয়েছে। Rec মিউটেশনযুক্ত ব্যাকটিরিয়া যা স্বাভাবিকভাবে রিকমবিনেশন করতে পারে না, সেখানে RecA প্রোটিন এবং RecBCD এন্ডোনিউক্লিয়েজ পাওয়া গেছে, যা বিশেষ রিকমবিনেশনে সহায়তা করে। রিকমবিনেশন সহায়ক আরেক রকমের উৎসেচক হল টোপোআইসোমারেজ। ল্যামডা ফাজ রিকমবিনেশনের জন্য Int প্রোটিন, Xis প্রোটিন এবং IHF প্রোটিন ব্যবহার করে। RecA এবং RecBCD প্রোটিন ও প্রান্তবিশিষ্ট একসূত্রযুক্ত DNA-র সাথে দ্বিসূত্রযুক্ত DNA-এর পরিপূরক সূত্রের বেস জোড়া গঠনে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়াকে single-strand uptake বা single-strand assimilation (একক সূত্রের উত্তোলন বা পরিপাক) বলে। RecA প্রোটিন প্রথম একসূত্রযুক্ত DNA-র সাথে যুক্ত হয়। এরপর দ্বিসূত্রযুক্ত DNA-র পরিপূরক অঞ্চলের সাথে যুক্ত হয়। একক সূত্রের পরিপাকের সাথে রিকমবিনেশনের প্রারম্ভ সম্পর্কিত। RecA প্রোটিন রিকমবিনেশন প্রক্রিয়ায় সম্ভবত উৎসেচক হিসাবে কাজ করে।

RecA প্রোটিনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রিকমবিনেশনে এর ভূমিকার সহায়ক। যেমন— i) একটি সূত্রকে পলিমারাইজ বা বহুযোজন করার ক্ষমতা, ii) ডুপ্লেক্স DNA সূত্রকে স্বাভাবিকের থেকে দীর্ঘ করার ক্ষমতা।

রিকমবিনেশনের সময়ে হেটারোডুপ্লেক্সের উৎপাদন তিনটি ধাপে হয়। i) একটি ধীর সাইন্যাপসিস পূর্ববর্তী দশা (presynaptic phase)। এই দশায় RecA DNA-র একক সূত্রকে পলিমারাইজ (বা বহুযোজন) করে। ii) একক DNA সূত্রের (single strand DNA) সাথে দ্বিসূত্র DNA-র পরিপূরক অঞ্চলের দ্রুত যুগ্মতা। iii) ডুপ্লেক্স

DNA-র অপরিপূরক সূত্রের ধীর স্থানচ্যুতি। এর ফলে দীর্ঘ DNA হেটারোডুপ্লেক্স অঞ্চল গঠিত হয়। প্রথম অবস্থায় হেটারোডুপ্লেক্স অঞ্চলের সূত্র দু'টি পাশাপাশি অবস্থান করে (প্যারানেমিক) অর্থাৎ, পেঁচিয়ে ডাবল হেলিক্স গঠন করে না (প্লেকটোনেমিক)। প্যারানেমিক অবস্থা অস্থায়ী এবং পরে সূত্র দু'টি পেঁচিয়ে প্লেকটোনেমিক অবস্থার সৃষ্টি করে।

বলায়কার DNA-র ক্ষেত্রে RecA-র প্রভাবে chi গঠনের (x) সৃষ্টি হয়। RecA-র কার্যকারিতা DNA-র ক্রম দিয়ে সাধারণত প্রভাবিত হয় না। তবে কোনও কোনও বিশেষ অঞ্চল (hot spot) RecA-র রিকমবিনেশন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে। ল্যামডা ফাজের chi ক্রম নিকটবর্তী অঞ্চলের রিকমবিনেশনকে উদ্দীপিত করে। এছাড়া এটি উৎসেচক এন্ডোনিউক্লিয়েজ V কোন অঞ্চলের ওপর কাজ করবে তা সনাক্ত করে। এই উৎসেচক জিন RecBCD-র প্রভাবে উৎপন্ন হয়। এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হল— (a) এটি DNA-কে ক্ষতিগ্রস্থ করে (degrade) (b) এটি DNA ডুপ্লেক্সের পেঁচ SSB-র উপস্থিতিতে খুলে দেয়। (c) এতে ATPase কার্যকারিতা দেখা যায়। সুতরাং, এই উৎসেচকের প্রভাবে মুক্ত প্রান্তযুক্ত একসূত্র DNA পাওয়া যায়। RecA প্রোটিনের একক সূত্রের পরিপাকের প্রারম্ভের জন্য এরকম মুক্তপ্রান্তের উপস্থিতির প্রয়োজন।

টোপোআইসোমারেজ (topoisomerase)

রেপ্লিকেশনের মত রিকমবিনেশনের ক্ষেত্রেও DNA-র সংস্থানিক (topological) গঠন যথাযথ হওয়া দরকার। টোপোআইসোমারেজ উৎসেচকগুলি এই কাজ করে। এই উৎসেচকের প্রভাবে DNA-র সুপার কয়েল সংযোজিত হয় বা শিথিল হয়। এছাড়া এই উৎসেচক রিকমবিনেশন বা রেপ্লিকেশনের ফলে পেঁচান DNA অণুগুলিকে পৃথক করে। টাইপ I টোপোআইসোমারেজ DNA-র একটি সূত্র অস্থায়ীভাবে ভেঙে দেয়। টাইপ II টোপোআইসোমারেজ DNA অণুর দু'টি সূত্রই অস্থায়ীভাবে ভেঙে দেয়। টাইপ I টোপোআইসোমারেজের প্রভাবে নেগেটিভ সুপার কয়েলযুক্ত DNA শিথিল হয়। টাইপ II টোপোআইসোমারেজ, যেমন— গাইরেজ DNA অণুর নেগেটিভ ও পজিটিভ সুপার কয়েলকে শিথিল করে। রিকমবিনেশনের জন্য DNA অণুর সুপার কয়েল খুলে যাওয়া প্রয়োজন।

ক্রসিং ওভারের তাৎপর্য

ক্রসিং ওভারে ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশ বিনিময় হয় বলে নতুন ধরনের ক্রোমাটিড গঠিত হতে পারে। সেজন্য বিবর্তনে ক্রসিং ওভারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ক্রসিং ওভারের হার থেকে ক্রোমোসোমে জিনের অবস্থান নির্ণয় করা যায় এবং এর থেকে ক্রোমোসোম মানচিত্র গঠন করা যায়। ক্রোমোসোমে জিনের সরলরেখায় অবস্থানও (linear arrangement) ক্রসিং ওভারের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়।

চতুর্দশ অধ্যায়

সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসের পারস্পরিক প্রভাব

সাইটোপ্লাজমবিহীন নিউক্লিয়াস কিম্বা নিউক্লিয়াসবিহীন সাইটোপ্লাজম স্বাভাবিক কাজ চালাতে পারে না। কোষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কাজের জন্য নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম দু'টিরই একান্ত প্রয়োজন।

সাইটোপ্লাজমের অনেক এনজাইম নিউক্লিয়াস থেকে তৈরি হয় এবং নিউক্লিয়াস অন্তত আংশিকভাবে তাদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণত নিউক্লিয়াসবিহীন সাইটোপ্লাজম বেশি দিন বাঁচে না। মানুষের রক্তের এরিথ্রোসাইট (erythrocyte) কোষের নিউক্লিয়াস লুপ্ত হয়ে যায় এবং এদের জীবনকাল মাত্র কয়েক সপ্তাহ।

নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সাইটোপ্লাজম থেকেই আসে। নিউক্লিক অ্যাসিড ও ক্রোমোসোমীয় প্রোটিন তৈরি করবার জন্য যেসব পদার্থের দরকার হয়, তা সাইটোপ্লাজমই সরবরাহ করে। সাইটোপ্লাজমে কোনও পরিবর্তন হলে তার প্রভাব নিউক্লিয়াসের উপর পড়ে।

কোনও কোষ বা কোষ সমষ্টির নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের অনুপাত নির্দিষ্ট হয়। কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট পলিপ্লয়েডে নিউক্লিয়াসের আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইটোপ্লাজমের পরিমাণও বাড়ে।

Caspersson প্রথম নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের পারস্পরিক নির্ভরতার প্রমাণ করেন। সাইটোপ্লাজমের RNA ও ক্রোমোসোমের DNA-র মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। দ্রুত বৃদ্ধিশীল কোষে কখনও কখনও নিউক্লিও মেমব্রেন তাড়াতাড়ি তৈরি হয় ও এর ফলে কোষ বিনষ্ট হয়ে যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে, টেলোফেজে নিউক্লিও মেমব্রেন গঠিত হবার আগেই ক্রোমোসোম থেকে সৃষ্ট পদার্থ সাইটোপ্লাজমে যায় ও সাইটোপ্লাজম গঠনে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়ায় কোনও পরিবর্তন হলে কোষ বিনষ্ট হয়ে যায়।

কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের সহযোগিতার ফলেই স্পিন্ডিল গঠিত হয়। রাসায়নিক বস্তু বা x-ray প্রয়োগ করে ক্রোমোসোমকে কতকগুলি অংশে বিভাজিত করলে সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন ক্রোমোসোমের অংশগুলি কোষ বিভাজনের সময় কোনও মেরুতে যেতে পারে না ও এরা সাইটোপ্লাজমে থাকে। এর ফলে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে। নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের অনুপাতের এই পরিবর্তনের জন্য অনেক সময় কোষ বিনষ্ট হয়ে যায়। এই পদ্ধতির ব্যবহার করে ক্যানসার টিউমার কোষের বিকিরণ চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের পারস্পরিক প্রভাব জিন এনজাইম সম্পর্ক থেকে ভাল করে বোঝা যায়। জিন সব সময় সাইটোপ্লাজমের এনজাইমের মাধ্যমে কাজ করে। কোনও চরিত্রের বর্হিপ্রকাশ নির্ভর করে বহু রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর, যার প্রারম্ভ জিন স্তরে হয়। সাইটোপ্লাজমীয় বস্তু ও জিন বিভাজনের সময় সৃষ্ট উপজাত (byproduct) বস্তুর সমন্বয়ে এনজাইম তৈরি হয়। এছাড়া এনজাইমের কাজ যথাযথ সাইটোপ্লাজমীয় পদার্থের উপর নির্ভর করে।

আগেই বলা হয়েছে যে, রঞ্জন রশ্মির প্রভাবে ক্রোমোসোম কতকগুলি অংশে বিভাজিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে ফ্র্যাগমেন্টেশন (fragmentation) বলে। ফ্র্যাগমেন্টেশনের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে। প্রত্যক্ষ আঘাতের মতবাদ (direct hit theory) অনুসারে রঞ্জন রশ্মি ক্রোমোসোমে পরিবর্তন ঘটায় এবং এর ফলে ক্রোমোসোম ভেঙে যায়। রঞ্জন রশ্মির মাত্রা ও ক্রোমোসোমের ভগ্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য এই মতবাদের সমর্থন করে। পরোক্ষ বা রাসায়নিক মতবাদ (chemical theory) অনুসারে, রঞ্জন রশ্মির প্রভাবে সাইটোপ্লাজমে পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তনের জন্য ক্রোমোসোমগুলি ভেঙে যায়। রাসায়নিক বস্তুর প্রভাবে ও রঞ্জন রশ্মির প্রভাবে ক্রোমোসোমের একই রকমের ভগ্নতা এই মতবাদের সমর্থক। Duryee দেখান যে, স্বাভাবিক নিউক্লিয়াস যদি বিকিরণপ্রাপ্ত সাইটোপ্লাজমে রাখা হয়, তবে ক্রোমোসোম ভেঙে যায়। কিন্তু বিকিরণপ্রাপ্ত নিউক্লিয়াস বিকিরণ দেওযা হয়নি এমন সাইটোপ্লাজমে রাখলে ক্রোমোসোম ভেঙে যায় না। এর থেকে নিউক্লিযাসের উপর সাইটোপ্লাজমের প্রভাব সমর্থিত হয়। সুতরাং, রাসায়নিক বা পরোক্ষ মতবাদ নিউক্লিযাস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের ইঙ্গিত করে।

এককোষী শৈবাল *Acetabularia*-এ (চিত্র 17d) নিউক্লিয়াসের পরিণতির ওপর সাইটোপ্লাজমের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। একটি অপবিণত নিউক্লিয়াসকে পরিণত কোষে ঢুকিয়ে দিলে নিউক্লিয়াসটি খুব তাড়াতাড়ি পরিণত হয়।

Sea urchin-এর অপরিণত ডিম্বাশয়ে স্পার্ম বা শুক্রাণু প্রবেশ করালে দেখা যায় যে, শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসটি ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস কোষ বিভাজনের যে পর্যায়ে আছে সেই অবস্থায়ই থাকে অর্থাৎ, ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস প্রফেজ অবস্থায় থাকলে শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসও প্রফেজ অবস্থায় থাকবে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাইটোপ্লাজমই নিউক্লিয়াসটি কোন অবস্থায় থাকবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

নিউক্লিয়াসের ওপর সাইটোপ্লাজমের প্রভাব অ্যামিবায় (amoeba) নানা গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়। *Amoeba proteus*-এর নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসবিহীন *Amoeba discoides*-এর সাইটোপ্লাজমে ঢুকিয়ে দিলে ঐ নিউক্লিয়াসে *Amoeba discoides*-এর কিছু কিছু চরিত্র দেখা যায়। অনেকবার কোষ বিভাজনের পর এই নিউক্লিয়াসকে নিউক্লিয়াসবিহীন *Amoeba proteus*-এর সাইটোপ্লাজমে স্থানান্তরিত করলে ঐ নিউক্লিয়াসে *Amoeba discoides*-এর কিছু কিছু চরিত্র দেখা যায় অর্থাৎ, এখানে সাইটোপ্লাজমের প্রভাবে নিউক্লিয়াসে কতকগুলি স্থায়ী পরিবর্তন হয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ক্রোমোসোমের মানচিত্র

প্রত্যেক ক্রোমোসোমে অনেকগুলি জিন থাকে। এই জন্য ক্রোমোসোমে বিভিন্ন জিনের স্থান নির্ধারণ করা দরকার। বিভিন্ন উপায়ে ক্রোমোসোমে জিনের স্থান নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত ক্রসিং ওভারের তথ্যের উপর ভিত্তি করে জেনেটিক উপায়ে জিনের স্থান নির্ধারণ করা যায় ও এই পদ্ধতিতে গঠিত ক্রোমোসোমের মানচিত্রকে ক্রস ওভার (crossover) বা লিঙ্কেজ (linkage) বা জেনেটিক মানচিত্র (genetic map) বলে। ক্রোমোসোমের মানচিত্র হল একটি সরলরেখা যার উপর জিনের স্থান নিরূপণ করা হয়। 1911 খ্রিস্টাব্দে Sturtevant ড্রসোফিলায় ক্রোমোসোমের মানচিত্র প্রথম গঠন করেছিলেন। এর পরে Bridges ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এই মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। জেনেটিক পদ্ধতি ছাড়া সাইটোলজিয় (cytological) উপায়েও ক্রোমোসোমের মানচিত্র গঠন করা যায়। তবে উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্রোমোসোমের মানচিত্র গঠন করলে সবচেয়ে ভাল হয়।

জেনেটিক পদ্ধতি

কতকগুলি তথ্যের উপর ভিত্তি করে জেনেটিক মানচিত্র গঠন করা হয়। এই তথ্যগুলি হল—

(1) ক্রোমাটিড ভেঙে যাবার ফলেই ক্রসিং ওভার হয়।

(2) ক্রোমোসোমের যে কোনও অংশে সমান হারে ক্রসিং ওভার হয়। কোনও ক্রোমোসোমে দু'টি জিন যত দূরে থাকবে, তাদের মধ্যে ক্রসিং ওভারের সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

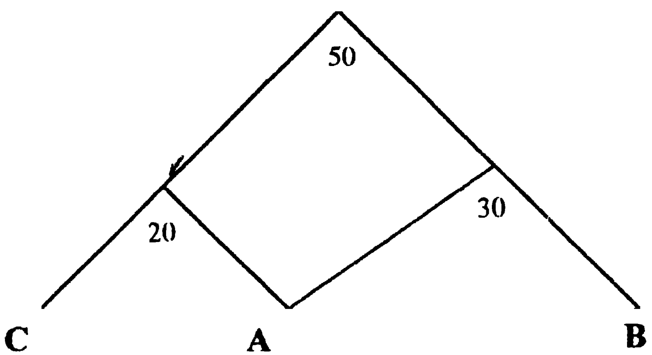
কোনও দু'টি জিনের মধ্যে ক্রসিং ওভারের শতকরা হার থেকে ক্রোমোসোমে ঐ দু'টি জিনের স্থান নির্ধারণ করা হয়। দু'টি জিনের মধ্যে ক্রসিং ওভারের শতকরা হার পাঁচ হলে বলা যায় যে, ঐ দু'টি জিন নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমে পাঁচ একক (unit) ব্যবধানে আছে।

ক্রসিং ওভারের হার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও পরিবেশ দিয়ে প্রভাবিত হয়। সেজন্য নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

ক্রোমোসোমে তিনটি জিনের স্থান নির্ধারণ

কোনও জীবে যদি জিন A ও B লিঙ্কড (linked) বা সংযুক্ত থাকে, তবে বলা

যায় যে, ঐ দু'টি জিন একই ক্রোমোসোমে অবস্থিত। একইভাবে জিন A ও C লিঙ্কড থাকলে, C জিনও ঐ ক্রোমোসোমে থাকবে। সুতরাং, জিন B ও C একই ক্রোমোসোমে অবস্থিত। হেটারোজাইগাস AaBb উদ্ভিদের সাথে aabb-র ক্রস করলে যদি 30 শতাংশ নতুন ধরনের উদ্ভিদ অর্থাৎ recombination type পাওয়া যায়, তবে A এবং B জিনের মধ্যে ব্যবধান হবে 30 একক। একইভাবে হেটারোজাইগাস AaCc উদ্ভিদকে ডাবল রিসেসিভ (double recessive) aacc উদ্ভিদের সাথে ক্রস কবলে যদি 20% নতুন ধরনের উদ্ভিদ দেখা যায়, তবে বলা যায় যে A ও C-র মধ্যে দূরত্ব 20 একক। ক্রোমোসোমে এই তিনটি জিনের বিন্যাস C-A-B কিম্বা A-C-B হতে পারে। প্রথম ধরনের বিন্যাস হলে B-C-র মধ্যে ব্যবধান 50 একক হবে এবং দ্বিতীয় ধরনের বিন্যাস হলে B-C-র দূরত্ব 10 একক হবে। এখন CcBb উদ্ভিদের সাথে ccbb উদ্ভিদের ক্রস করে দেখা গেল যে, নতুন ধরনের উদ্ভিদের শতকরা হার 50। তাহলে A, B, C জিনের বিন্যাস হবে C-A-B (চিত্র 171)। সুতরাং, ক্রোমোসোমের তিনটি জিনের অবস্থান নির্ণয় করতে হলে তাদেব প্রত্যেকের মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার জানা দরকার কিম্বা দু'টি ক্রসিং ওভারের হার ও জিন তিনটির বিন্যাস জানা দরকার।

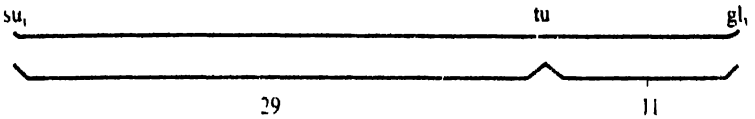


চিত্র—171

ক্রোমোসোমে তিনটি জিনেব স্থান নির্ধাবণ

Emerson ও তাঁর সহকর্মীদেব গবেষণা থেকে ভুট্টাব লিঙ্কেজ মানচিত্রের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ভুট্টার চতুর্থ ক্রোমোসোমে শর্করাযুক্ত (su_1) বা স্টার্চযুক্ত (starchy Su_1) সস্যের (endosperm) নিয়ন্ত্রক জিন, বিশেষভাবে আচ্ছাদিত (tunicate) মঞ্জরী (Tu) বা স্বাভাবিক মঞ্জরীর (tu) জিন, চকচকে (glossy gl_3) বা স্বাভাবিক (Gl_3) পত্রত্বকেব জিন থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, শর্করাযুক্ত ও টিউনিকেট (tunicate) জিনের রিকমবিনেশনের শতকবা হার 29 অর্থাৎ এই দু'টি জিন 29 একক ব্যবধানে আছে। টিউনিকেট ও চকচকে (glossy) জিনের মধ্যে রিকমবিনেশন হার 11 অর্থাৎ, এই জিন দু'টির মধ্যে দূরত্ব 11। শর্করাযুক্ত (su_1)

ও চকচকে (gl_1) জিনের মধ্যে বিকমবিনেশনের হার 34। সুতরাং, এই দু'টি জিনের ব্যবধান 34 একক। তাহলে, এই তিনটি জিনের বিন্যাস হল su_1-tu-gl_1 (চিত্র 172)।



চিত্র— 172

ভুট্টার চতুর্থ ক্রোমোসোমে জিন su_1, tu ও gl_1-র অবস্থান দেখান হয়েছে

su_1–gl_1-র মধ্যে বিকমবিনেশনের শতকরা হার su_1–Tu এবং Tu-gl_1-র মধ্যে বিকমবিনেশনের হারের যোগফলের চেয়ে সামান্য কম। এর কারণ হল, কোনও দু'টি জিন যথেষ্ট দূরত্বে থাকলে, তাদের মধ্যে দু'টি ক্রসিং ওভার (double crossing over) হতে পারে। su_1–gl_1 র মধ্যে দু'টি ক্রসিং ওভার হলে, ক্রসিং ওভারের পরেও ওই দু'টি জিন একই ক্রোমাটিডে থাকে।

অল্প কয়েকটি জিন নিয়ে এই ধরনের মানচিত্র তৈরি করলে ওই মানচিত্র সব সময় জিনের যথার্থ স্থান নির্দেশ করে না। ক্রসিং ওভার মানচিত্র গঠনের সময় যে জিনগুলি নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে, সেগুলি খুব কাছে অবস্থিত হলে এই মানচিত্র সঠিক হয়। জিনগুলির মধ্যে ব্যবধান যত বেশি হবে, দু'বার ক্রসিং ওভারের সম্ভাবনা ততই বাড়বে। এইজন্য যথেষ্ট ব্যবধানে দু'টি জিন নিয়ে পরীক্ষার থেকে তিনটি জিন নিয়ে পরীক্ষা করলে বেশি নির্ভুল ফল পাওয়ার সম্ভাবনা।

ক্রোমোসোমে জিনের সরলরেখায় অবস্থান
(linear arrangement of genes in a chromosome)

Roux 1838 খ্রিস্টাব্দে ও পরবর্তীকালে Correns ও de Vries জিনের এই ধরনের বিন্যাসের ইঙ্গিত দেন। ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমের উপর গবেষণা করে Morgan বলেন যে, ক্রোমোসোমে জিনগুলি সরলরেখায় অবস্থান করে। এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে জেনেটিক গবেষণালব্ধ প্রমাণ দরকার। Sturtevant 1915 খ্রিস্টাব্দে একটি পরীক্ষা করেন, যার সাহায্যে কোনও ক্রোমোসোমে তৃতীয় জিনের স্থান ও এর সরলরেখায় অবস্থান নির্ণয় করা যায়। এই পরীক্ষায় অন্য দু'টি জিনের সাহায্যে তৃতীয় জিনের স্থান নিরূপণ করা হয়। একসাথে তিনটি জিন নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে এই পরীক্ষাকে 'তিন বিন্দু ক্রস' (three point cross) বলে।

তিন বিন্দু পরীক্ষা বা three point test– ধরা যাক, একটি ক্রোমোসোমের তিনটি জিনের বিন্যাস হল abc। হেটারোজাইগাস – $\frac{ABC}{abc}$ র সাথে রিসেসিভ (প্রচ্ছন্ন)

$\frac{abc}{abc}$ -র (cross) করলে যেসব উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় তা হল—

		জেনোটাইপ	ফেনোটাইপ	সংখ্যা
ক্রস ওভারবিহীন শ্রেণী	(i)	ABC/abc	ABC	d
(non-crossover type)	(ii)	abc/abc	abc	e
একটা ক্রস ওভারযুক্ত শ্রেণী	(iii)	Abc/abc	Abc	f
(টাইপ 1) (A–B)	(iv)	aBC/abc	aBC	g
একটা ক্রস ওভারযুক্ত শ্রেণী	(v)	ABc/abc	ABc	h
(টাইপ 2) (B–C)	(vi)	abC/abc	abC	i
দুইটি ক্রস ওভারযুক্ত শ্রেণী	(vii)	AbC/abc	AbC	j
(double crossover type)	(viii)	aBc/abc	aBc	k
(A-B), (B-C)			মোট —	t

ক্রস ওভারবিহীন উদ্ভিদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয়। দু'টি ক্রস ওভারযুক্ত উদ্ভিদের সংখ্যা সবচেয়ে কম হয়, কারণ একই সাথে দু'টি পাশাপাশি অঞ্চলে ক্রস ওভারের সম্ভাবনা ওই স্থান দু'টির যে কোনও একটির ক্রস ওভারের সম্ভাবনার চেয়ে কম হয়। যদি a ও b-র মধ্যে ক্রস ওভারের সম্ভাবনা $^1/_3$ ও b ও c-র মধ্যে ক্রস ওভারের সম্ভাবনা $^1/_4$ হয়, তবে a ও c-র মধ্যে দু'টি ক্রস ওভারের সম্ভাবনা হল $^1/_3 \times {}^1/_4$ অর্থাৎ $^1/_{12}$।

যদি A-B-র ক্রস ওভারকে X এবং B-C-র মধ্যে ক্রস ওভারকে Y এবং A-C-র মধ্যে ক্রস ওভারকে Z ধরা হয়, তাহলে নিচের পদ্ধতি অনুযায়ী ক্রসওভারের হার নির্ণয় করা যায়।

$$\text{A-B-র মধ্যে ক্রস ওভার} = X = \frac{(f + g + j + k) \times 100}{t}$$

$$\text{B-C-র মধ্যে ক্রস ওভার} = Y = \frac{(h + i + j + k) \times 100}{t}$$

$$\text{A-C-র মধ্যে ক্রস ওভার} = Z = \frac{(f + g + h + i) \times 100}{t}$$

এর থেকে জিনের অবস্থানও নির্ণয় করা যায়। যদি Z = X + Y হয়, তাহলে জিনের অবস্থান হবে যথাক্রমে A-B-C। যদি Z = Y – X হয়, তাহলে জিনের অবস্থান হবে যথাক্রমে B - A - C। যদি Z = X - Y হয়, তাহলে জিনের অবস্থান হবে A-C-B।

ভুট্টার পঞ্চম ক্রোমোসোমের তিনটি লিঙ্কড (linked) জিন হল — বাদামী

(brown-bm) বা সবুজ (Bm) মধ্যশিরার নিয়ন্ত্রক জিন, লাল অ্যালিউরোন (aleurone-pr) বা লালচে বেগুনী (purple) অ্যালিউরোনের (Pr) জিন, হালকা হলদে রঙের (virescent) চারা (v) বা সবুজ চারার (V) জিন। Emerson, Beadle ও Fraser ভুট্টার পঞ্চম ক্রোমোসোমের এই জিনগুলি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁরা একটি হেটারোজাইগাস $\frac{\text{Bm Pr V}}{\text{bm pr v}}$ উদ্ভিদের সাথে হোমোজাইগাস রিসেসিভ $\frac{\text{bm pr v}}{\text{bm pr v}}$ উদ্ভিদের ক্রস করেন।

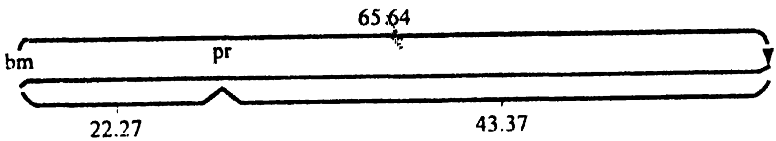
এই ক্রসের ফলে সৃষ্ট প্রথম অপত্য বংশের উদ্ভিদগুলি হল—

Bm Pr V	–	232টা	ক্রস ওভারবিহীন উদ্ভিদ 42.11%
bm pr v	–	235টা	
Bm pr v	–	84টা	bm ও pr-এর মধ্যে একটা ক্রস ওভারযুক্ত উদ্ভিদ 14.52%
bm Pr V	–	77টা	
Bm Pr v	–	201টা	pr ও v-র মধ্যে একটা ক্রস ওভারযুক্ত উদ্ভিদ 35.62%
bm pr V	–	194টা	
Bm pr V	–	40টা	(ডাবল ক্রস ওভার) bm ও pr এবং pr ও v-র মধ্যে দুইটি ক্রস ওভারযুক্ত উদ্ভিদ 7.75%
bm Pr v	–	46টা	
মোট	—	1109	

যেসব উদ্ভিদ মাতা বা পিতার অনুরূপ, তারা ক্রস ওভারবিহীন শ্রেণীর। দুইটি ক্রস ওভার শ্রেণীর উদ্ভিদে জিন bm ও v-র স্থান আগের মত থাকলেও, জিন pr ও Pr স্থান বদল করে। এর থেকে জিনের সরলরেখায় অবস্থান প্রমাণিত হয়। অন্য দুই শ্রেণীর উদ্ভিদে যথাক্রমে bm ও pr-এর মধ্যে এবং pr ও v-র মধ্যে একটা করে ক্রসিং ওভার হয়। এই তিনটি জিনের বিন্যাস হল bm-pr-v।

bm ও pr-এর মধ্যে ব্যবধান হল, ওই স্থান দু'টির মধ্যে একটি ক্রস ওভারের হার ও দু'টি ক্রস ওভারের হারের যোগফল অর্থাৎ, 14.52 + 7.75 বা 22.27। একইভাবে, Pr ও v-র মধ্যে দূরত্ব হল 35.62 + 7.75 বা 43.37। bm এবং v-এর মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার হল bm ও pr-এর ক্রসিং ওভারের হার, pr ও v-র মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার এবং bm ও v-র মধ্যে দু'টি ক্রসিং ওভারের (double crossing over) হারের যোগফল। অতএব, bm ও v-র মধ্যে ব্যবধান হল [14.52 + 35.62 + 2 (7.75)] বা 65.64 (চিত্র 152)।

উপরের পরীক্ষায় bm ও v-র মধ্যে দু'টি ক্রসিং ওভারের হার বিবেচনা না করলে এদের মধ্যে দূরত্ব হবে 14.52 + 35.62 অর্থাৎ, 50.14। কিন্তু bm থেকে pr-এর দূরত্ব 22.72 এবং pr থেকে v-র ব্যবধান 43.37। তাহলে bm থেকে v-র দূরত্ব (bm – pr + pr – v) হবে 65.64, কিন্তু সে জায়গায় এই দূরত্ব হচ্ছে মাত্র 50.14। এইজন্য দু'টি ক্রসিং ওভারের হার বিবেচনা না করলে ভুল হবার সম্ভাবনা।

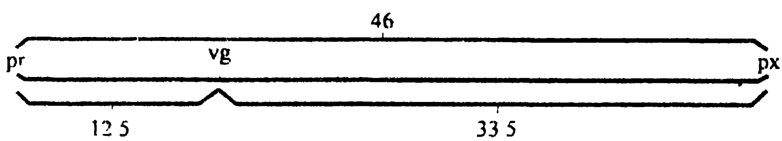


চিত্র—173

সুতরাং, দু'টি জিনের মধ্যে ব্যবধান নির্ণয় করতে হলে মধ্যবর্তী আরেকটি জিন নিয়ে তিনবিন্দু পরীক্ষা বা three point test করা দরকার। এছাড়া কাছাকাছি জিন নিয়ে পরীক্ষা করে ক্রোমোসোম মানচিত্র গঠন করা ভাল।

একই ক্রোমোসোমে অবস্থিত চারটি বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক জিনের মানচিত্র

ড্রসোফিলার দ্বিতীয় ক্রোমোসোমে অবস্থিত পাঁচটি জিন নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই জিনগুলি হল— কালো (black body-b) বা স্বাভাবিক দেহের (B) জিন,

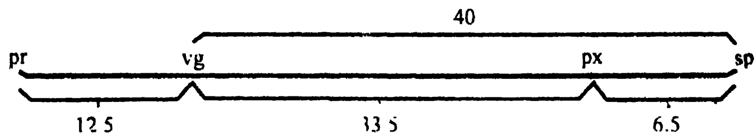


চিত্র—174

লালচে, বেগুনি (purple) চোখ (pr) বা স্বাভাবিক চোখের (Pr) জিন, অদৃশ্য প্রায় (vestigial) পাখা (vg) বা স্বাভাবিক পাখার (Vg) জিন, জালিকাকার (plexus) শিরা (px) বা স্বাভাবিক শিরার (Px) জিন। দাগযুক্ত (speck) দেহ (sp) বা দাগহীন দেহের (sp) জিন। এইসব জিনগুলির স্থান নির্ধারণ করতে হলে তিনটি জিন নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষা করা দরকার। pr, vg ও px জিন নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, pr ও vg-র মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার 12.5%; vg ও px -এর মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার

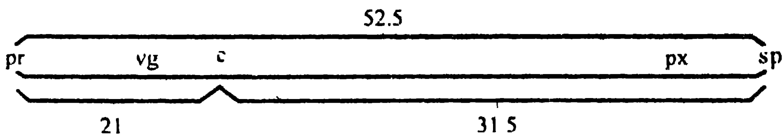
33.5%। pr ও px-এর ক্রসিং ওভারের শতকরা হার হল 46। সুতরাং, এই জিন তিনটির বিন্যাস হল pr-vg-px কিম্বা px-vg-pr (চিত্র 174)।

ওই ক্রোমোসোমের অন্য আরেকটি জিন sp-র স্থান নির্ণয় করতে হলে উপরের পরীক্ষার যে কোনও দু'টি জিনের সাথে sp জিনের পরীক্ষা করতে হবে। sp, vg ও px জিন নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, sp ও px-এর মধ্যে ক্রস ওভারের হার 6.5% এবং vg-sp-র মধ্যে ক্রস ওভারের হার 40%। তাহলে ক্রোমোসোম মানচিত্রে sp জিনের স্থান চিত্র 175 অনুযায়ী হবে।



চিত্র—175

এখন জিন c-র স্থান নির্ণয় করবার জন্য pr, sp ও c জিন নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, pr ও c-র মধ্যে ক্রস ওভারের হার 21%। sp ও c-র মধ্যে 31.5 শতাংশ ক্রস ওভার হয়। তাহলে এই মানচিত্রে জিন c-র স্থান চিত্র 176 অনুযায়ী হবে।



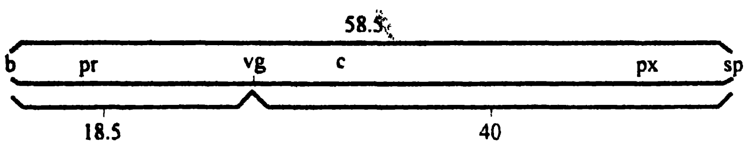
চিত্র—176

নির্বাচিত জিনগুলির (pr, c, sp) মধ্যে বেশ ব্যবধান থাকায় এই পরীক্ষা অনুসারে জিন c-র অবস্থান যথাযথ কিনা তা নির্ণয় করবার জন্য অন্য দু'টি জিন যেমন, px ও vg-র সাথে জিন c-র পরীক্ষা করা যেতে পারে।

ড্রসোফিলার দ্বিতীয় ক্রোমোসোমে অবস্থিত আরেকটি জিন b-র স্থান নিরূপণ করার জন্য b, vg ও sp জিন নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল b ও vg-র মধ্যে 18.5%, vg ও sp-র মধ্যে 40% এবং b ও sp-র মধ্যে 58.5% ক্রস ওভার হয়। আগেই দেখা গেছে যে, vg ও sp-র মধ্যে ব্যবধান হল 40 একক (unit)। এই মানচিত্রে জিন b-র অবস্থান চিত্র 177-এ দেখান হয়েছে।

b জিন সবচেয়ে বাঁদিকে আছে। ওই স্থানটিকে 0 ধরা হলে, পরপর জিনগুলি নির্দিষ্টভাবে সাজান যায়। তবে ড্রসোফিলার দ্বিতীয় ক্রোমোসোমে ছয়টির চেয়ে অনেক

বেশি সংখ্যক জিন থাকে। নতুন জিনের স্থান নির্ণীত হলে ওই জিনের জন্য ক্রোমোসোমের মানচিত্রের একটু রদবদল করতে হয়। *Drosophila*-র দ্বিতীয় ক্রোমোসোমে জিন b-র বাঁদিকে আরও অনেক জিন আছে। *Drosophila*-র বিভিন্ন ক্রোমোসোমের মানচিত্র চিত্র 178-এ দেখান হয়েছে।



চিত্র—177

একইভাবে বিভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোসোমের মানচিত্র গঠন করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে ভুট্টার দশটি ক্রোমোসোমের মানচিত্র গঠন করা হয়েছে (চিত্র 179A, B)।

ইউক্যারিওটে জেনেটিক মানচিত্র

টেট্রাড বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানচিত্র গঠন

কিছু উদ্ভিদ যেমন— ছত্রাক, ইস্ট ও *Neurospara crassa* এবং শৈবাল *Chlamydomonas*-এ যেখানে মায়োসিসের ফলে উৎপন্ন টেট্রাড একই কোষের মধ্যে থাকে, সেখানে এই পদ্ধতি উপযোগী।

i) এই জীবগুলি হ্যাপ্লয়েড হওয়ায় যে কোনও মিউটেশন প্রকাশ পায়।

ii) এদের জীবন চক্র ছোট হওয়ায়, জেনেটিক অস্বাভাবিকতার পৃথকীকরণ সম্বন্ধে পরীক্ষা করা যায়।

Neurospora-এ দু'টি স্ট্রেইন হল A এবং a। এই দুই রকম স্ট্রেইনের কোষ মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড কোষের সৃষ্টি করে। এই কোষে মায়োসিসের ফলে চারটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয়। এগুলি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে আটটি রেণু উৎপন্ন করে। রেণুগুলি সারিবদ্ধভাবে সাজান থাকে।

ইস্টেও *Neurospora*-র মতো একইভাবে অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন হয়। তবে এখানে রেণুগুলি সারিবদ্ধভাবে সাজান থাকে না।

ab এবং + + জেনোটাইপযুক্ত কোষের সংযোগের ফলে এবং একটি ক্রস ওভার হলে টেট্রাডের দু'টি রেণু মাতা পিতার অনুরূপ এবং রিকমবিনেশন ধরনের দু'টি রেণু উৎপন্ন হতে পারে। জিন দু'টি লিঙ্কড হলে এবং ক্রসিং ওভার না হলে কেবল মাতাপিতার অনুরূপ রেণু উৎপন্ন হয়। ডাবল ক্রস ওভার হলে ওই ক্রস কতগুলি ক্রোমাটিডের মধ্যে হয়েছে, তার ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম টেট্রাড গঠিত হতে পারে।

দু'টি সূত্রে ডাবল ক্রস ওভার হলে কেবল মাতা পিতার অনুরূপ রেণু উৎপন্ন হয়। তিনটি সূত্রে ডাবল ক্রস ওভার হলে দু'টি মাতা পিতার অনুরূপ এবং দু'টি রিকমবিনেশন ধরনের রেণুর সৃষ্টি হয়। চারটি সূত্রে ডাবল ক্রসিং ওভার হলে, চারটি রিকমবিনেশন ধরনের রেণুর সৃষ্টি হয়।

মাতা পিতার ধরনের জীব অধিক সংখ্যায় দেখা গেলে বলা যায় যে, জিন দু'টি লিঙ্কড (linked)। টেট্রাড বিশ্লেষণ থেকে রিকমবিনেশনের সংখ্যা জানা গেলে নিচের সূত্র থেকে জিন দু'টির মধ্যে ব্যবধান নির্ণয় করা যায়।

$$\frac{\text{রিকমবিনেশনের সংখ্যা}}{\text{প্রোজেনির মোট সংখ্যা (টেট্রাড)}}$$

মানুষের ক্রোমোসোমের জেনেটিক মানচিত্র

সোমাটিক কোষের সংকরণের মাধ্যমে মানুষের অটোসোমীয় এবং সেক্স লিঙ্কড জিনের মানচিত্র গঠন করা যায়। রিকমবিনেশন বিশ্লেষণ করে সেক্স লিঙ্কড জিনের মানচিত্র গঠন করা হয়।

মানুষের পেডিগ্রী বিশ্লেষণ করে জিনের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে জানা যায়। একে 'পেডিগ্রী বিশ্লেষণ' (pedigree analysis) বলে। এই পদ্ধতিতে সাধারণত জিনের অবস্থান নির্ণয় করা যায় না। তবে কখনও বহু সংখ্যক পেডিগ্রী বিশ্লেষণ থেকে দু'টি জিনের রিকমবিনেশনের ফ্রিকোয়েন্সি জানা যায় এবং এর থেকে জিন দু'টির মধ্যে জেনেটিক ব্যবধান নির্ণয় করা যায়।

সোমাটিক কোষের সংকরণ পদ্ধতি

'in vitro' কালচারে যথাযথ মাধ্যমে দেহ কোষ বৃদ্ধি পায়। তবে এই কোষগুলি কেবল নির্দিষ্ট সময় বৃদ্ধি পায়। ম্যালিগন্যান্ট কলার কোষ অনির্দিষ্ট কাল বৃদ্ধি পায়।

মানুষের কোষের (যেমন, ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ) সাথে ইঁদুরের টিউমার কোষের সংযোগের ফলে সংকর কোষ গঠিত হয়। পলিইথিলিন গ্লাইকল (PEG) কোষ সংযোগে সহায়তা করে। সংকর কোষের নিউক্লিয়াস দু'টি পৃথক থাকতে পারে (heterokaryon) অথবা সংযুক্ত হয়ে একটি নিউক্লিয়াস গঠন করে। এই নিউক্লিয়াসে ইঁদুর ও মানুষের দুই সেট (set) ক্রোমোসোম থাকে। সংকর কোষের পরপর প্রজন্মে মানুষের কিছু ক্রোমোসোম বাদ যায়। কোনও কোনও স্থায়ী (stable) সংকর কোষ পাওয়া গেছে, যেখানে মানুষের কেবল একটি ক্রোমোসোম রয়েছে।

এরকম ক্রোমোসোমের জিন সনাক্ত করা যায় এবং এসব জিনের মানচিত্র গঠন করা যায়। প্রথমে কমপ্লিমেন্টেশন প্রক্রিয়ায় সংকর কোষ নির্বাচন করা হয়। এরকম একটি নির্বাচন পদ্ধতি হল HAT পদ্ধতি।

HAT পদ্ধতি :

মাধ্যমে হাইপোজ্যান্থিন অ্যামিনোটেরিন থাইমিডিন (HAT) দেওয়া হয়। এর ফলে কোষ পূর্ববর্তী পদার্থ (precursor) থেকে পিউরিন এবং পিরিমিডিন সংশ্লেষ করতে পারে না। বিকল্প পথে পিউরিন এবং পিরিমিডিন উৎপন্ন হতে পারে, উৎসেচকের সহায়তায় DNA ও RNA বিশ্লিষ্ট করে। এই পদ্ধতিকে 'salvage pathway' বলে।

অস্বাভাবিক জেনোটাইপযুক্ত একটি ইঁদুরের কোষের (TK^+ ও $HGPRT^-$) সাথে মানুষের একটি অস্বাভাবিক কোষের (TK^- ও $HGPRT^+$) সংকরণ করা হয়। প্রথমোক্ত কোষে থায়ামিডিন কাইনেস সক্রিয় (TK^+) এবং হাইপোজ্যান্থিন ফসফোরাইবোসিল ট্র্যান্সফারেজ অনুপস্থিত ($HGPRT^-$)। অ্যামিনোপটেরিনের উপস্থিতিতে এরকম কোষ বৃদ্ধি পায় না কারণ, কোষগুলি পিউরিন ও পিরিমিডিন পথ ব্যবহার করতে পারে না। এরকম কোষ দু'টি থেকে উৎপন্ন সংকর কোষে কমপ্লিমেন্টেশন হওয়ায় (TK^+ ও $HGPRT^+$) ওই কোষ অ্যামিনোপটেরিনের উপস্থিতিতেও বৃদ্ধি পেতে পারে। এরকম সংকর কোষ HAT পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়।

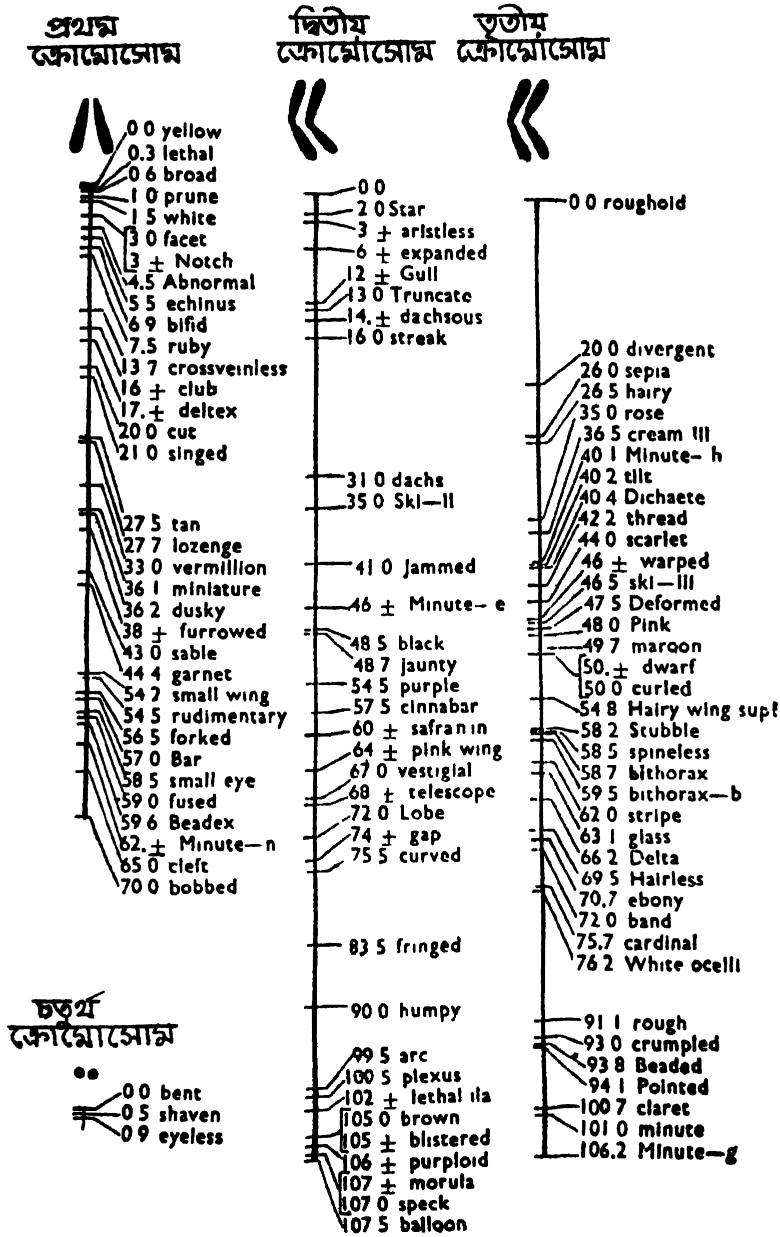
মানুষের ক্রোমোসোমে জিনের অবস্থান কীভাবে নির্ণয় করা যায় তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিছু কোষে ক্রোমোসোম ছয় স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে (A ধরনের কোষ)। আবার অন্য কিছু কোষে ক্রোমোসোম ছয়ের একটি বাহুতে ডিলিশন থাকে (B ধরনের কোষ)।

A ধরনের কোষ ও ইঁদুরের কোষের মধ্যে সংকর গঠিত হলে, ওই সংকরে কিছু উৎসেচকের সক্রিয়তার ফলে নতুন প্রোটিন উৎপন্ন হয়, যা ওই ক্রোমোসোমের জিনের প্রভাবে হয়। B ধরনের কোষ ও ইঁদুরের কোষের মধ্যে সংকর গঠিত হলে, ওই সংকরে কিছু উৎসেচকের কার্যকারিতার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, ওই সব জিন ক্রোমোসোম ছয়ের বাদ যাওয়া অংশে ছিল। এভাবে অনেক কোষ পরীক্ষা করে কোনও ক্রোমোসোমে নির্দিষ্ট জিনের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। এভাবে মানুষের অনেক জিন সনাক্ত করা হয়েছে।

মানুষের মাইটোকন্ড্রিয় DNA-র মানচিত্র

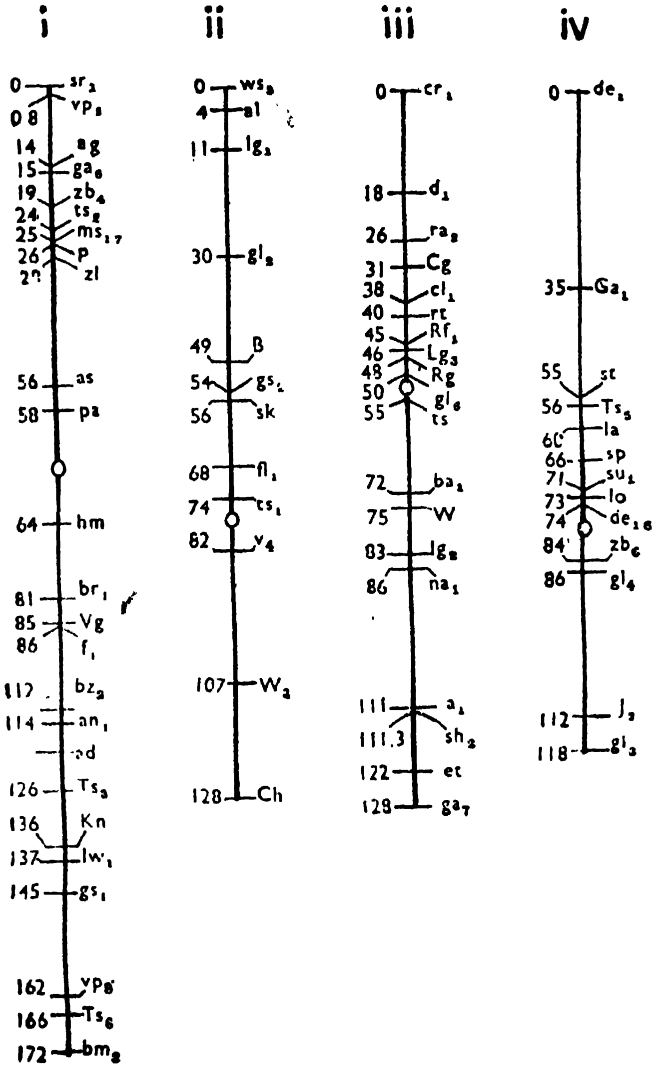
অপ্রাকৃত অর্থাৎ 'ডিনেচারেশন' (denaturation) পদ্ধতিতে প্রধানত মাইটোকন্ড্রিয় DNA-র মানচিত্র গঠন করা হয়। নির্বাচিত ডিনেচারেশন প্রক্রিয়ায় AT বেস জোড়াগুলিতে ডিনেচারেশন হয়, কিন্তু GC অঞ্চলে এই প্রক্রিয়া হবে না। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এরকম AT প্রধান অঞ্চলগুলি সনাক্ত করা যায়।

দ্রুত অলিগোনিউক্লিওটাইড লেবেলিং (labelling) প্রক্রিয়ায় DNA-র বেসের ক্রমগুলির মানচিত্র গঠন করা যায়। এই পদ্ধতিতে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জিনের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। রাইবোসোমের 16S এবং 12S RNA-র ভারী H সূত্রে জিন সনাক্ত করা হয়েছে। এই জিনগুলি পরস্পরের নিকটে থাকে। tRNA-র



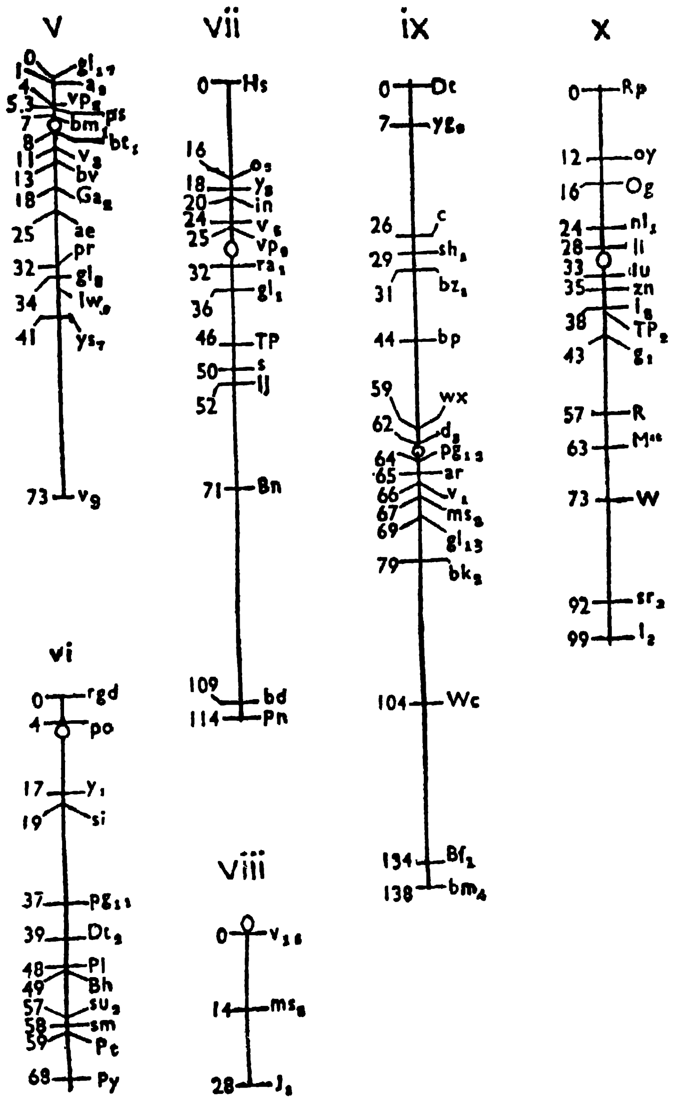
চিত্র—178

Drosophila melanogaster-এর জেনেটিক মানচিত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জিনের অবস্থান দেখান হয়েছে



চিত্র—179A

ভুট্টার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ক্রোমোসোমের জেনেটিক মানচিত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জিনের অবস্থান দেখান হয়েছে



চিত্র—179B

ভুট্টার পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম এবং দশম ক্রোমোসোমের জেনেটিক মানচিত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জিনের অবস্থান দেখান হয়েছে

জিনগুলিতে H সূত্র এবং L সূত্র (হালকা সূত্র) উভয়েই থাকে। এসব জিনের অবস্থানও নির্ণয় করা হয়েছে।

কমপিউটার প্রোগ্রামিং-এর দ্বারা DNA-র ক্রম নির্ণয় করা হয়েছে। H সূত্র এবং L সূত্রে অনেক জিনের অবস্থান জানা গেছে। DNA ক্রমে প্রারম্ভ ও শেষ নির্দেশক সঙ্কেত থাকে। শেষে শৃঙ্খলের প্রান্তীয় কোডন থাকে। এটিকে মুক্ত reading frame (ORF) বলে। মাইটোকন্ড্রিয়ার mRNA-র 3′ প্রান্তে পলি A থাকে।

সাইটোলজিয় মানচিত্র

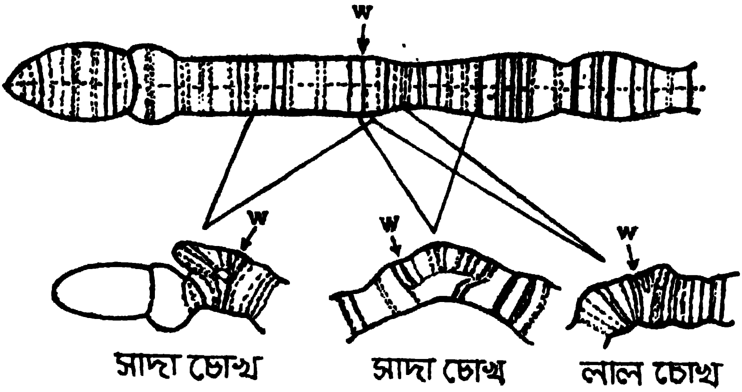
সাইটোলজিয় পদ্ধতিতে মানচিত্র গঠন করার সময় ক্রোমোসোমের বিভিন্ন অস্বাভাবিকতা যেমন, ডিলিশন (ঘাটতি), ট্র্যান্সলোকেশন, ইনভারশন ইত্যাদির ব্যবহার করা হয়। এখানে মেটাফেজ অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলির ওপর গবেষণা করা হয় বলে এই উপায়ে নির্মিত মানচিত্রকে অনেক সময় মেটাফেজ ক্রোমোসোমের মানচিত্র বলা যায়। কেবল লিঙ্কেজ মানচিত্র থেকে কোন ক্রোমোসোমে কোন লিঙ্কেজ গ্রুপ অবস্থিত তা বলা যায় না। তবে কখনও কখনও লিঙ্কেজ গ্রুপের আয়তন ও ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য থেকে কিছুটা ধারণা করা যায়। সাইটোলজিয় মানচিত্র গঠনের সময় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্রোমোসোমের পরীক্ষার সাথে সাথে লিঙ্কেজ পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত জেনেটিক তথ্যও ব্যবহার করা হয়। X-ray প্রয়োগ করে ক্রোমোসোমের অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করা হয়। এই অস্বাভাবিকতার ফলে কোন কোন চরিত্রের পরিবর্তন হচ্ছে, তার থেকে জিনের স্থান নির্ণয় করা হয়।

ডিলিশনের (deletion) সাহায্যে ক্রোমোসোমে জিনের স্থান নির্ণয়

ছোট হেটারোজাইগাস ডিলিশন হলে অনেক সময় ওই উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারে। এই উদ্ভিদে কোন কোন চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে তা লক্ষ্য করা হয়। এই সব চরিত্রের নিয়ন্ত্রক জিন ওই অবলুপ্ত (deleted) অংশে অবস্থিত ছিল। ড্রসোফিলায় (চিত্র 180) এবং ভুট্টায় ডিলিশনের সাহায্যে অনেক জিনের স্থান নির্ণয় করা হয়েছে।

ভুট্টায় জিন yg_2 হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকলে হলদেটে সবুজ (yellowish-green) উদ্ভিদের সৃষ্টি জিন yg_2 হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস অবস্থায় সবুজ (green) উদ্ভিদের সৃষ্টি করে। এই জিন ভুট্টার নবম ক্রোমোসোমে থাকে। নবম ক্রোমোসোমের প্রান্তে কোনও কোনও ভ্যারাইটিতে বড় প্রান্তস্থ স্ফীতি (terminal knob) দেখা যায়। ফলে এই ক্রোমোসোমকে সহজেই চেনা যায়। লিঙ্কেজ পরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, জিন yg_2 ক্রোমোসোমের প্রান্তে থাকে। Creighton জিনের স্থান নির্ণয় করার জন্য একটা ছোট প্রান্তস্থ স্ফীতিযুক্ত হলদে সবুজ হোমোজাইগাস উদ্ভিদের ($yg_2 yg_2$) সাথে বড় প্রান্তস্থ স্ফীতিযুক্ত উদ্ভিদের ক্রস (cross) করেন। প্রথম

উদ্ভিদকে মাতা হিসাবে ও দ্বিতীয় উদ্ভিদকে পিতা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বড় প্রান্তস্থ স্ফীতিযুক্ত সবুজ উদ্ভিদের পরাগরেণুতে X-ray প্রয়োগ করা হয়। ওই বিকিরণপ্রাপ্ত পরাগরেণু নির্বাচিত ছোট স্ফীতিযুক্ত হলদে সবুজ উদ্ভিদের গর্ভমুণ্ডের উপর ফেলা



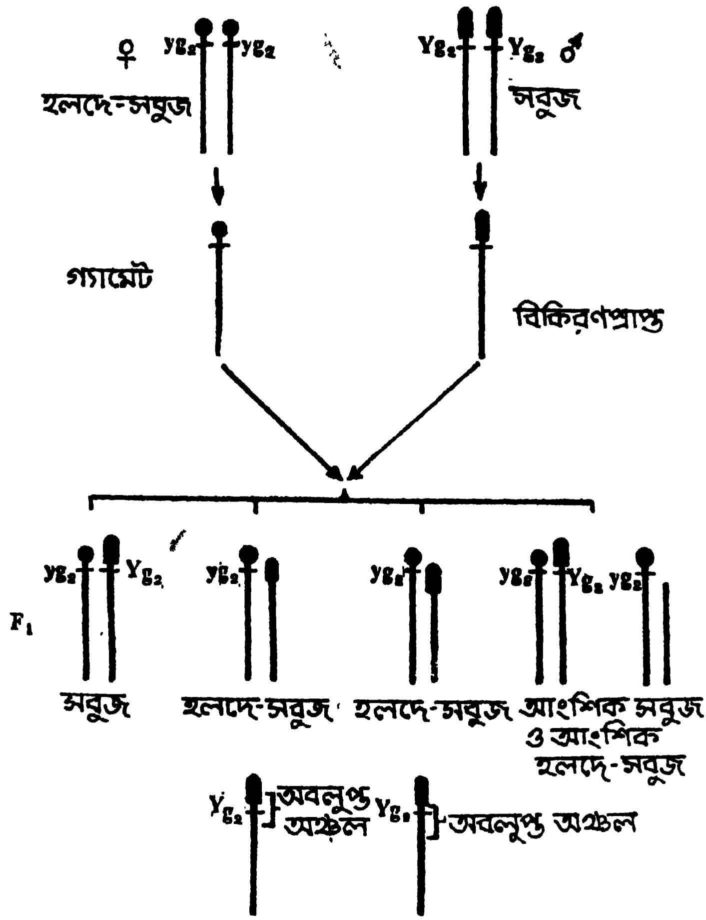
চিত্র—180

Drosophila-র স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমে ডিলিশনের মাধ্যমে জিন w-র (সাদা চোখ) স্থান নির্ধারণ। উপরে— স্বাভাবিক ক্রোমোসোম, নিচে— বিভিন্ন রকমের হেটারোজাইগাস ডিলিশন, বাঁদিকে ও মাঝে— জিন 'w'-অবলুপ্ত অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে, ডানদিকে— জিন w ডিলিশন অঞ্চলের বাইরে রয়েছে।

হয়। এই ক্রসের ফলে সৃষ্ট বীজগুলি বপন করা হলে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। (a) বেশিরভাগ উদ্ভিদই সবুজ হয়। এই সব উদ্ভিদের সাইটোলজিয় পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, এখানে নবম ক্রোমোসোমের দু'টি সদস্যই অপরিবর্তিত আছে। (b) কিছু কিছু হলদে সবুজ উদ্ভিদ দেখা যায়। এইসব উদ্ভিদে বড় স্ফীতিযুক্ত নবম ক্রোমোসোমের স্ফীত (knob) জায়গার কাছের অঞ্চলের অবলুপ্তির ফলে ওই ক্রোমোসোমটি বেশ ছোট থাকে। (c) অন্যান্য কতকগুলি হলদে সবুজ উদ্ভিদের নবম ক্রোমোসোমের বড় স্ফীত অংশটি ডিলিশনের ফলে ছোট হয়েছে। (d) একটি উদ্ভিদ আংশিক সবুজ ও আংশিক হলদে সবুজ হয়। সবুজ অংশের কোষগুলিতে নবম ক্রোমোসোম অপরিবর্তিত থাকে। হলদে সবুজ অংশের কোষগুলিতে নবম ক্রোমোসোমের একটি সদস্যে কোনও স্ফীত স্থান দেখা যায় না ও এই ক্রোমোসোমটি ছোট হয় (চিত্র 181)। কেবল পরাগরেণুতেই X-রশ্মি প্রয়োগ করা হয়েছিল বলে সব ক্ষেত্রেই মাতৃ ক্রোমোসোম অপরিবর্তিত থাকে। এই পরীক্ষা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কোনও কোনও উদ্ভিদের নবম ক্রোমোসোমে ডিলিশনের (deletion) ফলে স্ফীত অংশের কাছে অবস্থিত ডমিন্যান্ট Yg_2 জিন অবলুপ্ত হয়েছে। সুতরাং, যেসব জীবে ক্রোমোসোমগুলি দীর্ঘ হয় ও কোনও বৈশিষ্ট্যের জন্য ক্রোমোসোমকে চেনা যায়, সেখানে ডিলিশনের মাধ্যমে সহজেই জিনের স্থান নির্ণয় করা সম্ভব।

ট্র্যান্সলোকেশনের (translocation) সাহায্যে জিনের স্থান নিরূপণ

ট্র্যান্সলোকেশনের সাহায্যে ক্রোমোসোমে জিনের স্থান নির্ণয় করা যায়। ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে লিঙ্কেজ গ্রুপের (linkage group) পরিবর্তন হয় কারণ, কোনও ক্রোমোসোমের যে অংশটি ভেঙে গিয়েছে, সে অংশের জিনগুলি ওই ক্রোমোসোমের অন্য জিনগুলির সাথে আর সংযুক্ত বা লিঙ্কড (linked) থাকে না। এই ভগ্ন অংশ যে



চিত্র—181

ভুট্টায় ডিলিশনের মাধ্যমে জিনের স্থান নির্ণয়ের চিত্র

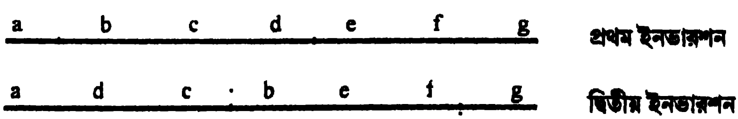
ক্রোমোসোমে যুক্ত হয়েছে, সেই ক্রোমোসোমের জিনগুলির সাথে ওই জিনগুলি লিঙ্কেজ গ্রুপ গঠন করে। লিঙ্কেজের গবেষণা থেকে জেনেটিক মানচিত্রের কোন অঞ্চলে ক্রোমোসোমটি ভেঙেছে তা নির্ণয় করা যায়। মেটাফেজ অবস্থায় ট্র্যান্সলোকেশনযুক্ত ক্রোমোসোম পরীক্ষা করে ক্রোমোসোমের কোন অংশটি ভেঙেছে

তা লক্ষ্য করা হয়। জেনেটিক এবং সাইটোলজিয় পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ক্রোমোসোমে জিনগুলির যথাযথ অবস্থান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

ড্রসোফিলায় কোন লিঙ্কেজ গ্রুপ কোন ক্রোমোসোমে অবস্থিত, তা ট্র্যান্সলোকেশনের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়েছে। Dobzhansky ড্রসোফিলার তৃতীয় ক্রোমোসোমের একটি অংশ X-ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত অবস্থায় পেয়েছিলেন। তৃতীয় ক্রোমোসোম ড্রসোফিলার ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে সবচেয়ে লম্বা। ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে কোন জিনগুলি লিঙ্কেজ গ্রুপ পরিবর্তন করছে, তার থেকে Dobzhansky তৃতীয় ক্রোমোসোমের যথাযথ লিঙ্কেজ গ্রুপ নির্ণয় করেছিলেন। একই ভাবে ট্র্যান্সলোকেশনের সাহায্যে তিনি ড্রসোফিলার দ্বিতীয় ক্রোমোসোমের লিঙ্কেজ গ্রুপ নিরূপণ করেছিলেন। Sternও ট্র্যান্সলোকেশনের সাহায্যে ড্রসোফিলায় জিনের স্থান নির্ধারণ করেছিলেন। অনেকগুলি ট্র্যান্সলোকেশনেব সাহায্যে কোনও একটি ক্রোমোসোমে বিভিন্ন জিনের স্থান প্রায় নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব।

ইনভারশনের সাহায্যে জিনের স্থান নির্ণয়

ড্রসোফিলায় ইনভারশনের সাহায্যে জিনের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। ইনভারশন হেটারোজাইগোটে ইনভারশন অঞ্চলের মধ্যে সাধারণত ক্রসিং ওভার হয় না, কিন্তু ওই অঞ্চলেব বাইবে ক্রসিং ওভার হয়। এই জন্য লিঙ্কেজ পরীক্ষা থেকে কোনও নির্দিষ্ট জিন ইনভারশন অঞ্চলের মধ্যে, কিম্বা ওই অঞ্চলের ডান বা বাঁদিকে অবস্থিত, তা বোঝা যায়। ইনভারশন হেটারোজাইগোটে ইনভারশন লুপ গঠিত হয। অনেক সময় একই ক্রোমোসোমে দুইটি ইনভারশনে আংশিকভাবে ক্রোমোসোমেব একই অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত থাকে অর্থাৎ, abcdefg ক্রোমোসোমে প্রথম ইনভাবশন bcd অঞ্চলে ও দ্বিতীয় ইনভারশন def অঞ্চলে হতে পারে। এর ফলে জিন d উভয ইনভারশনেই (চিত্র 182) অন্তর্ভুক্ত থাকে।

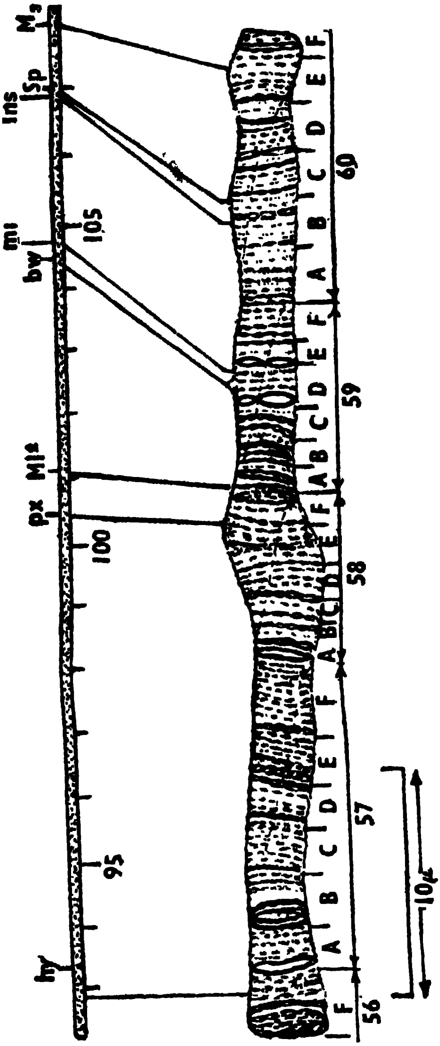


চিত্র—182

ইনভারশনের সাহায্যে জিনের স্থান নির্ণয়ের চিত্র

এখানে জিন e প্রথম ইনভারশনের ডানদিকে ও দ্বিতীয় ইনভারশনের মধ্যে থাকে। এই ভাবে প্রথম ইনভারশনের ডানদিকে এবং দ্বিতীয় ইনভারশনের মধ্যে কোনও জিনের

(যেমন জিন e) স্থান নির্ণয় করা যায়। দ্বিতীয় ইনভারশনের বাঁদিকে এবং প্রথম ইনভারশনের মধ্যে (জিন c) কোনও জিনের স্থান একই পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়।



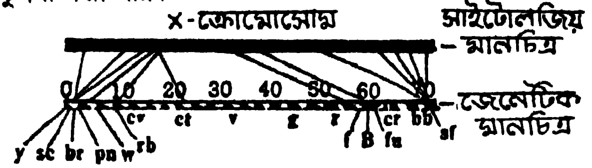
চিত্র—183

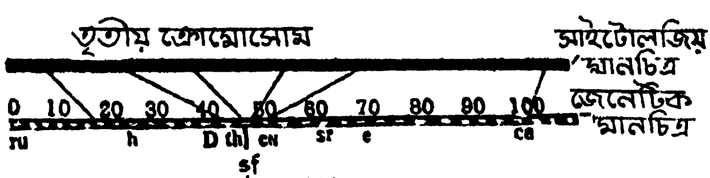
Drosophila melanogaster-এর দ্বিতীয় ক্রোমোসোমের ডান বাহুর প্রান্তের জেনেটিক মানচিত্রের সাথে স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমের মানচিত্রের তুলনা

Drosophila-র স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোম থেকে সাইটোলজিয় মানচিত্র গঠন করা যায়। কোনও জিনের স্থান নির্ণয় করবার জন্য স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের স্বাভাবিক ক্রোমোসোমের মানচিত্রের সাথে অস্বাভাবিক ক্রোমোসোমযুক্ত মানচিত্রের

তুলনা করা হয়। কোনও ক্রোমোসোমের অস্বাভাবিকতার (যেমন, ট্রান্সলোকেশন, ইনভারশন কিম্বা ডিলিশন) ফলে ফেনোটাইপের কী পরিবর্তন হয়েছে, তা লক্ষ্য করা হয়। এরপর ওই স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমের কোন ব্যান্ড পরিবর্তিত হয়েছে, তার থেকে কোন জিন ওই স্থানে অবস্থিত তা নির্ণয় করা যায়। ক্রোমোসোমের মাঝখানের কোনও অংশ বাদ গেলে (deletion), ওই ক্রোমোসোমটি যখন হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের সাথে যুগ্ম অবস্থান করে, তখন স্বাভাবিক সদস্যের যে অংশটি অবলুপ্ত অংশের অনুরূপ, সেটি পাশের দিকে একটি লুপ (loop) বা ফাঁস গঠন করে। সাদা চোখের জিন w-র অবস্থান চিত্র 180 অনুসারে ডিলিশনের মাধ্যমে সহজেই নির্ধারণ করা যায়। লিঙ্কেজ পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোন জিন অবলুপ্ত (deleted) অংশে অবস্থিত, তা বোঝা যায়।

ভুট্টার পরাগরেণু মাতৃকোষের প্যাকিটিন অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি খুব সম্প্রসারিত থাকে। এই সময় ক্রোমোসোমগুলির সূক্ষ্ম গঠন দেখা যায়। প্যাকিটিনে ক্রোমোসোমগুলি যুগ্ম অবস্থায় থাকে বলে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলির সব অংশের তুলনা করা যায়।





চিত্র—184

Drosophila melanogaster-এর জেনেটিক ও সাইটোলজিয় মানচিত্রের তুলনা

কোনও উদ্ভিদ বা প্রাণী ক্রোমোসোমের জেনেটিক মানচিত্রের সাথে সাইটোলজিয় মানচিত্রের তুলনা করলে দেখা যায় যে, দু'টি মানচিত্রে জিনের বিন্যাস একই রকম হলেও, এই দুই মানচিত্রের বিভিন্ন জিনের ব্যবধানের মধ্যে পার্থক্য (চিত্র 183) হয়। সাইটোলজিয় মানচিত্রে সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের অঞ্চলে জিনের অবস্থান লিঙ্কেজ (জেনেটিক) মানচিত্রের তুলনায় অনেক দূরে থাকে। Dobzhansky ড্রসোফিলার বিভিন্ন ক্রোমোসোমের সাইটোলজিয় ও জেনেটিক মানচিত্রের মধ্যে এই রকমের তফাৎ (চিত্র 184) দেখতে পেয়েছিলেন। কোনও ক্রোমোসোমের বাহুর মাঝামাঝি অঞ্চলের জিনগুলি সাইটোলজিয় মানচিত্রের তুলনায় জেনেটিক মানচিত্রে বেশি ব্যবধানে থাকে। দুই মানচিত্রের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ হল যে, ক্রোমোসোমের সব

অংশে সমান ক্রসিং ওভার হয়, এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই লিঙ্কেজ মানচিত্র (linkage map) গঠন করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে, ক্রোমোসোমের সব অঞ্চলে একই হারে ক্রসিং ওভার হয় না। ক্রোমোসোমের কোনও স্থানে ক্রসিং ওভারের হার খুব বেশি হলে, ওই অঞ্চলের লিঙ্কেজ মানচিত্র অতিরিক্ত দীর্ঘ হবে। আবার ক্রোমোসোমের কোনও অঞ্চলের ক্রসিং ওভারের হার খুব কম হলে, কিম্বা ক্রসিং ওভার না হলে ওই অঞ্চলের লিঙ্কেজ মানচিত্র খুব ছোট হবে।

এই জন্য ক্রোমোসোমের সঠিক মানচিত্র গঠন করতে হলে জেনেটিক ও সাইটোলজিয় উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা উচিত।

ষোড়শ অধ্যায়

ক্যারিওটাইপের বিবর্তন

একটি প্রজাতির বেসিক সেটকে ক্যারিওটাইপ বলে। Levitsky-র মতে, ('24,'31) ক্যারিওটাইপ হল দেহ কোষের ক্রোমোসোমগুলির ফেনোটাইপের আকৃতি। রাশিয়ার বিজ্ঞানী S. Navaschin বিভিন্ন জীবের দেহ কোষের ক্রোমোসোম লক্ষ্য করে দেখেন যে, বিভিন্ন জীবের ক্রোমোসোমের মধ্যে বেশি সামঞ্জস্য দেখা যায়। একটি প্রজাতির বিভিন্ন উদ্ভিদের বা প্রাণীর ক্যারিওটাইপ মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। এজন্য ক্যারিওটাইপ একটি জেনাসের চরিত্রও নির্দেশ করতে পারে। Liliaceae-র কোনও কোনও জেনাসে ও উত্তর আমেরিকার *Tradescantia*-র কতকগুলি প্রজাতির ক্যারিওটাইপ একই রকম। কিন্তু *Crepis, Drosophila* ইত্যাদির বিভিন্ন প্রজাতির ক্যারিওটাইপে পার্থক্য দেখা যায়। ক্যারিওটাইপ থেকে কোনও জীবের ক্রোমোসোমের আকৃতি ও আয়তন বোঝা যায়। ক্যারিওটাইপকে নক্সাকারে উপস্থাপিত করাকে ইডিওগ্রাম (idiogram) বলে।

বিভিন্ন প্রজাতির ক্যারিওটাইপের তুলনা করলে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে বিভিন্ন রকম পার্থক্য হতে পারে। যেমন—

(1) বেসিক ক্রোমোসোম সংখ্যার পার্থক্য,

(2) ক্রোমোসোমের আকৃতি ও আয়তনের পার্থক্য,

(3) হেটারোক্রোমাটিনের পরিমাণ ও অবস্থানের পার্থক্য,

(4) সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের পার্থক্য,

(5) স্যাটেলাইটের সংখ্যা ও অবস্থানের পার্থক্য।

বিভিন্ন জীবের বিবর্তনের সাথে উপরের পরিবর্তনগুলির একটি বা একাধিক পরিবর্তন জড়িত থাকে।

(1) বেসিক ক্রোমোসোম সংখ্যার পার্থক্য

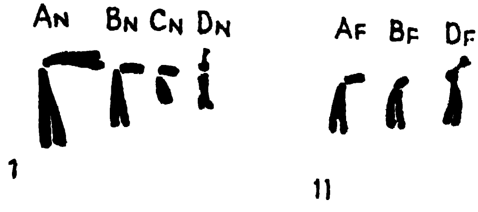
ক্রোমোসোম সংখ্যার পরিবর্তন পলিপ্লয়েডি ও অ্যানইউপ্লয়েডির মাধ্যমে হয়। সাধারণত পলিপ্লয়েডির মাধ্যমে ক্রোমোসোম সংখ্যা বাড়ে। অনেক উদ্ভিদে পলিপ্লয়েড সিরিজ পাওয়া গেছে। Amaryllidaceae গোত্রের *Crinum*-এর বিভিন্ন প্রজাতিতে $x = 11$ এর গুণিতক পাওয়া যায়, যেমন, $2n = 22, 33, 44$ ইত্যাদি। কম ক্রোমোসোম সংখ্যাযুক্ত উদ্ভিদ তুলনামূলকভাবে বেশি প্রাচীন। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণতার (specialization) সাথে সাথে বেসিক সংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা দেখা যায়। Stebbins-এর ('38) মতে, বেসিক সংখ্যার সাথে উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রকৃতির

(growth habit) সম্পর্ক রয়েছে।

বিভিন্ন সংখ্যক ক্রোমোসোমযুক্ত দু'টি উদ্ভিদ থেকে সংকরণ এবং ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার ফলে নানা রকম বেসিক সংখ্যা দেখা যায়। যেমন, *B. campestris* (2n = 20) ও *B. oleracea* (2n = 18) থেকে উদ্ভূত *B. napas*-এর ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 2n = 38।

অ্যানইউপ্লয়েডির ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদে নানা রকম বেসিক সংখ্যা দেখা গেছে। যেমন *Crepis* এর বেসিক সংখ্যা হল x = 3, 4, 5, 6, 7 ইত্যাদি। Cyperaceae গোত্রের *Carex*-এর হ্যাপ্লয়েড সংখ্যা n = 6–56 পর্যন্ত হয়। এখানে 12 থেকে 43 পর্যন্ত প্রত্যেকটি সংখ্যা পাওয়া গেছে। এরকম হ্যাপ্লয়েড সংখ্যার তারতম্য দেখা গেছে *Scirpus, Eliocharis* (Graminae) *Draba, Brassica* (Cruciferae), *Viola* (Violaceae), *Euphorbia* (Euphorbiaceae), *Nicotiana* (Solanaceae) ইত্যাদিতে (Stebbins 50)। প্রাণীতে ড্রসোফিলার হ্যাপ্লয়েড সংখ্যা 3-7 হয়।

Crepis-এ বিবর্তনের সাথে সাথে ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। প্রাচীন প্রজাতিতে x = 7 দেখা গেছে। ক্রমশ উন্নত প্রজাতির বেসিক সংখ্যা x = 6, 5, 4, 3। এই বিবর্তন পর্যায়ক্রমে অসমান ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে হয়েছে। যখন ক্ষুদ্রতম ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ারের কাছে হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল থাকে, তখন অসমান ট্র্যান্সলোকেশনের মাধ্যমে ঐ ক্রোমোসোম থেকে প্রয়োজনীয় জেনেটিক পদার্থ অপসারিত হতে পারে এবং পরিশেষে এই ক্রোমোসোম অবলুপ্ত হতে পারে। ক্রোমোসোমের সংখ্যা হ্রাসের এই মতকে dislocation hypothesis বলে। Tobgy-র ('43) মতে, *C. fulginosa*-র (n = 3) নিকট সম্পর্কীয় *C. neglecta* (n = 4) বা অনুরূপ পূর্বপুরুষ থেকে রেসিপ্রোক্যাল ট্র্যান্সলোকেশনের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে (চিত্র 185)। *C. neglecta*-র ক্রোমোসোমগুলি হল A_N, B_N, C_N এবং D_N। C_N প্রধানত হেটারোক্রোমাটিন প্রকৃতির। *C. fulginosa*-এ A_F, B_F, D_F ক্রোমোসোম রয়েছে।



চিত্র—185

Crepis-এর দু'টি প্রজাতির হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোম সেট

I Crepis neglecta-র হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোম সেট, *II C. fulginosa*-র হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোম সেট

এখানে C ক্রোমোসোম অবলুপ্ত হয়েছে। A_N ক্রোমোসোমের ছোট বাহুর একটি অংশ D_F ক্রোমোসোমের দীর্ঘ বাহুতে স্থানান্তরিত হয়েছে। C_N-এর কিছু অংশ B_N-এ

স্থানান্তরিত হয়েছে। একইভাবে *C. kotschyana*-র (n = 4) উৎপত্তি হয়েছে *C. foetida* (n = 5) বা এর নিকট সম্পর্কীয় প্রজাতি থেকে (Sherman '46)। *Crepis*-এর নিকট সম্পর্কীয় উদ্ভিদ *Youngia* ও *Ixeris*-এও এইভাবে প্রজাতির উৎপত্তি হতে দেখা গেছে। ক্রোমোসোমের সংখ্যা বৃদ্ধি নানাভাবে হতে পারে। যেসব প্রজাতিতে B ক্রোমোসোম রয়েছে, সেখানে সহজেই বেসিক সংখ্যার বৃদ্ধি হতে পারে। এই সব নিষ্ক্রিয় ক্রোমোসোমে ইউক্রোমাটিন স্থানান্তরিত হয়ে যুক্ত হলে, সক্রিয় ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হতে পারে। ছোট অতিরিক্ত ক্রোমোসোমের সাথে বড় ক্রোমোসোমের বিপরীত (reciprocal) ট্রান্সলোকেশনের ফলে বড় ক্রোমোসোমের কার্যকর জিন ছোট ক্রোমোসোমে স্থানান্তরিত হওয়ায়, ছোট ক্রোমোসোমটি কার্যকর হয়। এরপর স্বপরাগযোগের মাধ্যমে নতুন জিনোম স্থায়ী হয়।

নন-ডিসজাংশনের (non-disjunction) ফলেও ক্রোমোসোম সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। নন-ডিসজাংশনের জন্য একটি গ্যামেটে (n + 1) কোনও একটি বাইভ্যালেন্টের দু'টি হোমোলোগই থাকে। এই গ্যামেট স্বাভাবিক গ্যামেটের সাথে মিলিত হলে ট্রাইসোমিকের (2n + 1) সৃষ্টি হয়। এরকম জীব সাধারণত বাঁচে না। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরকম উদ্ভিদ বেঁচে থাকে, যেমন, আন্তঃপ্রজাতিয় সংকরণের ক্ষেত্রে।

অ্যাম্ফিডিপ্লয়েডির ফলে ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি পেতে পারে। যেমন, *Crepis*-এ (X = 5, 6, 7) দশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম হ্যাপ্লয়েড সংখ্যার সৃষ্টি হতে পারে। X = 5-এর পলিপ্লয়েড থেকে X = 10, আবার X = 5 + 6 থেকে X = 11, X = 6 + 6 অথবা X = 5 + 7 থেকে X = 12 এবং X = 6 + 7 থেকে X = 13 ইত্যাদি পাওয়া যায়। *Brassica*-তেও এভাবে ক্রোমোসোম সংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে।

Carex-এ একটি দীর্ঘ অ্যানইউপ্লয়েড সিরিজ পাওয়া গেছে। এখানে ক্রোমোসোম সংখ্যা হল n = 6 থেকে 56। এই ক্রোমোসোম সংখ্যার পরিবর্তন সম্ভবত অটোপলিপ্লয়েডি এবং অ্যাম্ফিডিপ্লয়েডির মাধ্যমে হয়েছে। *Carex*-এ ডিফিউসড বা পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার থাকায় ক্রোমোসোম ভেঙে গেলে প্রত্যেক অংশেরই বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া ট্রান্সলোকেশন, সংকরণ ইত্যাদির মাধ্যমেও ক্রোমোসোম সংখ্যার পরিবর্তন হয়।

Allium (Liliaceae গোত্রের) ও *Dorstenia*-র (Moraceae) প্রাচীন প্রজাতিতে উন্নত প্রজাতির তুলনায় কম সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। Stebbins ('50) বলেন যে, ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাস ক্রোমোসোম সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি দেখা যায়। অনেক একবর্ষজীবী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদ্ভিদে কম ক্রোমোসোম সংখ্যা থাকে। কম ক্রোমোসোম সংখ্যা অধিকতর লিঙ্কেজ ও স্বল্প সময়ের জন্য অধিক জেনেটিক স্থায়িত্ব (constancy) প্রদান করে। .

বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের চেয়ে প্রাচীন বলে মনে করা হয়। সাধারণত বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের বেসিক সংখ্যা বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের চেয়ে বেশি হয় (Stebbins)। বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের বেসিক সংখ্যা সাধারণত n = 12, 13 হয়। কাষ্ঠল ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের বেসিক সংখ্যা 11 ও 12। মনে করা হয় যে, কাষ্ঠল গুপ্তবীজী উদ্ভিদ এর পূর্বপুরুষ থেকে বেসিক সংখ্যার যথেষ্ট পরিবর্তন ছাড়াই উদ্ভূত হয়েছে। তবে Leguminosae গোত্রের কিছু কাষ্ঠল উদ্ভিদের বেসিক সংখ্যা 6, 7, 8 (Senn '38)। এর থেকে মনে করা হয় যে, কোনও কোনও কাষ্ঠল উদ্ভিদ পলিপ্লয়েডির মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে। বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের বেসিক সংখ্যা 8, 9 হয়। কাষ্ঠল জেনাসে সাধারণত বেসিক সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

Drosophila-এ ক্রোমোসোম সংখ্যার হ্রাস বেশি দেখা যায়। এখানে ক্রোমোসোম সংখ্যার বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বিরল। ড্রসোফিলার প্রাচীন প্রজাতির বেসিক সংখ্যা 6। এখানে পাঁচটি বড়, সাবটারমিন্যাল (উপপ্রান্তিয়) সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম ও একটি ডট্ (dot) ক্রোমোসোম থাকে। এরকম ক্রোমোসোম দেখা যায় *D. virilis, D. funebris, D. repleta* এবং *D. tripunctata*-এ। ড্রসোফিলায় সেন্ট্রিক ফিউশন, পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশন, ট্রান্সলোকেশন এবং হেটারোক্রোমাটিনের পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। *D. virilis*-এ (চিত্র 165) ক্রোমোসোম দুইয়ে পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনের ফলে একটি বড় ক্রোমোসোম পরিবর্তিত হয়ে একটি ছোট V আকৃতির ক্রোমোসোমের সৃষ্টি করে। এভাবে *D. montana*-র সৃষ্টি হয়েছে। ক্রোমোসোম 2 এবং 3-এর মধ্যে সেন্ট্রিক ফিউশনের ফলে একটি বড় V আকৃতির ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। এভাবে *D. texana*-র সৃষ্টি হয়েছে। ক্রোমোসোম 4 এবং X ক্রোমোসোমের মধ্যে সংযোগের ফলে *D. americana*-র উদ্ভব হয়েছে। ক্রোমোসোম 3 এবং 4-এর মধ্যে সংযুক্তি এবং দ্বিতীয় ক্রোমোসোমে একটি পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনের ফলে *D. littoralis*-এর সৃষ্টি হয়েছে।

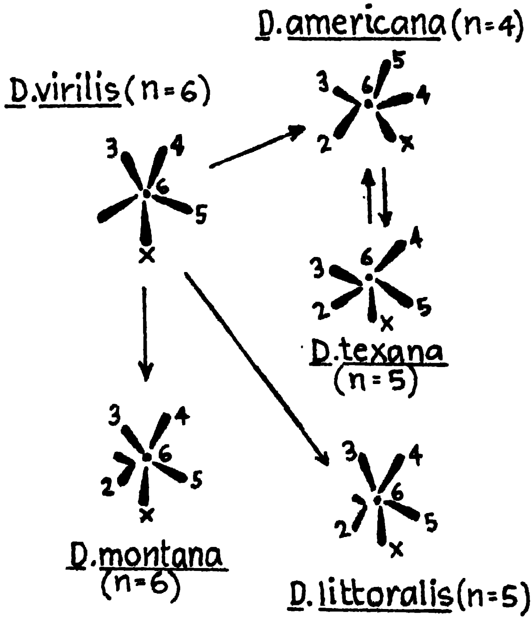
Drosophila-এ অন্যান্য ধরনের ট্রান্সলোকেশনের চেয়ে সেন্ট্রিক ফিউশন বেশি দেখা যায়, কারণ এখানে বড় সেন্ট্রিক হেটারোক্রোমাটিন রয়েছে। Orthoptera-তেও সেন্ট্রিক ফিউশনের ফলে ক্রোমোসোম সংখ্যার পরিবর্তন হয়। ড্রসোফিলায় বেসিক সংখ্যার পরিবর্তন ছোট্ট ডট্ ক্রোমোসোমের সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়ার ফলেও হতে পারে।

2a) ক্রোমোসোমের যথার্থ আয়তনের পার্থক্য

বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের মধ্যে সাধারণত ক্রোমোসোমের যথার্থ (absolute) আয়তনের পার্থক্য দেখা যায়। তবে কখনও কখনও একই শ্রেণীর বিভিন্ন সদস্যে এরকম পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়েছে।

সাধারণভাবে প্রাচীনতার সাথে বড় ক্রোমোসোমের সম্পর্ক রয়েছে। *Crepis*-এর

ক্যারিওটাইপ এই ধারণাকে সমর্থন করে। বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের তুলনায় একবর্ষজীবী উদ্ভিদে ছোট ক্রোমোসোম থাকে। *Crepis*-এর নিকট সম্পর্কীয় Compositae গোত্রের অন্য উদ্ভিদে, Caryophyllaceae গোত্রের *Dianthus*-এ, Commelinaceae এবং Graminae গোত্রের অনেক উদ্ভিদে এরকম দেখা গেছে। ফার্ণের ক্রোমোসোমও এই ধারণাকে সমর্থন করে (Monton '52)। প্রাচীন Osmundaceae গোত্রে সবচেয়ে বড় ক্রোমোসোম, কিছুটা উন্নত Polypodiaceae গোত্রে মধ্যম আয়তনের ক্রোমোসোম এবং বৈশিষ্ট্যযুক্ত Salvineaceae গোত্রে ছোট ক্রোমোসোম দেখা যায়। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য বাড়ার সাথে সাথে ক্রোমোসোমের আয়তনও বাড়তে দেখা গেছে, যেমন, Cruciferae, Leguminosae, Onagraceae এবং Polygonaceae গোত্রের কোনও কোনও উদ্ভিদে।



চিত্র—186

Drosophila-র *virilis* শ্রেণীতে বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি। ইনভারশন, সেন্ট্রিক ফিউশন (ট্রান্সলোকেশন) ইত্যাদি প্রজাতির উৎপত্তিতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে।

উদ্ভিদের বিবর্তনে নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ থেকে ক্রমশ উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে DNA-র পরিমাণ বেড়েছে। তবে প্রত্যেক শ্রেণীতে আবার DNA-র পরিমাণেও পার্থক্য রয়েছে। কখনও কখনও দু'টি শ্রেণীর (class) মধ্যে পার্থক্যের চেয়ে একটি শ্রেণীর

মধ্যে, কিম্বা একটি বর্গ (order) বা একটি গোত্রের (family) মধ্যে পার্থক্য বেশি হয়। পলিপ্লয়েডির জন্য এরকম হতে পারে। এছাড়া কখনও বা একই গোত্রের বিভিন্ন জেনাসের (গণের) ক্রোমোসোমের আয়তনে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়, যেমন, *Glycine max* এবং *Vicia faba* এ (Leguminosae গোত্রের)। *V. faba*-র DNA-র পরিমাণ *G. max*-এর DNA-র পরিমাণের প্রায় ছয় গুণ।

তবে টেরিডোফাইটা ও সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন শ্রেণীতে DNA-র পরিমাণে কিছু নিয়মিততা রয়েছে, যেমন—

(a) সমরেণুপ্রসূ টেরিডোফাইটার (যেমন, *Lycopodium*) চেয়ে অসমরেণুপ্রসূ টেরিডোফাইটার (যেমন, *Selaginella, Marsilea*) ক্রোমোসোম তুলনামূলকভাবে ছোট।

(b) ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সাধারণত বড়। তবে কোনও কোনও একবীজপত্রী উদ্ভিদ, যেমন, *Tradescantia, Lilium* ইত্যাদিতে তার চেয়েও বড় ক্রোমোসোম লক্ষ্য করা হয়েছে।

(c) কাষ্ঠল দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে সাধারণত ছোট ক্রোমোসোম দেখা যায়। নিকট সম্পর্কীয় গণ ও প্রজাতির মধ্যে ক্রোমোসোমের পার্থক্য কম থাকে। তবে এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে Annonaceae-তে।

(d) বীরুৎ জাতীয় গুপ্তবীজী উদ্ভিদে একই গোত্রের বিভিন্ন গণের ক্রোমোসোমে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

DNA-র পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে কার্যকর জিনের সংখ্যা বাড়ে। এর ফলে জিনের কাজের বিভিন্নতাও বাড়ে। সুতরাং, সরল থেকে জটিল জীবের বিবর্তনের সাথে সাথে কার্যকর জিনের সংখ্যা বেড়েছে। তবে এই ধারণা a) একই গণের বিভিন্ন প্রজাতির DNA-র পরিমাণের যথেষ্ট পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারে না এবং b) অধিকাংশ খুব উন্নত গুপ্তবীজী উদ্ভিদের তুলনায় ব্যক্তবীজী *Cycas*-এর নিউক্লিয়াস প্রতি DNA-র পরিমাণ বেশি হওয়ার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

সম্ভবত দীর্ঘ ক্রোমোসোমযুক্ত প্রজাতির DNA-তে অর্থহীন কোডনের সংখ্যা বেশি হয়। এর অভিযোজনে কোনও উপযোগিতা নেই। প্রাচীন উদ্ভিদে বেশি পরিমাণ DNA ক্রমশ যেমন খুশী ডিলিশনের ফলে হ্রাস পায়।

অধিক পরিমাণ DNA-যুক্ত প্রজাতিতে বহুসূত্রযুক্ত ক্রোমোসোম দেখা যায়। সুতরাং, এরা পলিপ্লয়েড, যদিও এদের দেহ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা ডিপ্লয়েড হতে পারে। Rothfels ও তার সহকর্মীদের ('66, '68) মতে, বিবর্তনে ক্রোমোসোমের আয়তন বৃদ্ধি পলিনেমির (polynemy) জন্য হয়।

দীর্ঘ ক্রোমোসোমের সৃষ্টি কোনও কোনও অঞ্চলের অনেক বার ডুপ্লিকেশনের জন্য হতে পারে। এর ফলে নতুন কাজের জন্য জিনের বিকাশে সুবিধা হয়। এরকম ডুপ্লিকেশন বা দ্বিগুণতার অভিযোজনে গুরুত্ব রয়েছে।

DNA সূত্রের যেসব অঞ্চলে নিউক্লিওটাইডের দ্বিগুণতা রয়েছে, সেসব স্থানে repetitive DNA-র উপস্থিতি লক্ষ্য করা হয়েছে।

ক্রোমোসোমের দ্বিগুণতা ও বহুসূত্রযুক্ত অবস্থা উভয়ই ক্রোমোসোমের আয়তন বাড়াতে পারে। এজন্য বিবর্তনে উভয় প্রক্রিয়ার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তবে কখনও কখনও জিনের দ্বিগুণতার ক্রোমোসোমের আয়তন হ্রাসেও ভূমিকা থাকে। যেমন, Compsitae গোত্রের *Crepis*-এ একবর্ষজীবী বৃদ্ধিচক্রে অতিরিক্ত দ্বিগুণতায় (duplication) ফলে অভিযোজন সংক্রান্ত উপযোগিতা হ্রাস পায়। এর ফলে ঐসব অঞ্চল বাদ যায় ও ক্রোমোসোমের আয়তন হ্রাস পায়।

উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের বিবর্তনে ক্রোমোসোমের হ্রাস কিম্বা বৃদ্ধি সমান হারে দেখা যায়। এই দু'টি প্রক্রিয়া আবার পূর্বানুবৃত্তিসম্পন্ন।

2b) ক্রোমোসোমের আপেক্ষিক আয়তন ও আকৃতির পরিবর্তন

একই গোত্রের বিভিন্ন গণে কিম্বা একই গণের বিভিন্ন প্রজাতিতে ক্রোমোসোমের আয়তন ও আকৃতির পার্থক্য দেখা যায়। তবে কোনও একটি গণের বিভিন্ন প্রজাতির ক্যারিওটাইপে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে ক্যারিওটাইপের পার্থক্যের সাথে ফেনোটাইপের পার্থক্যের সম্পর্ক রয়েছে।

ট্র্যান্সলোকেশন, পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশন, ডিলিশন ও ডুপ্লিকেশনের ফলে ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন হতে পারে। প্রাণীতে সেন্ট্রিক ফিউশন ধরনের ট্র্যান্সলোকেশন বেশি দেখা যায়।

V আকৃতির ক্রোমোসোম J বা I আকৃতির ক্রোমোসোমের চেয়ে প্রাচীন বলে মনে করা হয়। এছাড়া মোটামুটি সম আকৃতির ক্রোমোসোমযুক্ত ক্যারিওটাইপ সাধারণত প্রাচীন। এরকম ক্যারিওটাইপকে symmetrical ক্যারিওটাইপ বলে। অসম আকৃতির ক্রোমোসোমযুক্ত asymmetrical ক্যারিওটাইপ তুলনামূলকভাবে উন্নত। Ranunculaceae গোত্রের সবচেয়ে প্রাচীন জেনাসে V আকৃতির অর্থাৎ মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম থাকে, যথা— *Nigella*-এ। এই উদ্ভিদে সিমেট্রিক্যাল ক্যারিওটাইপ দেখা যায়। এই গোত্রের উন্নত জেনাস *Aconitum* ও *Dephinium*-এ অ্যাসিমেট্রিক্যাল ক্যারিওটাইপ দেখা যায়। এদের J আকৃতির ক্রোমোসোম থাকে এবং ক্রোমোসোমের আয়তনেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং, বিবর্তনে symmetrical থেকে asymmetrical ক্যারিওটাইপে পরিবর্তন হয়েছে। মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম থেকে সাবমেটাসেন্ট্রিক এবং অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে। সম আকৃতির ক্রোমোসোম থেকে অসম আকৃতির ক্রোমোসোমের বিবর্তনের সাথে সাথে ক্রমশ বিভিন্ন চরিত্রের জটিলতা বেড়েছে।

Leguminosae গোত্রের *Vicia*-র বহুবর্ষজীবী প্রজাতিতে symmetrical ক্যারিওটাইপ দেখা যায় এবং এর একবর্ষজীবী প্রজাতিতে asymmetrical

ক্যারিওটাইপ পাওয়া যায়। Liliaceae গোত্রের প্রাচীন জেনাস *Allium, Kniphofia* ও *Lilium*-এর ক্যারিওটাইপ সিমেট্রিক্যাল বা সমতাযুক্ত। এই গোত্রের তুলনামূলকভাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত জেনাস *Haworthia, Northoscordum*-এর ক্যারিওটাইপ অ্যাসিমেট্রিক্যাল বা সমতাবিহীন। Agavaceae গোত্রের Agave, *Yucca, Furcraea* ইত্যাদির ক্যারিওটাইপ খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখানে 5টি বড় এবং 25টি খুব ছোট ক্রোমোসোম (n = 30) দেখা যায়।

বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্যারিওটাইপ থেকে বিবর্তনের কতকগুলি ধারা লক্ষ্য করা হয়েছে। এগুলি হল— (a) ক্রোমোসোমের আপেক্ষিক আয়তনে পার্থক্য বেড়েছে অর্থাৎ asymmetry বেড়েছে ও এর সাথে ক্রোমোসোমের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং কোনও কোনও অঙ্গ সংস্থানিক চরিত্রে বৈশিষ্ট্য বেড়েছে, e. g. *Crepis*-এ। (b) asymmetry বাড়ার সাথে সাথে ক্রোমোসোম সংখ্যা বেড়েছে এবং কোনও কোনও চরিত্রে বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে, যেমন, *Clarkia*-এ। তবে এই রকম প্রবণতা প্রথম ধরনের (a) পরিবর্তনের চেয়ে কম দেখা যায়।

V আকৃতির ক্রোমোসোম মাঝে ভেঙে গেলে দুইটি টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে ক্রোমোসোমগুলির আকৃতির পার্থক্য দেখা যায় অর্থাৎ, asymmetry বাড়ে। আবার কখনও কখনও দুইটি টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোমের মধ্যে সংযোগের ফলে, কিম্বা দুইটি অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোমের মধ্যে রেসিপ্রোক্যাল ট্রান্সলোকেশনের ফলে V আকৃতির ক্রোমোসোম সৃষ্টি হয়। শেষোক্ত পদ্ধতিতে উৎপন্ন V আকৃতির ক্রোমোসোমের একটি বড় ও আরেকটি ছোট হওয়ায় ক্যারিওটাইপে বিভিন্ন ক্রোমোসোমের আয়তনে পার্থক্য দেখা দেয়। এই ছোট ক্রোমোসোমটি যদি বাদ যায়, তাহলে ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাস পায়, যেমন *Crepis*-এ। এরপর যদি ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন ও পলিপ্লয়েডির মাধ্যমে বিবর্তন হয়, তাহলে বিভিন্ন উদ্ভিদের বিবর্তন ও পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা মুস্কিল, যেমন, Cycadaceae-তে।

সাধারণত symmetry থেকে asymmetry-র দিকে বিবর্তন হয়। কিন্তু কখনও কখনও বিপরীত দিকে অর্থাৎ, asymmetry থেকে symmetry-র দিকে বিবর্তন হতে পারে। তবে Stebbins বলেছেন যে, প্রথম ধরনের প্রক্রিয়া দ্বিতীয় ধরনের প্রক্রিয়ার চেয়ে অনেক বেশি হারে হয়। এই দুই বিপরীতমুখী বিবর্তনে দেখা যায় যে, প্রথম ধরনের বিবর্তন ক্রোমোসোমের অসমান ট্রান্সলোকেশন বা পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনের ফলে হয়। এর ফলে ক্রোমোসোমের বা সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। দ্বিতীয় ধরনের বিবর্তন কেন্দ্রীয় সংযোগের ফলে হয় এবং এর ফলে ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাস পেতে পারে।

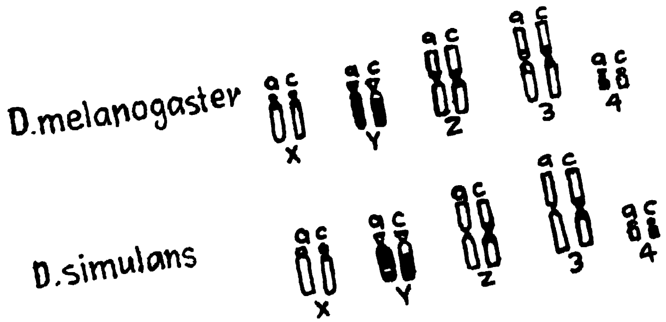
বিবর্তনের ফলে ক্যারিওটাইপে ক্রমশ asymmetry বাড়ার কারণ ব্যাখ্যা করে দুইটি মত রয়েছে।

(a) কোনও কোনও বিজ্ঞানী মনে করেন যে, বড় V আকৃতির ক্রোমোসোমের

চেয়ে ছোট টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম অ্যানাফেজে অনেক তাড়াতাড়ি পরস্পর থেকে পৃথক হতে পারে। সুতরাং, ক্রোমোসোমগুলি সহজেই মেরুতে পৌঁছায় এবং এদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি হয়। এছাড়া অপেক্ষাকৃত ছোট ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল ছোট হওয়ায় ক্রোমোসোমের পৃথকীকরণের সুবিধা হয়। তবে এই মতের সাহায্যে *Lilium*-এর উন্নত প্রজাতির ক্যারিওটাইপে দুইটি বড় V আকৃতির ক্রোমোসোমের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা যায় না। এই মতকে 'ease of separation hypothesis' (সহজ পৃথকীকরণের মত) বলে।

(b) আরেকটি মত অনুসারে, asymmetrical ক্যারিওটাইপে ক্রোমোসোমের দীর্ঘ বাহুতে উপযোগী জিনের সমাবেশ হয়। এই বাহুতে ইনভারশন ও ট্র্যান্সলোকেশনের মাধ্যমে ক্রমশ উপযোগী জিন যুক্ত হয়। যেসব বাহুতে এরকম জিনের সমন্বয় হয়নি, সেইসব বাহু থেকে ডিলিশনের ফলে অদরকারী জিন বাদ যায়। এই মতকে 'linked gene cluster hypothesis' (লিঙ্কড জিনের সমাবেশের মত) বলে।

এজন্য নতুন পরিবেশে অভিযোজনের সময় কোনও জীবের বিবর্তনে asymmetrical ক্যারিওটাইপ দেখা যায়। ছোট, বড় নানা রকম ক্রোমোসোমীয় পরিবর্তনের ফলে ক্যাবিওটাইপে পার্থক্য দেখা দেয়। এরকম কোনও কোনও পরিবর্তন কখনও কখনও অনেকগুলি শ্রেণীতে দেখা যায়, আবাব কোনও কোনও পরিবর্তন কেবল একটি বিশেষ শ্রেণীতে হয়। ক্রোমোসোমের পুনর্বিন্যাসের ফলে ক্যারিওটাইপের পরিবর্তন হয় এবং এব থেকে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে।



চিত্র—187

D melanogaster ও *D simulans*-এ কুইনোক্রিন মাস্টার্ড স্টেইনিং পদ্ধতিতে দেহ কোষের মেটাফেজ অবস্থার ক্রোমোসোমে Q এবং C ব্যান্ডিং দেখান হয়েছে। বর্ণহীন অঞ্চল সাদা এবং গাঢ় বর্ণযুক্ত অঞ্চল কালো এবং হালকা বর্ণযুক্ত অঞ্চল ছিটযুক্ত দেখান হয়েছে।

Drosophila melanogaster ও *D. simulans*-এ অঙ্গ সংস্থানিক চরিত্রের দিক থেকে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু এরা জননের ক্ষেত্রে পরস্পর থেকে পৃথক থাকে। তৃতীয় ক্রোমোসোমের একটি বড় ইনভারশন এবং অন্যান্য ক্রোমোসোমে অনেকগুলি

ছোট ছোট পরিবর্তনের জন্য এই পার্থক্য দেখা যায়। Q এবং C ব্যান্ডিং পদ্ধতিতে পরীক্ষা করলে আরও ভালভাবে দুইটি জিনোমের পার্থক্যগুলি দেখা যায় (চিত্র 187)। *D. pseudoobscura* এবং *D. simulans*-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। এদের বিভিন্ন ক্রোমোসোমে অন্তত পঞ্চাশ জায়গায় ভেঙে গিয়ে পুনর্বিন্যাস হয়েছে। এরকম পরিবর্তন প্রধানত ক্রোমোসোমের একটি বাহুর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

White-এর মতে, যৌন জননশীল জীবের তুলনায় পারথেনোজেনেটিক প্রজাতিতে অনেক বেশি মাত্রায় ক্রোমোসোমের অসাম্য (heterozygosity) দেখা যায়। যে পরিমাণ সংযোজন বা অবলুপ্তি বা পুনর্বিন্যাস সহনীয়, সেই পরিমাণের ক্রোমোসোমীয় বা ক্যারিওটাইপের পার্থক্য দেখা যায়।

ড্রসোফিলায় পঞ্চাশটি বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যান্ডের অবলুপ্তি প্রাণনাশক হয়। মানুষের 13 এবং 14নং ক্রোমোসোমের মধ্যে ট্রান্সলোকেশনেব ফলে উভয় ক্রোমোসোমে খর্ব বাহুর একটি অংশ বাদ যায়, কিন্তু এই পরিবর্তনের কোনও বহিঃপ্রকাশ হয়নি। 17নং ক্রোমোসোমের খর্ব বাহুর একাংশ অবলুপ্ত হলেও এব কোনও বহিঃপ্রকাশ নেই। কিন্তু 5নং ক্রোমোসোমের একটি অংশেব অবলুপ্তির ফলে cru-du-chat সিনড্রোম দেখা দেয়। সুতরাং, ক্যারিওটাইপের বিবর্তনে নানা রকম পরিবর্তন হয়েছে।

3) হেটারোক্রোমাটিনের পরিমাণ ও অবস্থানের পার্থক্য

হেটারোক্রোমাটিনের পরিমাণের বৃদ্ধি বা হ্রাস-এর ফলেও ক্যাবিওটাইপের পরিবর্তন হয়। যেখানে ক্রোমোসোমে যথেষ্ট পরিমাণ হেটারোক্রোমাটিন থাকে, সেখানে ক্রোমোসোমের আকৃতি, আয়তন বা সংখ্যাব পরিবর্তন ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের কোনও রদবদল ছাড়াই হতে পারে।

প্রাণীতে সেন্ট্রিক ফিউশন সম্ভবত কেবল হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল এবং সেন্ট্রোমিয়ার ও এর পার্শ্ববর্তী হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের হ্রাস বা বৃদ্ধির ফলে হয়। এরকম পরিবর্তনের ফলে ওই প্রাণীতে খুব বেশি প্রভাব পড়ে না। সুতরাং, কিছু পরিমাণ হেটারোক্রোমাটিনের উপস্থিতি বিবর্তনের জন্য সুবিধাজনক কারণ এর ফলে কোনও ক্ষতিকর প্রভাব ছাড়াই ক্যারিওটাইপের পরিবর্তন সম্ভব।

Tradescantia-র উত্তর আমেরিকার প্রজাতিগুলিতে হেটারোক্রোমাটিনের পরিমাণ অত্যন্ত কম এবং ক্যারিওটাইপ সিমেট্রিক্যাল ও প্রায় অপরিবর্তনীয়। এখানে কেবল ইনভারশনের মাধ্যমে ক্যারিওটাইপের পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ (Anderson ও Sax '36, Darlington '37, Swanson '40) দেখেছেন যে, *Tradescantia*-এ ইনভারশন খুব বেশি হারে হয়। এখানে ক্যারিওটাইপের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় নমনীয়তা নেই বললেই চলে। Commelinaceae-র অন্যান্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জেনাসে (*Callispa, Campelia, Commelina, Cyanotis*-এ)

অ্যাসিমেট্রিক্যাল ক্যারিওটাইপও সাধারণত খুব ছোট ক্রোমোসোম থাকে। এর থেকে বোঝা যায় যে, এই গোত্রে পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে। *Tradescantia*-র নিকট সম্পর্কীয় জেনাস *Rhoeo* হল ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোট।

উত্তর আমেরিকার *Tradescantia*-র বিভিন্ন ডিপ্লয়েড প্রজাতির ক্যারিওটাইপে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। এদের মধ্যে সহজেই আন্তঃপ্রজাতি সংকরণ করা যায়। এইসব প্রজাতিগুলিতে এবং সব সংকর উদ্ভিদে প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশন দেখা যায়। এদের যদৃচ্ছ উপস্থিতির জন্য মনে করা হয় যে, এসব ইনভারশনের অভিযোজনে কোনও গুরুত্ব নেই। *Drosophila willistoni*-তেও এরকম আচরণ দেখা যায়।

ড্রসোফিলায় ও grasshopper-এর বিভিন্ন প্রজাতিতে হেটারোক্রোমাটিনের হ্রাস বা বৃদ্ধির ফলে ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন হতে দেখা গেছে। *D. pseudoobscura*-এ সাতটি ভ্যারাইটিতে বিভিন্ন রকম সম্পূর্ণ হেটারোক্রোমাটিন প্রকৃতির Y-ক্রোমোসোম পাওয়া গেছে। এদের ভৌগোলিক বিস্তারে পার্থক্য রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি অনেক জাযগায় পাওযা যায় এবং বাকী চারটি কেবল নির্দিষ্ট অঞ্চলে পাওয়া যায়। replata শ্রেণীর প্রজাতিগুলির মধ্যে *D melanopalpa*-তে সোমাটিক মেটাফেজে তিনটি হেটারোক্রোমাটিনযুক্ত বাহু দেখা যায়। *D. replata*-এ কোনও হেটারোক্রোমাটিনযুক্ত বাহু নেই। কেবলমাত্র একটি বড় ইনভারশন এই দুইটি প্রজাতিকে পৃথক কবেছে।

হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের অস্থায়িত্ব বা পরিবর্তনশীলতা ভুট্টার B-ক্রোমোসোমের ভ্যারিয়েশন থেকে প্রমাণিত হয। রাইয়ের অতিরিক্ত ক্রোমোসোমও এই ধারণাকে সমর্থন করে।

আণবিক স্তরে জিনোমের পরিবর্তন

সময়ের সাথে অভ্যন্তরীণ প্রভাবে এবং পরিবেশের প্রভাবে ক্রোমোসোমে পরিবর্তন হয়। তবে অসংখ্য ক্রোমোসোমীয় পরিবর্তন জিনের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার না করেই আবার অবলুপ্ত হয়ে যায়।

আণবিক স্তরে (molecular level) বোঝা গেছে যে, একক (single copy) এবং পুনরাবৃত্তিসম্পন্ন (repetitive) DNA-তে নির্দিষ্ট সংখ্যায় নিউক্লিওটাইডের পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন জীবে জটিলতার ক্রমবৃদ্ধি সাধারণত DNA-র পরিমাণ বৃদ্ধিব সাথে জড়িত। এছাড়া জিনগুলির মাঝে মাঝে non-coding DNA-র উপস্থিতির ফলে ট্রান্সক্রিপশন ও ট্রান্সলেশনে সুবিধা হয়। অধিক পরিমাণ কোডযুক্ত এবং কোডবিহীন DNA ও জিনের ক্রমে (sequence) বিরতি ইত্যাদি অনুন্নত অবস্থা নির্দেশ করে। বিবর্তনে পরে ট্রান্সক্রিপশন, ট্রান্সলেশন, সংযোজন (splicing) ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে হয়েছে। জিনের ক্রমে বিরতি (interrupted sequence) রয়ে গেছে কারণ, এর ফলে একটি ট্রান্সক্রিপশনের এককে বিভিন্ন রকম রিকমবিনেশন কোষটি চেষ্টা করে দেখতে পারে (Darnell)।

এই অস্থায়ী (transitional) অবস্থা থেকে 10^9 বছরের বেশি আগে একই পূর্বপুরুষ থেকে ব্যাকটিরিয়া ও ইউক্যারিওট দুইটি বিভিন্ন ধারায় উদ্ভূত হয়েছে। বিবর্তনের ফলে ব্যাকটিরিয়ার জিনোম ওপেরন নিয়ন্ত্রিত সুগঠিত অবস্থায় এসেছে, যা বিশেষ ধরনের জীবনের জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত। এদের জিনোম পরিবর্তিত পরিবেশে দ্রুত জিনীয় ও বিপাকীয় পরিবর্তনে সক্ষম। এছাড়া দ্রুত জনন এবং যথাযথ পরিবেশে মানিয়ে নিতেও এদের জিনোম খুব উপযোগী। ব্যাকটিরিয়ার জিনোমে ট্রান্সফর্মেশনের মাধ্যমে বা এপিসোম কিম্বা প্লাসমিডের সাহায্যে পরিবেশের প্রভাবে দ্রুত নিউক্লিওটাইডের পরিবর্তন হতে পারে।

প্রোক্যারিওট ও ইউক্যারিওট জিনোমে প্রধান পার্থক্য হল, এদের জিনের গঠন, বিন্যাস ও নিয়ন্ত্রণে পার্থক্য। যেমন, প্রোক্যারিওটে হিস্টিডিন বা ল্যাকটোজ উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণকারী জিনগুলি একটি ওপেরনে একসাথে (clustered) থাকে। এরা প্রোটিন নিয়ন্ত্রক পদার্থ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ইউক্যারিওটে এই জিনগুলি জিনোমে ছড়ান অবস্থায় থাকে। প্রত্যেক ইউক্যারিওট জিনের কাছেই এর নিয়ন্ত্রক জিন থাকে।

ইউক্যারিওটের interrupted জিনের যথাযথ স্থানে একটি মিউটেশন হলে, এর প্রভাব সুদূর প্রসারী হতে পারে। Gilbert-এর মতে, জিনের ক্রম ইনট্রনের (intron) মাধ্যমে ব্যাহত (interrupt) করে বিবর্তনে পুরনো অবস্থাকে বিনষ্ট না করে নতুন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন সম্ভব।

Davidson ও Britten-এর মতে, কোনও জীবের গঠনগত জিন তিন রকম mRNA তৈরি করে। সবচেয়ে কম সংখ্যক (এক থেকে কয়েকটি) প্রতিলিপিযুক্ত mRNA জটিল শ্রেণীর। এরা 10^4 বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক প্রোটিনের কোড বহন করে। মাঝারি সংখ্যক mRNA (কোষ প্রতি 15 থেকে 30টি) কেবল দশ শতাংশ প্রোটিনের কোড বহন করতে পারে। খুব বেশি যে mRNA পাওয়া যায় অর্থাৎ super-prevalent (কোষ প্রতি 10^4 টি) mRNA কেবল পরিণত কোষে পাওয়া যায়। এরা কোনও বিশেষ প্রোটিন প্রচুর উৎপাদন করে, যেমন, ইঁদুরের রেটিকুলোসাইট যা গ্লোবিন তৈরি করে। কেবল কয়েকটি mRNA শেষোক্ত শ্রেণীর। জটিল শ্রেণীর mRNA-র সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

নিউক্লিও RNA-তে (nRNA) জিনোমের সব গঠনগত জিনের প্রতিরূপ (representative) রয়েছে। সব কোষেই সব গঠনগত জিন কার্যকর ক্রমে রয়েছে ও এগুলির ট্রান্সক্রিপশন হচ্ছে কারণ, nRNA-র গড় অর্ধ জীবন (half life) হচ্ছে 20 মিনিট। সুতরাং, এই জিনগুলির ট্রান্সক্রিপশন ঐ হারেই এবং ক্রমাগতভাবে হয়।

Davidson-Britten-এর মতবাদ অনুসারে, জিনোমে দুই রকম ট্রান্সক্রিপশনের একক থাকে।

(a) গঠনগত ট্রান্সক্রিপশনের একক (constitutional transcribing unit) বা CTU-এর প্রত্যেকটিতে একটি গঠনগত জিন, কোনও পুনরাবৃত্তিসম্পন্ন (repetitive)

ক্রম ও একটি ট্র্যান্সক্রিপশন প্রারম্ভকারী অঞ্চল থাকে। এর থেকে ক্রমাগত ট্র্যান্সক্রিপশনের ফলে গঠনগত (constitutive) ট্র্যান্সক্রিপ্ট (CTs) তৈরি হয়।

(b) জিনোমের বেশিরভাগ অংশে integrating regulatory transcription-এর একক (IRTU) থাকে। এখানে ছড়ান অবস্থায় একক কপিযুক্ত ও পুনরাবৃত্তিসম্পন্ন (repetitive) ক্রম থাকে, কিম্বা পুনরাবৃত্তিসম্পন্ন ক্রমগুলি এক সাথে থাকে। এর থেকে কোষে নির্দিষ্ট integrating regulatory transcript-এর (IRTUs) এককগুলি উৎপন্ন হয়।

CTs এবং IRTs একসাথে n-RNA গঠন করে। CTs-এর তুলনায় IRTs বেশি পরিমাণে থাকে, কারণ IRTs পুনরাবৃত্তিসম্পন্ন প্রকৃতির এবং এদের উভয় সূত্রের ট্র্যান্সক্রিপশন হয়। মাঝারি সংখ্যক mRNA CTs থেকে উৎপন্ন হয়।

Davidson ও Britten এর মতে, একই পূর্বপুরুষ থেকে উৎপন্ন হওয়ার পর প্রোক্যারিওট ও ইউক্যারিওটে বিবর্তন দু'টি যথেষ্ট পৃথক ধারায় হয়েছে। প্রোক্যারিওটে জিন নিয়ন্ত্রণ (regulation) প্রধানত ট্র্যান্সক্রিপশন স্তরে কার্যকর, কিন্তু ইউক্যারিওট জিনের নিয়ন্ত্রণ ট্র্যান্সক্রিপশনের পরে হয়।

ইউক্যারিওটে জেনেটিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্যারিওটাইপের বিভিন্ন অঞ্চলের ট্র্যান্সক্রিপশন শুরু হয়, কিম্বা যথাযথ সময় ট্র্যান্সক্রিপশন বন্ধ থাকে। একটি পরিণত কোষ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে। এরকম কোষ কেবল জিনোমের অংশ বিশেষ প্রকাশ করতে সক্ষম। যেমন, মানুষের প্যানক্রিয়াসের বিটা কোষ ইনসুলিন তৈরি করতে পারে, কিন্তু এই কোষ হিমোগ্লোবিন বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করে না, যদিও এইসব পদার্থ উৎপাদনের জিন এই কোষে রয়েছে। এরিথ্রোব্লাস্ট কোষ হিমোগ্লোবিন এবং পাকস্থলীর প্যারাইট্যাল কোষ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপাদন করে।

E. coli-র জিনোমের 95% বা বেশি ট্র্যান্সক্রিপশন হয়। কিন্তু এর মধ্যে জিনোমের মোটামুটি এক তৃতীয়াংশের প্রতি 300 থেকে 1000 কোষে কেবল একবার ট্র্যান্সক্রিপশন হয়। মনে করা হয়, এই জিনগুলি ইনডিউসেবেল ভ্যারাইটির। যখন পরিবেশের পরিবর্তন হয়, যার জন্য নতুন ফেনোটাইপ প্রয়োজন, তখন এই জিনগুলি কার্যকর হয়।

সুতরাং, জিনোমের একটি বড় অংশের ট্র্যান্সক্রিপশন হয় না এবং নির্দিষ্ট সময় পরে এইসব অঞ্চলের ট্র্যান্সক্রিপশনের ক্ষমতা লোপ পায়। পরিশেষে, ইউক্রোমাটিন অঞ্চল হেটারোক্রোমাটিনে পরিবর্তিত হয়।

অন্তঃক্রোমোসোমীয় (intrachromosomal) নিয়ন্ত্রণ পাশাপাশি জিনের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। উদাহরণ হিসাবে ড্রসোফিলার Bar অঞ্চলের আচরণ পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ড্রসোফিলার একটি X ক্রোমোসোমে 16A অঞ্চল দুই বার থাকলে 'বার' চোখের সৃষ্টি হয় এবং তিন বার থাকলে বার ডাবল (bar double) চোখের সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক পুরুষে 16A অঞ্চল এক বার থাকে। বার

চোখবুক্ত পুরুষে 16A অঞ্চল পরপর দু'বার থাকে। স্বাভাবিক স্ত্রীর দু'টি X ক্রোমোসোমের প্রতিটিতে 16A অঞ্চল এক বার করে (মোট দুই বার) থাকে। বার স্ত্রী ড্রসোফিলায় অসমান ক্রসিং ওভারের ফলে স্বাভাবিক কিম্বা বার ডাবল ড্রসোফিলার সৃষ্টি হয়ে থাকে। বার চরিত্র ইউক্রোমাটিনে s-ধরনের (subtle) অবস্থানের প্রভাব (position effect) নির্দেশ করে। v-ধরনের (variegated type) position effect -এ ইউক্রোমাটিনের ওপর হেটোরোক্রোমাটিন জিনের প্রভাব দেখা যায়। ড্রসোফিলার স্বাভাবিক সাদা চোখ w জিন দিয়ে এবং লাল চোখ W জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি কোনও অস্বাভাবিকতার ফলে জিন W অপরিহার্য (constitutive) হেটোরোক্রোমাটিন অঞ্চলের কাছে অবস্থান করে, তাহলে একটি হেটোরোজাইগাস স্ত্রীতে (Ww) সম্পূর্ণ লাল চোখের পরিবর্তে লাল ও সাদা মিশ্র রঙের চোখ দেখা যায়, কারণ কোনও কোনও অঞ্চলে হেটোরোক্রোমাটিনের প্রভাবে লাল রঙের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। সুতরাং, ইউক্রোমাটিন জিনের কাজ হেটোরোক্রোমাটিনের প্রভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। হেটোরোক্রোমাটিন অঞ্চল যতদূরে থাকবে ততই এই প্রভাব কমবে। ড্রসোফিলায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই প্রভাব ক্রোমোসোমের 50 ব্যান্ড দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ইঁদুরে আনুসঙ্গিক (facultative) হেটোরোক্রোমাটিনের ইউক্রোমাটিন জিনের ওপর এরকম বাধাদায়ক প্রভাব লক্ষ্য করা হয়েছে।

উদ্ভিদে s-ধরনের position effect বিরল। কিন্তু ভুট্টায় ড্রসোফিলার মত v ধরনের position effect দেখা গেছে। হেটোরোক্রোমাটিনের প্রভাবে কোনও জিনের ট্র্যান্সক্রিপশন ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। McClintock ভুট্টার dissociation activator অঞ্চলে এরকম প্রভাব দেখেছিলেন। ক্রোমোসোম 9-এর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে Ds থাকে ও এটা Ac দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। Ac-র উপস্থিতিতে Ds ক্রোমোসোমকে অস্থায়ী করে। যখন Ds অঞ্চল ভেঙে গিয়ে নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়, তখন ক্রোমোসোমের ওই অঞ্চল ভেঙে যাওয়ার ফলে sister ক্রোমাটিডের ভগ্ন অংশ পুনরায় জোড়া লাগে ও breakage fusion-bridge cycle শুরু হয়। Ds অঞ্চল স্থানান্তরিত হলে ওই অঞ্চলের জিনগুলি আর Ac-Ds প্রক্রিয়া দিয়ে প্রভাবিত হয় না ও এদের যথাযথ ফেনোটাইপ প্রকাশিত হয়। Ds যে নতুন অঞ্চলে যায়, সেখানকার জিনগুলিতে নানারকম অস্থায়িত্ব দেখা দেয়। Ds-এর প্রভাবে জিনে যে পরিবর্তিত প্রভাব দেখা দেয় তাই নয়, এর প্রভাবে নতুন মিউটেশনও দেখা দিতে পারে। Ds ও Ac একসাথে কাজ করে ও সম্ভবত এদের উৎপত্তিস্থল একই। তবে Ac-র অনুপস্থিতিতে Ds-এর কোনও প্রভাব নেই। কিন্তু Ac এককভাবে কোনও জিনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। Ac যখন ওই জিনের নিকটবর্তী স্থান থেকে সরে যায়, তখন ঐ জিন আবার স্বাভাবিক আচরণ করে, কিম্বা এর পরিবর্তিত প্রভাব দেখা যায়। Ac এবং Ds উভয়েই মিউটেশন হতে পারে। Ac-র বিভিন্ন অবস্থা Ds-র ওপর এর প্রভাবের তারতম্য থেকে বোঝা যায়। Ds যখন ক্রোমোসোম 9-এর স্বাভাবিক স্থানে

অবস্থান করে, তখন এটা Wx বা waxy জিনের কাছে থাকে। তখন Wx জিন Ds-এর প্রভাবে এর কোনও প্রচ্ছন্ন অ্যালীলের মত (বা অনুপস্থিত) আচরণ করে। Ds অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত হলে Wx আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। Ac-র সংখ্যা যত বেশি হয়, Ds-র প্রভাব ততই কমে অর্থাৎ ফেনোটাইপে কম পরিবর্তন দেখা যায়।

জিনোম প্রতি DNA-র পরিমাণ

বিভিন্ন ইউক্যারিওট জীবে DNA-র পরিমাণের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়েছে। DNA-র পরিমাণ থেকে কোনও প্রজাতির প্রয়োজনীয় জিনের সংখ্যা নির্ধারণ করা যায় না।

Judd ড্রসোফিলার পলিটিনি ক্রোমোসোমে দেখেন যে, জিনোম প্রতি DNA-র পরিমাণের তুলনায় জিনের সংখ্যা কম। হেটারোজেনাস nRNA-র কেবলমাত্র একটি অংশের ট্র্যান্সক্রিপশন হয়ে কার্যকর mRNA তৈরি হয়।

অধিকাংশ গঠনগত (structural) জিন ও কিছু নিয়ন্ত্রক (regulatory) জিন একক কপিযুক্ত ক্রমের (single copy sequence) DNA দিয়ে তৈরি। তবে সব একক কপিযুক্ত ক্রম গঠনগত বা নিয়ন্ত্রক প্রকৃতির নয়। মেরুদণ্ডী প্রাণীতে 10% বা তার চেয়ে কম সংখ্যক একক কপিযুক্ত ক্রম গঠনগত বা নিয়ন্ত্রক কাজের সাথে জড়িত। মটরে একক কপিযুক্ত ক্রমের তুলনায় বহু কপিযুক্ত ক্রম তিন গুণ বেশি দেখা যায়।

সাধারণত উন্নত ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবে কম পরিমাণ DNA দেখা যায়। মনে করা হয় যে, বিবর্তনে বৈশিষ্ট্য বাড়ার সাথে সাথে অনেক ক্ষেত্রে ছোট ছোট বহু কপিযুক্ত ক্রমগুলি বাদ গেছে। জিনোম প্রতি DNA-র পরিমাণ জীবের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, নিউক্লিওলাস এবং কোষের আয়তন, মাইটোসিস ও মায়োসিসের স্থায়িত্ব, কোষে বিপাকের (বিশেষত জারণের) হার ইত্যাদি।

জীবের ফেনোটাইপের চরিত্র কেবল জেনোটাইপ ও পরিবেশ দিয়েই প্রভাবিত হয় না, এটা নিউক্লিওটাইপ অর্থাৎ DNA-র পরিমাণ দিয়েও প্রভাবিত হয়।

যেসব উদ্ভিদে DNA-র পরিমাণ খুব বেশি থাকে, তারা বাধ্যতামূলকভাবে (obligate) বহুবর্ষজীবী। যেসব উদ্ভিদে খুব কম পরিমাণ DNA থাকে, সেগুলি একবর্ষজীবী। যেসব ঐচ্ছিক (facultative) বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ যাদের ফুল এক বছরে উৎপন্ন হয়, তাদের DNA-র পরিমাণ একবর্ষজীবী উদ্ভিদের মত। যেসব একবর্ষজীবী উদ্ভিদে খুব কম পরিমাণ DNA থাকে, তাদের স্থায়িত্বও খুব কম, যেমন মরুভূমি বা অতুচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের কোনও কোনও উদ্ভিদে। সুতরাং, DNA-র পরিমাণ জীবন চক্রের স্থায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে Compositae গোত্রের *Pyrrhopappus*-এর বিভিন্ন প্রজাতিতে। এছাড়া পলিপ্লয়েডে এরকম সম্পর্ক প্রযোজ্য নয়।

Commoner-এর DNA-র পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে বিপাকের হার ধীর হয়।

কম পরিমাণ DNA যুক্ত বেশিরভাগ জীবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তবে Stebbins-বলেন যে, বৈশিষ্ট্যযুক্ত *Trillium, Lilium* এবং *Phoradendron*-এ খুব বেশি পরিমাণ DNA থাকে। এরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধারার শেষ পর্যায় নির্দেশ করে।

Mills বলেন যে, কম পরিমাণ DNA-র সাথে প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার একটা সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং, বিবর্তনের ও পরিবেশের চাপ আণবিক স্তরেও কার্যকর।

ক্রোমোসোমের বিবর্তন

বিভিন্ন প্রমাণ থেকে জানা গেছে যে, হেটারোক্রোমাটিন কখনও ট্র্যান্সক্রিপশন ক্ষমতা সম্পন্ন ইউক্রোমাটিনে পরিবর্তিত হতে পারে না। হেটারোক্রোমাটিন হল স্থায়ী, অপরিবর্তনশীল, জেনেটিকভাবে নিষ্ক্রিয় DNA। বিশেষ অবস্থায় ইউক্রোমাটিন জেনেটিকভাবে নিষ্ক্রিয় হেটারোক্রোমাটিনে পরিবর্তিত হতে পারে। হেটারোক্রোমাটিন বিভিন্ন প্রক্রিয়ার হারকে প্রভাবিত করে। যখন হেটারোক্রোমাটিন সেন্ট্রোমিয়ারের কাছে থাকে, তখন এটি নিকটবর্তী অঞ্চলের ক্রসিং ওভার কমিয়ে দেয়। তাছাড়া হেটারোক্রোমাটিন সহজেই ভেঙে যায়। অন্য হেটারোক্রোমাটিনের সাথে এমনকি অনুরূপ নয় এমন অংশের সাথেও যুগ্ম অবস্থান করার প্রবণতা থাকায়, এটা সেন্ট্রিক ফিউশন ও ট্র্যান্সলোকেশন সহজেই হতে দেয় এবং এর ফলে প্রয়োজনীয় ক্রোমাটিন বাদ যায় না। হেটারোক্রোমাটিন যদি জিনের পাশে অবস্থান করে, তাহলে ওই জিনের কাজকে প্রভাবিত করতে পারে। সহজেই ভেঙে যাওয়ার ক্ষমতা থাকায় কোনও রাসায়নিক বস্তুর বা বিকিরণের প্রভাব আগে হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলে দেখা যায়। সুতরাং, হেটারোক্রোমাটিন কোনও ইউক্রোমাটিন অঞ্চলকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে। এই মতকে body guard hypothesis বলে। ইন্টারফেজ অবস্থায় হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল পরিধির দিকে অবস্থান করে। সুতরাং, হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল অন্তর্বর্তী অবস্থানকারী ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের চেয়ে আগেই কোনও বস্তু দিয়ে প্রভাবিত হয়।

একটি ক্রোমোসোম বা এক জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোসোমের বিবর্তন সেক্স নির্ধারণের সাথে জড়িত। অনেক জীবে যেখানে আলাদা সেক্স ক্রোমোসোম নেই বা সেক্স ক্রোমোসোমকে অন্য সব ক্রোমোসোম থেকে আলাদাভাবে চেনা যায় না, সেখানে সমসংস্থ জিন জোড়া (allelic pairs) সেক্স নির্ধারণ করে। এখানে সেক্স কার্যগতভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু ডিপ্লয়েড প্রজাতিতে যেখানে সেক্স অঙ্গসংস্থানিক এবং / বা আচরণগতভাবে প্রকাশিত হয়, সেখানেও সব সময় সেক্স ক্রোমোসোম দেখা যায় না। যখন একটি বিশেষ ক্রোমোসোম স্ত্রী বা পুরুষে থাকে, তখন সেক্স ক্রোমোসোম বোঝা যায়। এভাবে সেক্স ক্রোমোসোম জেনেটিকভাবে পৃথকীকৃত হয়। যেমন খুশী মিউটেশনের ফলে সেক্স ক্রোমোসোম দুইটির বিবর্তন বিভিন্ন পথে হয়। তার ফলে এদের মধ্যে সমসংস্থা কমে এমন পর্যায়ে আসে, যেটুকু কেবল এদের যুগ্মতা ও অ্যানাফেজে পৃথকীকরণের জন্য প্রয়োজন। হেটারোমর্ফিয় সেক্স ক্রোমোসোমের

উৎপত্তির সাথে জিন dosage compensation-এর নিবিড় সংযোগ রয়েছে। ড্রসোফিলায় XY পুরুষের একটি X ক্রোমোসোম XX স্ত্রীর দুইটি X ক্রোমোসোমের তুলনায় দ্বিগুণ হারে ট্র্যান্সক্রিপশন করে।

ভুট্টার জেনেটিক গঠন পর্যালোচনা করলে X, Y ক্রোমোসোমের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানা যায়। ভুট্টা সহবাসী। এখানে পৃথক পুং পুষ্পবিন্যাস ও স্ত্রী পুষ্পবিন্যাস গঠিত হয়। প্রচ্ছন্ন জিন ts (tassel seed) হোমোজাইগাস অবস্থায় (ts ts) অগ্রস্থ পুং পুষ্পবিন্যাসকে স্ত্রীপুষ্পবিন্যাসে পরিবর্তিত করে। আরেকটি প্রচ্ছন্ন জিন sk (silkless) ডিম্বককে বিনষ্ট করে দেয়। Ts জিন sk-র উপর এপিস্ট্যাটিক। tstssksk উদ্ভিদে স্বাভাবিক পার্শ্বীয় পুং পুষ্পবিন্যাস এবং অগ্রস্থ পুং পুষ্পবিন্যাস স্ত্রী পুষ্পবিন্যাসে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং, এরকম উদ্ভিদ হল স্ত্রী উদ্ভিদ। Tsts sksk উদ্ভিদগুলি সম্পূর্ণভাবে পুং উদ্ভিদ। ts ও sk জিন দুইটি লিঙ্কড নয়। Tsts sksk × tsts sksk ক্রসের ফলে স্ত্রী ও পুং উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। এখানে ts ও Ts জিনযুক্ত ক্রোমোসোম দু'টি যথাক্রমে প্রাচীন X ও Y ক্রোমোসোমের সমকক্ষ।

প্রাণীতে ও উদ্ভিদে বহুবার স্বাধীনভাবে সেক্স নির্ধারণকারী প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছে। এদের বিশদ প্রক্রিয়ার পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে হেটোবোমর্ফিক ক্রোমোসোম জোড়ার উৎপত্তি হয়েছে। ড্রসোফিলায় X ক্রোমোসোম স্ত্রী চরিত্র নির্ধাবণ করে এবং অটোসোমগুলি পুরুষ চরিত্র নির্ধারণ করে। Y ক্রোমোসোম কেবল পুরুষের উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ করে। X ক্রোমোসোম ও অটোসোমের ভারসাম্যের ফলে সেক্স নির্ধারণ হয়।

Lucchesi-র মতে, হেটোরোমর্ফিক ক্রোমোসোমে, যেমন Y বা Z ক্রোমোসোমে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হতে পারে, কারণ এরকম ক্রোমোসোমে রিকমবিনেশন হয় না ও এর জেনেটিক প্রভাব কম। এরকম ক্রোমোসোম প্রধানত হেটোরোক্রোমাটিন প্রকৃতির হয় এবং জেনেটিকভাবে মোটামুটি নিষ্ক্রিয় হওয়ায় হারিয়ে যেতে পারে। পতঙ্গে XX-XO ধরনের সেক্স নির্ধারণের সুলভতা ক্রোমোসোমের (Y বা Z) হারিয়ে যাওয়া নির্দেশ করে। XX-XO জীব থেকে ট্র্যান্সলোকেশনের বা সেন্ট্রিক ফিউশনের ফলে XX-XY বা $X_1X_1Y_2Y_2$–X_1X_2Y জীবের সৃষ্টি হতে পারে। XX-XY থেকে আবার ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে XX-XY_1Y_2 জীবের সৃষ্টি হতে পারে। ড্রসোফিলার কোনও কোনও প্রজাতিতে XY থেকে XY_1Y_2 অবস্থা এবং আবার XY_1Y_2 থেকে XY অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে একটি হেটোরোক্রোমাটিনযুক্ত Y ক্রোমোসোম বাদ গেছে। *Agrilus anxius*-এও এরকম দেখা গেছে।

অঙ্গজ জননকারী উদ্ভিদে প্রজাতির উদ্ভব

যৌন জননকারী উদ্ভিদে ক্রোমোসোমের যেসব পরিবর্তন জনন কোষে হয়, সেগুলিই কেবল পরের প্রজন্মে যেতে পারে। এই ধরনের যেসব পরিবর্তন লীথ্যাল নয় অর্থাৎ, যার ফলে প্রাণনাশের আশঙ্কা নেই, সেগুলির মাধ্যমে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি

হতে পারে। তবে পলিপ্লয়েডি ছাড়া ক্রোমোসোম সংখ্যার অন্য পরিবর্তনের ফলে সাধারণত গ্যামেট কার্যকর হয় না এবং এরকম পরিবর্তন সেই কারণে স্থায়ী হয় না।

অঙ্গজ জননকারী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জনন কোষ ছাড়া অন্য কোষের ক্রোমোসোমীয় পরিবর্তনও প্রজাতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে কারণ, এসব ক্ষেত্রে নতুন ধরনের ক্যারিওটাইপের জন্য গ্যামেটের অকার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অধিকাংশ একবীজপত্রী উদ্ভিদ ও কিছু দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ অঙ্গজ জননের মাধ্যমে জনন সম্পন্ন করে। এই রকম অনেক উদ্ভিদে যৌন জনন বিরল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে নানা রকম ভ্যারাইটি এবং অনেক নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে দেখা গেছে।

অঙ্গজ জননকারী উদ্ভিদের কোনও কোনও দেহ কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যার ও আকৃতির পার্থক্য দেখা যায়। যে ধরনের ক্যারিওটাইপ সবচেয়ে বেশি হারে পাওয়া যায়, সেই ক্যারিওটাইপই হ'ল ওই প্রজাতির নিজস্ব ক্যারিওটাইপ। ক্যারিওটাইপে যেসব পরিবর্তন দেখা যায়, সেরকম কোনও প্রকারণযুক্ত ক্যারিওটাইপ যদি বর্ধিষ্ণু কান্ডাগ্রে থাকে ও অপত্য উদ্ভিদের উৎপাদনে অংশ নেয়, তাহলে ওই অপত্য উদ্ভিদে এই নতুন ধরনের ক্যারিওটাইপ দেখা দেয়। এভাবে নতুন ভ্যারাইটির বা নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে। Araceae গোত্রের *Caladium bicolor*-এ এরকম আচরণ দেখা গেছে (Sharma ও Das '54)। এছাড়া Amaryllidaceae গোত্রের কোনও কোনও উদ্ভিদে, *Bougainvillea*-তে *Codiaeum* ইত্যাদিতে এভাবে প্রজাতির উৎপত্তি হয়েছে। একই প্রজাতির বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভিদে ক্যারিওটাইপের পার্থক্য এই ধারণাকেই সমর্থন করে। যেমন দেখা গেছে *Hymenocallis calathium* (2n = 74) ও *H. littaralis*-এ (2n = 44)। Sato ('44) এই দুইটি উদ্ভিদে যথাক্রমে 2n = 60 এবং 2n = 46 ক্রোমোসোম সংখ্যা দেখেছিলেন। একই উদ্ভিদের বিভিন্ন কোষে ক্যারিওটাইপের পার্থক্য কিম্বা একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যে ক্যারিওটাইপের পার্থক্য কেবল অঙ্গজ জননের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির সৃষ্টির সাহায্যেই করা যায়।

ক্যারিওটাইপের পার্থক্য ক্রোমোসোমের বিভিন্ন রকম পরিবর্তন, যেমন, ডিলিশন, ডুপ্লিকেশন, ইনভারশন বা ট্রান্সলোকেশনের জন্য হতে পারে। ক্রোমোসোমের সংখ্যার পরিবর্তন নন-ডিসজাংশন (non-disjunction), দেহ কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা হ্রাস (somatic reduction) এবং কখনও কখনও এন্ডোমাইটোসিসের জন্য হয়। নন-ডিসজাংশনের ফলে একটি গ্যামেটে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ক্রোমোসোম থাকে ও অপর গ্যামেটে স্বাভাবিকের চেয়ে কম ক্রোমোসোম থাকে। Huskin 1947 খ্রিস্টাব্দে সোডিয়াম নিউক্লিয়েট প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে প্রথম somatic reduction দেখেছিলেন। নিউক্লিক অ্যাসিডের ভারসাম্য ব্যাহত হওয়ায় দেহ কোষে সংখ্যা হ্রাসকারী পৃথকীকরণ হয়। এরকম বিভাজনের ফলে সৃষ্ট অপত্য কোষ দুইটিতে অসমান সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকতে পারে। জিন মিউটেশনের ফলে কোষে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। যেভাবেই পরিবর্তন আসুক না কেন, পরিবর্তিত কোষ থেকে

পরবর্তী প্রজন্মে কেবল পরিবর্তিত কোষের সৃষ্টি হয়। এর ফলে নিউক্লিক অ্যাসিডের ভারসাম্য ব্যাহত হওয়ায় আরো অনিয়মিত ক্যারিওটাইপ সৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে।

কোনও কোনও অঙ্গজ জননকারী উদ্ভিদে কেবল কয়েকটি ক্রোমোসোমের দ্বিগুণত্বার জন্য ক্রোমোসোম সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে, যেমন, দেখা গেছে Amaryllidaceae গোত্রের *Zephyranthes mesochloa*-এ (2n = 48)। এখানে প্রকারণযুক্ত কোষে বিভিন্ন ক্রোমোসোম সংখ্যা দেখা গেছে, যেমন— 2n = 24, 42, 54, 60, 72 ইত্যাদি। এইসব সংখ্যাই ছয়ের গুণিতক। সুতরাং বলা যায় যে, দেহ কোষের ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে ছয়টি ক্রোমোসোম এন্ডোমাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্টারফেজ অবস্থায় এই ছয়টি ক্রোমোসোম এক বা একাধিকবার দ্বিগুণ হয়। এর ফলে যতবার বিভাজন হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে মেটাফেজে অধিক সংখ্যক ক্রোমোসোম দেখা যায়।

অঙ্গজ জননকারী উদ্ভিদের দেহ কোষে খুব বেশি ক্যারিওটাইপের প্রকারণ দেখা যায়। এই পদ্ধতি জিন নিয়ন্ত্রিত। জিন ও পরিবেশের পারস্পরিক প্রভাবের ফলে এরকম পরিবর্তন দেখা যায়। যেসব জিন এরকম প্রভাবের ফলে সহজেই পরিবর্তিত হয়, বিবর্তনে সেসব জিনের নির্বাচনী গুরুত্ব রয়েছে। অন্যান্য জিন তুলনামূলকভাবে স্থায়ী।

ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তনে সাধারণত হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত থাকে। এর কারণ এইসব অঞ্চল সহজেই বহিস্থ উদ্দীপক দিয়ে প্রভাবিত হয়।

কোষের যথাযথ কাজের জন্য নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের ভারসাম্য অব্যাহত থাকা দরকার। মনে করা হয় যে, অঙ্গজ জননকারী উদ্ভিদের এই ভারসাম্য যৌন জননকারী উদ্ভিদ থেকে অন্য পদ্ধতিতে বজায় থাকে। অঙ্গজ জননকারী উদ্ভিদে প্রত্যেক কোষে আলাদাভাবে এই ভারসাম্য বজায় থাকে না। এখানে একটি কলার (টিস্যুকে) সব কোষের নিউক্লিয়াস ও সব কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে এক সাথে এই ভারসাম্য বজায় থাকে। এর ফলে একটি কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যার বৃদ্ধি অপর আরেকটি কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যার হ্রাসের ফলে মূল টিস্যুর নিউক্লিও সাইটোপ্লাজমীয় ভারসাম্য অপরিবর্তিত থাকে।

বেশিরভাগ নতুন ভ্যারাইটি বা নতুন প্রজাতি ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে। ক্রোমোসোম সংখ্যার পরিবর্তন নতুন ভ্যারাইটি বা নতুন প্রজাতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তনের ফলে বেশি পার্থক্য দেখা দেয় ও অভিযোজনে সুবিধা হয়। ক্রোমোসোমের সংখ্যার পরিবর্তনের ফলে তুলনামূলকভাবে কম পার্থক্য দেখা যায়।

সুতরাং, অঙ্গজ জননকারী উদ্ভিদে প্রকারণযুক্ত নিউক্লিয়াস অপত্য কাণ্ডে প্রবেশ করলে এবং এর থেকে অঙ্গজ জনন হলে, নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। এভাবে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে।

সপ্তদশ অধ্যায়

কোষের বৃদ্ধি, বিকাশ ও বার্ধক্য (Aging)

সব রকম কোষেরই নির্দিষ্ট জীবন সীমা রয়েছে। যতদিন একটি কোষ বেঁচে থাকে, সেই সময় সীমাকে কোষ চক্র (cell cycle) বা কোষের জীবন চক্র (life cycle of cell) বলা হয়। মাতৃ কোষের বিভাজনের ফলে কোষের সৃষ্টি হয়। এরপর কোষগুলি আয়তনে বাড়ে, নির্দিষ্ট কাজের জন্য বিকাশ লাভ করে। কোষগুলি নির্দিষ্ট সময় এই অবস্থায় থাকে, তারপর বিনষ্ট হয়ে যায়, কিম্বা বিভাজিত হয়ে অপত্য কোষ গঠন করে। সুতরাং, কোষ চক্রকে কতগুলি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এগুলি হল—

1. কোষের বৃদ্ধি— এই পর্যায়ে কোষটি আয়তনে বাড়ে ও পরিণত কোষের আয়তন লাভ করে।

2. কোষের বিকাশ (differentiation)— বিভিন্ন কাজের জন্য কোষগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়।

3. কোষের স্থায়িত্ব— এই পর্যায়ে কোষগুলি ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। এই সময় কোষের উপচিতি (anabolism) ও অপচিতি (catabolism) মোটামুটি সমান থাকে।

4 কোষের বার্ধক্য senility বা (senescence)— এই পর্যায়ে কোষের অপচিতির হার বৃদ্ধি পায়।

5. মৃত্যু— এই পর্যায়ে কোষের সব সজীব বা প্রাণবন্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায় ও কোষটি বিনষ্ট হয়ে যায়।

কোষের বৃদ্ধি ও বিকাশ

এককোষী জীবে কোষের আয়তন বৃদ্ধির ফলে ঐ জীবের বৃদ্ধি সাধিত হয়। কোষটি পরিণত হওয়ার পর যখন কোষ বিভাজনের ফলে দু'টি অপত্য কোষ উৎপন্ন হয়, তখন এককোষী জীবের জনন সম্পন্ন হয়।

বহুকোষী জীবে কোষ বিভাজনের ফলে বৃদ্ধি হয়। কোষ বিভাজনের ফলে উৎপন্ন কোষগুলি আয়তনে বাড়ে এবং ঐ প্রজাতির নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ আয়তন প্রাপ্ত হয়। এরপর কিছুদিন কোষগুলি ঐ অবস্থায় থাকে। তারপর কোষগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়, কিম্বা বিভাজিত হয়।

কোষগুলি কখনও এক অবস্থায় থাকে না। অপরিণত কোষগুলি আয়তনে বাড়ে, কিম্বা বিকাশ লাভ করে। পরিণত কোষগুলি কোনও ক্ষতি বা আঘাত আবার সারিয়ে

নেয়। কোষের বৃদ্ধি ও নতুন প্রোটোপ্লাজম উৎপাদনের জন্য কোষ পারিপার্শ্বিক মাধ্যম থেকে পুষ্টিসাধনকারী পদার্থ (nutrients) ব্যবহার করে।

কোষের বৃদ্ধি বা প্রতিস্থাপন হর্মোন বা অক্সিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।

বৃদ্ধির প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের কোষ

বহুকোষী জীবের বিভিন্ন কোষের বিভাজন, বৃদ্ধি ও বিকাশের হারের পার্থক্য দেখা যায়। বেশি সক্রিয় কোষগুলির জীবন সীমা তুলনামূলকভাবে কম হয়। এই কোষগুলি তাড়াতাড়ি জরাগ্রস্থ হয় ও মারা যায়। কম সক্রিয় কোষগুলি অত্যন্ত ধীরে ধীরে জরাগ্রস্থ হয়। একই কোষ ঐ জীবের সমগ্র জীবনকাল ধরে বিভাজিত না হয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে, যেমন— স্নায়ু কোষ।

Leblond (1964) বহুকোষী জীবের কোষগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এগুলি হল—

1. বিভাজনশীল কোষ সমষ্টি— এই কোষগুলির বিভাজন ক্ষমতা বজায় থাকে। এরকম কোষ বিশেষভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় না। দেহের কোনও অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে, কিম্বা অন্য কোনও কারণে টিস্যু বা কলার পুনরুৎপাদনের প্রয়োজন হলে এ ধরনের কোষ এইসব প্রয়োজন মেটায়। রক্তের লোহিত কণিকার জীবন সীমা 120 দিন। সুতরাং, রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা বজায় রাখার জন্য অস্থি মজ্জার হিমাটোপোয়েটিক (haematopoietic) কলার কোষগুলি পুনরায় লোহিত কণিকা উৎপাদন করে।

2. প্রসারণশীল (expanding) কোষ সমষ্টি (population)— এই কোষগুলি বিকাশ লাভ করে এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়। তবে প্রয়োজন হলে এরকম কোষ বিভাজিত হতে পারে। এই ধরনের কোষ ঐ জীবের সম্পূর্ণ জীবনকাল ধরে বেঁচে থাকে। এরকম কলার কোনও কোনও কোষে কেবল কোষ বিভাজন দেখা যায়। টিস্যু বা কলার বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রাখার জন্যই কেবল এই কোষ বিভাজন হয়। যেমন, প্রাণীর পেশী, যকৃত, বৃক্ক, থাইরয়েড ইত্যাদি কোষ এবং উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষকারী কোষ।

3. অপরিবর্তনশীল (static) কোষ সমষ্টি— এইসব বিকশিত এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষের বিভাজন ক্ষমতা থাকে না। এরকম কোষ অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

সাধারণত বহুকোষী জীবে কিছু পুরনো কোষ অবিরাম বিনষ্ট হচ্ছে ও নতুন কোষ তৈরি হচ্ছে। নবীন জীবে পুরনো কোষ বিনষ্ট হওয়ার তুলনায় নতুন কোষ উৎপাদনের হার বেশি হয়। যখন কোনও জীব পূর্ণতা (maturity) প্রাপ্ত হয়, তখন বিভিন্ন কলার কোষের মৃত্যু ও কোষের উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিণত জীবে কোষ উৎপাদনের হার কমে যায়।

কোষের আয়তন নিয়ন্ত্রণ

কোষের আয়তন বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এককোষী জীবে কোষের

আয়তন কোষ বিভাজন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। অ্যামিবায় কোষটি প্রায় দ্বিগুণ বড় হওয়ার পর এর আয়তন বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। এর কিছু পরই কোষ বিভাজন হয়।

বহুকোষী জীবে কোষের নির্দিষ্ট আয়তন 'কালোন' (chalones) দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিণত বহুকোষী প্রাণীতে কেবল কয়েকটি বিশেষ অঞ্চল (যথা-ত্বকের কোষ, হেমোপোয়েটিক কোষ) ছাড়া বাকি কোষ বিভাজিত হয় না। কেবল যেসব কোষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, সেসব অঞ্চলে সংস্কারের জন্য কোষ বিভাজন হয়। কলা থেকে উৎপাদিত বাধাদায়ক পদার্থ কোষ বিভাজনে বাধা দেয়। এই পদার্থগুলিকে 'কালোনস' বলে। আণবিক ওজনের ভিত্তিতে কালোনস দুই রকমের—

a) কম আণবিক ওজনযুক্ত (মোটামুটি 1000 থেকে 3000) কালোন,

b) বেশি আণবিক ওজনযুক্ত (মোটামুটি 30000 থেকে 50000) কালোন।

'টিস্যু কালচারে' কোষগুলি ধুয়ে কালোন মুক্ত করার পর ঐসব কোষে বিভাজন ও বৃদ্ধি হতে পারে। Giese-এর (1973) মতে, নির্দিষ্ট কালোন কোষ পর্দার নির্দিষ্ট স্থানে যুক্ত হয়ে এর বাধাদায়ক প্রভাব বিস্তার করে। Szent ও Gyorggi (1967) বলেন যে, সম্ভবত কোষে বৃদ্ধি সহায়ক পদার্থ (প্রোমিন) এবং বৃদ্ধি রোধক পদার্থ (রেটিন) থাকে। উদ্ভিদে বৃদ্ধি সহায়ক পদার্থ হল অক্সিন, জিব্বারেলিন ইত্যাদি।

কোষের বার্ধক্য (aging বা senescence)

বিভিন্ন রোগের কথা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, কোষের জরা ও মৃত্যু একটি স্বাভাবিক ঘটনা। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্রমশ কোষের কার্য ক্ষমতা কমে যেতে থাকে ও পরিশেষে কোষটি জরাগ্রস্থ হয়। বিভিন্ন কলার কোষের জরাগ্রস্থ হওয়ার সময়ের তারতম্য হয়। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষগুলি তুলনামূলকভাবে ধীরে ধীরে জরাগ্রস্থ হয়। কিন্তু বিভাজনশীল কোষগুলি তুলনামূলকভাবে তাড়াতাড়ি জরাগ্রস্থ হয়। যেমন, স্নায়ু কোষের তুলনায় ত্বকের কোষ অনেক তাড়াতাড়ি জরাগ্রস্থ হয়।

কোষের বার্ধক্যের কারণ— কোষে নানা রকম পরিবর্তনের জন্য কোষগুলি ক্রমশ নিষ্ক্রিয় ও জরাগ্রস্থ হয়। এরকম কতকগুলি পরিবর্তন হল—

1. কোষের আয়তন হ্রাস— জরাগ্রস্থ কোষের আয়তন স্বাভাবিক কোষের তুলনায় কমে যায়।

2. নিউক্লিয় পিকনোসিস (pycnosis)— বয়স বাড়ার সাথে সাথে নিউক্লিয়াস সঙ্কুচিত হয়ে যায় ও গাঢ় বর্ণ নেয়। এই প্রক্রিয়াকে নিউক্লিয় পিকনোসিস বলে এবং নিউক্লিয়াসটিকে পিকনোটিক বলে। নিউক্লিয় পদার্থের ঘনীভবনের (condensation) ফলে এরকম হয়ে থাকে।

3. লিপিড বিপাকে অস্বাভাবিকতা— অসম্পৃক্ত (unsaturated) লিপিডের জারণের ফলে সৃষ্ট উপজাত পদার্থ কোষে সঞ্চিত হয়ে কোষের ক্ষতি করে। এছাড়া সাইটোপ্লাজমে ছোট ছোট লিপিড বা স্নেহ পদার্থের ভ্যাকুওল দেখা দেয়।

4. ক্যালসিয়াম আয়নের সঞ্চয়— বয়স বাড়ার সাথে সাথে উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের সাইটোপ্লাজমে পরিধির দিকে ক্যালসিয়াম আয়ন সঞ্চিত হতে থাকে। কোষ পর্দার ভেদ্যতার পরিবর্তনের জন্য এরকম হয়।

5. অন্যান্য জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন— বয়স বাড়ার সাথে সাথে কোষে অন্যান্য কিছু জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন, (a) কোষে শ্বসনের হার কমে যায়, (b) ক্ষারীয় ও অম্লীয় ফসফেটের ঘনত্ব হ্রাস পায়।

6. প্লাজমা পর্দার ভেদ্যতা বয়স বাড়ার সাথে হ্রাস পায়।

7 অমসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিয় জালিকার পরিমাণ পুরনো কোষে হ্রাস পায়।

8. Damsey ('56) দেখেন যে, পুরনো কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া বিনষ্ট হয়ে যেতে থাকে। Zeuthen-এর ('47, '53) মতে, পুরনো কোষে শ্বসন হ্রাস পাওয়ায় মাইটোকন্ড্রিয়াগুলি কিছুটা জলহীন (dehydrated) হয়ে পড়ে।

9. পুরনো কোষে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের অনুপাতের পরিবর্তনের জন্য কোষ জরাগ্রস্থ হয়।

10. পুরনো কোষে লাইসোসোমের লিপিডের স্বজারণ (autoxidation) হওয়ায় কোষের সাইটোপ্লাজমে রঞ্জক পদার্থ লাইপোফুসিন (lipofuscin) সঞ্চিত হয়।

কোষের বার্ধক্য সংক্রান্ত মতবাদ— কোষের বার্ধক্য কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, সে সম্বন্ধে কতকগুলি মতবাদ আছে।

1. জেনেটিক ঘড়ির (genetic clock) মতবাদ— প্রত্যেক উদ্ভিদ বা প্রাণীর নির্দিষ্ট জীবন সীমা রয়েছে। কোনও উদ্ভিদ একবর্ষজীবী, কোনওটা দ্বিবর্ষজীবী, আবার কোনও কোনও উদ্ভিদ বহুবর্ষজীবী। বিভিন্ন জীবের জিনোমে তাদের জীবনকালের সর্বোচ্চ সময় সীমা লিপিবদ্ধ থাকে। বার্ধক্যের বা বয়সের নিয়ন্ত্রক জিন (aging gene) সব জীবে থাকে। এই জিনে নির্দিষ্ট জীবের সর্বোচ্চ জীবন সীমা লিপিবদ্ধ থাকে ও এই জিন জরাগ্রস্থ হওয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে। 1975 খ্রিস্টাব্দে B. Pal এই প্রক্রিয়াকে জেনেটিক ঘড়ি (clock) বা জেনেটিক সময় তালিকা (time-table) নাম দিয়েছেন।

2. কোষ সংক্রান্ত মতবাদ (cellular theories of aging)— আগে মনে করা হত যে, জরাগ্রস্থ হওয়া বা aging হল জটিল জীবের একটি ধর্ম। যদি ঐসব জীবের কোষ আলাদা করে যথাযথভাবে কালচার করা যায়, তাহলে সেগুলি জরাগ্রস্থ না হয়ে অসংখ্য প্রজন্ম ধরে বেঁচে থাকবে। কিন্তু Hayflick ('68) ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে, জরাগ্রস্থ হওয়া কেবলমাত্র জটিল জীবের ধর্ম নয়, সব কোষই এককভাবে (individually) জরাগ্রস্থ হয়।

Hayflick মানুষের ফাইব্রোব্লাস্ট (fibroblast) কোষ কালচার করে দেখেন যে, এই কোষ কেবল সীমিত প্রজন্ম ধরে কালচার করা যায়। এরপর ঐসব কোষের

বিভাজন ক্ষমতা লোপ পায় ও এগুলি জরাগ্রস্থ হয় এবং পরিশেষে মারা যায়। কত প্রজন্ম ধরে কোষগুলি কালচার করা যাবে, তা নির্ভর করে ঐ প্রজাতির জীবন সীমা ও যে জীব থেকে কোষটি নেওয়া হয়েছে তার বয়সের উপর।

জরাগ্রস্থ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে কোষ সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। এগুলি হল—

(a) ক্রস-লিঙ্কেজ (cross-linkage) মতবাদ— এই মতবাদ অনুসারে বয়স বাড়ার ফলে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের অণুর মধ্যে বণ্ড (bond) বা বন্ধনের সংখ্যা বেড়ে যায়। এর ফলে কিছু কার্যকর প্রোটিন অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং কোষের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়।

(b) মুক্ত র‍্যাডিকেলের (radical বা মূলক) মতবাদ— কোষের বিপাকের ফলে মুক্ত র‍্যাডিকেল বা মূলকের সৃষ্টি হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এইসব র‍্যাডিকেলের সংখ্যা বাড়ে। এইসব র‍্যাডিকেলের অযুগ্ম (unpaired) ইলেকট্রনগুলি আণবিক ক্রস লিঙ্কেজ বাড়ায়। এর ফলে কোষের কার্যকরী ক্ষমতা কমে যেতে থাকে। কোনও কোনও মুক্ত র‍্যাডিকেল কোষ পর্দার অসংপৃক্ত লিপিডকে আক্রমণ করে ও কোষে পুষ্টিকর পদার্থের প্রবেশ ব্যাহত করে এবং বর্জ্য পদার্থের কোষ থেকে নির্গমনে বাধা দেয়। এজন্য কোষে বর্জ্য পদার্থ সঞ্চিত হয়ে কোষের ক্ষতি করে। Harman ('56) বলেন যে, কিছু মুক্ত র‍্যাডিকেল জারণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে ও কোষের লিপিড, কোলাজেন, ইলাস্টিন প্রভৃতি বস্তুকে বিনষ্ট করে।

(c) কোষে বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে। এসব সঞ্চিত বর্জ্য পদার্থ কোষের ক্ষতি করে।

(d) কোষে বিপাকের হার (metabolic rate) বেশি হলে, কোষটি তাড়াতাড়ি জরাগ্রস্থ হয়। যেসব কোষে বেশি সক্রিয়ভাবে বিপাক হয়, সেসব কোষ তুলনামূলকভাবে তাড়াতাড়ি জরাগ্রস্থ হয়।

(e) ব্যাপনের (diffusion) মতবাদ অনুসারে, কোষে বড় বড় অণু যে হারে ব্যাপিত হয়ে কোষের বাইরে চলে যেতে পারে, তার চেয়ে দ্রুত তৈরি হয়। এর ফলে ঐসব অণু কোষে সঞ্চিত হতে থাকে ও কোষের ক্ষতি করে।

(f) স্ট্রেস বা পীড়নের (stress) মতবাদ অনুসারে, দেহে ও কোষে প্রত্যেক দিন যে ক্ষয় ক্ষতি হয়, তার ফলে কোষের অপরিবর্তনীয় লোকসান হয়ে থাকে এবং পরিশেষে কোষের মৃত্যু হয়। জীবের যত বয়স বাড়ে, ততই তার স্ট্রেস বা পীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা কমে যায়।

(g) পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের মতবাদ অনুসারে জীবের দেহ কোষে স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন হয়। কোষ বিভাজনের সময় DNA যখন দ্বিগুণ হয়, তখন কোনও ভুল ভ্রান্তির ফলে এই রকম মিউটেশন হয়। সব সজীব কোষে এই ভুল সংশোধনের পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু যদি এরকম ভুল খুব দ্রুত হারে হতে থাকে, তাহলে এই সংশোধন

পদ্ধতি সব ভুলকে সংশোধিত করতে পারে না। কিম্বা কখনও কখনও DNA-র ক্ষতি এত জটিল হয়, যা সংশোধন পদ্ধতি ঠিক করতে পারে না। এর ফলে কিছু দেহ কোষের DNA-তে মিউটেশন দেখা দেয়। এই পরিবর্তিত DNA-র জন্য প্রয়োজনীয় কোনও এনজাইম উৎপাদনে অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে এবং এর ফলে কোষের জরা ও মৃত্যু হতে পারে।

(h) **ভুল বা বিপর্যয় সংক্রান্ত (error catastrophe)** মতবাদ অনুসারে, জেনেটিক কোডের পঠনের ভ্রান্তির ফলে প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাস ভ্রান্ত হতে পারে। যদি এরকম ভ্রান্তি প্রোটিন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে গঠনগত (structural) প্রোটিন উৎপাদনে অস্বাভাবিকতা দেখা দেবে এবং কোষটি ক্রমশ জরাগ্রস্থ হবে ও পরিশেষে মারা যাবে। Orgel 1963 খ্রিস্টাব্দে এই মতবাদ গঠন করেন। পরে 1974 খ্রিস্টাব্দে Holiday ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এই মতের সমর্থন করেন ও এর সপক্ষে প্রমাণ দেন। Holiday পরিণত ফাইব্রোব্লাস্ট কোষে অস্বাভাবিক এনজাইম পেয়েছিলেন। তাঁরা *Drosophila*-র লার্ভার খাবারে মিথিযোনিন p-ফ্লুরোফিনাইল অ্যালানিনের মত অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যানালোগ ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ *Drosophila*-র জীবনকাল কমাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরকম অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যানালোগ প্রোটিনে মিথিয়োনিন ও ফিনাইল অ্যালানিনের পরিবর্তে যুক্ত হয়। এজন্য প্রোটিনের কাজে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

3. **অখণ্ড বা integrated মতবাদ**— উপরের বর্ণিত কোনও একটি মতবাদ জরা ও মৃত্যুর কারণ এককভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। এইসব মতবাদের সমন্বয় সাধন করে বলা হয়েছে যে, জরার প্রধান কারণ বিভিন্ন অণুর মধ্যে ক্রস লিঙ্কেজ গঠন। এই ক্রস লিঙ্কেজের হার, বিপাকের হার, মুক্ত র‍্যাডিকেলের ঘনত্ব এবং জীবের ওপর যে চাপেব (stress) সৃষ্টি হয়, তার ওপর নির্ভরশীল। ক্রস লিঙ্কেজ জেনেটিক ও অজেনেটিক উভয় পদ্ধতিকেই প্রভাবিত করতে পারে। DNA-তে ক্রস লিঙ্কেজের ফলে মিউটেশন দেখা দেয়। এর ফলে প্রোটিন উৎপাদনে অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। ক্রস লিঙ্কেজের ফলে কোষে কিছু বড় বড় অণু উৎপন্ন হতে পারে, যা কোষের বাইরে খুব ধীরে যেতে পারে। এজন্য এই সব অণু কোষে সঞ্চিত হয়। কোষে বর্জ্য পদার্থ ও বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ে। বিপাকের হার বেড়ে যাওয়ার ফলে কোষে মুক্ত র‍্যাডিকেলের পরিমাণ বাড়ে ও আরো ক্রস লিঙ্কেজ হতে থাকে। জীবের কোনও অংশে পরিবর্তন হলে, তার প্রভাব দেহের অন্য অংশেও পড়ে।

4. **সমন্বয়সাধনের (reconcilation) মতবাদ**— B. L. Strehler-এর মতে জেনেটিক প্রক্রিয়াব সুইচের (switch) অন-অফ পদ্ধতির সাহায্যে কোষের জরা নির্ধারিত হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথম কতকগুলি জিন সক্রিয় হয়। তারপর অন্য কতকগুলি জিন সক্রিয় হয়। এইভাবে নির্দিষ্ট সুইচ বন্ধ হওয়ার ফলে পরিণত কোষের বিভাজন ক্ষমতা লোপ পায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ক্যানসার

কোষের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিকত্বার জন্য কখনও কখনও কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজন অত্যন্ত দ্রুত হারে হয় ও টিউমারের সৃষ্টি করে। সাধারণত পরিণত কোষ বেশি বিভাজিত হয় না। তবে মৃত কোষের পরিবর্তে নতুন কোষের সৃষ্টির জন্য, কিম্বা কোনও অংশের বৃদ্ধির জন্য কোষগুলি বিভাজিত হতে পারে। তবে অস্বাভাবিক অবস্থায় কোষগুলি দ্রুত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বৈশিষ্ট্যহীন কোষ সমষ্টির সৃষ্টি করে। এই কোষ সমষ্টিকে ক্যানসার বা টিউমার বা নিওপ্লাস্টিক বৃদ্ধি (neoplastic growth) বলে। ক্যানসার কোনও একটি স্থানে হতে পারে। এরকম কোষ সমষ্টিকে মৃদু টিউমার বা benign tumour বলে। কিন্তু কখনও কখনও রক্তের বা লিম্ফের মাধ্যমে নিওপ্লাস্টিক কোষ সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ে ও metastatic tumour গঠন করে।

টিউমার মৃদু বা ম্যালিগন্যান্ট (মারাত্মক) হতে পারে।

মৃদু বা benign টিউমার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে থাকে। কোষগুলি একটি ক্যাপসুলে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। এরকম টিউমার সাধারণত ভয়ঙ্কর হয় না। তবে মস্তিষ্কের এরকম টিউমার কোনও অত্যাবশ্যকীয় অঞ্চলে চাপের সৃষ্টি করে প্রাণঘাতী হতে পারে। মৃদু টিউমার ধীরে বাড়ে। এর কোষগুলিতে অনিয়মিত মাইটোসিস হয় ও সাইটোলজিয় বিভিন্নতা এবং ক্রোমোসোমের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। এই কোষগুলি বিকশিত ও পরিণত (differentiated) হয়।

মারাত্মক বা malignant টিউমারের কোষগুলি যথাযথভাবে বিকশিত হয় না। এসব কোষে মাইটোসিস অস্বাভাবিক ও অত্যন্ত দ্রুত হারে হয়। নিউক্লিয়াসের পলিমরফিজিম দেখা যায়। রক্তবাহিকা বা লিম্ফের মধ্যে দিয়ে এরকম টিউমারের কোষ সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে। এরকম কোষে ক্ষণপদ বা সিউডোপডিয়া থাকতে পারে, যার সাহায্যে আরেকটি স্থানে টিউমার (গৌণ টিউমার) সৃষ্টি হতে পারে (মেটাস্টেসিস)।

বিভিন্ন রকম ক্যানসার দেখা গেছে। এগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

(a) কারসিনোমা (carcinoma)— 85% ক্যানসার এরকম ধরনের। এই রোগে এপিথিলিয় টিস্যু আক্রান্ত হয় ও কঠিন টিউমার গঠিত হয়। স্নায়ু কলায়, দেহ ত্বকের

এপিথিলিয় টিস্যুতে ও এর সাথে যুক্ত বিভিন্ন গ্রন্থিতে (gland) এরকম ক্যানসার দেখা যায়।

(b) লিম্ফোমা (lymphoma)— 5% ক্যানসার এরকম ধরনের। এই রোগে লিম্ফ গ্রন্থি (node) এবং প্লীহা (spleen) অতিরিক্ত লিম্ফোসাইট উৎপাদন করে।

(c) সারকোমা (sarcoma)— 2% ক্যানসার এই ধরনের। এই রোগ যোজক কলা বা connective টিস্যুতে, পেশীতে, অস্থিতে কিম্বা তরুণাস্থিতে (cartilage) হতে পারে এবং কঠিন টিউমার গঠন করতে পারে।

(d) লিউকোমিয়া (leukaemia)— 4% ক্যানসার এই ধরনের। এর ফলে লিউকোসাইটের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়।

(e) মেলানোমা (melanoma)— রঞ্জক (pigment) কোষের টিউমারকে মেলানোমা বলে।

(f) গ্লিয়োমা (glioma)— কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের গ্লিয়াল (glial) কোষের টিউমারকে গ্লিয়োমা বলে।

ক্যানসার কোষের বৈশিষ্ট্য

ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, স্বাভাবিক কোষের সাথে ক্যানসার কোষের কিছু পার্থক্য রয়েছে।

ক্যানসার কোষের নিউক্লিয়াস বড় এবং অনিয়মিত আকৃতির হয়। নিউক্লিও পর্দা গভীর ভাঁজযুক্ত বা জড়ান অবস্থায় থাকে। স্বাভাবিক কোষের তুলনায় এরকম কোষে পেরিক্রোমাটিন এবং ইন্টারক্রোমাটিন দানা বেশি থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসে কিছু নিউক্লিও বস্তু (0.2-2μ) দেখা যায়। নিউক্লিয়াসে প্রোটিন, গ্লাইকোজেন, লিপিড বা ভাইরাস থাকতে পারে। এরকম কোষের নিউক্লিওলাস অনিয়মিত আকৃতির এবং বড় হয়। ক্যানসার কোষে কখনও কখনও অনেক নিউক্লিওলাস দেখা যায়।

ক্যানসার কোষে রাইবোসোম তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই রাইবোসোমগুলি একসাথে পলিসোম গঠন করে। গলগি বস্তু সাধারণত সুগঠিত থাকে না। এরকম কোষের মাইটোকন্ড্রিয়া স্ফীত ও অস্বাভাবিক গঠনযুক্ত হয়। ক্রিস্টিগুলি সমান্তরাল বা সমকেন্দ্রিক (concentric) বা অনিয়মিত এবং সংখ্যায় কম থাকতে পারে।

এরকম কোষের সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন রকম বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। গ্যাসট্রিক ক্যানসারে মিউকাস এবং মেলানোমার কোষে মেলানিন পাওয়া যায়।

কাজের দিক থেকেও স্বাভাবিক কোষের সাথে ক্যানসার কোষের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ক্যানসার কোষ অনির্দিষ্ট বৃদ্ধি ক্ষমতা সম্পন্ন। স্বাভাবিক কোষ কালচারে পঞ্চাশ প্রজন্ম পরে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু নিওপ্লাস্টিক কোষ অনির্দিষ্টকাল বিভাজিত হতে পারে।

স্বাভাবিক কোষের প্লাজমা পর্দা যখন পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় থাকে, তখন কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজন বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থাকে contact inhibition (স্পর্শ-বাধা) বলা হয়। কালচারে স্বাভাবিক কোষ এক স্তরযুক্ত অবস্থায় বিন্যাসিত হয়। এক স্তর গঠিত হওয়ার পর, কোষ বিভাজন বন্ধ হয়ে যায়। ক্যানসার কোষ পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় থাকলেও, কোষ বিভাজন বন্ধ হয় না। এই কোষগুলি সাধারণত এক স্তর গঠন করে না। কোষগুলি সাধারণত আব (clump) গঠন করে। কোষগুলি ঐ স্ফীত অংশ থেকে আবার বৃদ্ধি পেতে পারে। সুতরাং, এরকম কোষে contact inhibition দেখা যায় না।

স্বাভাবিক কোষে পরস্পরের সাথে আটকে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কোষের এই আসঞ্জনশীলতা (adhesiveness) নির্দিষ্টভাবে হয় অর্থাৎ, একই ধরনের কোষ পরস্পর যুক্ত হয়। কালচারে যদি লিভার ও প্যানক্রিয়াসের কোষগুলি একসাথে রাখা হয়, তাহলে লিভারের কোষগুলি একসাথে যুক্ত হয় এবং প্যানক্রিয়াসের কোষগুলি একসাথে যুক্ত হয়। ক্যানসার কোষে কিন্তু খুব কম আসঞ্জন (adhesive) দেখা যায়। এছাড়া এরকম কোষের নির্দিষ্ট ধরনের কোষের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় না।

ক্যানসার কোষের পরস্পরের সাথে সংলগ্ন হওয়ার প্রবণতা না থাকায় এবং কম আসঞ্জনশীল হওয়ায় কোষগুলি সহজেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অন্য অঙ্গে প্রবেশ করতে পারে। প্লাজমা পর্দায় পরিবর্তন করে, কিম্বা প্রোটিয়েজ নিঃসৃত করে ক্যানসার কোষ অন্য টিস্যুতে প্রবেশ করে।

ক্যানসার কোষ সাধারণত প্রচুর পরিমাণ প্রোটিওলাইটিক এনজাইম নিঃসৃত করে। এইভাবে সৃষ্ট প্রোটিয়েজ সেরাম প্রোটিন প্লাসমিনোজেনের সাথে বিক্রিয়ার ফলে প্লাসমিন তৈরি করে। প্লাসমিন কোষকে বিভাজিত হতে দেয়।

ক্যানসার কোষ স্বাভাবিক কোষের চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায় ও বিভাজিত হয়। সেজন্য এরকম কোষ স্বাভাবিক কোষের চেয়ে বেশি গ্লুকোজ ব্যবহার করে।

কালচারে স্বাভাবিক কোষের তুলনায় ক্যানসার কোষ কম সিরাম ঘনত্বেও বৃদ্ধি পেতে পারে।

স্বাভাবিক কোষের চেয়ে ক্যানসার কোষে গ্লাইকোলাইসিস দ্রুত হয়। এরকম কোষের ত্বকে নেগেটিভ চার্জ স্বাভাবিক কোষের চেয়ে বেশি হয়। নিওপ্লাস্টিক কোষের কোষ পর্দায় স্বাভাবিকের চেয়ে কম গ্লাইকোলিপিড এবং গ্লাইকোপ্রোটিন থাকে।

কারসিনোজেনেসিসের কারণ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদ

কারসিনোজেনেসিসের সঠিক কারণ এখনো জানা নেই। বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ নিওপ্লাসটিক কোষের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ পেশ করেছেন।

1. **মিউটেশনের মতবাদ**— Jacobson-এর ('58) মতে, মিউটেশনের ফলে

স্বাভাবিক কোষে জেনেটিক নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া যা এনজাইম ও হর্মোনের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে কোষের বিভাজন বন্ধ রাখে, সেই প্রক্রিয়ায় গোলযোগ দেখা দেয়। মিউটেশনের ফলে স্বাভাবিক সক্রিয় জিনের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কিম্বা নিষ্ক্রিয় জিনের কাজ শুরু হতে পারে। মিউটেশন নিষ্ক্রিয় জিনে হতে পারে কিম্বা এমন জিনে হয়, যা রিপ্রেসর প্রোটিন তৈরি করে এই জিনের কাজে বাধা দেয়।

অধিকাংশ নিওপ্লাস্টিক কোষে অস্বাভাবিক ক্যারিওটাইপ দেখা দেয়। এই পরিবর্তন ক্রোমোসোম সংখ্যায়, কিম্বা ক্রোমোসোমের আকৃতিতে হতে পারে।

বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের (mutagen) প্রভাবে মিউটেশন দেখা দিতে পারে। যেসব রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে নিওপ্লাস্টিক কোষ উৎপন্ন হতে পারে তার কতকগুলি হল— মাস্টার্ড গ্যাস, p-ন্যাপথাইল অ্যামিন, কিছু রঞ্জক পদার্থ যেমন, azo-dye, আলকাতরার পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন, অ্যামিনোফেনল ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণের প্রভাবে ক্রোমোসোমে পরিবর্তন দেখা যায় ও এর ফলে ক্যানসার কোষের সৃষ্টি হতে পারে।

ক্যানসার কোষের ক্যারিওটাইপে স্বাভাবিক কোষের তুলনায় অনেক বেশি প্রকারণ (variation) দেখা যায়। একটি টিউমারের বিভিন্ন কোষে ভিন্ন ভিন্ন ক্যারিওটাইপ দেখা যেতে পারে। সুতরাং, টিউমারের কোষগুলি বিভিন্ন ধর্মী বা heterogeneous। Makino বলেন যে, প্রত্যেক টিউমারের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্যারিওটাইপ রয়েছে। নির্দিষ্ট ক্রোমোসোম সংখ্যা ও আকৃতিবিশিষ্ট এই ক্যারিওটাইপ হল প্রধান (dominate) এবং একটি stem line নির্দেশ করে। পরিবেশ যতদিন অপরিবর্তিত থাকে, ততদিন কোষ সমষ্টির ভারসাম্য থাকে এবং ঐ স্টেম লাইন নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু পরিবেশের পরিবর্তন হলে ভারসাম্য ব্যাহত হয় এবং অন্য কোনও ক্যারিওটাইপ তখন প্রধান হয় ও 'স্টেম লাইন' হিসাবে কাজ করে। ক্যানসার কোষের এরকম অভিযোজন ক্ষমতা এর রাসায়নিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা।

টিউমারের স্টেম লাইন সাধারণত পলিপ্লয়েড বা অ্যানুপ্লয়েড হয়। সাধারণত হাইপোডিপ্লয়েড থেকে হাইপারটেট্রাপ্লয়েড পর্যন্ত নানা রকম কোষ দেখা যায়। দেখা গেছে যে, টেট্রাপ্লয়েড স্তরে টিউমার কোষগুলি এক্সরে, রাসায়নিক বস্তু বা তাপমাত্রা ইত্যাদির প্রভাবে কম প্রভাবিত হয় অর্থাৎ এদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। এরকম কোষের মেটাস্টেসিস গঠনের সম্ভাবনা বেশি। টেট্রাপ্লয়েডের চেয়ে উচ্চতর সংখ্যা সাফল্য লাভ করে না এবং এরকম সংখ্যা ক্যানসার বৃদ্ধিতে বাধা দিতে পারে। একটি কোষের কালচার থেকে উৎপন্ন টিউমারগুলিতে ক্রোমোসোম সংখ্যার, আকৃতির, এমন কি কাজেরও পার্থক্য দেখা যায়।

2. **ভাইরাসের মতবাদ**— 1911 খ্রিস্টাব্দে Murphy এবং Rous বলেন যে, ভাইরাসের জন্য কারসিনোজেনেসিসের সৃষ্টি হতে পারে। এখন জানা গেছে যে, মানুষে এবং অন্যান্য অনেক জীবে ভাইরাসের আক্রমণের ফলে ক্যানসার হতে পারে।

মানুষে EB ভাইরাস অর্থাৎ Epstein-Barr ভাইরাসের প্রভাবে Burkitt-এর লিম্ফোমা এবং নাসিকা ও ফ্যারিংসের কারসিনোমা হয়। ইঁদুরে পলিওমা ভাইরাসের প্রভাবে টিউমার এবং SV 40 (semian virus 40) ভাইরাসের প্রভাবে বাঁদরে টিউমার হয়। পাখিতে ASV (avian sarcoma virus) ভাইরাসের প্রভাবে টিউমার হয়। পলিওমা ভাইরাসে একটি দ্বিসূত্রযুক্ত বলয়াকার DNA থাকে। পাখিতে এবং ইঁদুরে লিউকোমিয়া ও অন্যান্য টিউমার সৃষ্টিকারী মিক্সোভাইরাসের জিনোমে এক সূত্রযুক্ত RNA থাকে।

ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড কোষে প্রবেশ করার পর ঐ কোষের ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট অঞ্চলে ভাইরাসের DNA প্রবিষ্ট হয় ও ঐ ক্রোমোসোমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে থাকে। ভাইরাসের DNA-র প্রভাবে কোষের বিভাজন ও কোষের চলনের উপর স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। এছাড়া কোষের ত্বকেও পরিবর্তন হয় এবং কোষগুলির সংলগ্ন হওয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে যায়। এর ফলে স্বাভাবিক কোষ কারসিনোজেনাস হয়।

RNA ভাইরাসের প্রভাবেও কোষে পরিবর্তন হয়। Howard Temin-এর ('64) মতে, কোষে ভাইরাস-নির্দিষ্ট (specific) এনজাইম থাকে। এই রকম RNA নির্ভরশীল DNA পলিমারেজ বা রিভার্স ট্র্যান্সক্রিপটেজের প্রভাবে RNA ছাঁচ থেকে পরিপূরক DNA গঠিত হয়। সুতরাং, ভাইরাসের RNA হোস্টের ক্রোমোসোমে নতুন জিন সংযোজন করে এবং এর প্রভাবে কোষের স্বাভাবিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটে।

ক্যানসার সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে অঙ্কোজেনিক (oncogenic) ভাইরাস বলে। যেসব জিনে ভাইরাসের প্রভাবে পরিবর্তনের ফলে নিওপ্লাস্টিক কোষের সৃষ্টি হয়, তাদের oncogenes বলে। যেসব নির্দিষ্ট কোষে ভাইরাসের প্রভাবে ক্যানসার হয়, তাদের permissive বা অনুমতিদায়ক কোষ বলে। যেসব কোষে ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে না, তাদের non-permissive কোষ বলে।

RSV অর্থাৎ Rous সারকোমা ভাইরাসের কেবল একটি জিন (Src জিন বা সারকোমা জিন) মারাত্মক বা ম্যালিগন্যান্ট টিউমার সৃষ্টি করতে পারে। Src জিনবিহীন RSV ভাইরাস জনন সম্পন্ন করতে পারে, কিন্তু হোস্টের কোষকে ক্যানসার কোষে পরিবর্তিত করতে পারে না।

3. **বিপাকীয় মতবাদ (metabolic theory)**— Warburg-এর ('56) মতে, স্বাভাবিক কোষের শ্বসন প্রক্রিয়ায় গোলযোগ দেখা দিলে ক্যানসার হয়। সবাত শ্বসন ব্যাহত হলে অবাত শ্বসন হয় এবং এর ফলে তুলনামূলকভাবে অনেক কম শক্তি উৎপন্ন হয়। গ্লাইকোলাইসিসের ফলে উৎপন্ন সামান্য পরিমাণ শক্তি কোষের গঠন ও কাজ স্বাভাবিকভাবে বজায় রাখতে না পারায় ক্যানসার হয়। Oppenheimer দেখেন যে, ত্বকের কোষে যদি অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে ঐ সব কোষ ক্যানসার কোষে পরিবর্তিত হয়।

4. DNA-র সংস্কারে ত্রুটি— স্বাভাবিক কোষে DNA-র সংস্কার (repair) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। DNA দ্বিগুণ হওয়ার সময় কোনও গোলযোগ হলে সাধারণত এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ সব মিউটেশন সংশোধিত হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় যদি ত্রুটি দেখা দেয়, তাহলে যেসব কারসিনোজেনিক মিউটেশন হয় তা সংশোধিত হতে পারে না এবং ক্যানসার দেখা দেয়। Blooms সিনড্রোম এবং জেরডার্মা পিগমেন্টোসা (XP) ইত্যাদি কারসিনোজেনিক রোগে DNA-র সংস্কারে ত্রুটি দেখা গেছে।

পরবর্তী গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, ক্যানসারীয় বৃদ্ধির ফলে শ্বসন প্রক্রিয়ায় গোলযোগ দেখা দেয়।

5. প্রতিরোধ ক্ষমতার (immunity) অস্বাভাবিকতা— প্রত্যেক দেহ কোষের প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে, যা ঐ কোষকে বিভিন্ন রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। স্বাভাবিক জীবের প্রতিরোধ ক্ষমতা নিওপ্লাস্টিক কোষকে ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু যদি এই প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে পরে যেমন, লিম্ফোসাইটের সংখ্যা হ্রাসের ফলে, তখন ক্যানসার দেখা দেয়।

6. হর্মোনের গোলযোগ— বয়স্ক লোকের হরমোনের ভারসাম্য ব্যাহত হলে ক্যানসার দেখা দিতে পারে।

7. উত্তেজকের প্রভাবে— যেসব কোষ অবিরাম উত্তেজনার (irritated) প্রভাবে থাকে, সেসব কোষে ক্যানসার দেখা দিতে পারে। তামাকের রাসায়নিক উত্তেজনার প্রভাবে ঠোঁটের ক্যানসার হতে পারে।

উদ্ভিদে টিউমার ঃ

উদ্ভিদে টিউমার বা বাদামী গল (gall) রোগ সম্বন্ধে 1907 খ্রিস্টাব্দে Smith ও Townsend বিবরণ দেন। এই রোগ ব্যাকটিরিয়া *Agrobacterium tumefaciens*-এর আক্রমণের ফলে হয়। এই ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণের ফলে উদ্ভিদ কোষ অত্যাধিক সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং টিউমারের সৃষ্টি হয়। টিউমার সৃষ্টির জেনেটিক তথ্য একটি বড় টিউমার সৃষ্টিকারী প্লাসমিড বা Ti plasmid-এর (tumour inducing plasmid) উপস্থিতির জন্য হয়। এই প্লাসমিডে দু'টি অঞ্চল টিউমার সৃষ্টির জন্য দায়ী। এই দু'টি অঞ্চল হল TDNA (transfer DNA) এবং vir অঞ্চল (virulence)। শেষোক্ত অঞ্চলের জিন প্রথম অঞ্চলের DNA-র পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদ কোষের DNA-র সাথে প্লাসমিডের TDNA যুক্ত হয় এবং এর ফলে এমন উৎসেচকের সৃষ্টি হয়, যা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ সংশ্লেষ করে। এই পদার্থের প্রভাবে উদ্ভিদ কোষের অত্যাধিক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং টিউমার গঠিত হয়।

অঙ্কোজিনের উৎপত্তি

অঙ্কোজিন (oncogene) হল ভাইরাসের যেসব নির্দিষ্ট জিন যা ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে অথবা কোষকে পরিবর্তিত করে ক্যানসার সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

প্রোটোঅঙ্কোজিন থেকে অঙ্কোজিনের সৃষ্টি বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে। এরকম পাঁচটি পদ্ধতি হল—

ক) **পয়েন্ট মিউটেশন**— একটি বেস জোড়ার প্রতিস্থাপনের ফলে প্রোটো-অঙ্কোজিন অঙ্কোজিনে পরিবর্তিত হতে পারে।

খ) **স্থানীয় DNA-র পুনঃবিন্যাস** — DNA অণুর কোনও অংশে ডিলিশন বা পুনঃবিন্যাসের ফলে অঙ্কোজিনের সৃষ্টি হতে পারে। বেসের ক্রমের বিনিময়ের ফলে পুনঃবিন্যাস হতে পারে।

গ) **জিনের অধিক উৎপাদন**— প্রোটোঅঙ্কোজিনের অধিক উৎপাদনের ফলে অনেক প্রতিলিপি গঠিত হয়। এর ফলে ম্যালিগন্যান্ট কোষের সৃষ্টি হতে পারে।

ঘ) **ভাইরাসের DNA প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে মিউটেশন**— ক্যানসার সৃষ্টিকারী কোনও কোনও রিট্রোভাইরাসে অঙ্কোজিন থাকে না। পোষকের কোষের যে স্থানে প্রোটোঅঙ্কোজিন ছিল, সেখানে ভাইরাসের DNA যুক্ত হওয়ায় অঙ্কোজিনের সৃষ্টি হয়।

ঙ) **ক্রোমোসোমের ট্র্যান্সলোকেশন**— রেসিপ্রোক্যাল ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে প্রোটোঅঙ্কোজিনযুক্ত খণ্ড অন্য ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত হওয়ায় অঙ্কোজিনে পরিবর্তিত হয়।

মানুষের অঙ্কোজিন : মানুষের ক্যানসারে কোষস্থ (cellular) অঙ্কোজিনের ভূমিকা প্রথম প্রমাণিত হয় আশীর দশকের প্রথম দিকে Robert Weinberg এবং Geoffrey Cooper দ্বারা। মানুষের মূত্রথলির (bladder) কারসিনোমার কোষের DNA ইঁদুরের কোষের কালচারে দিলে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার সৃষ্টি হয়। এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে, টিউমার কোষে সক্রিয় কোষস্থ অঙ্কোজিন ছিল।

জিন স্থানান্তরণ পরীক্ষায় মানুষের যে অঙ্কোজিন প্রথম সনাক্ত করা হয়, সেটি হ'ল ras অঙ্কোজিন। স্বাভাবিক কোষের ras-প্রোটোঅঙ্কোজিনে পয়েন্ট মিউটেশন হওয়ায় ras-অঙ্কোজিনের সৃষ্টি হয়। কোডন 12তে একটি নিউক্লিওটাইডের পরিবর্তনের ফলে GGC-র (গ্লাইসিন) পরিবর্তে GTC-র (ভ্যালিন) সৃষ্টি হয়। এই পরিবর্তনের ফলে প্রোটিনে গ্লাইসিনের পরিবর্তে ভ্যালিনযুক্ত হয়। এই ras অঙ্কোজিনের প্রভাবে নিষ্ক্রিয় GDP পরিবর্তে সক্রিয় GTP আবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং এর ফলে কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়।

ক্রোমোসোমের ট্র্যান্সলোকেশনের ফলেও প্রোটোঅঙ্কোজিন অঙ্কোজিনে পরিবর্তিত হতে পারে, যেমন— Burkitt-এর লিম্ফোমা-এ। B লিম্ফোসাইটে ক্রোমোসোম আটের c-myc প্রোটোঅঙ্কোজিনযুক্ত অংশ ক্রোমোসোম চৌদ্দতে স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে c-myc প্রোটোঅঙ্কোজিন যথেস্ট সক্রিয় অ্যান্টিবডির জিনের কাছে থাকে। লিম্ফোসাইটে শেষোক্ত জিন যথেষ্ট সক্রিয় হওয়ায় প্রোটোঅঙ্কোজিনের ট্র্যান্সক্রিপশনে গোলযোগ দেখা দেয় এবং myc প্রোটিনের অস্বাভাবিক সংশ্লেষ হয়। এর ফলে কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় এবং টিউমার সৃষ্টি হয়।

DNA-র কোনও অঞ্চলের বারবার রেপ্লিকেশনের ফলে কোনও জিনের অনেক প্রতিলিপি গঠিত হওয়ার (gene amplification) ফলে প্রোটোঅঙ্কোজিন অঙ্কোজিনে পরিবর্তিত হতে পারে। জিন অ্যামপ্লিফিকেশনের ফলে কোনও কোনও প্রোটিন বা উৎসেচক অত্যাধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে ক্যানসার সৃষ্টি হতে পার। এই প্রক্রিয়ায় অঙ্কোজিন সৃষ্টির একটি উদাহরণ হল নিউরোব্লাস্টোমার N-myc জিন।

অঙ্কোজিনের প্রভাবে উৎপন্ন পদার্থের কাজ —

স্বাভাবিক জিনের প্রভাবে উৎপন্ন প্রোটিনের প্রভাবে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে হয়। কিন্তু এর অনুরূপ অঙ্কোজিনের দ্বারা উৎপন্ন প্রোটিনের প্রভাবে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি অনিয়ন্ত্রিতভাবে হয়। এরকম অত্যাধিক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে টিউমারের সৃষ্টি হয়। এছাড়া স্বাভাবিক কোষের তুলনায় ক্যানসার কোষের বিকাশ (differentiation) অস্বাভাবিকভাবে হয় এবং এরকম কোষে স্বাভাবিক কোষের মত নিয়মবদ্ধভাবে কোষের মৃত্যু (programmed cell death) ঘটে না। অঙ্কোজিনের প্রভাবে সৃষ্ট প্রোটিনের মধ্যে পলিপেপটাইড বৃদ্ধির ফ্যাক্টর, বৃদ্ধির ফ্যাক্টরের গ্রহীতা, আন্তঃকোষীয় সঙ্কেতের পথের উপাদান এবং ট্র্যানক্রিপশনের ফ্যাক্টর অন্তর্ভুক্ত।

কোনও কোনও অঙ্কোজিনের প্রভাবে উৎপন্ন পদার্থের সাথে বৃদ্ধির হর্মোনের সাদৃশ্য দেখা যায়, যেমন— অঙ্কোজিন erb B।

অঙ্কোজিনের প্রভাবে উৎপন্ন সব পদার্থগুলি আন্তঃকোষীয় বার্তা চক্রের সাথে জড়িত। এই চক্র বৃদ্ধি এবং বিভাজনের সময় কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণ করে।

গ্রহীতা প্রোটিন টাইরোসিন কাইনেজ কোষ বিভাজনের সঙ্কেত পাঠায়। এই উৎসেচকের গঠনে পরিবর্তন হলে এর কাজেরও পরিবর্তন হয়। এর ফলে ভুল সঙ্কেত যায় অর্থাৎ, কোষটি যখন বিভাজিত না হওয়ার কথা, তখনও বিভাজিত হওয়ার সঙ্কেত পায়। src অঙ্কোজিন গ্রহীতা প্রোটিন টাইরোসিন কাইনেজের সঙ্কেত বহন করে। এছাড়া আরো কুড়িটি অঙ্কোজিন এই প্রোটিনের সঙ্কেত বহন করে। এসব অঙ্কোজিনের সঙ্কেতযুক্ত টাইরোসিন কাইনেজ দুই রকমের— গ্রহীতা প্রোটিন টাইরোসিন কাইনেজ এবং গ্রহীতা নয় এমন প্রোটিন টাইরোসিন কাইনেজ।

টিউমার রোধকারী জিন—

টিউমার রোধকারী (supressor) জিন বাদ যাওয়ার বা নিষ্ক্রিয় হওয়ার ফলে টিউমার সৃষ্টি উদ্দীপিত হতে পারে। এরকম জিন স্বাভাবিক অবস্থায় কোষের বিভাজন এবং অস্বাভাবিক সংখ্যা বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। অর্থাৎ, এই জিনের কাজ অঙ্কোজিনের ঠিক বিপরীত।

Henry Harris ও তাঁর সহকর্মীরা 1969 খ্রিস্টাব্দে এরকম জিনের উপস্থিতির প্রথম প্রমাণ দেন। টিউমার কোষের সাথে স্বাভাবিক কোষের সংকর গঠিত হলে, ওই

সংকর কোষে টিউমার হয় না। সুতরাং, স্বাভাবিক কোষের কোনও জিন টিউমার গঠনে বাধা দেয়।

টিউমাররোধক যে জিনটি প্রথম সনাক্ত করা হয়েছিল, সেটি বংশগত রেটিনোব্লাস্টোমা রোধ করতে পারে। এই রোগ হ'ল বাচ্চাদের চোখের ক্যানসার। এরকম রোগীদের ক্রোমোসোম 13-র একটি সদস্যের নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি ডিলিশন থাকে। এর হোমোলোগে স্বাভাবিক জিন থাকে। এই অবস্থায় রোগ সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ওই হোমোলোগের ওই অঞ্চলে মিউটেশন হলে ক্যানসার দেখা দেয়। তবে এরকম হেটারোজাইগাস রেটিনোব্লাস্টোমা জিনবিশিষ্ট রোগীদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওই স্থানে সোমাটিক মিউটেশন হয় এবং রোগের সৃষ্টি হয়। বংশগত রেটিনোব্লাস্টোমায় টিউমাররোধী জিন RBI অনুপস্থিত থাকে।

ক্যানসারের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

যদিও ধারণা রয়েছে যে, ক্যানসার নিরাময় হয় না, তবে অনেক ক্ষেত্রে শুরুতে রোগ নির্ণয় হলে তা নিরাময় হতে পারে। বংশগত ক্যানসারের ক্ষেত্রে নিয়মিত পরীক্ষার ফলে রোগ শুরুতে ধরা পরতে পারে।

ক্যানসার প্রতিরোধের জন্য কীসের থেকে এই রোগ হতে পারে, তা জানা দরকার। যেমন, এখন জানা গেছে যে, তামাকের ধোঁয়া থেকে ফুসফুসের ক্যানসার হতে পারে। অত্যাধিক সূর্যালোক বা এক্স-রশ্মি থেকেও ক্যানসার হতে পারে। সেজন্য একান্ত প্রয়োজন না হলে বারবার X-ray করান উচিত নয়। সূর্যালোকে অনেকক্ষণ থাকতে হলে ত্বকের ক্রীম ব্যবহার করা উচিত। ক্যানসার সৃষ্টিকারী পদার্থ পরিহার করে চলা উচিত।

'এপিডেমিওলজিতে' (epidemiology) ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন জাতির ক্যানসারের হারের তুলনা করা হয়। আমেরিকায় আগত জাপানীদের পাকস্থলী ও ফুসফুসের ক্যানসার জাপানের জাপানীদের চেয়ে বেশি হয়। এর থেকে বলা যায় যে, ক্যানসার সৃষ্টিতে পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

Ames পরীক্ষার দ্বারা ক্যানসার কোষ গঠন করতে পারে এরকম কোষ দ্রুত সনাক্ত করা যায়। যেমন— কিছু ব্যাকটিরিয়া হিস্টিডিন সরবরাহ ছাড়া বাঁচতে পারে না। এরকম ব্যাকটিরিয়ার কলোনীতে ক্যানসার সৃষ্টিকারী পদার্থ (কারসিনোজেন) প্রয়োগ করলে হয়ত কিছু ব্যাকটিরিয়ার কোষে মিউটেশন হতে পারে এবং ওইগুলি হিস্টিডিনের সরবরাহ ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে। এরকম কোষ থেকে উৎপন্ন কলোনীগুলি গুনে পরীক্ষিত পদার্থের মিউটেশন সৃষ্টির ক্ষমতা জানা যায়।

কারসিনোজেন অন্যান্য অণুর সাথে বিক্রিয়ার ফলে যথেষ্ট সক্রিয় মুক্ত র‍্যাডিকেল গঠন করে। এসব মুক্ত অণু কোষের বিভিন্ন অণুর, এমনকি DNA-র ক্ষতিসাধন করে এবং ক্যানসার সৃষ্টিতে সহায়তা করে। খাদ্যের কোনও কোনও উপাদান, যেমন ভিটামিন (A, C, E ইত্যাদি) অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হিসাবে কাজ করে এবং মুক্ত

র‍্যাডিকেলের প্রভাব রোধ করে। সুতরাং, ভিটামিন ক্যানসার সৃষ্টির সম্ভাবনা কমায়।

ক্যানসার নিরাময়ে তিনটি পদ্ধতি হল— শল্য চিকিৎসা, বিকিরণ চিকিৎসা এবং কেমোথেরাপি (chemotherapy)। শুরুতে রোগ ধরা পড়লে, শল্য চিকিৎসা সবচেয়ে উপযোগী। দেহের একটি নির্দিষ্ট স্থানের টিউমার অপসারণ এই পদ্ধতিতে করা হয়। মেটাস্টেসিস হলে এই চিকিৎসা ফলপ্রদ হয় না কারণ, দেহের বিভিন্ন অংশে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে।

ক্যানসার নিরাময়ে X রশ্মি প্রয়োগ করা হয়। এই বিকিরণ সক্রিয়ভাবে বৃদ্ধিশীল ক্যানসার কোষের মৃত্যু ঘটায়। যেসব কোষে বিভাজনের আগে DNA সংশ্লেষ হচ্ছে অথবা মাইটোসিস হচ্ছে, সেসব কোষগুলি বিকিরণের দ্বারা অতি সহজেই প্রভাবিত হয় (সংবেদন)। তবে X-ray-র কুফল হল যে, এই বিকিরণ সুস্থ বিভাজনশীল কোষগুলিকেও (যেমন অস্থিমজ্জার লোহিত কণিকা সৃষ্টিকারী কোষ) বিনষ্ট করে। এছাড়া X রশ্মির ক্যানসার সৃষ্টিকারী ধর্মও বয়েছে। তবে কয়েক ধরনের ক্যানসারে বিকিবণ চিকিৎসা ফলপ্রসূ। যেমন— ত্বকের ক্যানসার, অস্থির ক্যানসার, Hodgkin-এর রোগ ইত্যাদি।

কেমোথেবাপিতে কোনও কোনও রাসায়নিক ওযুধের প্রভাবে ক্যানসার কোষের মৃত্যু ঘটে। মেটাস্টেসিস অবস্থায়ও এই পদ্ধতি উপযোগী। ওষুধটি ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ কবানোর পর এটি রক্ত স্রোতের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে বিকিরণের মতো। এইসব ওষুধ স্বাভাবিক, সুস্থ কোষেরও মৃত্যু ঘটায়। এই চিকিৎসাব বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায। যেমন— চুল উঠে যায়, পেটের গোলযোগ দেখা যায় এবং সহজেই কোনও রোগ হতে পারে। দেহের রক্ত কণিকা বিনষ্ট হওয়ার ফলে প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে পড়ে। এসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কেমোথেরাপি কোনও কোনও ধরনেব ক্যানসারে খুবই উপযোগী। যেমন— লিম্ফোসাইটিক লিউকোমিয়া, Burkitt-এর লিম্ফোমা, বেটিনোব্লাস্টোমা এবং Hodgkin-এর রোগ ইত্যাদি।

সম্প্রতি দেহেব নিজস্ব অনাক্রম্য প্রক্রিযার (immune system) মাধ্যমে ক্যানসার কোষ বিনষ্ট করার কথা ভাবা হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে 'ইমিউনোথেরাপি' (immunotherapy) বলে। এই পদ্ধতিতে রোগীর দেহের লিম্ফোসাইট সংগ্রহ করে ইন্টারলিউকিন 2-এর উপস্থিতিতে কালচার করা হয়। এভাবে ওই কোষের ক্যানসার ধ্বংসকারী ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। রিকমবিন্যান্ট DNA পদ্ধতিতে এমন কোনও জিন ওই সব লিম্ফোসাইটে প্রবেশ করান যেতে পারে, যে জিনের ক্যানসার কোষ ধ্বংস করার ক্ষমতা রয়েছে। এই কালচার থেকে ঘাতক T কোষ (killer T-cell) পৃথক করে রোগীর দেহে পুনরায় প্রবেশ করান হয়। এই কোষগুলিকে tunner infiltrating lymphocyte বা TILs বলে। এগুলির টিউমার হ্রাসকারী ধর্ম রয়েছে।

পরিভাষা

aberration — ত্রুটি, অস্বাভাবিকতা
acentric — সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন
achromatic — বর্ণহীন
acidic — অম্লধর্মী, আম্লিক
activator — সক্রিয়কারী
adhesive — আসঞ্জন
agametic complex — অ্যাগ্যামিয জটিলতা
aging — বার্ধক্য
algae — শৈবাল
alkaloid -- উপক্ষার
alternation of generations — জনুঃক্রম
anabolism —উপচিতি
analyser — বিশ্লেষক
angiosperm — গুপ্তবীজী উদ্ভিদ
anther —পরাগধানী
antipodal cell — প্রতিপাদ কোষ
aperture — রন্ধ্র, ছিদ্র
aqueous — জলীয়
arm — বাহু
asexual reproduction — অযৌন জনন
autoxidation — স্বজারণ
auxochrome — অক্সোক্রোম, বর্ণকারী অংশ
balanced gamete — সুষম বা সমতাযুক্ত গ্যামেট
basic — ক্ষারধর্মী, বেসিক
basic number — মূল সংখ্যা, বেসিক সংখ্যা

bright field microscope — দৃশ্যমান আলোক ব্যবহৃত অনুবীক্ষণ যন্ত্র, উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র
budding — মুকুলোদ্গম, বাডিং
by-product — উপজাত
carbohydrate — শর্করা, শ্বেতসার
catabolism — অপচিতি
cell — কোষ
cell cycle — কোষ চক্র
cell division — কোষ বিভাজন
cell plate — কোষ পর্দা
cell sap — কোষ রস
chalaza — ডিম্বক মূল
chromatic aberration — বর্ণগত ত্রুটি
chromatid bridge — ক্রোমাটিড সেতু
chromatin — ক্রোমাটিন
chromatophore — ক্রোমাটোফোর
chromosomal theory — ক্রোমোসোমীয় মতবাদ
chromosome — ক্রোমোসোম
circulation — আবর্তন গতি
class — শ্রেণী
classification — শ্রেণী বিভাগ
coil — কুণ্ডল, পেঁচ
coiled — কুণ্ডলিত, পেঁচান
coiling — কুণ্ডলীকরণ
coincidence — সমস্থানিকতা
compound microscope — যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র

concentric — সমকেন্দ্রিক
condensation — ঘনীভবন
condensed — ঘনীভূত
condenser — কনডেন্সার, আলোক কেন্দ্রীভূতকারী লেন্স
connective tissue — যোজক কলা
constitutive — অপরিহার্য
copy — প্রতিলিপি
corolla — দলমণ্ডল
cotyledon — বীজপত্র
crossing over — ক্রসিং ওভার
crystal — কেলাস
cylindrical — বেলনাকার
cytogenetics — কোষ-জিনতত্ত্ব, সাইটোজেনেটিক্স
cytokinesis — সাইটোপ্লাজমের বিভাজন
cytology — কোষতত্ত্ব, সাইটোলজি
dark field microscope — অন্ধকার ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র
daughter cell — অপত্য কোষ
deficiency — ঘাটতি, ডিফিসিয়েন্সি
dehydrate — জলহীন করা, জলবিযুক্ত করা
dehydration — জল বিয়োজন
despiralization — বিকুণ্ডলীকরণ
development — পরিণতি
dicentric — দ্বিসেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত
differential — পার্থক্যমূলক
differentiation — বিকাশ
diffused centromere — পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার
displaced duplication — স্থানান্তরিত দ্বিগুণতা
distilled — পরিশুদ্ধ, পাতিত
distortion — বিকৃতি
dividing — বিভাজনশীল
dominant — প্রবল
dormant — সুপ্ত
double fertilization — দ্বি-নিষেক
duplication — দ্বিগুণতা
ecology — বাস্তু সংস্থান
egg — ডিম্বাণু
elastic — স্থিতিস্থাপক
elemination — বর্জন
embed — নিহিত করা
embryo — ভ্রূণ
embryology — ভ্রূণতত্ত্ব
embryosac — ভ্রূণস্থলী
endosperm — সস্য
enlarge — বিবর্ধন
enlarged — বিবর্ধিত
equational division — সম বিভাজন
equator — নিরক্ষরেখা
evolution — বিবর্তন, ক্রম বিকাশ
excretory substance — বর্জ্য পদার্থ
extract — নির্যাস
facultative — আনুষঙ্গিক, ঐচ্ছিক
family — গোত্র, ফ্যামিলি
fat — স্নেহপদার্থ
fertilization — নিষেক, ফার্টিলাইজেশন
fertilized — নিষিক্ত
fibre — তন্তু, আঁশ
filter — পরিস্রুত
fixation — স্থায়ীকরণ, ফিক্সেশন
flowering plant — সপুষ্পক উদ্ভিদ
fluorescent — প্রতিপ্রভ

free nuclear stage — মুক্ত নিউক্লিয় অবস্থা
fungus — ছত্রাক
fusion — মিলন, সংযোগ
gametophyte — লিঙ্গধর উদ্ভিদ
generation — বংশ, প্রজন্ম
generative cell — জনন কোষ
generative nucleus — জনন নিউক্লিয়াস
genetics — জিনতত্ত্ব
gland — গ্রন্থি
granule — দানা
guard cell — রক্ষী কোষ
gymnosperm — ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ
herb — বীরুৎ
hereditary — বংশগত
heredity — বংশধারা, বংশগতি
homologous — হোমোলোগাস, সমসংস্থ
hybrid — সংকর
hybridization — সংকরণ
image — প্রতিবিম্ব
included inversion — অন্তর্ভুক্ত ইনভারশন
infra red ray — অবলোহিত রশ্মি
inheritance — উত্তরাধিকার
inorganic — অজৈব
insoluble — অদ্রবণীয়
integument — ডিম্বক ত্বক
intercalary — মধ্যবর্তী
interference — প্রতিবন্ধক
interzonal fibre — মধ্যাঞ্চলের তন্তু
irritability — উত্তেজনা
intra-chromosomal — অন্তঃক্রোমোসোমীয়
kinetic energy — গতিশক্তি
lagging — মন্থর গতিশীলতা, ল্যাগিং
lethal — প্রাণনাশক
life cycle — জীবন চক্র
linkage — লিঙ্কেজ, সংযুক্ততা
linked — লিংকড, সংযুক্ত
localized — স্থানিক
lump — আব
magnify — বিবর্ধিত করা
magnifying glass — আতস কাঁচ
major coil — মুখ্য কুণ্ডল
map unit — মানচিত্রের একক
maternal inheritance — মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার
medium — মাধ্যম
megaspore — স্ত্রীরেণু, ডিম্বক
membrane — পর্দা
meristematic cell — ভাজক কোষ
meristematic tissue — ভাজক কলা
messenger RNA (mRNA) — বার্তাবহ্ আর. এন. এ.
micropyle — ডিম্বক রন্ধ্র
microscope — অণুবীক্ষণ যন্ত্র
middle lamella — মধ্য পর্দা
minor coil — গৌণ কুণ্ডল, মাইনর কয়েল
mis-copy — ভ্রান্ত প্রতিলিপি
mis-division — ভ্রান্ত বিভাজন, অপবিভাজন
molecular weight — আণবিক ওজন
molecule — অণু
mother cell — মাতৃকোষ

movement — সঞ্চালন, চলন
multicellular — বহুকোষী
negative (–) — ঋণাত্মক
non-cross-over type — ক্রসওভার-বিহীন শ্রেণী
non-disjunction — ননডিসজাংশন, অপৃথকতা
nucellus — ভ্রূণ পোষক
nuclear membrane — নিউক্লিও পর্দা
nuclear reticulum — নিউক্লিও জালিকা
nucleolar organizer — নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চল
nucleolus — নিউক্লিওলাস
nucleus — নিউক্লিয়াস
organic — জৈব
overlapping inversion — উপরিপন্ন ইনভারশন
ovule — ডিম্বক
oxidation — জারণ
paraffin block — মোম খণ্ড
pericarp — ফল ত্বক
permiability — ভেদ্যতা
photosynthesis — সালোকসংশ্লেষ
physiology — শারীরবৃত্তি, শারীরতত্ত্ব
polarized — মেরু অভিমুখী
polarizer — মেরু অভিমুখীকারক
pole — মেরু
pollen — পরাগ রেণু
pollination — পরাগযোগ
polycentric — বহু সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত
positive (+) — ধনাত্মক
preserve — সংরক্ষণ
primary cell wall — প্রাথমিক কোষ প্রাচীর
pro-centric — প্রাক্-কেন্দ্রীয়
process — প্রক্রিয়া
pro-terminal — প্রাক্-প্রান্তীয়
radiation — বিকিরণ
radioactive — তেজস্ক্রিয়
reaction — বিক্রিয়া
recessive — প্রচ্ছন্ন, রিসেসিভ
recombination — রিকমবিনেশন, জিনের নতুন সংযোগ
reduction division — সংখ্যা হ্রাসকারী বিভাজন
refract — প্রতিসরিত
refractive index — প্রতিসরাঙ্ক
regulatory — নিয়ন্ত্রক
relic coil — স্মারক কুণ্ডল
reproduction — জনন
reproductive cell — জনন কোষ
residual protein — অবশিষ্ট প্রোটিন
resolving power — বিশ্লেষণ ক্ষমতা
resting stage — বিশ্রাম অবস্থা
ribose-nucleic acid (RNA)—রাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড (আর. এন. এ)
ribosomal RNA (rRNA) — রাইবোসোমীয় আর. এন. এ.
ring — বলয়াকার
rotation — প্রবাহ গতি
saturated — সংপৃক্ত
secretion — ক্ষরণ
secretory substance — ক্ষরিত পদার্থ
section — ছেদ
sectioning — সেকশন কাটা, ছেদন

seed coat — বীজ ত্বক
segmental allopolyploid — আংশিক অ্যালোপলিপ্লয়েড
self-duplication — স্ব-দ্বিগুণতা
self-reproducing — স্ব-জননশীল
semi-conservative — আংশিক রক্ষণশীল
semi-permeable — আংশিক ভেদ্য
senescence — বার্ধক্য
sensitive — সংবেদনা, সুবেদী
sexual reproduction — যৌন জনন
solution — দ্রবণ
somatic cell — দেহ কোষ
species — প্রজাতি
specific gravity — আপেক্ষিক গুরুত্ব
sperm — শুক্রাণু
spore — রেণু
sporophyte — রেণুধর উদ্ভিদ
stain — রঞ্জক পদার্থ, বর্ণ
staining — রঞ্জিতকরণ
stigma — গর্ভমুণ্ড
stomata — পত্ররন্ধ্র
structural — গঠনগত, অবয়বিক
supporting fibre — সহযোগী তন্তু
synapsis — সাইন্যাপসিস, যুগ্মতা
synergid — সাইনারজিড, সহকারী কোষ
taxonomy — শ্রেণীতত্ত্ব, ট্যাক্সোনমী
terminalization — প্রান্তিকরণ
theory — মতবাদ
tissue — টিস্যু, কলা
tractile fibre — আকর্ষ তন্তু
transfer RNA (tRNA) — পরিবহক আর. এন. এ.
transformation — রূপান্তর
translocation — ট্র্যান্সলোকেশন (স্থান বদল)
tube nucleus — নালী নিউক্লিয়াস
turgour — রসস্ফীতি
ultra violet ray — অতি বেগুনী রশ্মি
unbalanced gamete — সমতা-বিহীন গ্যামেট
unicellular — এককোষী
unit — একক
unsaturated — অসংপৃক্ত
variation — বিভিন্নতা, প্রকারণ
vegetative — অঙ্গজ
vegetative reproduction — অঙ্গজ জনন
wave length — তরঙ্গ দৈর্ঘ্য
x-ray — রঞ্জন রশ্মি, এক্স রশ্মি

অঙ্গজ — vegetative
অঙ্গজ জনন — vegetative reproduction
অজৈব — inorganic
অণু — molecule
অণুবীক্ষণ — microscope
অতি বেগুনী রশ্মি — ultra violet ray
অদ্রবণীয় — insoluble
অন্তর্ভুক্ত ইনভাবশন — included inversion
অন্তঃক্রোমোসোমীয় — intrachromosomal
অন্ধকার ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র — dark field microscope
অপত্য কোষ — daughter cell
অপচিতি — catabolism
অপবিভাজন — mis-division
অপরিবর্তনীয় — static
অপৃথকতা — non-disjunction
অবলোহিত রশ্মি — infra red ray
অম্লধর্মী — acidic
অযৌন জনন — asexual reproduction
আংশিক অ্যালোপলিপ্লয়েড — segmental allopolyploid
আংশিক ভেদ্য — semipermeable
আকর্ষ তন্তু — tractile fibre
আতস কাঁচ — magnifying glass
আণবিক ওজন — molecular weight
আনুষঙ্গিক — facultative
আপেক্ষিক গুরুত্ব — specific gravity
আব — lump
আবর্তন গতি — circulation
আলোক কেন্দ্রীভূতকারী লেন্স — condenser
আঁশ — fibre
আসঞ্জন — adhesive
আসঞ্জনশীলতা — adhesiveness
অসংপৃক্ত — unsaturated
উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র — bright field microscope
উত্তরাধিকার — inheritance
উপক্ষার — alkaloid
উপচিতি — anabolism
উপজাত — by-product
উপরিপন্ন ইনভারশন — overlapping inversion
ঋণাত্মক বিদুৎ — negative charge
একক — unit
এককোষী — unicellular
কলা — tissue
কুণ্ডল — coil
কুণ্ডলিত — coiled
কুণ্ডলীকরণ — coiling
কেলাস — crystal
কোষ — cell
কোষ চক্র — cell cycle
কোষ-জিনতত্ত্ব — cytogenetics
কোষ পর্দা — cell plate
কোষ বিভাজন — cell division
কোষ রস — cell sap
ক্রমবিকাশ — evolution
ক্রস ওভার শ্রেণী — crossover type
ক্রস ওভারবিহীন শ্রেণী — non-crossover type
ক্রসিং ওভার — crossing-over

ক্রোমাটিড সেতু — chromatid bridge
ক্রোমোসোমীয় মতবাদ — chromosomal theory
ক্ষরণ — secretion
ক্ষরিত পদার্থ — secretory substance
ক্ষারধর্মী — basic, alkaline
গঠনগত — structural
গর্ভমুণ্ড — stigma
গোত্র — family
গৌন কুণ্ডল — minor coil
গুপ্তবীজী উদ্ভিদ — angiosperm
গ্রন্থি — gland
ঘনীভবন — condensation
ঘনীভূত — condensed
ঘাটতি — deficiency
চলন — movement
ছত্রাক — fungus
জনন — reproduction
জনন কোষ — generative cell
জনন নিউক্লিয়াস — generative nucleus
জনুঃক্রম — alternation of generations
জরা — senescence
জল বিয়োজন — dehydration
জল বিযুক্ত করা — dehydrate
জলীয় — aqueous
জারণ — oxidation
জিনতত্ত্ব — genetics
জীবন চক্র — life cycle
জৈব — organic

ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড — deoxyribose nucleic acid (D.N.A.)
ডিম্বক — ovule
ডিম্বক ত্বক — integument
ডিম্বক মূল — chalaza
ডিম্বক রন্ধ্র — micropyle
ডিম্বাণু — egg

তন্তু — fibre
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য — wave length
তেজষ্ক্রিয় — radioactive

দলমণ্ডল — corolla
দানা — granule
দেহ কোষ — somatic cell
দ্বিগুণতা — duplication
দ্বি-নিষেক — double fertilization
দ্বিসেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত — dicentric
দ্রবণ — solution

ধনাত্মক বিদ্যুৎ — positive charge

নালী নিউক্লিয়াস — tube nucleus
নিউক্লিও জালিকা — nuclear reticulum
নিউক্লিও পর্দা — nuclear membrane
নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চল — nucleolar organizer
নিয়ন্ত্রক — regulatory
নির্যাস — extract
নিরক্ষরেখা — equator
নিষিক্ত — fertilzed
নিষেক — fertilization

পত্ররন্ধ্র — stomata
পর্দা — membrane
পরাগধানী — anther
পরাগযোগ — pollination
পরাগরেণু — pollen
পরিপূরক — complementary
পরিবহক আর এন এ — transfer R. N. A.
পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার — diffused centromere
পরিশুদ্ধ — distilled
পরিস্রুত — filtered
পাতিত — distilled
পার্থক্যমূলক — differential
পেঁচ — coil
পেঁচান — coiled
প্রক্রিয়া — process
প্রচ্ছন্ন — recessive
প্রজাতি — species
প্রতিপাদ কোষ — antipodal cell
প্রতিপ্রভ — fluorescent
প্রতিপ্রভা — fluorescence
প্রতিবন্ধক — interference
প্রতিবিম্ব — image
প্রতিলিপি — copy
প্রতিসরাঙ্ক — refractive index
প্রতিসরিত — refract
প্রবল — dominant
প্রবাহগতি — rotation
প্রাক-কেন্দ্রীয় — pro-centric
প্রাক-প্রান্তীয় — pro-terminal
প্রাণনাশক মিউটেশন — lethal mutation
প্রাথমিক কোষ প্রাচীর — primary cell wall
প্রান্তীয় — terminal

ফলত্বক — pericarp

বংশ — generation
বংশগত — hereditary
বংশগতি — heredity
বংশধারা — heredity
বর্জন — elemination
বর্জ্য পদার্থ — excretory substance
বর্ণগত ত্রুটি — chromatic aberration
বলয়াকার — ring
বহুকোষী — multicellular
বহুসেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত — polycentric
বার্তাবহ আর এন এ — messenger R.N.A.
বার্ধক্য — aging, senescence
বাস্তু সংস্থান — ecology
বাহু — arm
বিকিরণ — radiation
বিক্রিয়া — reaction
বিকাশ — differentiation
বিকুণ্ডলীকরণ — despiralization
বিবর্তন — evolution
বিবর্ধন — enlarge, magnify
বিবর্ধিত — enlarged, magnified
বিভাজনশীল — dividing
বিভিন্নতা — variation
বিশ্রাম অবস্থা — resting stage
বিশ্লেষক — analyser
বিশ্লেষণ ক্ষমতা — resolving power

বীজত্বক — seed coat
বীজপত্র — cotyledon
বীরুৎ — herb
বেলনাকার — cylindrical

ভাজক কলা — meristematic tissue
ভাজক কোষ — meristematic cell
ভেদ্যতা — permeability
ভ্রান্ত প্রতিলিপি — mis-copy
ভ্রান্ত বিভাজন — mis-division
ভ্রূণ — embryo
ভ্রূণতত্ত্ব — embryology
ভ্রূণপোষক — nucellus
ভ্রূণস্থলী — embryo sac
মতবাদ — theory
মধ্যপর্দা — middle lamella
মধ্যবর্তী — intercalary
মধ্যাঞ্চলের তন্তু — interzonal fibre
মন্থরগতিশীলতা — lagging
মাতৃকোষ — mother cell
মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার — maternal inheritance
মাধ্যম — medium
মানচিত্রের একক — map unit
মুকুলোদ্গম — budding
মুক্ত নিউক্লিয় অবস্থা — free nuclear stage
মুখ্য কুণ্ডল — major coil
মূল সংখ্যা — basic number
মেরু — pole
মেরু অভিমুখী — polarized
মেরু অভিমুখীকারী — polarizer
মোম খণ্ড — paraffin block

যুগ্মতা — synapsis
যোজক কলা — connective tissue
যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র — compound microscope
যৌন জনন — sexual reproduction

রক্ষী কোষ — guard cell
রঞ্জক পদার্থ — stain
রঞ্জন রশ্মি — x-ray
রন্ধ্র — aperture
রসস্ফীতি — turgour
রাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড — ribose nucleic acid
রাইবোসোমীয় আর. এন. এ. — ribosomal R.N.A.
রূপান্তর — transformation
রেণু — spore
রেণুধর উদ্ভিদ — sporophyte

লিঙ্গধর উদ্ভিদ — gametophyte

শর্করা — carbohydrate
শারীরতত্ত্ব — physiology
শারীরবৃত্তি — physiology
শুক্রাণু — sperm, antherozoid
শ্বেতসার — carbohydrate
শ্রেণী — class
শ্রেণীতত্ত্ব — taxonomy
শ্রেণী বিভাগ — classification
শৈবাল — algae

সংকর — hybrid
সংকরণ — hybridization
সংকরায়ণ — hybridization

সংপৃক্ত — saturated
সংবেদনশীল — sensitive
সংযুক্ত — linked
সংযুক্ততা — linkage
সংযোগ — fusion
সংরক্ষণ — preserve
সক্রিয়কারী — activator
সঞ্চলন — movement
সপুষ্পক উদ্ভিদ — flowering plant
সমকেন্দ্রিক — concentric
সমতাবিহীন গ্যামেট — unbalanced gamete
সমবিভাজন — equational division
সমস্থানিকতা — coincidence
সস্য — endosperm
সহকারী কোষ — synergid
সহযোগী তন্তু — supporting fibre
সাইটোপ্লাজমের বিভাজন — cytokinesis
সুপ্ত — dormant
সুষম গ্যামেট — balanced gamete
সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন — acentric
স্ত্রীরেণু — megaspore
স্থানান্তরিত দ্বিগুণতা — displaced duplication
স্থানিক — localized
স্থায়ীকরণ — fixation
স্থিতিস্থাপক — elastic
স্নেহ পদার্থ — fat
স্বদ্বিগুণতা — self-duplication
স্বজারণ — autoxidation
স্মারক কুণ্ডল — relic coil

গ্রন্থপঞ্জী

Allfrey, V., Mirsky, A. E. and Stern, H. (1955) The chemistry of cell nucleus, Adv. Enzymol. 16 : 411-500

Ambrose, E. J. and Easty, D. M. (1971) Cell biology. Ind Ed. Vikas Publ., New Delhi

Auerbach, C. and Kilbey, B. J. (1971) Mutation in eukaryotes. Amer. Rev. Genetics 5 : 163-218

Avdulov, N. P. (1931) Karyosystematische Untersuchung des Familie Gramineen. Bull. Appl. Bot. Suppl. 44 : 428

Avers, C. J. (1976) Cell biology. Eng. Language Book Society Nelson, London.

Babcock, E. B. and Stebbins, G. L. Jr. (1938) The american species of *Crepis* : their relationships and distribution as affected by polyploidy and apomixis. Carnegie Inst. Wash. Pub. 504 : 200

Baker, J. R. (1966) Cytological technique, Methuen & Co., London.

Baldwin, J. T. Jr. (1941) *Galax* : The genus and its chromosomes. Jour. Heredity 32 : 249-254

Barry, J. M. and Barry, B. M. (1973) Moleculer biology, Prentice Hall of India, New Delhi.

Bauer, H. (1938) Dié polyploidie Natur der Riesen-chromosomen. Naturwiss. 26 : 77

Beadle, G. and Beadle, M. (1966) The language of life. Doubleday & Co. Inc., New York

Beadle, G. W. (1932) The relation of crossing-over to chromosome association in *Zea-Euchlaena* hybrids. Genetics 17 : 481-501

Beasley, J. O. (1938) Nuclear size in relation to meiosis. Bot. Gaz. 99 : 865-871

Becker, A. and Hurwitz, J. (1971) Current thoughts on the replication of DNA. Progr. Nucl. Acid Res. 11 : 423-459

Beermann, W. (1952) Chromosomenkonstanz and spezifiche Modifikationen der Chromosomenstruktur in der Entwicklung and Organdifferenzierung. Chromosoma 5 : 139-198

— (1957) In biological organization cellular and subcellular, ed C. H. Waddington. Pergamon Press, London, 60-71

— (1962) Riesenchromosomen, Protoplasmatologia 6 : 1-161

Belar, K. (1929) Beitrüge zur Kausalanalyse der Mitose, II.

Untersuchung an den Spermatocyten von *Chorthippus (Stenobothrus) Lineatus* Panz. Arch. Entwn. 118 : 359-484

Belling, J. (1926) The iron acetocarmine method of fixing and staining chromosomes. Biol. Bull. 50 : 160-162

—. (1928) The ultimate chromomeres of *Lilium* and *Aloe* with regard to the number of genes. Univ. Calif. Publ. Bot. 14 : 307-318

—. and Blakeslee, A. F. (1924) The configurations and sizes of the chromosomes in the trivalents of twenty-five chromosomes of *Datura*. Proc. Nat. Acad. Sci. 10 : 116-120

Berger, C. A. (1938) Multiplication and reduction of somatic chromosome groups as a regular developmental process in the mosquito *Culex pipens*. Carnegie Inst. Wash. Publ. 476 : 209-232

—. (1941) Multiple chromosome complexes in animals and polysomaty in plants. Cold Spring Harbor. Symp. Quant. Biol. 9 : 19-21

Berry, R. O. (1941) Chromosome behaviour in the germ cells and development of the gonads in *Sciara ocellaris*. Jour Morph 68 · 547-583

Blakeslee, A. F (1928) Genetics of *Datura*. Verh. V. Internat. Kong Vererb. 7 . 117-130

— . (1930) Extra chromosomes, a source of variations in the Jimson weed. Smithsonian Report, 431-450

Bostok, C. J. and Sumner, A T. (1978) The eukaryotic chromosome. North Holland Pub. Co , Amstardam.

Bourne, G. L. (ed.) (1964) Cytology and cell physiology. Academic Press, New York.

Brachet, J. (1957) Biochemical cytology. Academic press, New York

— . and Mirsky, A. E. (1961) The cell, meiosis and mitosis. Academic press, New York.

Bradbury, E. M., Maclean, N. and Matthews, H. R. (1981) DNA, chromatin and chromosomes. Blackwell Scientific Pub., Oxford.

Braver, G. and Blount, J. (1950) Somatic elemination of ring chromosomes in *Drosophila melanogaster*. Genetics 35 : 90

Breuer, M. F. and Pavan, G. (1955) Behaviour of polytene chromosomes of *Rhynocosciara angelae* in different stages of development. Chromosoma 7 : 275-280

Bridges, C. B. (1916) Non-disjunction as a proof of the chromosome theory of heredity. Genetics 1 : 1-52, 107-163

— (1927) The relation of the age of the female to crossing over in

বিষয়সূচি

সাইটোলজির নানা জটিল বিষয় এই বইয়ে যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে জীনতত্ত্বেরও অবতারণা করা হয়েছে। কোষতত্ত্বের ইতিহাস থেকে শুরু করে অণুবীক্ষণ যন্ত্র, সাইটোলজিয় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি, কোষ, কোষ বিভাজন, জনন, ক্রোমোসোম, ক্রোমোসোমের গঠন, আচরণ, পরিবর্তন, মিউটেশন, ক্রসিং ওভার, ক্রোমোসোমের মানচিত্র, ক্যারিওটাইপের বিবর্তন, কোষের বৃদ্ধি, বিকাশ, বার্ধক্য এবং ক্যানসার ইত্যাদি সম্বন্ধে এই বইয়ের আলোচনা করা হয়েছে। অনেক চিত্র এইসব আলোচনাকে সুবোধ্য করেছে। গ্রন্থপঞ্জী ও বিষয়সূচীর সংযোজন বইটিকে সমৃদ্ধতর করেছে। এই বইয়ে বাংলা প্রতিশব্দের সঙ্গে প্রচলিত মূল বৈজ্ঞানিক শব্দগুলিও রাখা হয়েছে কারণ এইসব শব্দের সঙ্গে পরিচয় থাকলে আন্তর্জাতিক বই ও গবেষণা নিবন্ধগুলি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাবে। আগের সংস্করণের মতো এই সংস্করণটিও আমূল পরিবর্ধন ও পরিমার্জনা করা হয়েছে। সাইটোলজির গবেষণায় দ্রুত অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সংস্করণে অনেক নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে।